প্রবাসী, ৪৪শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫১

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র



বাণিজ্য-যাত্রা কালে চাঁদ সওদাগরের নৌকাডুবি

শ্রীসুখলতা রাও

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫১ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাকিস্থান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নাই। ইহাতে আনন্দিত হইবার কোন কারণ নাই, নিরুৎসাহিত হইবারও হেতু নাই। মুসলিম লীগের লাহোর-প্রস্তাব এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়ার ফরমুলা যে কত কৃত্রিম, কত অবাস্তব এই আলোচনায় তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। গান্ধীজীর পত্র-গুলিতে তাহার মানসিক অশান্তির পরিচয় অস্পষ্ট নয়; মনে হয় যেন এক দল লোকের পরোধে বাধ্য হইয়া তিনি এক অসম্ভব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মিঃ জিন্নার দাবীর কৃত্রিমতা তাঁহার প্রতি পত্রের ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্ট। লাহোর-প্রস্তাবকে পাকিস্থান দাবীর অভিব্যক্তিরূপে ধরিয়া লইয়া গান্ধীজী উহার আসল অর্থ জানিতে চাহিয়াছেন; আর মিঃ জিন্না তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন এই বলিয়া যে লাহোর-প্রস্তাবের আক্ষরিক ব্যাখ্যার জন্য এরূপ প্রশ্ন উঠে না। গান্ধীজী সমগ্রভাবে সমস্যাটির আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন, মিঃ জিন্না তাঁহার দাবী হইতে সুচ্যগ্র সরিবেন না, বার বার ইহা জানাইয়া দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার দাবীটা আসলে কি তাহা কোথাও বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। এই কৃত্রিম সমস্যার কৃত্রিম সমাধান করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত রাজাগোপালের প্রস্তাবও সমান কৃত্রিম হইয়াছিল।

মিঃ জিন্না গণভোটে রাজী নহেন। অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকাররূপেই তিনি পাকিস্থানের দাবী তুলিয়াছেন। রাজ-নীতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর সহিত গণভোট অভেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন। পৃথিবীর যে-কোন দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিলে তাহাকে গণভোটের সাহায্যে সে দাবীর সারবত্তা প্রমাণ করিতে হইয়াছে। মিঃ জিন্না আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে পাকিস্থান চাহেন, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রমাণ গণভোট গ্রহণে অনিচ্ছুক। আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে পাকিস্থান দাবীর অসারতা ইহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ জিন্নার ভয়ের কারণ নাই ইহা নহে। নিখিল-ভারত জমিয়ৎ-উল-উলেমা পাকিস্থানের সম্পূর্ণ বিরোধী। বাংলার অবস্থাও লীগের পক্ষে সঙ্কটজনক। গত ৮ই অক্টোবর বগুড়ায় জমিয়ৎ-উলেমার এক বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, মালদহ, পাবনা, জলপাইগুড়ী প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জিলার বহু মৌলানা মৌলবী এবং প্রায় কুড়ি সহস্র মুসলমান এই সভায় যোগদান করেন। সভায় মুসলিম লীগ বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিপূর্বে জমিয়তের প্রায় আশী হাজার মুসলমানের আর এক সভায়ও লীগ বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। এই সভায় উহা পুনরায় সমর্থিত হয়। ত্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি অন্যান্য জেলা হইতেও যে-সব সংবাদ আসিতেছে তাহাতেও দেখা যায় বাঙালী মুসলমান হিন্দুর সহিত আলাদা হইয়া থাকা যে সম্ভব অথবা বাঞ্ছনীয় নয় তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাংলার বর্তমান সীমানা কৃত্রিম উপায়ে টানা হইয়াছে। ইহাতে বাঙালী হিন্দু মুসলমান উভয়ের ক্ষতি হইয়াছে, সুবিধা হইয়াছে ইংরেজ শাসকের। বাংলাভাষাভাষী মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলা বিহারে জুড়িয়া দেওয়ায় বাঙালী খনিজ দ্রব্য এবং স্বাস্থ্যকর স্থানগুলি হারাইয়াছে, শ্রীহট্ট কাটিয়া বাদ দেওয়ায় বাঙালী মুসলমান বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক সম্পদের দিক দিয়া ইহাতে বাংলার প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। সব দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত বাংলার ভেদনীতি অনুসরণ করিয়া ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষের এই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী প্রদেশটিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। সহস্র বৎসর যে বাংলায় হিন্দু মুসলমান সৌহার্দ্যের সহিত পাশাপাশি বাস করিয়াছে, সেই বাংলায় মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের ভেদনীতি অনুসরণের পর হইতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সুরু হইয়াছে। উহা ক্রমাগত বাড়িয়া চলায় তৃতীয় পক্ষেরই সুবিধা হইয়াছে। ক্ষতি সব দিক দিয়া হইয়াছে বাঙালীর নিজের—হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে। বাংলার বাহির হইতে আগত মাড়োয়ারী ভাটিয়া গুজরাটি পাঞ্জাবী হিন্দু মুসলমান এখানে আসিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যেও নানা প্রভেদ আছে কিন্তু একটি বিষয়ে তাহারা সকলেই এক মত, বাঙালীকে বঞ্চিত করিয়া অর্থোপার্জন সম্বন্ধে ইহারা সকলেই একজোট। বাঙালী হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ইহাতে সমান ক্ষতি।

নেশ্যন বা জাতি সম্বন্ধেও মিঃ জিন্নার কৃত্রিম দাবী এই আলোচনায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। মেজরিটির আভিধানিক অর্থ মানিবার জন্য তিনি ব্যস্ত, কিন্তু নেশ্যনের আভিধানিক অর্থ

তিনি দেখিতে চাহেন না। যে জাতির ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস এক, ধর্মে ভিন্ন হইলেও তাহারাই শুধু আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার দাবী করিতে পারে। ইউরোপে, বিশেষতঃ রাশিয়ায় আত্মনিয়ন্ত্রণের যে নীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহাও এই ভিত্তিতে। ধর্মকে কোন দেশে কোন ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক অধিকারলাভের ভিত্তি বলিয়া ধরা হয় নাই। মিঃ জিন্না ভারতীয় মুসলমানের স্বতন্ত্র ভাষা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা একান্ত ভ্রান্ত। মুষ্টিমেয় ধনী মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতি হিন্দু হইতে পৃথক হইতে পারে, কিন্তু কোটি কোটি সাধারণ মুসলমান ধর্মান্তরিত হিন্দু ভিন্ন আর কিছু নয়, ইহাদের অধিকাংশই আজও পূর্বপুরুষের আচার-ব্যবহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। বাংলার তিন কোটি মুসলমান সম্বন্ধে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ১৮৭২ সালের প্রথম সেন্সাসে মিঃ বিভার্লি তাঁহার রিপোর্টেও এই সত্যের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন। মিঃ জিন্না এবং মুসলিম লীগের কতিপয় নবাব জমিদারের ভাষা ও সংস্কৃতি ভারতের সাধারণ মুসলমানের ভাষা ও সংস্কৃতি নয়। মহাত্মা গান্ধীও এই সত্যের প্রতিই মিঃ জিন্নার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ধর্মান্তরিত ব্যক্তি তাহার মূল জাতি হইতে কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন হয় না, পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য আন্তরিকতা বর্জিত অবাস্তব মীমাংসার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ও বাস্তব উপায়ে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যম হওয়া আবশ্যক। এজন্য পঞ্চদশ বা বিংশ বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়া প্রতি পাঁচ বৎসরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক জীবনে বাঙালী মুসলমানকে সর্ববিধ সুযোগ দান করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ববিষয়ে হিন্দুর সমকক্ষ করিয়া তুলিবার আয়োজন হওয়া দরকার। বাঙালী হিন্দুর সহিত মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দু শিক্ষায় ও আর্থিক অবস্থায় সমান হইয়া দাঁড়াইলে তারপর জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকলে সমানভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারিবে। রক্ষা-কবচ, বিশেষ সুবিধা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রভৃতি ভেদনীতির কথা তখন আর শোনা যাইবে না। বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজনও তখন আর হইবে না।

খাদ্যদ্রব্য অপচয়

বাংলাদেশে সরকারী কর্মচারী ও মন্ত্রীদের অনভিজ্ঞতা, অকর্মণ্যতা ও অদূরদর্শিতার জন্য লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যদ্রব্য যে ভাবে অপচয় হইতেছে, যে-কোন দেশের গবর্মেন্টের পক্ষে তাহা গভীর কলঙ্ক ও লজ্জার বিষয়। ভারতসরকার বা বাংলা-সরকারের কলঙ্কের বা লজ্জার বালাই নাই বলিয়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, যাহাদের দোষে বিরাট অপচয় ঘটিতেছে তাহাদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়া অথবা ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ব্যাপার না ঘটিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করাও ইঁহারা প্রয়োজন মনে করেন নাই। যে খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে, যাহা খাওয়ার উপযুক্ত অবস্থায় পাইলে আজও লক্ষ লক্ষ লোক একটু ভাল করিয়া খাইতে পারে, সেই অমূল্য খাদ্যদ্রব্যের অপচয় অবাধে চলিতে দেওয়া হইতেছে; গবর্মেন্ট স্বয়ং বিজ্ঞাপন দিয়া পচা খাদ্যদ্রব্য পশুখাদ্য বা মাড় দেওয়ার জন্য বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। সার প্রস্তুত করিবার জন্য আটা ময়দা জমিতে ফেলা হইতেছে ইহাও বলিতে তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সম্প্রতি বাংলা সরকার ৭৫ হাজার মণ আটা এবং ৭১ হাজার মণ ময়দা মাড় দেওয়ার জন্য বিলি করিতে চাহিয়াছেন। ইহার পূর্বে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে যে লক্ষ লক্ষ মণ আটা ময়দা উন্মুক্ত স্থানে রাখা হইয়াছিল। তাহার একটা বড় অংশ পচিয়া যাওয়ায় হাওড়ার এক জমিতে সার তৈরির জন্য ফেলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু পরিমাণ আটা ময়দা গবর্মেন্ট মানুষের খাদ্যের অযোগ্য বলিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় আটা ময়দা মজুত রাখিবার সুবন্দোবস্ত বাংলা-সরকার করিতে পারেন নাই। কলিকাতা রেশনিঙে লোককে এই সব পচা আটা ময়দা গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য গমের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রকাশ্য সভায় মেয়র স্বয়ং এবং অভিযোগ করিয়াছেন, এবং বাংলা-সরকার ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। লোককে আটার পরিবর্তে গম দিলে অপচয় হয়ত এত বেশী হইত না, কিন্তু ময়দার কলওয়ালাদের প্রতি হইত। গবর্মেন্ট বরাদ্দ গমের পরিমাণ পর্য্যন্ত কমাইয়া দিতে দ্বিধা করেন নাই। হিন্দু মহাসভার এক বিবৃতিতে প্রকাশ, খুলনা রেলওয়ে কলোনীতে শত শত বস্তা চাউল ও আটা পড়িয়া পচিতেছে।

শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থার জন্য কথায় কথায় ভারতবাসীকে দোষ দেওয়া হইয়া থাকে। গত দুর্ভিক্ষেও তাহাই করা হইয়াছে। এইজন্যই আজ মনে করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, যে দুইটি বিভাগ—সিভিল সাপ্লাই ও রেশনিং—খাদ্যদ্রব্যের বিপুল অপচয়ের জন্য দায়ী তাহাদের দুই বড় কর্তা ইংরেজ সিভিলিয়ান, এবং আর একজন ইংরেজকে বহু অর্থব্যয়ে খোঁজাখুঁজির পর রেশনিঙের পরামর্শদাতারূপে ব্রিটেন হইতে আমদানী করা হইয়াছে। ইঁহারা খোদ গবর্ণরের অধীন, ব্যবস্থা-পরিষদের কোন ক্ষমতা ইঁহাদের উপর নাই।

বাংলায় ম্যালেরিয়া

গবর্ণর মিঃ কেসী ২১শে সেপ্টেম্বর এক বেতার বক্তৃতায় বাংলার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উহাতে তিনি বলেন:

"যাহা মনে করা গিয়াছিল, তাহাই হইয়াছে; বাংলার কোন কোন অংশে, বিশেষতঃ মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলে ও পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া পুনরায় ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার ম্যালেরিয়ার ঔষধ অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ ম্যালেরিয়ার ঔষধ ব্যবহৃত হইত, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কেবল বাংলায় তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। সরকারের ঔষধ বণ্টনের ব্যবস্থাও সম্প্রতি পরিশোধিত হইয়াছে।"

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মিঃ কেসীর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন ম্যালেরিয়া কোন সময়েই কমে নাই, উহার তীব্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন

কমীটির কেন্দ্রসমূহে যে-সব রোগী চিকিৎসিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার অনুপাত নিম্নলিখিত রূপ :

মে	মাসে	...	৬৯·৩%
জুন	„	...	৬৪·৬%
জুলাই	„	...	৬৬·২%
আগষ্ট	„	...	৭৫·৩%
সেপ্টেম্বর	„	...	৮১·২% (প্রথম ১৫ দিনে)

কমীটির আপিসে বিভিন্ন স্থান হইতে যে-সব রিপোর্ট আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য স্থান ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত। অল্প কয়েক দিন পূর্বে কমীটির ইন্সপেক্টর ডাঃ বি, কে, বসু এবং আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমীটির ডাঃ লং শোর যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতেও উপরোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। মেপাক্রিন ও কুইনাক্রিন দেড় মাস আগে যে পরিমাণে পাওয়া যাইত বর্তমানে তদপেক্ষা বেশি পাওয়া যাইতেছে ডাঃ বিধান রায় ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সঙ্গে তিনি দেখাইয়াছেন যে এই সব ঔষধ যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণে ব্যবহৃত হইত আজকাল একমাত্র বাংলাদেশের জন্যই তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার। কোন কোন জেলায় কুইনাইন খুব কম দেওয়া হইতেছে, কোথাও বা উহা একেবারেই পাওয়া যায় না। সিভিল সার্জনদের মারফৎ ঔষধ সরবরাহের বন্দোবস্তও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। মফস্বলের গ্রাম্য কেন্দ্রে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য যে-সব ঔষধ দেওয়া হয় সেগুলি একেবারে ফুরাইয়া না গেলে নূতন চালান দেওয়া হয় না। এই কারণে বহু কেন্দ্রে পুনরায় ঔষধ না আসা পর্য্যন্ত চিকিৎসা বন্ধ রাখিতে হয়।

ঔষধ বিক্রয়ের জন্য যে ভাবে লাইসেন্স দেওয়া হয় তাহার ত্রুটিও ডাঃ রায় দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে-সব বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের কমীটিতে প্রতিষ্ঠাবান দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আছেন সেগুলিকে পর্য্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্তির সুযোগ খুব কম দেওয়া হয় ; যাহাদের দ্বারা প্রাপ্ত লাইসেন্সের অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা অধিক তাহারাই বরং উহা সহজে পাইয়া থাকে। এই জন্য ঔষধের চোরা ব্যবসায় এত বেশি দেখা যায়।

মিঃ কেসীর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া ডাঃ বিধান রায় বলিয়াছেন যে বাংলায় ম্যালেরিয়ার মড়ক দমন করা গিয়াছে, সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার আর কোন প্রয়োজন নাই এরূপ ধারণা জন্মিতে দেওয়া অন্যায় হইবে। মড়ক দমনের উপযুক্ত আয়োজন এখনও করা হয় নাই, ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ এখনও বাংলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না।

বাংলার বাহিরের নেতাদের সম্বন্ধে মিঃ কেসীর উক্তি

মিঃ কেসী তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে অ-বাঙালীরা যেন দুই এক দিন বাংলায় ঘুরিয়াই সংবাদপত্রে কোন বিবৃতি না দেন ; বিশেষতঃ যে-সব বিবৃতির তথ্যের সত্যতা সংশয়পূর্ণ তাহা দ্বারা বাংলায় অসুবিধাই বাড়াইয়া তোলা হইবে। গবর্ণর ইঙ্গিত করেন যে ইঁহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এরূপ বিবৃতি দিয়া থাকেন। ডাঃ বিধান রায় এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গবর্ণরের এই উক্তির যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ রায় বলিয়াছেন, "যে সাহায্য প্রতিষ্ঠানটি আমি পরিচালনা করিতেছি, কর্মী ও অর্থের জন্য তাহাকে বাংলার বাহিরের প্রদেশগুলির উপর প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। ভিন্ন প্রদেশের যে-সকল ব্যক্তির আবেদনে আমরা কর্মী ও অর্থ পাইতেছি তাঁহারা স্বয়ং বাংলায় আসিয়া দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বিবৃতি দিলে তাহাকে কিছুতেই জনস্বার্থবিরোধী কাজ বলা যায় না। গবর্ণর দপ্তরখানার মারফৎ যে-সব সংবাদ পাইয়া থাকেন তাঁহারা তাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলে তাহাকে অন্যায় বলা যায় না। এ কথা সত্য যে লাটসাহেবের ভ্রমণ কালে তাঁহাকে শুধু ভাল দিকটা দেখাইবার জন্য সরকারী কর্মচারিগণ যে আয়োজন করিয়া দেন তাহাতে তিনি যাহা দেখেন এবং বুঝেন, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং শ্রীমতী পণ্ডিত যাহা দেখেন এবং বুঝেন তাহার সহিত উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবেই।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, "সম্প্রতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বাংলার খাদ্যসমস্যার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন ও এক স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐগুলি মন দিয়া পড়িয়াও আমি এমন কিছু দেখিতে পাইলাম না যাহা গবর্ণরের উক্তির বিরোধী। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধেও কোন ত্রুটি ধরা যায় না। হয়ত তাঁহার বর্ণনা স্থানবিশেষে অতিরঞ্জিত। কিন্তু বিভাগীয় কর্তারা বা মন্ত্রীরাই ইহা সংশোধন করিতে পারিতেন ; প্রদেশের শাসনকর্তা যে ধরণের মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তিনি না করিলেও পারিতেন। গবর্ণরের জানা উচিত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু শুধু জাতীয় জীবনে প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যই শ্রদ্ধেয় নন, সমাজসেবার জন্যও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করা হয়। তাঁহাদের উক্তিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ অশেষ বেদনাদায়ক। ইঁহারা রাজনৈতিক উত্তেজনা সঞ্চারের জন্য বাংলায় আসেন নাই। গত দুর্ভিক্ষে ইঁহারা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জনগণের যে অসামান্য সেবা করিয়াছেন, বাংলা সকৃতজ্ঞ অন্তরে উহা স্মরণ করিবে।"

অ-বাঙালীরা বাংলার অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছেন বা পণ্ডিত কুঞ্জরু এবং শ্রীমতী পণ্ডিতের ন্যায় সমাজসেবীগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আর্ত বাংলা সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেছেন এরূপ উক্তিকে বাঙালী অত্যন্ত আপত্তিকর বলিয়া মনে করে। ইঁহাদের সম্বন্ধে গবর্ণর যে আপত্তিজনক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাংলার কথা নয় এই সামান্য কথাটুকু বুঝিবার মত উদারতা তাঁহাদের আছে বাঙালী ইহা বিশ্বাস করে। জাতীয় জীবনের এক পরম দুর্দ্দিনে ভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙালী যে সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহা লেখা থাকিবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ম্যালেরিয়া মড়কের আলোচনা

ম্যালেরিয়া মড়ক দমনে বাংলা-সরকারের ব্যর্থতা আলো-

চনার জন্য ১১ই অক্টোবর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত দাস বলেন, "সরকার ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। মড়কে এখন লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার মৃত্যুসংখ্যা ৭ লক্ষেরও অধিক হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে প্রায় কোন গৃহই ম্যালেরিয়াশূন্য নহে—কোন কোন পরিবারে সকলেই ব্যাধিগ্রস্ত—তৃষ্ণায় জল দিবার লোক নাই।" ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ লেডলও এই ব্যাপারে বাংলা-সরকারকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনিও বলিয়াছেন, "বাংলার ম্যালেরিয়ার অবস্থা যে ভয়াবহ তাহা বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া দমনের একমাত্র ফলপ্রদ উপায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধের ব্যবস্থা করা। সুতরাং এই ব্যাপক মড়কের মুখে সরকারকে দেখিতে হইবে যে সর্বশ্রেণীর লোক কুইনাইন অথবা কুইনাইনের বিকল্প ঔষধ পাইতেছে কিনা। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে সরকারের অবিলম্বে তাহা রোধ করা কর্তব্য।"

গবর্মেণ্টের মুখপাত্র হিসাবে মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর মোয়াজ্জেমউদ্দীন হোসেন গত তিন বৎসরে কোন্ জেলায় কত হাজার কুইনাইন বড়ি বিতরিত হইয়াছে তাহার হিসাব দেন এবং বর্তমান বর্ষে কত লক্ষ কুইনাইন ও মেপাক্রিন বড়ি বিলি হইয়াছে তাহা বলেন। এই হিসাব সম্পূর্ণ অর্থহীন এই জন্য যে এবার কত লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে তাহার সংখ্যা জানা নাই, উহা নির্ধারণের কোন চেষ্টাও গবর্মেণ্ট করেন নাই। হাসপাতালে কত লোক চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে তাহার সংখ্যা হইতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের ব্যাপকতা এবার বুঝা অসম্ভব, কারণ বহু লোক এবার হাসপাতালের সাহায্য লইতে আসিতে পারে নাই এবং হাসপাতালসমূহে চিকিৎসার বন্দোবস্তও উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়ে নাই। সুতরাং পূর্ব পূর্ব বৎসরের হাসপাতালের রোগীর সহিত এবার হিসাব মিলাইবার চেষ্টা নিরর্থক। তথাপি গবর্মেণ্ট এক প্রেস-নোটে এই চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃত সত্য ইহাতে প্রকাশ পাইবে না, চাপাই পড়িবে।

মন্ত্রী মহাশয়ের মূল বক্তব্য এই যে, ম্যালেরিয়া দমনের জন্য মানুষের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাঁহারা তাহার সমস্তই করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির জন্য সরকারের দোষ নাই—তাহা ভগবান দিয়াছেন। সরকারী অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও অপদার্থতা ঢাকিবার এরূপ অসার চেষ্টার পরিচয় আসামের লীগ-প্রধানমন্ত্রী সর্ মহম্মদ সাদুল্লা একবার দিয়াছিলেন, ইহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিলেন লীগ-মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর মোয়াজ্জেমউদ্দীন হোসেন। ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ খুব শক্ত নয়, পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত চিকিৎসায় এই রোগ সহজেই আরোগ্য হয়। আমেরিকার পানামা অঞ্চলকে অতি ভীষণ ম্যালেরিয়া হইতে মানুষেই মুক্ত করিয়াছে। আসামের যে-সব চা-বাগান ম্যালেরিয়ার জন্য কুখ্যাত ছিল, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধের উপায় অবলম্বন করিবার পর সেগুলিও প্রায় ম্যালেরিয়ামুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে আমেরিকানরা ম্যালেরিয়া দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। ইহারা কেহই ভগবানের উপর দোষ চাপায় নাই। অথচ বাংলায় ম্যালেরিয়া ক্রমাগত বাড়িতেছে, কলিকাতা শহরে পর্য্যন্ত এই রোগ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। প্রায় এক বৎসর পূর্বে গত ১০ই জানুয়ারী মেজর-জেনারেল ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছিলেন সাধারণ সময়ের তুলনায় বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চার-পাঁচ গুণ অধিক এবং রোগীদের যে পরিমাণ কুইনাইন পাওয়া আবশ্যক তাহারা তাহা পাইতেছে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মেজর-জেনারেল ষ্টুয়ার্ট যাহা বলিয়াছিলেন বাংলা-সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত ডাঃ বিধান রায়ের বিবৃতির গুরুত্বও তাঁহারা ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রামাঞ্চলে খানা-ডোবাগুলি বুজাইয়া মশককুল বৃদ্ধি বন্ধ করিবার চেষ্টা গবর্মেণ্ট করেন নাই। নিজ নিজ ডোবা পুকুর প্রভৃতি যাহারা পরিষ্কার রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে অনিচ্ছুক ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে তাহাদের সামাজিক কর্তব্যজ্ঞান জাগ্রত করিবার আয়োজন করা যাইতে পারিত। যাহারা অক্ষম, সরকারী সাহায্যে তাহাদের পুকুর পরিষ্কার করাইয়া দেওয়া যাইতে পারিত। সরকারী প্রচারপত্রে ছবি ছাপাইবার জন্য দুই একটা লোক দেখানো কাজ ছাড়া এ বিষয়ে একেবারেই মন দেওয়া হয় নাই। শুধু অর্ডিনান্স বা হুকুমজারী করিলেই এ কাজ হইবে না, গবর্মেণ্টকে স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নামে গ্রামের পুকুর ডোবা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করিতে থাকিবে, কোন সমাজের পক্ষেই ইহা সহ্য করা উচিত নয়। কলিকাতার স্লিট্ ট্রেঞ্চগুলিও হয় পরিষ্কার রাখা না হয় বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার।

হিন্দু নারীর দায়াধিকার

গত ২৪শে আশ্বিন কলিকাতায় এক জনসভায় প্রস্তাবিত হিন্দু বিলের মূলনীতিগুলি সমর্থন করা হয়। শ্রীমতী সরলাবালা সরকার উহাতে সভানেত্রীত্ব করেন। বিলে হিন্দু দায়াধিকার ও হিন্দু বিবাহবিধির যে-সব সংস্কারের প্রস্তাব করা হইয়াছে বিভিন্ন বক্তা সেগুলির মর্মার্থ ও প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার বলেন যে, যুগে যুগে হিন্দুসমাজ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। বৈদিক যুগে প্রচলিত অনেক প্রথার আজ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ডের দিক দিয়া কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে যুগের প্রয়োজনের তাগিদে এবং এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই সৃষ্টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সমাজ পরিবর্তন স্বীকার করিবে না তাহার পতন অনিবার্য্য। বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধির সমর্থনে তিনি বলেন যে, যাহারা এই বিধিবলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারা যদি তাহা না করে, তবে সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইবে—একথা সকলে চিন্তা করিয়া দেখেন না কেন? উপসংহারে শ্রীযুক্তা সরকার বলেন

যে, প্রস্তাবিত হিন্দু বিধির ব্যবস্থাগুলি বর্তমান যুগোপযোগী। এই পরিবর্তন সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্যই। মেয়েরা নিজেরা যেন বিচারবুদ্ধি দিয়া ইহা ভাবিয়া দেখেন। তাঁহারা যেন কেবল তাঁহাদের স্বামী, পিতা বা ভ্রাতাদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হন। আর এই পরিবর্তন আনিবার দায়িত্ব মেয়েরা নিজেরাই যেন গ্রহণ করেন। মেয়েরা দেখান যে, তাঁহারাও সমাজের মঙ্গল আনয়ন করিতে পারেন। হিন্দু-সমাজে ভিতরে ভিতরে যে গভীর ক্ষত হইয়া চলিয়াছে তাহা রোধ করিতে না পারিলে তাহার যথোচিত প্রতিকার করিতে না পারিলে এই সমাজ বাঁচিতে পারিবে না।

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ঃ—

"হিন্দু আইনের মূলগত নীতিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেছি। হিন্দুসমাজও হিন্দু আইনের অন্তর্নিহিত সারাংশ অক্ষুণ্ণ রাখিরাও আমরা মনে করি—যে সমস্ত অন্যায় অবিচার শতাব্দীক্রমে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নিতেছে—বর্তমান সামাজিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবিলম্বে তাহার সংশোধন ও দূরীকরণ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমরা সমর্থন করি ঃ

(ক) সমস্ত হিন্দুর প্রতি প্রযোজ্য একই আইনপ্রথা, (খ) উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার স্বীকার এবং মাতার স্ত্রীধনে পুত্রের উত্তরাধিকার স্বীকার, (গ) সম্পত্তিতে নারীদের দানবিক্রয়ের স্বত্বাধিকার, (ঘ) আইনের বলে এক বিবাহের প্রচলন, (ঙ) সগোত্র এবং অসবর্ণ বিবাহকে আইনানুমোদিত করা, (চ) বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনানুমোদিত ব্যবস্থা।"

ভারতবর্ষের ডাক ও তার বিভাগ

নয়াদিল্লী হইতে সরকারী প্রেস-নোটে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা **হইয়াছে। ইহাতে গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে** ডাক ও তার বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কত কষ্টকর তাহার সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে সম্যক ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেখানো হইয়াছে যে, এই বিভাগকে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ জিনিস হাতে নাড়াচাড়া করিতে হয়, প্রত্যহ হাজারে হাজারে টেলিগ্রাম প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে হয়, অবিরাম টেলিফোনে সংবাদ আদান-প্রদান করিতে হয় এবং প্রতি বৎসরে কোটি কোটি টাকার আদান-প্রদান এই বিভাগের মারফতেই হইয়া থাকে। তাহার পর এই বিভাগকে সর্বপ্রকার যানবাহন ব্যবহার করিতে হয়। ভারতবর্ষে ডাক চলাচলের পথের দৈর্ঘ্য এক লক্ষ সাতান্ন হাজার মাইল। এই দীর্ঘ রাস্তায় ডাক বহনের জন্য ডাক হরকরা, নৌকা, গরুর গাড়ী, ঘোড়া, খচ্চর, উষ্ট্র প্রভৃতি তো আছেই, তাহার উপরে মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, ষ্টীমার, এরোপ্লেন প্রভৃতি আধুনিক যান্ত্রিক যানবাহনেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে যে, শান্তির সময়েই ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগকে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক রাখিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। তাহার উপরে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তারের উপরে বন্য পশুপক্ষীর উৎপীড়ন। সর্বোপরি এই যুদ্ধের সময়ে এক দিকে যেমন ডাক বিভাগের কাজের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্য দিকে যুদ্ধের দরুন নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টি হইতেছে।

ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক দপ্তর হইতে ডাক ও তার বিভাগের কার্য্যের একটা হিসাব দেওয়া হয়। তাহা হইতে যুদ্ধের পূর্ব বৎসরের সহিত সর্বশেষ বাৎসরিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল। ডাক ও তার বিভাগের উপর কাজের চাপ সম্বন্ধে ভারত-সরকার যে পরিমাণ কাঁদুনী গাহিয়াছেন কাজ সে অনুপাতে বাড়ে নাই। প্রদত্ত হিসাব হইতে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে।

	রে:জষ্টী পার্শেল	রেজেষ্টী চিঠি	রেজেষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র
১৯৩৮ ৩৯	৭,৬৬৬,০০০	২৮.২২৩,০০০	৮০,০৬৫,০০০
১৯৪২-৪৩	৯,৫৯৭,০০০	২৯,৭৪২,০০০	৮২,১৬৩,০০০
বৃদ্ধি	প্রায় ২৭%.	প্রায় ৬%.	প্রায় ২১%.

	চিঠি (খাম)	পোষ্টকার্ড	মনিঅর্ডার	টেলিগ্রাম
১৯৩৮-৩৯	৫২২,১৪৫,০০০	৩৮০,৫৫৫,০০০	৪০,১১৭,০০০	১৩,৯৫৯,০০০
১৯৪২-৪৩	৫৩০,৯৭৪,০০০	৪৭৩,৫০০,০০০	৫০,৩৮৭,০০০	১৯,২৬৯,০০০
বৃদ্ধি	প্রায় ১%	প্রায় ২৯%.	প্রায় ২৫%.	প্রায় ৩৫%.

	বইয়ের প্যাকেট	আনরেজিষ্টার্ড পার্শেল
১৯৩৮-৩৯	১২৯,৯৫৪,০০০	৩,৩৩৫,০০০
১৯৪২ ৪৩	৮২,৮৪০,০০০	১,৯৫১,০০০
হ্রাস	প্রায় ৪০%.	প্রায় ৪৩%.

রেজেষ্ট্রি পার্শেল, পোষ্টকার্ড, মণিঅর্ডার এবং টেলিগ্রাম কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তেমনি বইয়ের প্যাকেট ও আন-রেজিষ্টার্ড পার্শেলের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। রেজিষ্ট্রি চিঠি, সাধারণ খামের চিঠি এবং রেজিষ্টার্ড সংবাদপত্রের আদান-প্রদান বাড়ে নাই বলা চলে। এই হিসাব হইতে বেশ বুঝা যায় ডাক বিভাগের কাজ এমন কিছু বাড়ে নাই, কিন্তু উহার কর্মদক্ষতা যে কমিয়াছে তাহারও স্পষ্ট আভাস ইহাতেই পাওয়া যায়। বইয়ের প্যাকেট ও আনরেজিষ্টার্ড পার্শেল মারা যাওয়ার অভিযোগই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বেশী এবং দেখা যায় এই দুইটিই অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বিনা রেজেষ্ট্রিতে লোকে পোষ্টাফিসের হাতে কোন দ্রব্য সমর্পণ করিতে ভয় পায় এবং এই কারণেই রেজিষ্টার্ড পার্শেলের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। চিঠির মাশুল যে অত্যধিক তাহাও ধরা পড়িতেছে। যুদ্ধের সময় দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের যেরূপ কর্মতৎপরতা ঘটিয়াছে, এবং রকমারি কণ্ট্রোলের হুকুমে চিঠি-পত্র লেখা যে ভাবে বাড়িবার কথা, খাম পোষ্টকার্ড আদান-প্রদান সে ভাবে বাড়ে নাই। খামের সংখ্যা প্রায় সমান আছে এবং পোষ্টকার্ড সামান্য বাড়িয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় বহু লোকে নিতান্ত দায়ে না পড়িলে চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে, এবং বাধ্য হইয়া লিখিতে হইলে পোষ্টকার্ডেই কাজ সারিতেছে।

দীর্ঘ প্রেস-নোট জাহির করিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তারের উপর বন্য পশুপক্ষীর উপদ্রব, যানবাহনের অসুবিধা প্রভৃতির সাফাই গাহিলেও ডাক বিভাগের কর্মকুশলতার নিদারুণ অবনতি ঢাকা পড়িবে না। যুদ্ধের সময় বিলাতের ও আমেরিকার ডাক বিভাগেরও কাজ যথেষ্ট বাড়িয়াছে, কিন্তু সে সব দেশের গবর্মেণ্ট এই অত্যাবশ্যক বিভাগটির কর্মদক্ষতা কমিতে

দিয়া তাহার সাফাই গাহিতে বসিয়াছেন কি না ভারত-সরকার প্রেস-নোটে তাহারও উল্লেখ করিলে ভাল করিতেন।

প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি সম্পর্কে বার্ট্রাণ্ড রাসেল

যুদ্ধোত্তরকালে প্রাচ্যখণ্ডে ইংলণ্ড যে সহজে তাহার সাম্রাজ্যবাদ বিসর্জন দিবে সে বিষয়ে অধ্যাপক বার্ট্রাণ্ড রাসেল যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রাচ্য ভূভাগের রবার, তৈল ও টিনের আকর্ষণ ব্রিটেন ভুলিতে পারিবে না। ব্রিটেন হয়ত আমেরিকান তৈল কোম্পানীসমূহ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সহিত একটা চুক্তি করিয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চালাইবে। চীনে কম্যুনিষ্ট ও মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের কুওমিণ্টাঙের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা যায়। কারণ কম্যুনিষ্টরা সংস্কারপন্থী এবং মার্শাল চিয়াং কাই-শেক অনেকটা একনায়কবাদী। রাশিয়ার এখন চীনা কম্যুনিষ্টদের প্রতি কোন ভালবাসা নাই বটে, কিন্তু যদি সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে রাশিয়া কম্যুনিষ্টদের পক্ষ গ্রহণ করিবে এবং ব্রিটেন কুওমিণ্টাঙের পক্ষ লইবে।

অধ্যাপক রাসেল লিখিতেছেন যে, ব্রিটিশ যৌথরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে আমি মনে করি যে ভবিষ্যতে চীন ও জাপানের মধ্যে মৈত্রী অসম্ভব নহে। জাপান পরাজিত ও অধিকৃত হইবে বলিয়া বেশ বুঝা যায়। বর্ত্তমানে নীরব থাকিলেও জাপানে বহু উদারমতাবলম্বী লোকের বাস। পরিণামে প্রাচ্যখণ্ডে শ্বেতজাতির প্রাধান্য বন্ধ হইবেই। সম্ভবতঃ চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। চীন, জাপান ও ভারত তাহাদের বিরাট জনসংখ্যা ও অসমশক্তি ও সম্পদ লইয়া বর্তমান ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। নৌ-শক্তির আড়ালে কেবলমাত্র অষ্ট্রেলিয়া শ্বেতজাতির দেশ থাকিতে পারে। যুদ্ধের সময় এইজন্য তাহাকে আমেরিকার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাকে অধিকতর পরিমাণে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে।

ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ কার্ল হীথের অভিমত

ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কাউন্সিলের ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ কার্ল হীথ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া বলিয়াছেন,

"১৯৪২ ও ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট ও গান্ধীজীর মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হইয়াছিল, আধুনিক ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই পত্র-বিনিময় ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই পত্রগুলি সতর্কতা সহানুভূতির সহিত পাঠ করা কর্তব্য; কারণ, উভয় পত্রলেখকই ধর্মপরায়ণ এবং উভয়ের প্রত্যেকটি পত্রেই সংযম ও সহিষ্ণুতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনায় আপনাদিগকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদিগের স্থলে স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সমস্যা বিচার করাই প্রথম কর্তব্য। পরবর্তী কার্য্য খোলাখুলিভাবে পরামর্শের ব্যবস্থা করা। যখন কারারুদ্ধ নেতৃবর্গের সহিত গান্ধীজীর মতামত বিনিময়ের পথ নিশ্চিতরূপে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং কারারুদ্ধ নেতৃবর্গকেও কংগ্রেস, মুসলমান, খ্রীষ্টান কিম্বা বাহিরের অপর কাহারও সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে দেওয়া হইতেছে না তখন এ কথা বারবার বলার কোনও অর্থ হয় না যে, অগ্রে ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে মতের ঐক্য আনিতে হইবে। বড়লাটের অতঃপর কর্তব্য, ভারতীয় নেতৃবর্গকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আহ্বান করা। তাঁহারা যদি বুঝেন যে, বড়লাট অবিলম্বে ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং তিনি আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিতে প্রস্তুত তবে নেতৃবর্গও তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবেন। বড়লাটরূপে লর্ড ওয়াভেল ভারতের দারিদ্র্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া যথার্থ কার্য্যই করিয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ রাজনীতিক মন-কষাকষি একটি ক্ষত সৃষ্টি করিয়া রাখিবে এবং শান্তিস্থাপনে ব্রিটিশ সরকারও আর অধিক চেষ্টা করিতে অনিচ্ছুক থাকিবেন, ততক্ষণ অন্যান্য সমস্যার মত দারিদ্র্যের সমস্যারও সমাধান হইতে পারে না।"

সর্বশেষে মিঃ হীথ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন:

"ভারতবর্ষ বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া বরাবর প্রতীচীর দিকেই তাকাইবে, না তীব্র তিক্ততায় ভারতের জন-আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত চীন ও এক নূতন জাপানের সহিত যুক্ত হইয়া এক শক্তিশালী দল সৃষ্টি করিবে? খুবই সঙ্কটের ভিতর দিয়া দিন যাইতেছে এবং আমাদিগের সাম্রাজ্যবাদীরা বিপজ্জনক বীজ বপন করিয়া রাখিতেছেন।"

আমেরিকান মিশনরী বহিষ্কৃত

আমেরিকান মিশনরী ভারত-বন্ধু রেভারেণ্ড আর আর কিমানকে মহীশূর রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। স্বদেশ-যাত্রার প্রাক্কালে তিনি তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণকে একখানি খোলা চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিখানির মর্ম এই:

"আমাদিগের প্রিয়দেশ ত্যাগ করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া আমরা ভারতীয় গ্রামগুলিতে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। আমরা এই দেশের সেবা করিয়াছি ও এই দেশকে নিজের বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি। আমরা ভারতীয় যুবকগণের উৎসাহ ও শক্তি গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং সুখের বিষয় এই যে, আমরা ব্যর্থকাম হই নাই।

"মিত্রশক্তি বর্তমানে শয়তান-কবলিত। ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমরা বৃহত্তর স্বাধীনতার দাবী করিতে পারি এবং সেই সঙ্গে আমাদিগের প্রিয়ভূমি ভারতের স্বাধীনতার দাবীও জানাইতে পারি। আমরা বিশ্ব-মানবের মুক্তি চাই। আমাদিগের ধারণা গঠনতান্ত্রিক ও সৃজনশক্তির উপরেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শক্তি সত্য ও প্রেমের শক্তি। আমাদিগের বিশ্বাস, স্থায়ী শান্তি কখনও হিংসা ও প্রতারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। হিংসা ও প্রতারণা নাৎসীবাদের অঙ্গীভূত। ক্রমবর্দ্ধমান উদ্বেগের সহিত আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, হিংসা ও প্রতারণা মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত বহু দেশে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। যদিও আমরা জ্ঞাতসারে নাৎসীদিগের হিংসাত্মক আক্রমণে যোগদান করিতে পারি নাই তথাপি মিত্রপক্ষের বহু জাতীয় লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মত্যাগের

কথা চিন্তা করিয়া নিজেদের ঈপ্সিত পন্থা অবলম্বন করা আমরা সঙ্গত মনে করি।"

সহকারী ভারত-সচিবের ভারতে আগমন

ভারতবর্ষে যে-সব ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রহিয়াছে তাহাদের মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য সহকারী ভারত-সচিব আর্ল মুনষ্টার এ দেশে আসিয়াছেন। ভারত-স্থিত সৈন্যদিগের ব্যয় ভারত-সরকার জোগাইয়া থাকেন, এই হিসাবে মিঃ আমেরি দায়ী এবং এই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য ভারত-সচিব সৈন্যদের অবস্থা দেখিয়া আসিবার জন্য তাঁহার সহকারীকে পাঠাইয়াছেন। ভারত-সরকার সৈন্যদের মঙ্গলের জন্য কি করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট বিলাতে ফিরিয়া আর্ল মুনষ্টার মিঃ আমেরির নিকট দাখিল করিবেন। ভারত-সচিব রিপোর্টটি কমন্স সভায় উপস্থিত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গত দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও ভারত-বাসীর প্রতি ভারত-সচিবের কর্তব্যজ্ঞান জাগ্রত হয় নাই, ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিবার জন্য তাঁহার সহকারীকে তখন প্রেরণ করিবার কথাও সম্ভবতঃ তাঁহার চিত্তপটে উদিত হয় নাই।

ভারতে কৃত্রিম সার তৈরি

ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর সর্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে ভারতবর্ষে সার উৎপাদন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

ভারতীয় কৃষির সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হইতেছে যে, এখানে একর প্রতি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সাত কোটি ষাট লক্ষ একর জমিতে বৎসরে গড়ে দুই কোটি আশি লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে প্রতি একরে নয় মণ পনর সের চাউল উৎপন্ন হয়। জাপানের সহিত তুলনায় ইহা অত্যন্ত অল্প। সেখানে প্রতি একরে পঁচিশ মণ দশ সের চাউল উৎপন্ন হয়। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে যে, যদিও শতকরা আশি জন লোক এখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাহা হইলেও তাহাদিগকে কুড়ি লক্ষ টন চাউল ব্রহ্ম হইতে আমদানী করিতে হয় এবং প্রচুর পরিমাণে গম অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী করিতে হয়। রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া ভারতে চাউলের উৎপাদন শতকরা ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

যদি তিন কোটি ষাট লক্ষ টন চাউল উৎপাদন লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে কুড়ি লক্ষ টন সার ব্যবহার করিয়া তাহা করা সম্ভব। গবর্মেণ্ট সরকারী কারখানায় বৎসরে তিন লক্ষ টন সার উৎপাদনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, অবশিষ্ট সতর লক্ষ টন সার বে-সরকারী চেষ্টায় উৎপন্ন হইবে। ভারত-সরকারের বড় বড় কারখানাগুলি উত্তর-পূর্ব ভারত অথবা বাংলার কয়লার খনিগুলির নিকট অবস্থিত হওয়া উচিত।

ডাঃ ঘোষ বিশ্বাস করেন যে কয়লার খনি অঞ্চলে অবস্থিত বৃহৎ কারখানা সহজেই বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে। দেশবাসীও ইহা বিশ্বাস করে। কিন্তু এই ব্যাপারে ভারত-সরকার যে ভাবে ইম্পিরিয়াল কেমিকেলের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছেন তাহাতে সার তৈরির জন্য খাঁটি ভারতীয় কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারিবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগিতেছে।

যুদ্ধোত্তর রেলপথ পরিকল্পনা

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য সর্ লক্ষ্মীপতি মিশ্র কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে নিখিল-ভারতীয় বেতারে এইরূপ আশা প্রচার করেন যে, যুদ্ধান্তে ভারতে রেলওয়ের উন্নতির জন্য ৩২০ কোটি টাকা ব্যয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে মরুভূমি ও পাহাড় ব্যতীত অন্যত্র কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানই কোন রেলপথ হইতে ২৫ মাইলের অধিক দূরবর্তী থাকিবে না। তিনি আরও বলেন যে এই যুদ্ধে ভারতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রব্যাদি প্রেরণের অসুবিধা হইতে যে শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া হইবে না এবং ভারতের যানবাহনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্র-ভাবে বিবেচিত হইবে। দেশের উন্নতিতে রেলপথ, ষ্টিমার পথ ও বিমান পথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে। রাস্তা নির্মাণ করিয়া যে সকল স্থানের উন্নতি সম্ভব নহে সে সকল স্থানে নূতন নূতন রেলপথ নির্মাণ করা হইবে। যাহা হউক, ইতি-মধ্যেই প্রায় ১৫ হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণের জন্য জরিপ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে নূতন রেলপথ নির্মাণের তালিকার বিস্তারসাধন সহজেই হইবে।

যুদ্ধের পর রেলপথ বিস্তার যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হয় তাহার প্রতিও এখন হইতেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ভারত-বর্ষের বহু স্থানে সস্তায় লাইন পাতিবার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য ও প্রয়োজন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের ম্যালে-রিয়া এবং উত্তরবঙ্গের বন্যা ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য রেল-লাইন অনেক পরিমাণে দায়ী ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

আর্থার বেরিডেল কীথ

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের রেজিয়াস প্রফেসর আর্থার বেরিডেল কীথের মৃত্যু হইয়াছে। সংস্কৃত ও পালি ভাষা, দর্শন ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি পৃথিবী-ব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঐ সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রা-জ্যের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইত। এডিনবরা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং ঐ পরীক্ষায় এত অধিক নম্বর পান যে ব্রিটিশ ছাত্রদের নিকট আজও তাহা বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল আপিসে চাকুরী করিয়া ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। কিন্তু সরকারী চাকুরী বেশী দিন তাঁহার ভাল লাগে নাই; এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন জ্ঞানচর্চ্চায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থা-বলীর সংখ্যা যেরূপ অধিক, উহাদের প্রত্যেকটি পাণ্ডিত্যেও তেমনই গভীর।

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম-সম্মেলন

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে নিখিল-বঙ্গ ও আসাম ব্রাহ্ম-সম্মেলনের ৫৪তম অধি-

বেশন হইয়া গিয়াছে। সিটি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত গুহ তাঁহার অভিভাষণে বলেন,নানা কারণে মনুষ্যত্ব আজ বিপদগ্রস্ত এবং ইহার মূলে রহিয়াছে ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিকতা। মনুষ্যত্বকে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায় ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। অসত্য, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার দ্বারা ধর্মকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা। সত্য, ন্যায়, প্রেম ও সাম্যের ভিত্তির উপর ধর্মের সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বলেন যে, বর্তমানে মানুষ পৃথিবীর জীবনধারায় ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনাবশ্যক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মানুষ ঐক্য চায়। যে-দিন তাহারা স্বধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উদার হৃদয়ে পরস্পরের মত গ্রহণ করিবার মত সৎসাহস সঞ্চয় করিতে পারিবে সে-দিন জগতে স্থায়ী ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কস্তুরবা স্মৃতিভাণ্ডার

কস্তুরবা স্মৃতিভাণ্ডারের ট্রাষ্টিবর্গ এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি উক্ত ভাণ্ডারের অর্থ কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তাহা বিবৃত করেন।

তিনি বলেন যে, কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থ কেবল স্ত্রীলোক ও শিশুদের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যয় করা হইবে। গ্রামেই এই কাজ চলিবে। এই বিষয়ে যত দিন গান্ধীজীর হাত থাকিবে তত দিন তিনি মৌলিক (basic) পন্থায়ই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে এই শিক্ষাকার্য্য চালান একটা বৃহৎ কাজ। এই বিরাট্ কাজের জন্য ৭৫ লক্ষ বা ১ কোটি টাকা কিছুই নয়। যে এলাকায় যত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার শতকরা ৭৫ টাকা সেই এলাকার পল্লী অঞ্চলে ব্যয়িত হইবে এবং অবশিষ্ট ২৫ টাকা কেন্দ্রীয় তহবিলে যাইবে। কিন্তু বড় বড় শহরে সংগৃহীত সকল অর্থই কেন্দ্রীয় তহবিলে যাইবে এবং ইহার কোন অংশই শহরে ব্যয় করা হইবে না। যতটা সম্ভব মহিলা কর্মীদের মারফতে অর্থ ব্যয় করাই গান্ধীজীর ইচ্ছা।

বাংলাদেশে সংগৃহীত দশ লক্ষ টাকার অধিকাংশই কলিকাতায় আদায় হইয়াছে, সুতরাং উপরোক্ত নিয়মানুসারে উহার সবটাই কেন্দ্রীয় তহবিলে যাইবার কথা। গত দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরে এই অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় কলিকাতা ভিন্ন বাংলার অন্যান্য স্থান হইতে যত অর্থ সংগৃহীত হওয়া সম্ভব ছিল তাহা হয় নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া ভাণ্ডারের অর্থ ব্যয়ের উল্লিখিত নিয়ম কিঞ্চিৎ সংশোধন না করিলে বাংলা দেশ উহার পূর্ণ সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইতে পারে।

মালয়ের ব্রিটিশ রবারওয়ালাদের সম্পত্তি উদ্ধারের আগ্রহ

মালয়ের ইনকর্পোরেটেড প্ল্যাণ্টার্স সোসাইটির লণ্ডন এজেন্ট তথাকার লুপ্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে টাইমস পত্রিকার নিকট নিজেদের উদ্বেগ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের ভয়, যে-সব রবারওয়ালা জাপানীর হাতে বন্দী হইয়াছেন তাঁহারা মুক্তি লাভের পূর্বেই মালয় পুনরুদ্ধার হইয়া রবার ক্ষেতের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিলিব্যবস্থা হইয়া গেলে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইঁহাদের উদ্বেগ নিরসনের জন্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিস জানাইয়াছেন যে অবিলম্বে কাহাকেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না ; মালয়ে যে-সব সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার বা মেরামত ক্ষমতানুসারে ধীরে ধীরে করা হইবে। জাপানী যুদ্ধের প্রারম্ভে বিলাতের ইকনমিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে মালয়ের রবার ক্ষেত ও টিনের খনির মালিকেরা প্রাণ ধরিয়া রবার গাছ বা টিন ধ্বংস করিয়া আসিতে পারেন নাই। ব্রহ্ম ও মালয় পুনরুদ্ধার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যে যাহার সম্পত্তি ফিরিয়া পাওয়ার জন্য আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছে। আটলাণ্টিক চার্টার, ঔপনিবেশিক গণতন্ত্র, ডিক্টেটর-কবলিত দেশের নাগরিক অধিকার প্রভৃতি বড় বড় বুলি সব রসাতলে গিয়াছে, সুরু হইয়াছে সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা। পূর্ববৎ সম্পত্তি বজায় থাকিলে পূর্বেরই ন্যায় বুলি ও কুলির উপর অত্যাচার অবাধে বহাল থাকিবে।

বাংলার তাঁতিদের দুরবস্থা

নিখিল-বঙ্গ তন্তুবায় সঙ্ঘের সেক্রেটরী মিঃ বি, হরলালকা নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

"সুতার বাজারের বর্তমান অবস্থা পৃথিবীর যে কোন সভ্য গবর্মেণ্টের পক্ষে লজ্জাজনক। ৮০ কাউণ্ট মাদুরা সুতা যাহার নিয়ন্ত্রিত মূল্য ২৪ টাকা তাহা চোরাবাজারে ৬২ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ৬০ কাউণ্ট সুতা নিয়ন্ত্রিত মূল্য ১৭ টাকার স্থলে ৩৫ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। বাংলায় হস্তচালিত তাঁতশিল্প অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। মাদ্রাজের সঙ্গে ইহা প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না ; কারণ মাদ্রাজে নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা খুব সাফল্যজনক ভাবে চলিতেছে। এই জন্যই মাদ্রাজের তাঁতের কাপড় বাংলার বাজার দখল করিয়াছে। গবর্মেণ্টের কাছে আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই যে, যদি নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব না হয় তবে তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করুন।"

বাংলার বর্তমান গবর্মেণ্ট একটি নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনাও আজ পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেন নাই। তথাপি মানুষের জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়া চলিয়াছেন। অক্ষম নিয়ন্ত্রণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অসাধুতা বৃদ্ধি ও চোরাবাজারের কাঁপতি। বাংলায় তাহাই ঘটিয়াছে।

ব্রিটেনে ভারতীয়দের পঞ্চায়েৎ

লণ্ডন হইতে গ্লোব এজেন্সি কর্তৃক প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, কভেণ্ট্রীর ভারতীয়েরা একটি পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করিয়াছে; ব্রিটেনে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম স্থাপিত হইল। পঞ্চায়েতের ৫ জন সদস্য ইতিমধ্যে ৩টি বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী মজদুর সভার কয়েক জন সদস্য মিলিত হইয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহার ফলেই এই পঞ্চায়েৎ গঠিত হইয়াছে।

১৯৪০ সালে কভেন্ট্রীতে মজহুর সভা গঠিত হয়; শহরে ইহার সদস্য সংখ্যা এখন ১ হাজার। বার্মিংহাম, উল্ভার-হাম্পটন্, ম্যাঞ্চেষ্টার এবং অন্যান্য শ্রমশিল্পকেন্দ্রে ইহার শাখা-প্রতিষ্ঠান আছে।

কভেন্ট্রীর ভারতীয় সম্প্রদায় কিরূপ অতুলনীয় সামাজিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন তাহারই প্রমাণ। ব্রিটেনের বিচার সম্বন্ধীয় ইতিহাসে ইহা অভুতপুর্ব ঘটনা; ইহা সামাজিক কর্তব্যবোধের উত্তম নিদর্শন।

মজহুর সভার প্রেসিডেণ্ট চৌধুরী আকবর খাঁ গ্লোবের প্রতিনিধিকে বলেন, "ব্রিটেনে অবস্থিত ভারতীয়দিগকে আমরা প্রথমে রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রস্তুত করিতে চাই; দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে জাতীয় সংগ্রামের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করা আমাদের লক্ষ্য; তৃতীয়তঃ, আমরা সর্বতোভাবে জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন করিব; চতুর্থতঃ, সাধারণভাবে ভারতীয়দিগকে পরামর্শ দেওয়া ও পরিচালনা করা আমাদের উদ্দেশ্য।"

পঞ্চায়েতের বিচার ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্যের জুরীর বিচার কতকটা ইহারই অনুকরণ বলা চলে। পাঁচ জন জ্ঞানী ও সম্মানিত গ্রামবৃদ্ধ সমবেত হইয়া সর্বসমক্ষে যে বিচার করিয়া দিতেন তাহাতে অন্যায়ের প্রতিবিধান যেমন হইত, অনাবশ্যক কঠোরতার সম্ভাবনাও তেমনি সেখানে কম ছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে শিক্ষা-ব্যবস্থা যতদিন বজায় ছিল, গ্রামে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির অভাব তত দিন ঘটে নাই। উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ বাধিলে গ্রামের স্মার্ত পণ্ডিত পাঁতি দিতেন, প্রয়োজন হইলে পঞ্চায়েত তাঁহার বিচার করিত এবং সমাজ পঞ্চায়েতের আদেশ কার্যে পরিণত করিত। দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার নিষ্পত্তি এই ভাবে হইতে পারিত। বিচারকার্য অল্প সময়ে, সহজে, নাম মাত্র ব্যয়ে এবং বিনা ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হইতে পারিত। ব্রিটেনে খাঁটি ভারতীয় বিচার-পদ্ধতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

গোল আলু বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

বাংলা-সরকার গোল আলু বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার পর ফল যাহা হইয়াছে ষ্টেটসম্যান তৎসম্পর্কে নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছেন:

"বাংলা-সরকার কয়দিন পুর্বে কলিকাতার অধিবাসিগণকে আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে (প্রতি দিন) দশ আনা সের দরে আধ সের গোল আলু কিনিতে পাইবেন। যে গোল আলু যুদ্ধের পুর্বে এই সময়ে দেড় আনা সের দরে বিকাইত, তাহার জন্য গত কয় মাস লোককে বিস্ময়কর অধিক মূল্য দিতে হইয়াছে। সেইজন্য এ সংবাদ তাহাদিগের নিকট সুসংবাদ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। বর্তমান সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে বিক্রেতারা এক সের আলুর জন্য এক টাকা বার আনা মূল্যও চাহিয়াছে। গত আগষ্ট মাস হইতে বাংলা-সরকার মাদ্রাজ হইতে মাসে পাঁচ শত টন গোল আলু পাইতেছেন। তাঁহারা স্থির করেন, বাজারে তাঁহাদিগের হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য এবং তাঁহারা শহরের মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য বাজারে ছাড় দিয়া দশ আনা সের দরে গোল আলু বিক্রয়ের জন্য লোক নিযুক্ত করেন। কিন্তু ফল সর্বনাশজনক হইয়াছে। যাহারা ছাড় পাইয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা অধিক নহে; তাহাদিগের মালও অল্প। সামান্য (অর্ধ সের) গোল আলুর জন্য সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। যাহারা লাইনের শেষে থাকে, তাহারা দীর্ঘকাল অপেক্ষার পরে দেখে—দোকানে আর গোল আলু নাই। ওদিকে যে-সকল দোকানীর ছাড়ের বালাই নাই তাহারা অনায়াসে প্রভুত লাভ করিতেছে। কেহ কেহ 'লাইসেন্স' দোকানে মাল ফুরান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। তাহার পরে আড়াই টাকা সের (অর্থাৎ যুদ্ধের পুর্বের মূল্যের সাতাশ গুণ দামে) দরে গোল আলু বিক্রয় হইতে থাকে। পৃথিবীর আর কোন দেশে এমন মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই।"

ইহার পর বাংলা-সরকারের মার্কেটিং অফিসার বক্তৃতা দিয়া জানাইয়াছেন যে আলু না পাওয়ার কারণ আলুর অভাব। আসাম মাদ্রাজ বা ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভর না করিয়া বাংলাদেশ নিজের প্রয়োজনীয় আলু উৎপাদন করিতে পারে কি না, কি উপায়ে তাহা করা যাইতে পারে এ সম্বন্ধে সরকার এখনও অবহিত হন নাই। সৈন্যদের জন্য আলু ক্রয় আলুর অভাবের একটা বড় কারণ অনেকেই ইহা মনে করেন, বাহির হইতে ইহাদের জন্য আলু আমদানীর আয়োজন করিলে এই সমস্যার কতকটা সমাধান অবশ্যই হইতে পারে। তারপর উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি একান্ত মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু অবস্থা যাহা দাঁড়াইতেছে তাহাতে আগামী বৎসর আরও কম আলু উৎপন্ন হইবে এ আশঙ্কা আদৌ অমূলক নয়। আলু উৎপাদনের যে হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল তাহা হইতে সমস্যার তীব্রতা বুঝা যাইবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় এক বিঘা জমিতে আলুর চাষ করিতে দুই মণ বীজ আলু ও সার দিবার জন্য ছয় মণ খৈল দরকার হয়। ব্যয় পড়ে:

বীজ আলু দুই মণ ৫৲ টাকা মণ দরে—১০৲ টাকা
খৈল—ছয় মণ ১।০ আনা " " ৭॥০ "
১৭॥০ "

বাংলার মাটিতে বিঘা প্রতি গড়পড়তা ৪০ মণ উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বাজার দর ২ টাকা মণ থাকে, চাষী মোট পায় ৮০ টাকা। তন্মধ্যে নগদ খরচ বাদে তাহার লাভ থাকে ৬২॥০ টাকা। সাধারণতঃ চাষী নিজেই আলুর ক্ষেতের কাজ করে বলিয়া এই হিসাবে মজুরী ধরা হইল না।

বর্তমানে বীজ আলুর দর ৫০ টাকা এবং খৈল ১০ টাকা। অর্থাৎ এক বিঘা আলু বুনিবার ব্যয় দাঁড়াইয়াছে:

বীজ আলু—২ মণ—৫০ টাকা দরে—১০০ টাকা
খৈল— ৬ " —১০ " " —৬০ "
১৬০ "

মরশুমের সময় আলুর দর অন্ততঃ ৮ টাকা থাকিবেই, সুতরাং এক বিঘার উৎপন্ন আলু বেচিয়া চাষী মোট ৩২০ টাকা অর্থাৎ লাভ ১৬০ টাকা পাইবে। কিন্তু আলু বুনিবার জন্য যে ১৬০ টাকা দরকার ইহা সে পায় কোথায়? চাষী সাধারণতঃ পাট বিক্রয়ের টাকা হইতে আলুর চাষের ব্যয় বহন করিয়া থাকে। এবার পাটের দর সে পাইয়াছে ৮ টাকা; বিঘাপ্রতি ৬ মণ পাটে

মোট সে পায় ৪৮ টাকা। এই টাকায় পূর্বে সে দুই বিধা জমিতে অন্ততঃ আলু বুনিত, কিন্তু এবার তাহা একেবারেই অসম্ভব। এবার ১০ কাঠার অধিক জমিতে আলুর চাষ তাহার পক্ষে অসাধ্য।

ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় চাষীকে সস্তায় বীজ আলু ও খৈল দেওয়া। উপযুক্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট এ কাজ সহজ কিন্তু বর্তমান "সাক্ষী গোপাল" মন্ত্রীদের নিকট ইহা আশা করাও অন্যায়।

কয়লার খনিতে নারী-শ্রমিক নিয়োগ

ভারতবর্ষে কয়লার খনিতে নারী শ্রমিক নিয়োগ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠিলে মিঃ আমেরী লন যে গবর্মেণ্ট খাদে শ্রমিক নিয়োগের যে অনুমতি দিয়াছেন তাহা বাতিল করা হইবে না। ছয় মাস পূর্বে আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এই অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রমিক সদস্য মিঃ হাইও জানিতে চাহেন যে, খনির ভিতরে নারী-শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী মানিয়া লইবার জন্য মিঃ আমেরী ভারত-সরকারকে কোন নির্দেশ দিবেন কি না।

মিঃ কোভ (শ্রমিক)—মিঃ আমেরী কি মনে করেন, খনির ভিতরে কাজ করিবার জন্য ভারতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুরুষ পাওয়া যাইতেছে না?

মিঃ আমেরী—ভারত-সরকার ভারতের অপরাপর অংশে পুরুষ ও শ্রমিক নিয়োগ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

মিঃ কোভ—ভারতবর্ষে কি পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে?

ডাঃ এডিথ সামারস্কীল (শ্রমিক)—এক বৎসর পূর্বে আমরা মিঃ আমেরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে কি না?

মিঃ আমেরী—কোন কোন কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে।

ডাঃ এডিথ সামারস্কীল—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে খনির ভিতরে কাজ করিতে দেওয়া হইতেছে কি না?

মিঃ আমেরী—সম্ভবতঃ নহে। আমি পরে এই বিষয়ে আপনাদিগকে জানাইব।

ডাঃ সামারস্কীল—বড়ই লজ্জার বিষয়।

মিঃ জর্জ গ্রিফিথস (শ্রমিক)—বড়ই লজ্জার বিষয়।

ভারত-সচিব বা ভারত-সরকার ইহাতে লজ্জা পান নাই, পাইবার কথাও নয়। খাদে নারী-শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি দানের সময় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং সংবাদপত্রে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে শ্রমিকের অভাব এই অনুমতি দানের কারণ নহে: খনির আশেপাশে মিলিটারী কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় বাধ্য হইয়া খনি-মালিকদের মজুরী বাড়াইতে হইতেছিল। ইহাতে তাঁহাদের লাভের মাত্রা কমিবার উপক্রম হয়। সুতরাং ভারত-সরকারের নিকট হইতে তাঁহারা সস্তায় নারী-শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি আদায় করিয়া লইয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বড় বড় কয়লার খনির মালিক ব্রিটিশ বণিক, কয়লার খনি-মালিক সমিতি পরিচালন-ভারও তাঁহাদের হাতে। আন্তর্জাতিক বিধি পদদলিত করিয়া খনিতে নারী শ্রমিক এমন কি গর্ভবতী স্ত্রীলোক নিয়োগের জন্য দায়ী ব্রিটিশ বণিক ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট।

শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে ছত্রীর নবাবের বক্তৃতা

পুণায় বোম্বাই প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতিরূপে ছত্রীর নবাব মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর ঝোঁক দেওয়া উচিত তাহার আলোচনা করিয়াছেন। ছত্রীর নবাব বর্তমানে হায়দরাবাদের নিজামের শাসন-পরিষদের সভাপতি। নবাব সাহেবের মতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শিক্ষা দান উচিত নহে। সাধারণতঃ উর্দুর উপর যে ভাবে জোর দেওয়া হয় তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে হিন্দু এবং মুসলমান যাহাতে পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ লাভ করে তাহারই জন্য উর্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। দরিদ্র ছাত্রেরা যাহাতে পড়াশুনার সুযোগ পায় সেজন্য বহু-সংখ্যক বৃত্তি দেওয়া উচিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য গবর্মেণ্টের মুখ তাকাইয়া থাকা অনুচিত; সুশৃঙ্খল ও সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিগত দান সামাজিক উন্নতি ও নাগরিক কর্তব্যবোধের পরিচায়ক।

ছত্রীর নবাব মুসলিম লীগের এক জন বড় নেতা। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলের লীগ সদস্যগণ ইঁহার বক্তৃতা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। ছাত্রবৃত্তি প্রদান অপেক্ষা ইহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা ও ভোজনাগার নির্মাণ অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। শিক্ষার জন্য মুসলমানের উল্লেখযোগ্য দান হাজী মহম্মদ মহসীনের পর মৌলবী ফজলুল হক বা মৌলবী ওয়াজেদ আলি খাঁ পনি ভিন্ন আর কয়জনের আছে জানি না।

হাসপাতাল ও অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য দান

'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী কলিকাতার মেডিক্যাল এড সোসাইটি নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালে ৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা হাসপাতালের জন্য এবং ১৫ হাজার টাকা গবেষণার জন্য দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে দাত্রী একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

রাজবালা দেবী

প্রবাসী ও মাডার্ণ রিভিউর ভূতপূর্ব বিজ্ঞাপনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদাস পালধি মহাশয়ের ধর্মপ্রাণা পত্নী রাজবালা দেবী গত ২৪শে আশ্বিন পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রামেশ্বর, বদ্রি-নারায়ণ, পশুপতিনাথ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থাদি পর্যটন করিয়াছিলেন। তিনি সরলা, ধর্মশীলা এবং পরদুঃখকাতরা ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স অনুমান ৬০ ষাট বৎসর হইয়াছিল।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

জার্মানির বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে ১৯১৬ সালের শেষের দিকে গত মহাযুদ্ধের অবস্থার তুলনা করা চলে। তখন জার্মানির অবরোধ চরমে উঠিয়াছিল এবং তখনকার মিত্রপক্ষ কতকটা অল্প আয়তনের দুর্গমালা ও পরিখার উপর কিছুকাল প্রবল আক্রমণ চালাইয়া, অল্প লাভ হওয়ার ফলে, পরে দীর্ঘকালব্যাপী শক্তি পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করে। সম নদের যুদ্ধের সঙ্গে হলাণ্ড ও বেলজিয়ম সীমান্তের যুদ্ধের তুলনা করা চলে এবং বর্ত্তমানে আমেরিকান উচ্চতম রণনায়কের যুদ্ধনীতির সঙ্গে তখনকার ফরাসী যুদ্ধনায়কের কার্য্যক্রমেরও কিছু তুলনা চলে। অবশ্য তুলনা আর বেশী দুর করা চলে না, কেননা বর্ত্তমান যন্ত্রযুদ্ধ যুগের অস্ত্রশস্ত্র তখনকার অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় বহু গুণ উন্নত এবং এখন স্থাণু যুদ্ধে—যাহা গত যুদ্ধে ফ্রান্সের সীমান্তে এবং বেলজিয়মে প্রায় আড়াই বৎসর চলিয়াছিল—রক্ষীদলের সুবিধা সুযোগ পূর্ব্বেকার তুলনায় অনেক কম, কেননা গুরুভারবাহী বোমাক্ষেপক এরোপ্লেন এবং প্যারাসুট-সেনা যুদ্ধচালনার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম স্থিতিশীল বহু বাধাবিঘ্ন নাশ ও অতিক্রম করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে সন্দেহ নাই যে জার্মানির উচ্চতম যুদ্ধপরিষদ এখন গত যুদ্ধের স্থাণুভাব আনিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত এবং মার্কিণ যুদ্ধ-সচিবের কথায় বুঝা যায় যে তাহারা ঐ বিষয়ে কিছু অংশে সফলকামও হইয়াছে। মিঃ ষ্টিমসনের কথায় বুঝা যায় যে জার্মান রণনায়কগণ ফ্রান্সরক্ষী সেনাদলের অনেক অংশই উন্মুক্ত রণাঙ্গন হইতে হটাইয়া দুর্গমালা পরিখা ও কৃত্রিম বাধাযুক্ত "পশ্চিম প্রাকারের" রক্ষাব্যূহের আড়ালে আনিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ঐ দুর্গ-মালার রক্ষায় বেশ কিছু নূতন তেজীয়ান সৈন্য যোজনায়ও সমর্থ হইয়াছে। ফলে জার্মান সীমান্তের নিকট এমন এক স্থাণুভাব দেখা দিয়াছে যাহাতে মিত্রপক্ষের প্রতি পদ অগ্রসর হওয়া কষ্ট ও বিষম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অবশ্য ইহা সম্ভব যে এই স্থাণুভাব সাময়িক মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমানে এইরূপ স্থাণুভাব নাশের অস্ত্র ও সরঞ্জামও আছে এবং ঐ ব্যাপারে মিত্রপক্ষের সঙ্গতির সহিত জার্মানির তুলনাই চলে না, কেননা, মিত্রপক্ষ—এবং সমস্ত সম্মিলিত জাতিবৃন্দ—এখন আকাশে অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও জার্মানি তাহার পশ্চিম প্রাকারের সাহায্যে এখনও স্থলচর সেনার সম্মুখে বিষম বাধার স্থাপনায় সক্ষম, এবং এই বাধাবিঘ্ন নাশে অশেষ চেষ্টা ও সময়ের প্রয়োজন যদি কেবলমাত্র অস্ত্রের ভারে এবং বহুগুণ অধিক সৈন্যের বলে সেই কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা চলে। নূতন যুদ্ধকৌশল চালনায় বা নূতন যুদ্ধাস্ত্রের যোজনায় কি অসাধ্য সাধন ঘটিতে পারে তাহার বিচার এখানে অবান্তর। যদি কখনও মিত্রপক্ষ সেরূপ কার্য্যক্রমের অবতারণা করে তবে তখন তাহা দেখা যাইতে পারে। এতাবৎ মিত্রপক্ষের চেষ্টা কেবলমাত্র "ভারে কাটার" দিকেই চলিয়াছে অর্থাৎ বৃহত্তর ও অধিকসংখ্যক যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োগ এবং যুদ্ধশক্তির বিভিন্ন শাখায় অধিকসংখ্যক সামরিক লোক-লস্করের যোজনাই তাহাদের প্রধান চেষ্টা। ফ্রান্সে মিত্রপক্ষ এখন এরোপ্লেনে, বর্ম্মযুক্ত সচল যুদ্ধাস্ত্রে ও সৈন্য সংখ্যায় জার্মানি অপেক্ষা বহুগুণ গরিষ্ঠ। উন্মুক্ত রণাঙ্গণে মার্কিন সেনা যুদ্ধশক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। সুতরাং এখন দুর্গাশ্রয় এবং জার্ম্মান রণচালকের অপরিসীম যুদ্ধকৌশলই জার্ম্মানির ভরসা।

পূর্ব্ব-ইয়োরোপ প্রান্তেও জার্ম্মানি ঐ প্রকার রক্ষাব্যূহ যোজনারই ব্যবস্থা করিয়াছিল। রুমানিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব্বে বল্কানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়ায় ঐ দিকে জার্ম্মানির যুদ্ধরেখা বহুবিস্তৃত এবং তাহার রক্ষা কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। উত্তরে ফিনল্যাণ্ড অস্ত্র ত্যাগ করায় সেখানেও ঐরূপ দুরূহ অবস্থা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে ও ইটালীতে মিত্রপক্ষ চতুর্গুণ বিক্রমে প্রচণ্ড অভিযান চালনা আরম্ভ করায় জার্ম্মানির পক্ষে এক বিষম ও অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখনকার অবস্থা দৃষ্টে মনে হইয়াছিল যে এই প্রচণ্ড শক্তিবৈষম্যে এবং অকস্মাৎ রক্ষণ-পরিকল্পনার বিপর্য্যয়ের ফলে জার্ম্মানির পতন অল্পদিনের মধ্যেই হইয়া যাইবে। পশ্চিমে জিগফ্রিড ব্যূহের অন্তরালে তাহার সৈন্যদলগুলিকে আনিতে পারায় সেদিকের অবস্থায় কতক পরিমাণে স্থায়িভাব স্থাপনায় জার্ম্মানি সক্ষম হয় কিন্তু পূর্ব্ব প্রান্তে, বিশেষতঃ পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে রুশসেনার প্রবল শক্তিশালী অভিযান কেন ক্রমে মন্থর হইয়া শেষে পূর্ব্ববৎ ধাপে ধাপে এখানে সেখানে কিরূপ চলিতে লাগিল তাহা বুঝা ভার। পূর্ব্ব প্রান্তে রুশ সেনা এক এক স্থলে এক এক বার প্রবল শক্তিতে আঘাত করিয়া কিছু দিনের মত সেখানে স্থাণুভাব ধারণ করিতেছে, এবং এইরূপ আঘাত কোনও এক স্থলে বহুদিন ব্যাপী হইতেছে না। এইরূপ অভিযান প্রথায় জার্ম্মান রক্ষাব্যূহ অতি ধীরে পিছাইয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে শেষ নিষ্পত্তির দিন কিছু আগাইয়া আসিতেছে না। ফলে এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তেই জার্ম্মানি তাহার শেষ পরীক্ষার দিন কিছু কালের মত ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে জার্ম্মানি এই ঠেকাইয়া রাখার চেষ্টায় কি লাভ করিতেছে? এবং সম্মিলিত জাতীয় দলের পক্ষে দ্রুত নিষ্পত্তিতে লাভই বা কি? মিত্রপক্ষের উচ্চতম যুদ্ধ পরিষদের অনুমানে এ বৎসরের গোড়ায় জার্ম্মানির নিকট ৩০ লক্ষ সৈন্য মজুত ছিল এবং তাহারও অধিকাংশ শ্রান্ত ক্লান্ত এবং বহু বার আহত। তাহার পর যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে তাহাতে মার্শাল ষ্টালিন ও মিঃ চার্চ্চিলের অনুমানে জার্ম্মানির ত প্রায় শেষ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। চার্চ্চিলের বক্তৃতায় যাহা প্রকাশিত তাঁহাতে এক ফ্রান্সেই ১০ লক্ষাধিক জার্ম্মান সৈন্য নষ্ট হইয়াছে। ফলে এখন পশ্চিম রণপ্রান্তে ৬ লক্ষ জার্ম্মান সেনা, ইটালিতে ৩ লক্ষের কম এবং পূর্ব্ব রণপ্রান্তে ১০ লক্ষ মাত্র জার্ম্মান সেনা আছে—অবশ্য যদি মিত্রপক্ষের অনুমান ঠিক হয়—যাহার বিরুদ্ধে পশ্চিমে ২৫।৩০ লক্ষ মিত্রপক্ষীয় সেনা, ইটালীতে ৫ লক্ষাধিক মিত্রপক্ষীয় সেনা এবং পূর্ব্ব প্রান্তে ৪০ লক্ষ রুশ সেনা নিযুক্ত আছে। অস্ত্রবলেও শক্তিবৈষম্যের অনুপাত প্রায় ঐ প্রকারই আছে,

সুতরাং সে ক্ষেত্রেও জার্ম্মান সেনার আশাভরসা খুবই কম। অতএব জার্ম্মানি যে কি ভরসায় সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা বুঝা সহজ নহে। গুপ্ত অস্ত্রের কথা অনেক কিছু শুনা গিয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাত্র উড়ুক্কু বোমা দেখা দিয়াছে এবং তাহার ব্যবহার রণক্ষেত্রে সম্ভব নহে। অন্য কি আছে এবং তাহার ব্যবহারের ফলাফল কি হইতে পারে তাহার বিচার বৃথা। জার্ম্মানির সৈন্যশক্তি বৃদ্ধিরও কোনই বিশেষ সম্ভাবনা নাই, অন্ততঃ পক্ষে সম্মিলিত জাতীয় দলের কাছেও কোন দিন তাহা পৌঁছাইতে পারিবে না। অন্য দিকে সম্মিলিত জাতীয় দলের পক্ষে দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনের কথা বিচার করিলে মনে হয় যে সে ক্ষেত্রে ইয়োরোপের যুদ্ধের বাহিরে অন্য যে-সকল সমস্যা আছে সেগুলি ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। তাহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলি দিনে দিনে বাড়িতেছে এবং চীন ও জাপানের ব্যাপারে অনেক সংশয়ের বিষয় দেখা দিতে পারে। সর্ব্বোপরি যে যুদ্ধে প্রত্যেক জাতির সমস্ত সামর্থ্যের সমষ্টি ধ্বংসকার্য্যের দিকে নিয়োজিত আছে, অর্থাৎ জাতীয় শক্তিসামর্থ্যের সমষ্টির প্রয়োজনের ফলে যাহা নির্ম্মিত হইতেছে তাহাতে আয়কর কিছুই জন্মাইতেছে না, সেরূপ যুদ্ধ যত বেশী দিন চলিবে ততই জাতীয় জীবনের ও জগতের লোকসানই বাড়িবে। সুতরাং সেদিক দিয়াও যুদ্ধের আশুনিবৃত্তি সম্মিলিত জাতীয় দলের প্রয়োজন। চীন ও রুশদেশ এই যুদ্ধে সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে অতি শীঘ্র অবসর প্রয়োজন যাহাতে জাতীয় জীবনের মূল বস্তুগুলি চিরকালের জন্য নষ্ট না হয়।

জার্ম্মানির শক্তি পরীক্ষা এখন চরমে উঠিয়াছে। পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে এবং পশ্চিমে সম্মিলিত জাতীয় দলের প্রচণ্ডতম আঘাত এখন জার্ম্মানির উপর পড়িতেছে। কেবল মাত্র ইটালিতে যুদ্ধের অবস্থা গতানুগতিক ধারায় চলিতেছে মনে হয়। পশ্চিমে আখেনের নিকট মিত্রপক্ষের যুদ্ধশক্তি এখন জিগফ্রিড লাইন ভেদ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এবং পূর্ব্ব রণাঙ্গনে বল্টিক অঞ্চল ও হাঙ্গেরীর সমতল ভূমিতে সোভিয়েটের অগণিত সেনা প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যস্ত। লিখিবার সময় (১৪-১০-৪৪) পর্য্যন্ত এই যুদ্ধগুলির ফলাফল দেখা যায় নাই। এইগুলির পরিণতিতেই বুঝা যাইবে জার্ম্মান যুদ্ধশক্তিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে কিনা।

চীনের অবস্থা সঙ্গীন একথা অনেক দিন যাবৎই শুনা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে সে অবস্থার কারণ "এসিয়া অপেক্ষা করুক" এই মূলনীতি যাহার পিছনে আছে মিঃ চার্চ্চিলের মত। জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতীয় দল যে যুদ্ধ করিয়াছে, দেড় বৎসর আগে পর্য্যন্ত তাহার শতকরা ৯০ ভাগ করিয়াছে স্বাধীন চীন এবং এখনও স্থলযুদ্ধের শতকরা ৭৫ ভাগ চীন সৈন্যই করিতেছে, অথচ মিত্রপক্ষের সম্মিলিত যুদ্ধসম্ভারের শতকরা ২ ভাগও চীনে যায় নাই যাহার ফলে চীনকে এখনও ইস্পাতের অগ্নিবৃষ্টি রোধ করিতে হইতেছে রক্তমাংসের দ্বারা। বর্ত্তমানে "এসিয়া অপেক্ষা করুক" এই আপ্তবাক্যের ফলে এসিয়া মহাদেশ অঞ্চলে জাপানের পরিস্থিতি দৃঢ়তর হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং ক্যাণ্টন-হাঙ্কাও রেলপথ জাপান যদি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারে তবে সে অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত মালয়, ওলন্দাজ পূর্ব্বভারত ও এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। মিত্রপক্ষের উচ্চতম যুদ্ধ-পরিষদের এত দিন ধারণা ছিল যে জার্ম্মানির পতন এই ১৯৪৪ সালে ঘটিবে এবং তাহার পরের বৎসরে জাপানের ধ্বংসকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। মিঃ চার্চ্চিল তো প্রথমে বিগত গ্রীষ্মের শেষে এবং পরে এই অক্টোবরের মধ্যে জার্ম্মানির পতন সম্ভব এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহার পর একথাও বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মানির পতনের পর জাপানের ধ্বংস সাধনে বেশী দেরী লাগিবে না। এখন তিনিই সুর বদলাইয়া বলিতেছেন যে জার্ম্মানি হয়ত ১৯৪৫ সালের কয়েক মাস পর্য্যন্ত টিকিয়া যাইতে পারে, এবং জাপান সম্বন্ধে আর কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই। অন্য দিকে মার্কিন নৌবহরের এক উচ্চ অধিকারীর ধারণা এই যে, ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইলে পরে জাপানকে শেষ করিতে অন্ততঃ পক্ষে আরও দেড় বৎসর লাগিবে। অথচ তত দিন চীন তাহার অগ্নিপরীক্ষা কি করিয়া সহ্য করিবে তাহার বিষয়ে কেহই কিছু বলে না।

বস্তুতঃ জাপান এখনও অতি সজাগ ভাবে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত। যদিও প্রশান্ত মহাসাগরে সে অনেক আঘাত পাইয়াছে এবং পাইতেছে, তাহার যুদ্ধশক্তির কোন বিকৃতি এখনও দেখা যায় নাই। আকাশে মিত্রপক্ষ এখন একাধিপত্য ভোগ করিতেছে কিন্তু জাপান তাহারও প্রতিকারের চেষ্টায় ব্যস্ত। মার্কিন যুদ্ধ-পরিষদ "এসিয়া অপেক্ষা করুক" এই নীতির আংশিক ব্যতিক্রম না করিলে এত দিনে সকলেরই অবস্থা বিপৎসঙ্কুল হইত। আশু প্রতিকার না হইলে সে বিপদ এখনও ঘটিতে পারে ইহাই স্বাধীন চীনের মত।

অন্য কথায় যত দিন জাপানের উচ্চতম অধিকারীবর্গ জাপানী সৈন্য অজেয় এবং মিত্রপক্ষের সৈন্য যুদ্ধে অক্ষম ও তাহাদের পরিচালকবর্গ অকেজো এইরূপ স্তোকবাক্যের প্রচার—এবং সম্ভবতঃ আংশিকভাবে বিশ্বাস—করিতেছিল, তত দিন মিত্রপক্ষের সুবিধার দিন ছিল। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে ক্রমাগত স্থানচ্যুত ও পরাজিত হওয়ার ফলে এবং ইউরোপে সম্মিলিত জাতীয় দলের প্রাধান্য দেখার ফলে জাপানের উচ্চতম অধিকারীবর্গ এখন নিকট ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনের বিষয়ে বিশেষ সজাগ হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ জাপান তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের নূতন যুদ্ধাস্ত্র ও অত্যাধুনিক যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত রহিয়াছে। চীনে যে নূতন যুদ্ধাভিযান চলিতেছে তাহার পিছনে জাপানের নূতন রক্ষণ-পরিকল্পনার পরিচয় প্রতি পদে দেখা দিতেছে। এই অভিযানে ক্যাণ্টন-হাঙ্কাও রেলপথ সম্পূর্ণভাবে জাপানের হস্তগত হইয়া গেলে এসিয়ায় যুদ্ধনিবৃত্তির দিন পিছাইয়া যাইবেই সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। জাপানের মনোবৃত্তির মধ্যে অস্ত্রত্যাগ বা বিজেতার কৃপাভিক্ষার স্থানমাত্র নাই একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বলিয়াছেন। সুতরাং ইউরোপের যুদ্ধে এখন যতই কালক্ষয় হইবে এসিয়ার যুদ্ধ ততই কঠোর হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে।

যবনিকা

শ্রীআর্যকুমার সেন

প্রত্নতাত্ত্বিকের খনিত্রের আঘাতে মৃত্তিকার নিম্নে কত মৃত বিস্মৃত অতীত যুগের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়, কত ভগ্ন অট্টালিকা, প্রস্তরমূর্তি, স্বর্ণালঙ্কার! অর্থহীন প্রস্তরলিখিত লিপি হইতে অর্থ আবিষ্কৃত হয়, অতীত তাহার গোপন কাহিনীর কতকাংশ যেন অনিচ্ছায় পরবর্তী যুগের মানুষের নিকট প্রকাশ করে। কিন্তু আরও কত লিপি অপঠিত রহিয়া যায়, কত ভগ্নাংশ চিরদিনের মত রহস্যাবৃত পড়িয়া থাকে, মৃত্তিকা হইতে বাহির হইয়াও অবোধ্যতার অন্তরালে কত রহস্য গোপন করিয়া রাখিয়া দেয় কে বলিবে।

গ্রাম, নগরী, জনপদ চিরদিন এক স্থানে পড়িয়া থাকে না। রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা বিবর্তনের ফলে নূতন নগরী গড়িয়া উঠে, কত বর্ধিষ্ণু নগরী মনুষ্য-পরিত্যক্ত হইয়া সর্প, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জীবের আবাসস্থলে পরিণত হয়। তাহার পরে তাহার উপর কালের করুণাময় হস্তের প্রলেপ পড়ে, প্রথমে মৃত্তিকার আচ্ছাদন, পরে বৃক্ষলতাদি, সকলে মিলিয়া মৃত জনপদকে চিরকালের জন্য নর-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া যায়। ক্বচিৎ কখনও কৌতূহলী প্রত্নতাত্ত্বিক সৌভাগ্যের ফলে লুপ্ত মাণিক্যের কণাংশ কুড়াইয়া পান, কিন্তু অধিকাংশই রহস্যের আচ্ছাদনে আবৃত থাকে।

বর্তমান যুগের তক্ষশিলা যাহারা দেখিয়াছে তাহারা কেহ তাহাকে বর্ধিষ্ণু নগরী বলিয়া ভুল করিবে না। কিন্তু এমন এক দিন ছিল যে দিন আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের এই নগরী ছিল নগরীশ্রেষ্ঠা। যবনবীর আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া ভারতে আগমন করেন তখন তক্ষশিলা নবযৌবনবতী সুন্দরী নগরী। বহু দিন কাটিয়া গেল। যবন, পারসীক, শক, কুশান, নানাজাতির পতাকাতলে তক্ষশিলা আশ্রয় লইল। রাজধানী ক্রমশ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উঠিয়া গেল, কিন্তু সবই পরস্পরের নিকটবর্তী স্থানে।

তাই বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ধরিত্রী তাহার এই অংশের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন, তখন একটি নাতিবৃহৎ পরিসরের মধ্যে আর্য, যবন, পারসীক, শক, কুশান, সকল জাতির অস্তিত্ব আবিষ্কার হইল। তবু কত মূর্তি, কত মুদ্রা, ইহাদের ইতিহাস অজ্ঞাত রহিয়া গেল, প্রত্নতাত্ত্বিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখেও ধরা দিল না।

দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বের কথা। দিগ্বিজয়ী যবনরাজ আলেকজাণ্ডার যখন সৈন্যগণের অসন্তোষের ফলে একান্ত অনিচ্ছায় ভারত পরিত্যাগ করিলেন তখনও বহু যবন সৈনিক ভারতেই রহিয়া গেল। গান্ধার রমণীর পাণিগ্রহণ পূর্বক কয়েক পুরুষের মধ্যেই পরিপূর্ণভাবে আর্য জাতিতে পরিণত হইল। যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখনও উত্তর-ভারতে দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয় নাই, অন্তত গান্ধারে নহে। ফলে গৌরবর্ণ গ্রীকজাতির পক্ষে গৌরবর্ণ ভারতবাসীতে পরিণত হইতে অধিক সময় লাগিল না।

ধর্ম লইয়া আধুনিক জগতে যতটা গোলযোগ, সেই অতীত-যুগে তাহা বোধ হয় ছিল না। বহু দেববাদী যবন বিনা-দ্বিধায় আর্য দেবগণকে আত্মসাৎ করিল, জিউস্ অক্লেশে ইন্দ্রে পরিণত হইলেন; ফিবাস হইলেন সূর্যদেব; আথেনি, বাণী; এমন কি আফ্রোদিতি ও এরস মাতাপুত্রের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া রতি ও পঞ্চশরে পরিণত হইলেন, কোনো অসুবিধাই রহিল না।

বৌদ্ধধর্মের তখন প্রবল অভ্যুদয়। প্রিয়দর্শী সম্রাট্ অশোক সমগ্র আর্যাবর্ত এমন কি ভারতের বাহিরে পর্যন্ত প্রচারক প্রেরণ করিয়া জনগণকে অহিংসা ও মুক্তির বাণীতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গান্ধারও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। বৌদ্ধবিহারে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে জাতির রক্তে বহু দেববাদ, বৌদ্ধধর্মের আনন্দহীন নিরীশ্বরবাদ তাহার মর্মে আঘাত করিল না। মুণ্ডিতশির পীতবস্ত্রধারী শ্রমণগণ বিহারের শোভাবর্ধন করিয়া চলিলেন, এবং রাজানুগ্রহে পরমসুখে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। সাধারণ জনগণ নামে বৌদ্ধ, কার্যত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রহিল। ধর্মসম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা আরম্ভ হয় হর্ষবর্ধনের সময় হইতে। তাহার পূর্বে সম্ভবত পরধর্মদ্বেষের চিহ্নমাত্র আর্যাবর্তে ছিল না। প্রজাগণ অবশ্য অনেক সময়েই উৎপীড়িত হইত, কিন্তু কদাচ ধর্মের নামে নহে।

গান্ধারের প্রধানা নগরী তক্ষশিলার তখন পরিপূর্ণ যৌবন। নানাজাতির রক্তের মিলনে নূতন সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা বেশভূষায়, ধর্মে আচার-ব্যবহারে পরিপূর্ণভাবে আর্য। পারসীক, শক প্রভৃতি জাতির পিতৃপুরুষের সংস্কৃতির বালাই ছিল না, তাহারা যত দূর পারিল নূতন সংস্কৃতি গ্রহণ করিল। কিন্তু যবনগণ যে শুধু আর্যসংস্কৃতি আত্মসাৎ করিল তাহা নহে, যবন-সংস্কৃতির সহিত তাহার সংযোগসাধনে তাহাকে বিলক্ষণ সমৃদ্ধ করিল।

তক্ষশিলার প্রধান বৌদ্ধবিহার নগরীর উপকণ্ঠে নগর সীমানার ঠিক বাহিরেই। শ্যামল বৃক্ষাদিশোভিত একটি ক্ষুদ্র গিরিকার উপরে বিহার। মধ্যে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, চতুষ্পার্শ্বে প্রশস্ত অলিন্দ। এই প্রাঙ্গণ এবং অলিন্দের মধ্যবর্তী স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, ভিক্ষুগণের উপাসনা এবং আবাসগৃহ। কারাপ্রকোষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এতই ক্ষুদ্র। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে সুবৃহৎ বিচারশালা। পতিতভিক্ষুর অপরাধের বিচার এই স্থানে হইয়া থাকে এবং মহাস্থবির অন্যান্য ভিক্ষুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অপরাধীর দণ্ড বিধান করেন।

কিন্তু তাই বলিয়া যে ভিক্ষুগণ নিরন্তর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং তপশ্চর্যায় নিরত থাকিতেন তাহা মনে করিলে সম্ভবত ভুল হইবে। তাহারা বিলাসিতা অথবা দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণরূপে বিসর্জন দেন নাই। সঙ্ঘের বৃহৎ পাকশালায় একাহারী ভিক্ষুগণের নিমিত্ত দৈনিক প্রচুর পরিমাণে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় বস্তু প্রস্তুত হইত।

সঙ্ঘের সর্বাংশ ভরিয়া অগণিত বুদ্ধ-মূর্তি। একই রূপের অসংখ্য বুদ্ধ, একটির সহিত অপরটির কোনো প্রভেদ নাই বলিলেও চলে। ভাবলেশহীন ভাস্কর্য, তবু কোন কোনটি দেখিলে বিস্ময়ে মাথা নত হইয়া আসে, এতই বৃহৎ।

শ্রমণগণের বুদ্ধভজনা, কৃচ্ছ্রসাধন এবং উদরপূর্তি নির্বিবাদে চলিতেছিল। মহাস্থবির বজ্রগুপ্তের প্রবল পরাক্রান্ত শাসনে

তাঁহারা সুখে না হউক, শান্তিতে ছিলেন। আর সুখ জিনিসটা গৃহীর জন্য, ভিক্ষুর জন্য নহে।

মহাস্থবির প্রভাতে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া এক দিন দেখিলেন, শ্রমণ ধর্মপাল এক অপরিচিত যুবকের সহিত বাক্যালাপে রত।

বিহার গৃহীর জন্য নহে। এখানে দিবারাত্র যাহাদের দেখা যায়, তাহারা পীতরঞ্জিত কৌষেয় বস্ত্রধারী শ্রমণ। কামিনী-কাঞ্চন, নগর, গ্রাম, ইহাদের কাহারও সহিত বিহারের কোন সম্বন্ধ নাই।

মহাস্থবির বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, "ধর্মপাল, এ আগন্তুক কে?" ধর্মপাল চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন। অপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেন, "থের, এ ব্যক্তি কর্মপ্রার্থী।"

পরুষবচনে মহাস্থবির কহিলেন, "কর্মপ্রার্থী? এ কি রাজদ্বার না স্বার্থবাহের বিপণি? বলিয়া দাও তক্ষশিলার রাজসভায় গমন করিতে। যণ্ডামর্ক চেহারা আছে, সৈন্যদলে কর্ম জুটিয়া যাইবে।"

মহাস্থবির মিথ্যা বলেন নাই। যুবক দীর্ঘকায়, প্রশস্তবক্ষ এবং পেশল দেহবিশিষ্ট। দেখিতে অতি সুশ্রী। গাত্রবর্ণ তক্ষশিলার নাগরিকগণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর নহে, স্নিগ্ধ শ্যাম।

যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে মহাস্থবিরের নাসিকাকুঞ্চন দেখিতেছিল। সৈনিক-বৃত্তির কথা শুনিয়া যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল। ব্যস্তভাবে বলিল, "আর্য, আমি সবল দেহ হইতে পারি, কিন্তু অস্ত্রধারণের যোগ্যতা নাই। আপনার বিহারে বহু পুণ্যাত্মা শ্রমণ আছেন, আমি তাঁহাদের সেবা করিয়া কালযাপন করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।"

মহাস্থবির মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, বক্ষে সৈনিকোচিত সাহসের অভাব আছে!"

মুহূর্তের জন্য যুবকের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; পরমুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "প্রকৃতই সাহসের অভাব আছে তাত! কিন্তু আমার দেহে বলের অভাব নাই, বিহারের অন্যান্য ভৃত্যগণ যে কার্য করিয়া থাকে আমিও তাহাই করিব।"

ধর্মপাল মৃদু স্বরে বলিলেন, "এ বিহারে ভৃত্য নাই, উপসম্পদার্থিগণ এখানে পরিচারক, পাচক প্রভৃতির কর্ম করে। বারিবাহকের কর্ম করে ভিক্ষু শঙ্খ।"

যুবক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। ধর্মপাল মহাস্থবিরের নিকটে গিয়া তাঁহার কর্ণে কি যেন বলিলেন, ফলে মহাস্থবির দুই তিন বার শির সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "উত্তম, উহাকে বারিবাহকের কর্মে নিযুক্ত কর। কিন্তু বলিয়া দাও, অধিক বেতনের আশা যেন না রাখে।"

বিহারের বারিবাহকের কর্ম নিতান্ত সহজ নহে। নিকটতম প্রস্রবণ পাহাড়ের পাদদেশে, নগরসীমানার ঠিক বাহিরে। শীর্ণদেহ শঙ্খ ভিক্ষুগণের নিমিত্ত বারিবহন করিয়া কুব্জদেহ হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্মপাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবককে কর্মে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এই সুশ্রী সবলদেহ আগন্তুক যে কেন অকারণে মঠের ভৃত্য-বৃত্তি অবলম্বন করিতে এত ব্যগ্র তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বিহার অধিক দিনের নহে। কিঞ্চিন্ন্যূন শতবর্ষ পূর্বে অশোকের রাজত্বকালে বিহারের সৃষ্টি, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নৃপতিগণের দাক্ষিণ্যে বিহারের পুষ্টি। রাজদাক্ষিণ্যের যে ন্যূনতা নাই তাহা শ্রমণগণের ঘৃতদুগ্ধপুষ্ট শরীর দেখিলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না। বর্তমান মহাস্থবির বন্ধুগুপ্ত প্রায় ত্রিংশ বর্ষ পূর্বে উপসম্পদাকামী হইয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পূর্বগামী বহু মহাস্থবিরের নির্বাণলাভের পর স্বয়ং গত পঞ্চ বৎসর যাবৎ মহাস্থবিরের পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। দীর্ঘ ত্রিংশ বর্ষের কৃচ্ছ্রসাধনের কোন চিহ্ন তাঁহার শরীরের কোথাও নাই। চিবুক ও স্কন্ধদেশ মেদবাহুল্যে কুৎসিত, উদরের পরিধি সন্ন্যাসীর ন্যায় নহে, সুখজীবী সুবর্ণবণিকের ন্যায়। অন্যান্য শ্রমণগণও অল্পবিস্তর মহাস্থবিরের মতই। পীতরঞ্জিত বহির্বাস ও মুণ্ডিত শীর্ষ ভিন্ন বিলাসী গৃহীর সহিত তাঁহাদের কোন প্রভেদ নাই।

দুই দিবস পূর্বের কথা। বৌদ্ধবিহারের অল্প দূরে নগরপ্রান্তে অপরাহ্নকালে একটি তরুণী জল লইতে আসিয়াছিল। রজ্জুবদ্ধ কলস কূপ হইতে উঠাইবার সময়ে সহসা কূপসন্নিকটে উপবিষ্ট এক যুবক তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যুবক বলিষ্ঠদেহ, কিন্তু পথশ্রান্ত।

কৌতূহলী তরুণী প্রথমে কথা কহিল। বলিল, "তুমি কি বিদেশী? আগন্তুক চমকিয়া চাহিল, পরে ক্লান্তস্বরে কহিল, "হাঁ ভদ্রে, আমি বহু দূর দেশ হইতে আসিয়াছি। আমাকে কিঞ্চিৎ পানীয় জল দিবে? আমি তৃষ্ণার্ত।"

করুণায় বিগলিত হৃদয়ে তরুণী যুবকের অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দিল। আকণ্ঠপান করিয়া যুবক নিবৃত্ত হইল।

যুবতী কহিল, "ভদ্র, তুমি নিশ্চয় ক্ষুধার্ত! আমার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিবে?"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ যুবতী তাহাকে পথশ্রান্ত সাধারণ দরিদ্র পথিক মনে করিয়াছিল, সে ভুল আর রহিল না।

তক্ষশীলা নগরীতে সুপুরুষ যুবকের অভাব নাই। কিন্তু এই পথশ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসার্ত ও রৌদ্রদগ্ধ আগন্তুকের মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহার ফলে সে সকলের বাহিরে এবং কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে। শতজনের মধ্যে একত্র থাকিলেও এই শ্যামল যুবকটি লোকের চক্ষে বিশেষ করিয়া রমণীজাতির চক্ষে, পড়িবেই পড়িবে।

অল্পক্ষণ হাঁটিয়া উভয়ে একটি প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহ ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি পরিচ্ছন্ন, নগরীর অধিকাংশ গৃহ যেমন আপাতদৃষ্টিতে মনুষ্যবাসের অযোগ্য, সেরূপ নহে। ভিত্তিগাত্র প্রস্ফুটিত কমলের চিত্রাঙ্কিত। গৃহের সম্মুখে ও পশ্চাতে উদ্যান।

কাষ্ঠপীঠিকায় উপবেশন করিয়া যুবক পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিল। আহারের উপকরণ সামান্য, গোধূমচূর্ণের পুরোডাশ, উদ্যানজাত অম্লাদ্যাদির ব্যঞ্জন, এবং মধু। কিন্তু আগন্তুকের আহার দেখিয়া যুবতীর মনে হইল এরূপ সুখাদ্য সে বহুকাল মুখে দেয় নাই।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া যুবতী একটি তৈলবর্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া কক্ষে লইয়া আসিল। কুমারসেন মৃদুদীপালোকে এই যেন প্রথম গৃহকর্ত্রীকে দেখিল। তাহার মুগ্ধবিস্মিত দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত তরুণীর মুখমণ্ডলে আবদ্ধ রহিল, স্বল্পালোকিত কক্ষে তরুণী আরক্তমুখ নত করিল।

ধন্যবাদ দেওয়ার প্রথা বর্তমান যুগের। সেযুগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইত উপকৃতের চক্ষে। যুবতী চাহিয়া দেখিল যুবকের চক্ষে কৃতজ্ঞতার অভাব নাই।

এতক্ষণে আগন্তুক কথা কহিল। বলিল, "ভদ্রে, তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"আমার নাম ক্রেসিস্।"

বিস্মিতকণ্ঠে আগন্তুক কহিল, "কি বলিলে, ক্রেসিস্ ?"

মৃদু হাসিয়া যুবতী উত্তর দিল, "হাঁ, ক্রেসিস্ আমার পিতামহপ্রদত্ত নাম। আমার অপর নাম প্রিয়দর্শিকা।"

যুবকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, একান্তভাবে কহিল, "প্রিয়দর্শিকা। সুন্দর নাম। কিন্তু আর একটি যে নাম বলিলে তাহার অর্থ কি ?"

সলজ্জ স্মিতমুখে যুবতী খুলিয়া বলিল।

সে ইতিহাসে অপূর্বতা আছে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের যে-সকল সেনা প্রত্যাবর্তন করে নাই, তাহাদের মধ্যে এক তরুণ সেনানী ছিল, তাহার নাম ডেমেট্রিয়স। ঘন হরিৎ-বনানী শোভিত পর্বতবেষ্টিত নগরী তক্ষশিলার মোহিনীমায়ায় পড়িয়া সেইখানেই বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। শুধু নগরীর মোহে নহে, গান্ধারনিবাসিনী এক নিবিড়কুন্তলা নীলাঞ্জনয়না রমণীর মোহেরও তাহাতে অংশ ছিল। মোট কথা, সে আর ফিরিয়া যায় নাই।

কালে হ্রস্ব যাবনিক তরবারির সহিত যাবনিক বেশ, বর্ম, এমন কি নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ডেমেট্রিয়স্ একান্তভাবে ভারতীয়ে পরিণত হইল। আলেকজাণ্ডারের সেনাদলে যোগ দিবার পূর্বে ভাস্কর্য ছিল তাহার বৃত্তি, পুরুষানুক্রমে ডেমেট্রিয়সের বংশ সেই বৃত্তিরই চর্চা করিয়া চলিল। বহু দূরের জন্মভূমি হেলেন দেশ বহুদূরেই পড়িয়া রহিল, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যাবনিক সংস্কৃতির মিলন ঘটিল ; প্রিয়দর্শিকার পিতামহ পৌত্রীর নাম দিয়াছিল ক্রেসিস্। কেন, তাহা সেই জানে।

যুবক কহিল, "কিন্তু ক্রেসিস্ অর্থ কি ? নামের ত একটা অর্থ থাকা চাই।"

গম্ভীর কণ্ঠে যুবতী বলিল, "দেবী আফ্রোদিতির অপর এক নাম।"

হতাশকণ্ঠে যুবক কহিল, "সবই বুঝিলাম।"

হাস্য দমন করিয়া ক্রেসিস্ কহিল, "আফ্রোদিতি যবনদের প্রেমের দেবী।" বলিয়াই সহসা যেন কেন আকর্ণ আরক্তিম হইয়া উঠিল। প্রসঙ্গ পরিবর্তনোদ্দেশ্যে কহিল, "তোমার নাম কি ?"

"কুমারসেন।"

ক্রেসিস্ কিছু না বলিয়া অন্যমনস্কভাবে গবাক্ষের বাহিরে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে কুমারসেন প্রশ্ন করিল, "নামটা মনঃপূত হইল না বুঝি ?"

"না, বেশ নাম। কিন্তু ইন্দ্রগুপ্ত নামটি আরও সুন্দর।"

অকারণে ইন্দ্রগুপ্তের প্রতি কুমারসেনের হৃদয়ে বিতৃষ্ণার উদয় হইল। শুষ্কস্বরে প্রশ্ন করিল, "কে সেই ইন্দ্রগুপ্ত ?"

বঙ্কিম ওষ্ঠাধরে মৃদুহাস্যের বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করিয়া ক্রেসিস্ কহিল, "পার্শ্বকক্ষে আসিয়া দেখ।"

এই কক্ষটি পূর্ববর্ণিত কক্ষ অপেক্ষা কয়েক গুণ বড়। গৃহতল ভরিয়া অসংখ্য প্রস্তর এবং মৃন্ময় মূর্তি। অধিকাংশই রমণী-মূর্তি। প্রত্যেকটি মূর্তিই অপূর্বসুন্দর।

আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কুমারসেন কহিল, "চমৎকার।"

স্মিতমুখে ক্রেসিস্ কহিল, "বেশ সুন্দর, নয় ? ইন্দ্রগুপ্ত এই সব গড়িয়াছে।"

ইন্দ্রগুপ্তের ক্রমাগত উল্লেখে কুমারসেনের মনোভাব তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিতেছিল না। কিন্তু সে বিদগ্ধ পুরুষ, রস-গ্রহণের শক্তি তাহার আছে, তা সে রস যেই সৃষ্টি করিয়া থাক না কেন। কহিল, "ইন্দ্রগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

বিস্মিতা ক্রেসিস্ কহিল, "তুমি কি ভাস্কর্য জান ?"

"বিশেষ কিছু জানি না, তবে বহুদিন আগে মূর্তি গড়িতাম।"

উজ্জ্বল নয়নে ক্রেসিস্ বলিল, "তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ক্ষণকালের মধ্যেই ইন্দ্রগুপ্ত ফিরিবে, তাহার সহিত আলাপ করিয়া দেখিও।"

কুমারসেন যেন নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল, "আর এক দিন। রাত্রি অধিক হইতেছে, এই বার যাই। নগরে কোনো পান্থ-শালায় রাত্রিযাপনের উপায় করিয়া লইতে হইবে।"

দুই একটি শিষ্টালাপের পর কুমারসেন বিদায় লইল। জন-পূর্ণ পান্থশালায় মৎকুণলাঞ্ছিত শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার নিদ্রা আসিল না। তন্দ্রার ঘোরে কখনও দেখিল হাস্যমুখী প্রিয়দর্শিকা, কখনও অজ্ঞাতরূপ ইন্দ্রগুপ্ত। লোকটা যেন ছায়ার মত প্রিয়দর্শিকার সহিত ঘুরিতেছে। কিন্তু কি কুৎসিত দেখিতে! কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, কেশবিরল মস্তক। সর্ষপতৈলনিষিক্ত একটা লগুড় হাতের কাছে পাইলে কুমারসেন তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিত।

মধ্যরাত্রির দিকে কুমারসেন সত্যই ঘুমাইল। এবারে স্বপ্নে আর একজনকে দেখিল, যে গত দুই বৎসর যাবৎ তাহার নিদ্রিত জীবনের সাথী, যাহার জন্য সে এই আর্যাবর্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পলাইয়া আসিয়াছে।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই কুমারসেনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সমস্ত দিন জনকোলাহলপূর্ণ কর্মব্যস্ত তক্ষশিলায় ঘুরিয়া কায়িক শ্রম দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জনপূর্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পান্থশালায় ফিরিয়া আসিল। পুনরায় অর্ধবিনিদ্র রজনী, প্রিয়দর্শিকা, কুৎসিতদর্শন ইন্দ্রগুপ্ত ; এবং শেষ রজনীতে আর একটি নারী, যাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিলে সে তাহার জীবনের অর্ধাংশ দিতে প্রস্তুত।

পরদিন প্রত্যূষে অন্যমনস্কভাবে পদচারণা করিতে করিতে কুমারসেন নগরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। দেখিল, সম্মুখে একটি নাতিউচ্চ হরিৎবৃক্ষরাজি শোভিত পর্বতিকা, তাহার শিখরদেশে বিহার। কুমারসেন বিহারে উপস্থিত হইল, এবং সঙ্ঘের বারিবাহকের কর্মে নিযুক্ত হইল।

কনিষ্ঠ স্থবির ধর্মপাল মধ্যে মধ্যে পরিশ্রমনিরত কুমার-সেনের দিকে তাকাইয়া একটা কথা না ভাবিয়া পারেন নাই। এ যুবকের দেহ ভৃত্যের দেহ নহে। মুক্ত তরবারি হস্তে মৃত্যু-সঙ্কুল রণক্ষেত্রে বর্মাবৃত বক্ষে শত্রুকুল নিধন করিবার জন্য যেন এ দেহের সৃষ্টি।

কিন্তু ঐ ত কুমারসেন প্রস্রবণ হইতে বারি আহরণপূর্বক পূর্ণ কলস স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধীরে পর্বতগাত্রে আরোহণ করিতেছে। কিন্তু ক্লান্তির চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। অতি-প্রত্যুষ হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া তাহার অবকাশ। এই কি দীর্ঘ সমুন্নতদেহ যোদ্ধৃরূপ পুরুষের কাজ? শঙ্কুকে এ কার্যে মানাইত ভালো। বারিবহন করিবার মত দৈহিক শক্তির তাহার অভাব আছে, কিন্তু সে যেন আজন্মভৃত্য। শূদ্রের কার্য করিবার জন্যই যেন তাহার জন্ম।

ধর্মপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। কুমারসেন ত নিজেই স্বীকার করিয়াছে সে বিপদ্‌ভীরু, সৈনিকদলে প্রবেশের মত বীর্য তাহার নাই। কি হইবে এ সব ভাবিয়া!

কুমারসেনের সঙ্ঘে আগমন আকস্মিক নহে। নাগরিক জীবনে বীতরাগ হওয়ার কারণ তাহার যথেষ্ট ছিল। শ্রমণ-সঙ্ঘে অখণ্ড শান্তি, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিরক্তিকর কোলাহল সেখানে নাই। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ তাহার পক্ষে কঠিন নহে। কাঞ্চনদ্রব্যটি মুদ্রায় পরিণত হইলে দেখিতে কিরূপ হয় তাহাও প্রায় সে ভুলিতে বসিয়াছে। আর কামিনী? অকারণে পথপ্রান্ত হইতে একটি শুষ্ক বৃক্ষশাখা তুলিয়া লইয়া দুই খণ্ডে ভাঙিয়া কুমারসেন দূরে নিক্ষেপ করিল। যদিচ নারীজাতির সহিত বৃক্ষশাখাটির বিন্দুমাত্রও আকারসাদৃশ্য ছিল না।

পঞ্চাহকাল কুমারসেন বারিবহন করিয়াছে। অপরাহ্ণে অবকাশ পাইয়াছে কিন্তু সঙ্ঘ ত্যাগ করে নাই। আজই প্রথম অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইল।

মানুষের পদদ্বয় সব সময়ে মস্তিষ্কদ্বারা পরিচালিত হয় না। হৃদয় অনেক সময়েই মস্তিষ্কনিরপেক্ষ ভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন-কার্য সমাধা করে। ফলে কিছুক্ষণ পথ চলিয়া সহসা কুমারসেন দেখিল প্রস্তরনির্মিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই কুমারসেন রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল।

দ্বার উন্মোচন করিয়া যে যুবক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতির অধিক নহে। মর্মর প্রস্তরের ন্যায় শুভ্র বর্ণ, স্বর্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশদাম আস্কন্ধবিলম্বিত। এ রূপ কুমারসেন পূর্বে কখনও দেখে নাই।

অপরিচিত যুবক তাহার প্রতি স্মিতহাস্যে চাহিয়া কহিল, "তুমিই কুমারসেন, না?"

বিস্মিত কণ্ঠে কুমারসেন কহিল, "হাঁ। কিন্তু তুমি কে?"

"আমার নাম ইন্দ্রগুপ্ত।"

ক্ষণিকের জন্য কুমারসেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই ইন্দ্রগুপ্ত! তাহার দুঃস্বপ্নদৃষ্ট কেশবিরল, কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় ইন্দ্রগুপ্তের সহিত ইহার সাদৃশ্য কোথায়? এ যে কন্দর্পদর্পাপ-হারী রূপ!

ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "ভিতরে আসিবে না?"

যন্ত্রচালিতের মত কুমারসেন কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

কেন সে এখানে আসিয়াছিল তাহা সে জানে। সপ্তাহ-কাল পূর্বে দৃষ্টা রূপসী ক্রেসিসের আর একবার দর্শনলাভা-কাঙ্ক্ষায়। কিন্তু সে ত রমণীদ্বেষী উপসম্পদাকামী, এই রূপবান্ যুবকের প্রতি তাহার অকারণ ঈর্ষার উদয় হইল কেন?

ক্রেসিস্ নিকটেই ছিল। হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিল, "ইন্দ্রগুপ্ত, এই তোমার নবলব্ধ শিষ্য।"

দিবালোকে সুস্থ দেহে কুমারসেন এই প্রথম ক্রেসিস্‌কে দেখিল।

বয়স তাহার অনধিক সপ্তদশ। গৌরী, মেঘকুন্তলা, কুরঙ্গ-নয়না। পীবর বক্ষ শ্বেতকঞ্চুকীতে অতিপিনদ্ধ, কটিতটে শুভ্র কার্পাসাংশুক। অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, কর্ণে হেমকুণ্ডল, বাহুতে হেমকঙ্কণ। কবরীমুক্ত কেশ আশ্রোণীবিলম্বিত, কয়েকটি চূর্ণকুন্তল ললাট ও স্কন্ধদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

এরূপ যেন মর্তের নহে। কোন্ বিধাতা কি উপকরণে এই তরুণীকে গঠিত করিয়াছিলেন? কোন্ নৃত্যতাল-বিস্মৃতা শাপভ্রষ্টা অপ্সরা এই যবনী তরুণী প্রিয়দর্শিকা?

রমণী-জাতি সম্বন্ধে কুমারসেন অজ্ঞ নহে। যদি অজ্ঞ হইত, তাহা হইলে আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্ত হইতে গান্ধারে আসিবার কোন কারণ থাকিত না। পাটলিপুত্র নগরে মদিরেক্ষণা, মরাল গামিনী সুন্দরী সে বহু দেখিয়াছে, কিন্তু এমন রূপ দেখে নাই। এ যেন জ্বলন্ত বহ্নিশিখা, ক্ষুদ্র পুরুষ তাহার সন্নিকটে আসিলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে!

একাগ্রদৃষ্টিতে কুমারসেন প্রিয়দর্শিকার দিকে চাহিয়াছিল। সহসা তরুণীর গৌর আননে আরক্ত মেঘের ছায়া পড়িতেই তাহার চমক ভাঙিল। ছি ছি, এ কি করিতেছে সে? এই পীবরবক্ষা, ক্ষীণমধ্যা, পৃথুজঘনা, অশোকরক্তকরতলা যুবতী তাহার কে? সে সংসারবিরাগী রমণীদ্বেষী কুমারসেন, সে বিহারবাসী নির্বাণকামী শ্রমণগণের বারিবাহক ভৃত্য, কালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ লুপ্ত করিবে,—সে এমন রূপলোলুপ হীনচরিত্র শ্রেষ্ঠিপুত্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে কেন?

অস্বাচ্ছন্দ্য দমন করিয়া কুমারসেন কহিল, "ইন্দ্রগুপ্ত, তোমার নির্মিত মূর্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবে?"

স্মিতমুখে ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "করিব বই কি? তোমার শিল্প-শিক্ষার বাসনার কথা আমি আমার ভগিনীর নিকট পূর্বেই শুনিয়াছি।"

হতভম্ব কুমারসেন কহিল, "তোমার ভগিনী? কে, প্রিয়-দর্শিকা?"

বিস্মিতভাবে ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "তাহা ব্যতীত আবার কে? আমাদের উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য কর নাই?"

নির্বাক কুমারসেন উভয়ের মুখের দিকে চাহিল। কোনই সন্দেহ নাই। চক্ষু ও কেশের বর্ণ ব্যতীত উভয়ের মুখাবয়বের গঠনে কোনই পার্থক্য নাই। সেই তুষারশুভ্র বর্ণ, আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু, ঋজু নাসিকা।

ক্রমশঃ

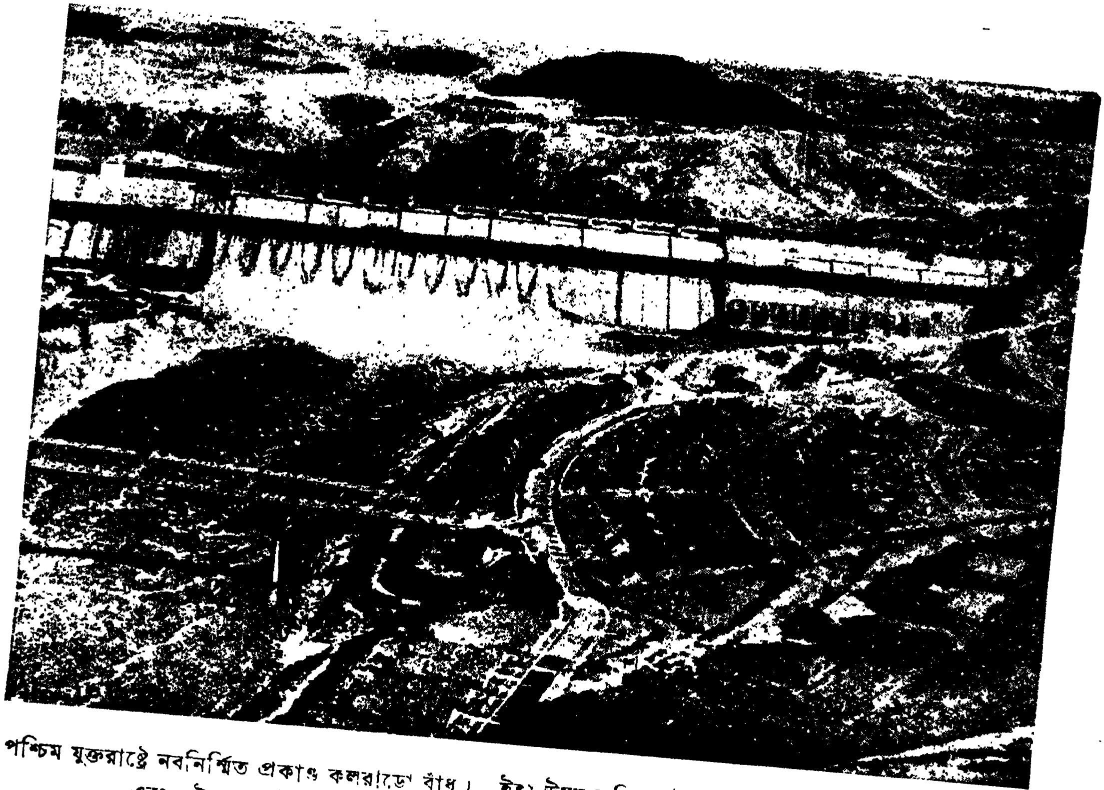


রাইম নগরীর মুক্তিদাতা মার্কিন সৈন্য-বাহিনীকে স্বাগত করিবার জন্য বিখ্যাত গির্জ্জার সম্মুখে সমবেত নগরবাসিগণ



প্যারিসের অবরোধ-মুক্তি কালে একটি নাৎসী স্নাইপারের গোলাবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নারী এবং শিশুদের আশ্রয়স্থলাভিমুখে গমন

USOWI



পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে নবনির্ম্মিত প্রকাণ্ড কলরাডো বাঁধ। ইহা উষর-ভূমিকে উর্ব্বরা করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে এবং এই স্থান হইতে নিকটবর্ত্তী শহরগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইবে



পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের সদ্যনির্ম্মিত বাঁধের স্রোতদ্বারসমূহের ভিতর দিয়া প্রবহমান কলরাডো নদীর জলরাশি

USOWI

তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও সাইক্লোট্রন

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানীর চিরন্তন সাধনা প্রকৃতিকে পরাভূত করা। এই সাধনার অন্যতম অঙ্গ হিসাবেই প্রকৃতিলব্ধ দ্রব্যসম্ভারের অনেকানেক জিনিসকে মানুষ কৃত্রিম পদ্ধতিতে বা মাল-মসলায় উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। একান্ত ভাবে প্রকৃতির দানের বা খেয়ালের উপর নির্ভরশীল হইয়া নিত্য প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইতে ইচ্ছুক নহে বলিয়া বিজ্ঞানী প্রকৃতির কার্যধারা অনুসরণে কৃত্রিম উপায়ে রেশম, পশম, রবার, পেট্রোল, রঞ্জন, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি বহুবিধ জড় পদার্থ উৎপন্ন করিতেছে। শুধু তাই নয় পৃথিবী ভরিয়া নিয়ত যে প্রাণলীলা চলিতেছে সেখানেও স্রষ্টার আদি ও অকৃত্রিম ব্যবস্থা আর টিকিতেছে না; কারণ কৃত্রিম প্রজনন, কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ্যা বা কুমারীর স্তনে দুগ্ধ-সঞ্চার-ব্যবস্থা, বীজবিহীন ফল উৎপাদন প্রভৃতি আজ মানুষের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে। বিংশ শতকীয় বিজ্ঞানী তাপস বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয় স্বর্গের মতই কৃত্রিম উপাদানে জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্দাম আনন্দে মত্ত রহিয়াছে। এই চিন্তাধারা অন্যতম ফল লাভ করিয়াছে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টিতে এবং এই সাফল্যে প্রকৃতির সৃজন-রহস্যের নিগূঢ়তম তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকেরেল আবিষ্কার করেন যে আলোকরশ্মির প্রভাবে ফোটো-প্লেটে যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে, য়ুরেনিয়াম নামক খনিজ পদার্থকে ফোটো-প্লেটের সন্নিকটে রাখিলেও তেমনি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদাম কুরী ঘোষণা করেন যে পিচব্লেণ্ডী নামক খনিজ প্রস্তরে য়ুরেনিয়ামের অনুরূপ আরও একটি পদার্থ আছে এবং পাঁচ বৎসর পরে কুরী দম্পতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আট টন পিচব্লেণ্ডী হইতে মাত্র এক গ্রাম পরিমাণ রেডিয়াম নামে অভিহিত মৌলিক পদার্থ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন এবং দেখা গেল রেডিয়ামও য়ুরেনিয়ামের মতই গুণসম্পন্ন বরং আরও বেশী তেজস্ক্রিয়। ইতিমধ্যে রাদারফোর্ড প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, এই জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে গামা-রশ্মি নামক এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয় যাহা এক্স-রশ্মি হইতেও বেশী ক্ষমতাপন্ন এবং ৩০ সেন্টিমিটার পুরু লৌহকেও অনায়াসে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইহা হইতে আলফা ও বিটা রশ্মি বলিয়া অভিহিত দুই প্রকার কণিকা বহির্গত হয়, যাহারা যথাক্রমে পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত ও অমিতবেগযুক্ত। য়ুরেনিয়াম বা রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা বা উপরোক্ত বিশিষ্ট ধর্মের রহস্য পরমাণুর গঠনবৈচিত্র্যে নিহিত রহিয়াছে।

পৃথিবীতে সর্বসমেত যে ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে উহাদের উপাদান মোটামুটি তিন রকম—ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত। ইহাকে তড়িদণু বলা চলে, কারণ ইহাদের চলাচলের ফলেই সংবাহক তারে তড়িৎপ্রবাহ চলে। প্রোটন পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত কিন্তু ইলেকট্রন অপেক্ষা অনেক বড় ও ভারী। প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রন কার্যত ভরশূন্য। নিউট্রন সম্পূর্ণরূপে মৌলিক কণিকা নহে। একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সম্মিলনে নিউট্রনের জন্ম, তাই নিউট্রন তড়িৎবিহীন ও প্রায় প্রোটনের সমান ভরযুক্ত। নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিলে প্রোটনে পরিণত হয়। এই তিন প্রকার মৌলিক কণিকা বিভিন্ন সংখ্যায় ও অনুপাতে সম্মিলিত হইয়া বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু গঠন করে। বোহর-রাদারফোর্ড কৃত পরিকল্পনানুসারে পদার্থের পরমাণুর উপাদানগুলি দুই ভাগে রহিয়াছে। সৌর জগতের কেন্দ্রে যেমন প্রচণ্ডকায় সূর্যের অবস্থিতি, পরমাণুর কেন্দ্রেও তেমনি ভারী কণিকা প্রোটন ও নিউট্রনের সমাবেশ। গ্রহবর্গের মত ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্র হইতে অনেকটা দূরে থাকিয়া এক বা ততোধিক কক্ষে কেন্দ্রকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কেন্দ্রে যে কয়েকটি প্রোটন থাকিবে কেন্দ্রের বাহিরেও সেই কয়েকটি ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন থাকিবে। একটা গোটা পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, কাজেই পরমাণুর কোন তড়িৎ-আধান নাই কিন্তু সকল পরমাণু-কেন্দ্রকই কমবেশী পরিমাণে পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। কোন পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনের দুই-একটি বিমুক্ত হইয়া গেলে পরমাণু পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত হয়, পক্ষান্তরে কোন পরমাণুতে আলগা ইলেকট্রন যুক্ত হইলে উহার তড়িৎ আধান হয় নেগেটিভ। পরমাণুর ভরের সবটুকু কেন্দ্র-ঘটিত। সর্বাপেক্ষা হালকা পদার্থ হাইড্রোজেন, উহার গঠন-উপাদানও খুব সাদাসিধা—একটি মাত্র প্রোটন রহিয়াছে কেন্দ্রে—বাহিরে একটি ইলেকট্রন। পরবর্তী গুরুতর পদার্থ হিলিয়াম। ইহার কেন্দ্রে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন, বহিঃস্থ ইলেকট্রন দুইটি মাত্র। হিলিয়াম পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা চার গুণ ভারী; কারণ ভরযুক্ত কণিকা ইহাতে চারটি। কেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রনের সমবেত সংখ্যা দ্বারা পরমাণুর ভর সংখ্যা নির্ণীত হয় এবং বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যাই পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা এবং ইহাই পদার্থের স্ব-স্ব গুণ ও ধর্মের জন্য দায়ী। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ভিন্নধর্মী, কারণ হাইড্রোজেনের পরমাণুতে বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যা এক ও হিলিয়ামে ইহাদের সংখ্যা দুই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পারদ ও স্বর্ণের ধর্মের প্রভেদেরও কারণ অনুরূপ। পারদের পরমাণুতে বহিঃস্থ ইলেকট্রন ৮০টি ও স্বর্ণের পরমাণুতে ৭৯টি। পারদের পরমাণুর বহিঃপ্রদেশ হইতে একটি ইলেকট্রন বিমুক্ত করিয়া দিলে স্বর্ণ পাওয়া যায় না, কারণ বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলি পদার্থের স্ব স্ব গুণ ও ধর্মের হেতু হইলেও উহারা স্বাধীন নহে, কেন্দ্রের প্রোটন সংখ্যা যতক্ষণ স্থির থাকিবে ততক্ষণ পদার্থের ধর্ম অটুট থাকিবে। বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলির ওলটপালট বা কক্ষ হইতে কক্ষান্তর গমনে পদার্থের নানা গুণ প্রকটিত হয়, কিন্তু যতক্ষণ কেন্দ্রের প্রোটন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ পদার্থের রূপান্তর সম্ভব নহে। নানা প্রক্রিয়ায় পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলিকে বিচলিত বা বিমুক্ত করা যায় কিন্তু কেন্দ্রীন প্রোটন-নিউট্রনগুলিকে স্থানচ্যুত করা খুব সহজসাধ্য নয়। পদার্থের সাধারণ গুণাবলী বহিঃস্থ ইলেকট্রনের কার্য্যকারিতার ফল, কিন্তু রেডিয়াম

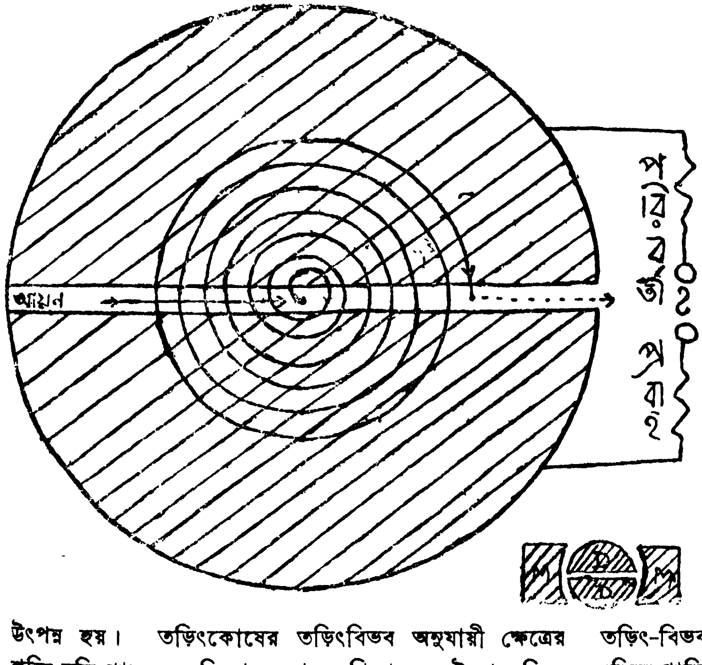
জাতীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য বা তেজস্ক্রিয়তার কারণ রহিয়াছে পরমাণুকেন্দ্রকে। য়ুরেনিয়াম সর্বাপেক্ষা ভারী পদার্থ, উহার কেন্দ্রে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন আছে। কেন্দ্রকের গণ্ডীতে প্রচণ্ড শক্তির ক্ষেত্র রহিয়াছে—তাহারই বলে প্রোটন ও নিউট্রনেরা একত্রিত থাকে—যদিও সমধর্মী প্রোটনগুলির স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী পরস্পরকে বিকর্ষণ করাই উচিত। কেন্দ্রীন আকর্ষণ-শক্তির মূল কথা আজও রহস্যাবৃত। কিন্তু দেখা যায় কেন্দ্রে অধিকসংখ্যক প্রোটন একত্রিত হইলে উহারা স্থায়ী হইয়া থাকিতে চাহে না। ক্রমান্বয়ে একটি একটি বেশী প্রোটন লইয়া ১,২,৩,৪ করিয়া ৯২টি পর্যন্ত প্রোটনে গঠিত ৯২টি পদার্থ আছে কিন্তু ৯২টির বেশীসংখ্যক প্রোটনে তৈয়ারী কোন কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং ৮৪টি বা ততোধিক প্রোটন-বিশিষ্ট কেন্দ্রকে ভাঙন লাগিয়াই আছে, তাই কেন্দ্রক হইতে স্বতই নিয়মিতরূপে কতকগুলি প্রোটন বা নিউট্রনবিমুক্ত ইলেক-ট্রন বহির্গত হইয়া আসে। পরমাণুকেন্দ্রকের এই স্বাভাবিক ভাঙনই রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার হেতু। কেন্দ্রীন প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলি প্রচণ্ড শক্তিবলে একত্রিত থাকে তাই বিমুক্ত হইবার সময়ে উহারা অমিতবেগশালী হয় এবং তড়িৎগ্রস্ত কণিকার এই বেগশক্তিই রেডিয়ামকে তেজস্ক্রিয় করিয়া তুলে। রেডিয়ামের কেন্দ্রক হইতে দুই রকম কণিকা বহির্গত হইতেছে। বিটা-কণিকা অতিবেগযুক্ত একক ইলেকট্রন ও আলফা-কণিকায় থাকে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন—ইহারা শক্তিপ্রাপ্ত হিলি-য়াম-কেন্দ্রক। কেন্দ্রকের এইরূপ প্রোটন-সম্পদ হ্রাসের ফলে রেডিয়াম পরমাণু ভাঙিয়া অন্য পদার্থ তৈয়ারী হইয়া থাকে। য়ুরেনিয়াম প্রমুখ তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি স্তরে স্তরে ভাঙিয়া নূতন নূতন পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে সীসায় পরিণত হইতেছে। পরমাণু-কেন্দ্রকের ভঙ্গপ্রবণতাই রেডিয়ামকে আভিজাত্য প্রদান করিয়াছে।

পরমাণুকেন্দ্রকের গঠন বিষয়ে লক্ষ্য করিলে অনেক জটিল পরমাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, পদার্থের স্ব স্ব ধর্ম নির্ভর করে কেন্দ্রকের প্রোটন সংখ্যার উপর কিন্তু পরমাণুর ভর কেন্দ্রকের প্রোটন নিউট্রনের সমষ্টি অনুযায়ী হইয়া থাকে। সাধারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকে একটি প্রোটন থাকে। যদি ইহাতে একটি নিউট্রন জুড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে যে কেন্দ্রক তৈয়ারী হয় উহার ধর্ম হাইড্রোজেন হইতে অভিন্ন হইবে যদিও উহার ভর সংখ্যা হইবে দুই। এই প্রকার একটি প্রোটনের সঙ্গে দুইটি বা তিনটি নিউট্রন জুড়িয়া দিলেও কেন্দ্রকের ভর বৃদ্ধি পায় কিন্তু উহার ধর্ম বদলায় না যদি উহাতে একটি প্রোটনের বেশী না থাকে। এইরূপ সমধর্মী অথচ বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট পরমাণুর নাম 'আইসোটোপ'। দেখা যাইতেছে কেন্দ্রকে ইচ্ছামত নিউট্রন জুড়িয়া কোন পদার্থের পরমাণুর ভর-বৃদ্ধি করা বা আইসোটোপ তৈয়ারী করা সম্ভব কিন্তু কার্যত দেখা যায় কেন্দ্রীন আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটিত ব্যাপারের জন্য যে কোন সংখ্যক প্রোটন-নিউট্রনের সমবায়ে ঘটিত কেন্দ্রকের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। স্বাভাবিকভাবে হাইড্রোজেনের দুই রকম পরমাণু পাওয়া যায়, হালকা হাইড্রোজেন ও ভারী হাইড্রোজেন। শেষোক্ত কেন্দ্রকে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন—উহার ভর সংখ্যা ২—ইহার নাম ডয়টেরন। লেবরেটরীতে একটি প্রোটন ও দুইটি প্রোটনে নির্মিত তিন ভরসংখ্যা-বিশিষ্ট হাইড্রোজেন কেন্দ্রকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহার নিউট্রন স্বতই একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে। এই কেন্দ্রক হইতে ইলেকট্রন নির্গত হইলে কেন্দ্রে থাকে দুইটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন এবং দুইটি প্রোটনে কেন্দ্রক গঠিত বলিয়া ইহা তিন ভরসংখ্যাবিশিষ্ট হিলিয়াম কেন্দ্রক। এইরূপে প্রোটন সংযোগ বা ইলেকট্রন বিমুক্তির দ্বারা এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পারে।

পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনকে নানা প্রকার সহজ প্রক্রিয়া-লব্ধ শক্তিপ্রয়োগে বিচলিত বা বিমুক্ত করা সম্ভব। তাপ প্রদান করিয়া, আলোক সম্পাত দ্বারা বা রাসায়নিক শক্তির সাহায্যে এই সকল ইলেকট্রনের নানা প্রকার ওলটপালট ঘটাইয়া অথবা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পাঠাইয়া পদার্থের বিভিন্ন গুণের অভিব্যক্তি সম্ভব। এমন কি বহিঃস্থ ইলেকট্রনকে অনেক ক্ষেত্রে পরমাণু-কেন্দ্র হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করাও যাইতে পারে। কোন ধাতব তারকে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এই ইলেকট্রনকে বেগযুক্ত করিয়া পরমাণুকে আঘাত করিলে অনেক সময় বহিঃস্থ সকল ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও কেন্দ্রকটি অবশিষ্ট থাকে। হাল্‌কা ও ভারী হাইড্রোজেনের পরমাণুকে এবম্প্রকারে ইলেকট্রন-বিমুক্ত করিয়া দিলে পাওয়া যাইবে যথাক্রমে প্রোটন ও ডয়টেরন এবং হিলিয়াম পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনদ্বয়কে বিদূরিত করিলে পাওয়া যায় আল্‌ফা-কণিকা। কিন্তু কেন্দ্রকের কোন পরি-বর্তন ঘটান এতাবৎকাল অসাধ্যই ছিল। কেন্দ্রকে বিভিন্ন অংশের আকর্ষণ এত প্রবল যে, সেই বন্ধন ছিন্ন করা মোটে সহজ নয়। কেন্দ্রকের শক্তি-প্রাচীর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সচরাচর কোন কণিকার পক্ষে সম্ভব নহে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে নির্গত আলফা ও কণিকা অমিত বেগশালী বলিয়া কখনও কখনও কেন্দ্রকে প্রবেশ করিয়া সেখানে খানিকটা ওলটপালট ঘটাইয়াছে। কিন্তু আল্‌ফা কণিকা পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত বলিয়া কেন্দ্রকের পজিটিভ তড়িৎ আধান স্বভাবতই উহাকে বিকর্ষণ করে। অতি-মাত্রায় বেগযুক্ত না হইলে উহার পক্ষে কেন্দ্রকের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। রেডিয়াম-সি হইতে যে আলফা-কণিকাগুলি নির্গত হয় উহারাই সবচেয়ে বেশী বেগযুক্ত। উহাদের সাহায্যে রাদারফোর্ড কয়েকটি হালকা কেন্দ্রকের পরিবর্তন ঘটাইয়া-ছিলেন কিন্তু তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলে বিজ্ঞানীর দুরাকাঙ্ক্ষা বাড়াইল মাত্র, কোন কার্যকরী ফল তাহাতে পাওয়া গেল এ কথা বলা যায় না—কারণ রেডিয়াম একান্ত দুর্লভ পদার্থ, পরমাণু ভাঙিবার অস্ত্র হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার সম্ভব নহে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বোথে ও বেকার বেরিলিয়ামের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়ম রাখিয়া দেখিলেন, বেরিলিয়ামের কেন্দ্রক ভাঙিয়া অতি বেগযুক্ত নিউট্রন বাহির হইয়া আসিল। নিউট্রন আবিষ্কা-রের পর কেন্দ্রক ভাঙিবার নূতন অস্ত্র পাওয়া গেল। নিউট্রন তড়িৎবিহীন, সুতরাং বহিঃস্থ ইলেকট্রন বা কেন্দ্রীন প্রোটন কেহই উহাকে প্রতিরোধ করে না, তাই নিউট্রন অনায়াসে পরমাণু-কেন্দ্রক ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে এবং

এই জন্যই আল্‌ফা-কণিকা যেখানে ".০১ সেন্টিমিটারের বেশী আলুমিনিয়াম বা পাতলা এক খণ্ড কাগজ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না সেখানে নিউট্রন সীসার মত ভারী পদার্থেরও কয়েক মিটার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে—কোন কিছুতেই ইহাকে আটকাইতে পারে না। নিউট্রনের সর্বত্র অবাধ গতি। পদার্থের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দৈবাৎ কোন কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষ হইলে কেন্দ্রকের পরিবর্তন অর্থাৎ পদার্থের রূপান্তর ঘটাইতে পারে। আল্‌ফা-কণিকার চেয়ে এই ব্যাপারে নিউট্রন বেশী কার্যকরী হইলেও এই আবিষ্কারেও বিশেষ সুবিধা হইল না। কারণ আল্‌ফা-কণিকা তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে স্বতই নির্গত হয় কিন্তু স্বাভাবিক কোন উপায়েই নিউট্রন পাওয়া যায় না—কেবল মাত্র তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে কেন্দ্রকের বিভাজনেই নিউট্রন-মোচন সম্ভব এবং আঘাতকারী কণিকা যত বেশী বেগযুক্ত হইবে নিউট্রন তত সহজলভ্য হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে আল্‌ফা-কণিকার মত অতিবেগযুক্ত কণিকা-সৃষ্টিই কেন্দ্রক ভাঙিবার একমাত্র উপায়। লরেন্স স্বীয় উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রন যন্ত্রে এইরূপ কণিকা উৎপাদন সম্ভব করিয়া বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। কেন্দ্রককে আঘাত করিবার জন্য আমরা কয়েক প্রকার কণিকা পাইতেছি—প্রোটন, আল্‌ফা-কণিকা ও ডয়টেরন। সাইক্লোট্রন যন্ত্রের কার্য এই কণিকাগুলিকে অমিতবেগশালী করিয়া দেওয়া।

কোন তড়িৎকোষের দুই মেরু পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুইটি ধাতব প্লেটে সংযুক্ত করিলে ঐ প্লেটদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তড়িৎক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। তড়িৎকোষের তড়িৎবিভব অনুযায়ী ক্ষেত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তড়িৎগ্রস্ত কোন কণিকাকে এইরূপ তড়িৎ-ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিলে উহা একটি প্লেটের দিকে আকৃষ্ট হইয়া বেগপ্রাপ্ত হয়। এই বেগের পরিমাণ নির্ভর করে কণিকার তড়িৎ-আধান ও প্লেটের তড়িৎ-বিভবের উপর। এই প্রকারে বেগ-প্রাপ্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে কোন পরমাণুর সংঘর্ষ হইলে সেখান-কার বহিঃস্থ ইলেকট্রন-সমাবেশের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ২.৫ ভোল্ট-বিভবযুক্ত ক্ষেত্রের প্রভাবে বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনকে বলা হয় ২.৫ ভোল্ট-ইলেকট্রন—ইহা সোডিয়ম পরমাণুর বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলির কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রেরণ করিয়া আলোক-রশ্মির জন্ম দিতে পারে। পারদবাষ্প হইতে আলট্রা-ভায়লেট রশ্মি পাইতে হইলে পারদের পরমাণুতে ১০-ভোল্ট-ইলেকট্রনের আঘাত প্রয়োজন। এক্স-রশ্মি উৎপন্ন করিবার জন্য ২০০০০-ভোল্ট ইলেকট্রন দ্বারা কোন ধাতব পদার্থের পরমাণুকে আঘাত করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পরমাণু-কেন্দ্রকের কাছাকাছি কক্ষস্থিত ইলেকট্রন বিচলিত হয়। মোটের উপর আঘাতকারী ইলেকট্রনের ভোল্ট-সম্পদ যত বেশী হইবে উহারা পরমাণুর তত অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবে। কিন্তু এত শক্তিধর ইলেক-ট্রনেরাও কেন্দ্রকে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণ সেলে আমরা ২-৩ ভোল্ট তড়িৎ-বিভব পাইয়া থাকি। ডায়নামো হইতে আলো জ্বালিবার বা পাখা চালাইবার জন্য যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তাহার বিভব ১১০-২২০ ভোল্ট। আবেশ-কুণ্ডলী হইতে প্রাপ্ত এক্স-রশ্মির জন্য ব্যবহৃত তড়িতের বিভব ২০০০০ ভোল্ট হইতে পারে। পরমাণু-কেন্দ্রকে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবার জন্য লক্ষ বা কোটি ভোল্টের কণিকা দরকার। কিন্তু সোজাসুজি কোটি ভোল্ট উৎপন্ন করার কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। লরেন্স ভারী সুন্দর উপায়ে তাঁহার সাইক্লোট্রন যন্ত্রে স্তরে স্তরে তড়িৎগ্রস্ত কণিকা বা আয়নকে পরোক্ষভাবে কোটি ভোল্ট-সম্পদযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।



তড়িৎগ্রস্ত একটি কণিকাকে তড়িৎক্ষেত্রে রাখিয়া দিলে সে বেগপ্রাপ্ত হয় আবার বেগসম্পন্ন কণিকা চৌম্বক ক্ষেত্রে (অর্থাৎ চুম্বকের দুই মেরুর প্রভাবাধীনে) পতিত হইলে উহা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে। সাইক্লোট্রন যন্ত্রে তড়িৎগ্রস্ত কণিকাকে উপযুক্ত সময়ে হঠাৎ একবার তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে ফেলিয়া বেগযুক্ত করা হয় ও অতঃপর চৌম্বক ক্ষেত্রের কার্য্য কারিতায় চক্রাকারে ঘুরাইয়া আবার তড়িৎক্ষেত্রে আনয়ন করা হয়। যন্ত্রটির মূল তথ্য খুব জটিল নয়। দুইটি অর্ধবৃত্তাকার (ইংরেজী D অক্ষরের মত) ধাতু নির্মিত ফাঁপা বাক্সের মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁক রাখিয়া উহাদিগকে দশ সহস্র ভোল্ট বিভবের পার্থক্যে রাখা হয়। ফলে বাক্স দুইটির মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় তড়িৎক্ষেত্র সৃষ্টি হইবে—সেখানে প্রোটন বা ডয়টেরনকে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা দশ সহস্র ভোল্ট সম্পদযুক্ত হইবে এবং প্রচণ্ড বেগে নেগেটিভ তড়িৎ-বিভবযুক্ত বাক্সের অভ্যন্তরে নীত হইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে থাকিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে ফাঁপা বলিয়া বাক্সের অভ্যন্তরে তড়িৎক্ষেত্র নাই এবং বাক্স দুইটি আবার শক্তিশালী অতিকায় তড়িৎ-চুম্বকের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। বেগযুক্ত প্রোটন (বা ডয়টেরন) চুম্বকের প্রভাবে বাক্সের এক প্রান্ত হইতে ঘুরিয়া অন্য প্রান্তে পৌঁছাইয়া পুনরায়

মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে উপনীত হইবে এবং তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে পড়িবে কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাক্স দুইটির তড়িৎ-বিভব উণ্টাইয়া দেওয়া হইল অর্থাৎ পূর্বে যেটি পজিটিভ তড়িৎযুক্ত ছিল এবার সেইটি নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত হইবে। প্রোটন প্রথমে নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত বাক্সের ভিতরে ঘুরিতেছিল—বাক্স হইতে বাহির হইবামাত্রই উহার সম্মুখীন বাক্সটি নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং পুনরায় অনুকূল তড়িৎক্ষেত্রে পড়িয়া নূতনতর আকর্ষণে দ্বিগুণিত বেগে উহার দ্বিতীয় বাক্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে ও বৃহত্তর চক্রপথে ঘুরিতে থাকিবে। এইরূপে প্রতি বারেই যখনই প্রোটন দুই বাক্সের মধ্যবর্তী স্থানে আসে তখনই উহা সাময়িকভাবে দশ সহস্র ভোণ্ট বিভবযুক্ত তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে পড়ে, ফলে ক্রমান্বয়ে চক্রাকারে ঘূর্ণনকালে প্রতি বাক্সে প্রবেশ করিবার সময়েই উহার বেগশক্তি বা ভোণ্ট-সম্পদ ধাপে ধাপে বর্ধিত হয়। পরবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে প্রোটন কেন্দ্রস্থলে আসিবামাত্রই বাক্সের তড়িৎ-বিভব ক্রমাগত উণ্টাইয়া দেওয়া হইতেছে। মোটামুটি হিসাবে এক চক্র ঘুরিয়া আসিলেই প্রোটনের ভোণ্ট-সম্পদ বা বেগ দ্বিগুণ, দুই চক্র ঘুরিবার পর চার গুণ, তিন চক্র ঘুরিলে ছয় গুণ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যে বৃত্তে ঘুরিতেছে উহার ব্যাসও বাড়িয়া যাইতেছে —অবশেষে বাক্সের বহিঃপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেই প্রচণ্ড শক্তিধর এই কণিকাকে অন্য তড়িৎ-ক্ষেত্রের সাহায্যে বাক্সের বাহিরে আনিয়া পরমাণুকেন্দ্রক ভাঙিবার কার্যে ব্যবহার করা হইবে।

বিস্ময়ের কথা এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য পরমাণুকে ভাঙিতে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার আকৃতি বিরাট্—এ যেন 'মশা মারিতে কামান দাগান'র চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার। লরেন্স নির্মিত দ্বিতীয় সাইক্লোট্রন যন্ত্রটির চুম্বকের মেরুদ্বয় ৪৫ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত। এই তড়িৎ-চুম্বকে ব্যবহৃত লৌহের ওজন ৬৫ টন অর্থাৎ ১৮০০ মণের কাছাকাছি, ও তামার তারের কুণ্ডলীর ওজন ৯ টন অথবা প্রায় ২৫০ মণ। পরবর্তী কালে লরেন্স তাঁহার কার্যস্থল ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলিতে আরও একটি সাইক্লোট্রন নির্মাণ করিয়াছেন তাহার বাক্স দুইটির ব্যাস ৬০ ইঞ্চি ও চুম্বকের ওজন ১০০ টনেরও অধিক। ছোটখাট একটি সাইক্লোট্রন যন্ত্র নির্মাণের প্রাথমিক খরচ দুই লক্ষ টাকা যুদ্ধের (পূর্ববর্তীকালের হিসাবে) এবং ঐ যন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে সেজন্যও অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা পুঁজি দরকার।

সাইক্লোট্রনের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু ভাঙা হইয়াছে। সাইক্লোট্রন হইতে যে প্রচণ্ড শক্তিধর প্রোটন, ডয়টেরন, নিউট্রন বা আলফা-কণিকা পাওয়া যায় তাহাদিগকে বহু সংখ্যায় কোন পদার্থের দিকে নিক্ষেপ করিতে হইবে। বেশীর ভাগই হয়ত বৃথা যাইবে এবং অল্প কয়েকটির হয়ত কোন না কোন পরমাণু-কেন্দ্রকের সহিত সংঘর্ষ হইবে এবং তাহারই ফলে কেন্দ্রকের রূপান্তর ঘটিবে। ঐ রূপান্তরকে মোটামুটি ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

…থমত, নিউট্রনের আঘাতে য়ুরেনিয়াম জাতীয় ভারী …ক ভাঙিয়া দুই টুকরা করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রক …তৎসহ প্রচুর তেজ উৎপাদন করা সম্ভব।

$$_{92}Ur + {_0n^1} \rightarrow {_{56}Ba} + {_{36}Kr} + {_0n^1}$$

য়ুরেনিয়াম + নিউট্রন → বেরিয়ম + ক্রীপটন + নিউট্রন

২৩৮-ভর সংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ৯২ + নিউট্রন ১৪৬) য়ুরেনিয়াম নিউট্রনের আঘাতে দুই ভাগ হইয়া বেরিয়াম (৫৬টি প্রোটনবিশিষ্ট) ও ক্রীপটন (৩৬টি প্রোটনবিশিষ্ট) কেন্দ্রকে পরিণত হইল ও তৎসহ কুড়ি কোটি ইলেকট্রন-ভোণ্ট পরিমিত তেজ বিমুক্ত হইল। নিউট্রন কেন্দ্রককে দুই টুকরা করিয়া দিয়া আবার বাহির হইয়া গেল। তেজবিমোচনের ফলে নূতন কেন্দ্রকদ্বয় প্রচণ্ড বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছুটিল।

দ্বিতীয়ত, প্রোটন, ডয়টেরন বা আলফা-কণিকা কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে উহার সঙ্গে মিলিত হইয়া নূতন কেন্দ্রক গঠন করে এবং অনাবশ্যক বা বাড়তি দুই-একটি কণিকাকে কেন্দ্রকের বাঁধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়।

[ক]

$$_4Be^9 + + {_2He^4} \rightarrow {_6C^{12}} + {_0n^1}$$

বেরিলিয়াম + আল্ফা-কণা → কারবণ + নিউট্রন

[$_4Be^9$ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে বেরিলিয়ামে মোট ৯টি প্রোটন-নিউট্রন তন্মধ্যে ৪টি প্রোটন] ৯-ভর সংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ৪ + নিউট্রন ৫) বেরিলিয়াম কেন্দ্রকে আল্ফা-কণিকা (প্রোটন ২ + নিউট্রন ২) মিলিত হইলে মোট ৬টি প্রোটন ও ৭টি নিউট্রনের মধ্যে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন একত্রিত হইয়া ১২-ভরসংখ্যাবিশিষ্ট কারবন কেন্দ্রক নির্মাণ করে ও একটি নিউট্রন মুক্ত হইয়া যায়। এই স্থলে বেরিলিয়াম কারবনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

[খ]

$$_6C^{12} + {_1H^2} \rightarrow {_6C^{13}} + {_1H^1}$$

করিবন + ডয়টেরন → ভারী কারবন + প্রোটন

১২-ভরযুক্ত-সংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ৬ + নিউট্রন ৬) কারবন কেন্দ্রকের সঙ্গে ডয়টেরন (প্রোটন ১ + নিউট্রন ১) সংযুক্ত হইলে মোট ৭টি প্রোটন ও ৭টি নিউট্রনের মধ্যে ৬টি প্রোটন ও ৭টি নিউট্রন মিলিত হইয়া ১৩-ভর-সংখ্যাবিশিষ্ট ভারী কারবন কেন্দ্রক গঠন করে ও একটি প্রোটনকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

[গ]

$$_5B^{11} + {_1H^1} \rightarrow {_4Be^8} + {_2He^4}$$

বোরন + প্রোটন → বেরিলিয়ম + আল্ফা কণিকা

১১-ভরসংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ৫ + নিউট্রন ৬) বোরন কেন্দ্রকে একটি প্রোটন আসিয়া জুটিলে ৮-ভর-সংখ্যা বিশিষ্ট (প্রোটন ৪ + নিউট্রন ৪) হালকা বেরিলিয়াম কেন্দ্রক গঠিত হয় ও বাকী ২টি প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হইয়া হিলিয়াম কেন্দ্রক বা আলফা-কণিকা উৎপন্ন করে। এই স্থলে বোরন হইতে বেরিলিয়াম পাওয়া গেল। [ক] ও [খ] চিহ্নিত রূপান্তরের সঙ্গে এই রূপান্তরের কিছু পার্থক্য আছে। [ক] ও [খ] উভয় ক্ষেত্রেই হালকা কেন্দ্রক ভারী কেন্দ্রকে পরিণত হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভারী কেন্দ্রক হালকা কেন্দ্রকে

পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথম দুইটিতে পরিবর্তনটা সংযোগ-ঘটিত কিন্তু শেষেরটিতে রূপান্তর বিয়োগজনিত। তৃতীয় শ্রেণীর রূপান্তর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। এই স্থলে প্রোটন, ডয়টেরন বা নিউট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কেন্দ্রকে যে ওলটপালট ঘটে তাহাতে প্রোটন-নিউট্রনের যে সংখ্যা ও অনুপাত হয় তাহাদের স্থায়ী মিলন সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপান্তরের মত এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রক হইতে প্রোটন বা নিউট্রন বহির্গত হওয়ার পরেও আবার নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং প্রোটনে পরিবর্তিত হয় এবং ইহারই ফলে রেডিয়াম-কেন্দ্রকের ইলেকট্রন ত্যাগের মতই বেগযুক্ত ইলেকট্রন ও গামা-রশ্মি কেন্দ্রক হইতে নির্গত হয়।

$_{11}Na^{23}$ + $_{1}H^{2}$ → $_{11}Na^{24}$ + $_{1}H^{1}$
সোডিয়াম + ডয়টেরন → রেডিও-সোডিয়ম + প্রোটন
$_{11}Na^{24}$ → $_{12}Mg^{24}$ + Beta particle
রেডিও সোডিয়াম → ম্যাগনেসিয়াম+ বিটা কণিকা
$_{12}Mg^{24}$ → $_{12}Mg^{24}$ + Gama Rays
ম্যাগনেসিয়ম → ম্যাগনেসিয়ম+ গামা রশ্মি।

২৩-ভরসংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ১১+নিউট্রন ১২) সোডিয়াম-কেন্দ্রকে ডয়টেরন (প্রোটন ১+নিউট্রন ১) সংযুক্ত হইলে একটি প্রোটন বিমুক্ত হইয়া ২৪-ভর সংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ১১+নিউট্রন ১৩) সোডিয়াম পরমাণু উৎপন্ন হইল কিন্তু এই প্রকার কেন্দ্রকের স্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই—ইহা বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম সৃষ্টি। এই কৃত্রিম কেন্দ্রক টিকিয়া থাকিতে পারে না, তাই একটি নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া প্রোটনে রূপান্তরিত হয় এবং ২৪-ভর সংখ্যাবিশিষ্ট (প্রোটন ১২+নিউট্রন ১২) ম্যাগনেসিয়ামে পরিণত হয়। এই ইলেকট্রন কেন্দ্রক-বিমুক্ত বলিয়া অমিতবেগশালী। উৎপন্ন ম্যাগনেসিয়াম তেজযুক্ত, তাই কিছুকাল গামা-রশ্মি প্রদান করে এবং তৎপর তেজহীন হইয়া সাধারণ ম্যাগনেসিয়ামের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই পরিবর্তন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য সত্যই যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। ডয়টেরনের আঘাতে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়মে পরিণত হইল কিন্তু এই পরিবর্তনের পথে সোডিয়াম কিছু সময় রেডিয়ামের ন্যায় তেজস্ক্রিয়তা প্রদর্শন করিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার মূলে রহিয়াছে কেন্দ্রক হইতে শক্তিধর কণিকার বহিষ্করণ। অনুরূপ ক্রিয়া এই সোডিয়াম হইতেও পাওয়া যাইতেছে। এই সোডিয়ামের নাম দেওয়া হইয়াছে রেডিও-সোডিয়াম। মোটা কথায় বিজ্ঞানীর লেবরেটরীতে কৃত্রিম-'রেডিয়াম' তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে। শুধু সোডিয়াম কেন, অন্যান্য পদার্থকেও এমনি করিয়া তেজস্ক্রিয় করা হইতেছে। রেডিয়াম জাতীয় গোটা কয়েক দুর্লভ পদার্থের যে গুণ ছিল সাইক্লোট্রনের প্রসাদে সেই গুণাবলী অনেকানেক পদার্থে আরোপ করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, এই আবিষ্কারের ফলে বহুমূল্য রেডিয়ামের কার্য স্বল্পব্যয়ে সোডিয়াম দ্বারা নির্বাহ হইবে। এক দিনের মধ্যে এক শত টাকা ব্যয়ে অর্ধ গ্রাম পরিমিত রেডিও-সোডিয়াম সাইক্লোট্রন যন্ত্রে তৈয়ারী করা সম্ভব। পক্ষান্তরে অর্ধ গ্রাম রেডিয়ামের মূল্য ৫০ হাজার টাকার কম নয়। কিন্তু এক গ্রাম রেডিয়াম কিনিয়া উহা যদি দুই হাজার বৎসর ব্যবহার করা যায়, এক গ্রাম রেডিও-সোডিয়াম এক দিনের মধ্যেই সকল তেজস্ক্রিয়তা হারাইয়া ম্যাগনেসিয়ামে পরিণত হইবে। রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা দুই হাজার বৎসরে অর্দ্ধেকে পরিণত হয় কিন্তু রেডিও-সোডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা অর্ধেক হইতে লাগে পনর-ষোল ঘণ্টা মাত্র। রেডিও-সোডিয়াম তাই সদ্য তৈয়ারী করিয়াই ব্যবহার করিতে হইবে, দেশ-দেশান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং রেডিও-সোডিয়াম জাতীয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারে রেডিয়ামের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই।

সাইক্লোট্রন যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামত এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় বটে, কিন্তু ইহা হইতে একথা মনে করিলে চলিবে না যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে যথেচ্ছা লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা যাইবে। সাইক্লোট্রন দ্বারা পদার্থের রূপান্তর সম্ভব বটে, কিন্তু কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির মত উৎপাদনের হার ব্যাপক বা প্রভূত নহে। খুবই স্বল্প পরিমাণে অন্য কোন নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা গেলেও তাহাতে যে ব্যয় হইবে সোনার দাম তার চেয়ে অনেক কম।

এক্ষণে স্বতই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সাইক্লোট্রন যন্ত্র যে দুইটি কার্য করিতেছে—পরমাণুর রূপান্তর ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন—যদি ইহাদের কোনটারই কোন ব্যবহারিক সার্থকতা না থাকে তবে বিজ্ঞানীর কৌতূহল চরিতার্থ করা ভিন্ন সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের আর কোন সার্থকতা আছে? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, সাইক্লোট্রনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র রহিয়াছে অন্যত্র। এই আবিষ্কারের পরে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও শারীর-বৃত্তের একটা নূতন শাখার উদ্ভব হইয়াছে। এখন জীব-দেহে কোন্ দ্রব্য কোথায় কিরূপে কার্য করে তৎসম্বন্ধে গবেষণা সম্ভব হইতেছে। দেহাভ্যন্তরে পদার্থের ক্রিয়া অনুধাবন করিবার নূতন সূত্র পাওয়া যাইতেছে। মনে করা যাক, এক ব্যক্তিকে খানিকটা সোডিয়াম-ঘটিত পদার্থ খাওয়ান হইল। দেহযন্ত্রে প্রবেশ করিয়া সোডিয়াম বেলাভূমিতে বালুকাকণা নিক্ষেপের মতই নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। দেহের কোন অংশে কতটুকু গেল বা কোথায় মোটে গেল না, তাহার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। যদি ঐ সঙ্গে খানিকটা রেডিও-সোডিয়াম খাওয়ান যায় তবে দেহের যেখানেই যত স্বল্পমাত্রাতেই থাক না কেন স্বীয় তেজস্ক্রিয়তার গুণে প্রত্যেকটি পরমাণু যন্ত্রে আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবে। এই প্রকারে ইহার দেহাভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার যথাযথ তথ্য জানা যাইবে। রেডিও-ফসফরাস প্রয়োগে জানা গিয়াছে কঠিন হাড়ের উপাদান ধাতব পদার্থগুলিও নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে। পরমাণুকে এইরূপে চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইবার পর দেহের ভিতরে খাদ্যদ্রব্য বা ভেষজের ক্রিয়া বা বিভিন্ন পদার্থ কিরূপে দেহোপাদান গঠন করে এই সকল বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য জানা যাইতেছে। শিরায়-উপশিরায়, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে অস্থি-মাংসে যেসকল সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম গোপন ক্রিয়া চলিতেছে লোকলোচনের অন্তরালে তাহা এখন আর রহস্যাবৃত থাকিতেছে না। রেডিয়াম প্রয়োগ

দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ নিরাময় হয় কিন্তু দেহাভ্যন্তরে ক্যানসার হইলে রেডিয়াম চিকিৎসা সম্ভব নয়, কারণ রেডিয়াম দেহের ভিতরে অবস্থিতি করিলে ক্রমাগত রশ্মিবিকীরণ দ্বারা দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়া তুলিত এবং রোগীর মৃত্যু ঘটিত—ক্যানসার রোগে নয় ঔষধের গুণে। এই রকম স্থলে রেডিও-সোডিয়াম দ্বারা চিকিৎসা চলিতে পারে। কিছু কালের জন্য উহা তেজ-বিকীরণ করিয়া রোগের ঔষধরূপে কার্য করিবে এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই ম্যাগনেসিয়াম হইয়া শরীরের ভিতরেই থাকিবে। কিন্তু তাহাতে দেহের কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ ম্যাগনেসিয়াম শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। এই সকল ব্যবহারাবলী লক্ষ্য করিলে একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে সাইক্লোট্রনের দানে অনাগত কালে চিকিৎসা-জগতে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিবে।

এই প্রসঙ্গে নিউট্রনের কার্যকারিতার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাইক্লোট্রন যন্ত্রে পরমাণু ভাঙিবার সময়ে নানা রকমে প্রচুর পরিমাণে নিউট্রন নির্গত হয়। নিউট্রন অনেক স্থলে এক্স-রশ্মির ন্যায় কার্য করে। ক্যানসার প্রভৃতি রোগে এক্স-রশ্মি ও গামা-রশ্মি প্রয়োগে চিকিৎসা করা হয়। দেহ-কোষের উপর নিউট্রনের ক্রিয়াও প্রায় অনুরূপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী। এতদ্বিষয়ে প্রচুর গবেষণার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে। নিউট্রনের একটি অদ্ভুত গুণ রহিয়াছে। এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্মির অনিষ্টকর ক্রিয়া হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে হইলে সীসার বর্মের আশ্রয় লইতে হয় এবং এই জন্যই রেডিয়াম সীসা-নির্মিত শিশিতে রাখা হয়। সীসাকে ভেদ করিয়া রেডিয়াম-বিকীরিত রশ্মি বেশী দূরে যাইতে পারে না। কিন্তু সীসা বা অনুরূপ ভারী পদার্থের আবরণে নিউট্রনকে আটকান যায় না, পরন্তু নিউট্রনকে আটকাইতে হইলে হাইড্রোজেনের ন্যায় হাল্কা পদার্থে গঠিত আবরণের (জল বা প্যারাফিন) আবশ্যক হয়। নিউট্রন তড়িৎবিহীন হাল্কা ও প্রচণ্ডবেগযুক্ত বলিয়াই ইহার এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এবং এই গুণের জন্যই ইহা দেহকোষের হাইড্রোজেনের উপর ক্রিয়া করে।

লরেন্স কর্তৃক সাইক্লোট্রন উদ্ভাবিত হইবার পর সারা পৃথিবীতে এই বিষয়ে তৎপরতা জাগ্রত হইয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাইক্লোট্রন নির্মিত হইয়াছে। যদিও অনগ্রসর তবুও ভারতবর্ষ এতদ্বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার তত্ত্বাবধানে একটি সাইক্লোট্রন নির্মিত হইতেছে। ইহাই হইবে ভারতবর্ষের প্রথম সাইক্লোট্রন।

"ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য"

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বাতাসী বিধাতার এক বীভৎস, বিকৃত সৃষ্টি।

মাথায় তার শণের নুড়োর মতো এক মাথা রুখু চুল, কোটরগত চোখ দুটো থেকে সারাক্ষণ যেন একটা তীব্র জ্বালা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেহের পানে তাকালে মনে হয় যেন একটা বাজে-পোড়া তালগাছ, মুখ দিয়ে সব সময় গড়াচ্ছে লাল। চেহারায় নারীসুলভ কোমলতার লেশমাত্রও নেই। মুখের প্রতিটি রেখায় প্রকৃতিগত কঠোরতার অভিব্যক্তি। বিধাতা যেন পুরুষ গড়তে গিয়ে ভুল করে এক অসতর্ক মুহূর্তে সৃষ্টি করেছেন এই কুরূপা রমণীকে। বাতাসী পথ চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। রাস্তায় বেরুল তো অমনি ছেলের পাল নিল তার পিছু। কেউ মুখ ভ্যাংচায়, কেউ ঢিল ছোড়ে, কেউ বা গ্রাম্য শিশু-কবির রচিত ছড়া কাটতে সুরু করে। বাতাসী একেবারে তেরিয়া হয়ে তেড়ে আসে, বাজখাঁই গলায় সুরু করে গালি-গালাজ।

বাতাসীর তিন কুলে কেউ নেই। বাপ মা দু'জনেই মারা গেছে বহুদিন। বাপ বেঁচে থাকতে তার বিয়ের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাত্র জোটাতে পারে নি। প্রেতিনীর মত বিকট আকৃতি এই মেয়েটাকে নিয়ে ঘর করতে কেউই নাকি রাজি

হয় ...

...প্রান্তে রূপমতী নদীতীরে তরুচ্ছায়া-প্রচ্ছন্ন কুটীরটিতে ...াস করে, শূন্য পুরীতে প্রেতলোকের অধিবাসিনীর ...মের লোকদের বাড়ীতে টুকিটাকি কাজকর্ম করে দেয়, তাতে দু-চার পয়সা রোজগার হয়। তা' ছাড়া ভিক্ষে-শিক্ষে করে একটা পেট টায়টোয় চালিয়ে নেয়।

রূপমতীর তীরে বাতাসীর বাঁশ-বনে ঘেরা ছায়া-নিভৃত কুটীরটি জীর্ণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। ঘরের চাল বেয়ে লাউ-কুমড়ো লতিয়ে উঠেছে, দাওয়াটি সযত্নে নিকানো-পুছানো। তক্তকে ঝক্‌ঝকে আঙিনার একধারে তুলসীমঞ্চ।

বাতাসীর কুটীরের অনতিদূরেই গ্রামের উত্তর প্রান্ত-সীমা দিয়ে বয়ে চলেছে রূপমতী নদী। নদীর ওপারে সবুজ ঘাসে-ঢাকা অবারিত প্রান্তরের মাঝখানে কালের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি অভ্রভেদী দেউল।

ঋতুতে ঋতুতে নব-নব রূপ-বৈচিত্র্যে রূপমতী গ্রামবাসীদের মন ভোলায়। বর্ষায় ওপারের দিগন্তপ্রসারী মাঠ জলে প্লাবিত হয়ে যায়, চারদিকে থৈ থৈ করে অনন্ত জলরাশি। বর্ষার অবসানে হাওরের জল যায় মরে', ওপারে জেগে ওঠে বর্ষাজলধারা-পুষ্ট মরকতশ্যাম তৃণাচ্ছাদিত বিরাট্ প্রান্তর। আবার অগ্রহায়ণ মাসে নদী-পরপারে দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন হলুদ বরণ সরষে ফুলে ছেয়ে যায় তখন মনে হয়, প্রকৃতি যেন সবুজ বসন পরিত্যাগ করে হলদে রঙের ফুল-কাটা শাড়ীখানা পরে বিশ্বভুবন আলো করে বসেছেন।

রূপমতীর সঙ্গে যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের নাড়ীর যোগ। প্রতিদিন গোধূলির আলো যখন নদীর বুকে মায়া-জাল বিস্তার করে তখন তার তীরে গিয়ে বসি।

সূর্য্য অস্ত গেছে বহুক্ষণ। নদীতীরে বসে বসে দেখছি পশ্চিম দিকে সুদূর দিগন্ত-লীন নীলাভ গ্রামতরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে পুঞ্জীকৃত মেঘমালার অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য। পাশে আছে বন্ধু নীরেন। দু'জনেই বসে আছি চুপচাপ। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নিঃসীম প্রান্তর আর নিভৃত নদীতীরে ঘনিয়ে আসছে। বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় অনুরঞ্জিত মেঘখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে আকাশের গায় মিলিয়ে গেল। শুধু পশ্চিম দিগন্তে লেগে রয়েছে অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড লাল মেঘ। অভিসারিকা সন্ধ্যার ললাটে যেন সিন্দুরের টিপ পরানো।

তন্ময় হয়ে সন্ধ্যার এই অপরূপ শান্তশ্রী উপভোগ করছিলাম।

"বাবা", "বাবা"—হঠাৎ কার কাংস্য-কণ্ঠের সুতীব্র চীৎকারে চমক ভাঙল। চেয়ে দেখি হন্ত-দন্ত হয়ে নদীর পানে ছুটে আসছে বাতাসী। তীরে এসে নদীর দিকে চেয়ে 'বাবা' 'বাবা' ব'লে সে কি প্রচণ্ড আহ্বান!

এই বীভৎসদর্শনা নারীর আকস্মিক অভ্যাগমে আর তার কাংস্যকণ্ঠের চীৎকারে সান্ধ্য-শ্রী মনের ওপর যে মোহ-জাল বিস্তার করেছিল তা যেন এক নিমিষে টুটে গেল। বিরক্ত হলাম, কিন্তু মনে কৌতূহলও জাগল। বাতাসীর এ আচরণের অর্থ কি? রূপমতীর অগাধ জলতল থেকে তার দীর্ঘকাল লোকান্তরিত পিতার পুনরুত্থান যে সম্পূর্ণই অসম্ভব। না তার ধারণা যে মৃত্যুর পরে তার পিতা কোন জলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। তবে কি অভাবের জ্বালায় আর মানুষের দুর্ব্যবহারে বাতাসীর মাথাটা একেবারেই বিগড়ে গেছে!

ভেবে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। হঠাৎ নীরেন বললে, "তুমি তো কয়দিন এদিকে আস নি, মাখন, তাই বাতাসীর বাবামশায়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় নি। ঐ দেখ, তিনি আসছেন।"—বলে নদীর পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। চেয়ে দেখি প্যাঁক প্যাঁক করে ঘাটের পানে এগিয়ে আসছে একটা হাঁস। তীরে এসে হাঁসটা ঘাড় উঁচিয়ে তুলকি চালে হেলেদুলে চলতে থাকে। নেংচাতে নেংচাতে তার কাছে গিয়ে বাতাসী তাকে বুকে জাপটে ধরে। তার পর 'বাবা' 'বাবা' বলে কত আদরের ডাক, কত সোহাগ-বাণী।

একটা মাটির কটোরাতে কিছু ধান ভিজিয়ে নিয়ে এসেছে বাতাসী। আদর-সোহাগের পালা সাঙ্গ হলে পর হাঁসের মুখটা খুরিতে গুঁজে ধরে। উদর-ভরণে পরিতুষ্ট হাঁসটা ডানা ঝটপট করে তারস্বরে 'প্যাঁক্ প্যাঁক্' করতে করতে ধান খেতে প্রবল আপত্তি জানায়। তখন মা যেমন ক'রে অবাধ্য সন্তানকে শাসন করে তেমনি করির বাতাসী তাকে চোখ রাঙিয়ে শাসায়।

"একটা মজা দেখবে, মাখন!"—বলেই নীরেন আচমকা হাঁসটাকে ছোঁ মেরে কেড়ে নেবার উপক্রম করে। তখন 'বাবারে মাইরা ফালাইল রে' বলে বাতাসীর সে কি গগন-ভেদী আর্ত-চীৎকার। সেই সুতীব্র চীৎকার-ধ্বনি যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত নৈশ নৈঃশব্দ্যকে খান্ খান্ করে চিরে ফেলতে থাকে। হিংস্র শিকারীর হাত থেকে শাবককে রক্ষা করবার জন্যে পক্ষীমাতা যেমন করে তার পক্ষপুট বিস্তার করে, তেমনি করে বাতাসী প্রসারিত বাহু দুটি দিয়ে হাঁসটাকে নিবিড়ভাবে বুকের ভিতর চেপে ধরে খোঁড়া পা নিয়ে মরিয়া হয়ে কুটীরের পানে ছুট দেয়।

ঘটনাটা মনের ওপর রেখাপাত করে। বাড়ী ফেরবার পথে নীরবেই পথ চলি। নীরবতা ভঙ্গ করে নীরেন বলে, "বাতাসীর মাথাটা শেষটায় বাস্তবিকই বিগড়াল, মাখন! কোথা থেকে জানিনে এই হাঁসটাকে যোগাড় করেছে। দিনরাত ওটাকে নিয়েই আছে। এই হাঁসই ওকে পাগল করেছে।"

নীরেনের কথার কোনো জবাব দিই না। কিন্তু, মানুষের মাথায় কত বিচিত্র খেয়ালই যে চাপে মনে মনে তাই ভাবি।

রোজই নদীর ঘাটে বাতাসী আর তার হাঁসটাকে দেখতে পাই। হাঁসটা দেখতে কিন্তু চমৎকার—একেবারে শিউলি ফুলের মত শাদা। আর তার ঠোঁট আর পায়ের রং ঠিক শিউলি ফুলের বোঁটার মত। বাতাসীর যত্ন-আত্তিতে তার যা শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে দিন দিন তাতে মাংসাশীদের লোভ হবার কথা। মনে মনে হাঁসটা কেনবার মতলব স্থির ক'রে ফেলি। না হয় তাকে দাম হিসেবে পুরোপুরি একটা টাকাই দিয়ে দেব। টাকা একটা পেলে বেচারী নিশ্চয় খুবই খুশী হবে, দু-চার দিন একটু ভালো করে খেতে-টেতেও পারবে।

সন্ধ্যার অনতিপরে বাতাসীর কুটীরে গিয়ে হাজির হই। ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। মৃদু নৈশ বাতাসে কুটীর-সংলগ্ন বেণুবন মর্ম্মরায়মান। জ্যোৎস্নালোকিত প্রাঙ্গণের এখানে-সেখানে বাঁশ-ঝাড়ের কালো ছায়া পড়ে আলো-ছায়ার এক বিচিত্র মায়া সৃষ্টি করেছে। উঠানের মাঝখানে হাঁসটাকে কোলে করে চুপ করে বসে আছে বাতাসী। হাঁসটা বাতাসীর বুকে মুখ গুঁজে তার সোহাগ উপভোগ করছে। শুভ্র, মসৃণ পালকগুলি তার জ্যোৎস্নায় চক্‌চক্ করছে।

তার কুটীরে আমার উপস্থিতিটা সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, তাই বাতাসী একেবারে চমকে ওঠে। তারপর আমার আসল উদ্দেশ্যটা যখন প্রকাশ করি তখন সে হাঁসটাকে বুকের আঁচল দিয়ে ঢেকে, একেবারে তেরিয়া হয়ে ওঠে; গলা সপ্তমে চড়িয়ে শাপমণ্যি দিতে থাকে। হঠাৎ স্বর নামিয়ে ছল ছল চোখে আমার পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—"তোমার মিণ্টুরে তুমি কত পাইলে বেচবায় বাবু।"

বাতাসীর কথাগুলো আমার হৃদয়ের বড় কোমল স্থানে আঘাত করল, মিণ্টু আমার একমাত্র সন্তান।

হঠাৎ যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। বাতাসীর স্নেহবুভুক্ষু মাতৃ-হৃদয়ের ছবিটি আমার চোখের সুমুখে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করি রসনা-পরিতৃপ্তির উপাদেয় উপকরণ হিসেবে যে-জীবটির ওপর আমার লোলুপ-দৃষ্টি পড়েছে, সেটি তার কৃতকতনয়। নিজের অন্তরের অপরিসীম শূন্যতাকে ভুলবার জন্যে মায়ের মত স্নেহে-যত্নে সেটিকে সে প্রতিপালন করছে।

অনুতপ্তচিত্তে বাঁশবনের ভেতরকার সুঁড়ি পথ দিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসি।

পরদিন নদীতীরে বাতাসীকে যখন দেখলাম তখন আর

মন বিরূপ হয়ে উঠল না। গোধূলির ধূসর আলোয় চরাচর হয়ে উঠেছে অপরূপ, মায়াময়। গরুর পিঠে ধানের আঁটি বোঝাই করে চাষীরা ফিরে চলেছে নিজ নিজ ঘরে। পাকা ধানের সুগন্ধে চারি দিক আমোদিত। পল্লবঘন তরুশাখায় সুরু হয়েছে নীড়-প্রত্যাগত পাখীদের কাকলি। নদীতীরে বসে আছে বাতাসী, ব্যগ্র উৎসুক স্নেহব্যাকুল তুটি চোখের দৃষ্টি নদী-জলে সন্তরণ-শীল, নীড়-প্রত্যাশী হংসটির পানে নিবদ্ধ। আজ মনে হ'ল বাতাসীর প্রতীক্ষমান মূর্তিটি এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর যেন আরো একটুখানি মাধুরী মাখিয়ে দিয়েছে। শুধু বাহিরটা দেখে মানুষের ওপর আমরা কতই না অবিচার করি! আমাদের চোখের দেখার মধ্যে কত ভুল, কত ত্রুটি, কত অসম্পূর্ণতা। মানুষের মনের ভিতরটা না দেখতে পেলে কি মানুষকে পুরোপুরিভাবে জানা যায়! সেদিন বাতাসীর কথা কয়টি আমার চৈতন্যের উদ্রেক না করলে, তার স্নেহ-বুভুক্ষু মনের চেহারাটা দেখতে না পেলে আর সকলের মতো আমিও তো হংসশিশুটির প্রতি তার অদ্ভুত আচরণকে এক বিকৃত-মস্তিষ্ক রমণীর উদ্ভট খেয়াল বলেই মনে করতাম।

দিনকতক পরে এক দিন বাতাসীর আর্তক্রন্দনে পাড়া সচকিত হয়ে উঠল। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, কতকগুলো ছেলে-ছোকরা মিলে তাকে বেদম প্রহার করছে; মাটির উপর অজস্র ধান ছড়ানো। ছেলেদের জিজ্ঞেস করে জানলাম চৌধুরীদের গোলাঘর থেকে ধান চুরি করে চুপিসাড়ে চলে যাচ্ছিল বাতাসী, হঠাৎ ধরা পড়ে যায়। এমন স্বভাব তো কখনো ছিল না তার। বুঝলাম হাঁসটার খোরাক জোগানোর জন্যেই তার এই অপকর্ম। এখন যে তার সংসারে পোষ্য বেড়েছে। কিন্তু এ কথা বলে ছেলেদের যদি প্রতিনিবৃত্ত করতে যাই, তাহলে তারা আমাকে সুদ্ধ পাগল ঠাওরাবে। ভাবতে লাগলাম হাঁসটার জন্যে বাতাসীর অদৃষ্টে না জানি আরো কত দুর্গতি আছে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাত্রি।

পাড়াগাঁয়ের একঘেয়েমির মাঝে বেশ একটু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে পূজাপার্বণগুলি, সারা গ্রাম জুড়ে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়, পল্লী-লক্ষ্মীর মুখখানি যেন প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে।

আমাদের অঞ্চলে কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাত্রিটি পল্লী-বাসীদের বহুবাঞ্ছিত। আজ পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই সারা রাত জেগে কাটাবে। রাত্রি এখন সবে প্রথম প্রহর। ছেলেরা মুখোস পরে সং সেজে বাড়ী বাড়ী ঘুরে হরেকরকম রং-তামাশা দেখানো সুরু করেছে। রাত যখন গভীর হবে তখন তারা গ্রামের লোকদের ক্ষেতের ফলমূল তরি-তরকারি চুরি করে নিজেরা রান্না করে খাবে। আজকের রাত্রে চুরি করে খাওয়াটাই রেওয়াজ। আমাকে আর নীরেনকেও তারা তাদের আনন্দ-ভোজের আসরে আমন্ত্রণ করেছে।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হলে পর নীরেনকে সঙ্গে করে নদী-তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে খোলা যায়গায় ছেলেরা তৈরি করেছে চালাঘর, ভিতরে চলছে রান্নার আয়োজন।

তরুণ কণ্ঠের আনন্দকলরবমুখরিত অপরূপ জ্যোৎস্না-রাত্রি। ঠিক মধ্যগগনে পূর্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ মহিমায় দীপ্যমান। জ্যোৎস্নার প্লাবনে রূপমতীর বুক হয়ে উঠেছে উদ্বেল, চক্রবাল-ঘেঁষা বনরেখা যেন ভেসে গেছে। জ্যোৎস্নাধারা যেন আকাশ আর পৃথিবীর মিলনের সকল বাধা অপসারিত করে দিয়েছে। কি গভীর স্নেহে, পরিপূর্ণ মিলনানন্দে আকাশ নত হয়ে পড়েছে ধরণীর বুকে।

রান্নার পাট চুকল ঘণ্টাখানেক বাদে। এবার ভোজন-পর্ব। নীরেন আর আমি একসঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসলাম।

ছেলেরা আয়োজন মন্দ করে নি, এমন কি মাংসের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করেছে—হাঁসেরমাংস। তেল-জবজবে মাংসের ঝোলটা বেশ রুচিকরই লাগছিল। খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম—"কি হে, তোমরা আবার হাঁস জোগাড় করলে কোত্থেকে? কিনে এনেছ নাকি?" যে ছেলেটি পরিবেশন করছিল সে মৃদু হেসে বললে—"বলেন কি মাখন-দা! লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন পয়সা খরচ করে হাঁস কিনে শেষে কি প্রত্যবায়ভাগী হব নাকি? বহু আয়াসে শেষটায় বাতাসীর 'বাবা'কেই সাবাড় করা গেছে। দেখছেন মাংসে কি তেল, একেবারে জব্‌জব্‌ করছে। তা হবে না? বাতাসী তার 'বাবা'কে খাওয়াতে তো আর কসুর করে নি!"

কথাগুলো শুনে আমার সকল আনন্দ যেন এক নিমিষে মাটি হয়ে গেল। এই জ্যোৎস্নারাত্রি, ছেলেদের পুলকোচ্ছ্বাস, সব কিছুতে মিলে মনের সেতারে যে আনন্দ-রাগিণী ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে-ছিল—সহসা যেন তার তাল কেটে গেল। ভোজনে আর কিছুমাত্র প্রবৃত্তি রইল না।

আমাকে ভোজন-বিরত দেখে নীরেন বললে—"তোমার আবার হঠাৎ কি হ'ল? একেবারে যে হাত গুটিয়ে বসে রইলে? নাও, হাত চালাও।" তার কথার জবাবে বললাম—"না ভাই, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। কাজটা কিন্তু ওরা ভাল করলে না নীরেন? বাতাসী হাঁসটাকে বাস্তবিকই পেটের ছেলের মতো ভালোবাসত।"

আমার কথা শুনে নীরেন এবং ছেলেরা সকলে মিলে হো হো করে হেসে উঠল। হাসির চোট থামলে পর নীরেন বললে—"আরে রেখে দাও তোমার ও-সব কবিত্ব, বিশ্ব-প্রেম। আজকের আনন্দ-উৎসবটা মাটি ক'রো না। পেটের ছেলের মতো ভালোবাসত—তুমি হাসালে, মাখন! আর দু-দিন বাদে 'পেটের ছেলে' বাতাসীরই পেটে যেত।" একটু থেমে নিজের রসিকতায় এক চোট হেসে নিয়ে খানিক বাদে আবার ভারিক্কি চালে বলতে সুরু করলে,—"বুঝলে, মানুষের পেটের ক্ষুধা মিটাবার জন্যেই শুধু ভগবান এ সকল ইতর প্রাণীদের, তোমাদের সাহিত্যিকদের ভাষায় অবোলা জীবদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু, তোমরা খামোকাই এদের নিয়ে বাড়াবাড়ি সুরু করে দাও। তা এতই যদি দরদ তা হলে বাতাসীকে না হয় কাল কিছু পয়সা দিয়ে দিয়ো। দেখবে পুত্রশোক ভুলতে তার বেশীক্ষণ লাগবে না।"

নীরেনের ব্যঙ্গোক্তির কোনো জবাব না দিয়ে ভোজন অসমাপ্ত রেখেই বাইরে এসে নদীসৈকতে বিচরণ করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে কোথা থেকে জানি না একখণ্ড কালো মেঘ এসে

চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে। আকাশব্যাপী উদার শুভ্রতার মধ্যে যেন একটুখানি কলঙ্ক-চিহ্ন। আমার মনের আকাশেও ঘনিয়ে এসেছে বিষাদের কৃষ্ণচ্ছায়া। ভাবতে লাগলাম, মানুষ কেন মানুষের ওপর এত অবিচার করে। না, নীরেনের কথাগুলোই সত্য। সত্যিই কি কিছু পয়সা পেলে বাতাসী 'পুত্রশোক' ভুলতে পারবে? তা হলে সেদিন হাঁসটা আমার নিকট বিক্রী করে নি কেন? সত্যিই কি ইতর প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের শুধুই খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ? বাতাসীর হাঁসটার সঙ্গে সত্যিকারের গভীরতম স্নেহের সম্পর্ক কি গড়ে ওঠে নি?

একটু পরেই মেঘ কেটে গিয়ে চারিদিক আবার আলোয় ঝলমল করে উঠল। চকিতে নজরে পড়ল, অনতিদূরে উপবিষ্ট, নিশ্চল, প্রতীক্ষমানা একটি নারীমূর্তি,—দৃষ্টি তার নদীস্রোতে নিবদ্ধ। চিনতে পারলাম মূর্তিটি বাতাসীর।

আর সকলের মতো বাতাসীও কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাত জেগে কাটাবে। তবে, আনন্দ-উৎসবে মেতে নয়;—তার স্নেহপুত্তলিটির প্রত্যাবর্তন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল শঙ্কিত-হৃদয়ে।

প্রাচীন ভারতের কয়েকটি মোকদ্দমা

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি.

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কিত লেখাবলী ও গ্রন্থাদি পরীক্ষা করিতে গেলে কতকগুলি ঐতিহাসিক মোকদ্দমার বিবরণ আমাদের চোখে পড়ে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে দিব্য বা পরীক্ষামূলক বিচার অর্থাৎ trial by ordeal সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমি হিন্দু আমলের কতিপয় বিচার-কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছিলাম। হিন্দু ভারতের ব্যবহার বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মৃচ্ছকটিক নাটকে বর্ণিত হত্যাপরাধে অভিযুক্ত চারুদত্তের বিচারের কাল্পনিক কাহিনীটিও উল্লিখিত হইয়া থাকে। অবশ্য মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা যে তাঁহার সময়ে তদ্দেশ-প্রচলিত বিচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া মোকদ্দমার বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নাট্যকারের আবির্ভাব-স্থান এবং কাল অজ্ঞাত। সুতরাং উহা অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট স্থান-কাল সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উদাহরণসমূহ অধিকতর মূল্যবান্। আমার মনে হয়, প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের হিন্দু রাজগণের শাসনকালীন বিচারকাহিনী অবলম্বনে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি তিনটি ঐতিহাসিক মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ করিব। ইহা হইতে যে কেবল ভারতের একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাচীন ব্যবহার-প্রণালী জানা যায় তাহা নহে; সেকালের সামাজিক অবস্থার উপরেও ইহা অনেকখানি আলোকপাত করে।

দশম শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশে যশস্কর নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি ৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। যশস্কর স্বয়ং সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার সুশাসনে দেশে চুরি ডাকাতির কথা শোনা যাইত না। পথিকেরা নিরাপদে পথ চলিতে পারিত। এমন কি, হাটে বাজারেও রাত্রিকালে দোকানের দ্বার খোলা থাকিত। কিন্তু ন্যায় বিচারের জন্যই রাজা যশস্করের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি ছিল।

সেকালে রাজার নিকট ব্রাহ্মণদিগের কোন অভিযোগ থাকিলে তাঁহারা রাজদ্বারে প্রায়োপবেশন করিতেন, অর্থাৎ অনাহারে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া ধর্ণা দিতেন। অকারণ ব্রহ্ম-হত্যা হইলে রাজার পাপ হইবে; সেজন্য রাজগণ ব্রাহ্মণের অভিযোগ শুনিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র বিচার করিতে বাধ্য হইতেন। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের কেহ রাজদ্বারে প্রায়োপবেশন করিতে অধিকারী ছিল কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, এক দিন প্রায়োপবেশাধিকৃত সংজ্ঞক কর্ম্মচারীরা আসিয়া রাজা যশস্করকে জানাইল, "মহারাজ, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ধর্না দিয়াছে।" রাজা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া তাহার অভিযোগ শুনিতে চাহিলেন।

ব্রাহ্মণের কাহিনী হইতে জানা গেল যে, সে পূর্ব্বে রাজধানী শ্রীনগরের এক জন ধনী গৃহস্থ ছিল, কিন্তু পরে নানা কারণে তাহার আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া যায়। ক্রমে তাহার ঋণ বাড়িতে লাগিল; পাওনাদারেরা তাহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্থির করে যে, বাড়ী-ঘর বিক্রয়পূর্ব্বক সমস্ত দেনা পরিশোধ করিবার পর সে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করিবে। এক জন স্থানীয় বণিকের নিকট সে নিজের বসতবাটী বিক্রয় করিল; কিন্তু বাগানের একধারে অবস্থিত সোপানশোভিত একটি কূপ ঐ সঙ্গে বিক্রয় না করিয়া সে উহা তাহার স্ত্রীর জন্য রাখিয়া দিল। মালীরা গ্রীষ্মকালে বাগানে কাজ করিতে আসিয়া পান, ফুল প্রভৃতি যাহাতে উত্তাপে শুকাইয়া না যায়, সেজন্য ঐগুলি কূপটির শীতল সোপানের উপর রাখিত। ইহার জন্য তাহারা যে ভাটক (ভাড়া) দিত, তাহাতে কোনরূপে একজন লোকের ভরণপোষণ চলিতে পারে। ব্রাহ্মণ স্থির করিল, উহাতেই তাহার স্ত্রীর জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া দেশান্তরে গেল।

কুড়ি বৎসর নানা দেশে ঘুরিয়া অল্প কিছু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দেশে প্রত্যাগমন করিল। তখন তাহার স্ত্রীর সন্ধান লইয়া দেখে যে, হতভাগিনী পরের গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিতেছে। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্ত্রীকে কহিল, "আমি ত তোমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলাম। তবে তুমি এত কষ্ট করিয়া শরীরপাত করিতেছ

কেন ?" ব্রাহ্মণী উত্তর দিল, "তুমি প্রবাসে প্রস্থান করিবার পর আমি যেমন কূপের কাছে গেলাম, অমনই আমাদের গৃহক্রেতা সেই বণিক্ লাঠি দিয়া মারিতে মারিতে আমাকে সে-স্থান হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া পেটের দায়ে আমাকে এই হীন কাজ অবলম্বন করিতে হইয়াছে।" স্ত্রীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ব্রাহ্মণের শোক ও ক্রোধের সীমা রহিল না। সে স্থেয় অর্থাৎ বিচারকদিগের নিকট গিয়া প্রায়োপবেশন করিল এবং দুষ্ট বণিক্ অন্যায় ভাবে তাহার কূপটি দখল করিয়াছে বলিয়া আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। দুঃখের বিষয়, বিচারকগণ যথাযথ মোকদ্দমা বিচার করিয়া বণিকেরই জয় ঘোষণা করিলেন। বিচারে পরাজিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ তাহার কূপের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। সে বারবার নালিশ করিতে লাগিল ; কিন্তু বারবারই পরাজিত হইল।

ঘটনা বিবৃত করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা যশস্করকে বলিল, "মহারাজ, আমি মূর্খ ; মামলা মোকদ্দমার কিছু বুঝি না। কিন্তু আমি আমার জীবন পণ রাখিয়া বলিতে পারি যে, আমার কূপটি আমি সে বণিকের নিকট বিক্রয় করি নাই। আপনি যদি এই বিষয়ের সুমীমাংসা না করিয়া দেন, তবে আমি রাজদ্বারে প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করিব।" রাজা ব্রাহ্মণের মোকদ্দমা বিচারের ভার গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর যথাসময়ে রাজা যশস্কর বিচারাসনে বসিলেন। তিনি বিবাদী বণিক্ ও সাক্ষীদিগের সহিত বিচারকগণকে ডাকাইয়া ব্রাহ্মণের মামলার প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিচারকেরা বলিলেন, "মহারাজ, আমরা বহুবার যথাযথ বিচার করিয়া এই ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিয়াছি। জুয়াচোর ব্রাহ্মণ আমাদের ন্যায্য বিচার গ্রাহ্য করিতেছে না। এ এখন বলিতে চায় যে, বাড়ী বিক্রয়ের দলিলটাই দোষদুষ্ট। ব্রাহ্মণকে শাস্তি দেওয়া উচিত।" তখন রাজা বণিকের নিকট হইতে বিক্রয়-পত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বাড়ী বিক্রয়ের দলিলখানা গ্রহণপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখা গেল, দলিলে স্পষ্ট লেখা আছে, "সোপানযুক্ত কূপ সহিত বাটী বিক্রীত হইল।" রাজার সভাসদগণ সকলেই বলিলেন, "দলিলের লেখার উপরে আর কোন কথা থাকিতে পারে না।" কিন্তু রাজা যশস্করের কেমন একটা সন্দেহ হইল। তাঁহার মন বলিল, "অর্থী (বাদী) ব্রাহ্মণ সত্য কথাই বলিয়াছে।"

রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপর উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় মূল্যবান্ প্রস্তরের কথা উঠিল। রাজা যেন কৌতূহলের বশে সভাসদগণের অঙ্গুরীয় ও অলঙ্কারাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে অন্যান্য অনেকের অলঙ্কারাদির ন্যায় প্রত্যর্থী (বিবাদী) বণিকের নিকট হইতে তাহার অঙ্গুরীটি চাহিয়া লইয়াছিলেন। হঠাৎ রাজা বলিলেন, "আপনারা সকলে ক্ষণিক অপেক্ষা করুন। আমি এখনই পাদক্ষালন করিয়া আসিতেছি।" বিচারশালার বাহিরে আসিয়া রাজা যশস্কর এক জন ভৃত্যের হস্তে বণিকের অঙ্গুরীটি দিয়া বলিলেন, "বণিকের এই আংটি লইয়া তুমি তাহার গৃহে যাও। সেখানে বণিকের গণনাধ্যক্ষের (হিসাবনবীশের) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট হইতে ঠিক কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বের গণনাপত্রিকা (হিসাবের খাতা) লইয়া আইস।" ভৃত্যটি যে সত্যই বণিকের আদেশমত হিসাবের খাতা আনিতে যাইতেছে, ইহাতে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য সেকালে অঙ্গুরীয়-কাদি কোন বস্তু পাঠাইবার প্রথা ছিল। ইহাকে অভিজ্ঞান বলা হইত।

রাজভৃত্য বণিকের গৃহে পৌঁছিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীকে বলিল, "মহাশয়, আপনার প্রভু এই অঙ্গুরী দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। যে বৎসর ব্রাহ্মণের বাড়ী কেনা হইয়াছিল, সেই বছরের হিসাবের খাতাখানি তিনি আমাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।" বণিকের হিসাবনবীশ প্রভুর অঙ্গুরী দেখিয়াই চিনিতে পারিল। একখানা পুরাতন হিসাবের খাতায় বণিকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। সে অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়কটি রাখিয়া হিসাবের খাতা রাজভৃত্যের হাতে দিল।

হিসাবের খাতা পাইয়া রাজা যশস্কর উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখা গেল, নানা খরচের মধ্যে অধিকরণ লেখক অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বাটী বিক্রয়-পত্রের লেখক রহিয়াছে। কর্ম্মচারীর নামে এক হাজার দীনার (কড়ি) খরচ লেখা রহিয়াছে। দলিল লেখকদিগের প্রাপ্য খুব বেশী হয় না। কিন্তু বণিকের দলিল লিখিয়া কর্ম্মচারীর এত অধিক অর্থ পাইবার কারণ কি ? তখন রাজার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, দুষ্ট বণিক অর্থদ্বারা কর্ম্মচারীকে বশ করিয়া, তাহাকে দিয়া "র" অক্ষরের স্থানে "স" অক্ষর, অর্থাৎ "কূপরহিত" কথার স্থলে "কূপসহিত" কথাটি লেখাইয়া লইয়াছে।

এইবার রাজা সভামধ্যে গিয়া হিসাবের খাতাখানি সকলকে দেখাইলেন। দলিল-লেখক কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া আনিয়া জেরা করা হইল। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই। সত্য কথা বলিলে তোমাকে কোন শাস্তি দিব না।" ধরা পড়িয়া কর্ম্মচারী স্বীকার করিল যে, সত্যই সে বণিকের নিকট হইতে অর্থ লইয়া দলিলে বিক্রেয় বাড়ীর উল্লেখ স্থলে "কূপরহিত" না লিখিয়া "কূপসহিত" লিখিয়াছিল। রাজার বিচারে বিবাদী বণিক্ অপরাধী প্রমাণিত হইল। তাহাকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করা হইল। তাহার বাড়ী এবং ধন বাদী ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইল। সভাসদগণ রাজার সুবিচারের প্রশংসা করিলেন।

আর এক দিন সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে রাজা যশস্কর আহারে বসিতে যাইতেছেন। এমন সময় ক্ষত্তাসংজ্ঞক অন্তঃপুররক্ষক কর্ম্মচারী আসিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "মহারাজ, এক ব্রাহ্মণ বাহিরে প্রায়োপবেশনে বসিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে, মহারাজ আজিকার বিচারকার্য্যাদি শেষ করিয়াছেন ; কাল তোমার নালিশ শুনিবেন। কিন্তু সে আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছে না। আজই তাহার অভিযোগ আপনার নিকট উপস্থিত করিবার জন্য জেদ করিতেছে।" ন্যায়বান্ রাজা পাচককে খাদ্যদ্রব্য আনিতে নিষেধ করিয়া বিচারার্থী ব্রাহ্মণকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে রাজা তাহার অভিযোগ জানিতে চাহিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল, "মহারাজ, আমি নানা দেশে ঘুরিয়া এক শত স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম। সম্প্রতি কাশ্মীর দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছি। পথে ঘাটে ডাকাতের উপদ্রব নাই; বেশ আনন্দেই আসিতেছিলাম। কাল সন্ধ্যাবেলা আমি লবণোৎস গ্রামে পৌঁছি। অনেক পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলাম। পথিপার্শ্বস্থ এক বাগানে প্রবেশ করিয়া একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলায় নির্ভয়ে রাত্রি যাপন করিলাম। স্বর্ণমুদ্রাগুলি আমার কোমরের গাঁটে বাঁধা ছিল। সকালবেলা উঠিয়া দাঁড়াইতেই হঠাৎ গাঁট খুলিয়া মুদ্রাগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। নিকটেই একটি কূপ ছিল; সেটা আগে দেখিতে পাই নাই। স্বর্ণমুদ্রাগুলি সমস্তই সেই কূপের মধ্যে পড়িল। তখন আমি টাকার শোকে পাগলের মত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই কূপের জলে ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগের সঙ্কল্প করিলাম। আমার হাহাকার শব্দে চারি দিক হইতে লবণোৎস গ্রামবাসীরা আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহারা আমাকে ধরিয়া রাখিল। এমন সময় উপস্থিত লবণোৎসবাসী এক জন সাহসী লোক আমাকে বলিল, আমি যদি তোমার মুদ্রগুলি তুলিয়া দেই, তবে তুমি আমাকে কত দিবে?' আমি তখন অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্ত; তাহাকে বলিলাম, 'মহাশয়, আমার মুদ্রাগুলি ত গিয়াছেই; আপনি যদি উহা তুলিয়া আনিতে পারেন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই আমাকে দিবেন।' লোকটি তখনই কূপের মধ্যে নামিল এবং কিছু ক্ষণ পরে মুদ্রাগুলি লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। সে আমাকে বলিল, 'তুমি আমার ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছ। আমি এই একশত মুদ্রামধ্যে দুইটি তোমাকে দিয়া বাকী আটানব্বই মুদ্রা নিজে লইব।' এই বলিয়া লোকটি সকলের সাক্ষাতে আমাকে মাত্র দুইটি মুদ্রা দিল এবং অবশিষ্ট সমস্ত মুদ্রা আত্মসাৎ করিল। আমি এইরূপ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু উপস্থিত গ্রামবাসীরা সকলেই আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "রাজা যশস্করের রাজ্যে কথার উপরেই মামলা নির্ভর করে। তোমার নিজের কথামতই ব্যবস্থা হইয়াছে; সুতরাং তুমি আর আপত্তি করিতে পার না।" এইরূপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "মহারাজ, আমি সদুদ্দেশ্যে সরলভাবে যে কথা বলিয়াছিলাম, কৌশলে তাহার অপব্যবহার করিয়া লবণোৎসবাসীরা আমার কষ্টের ধন অপহরণ করিল। আপনার বিচার-পদ্ধতির দোষই ইহার কারণ বলিয়া বুঝিতেছি। তাই আমি আপনার দ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছি।"

রাজা ব্রাহ্মণকে মুদ্রাগ্রহণকারী ব্যক্তির জাতিকুল এবং নাম জানাইতে বলিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কহিল, "মহারাজ, আমি তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। কেবল মুখ দেখিলে তাহাকে চিনিতে পারিব।" রাজা পরদিন সকালেই ব্রাহ্মণের মোকদ্দমা বিচার করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তারপর অনেক অনুরোধ করিয়া নিজের নিকটে বসাইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে কিছু আহার করাইলেন।

পরদিন প্রভাতে রাজদূতেরা লবণোৎসগ্রামের সমুদয় প্রজাকে ডাকিয়া আনিল। রাজার আদেশে ব্রাহ্মণ তাহার মুদ্রাগ্রহণকারী পুরুষকে দেখাইয়া দিল। রাজা সে ব্যক্তিকে ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে যাহা বলিয়াছিল, সেই লোকটিও অবিকল সেইরূপ বলিল। শেষে সে বলিল, "মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণের নিজের কথা অনুসারেই ব্যবস্থা করিয়াছি।" রাজসভাসদগণ ব্যাপার শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজা বিচার করিয়া বলিলেন, "ধনাধিকারী ব্রাহ্মণ আটানব্বই মুদ্রা এবং কূপ হইতে মুদ্রোত্তোলনকারী ব্যক্তি দুই মুদ্রা পাইবে।" সভাসদগণ রায় শুনিয়া অনুযোগ করিলে (বা জিজ্ঞাসু হইলে) রাজা যশস্কর তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন "দেখ এই ব্রাহ্মণ বলিয়াছে, 'তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমাকে দিও।' ব্রাহ্মণের বলার উদ্দেশ্য ছিল, তোমার যাহা দেওয়া উচিত, তাহাই আমাকে দিও।' কূপ হইতে মুদ্রা তুলিয়া দিবার পারিশ্রমিক স্বরূপ এই ব্যক্তিকে আটানব্বইটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হইবে, ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই এইরূপ ইচ্ছা করিয়া উহাকে সেকথা বলে নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের মনের কথা অনুসারে ব্যবস্থা হয় নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম স্মরণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে এ ব্যক্তি মাত্র দুই মুদ্রা পাইবে; অবশিষ্ট আটানব্বই মুদ্রা ব্রাহ্মণের থাকিবে।"

রাজা যশস্কর সর্ব্বদা এইরূপ ন্যায়ান্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়া বিচার করিতেন। ফলে তাঁহার শাসনকালে কাশ্মীরদেশে যেন সত্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল।

যশস্করের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে কাশ্মীর দেশে উচ্চল নামে এক ব্যক্তি রাজা হন। তিনি ১০০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাশ্মীরপতি উচ্চলও সুবিচারক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

জনৈক অসাধু বণিকের সহিত এক জন ধনী ব্যক্তির বন্ধুত্ব ছিল। ইতিহাসে এই দুই ব্যক্তির নাম লেখে নাই; কিন্তু ধরা যাক, বণিকের নাম বিম্ব এবং ধনী ব্যক্তির নাম মল্ল। ধনী মল্ল তাঁহার বণিক বন্ধুর নিকট গোপনে এক লক্ষ দীনার (লক্ষ কপর্দ্দক মূল্যের মুদ্রাদি) গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের কোন সাক্ষী ছিল না। মল্ল মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত বিম্বের নিকট গচ্ছিত অর্থ হইতে যৎসামান্য কিছু কিছু চাহিয়া লইতেন। এইরূপে প্রায় বিশ-ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর এক দিন মল্ল শ্রেষ্ঠী বিম্বের নিকট গিয়া তাঁহার গচ্ছিত অর্থ ফেরত চাহিলেন। কিন্তু দুষ্ট বণিক্ নানা ভাবে অর্থ প্রত্যর্পণে বিলম্ব ঘটাইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে মল্লের গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিবার তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কোন ব্যক্তি বিম্বের নিকট কিছু গচ্ছিত রাখিতে গেলে সে নানা মিষ্ট কথায় এবং সদ্ব্যবহারে ঐ ব্যক্তির মন ভুলাইত। কিন্তু সেই গচ্ছিত বস্তু ফিরাইয়া আনিতে গেলে অসাধু বণিক্ ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত। গচ্ছিত ধনাদির জন্য কেহ বিবাদ উপস্থিত করিলে, বিম্ব এমন ভাব দেখাইত যেন সে পরের দ্রব্য ফেরত দিতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়; কিন্তু আসলে সে প্রাণান্তেও ন্যাস প্রত্যর্পণ করিত না। ইহাই তাহার স্বভাব ছিল। দুষ্ট বিম্ব ললাটে, চক্ষুপ্রান্তে, কর্ণমূলে এবং বক্ষস্থলে চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া সাধু সাজিয়া

থাকিত। তাহার গাত্রবর্ণ শ্যামল, মুখ ছুঁচালো এবং ভুঁড়ি অতি প্রকাণ্ড ছিল। লোকের রক্তমাংস শোষণই ছিল তাহার ব্যবসায়।

মল্ল বিম্বকে জানাইলেন যে, অবিলম্বে তাঁহার গচ্ছিত ধন প্রত্যর্পণ না করিলে তিনি আদালতে নালিশ করিবেন। বিম্ব বুঝিল, এবার আর কোন ছলে বিলম্ব করা চলিবে না। তখন সে এক হিসাবের খাতা উপস্থিত করিয়া মল্লকে বলিল, "তুমি যখন অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, তখন সুদের কথা বল নাই। সুতরাং সুদের দাবী করিতে পার না। আর গচ্ছিত অর্থ হইতে মাঝে মাঝে যাহা লইয়াছ, তাহার সমস্ত হিসাব এই ভূর্জ্জপত্রের খাতায় দেখিতে পাইবে।" মল্ল দেখিলেন, নানা বাবদে তাঁহার নামে অনেক খরচ লেখা রহিয়াছে। বিম্ব হিসাব বুঝাইয়া মল্লকে বলিতে লাগিল, "তুমি একবার সেতু পার হইবার শুল্ক-দানের জন্য ৬০০ দীনার লইয়াছ। আবার একপাটি ছেঁড়া জুতা এবং একটা চাবুক মেরামত করিবার জন্য ১০০ দীনার লইয়া-ছিলে। তোমার দাসীর পায়ের ক্ষত চিকিৎসার জন্য ৫০ দীনারের ঘৃত কেনা হয়। একবার এক কুম্ভকার-পত্নীর কলসী ভাঙিয়া দয়াপরবশ হইয়া তুমি তাহাকে ৩০০ দীনার ক্ষতিপূরণ দিয়াছিলে। এই দেখ, সে সমস্তই ভূর্জ্জপত্রে লেখা রহিয়াছে। তোমার বিড়ালছানার আহারের জন্য হাট হইতে ১০০ দীনার মূল্যের ইঁদুর এবং মাছের ঝোল কেনা হইয়াছিল। পাক্ষিক শ্রাদ্ধের স্নানকালে মধু, ঘৃত এবং চালের গুঁড়া কেনায় এবং পায়ে মাখার জন্য মাখন বাবদ ৭০০ দীনার খরচ হইয়াছে। তোমার শিশুপুত্রের কাশি হইয়াছিল; তাহাকে ১০০ দীনারের আদা ও মধু খাওয়াইতে হইয়াছে। সে ত এখনও কথা কহিতে শেখে নাই; নহিলে সত্য মিথ্যা সমস্তই বলিতে পারিত। আবার সেই যে ভিখারীটা তোমার পশুগুলির কোষ তুলিয়া দিয়াছিল, সে যখন কিছুতেই ছাড়িল না, কেবল ঝগড়া করিতে লাগিল, তখন তাহাকে ৩০০ দীনার পারিশ্রমিক দিয়েছিলে। সেবার তোমার গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল; তখন ধূপ, মূলাদি ও পেঁয়াজ কিনিতে প্রায় ২০০।১০০ দীনার ব্যয় হইয়াছে। দেখ, সমস্ত হিসাব খাতায় লেখা আছে। এই সমুদয় খরচেরই হিসাব ধরিতে হইবে।" বিম্বের গণনা-পত্রিকা দেখিয়া মল্লের ত চক্ষুস্থির। তিনি আরও দেখিলেন, খাতায় এইরূপ যে খরচের হিসাব আছে তাহার উপরে আবার এই টাকার সুদ ধরা হইয়াছে। বিম্ব অঙ্গুলির পর্ব্বে গুনিয়া গুনিয়া টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তারপর ওষ্ঠ প্রসারিত এবং চক্ষু দুইটি অর্দ্ধ মুদিত করিয়া মল্লকে কহিল, "এই নাও তোমার সম্পূর্ণ হিসাব। তোমার অর্থ গচ্ছিত রাখার পর হইতে এতকাল আমি অতি দুশ্চিন্তায় কাটাইয়াছি। এ যেন আমার বুকে শেলের মত। এইবার তোমার টাকা তুমি লও। আর, আমার নিকট হইতে মাঝে মাঝে যাহা উজ্জাসধন লইয়াছ, তাহা সুদসমেত আমাকে ফিরাইয়া দাও।" প্রথমে মল্ল বিম্বের প্রস্তাবটিকে ততটা অন্যায় বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু সমস্ত হিসাব ভাল রূপে পরীক্ষা করিবার পর তিনি বুঝিলেন যে, প্রস্তাবটি মধুমাখা ছুরিকার ন্যায় ভয়ানক। কারণ বণিকের হিসাবে তিনি গচ্ছিত অর্থের অংশমাত্র ফেরত পাইবার দাবী করিতে পারেন। তখন মল্ল আদালতে উপস্থিত হইলেন এবং বিম্বের নামে এই মর্ম্মে অভিযোগ আনিলেন যে, কপটতাপূর্ব্বক সে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে।

বিম্বের নিকট লক্ষ দীনার গচ্ছিত রাখার এবং মাঝে মাঝে তাহার নিকট হইতে উজ্জাসধন লইবার কোন সাক্ষী ছিল না। সুতরাং মামলার শুনানির সময় বিচারকদিগের মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু বিম্বের আচরণ সন্দেহজনক হইলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাঁহারা মল্লের জয় ঘোষণা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা যখন বুঝিলেন যে, তাঁহাদের দ্বারা এই মোকদ্দমার সুবিচার সম্ভব নহে, তখন সমস্ত ব্যাপারটি রাজা উচ্চলের নিকট উপস্থাপিত করিলেন।

এই মামলার বিচার করিতে গিয়া রাজা প্রথমেই বণিকের গণনাপত্রিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। কিন্তু উহাতে কোন ত্রুটি পাওয়া গেল না। তারপর তিনি বিম্বকে কহিলেন, "যে অর্থ মল্ল তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সেই ন্যস্ত ধনের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অবিলম্বে এখানে লইয়া আইস। তারপর আমি তোমাদের মোকদ্দমা বিচার করিব।" বিম্ব গৃহ হইতে কতকগুলি মুদ্রা আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা উচ্চল মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "রাজারা কি ভাবী রাজার নামেও মুদ্রা অঙ্কিত করেন? মল্ল বলিতেছে, সে মহারাজ কলশের রাজত্বকালে (১০৬৩-৮৯) বিম্বের নিকট মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই ন্যাসের অবশিষ্টাংশ বলিয়া যাহা আনা হইয়াছে এই মুদ্রা মধ্যে আমার নামাঙ্কিত মুদ্রাও দেখা যাইতেছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, গচ্ছিত লক্ষ দীনার হইতে বণিক্ মাঝে মাঝে মল্লকে কিছু কিছু প্রত্যর্পণ করিয়াছে এবং বাকী অর্থ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করিয়াছে। আজ গচ্ছিত ধনের অবশিষ্টাংশ আনিতে বলায় নিজ তহবিল হইতে হিসাব পূরণ করিয়া মুদ্রা আনিয়াছে। সুতরাং বাদী যদি বণিক্‌কে গৃহীত দ্রব্যাদির মূল্য এবং উহার সুদ দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে বণিক্ কেন গচ্ছিত লক্ষ দীনারের সুদসহ সমস্ত মূলধন পরিশোধ করিবে না? আমার ন্যায় সদয় হৃদয় ব্যক্তির বিচারে বণিককে সুদ সমেত লক্ষ দীনার দিতে হইবে।"

দণ্ডদান প্রসঙ্গে রাজা আরও বলিলেন, "কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমার বিচারে এরূপ সহজ ব্যবস্থা ভাল নহে। এইরূপ স্থলে মহারাজ যশস্করের কঠোর বিচার-প্রণালীই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে যদি মোকদ্দমায় অর্থী এবং প্রত্যর্থীর ভ্রমপ্রমাদমাত্র প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বিচারক অপরাধীকে কঠোর দণ্ড দিবেন না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন প্রতারণার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবে, সেখানে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সন্দেহ স্থলে রাজা বিচার ব্যাপারে ক্ষমা ও ধীরতা অবলম্বন করিবেন।" যাহা হউক, রাজা উচ্চল অসাধু বণিকের কঠোরতর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন ভারতে সুদের হার অত্যন্ত চড়া ছিল। ন্যাস স্থলে শতকরা মাসিক এক মুদ্রা সুদের কথা প্রাচীন রাজ-শাসনাদি হইতে জানা যায়। এই হিসাবে এক লক্ষ দীনারের

পঁচিশ বৎসরের সাধারণ হারেই সুদ হয় তিন লক্ষ দীনার। চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাব করিলে আরও অনেক বেশী সুদ হয়। বিম্ব যে হিসাবের খাতা দাখিল করিয়াছিল, তাহাতে মল্লের নামে আড়াই হাজার দীনারও খরচ দেখাইতে পারে নাই। সম্ভবতঃ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ কষিয়া সে নিজ প্রাপ্যের পরিমাণ অনেক বাড়াইয়া দেখাইয়াছিল, সুতরাং রাজা উচ্চলের বিচারে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বোধ হয় ইহাই দয়ালু রাজা তাহার অপরাধের দণ্ড স্থির করিয়াছিলেন।

এই মামলার ফল প্রকাশিত হইলে সকলেই রাজা উচ্চলকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বিচারাদি ব্যাপারে উচ্চল কখনও অনুরোধ বা প্রশংসার লোভে কোন কাজ করিতেন না; সর্ব্বদাই নিজের বিবেক অনুসারে চালিত হইতেন।

যক্ষ্মারোগীর পত্র

শ্রীমায়া দাশগুপ্তা

স্নেহের রমা,

তোমার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম দক্ষিণ-ভারতে আমার জীবনযাত্রা-প্রণালী তোমায় জানাইব। তুমি ত জানই দক্ষিণ-ভারতে আমার গমন দেশ বেড়ান কিম্বা কোনও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য ছিল আরোগ্যলাভ। আমার ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের কাহিনী হয়ত তোমার কাছে মোটেই ঔৎসুক্যজনক হইবে না, কিন্তু আমার মত ব্যাধিগ্রস্ত আরও দশ জনের উপকারে আসিতে পারে এবং যাইবার পূর্ব্বে অজ্ঞতার জন্য আমাকে যে-সব অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল সেইরূপ অসুবিধায় যাহাতে অপরকে পড়িতে না হয় তাহার জন্য লিখিতে বসিয়াছি।

বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগীদের সংখ্যানুপাতে চিকিৎসার ব্যবস্থার অত্যন্ত অপ্রতুল। ঘরে ঘরে কত রোগী যে বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় প্রতিদিন মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে এবং অজ্ঞতার জন্য সমস্ত পরিবারকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাংলাদেশে যে কয়েকটি যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে তাহাতে 'বেডে'র (bed) সংখ্যা হাস্যকর এবং তাহাও মধ্যবিত্ত ও গরীব রোগীদের ভাগ্যে প্রায়ই পাওয়া ঘটিয়া উঠে না। কাজেই আমাকেও নিজের দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল সুদূর দক্ষিণ-ভারতে আরোগ্য লাভের আশায়।

পূর্ব্বে এ রোগকে শিবের অসাধ্য বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইত, তখন চিকিৎসার ব্যবস্থাও বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেও চলে, কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চলিয়াছে, মানব-জীবনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীরও রূপ বদলাইতেছে, আমরাও বিজ্ঞানের সে দান হইতে বঞ্চিত হই নাই। যক্ষ্মা এখন আর শিবের অসাধ্য নয়, মানুষই তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছে। এই রোগের চিকিৎসা করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং তাহার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় রোগীর আর্থিক সচ্ছলতার দিকে। এই রোগে শুধু শারীরিক চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থতার আশা বাতুলতা মাত্র। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধৈর্য্য সহকারে রোগীকে থাকিতে হয় বিশেষজ্ঞের অধীনে, কাজেই বিছানায় শুইয়া বোতল বোতল ঔষধই গলাধঃকরণ করা চলে না, প্রয়োজন হয় শারীরিক চিকিৎসার সঙ্গে মানসিক প্রফুল্লতার। প্রত্যেক রোগী তাহার শারীরিক অবস্থানুযায়ী হাসিবে, খেলিবে, বেড়াইবে কিন্তু তাহারাই আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশ্রাম করিবে, ঔষধ খাইবে, ইনজেকসন লইয়া হাসপাতালের খাটে শুইয়া থাকিবে। সেই কারণেই সাধারণ হাসপাতালে এমন কি যক্ষ্মা হাসপাতালে ও যক্ষ্মা রোগীদের স্বাস্থ্যনিবাসে বহু পার্থক্য। এইবার আমি আমার স্বাস্থ্যনিবাসের কথা বলিব।

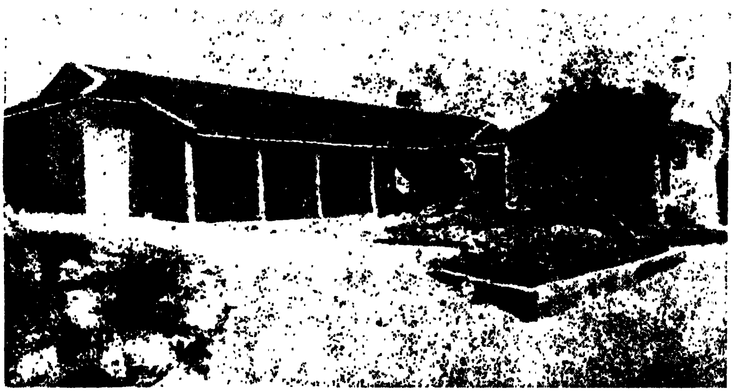


আরোগ্যভরমের নিকটবর্ত্তী রাস্তার দৃশ্য

এই স্বাস্থ্যনিবাসটির নাম "আরোগ্যভরম"। ইহা দক্ষিণ-ভারতে চিত্তুর নামক একটি তেলেগু জেলায় মদনাপল্লী রেল-ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বড় বড় পাহাড়কে সমতল করিয়া লইয়া স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইউনিয়ান মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহার প্রতিষ্ঠা হয় সেই জন্য ইহার আর একটি নাম, "ইউনিয়ান মিশন টিউবারকিউলসিস স্যানাটোরিয়াম।"

বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যনিবাসের প্রধান চিকিৎসক মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিবাঙ্কুর নিবাসী ডাক্তার পি, ভি বেঞ্জামিন।

দূর হইতে স্বাস্থ্যনিবাসের অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া সত্যই



আরোগ্যভরমের বহিরংশের দৃশ্য

করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। A, P, case-গুলিকে (Artificial Pneumothorax) A, P,র জন্য মাসিক ২॥০ টাকা এবং X'Ray ছবির জন্য দুই টাকা করিয়া দিতে হয়। অবশ্য এ সমস্তই রোগীর আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জেনারেল ওয়ার্ডগুলির সম্বন্ধেও ঐ একই ব্যবস্থা। সেমি-জেনারেল ওয়ার্ডগুলিতে প্রতি রোগীকে ওয়ার্ড ভাড়া বাবদ মাসিক ৩৫৲ A, P, বাবদ ৫৲ ও X'Ray ছবি বাবদ ৫৲ দিতে হয়। জেনারেল ওয়ার্ডগুলি বাদে প্রতি ওয়ার্ডেই মাথা পিছু প্রতি রোগীর জন্য একটি করিয়া রান্নাঘর আছে, চাকর দ্বারা রান্না করাইয়া লইতে হয়। অবশ্য স্বাস্থ্যনিবাসের প্রত্যেক রোগীই ইচ্ছা করিলে টাকা দিয়া স্বাস্থ্যনিবাসেই খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। স্পেশাল ওয়ার্ডগুলির ভাড়া ওয়ার্ড হিসাবে ৬০৲ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০৲ পর্য্যন্ত ধার্য্য করা আছে। A, P,র জন্য স্পেশাল ওয়ার্ডের রোগীদের ১০৲ এবং X'Ray ছবির জন্য ১০৲ করিয়া দিতে হয়।

জেনারল ওয়ার্ডগুলিতে রোগীর সহিত তাহার তত্ত্বাবধায়কের (Attendant) থাকিবার ব্যবস্থা নাই। সেমি-জেনারেলে রোগী পিছু একজন ও স্পেশাল ওয়ার্ডগুলিতে একজন হইতে দুইজন পর্য্যন্ত তত্ত্বাবধায়কের থাকিবার অনুমতি আছে।

স্বাস্থ্যনিবাসে রোগীদের জন্য যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করা আছে, সে নিয়ম রোগীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হয়, এমন কি রোগীর তত্ত্বাবধায়কদেরও স্বাস্থ্যনিবাসের সর্ব্ব প্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয়। এই সব নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করা রোগীর একান্ত প্রয়োজন, কারণ সুস্থতা লাভ করিবার পথে এই নিয়মই রোগীকে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম ঘড়ির কাঁটার সহিত সংযোগ রাখিয়া জীবন কাটাইতে কষ্ট হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, উপরন্তু ব্যাধিমুক্ত হইবার প্রয়োজনে নিয়মের সার্থকতা রোগী নিজেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সেখানকার রোগীদের নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখিবার এবং শিখিবার বস্তু।

যাহারা একবার এই দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হয় তাহাদের বাকী সমস্ত জীবনটা খানিকটা বাঁধাধরা নিয়মের মাঝে কাটাইতে হয়, এই কারণেই চিকিৎসা-বিজ্ঞান অসুস্থ রোগী (patient) এবং সুস্থ রোগী (ex-patient) এই দুইটি শব্দ যক্ষ্মা রোগীদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। রোগী সুস্থ হইয়া উঠিলেও মাঝে মাঝে তাহাকে বিশেষজ্ঞ দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করাইতে হয় বুকের ছবি ইত্যাদি। এইরূপ মাঝে মাঝে পরীক্ষা দ্বারা তাহার পক্ষে দেখা সম্ভব হয় যে সে সম্পূর্ণ যক্ষ্মাবীজাণুমুক্ত কি না। যক্ষ্মাবীজাণুমুক্ত রোগীরা বীজাণুমুক্ত হইয়া সুস্থতা লাভ

মনে আশার সঞ্চার হইল, হ্যাঁ আমরা বাঁচিব, এ অপূর্ব্ব স্থান হইতে পুনরায় সুস্থ হইয়া প্রিয়জনদের কাছে ফিরিয়া যাইব। এমন চমৎকার স্থান, এমন অপূর্ব্ব ব্যবস্থা যাঁহারা আমাদের মত দুর্ভাগাদের জন্য করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

স্বাস্থ্যনিবাসে খোলা ওয়ার্ডে রোগীদের থাকিবার স্থান। ওয়ার্ডগুলির তিন দিক খোলা, এক দিকে জিনিসপত্র রাখিবার একটি ছোট ঘর ও একটি বাথরুম। ওয়ার্ডগুলি দেখিতে অনেকটা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ীর মত। প্রতি ওয়ার্ডের সামনে খানিকটা করিয়া জমি ফুলের বাগান করিবার জন্য। প্রতি দশ-বার গজ অন্তর অন্তর ওয়ার্ডগুলি তৈয়ারী করা হইয়াছে যাহাতে এক ওয়ার্ড অপর ওয়ার্ডের আলো, হাওয়া ও সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে না পারে।

স্বাস্থ্যনিবাসে সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি জেনারেল ওয়ার্ড, পাঁচটি ছেলেদের ও দুইটি মহিলাদের জন্য। প্রতি জেনারেল ওয়ার্ডে সতর জন করিয়া রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। দুইটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জেনারেল ওয়ার্ড, একটি ছেলেদের ও একটি মহিলাদের জন্য, প্রতি ওয়ার্ডে চার জন করিয়া রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। দুইটি সেমি-জেনারেল ওয়ার্ড (এই দুইটি ওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাত্রী কলিকাতার স্বনামধন্যা ইংরেজ মহিলা মিসেস্ লী), প্রতি ওয়ার্ডে চার জন করিয়া রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে, একটি ছেলেদের ও একটি মহিলাদের। ১০৬টি স্পেশাল ওয়ার্ড। স্পেশাল ওয়ার্ডগুলিতে রোগী ভর্ত্তি করিবার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে-কোনও ওয়ার্ডে ছেলে-রোগী ও যে-কোনও ওয়ার্ডে মহিলা-রোগী থাকিতে পারেন। প্রতি স্পেশাল ওয়ার্ডে একজন করিয়া রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

জেনারেল ওয়ার্ডগুলি বিশেষভাবে মান্দ্রাজ প্রদেশ নিবাসী-দের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তবে অবস্থা বিশেষে কখনও কখনও অন্য প্রদেশবাসীরাও স্থান পাইয়া থাকেন।

জেনারেল ওয়ার্ডগুলিতে যাহাদের খরচা দিবার মত সামর্থ্য আছে তাহাদের খাওয়ার জন্য আঠার টাকা করিয়া দিতে হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য প্রতি বিষয়েই খরচা শতকরা কুড়ি টাকা

করিলেও পূর্ব্বের মত সর্ব্ব প্রকার কার্য্যের উপযুক্ত হয় না, যে-সব কাজে পরিশ্রম কম, যে-সব কাজে বিশ্রাম করিবার সুযোগ আছে সেই জাতীয় হাল্‌কা ধরণের কাজ তাহার পক্ষে উপযুক্ত। বিলাতে এই সব সুস্থ রোগীর জন্য উপনিবেশ (Aftercare colony) আছে। উপনিবেশের প্রত্যেক সুস্থ রোগী তাহাদের শারীরিক অবস্থানুযায়ী কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াথাকেন, এমন কি অনেকে বিশেষজ্ঞের অনুমতি লইয়া বিবাহাদি করিয়া সুস্থ মানবের মতই সুখে জীবন যাপন করিতেছেন। যক্ষ্মারোগীদের উপনিবেশের উদ্দেশ্য রোগমুক্ত হইলেও পুনরায় যাহাতে আক্রান্ত না হইয়া পড়ে (যাহা যক্ষ্মারোগীদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে) তাহার জন্য উপযুক্ত যত্ন লওয়া, নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন চালাইতে উৎসাহ দেওয়া, সর্ব্বোপরি তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বিশেষজ্ঞদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিবার সুবিধা ইত্যাদি। স্বাভাবিক জীবন যাপন করিবার উপযুক্ত হইলেও মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞেরা আবশ্যকবোধে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিতে পারেন, এবং আবশ্যকবোধে সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থাও করিতে পারেন, যাহা যক্ষ্মারোগীদের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি উক্ত সুস্থ রোগীরা যদি পুনরায় অসুস্থ হইয়াও পড়ে, তথাপি তাহাদের পক্ষে রোগ ছড়াইয়া সমাজের আরও পাঁচটি সুস্থ মানবকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিবার সম্ভাবনা থাকে কম। সুস্থ যক্ষ্মারোগীদের উপনিবেশ কেবলমাত্র যক্ষ্মারোগীদের জন্য নহে, সমস্ত জাতীয় কল্যাণের জন্যও ইহা সর্ব্বদেশে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলা দেশে দিন দিন যেভাবে দ্রুতগতিতে যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উপনিবেশ আশু প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, প্রতি শহরে, কলকারখানায় এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সাময়িক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য যে ভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া সরকার বাহাদুরেরও একান্ত প্রয়োজন। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য বটে। আমাদের দেশের বহু ধনী ব্যক্তি নানা সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া লোকের প্রভূত কল্যাণ করিয়া থাকেন, বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদেরও এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষে একমাত্র আরোগ্যভরমে "পানিপুরম" নামে বিলাতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুস্থ রোগীদের লইয়া একটি ছোট উপনিবেশ গঠন করা হইয়াছে। সুস্থ রোগীরা তাহাদের শারীরিক অবস্থানুযায়ী কাপড় বুনিয়া, ছাপাখানায় কাজ করিয়া, নানা প্রকার সেলাই, কাঠের দ্রব্য ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বহু সুস্থ রোগী স্বাস্থ্যনিবাসে নার্স, কম্পাউণ্ডার ও আপিসের অন্যান্য পদে কাজ করিতেছেন। বহু রোগী স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়া সুস্থ হইয়া স্বাস্থ্যনিবাসের সাহায্যে নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়া আরোগ্যভরমে অথবা অন্য কোনও স্বাস্থ্যনিবাসে কাজ করিতেছেন। ফলে সুস্থ হইয়া উঠিলেও তাহার শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনে স্বাস্থ্যনিবাসের সহিত সংযোগ রক্ষা করা তাহার পক্ষে সহজ হয়। আমাদের একটি বাঙালী বন্ধুর "থোরাকপ্লাষ্টিক" অপারেশন হইয়াছিল, সে ভদ্র মহিলা সুস্থ হইয় আরোগ্যভরমের বীজাণু-পরীক্ষাগার হইতে ছয় মাস ট্রেনিং লইয়া অন্য আর একটি স্বাস্থ্যনিবাসে বর্ত্তমানে কাজ করিতেছেন। আরোগ্যভরমের কর্ম্মকর্ত্তারা রোগী সুস্থ হইয়া উঠিলে তাহাদের উপযোগী অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া থাকেন।



আরোগ্যভরমের একটি 'জেনারেল ওয়ার্ড'

স্বাস্থ্যনিবাসে যাইবার পূর্ব্বে কি বাড়ীতে কি হাসপাতালে আমাদের মনের অবস্থা যে কিরূপ অবর্ণনীয় হইয়া পড়ে, তোমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না। যক্ষ্মার অপরাধে খুনী আসামীর মত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমাদের দিন কাটাইতে হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসে আসিবার পর আমাদের মনের আমূল পরিবর্ত্তন সত্যই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। প্রত্যেক রোগী তাহার অবস্থা, তাহার পরবর্ত্তী জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায় স্বাস্থ্যনিবাসে। স্বাস্থ্যনিবাসের প্রত্যেক রোগীকে তাহার জীবনের মূল্য, রোগের গুরুত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাহা বাহিরে বহু অর্থের বিনিময়েও পাওয়া কঠিন। আমি যখন বাহিরে ছিলাম তখন চিকিৎসকেরা ও অভিজ্ঞ লোকেরা রোগ সম্বন্ধে মুখে কত উপদেশই দিয়াছিলেন, কিন্তু সে-সব উপদেশ বুঝিয়া সম্পূর্ণ মানিয়া চলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, কাহারও পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব হয় না। কিন্তু আমার এক বৎসরের স্বাস্থ্যনিবাস-জীবন আমায় যে শিক্ষা দিয়াছে তাহা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ, সে-শিক্ষা

পরবর্ত্তী জীবনে আমার পক্ষে ভোলা হয়ত কখনও সম্ভব হইবে না।

আমি জানি ব্যাধিগ্রস্ত সকলের আর্থিক অবস্থায় স্বাস্থ্য-নিবাসের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হইয়া উঠে না, কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্থবানদেরও এ সুযোগ গ্রহণ করিতে প্রায়ই তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। আর্থিক অবস্থা অনুকূল হইলে প্রত্যেক রোগীর স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা একান্ত উচিত। স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই, সব সভ্যদেশেই দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য সরকার ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া থাকেন, তাই সময়মত বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা তাহাদের সকলের পক্ষেই সম্ভব ও সহজ হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের সরকার এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত তেমন তৎপরতা দেখাইতেছেন না। সরকারের নিজ স্বার্থের খাতিরেও এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ব্যাপক ভাবে যত দিন সরকারী সাহায্য না পাওয়া যায় তত দিন অসহায়ের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে জাতির মহা সর্ব্বনাশ হইবে। কয়েকটি ছোটখাট বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হুইয়াছে এবং হইতেছে সত্য, কিন্তু যেভাবে আমাদের দেশে দিন দিন এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে দুই-একটি প্রতিষ্ঠান সমগ্র জাতির পক্ষে নিতান্তই নগণ্য। জাতির কল্যাণের জন্য জনসাধারণেরও প্রচুর দায়িত্ব আছে, আর কালক্ষেপ না করিয়া বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত, তাহা হইলে সরকারও এই দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইবেন।

আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমি বোধ হয় তোমার ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করিতেছি, কিন্তু আমার আশা আছে আমার মত দুর্ভাগারা আমার এ কাহিনী প্রাণ দিয়া অনুভব করিবে। যে দুঃসহ জীবন তাহারা যাপন করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের ধারণা মৃত্যু ছাড়া ইহা হইতে মুক্তি নাই, আমার এ অভিজ্ঞতা তাহাদের নিরাশ প্রাণে খানিকটা সাহসের সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই, যেমন আমি নিজে সাহস পাইয়াছিলাম স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়া। ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর প্রথম স্বাস্থ্য-নিবাসে গিয়াই আমার নিজের জীবন সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। একজন রোগী অপর রোগীর জন্য কতখানি সম-বেদনা প্রকাশ করিতে পারে, তাহাকে কত শীঘ্র কত আপন করিয়া লইতে পারে তাহার অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে স্বাস্থ্য-নিবাসেই। পৃথিবীর জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আমরা একই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া একত্রে মিলিয়াছিলাম আরোগ্যভবনে। সেখানে আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল একটি মধুর প্রীতির সম্বন্ধ, আমরা জানিতাম এখানে ব্যাধির অপরাধে আমাদের কেহ ঘৃণা করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করিবে না। সত্যই দুঃসহ দুঃখ ও অসহ্য বাধার মধ্যে এমন আনন্দ, এমন শান্তি কোথাও আমরা পাই নাই।

এইবার আমি আমাদের চিকিৎসকদের কথা বলিয়া আমার এ পত্র শেষ করিব। তাঁহাদের বিষয় সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা আমার এ ক্ষুদ্র শক্তি, অপটু লেখনী দ্বারা সম্ভব নহে, কিন্তু তাঁহাদের বাদ দিলে আমার অভিজ্ঞতা আমার শিক্ষার কোনও মূল্যই থাকে না। আরোগ্যভবনের চিকিৎসকেরা আমাদের জীবনে শুধুই চিকিৎসক ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, অভিভাবক ও বন্ধু। তাঁহাদের যেমন আমরা ভাল-বাসিয়াছি, ভয় করিয়াছি, তেমনি করিয়াছি শ্রদ্ধা। চিকিৎসক-দের এমন কি আরোগ্যভবনের প্রত্যেকটি কর্ম্মচারীর ব্যবহারের কথা বিশদ ভাবে লিখিতে গেলে আমার এ পত্র দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিবে। এত নিকট সম্বন্ধ গড়িয়া না উঠিলে অত দীর্ঘ দিন কাটান হয়ত কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইত না। আরোগ্যভবন আমাদের দিয়াছে নবীন জীবন, সেখান হইতে লাভ করিয়াছি আমরা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। এ ঋণ শোধ করিবার নয়।

পথের আলো

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আজো কি তেমনি আছে শরতের হাসি,
তেমনি কি অপরূপ—দিনে ঝরে সোনা,
রাতে উচ্ছ্বসিয়া পড়ে রূপার ঝরণা,
তেমনি দিগন্ত ওঠে আনন্দে উদ্ভাসি ?
সবুজ অঞ্চলে ভরা শুভ্র পুষ্পরাশি
ধরণী কি আজো স্নিগ্ধ-শ্যামলবরণা ?
প্রিয় পাশে আসি ধীরে কুণ্ঠিতচরণা
বলে কোন বালা আজো, 'বাসি, ভালবাসি' ?

কালোয় বিলীন যদি আকাশের নীল
মেঘে যদি ঢেকে থাকে অম্লান শরৎ
পবন উদ্দাম হয়, সাগর ফেনিল,
লুপ্ত বর্ত্ম, নাহি দেখা যায় ভবিষ্যৎ,
তিমিরে আপনহারা হয় এ নিখিল
হে লক্ষ্মী, প্রদীপ ধরি দেখাইও পথ !

বাঁশবেড়ের বিবাহ-বাড়ি

শ্রীমহাদেব রায়, এম-এ

১

কিরীটি এক দিন জনারডাঙ্গা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "আর শুনেছ বাবা, চকাইদীঘির চট্টোপাধ্যায়দের ঘরে নির্মল আমাদের শিবু বড়ালের মেয়ের সম্বন্ধ করতে ছুটেছিল। শুনলাম—পণাপণ সব ধার্য হয়ে গেছে—আগামী বেস্পতিবার পাকা দেখা। চকাইদীঘির ও চট্টোপাধ্যায় ঘরটা ত আমাদেরই সর্বানন্দী ঘর না!" তপেন্দ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল—"হুঁ। কিন্তু নির্মল এই সব করছে—সত্যি খবর নাকি?"

"হ্যাঁ বাবা সত্যি—চকাইদীঘির লোকের মুখেই শুনলাম কি না। নির্মল শিবু বড়ালের খুব প্রশংসা করে এসেছে—বলে এমন লোক হয় না, যেমন চরিত্রবান্, তেমনি সদাশয়, মেয়েও তেমনই: এ মেয়ে ঘরে আনলে দেখবেন—ঘরে আপনার লক্ষ্মী-শ্রী দিন-দিন বেড়ে উঠবে। এক কথাতেই নারাণ চাটুয্যে রাজি হয়ে গেছে। নির্মল শিবুকে নিয়ে আশীর্বাদী করতে যাচ্ছে শুনলাম।"

তপেন্দ্র শুধু নীরবে শুনিয়া গেল। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই সে গোপীবল্লভের দরজায় গিয়া উপস্থিত। "গুপী, আর ত মান থাকে না ভাই—আমাদেরই চাটুয্যে ঘরে শিবেটা ঢুকতে গেছে রে!"

"কোথা—কোথা তপু-দা?"

"চকাইদীঘির চাটুয্যে ঘরে। নির্মল্যা এই সম্বন্ধের কথা কয়ে এসেছে। পরশু আশীবাদী—এক্ষুনি এর বিহিত কর—করা চাই। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয় গুপী? ওই পোলু স্যাঁকরা তোমার বাড়ীতে থাকে না?—ও ত চকাই-দীঘিরই লোক। ওকে পাঠালেই ত কাজ হয়ে যাবে মনে হয়। এ সম্বন্ধ কিন্তু ভাঙতেই হবে ভাই।"

"নিশ্চয়! এ আর বলতে দাদা। সেখানে আর শিবু বাছাধনকে হালে পানি পেতে দিচ্ছিনে।"

গোপীবল্লভ চট্টরাজ, ভাগবত চট্টরাজ এবং তপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি গোপনে প্রহ্লাদ স্বর্ণকারকে ফিস ফিস করিয়া মন্ত্র-দীক্ষা দিতে লাগিল। তিন জনেই নিকষ-কুলীন—সর্বানন্দী বংশ। একে ব্রাহ্মণ—মাথার ঠাকুর; তায় পাকা সোনা। স্বর্ণকারের পো নিজেকে কতই না ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিল। অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেবতা বোধ হয় মৃদু হাসিলেন।—"স্বর্ণকারের পো, যে সাধু সমাজে পড়েছ, কোটি জন্ম এই কর্ম ক'রে না কাটে।"

প্রহ্লাদ যেদিন চকাইদীঘিতে গিয়া পৌছাইল, তাহার আগের রাত্রিতেই পাকা দেখা হইয়া গিয়াছে। নারায়ণ-বাবুর বাড়িতে কিয়া কুশল-প্রশ্ন হিসাবে সে প্রথমে একথা-ওকথা পাড়িল। শেষে আসল কথা পাড়িবার ভঙ্গি সুরু করিল—"কানু-দাদার নাকি বিয়া দিচ্ছেন বাবু!"

"হ্যাঁ, কাল ত পাকা দেখা হ'ল। ফাল্গুনের প্রথমেই লগ্নও স্থির হল পোলু!" হেঁ, তা ইবেরে বিয়া দিবেন বইতন কি। তা' দাদাকে আমার যে জামাই করবেক বাবু, তার কিন্তু ভাগ্যি বলতে হবেক। একে আপনাদের বংশ—তায় অমন রূপ, গুণ, স্বভাব—এমন কটা ছেল্যার হয় বলত দেখি! তা' কুথায় হ'ল বাবু?"

"কেন, তুই যে চম্পকতটীতে থাকিস না? তার পাশেই ত বাঁশবেড়ে' রে! শিবু বড়ালের মেয়ে।"

"হঁ-হঁ—আগে আগে একটুকুন কানাঘুষা শুনেছিলম বাবু—ত বলি আমাদের উনারা কি ইয়াদের ঘরে ছেল্যার বিয়া দিতে আসছে? সেই লিয়ে ত চম্পকতটীর গুসাঁই ঠাকুরদের সঙ্গে আমার দু-কথা হয়েই গেল আজ্ঞা। উনারা বললেক—হঁরে হঁ, তুই জানিস নাই—হচ্ছে, হচ্ছে। আমি বলি—না, তা কেমন করে হবেক? এখন দেখছি—মিছা লয়, সত্তিই বটে।"

"কেন বল দেখি পোলু? না করবার মত নাকি?"

"না বাবু, আমি আর বলব কি? আমি ত আপনকাদের এঁঠ্যা পাতের চাকর আজ্ঞা। অই মেয়্যার কথা আর কি! না হালে কানুদাদাও পাত্তর, আর, অন্তও পাত্তর আজ্ঞা। তার উপর এই ঘর।"

"কেন, মেয়ের কি? খুলে বল তুই—সঙ্কোচের কিছু নেই।"

"না বাবু, অত শত কথা কেনে মিছামিছি? আমার ত মনে হয়—আপনারা সজাসজি বলে দাও গা যায়ে যে ই বিয়াটি হবেক নাইখ। আপনকাদের ঘরের মতন একটা ঘর চিরকালের লাগে লষ্ট হয়ে যাবেক, আর আমরা জানে শুনেও তা বলব নাইখ—ই একটা কথা আজ্ঞা!"

"কিন্তু না পোলু, শিববাবুর মত লোককে আমি জবাব কি করে দি বল ত! তাছাড়া, আমাদেরই ঘরের ছেলে নির্মল এর মধ্যে রয়েছে যে!"

"তা বলে কি একটা রগ্‌না মেয়্যা ঘরে ঢুকায়ে বংশটাকে ছারখার করবেন বাবু?"

নারায়ণবাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীধরবা পৃথগন্ন হইলেও কাজে-কর্মে তাঁহার মতামত চাইই। তিনি আসিয়া প্রহ্লাদের জের-টানা কথাটুকু শুনিতে পাইলেন।

"কি ব্যাপার? প্রহ্লাদের কি খবর?"

"আজ্ঞা না,—অই বাঁশবেড়্যার মেয়্যাটির কথা হচ্ছে, অই যেটির সঙ্গে আপনারা কানুদাদার বিয়া দিচ্ছ গো!"

"হ্যাঁ—তার কি হ'ল কি? কি বলছে পোলু নারাণ?"

নারায়ণবাবু বলিলেন—পোলু খুলেও কিছু বলে না—অথচ, সম্বন্ধ ভেঙে দিতে বলছে। শিবনাথ বাবুর মত সদাশয় লোক—তা ছাড়া নির্মল রয়েছে এর ভেতর। কেমন যেন লাগছে না দাদা?

"না নারাণ, ব্যাপারটা কি শোনই না! একটা জন্ম বেঁধে কর্ম—হলেনই বা শিবনাথবাবু, আর নির্মলই বা এল। পাকা দেখাই বা হ'ল, তাতে কি? আমরা বেটার বাপ, একটা বিচার করে দেখতে হবে ত। পোলু কি আর আমাদের

অনিষ্ট করতে এসেছে। আর ওর ভাঙচি দিয়ে লাভই বা কি বল!"

প্রহ্লাদ বলিয়া উঠিল—"না বাবু, বদ মতলব যদি থাকে ত কুষ্ঠ ব্যেরাধি হবেক। কি বলব—কানুদাদার মতন পাত্তরের বিয়ার অভাব! তা বল অই একটা লিকলিকা রগ্না মেয়্যা ঘরে ঢুকবেক—আর আমরা বলব নাই—ই একটা কথা আজ্ঞা?"

শ্রীধরবাবু বলিলেন—"কি? মেয়েটির কিছু অসুখ-বিসুখ আছে নাকি? কই, তা-ত শুনি নি, কিংবা টেরও পাই নি।"

"আপনকারা শুনবেই বা কি করে, আর টেরই বা পাবে কি করে? আমরা ত এইটুকুনের থাকে উখেনে মানুষ আজ্ঞা। মেয়্যাটির মাতামহর রাজযক্ষ্মা ছিল—তা মেয়্যার মায়ের চেহেরা দেখলেই বুঝা যায়। তা তাঁর নিজের দেহটি না-হয় আজতক জড়া-তালি দিয়ে চলে গেল। কিন্তু মেয়্যাটিকে ধরেছে যে এই বয়েসেই। এই গেল্ল মাসেও ত রমেন ডাক্তার ইংজিংশন দিয়ে গেছে।"

শ্রীধরবাবু বলিলেন—"না নারাণ, ও বন্ধ করে দাও: পরশু ত গাত্রহরিদ্রার দিন। গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব আমাদেরই আগে যাওয়ার কথা। গাত্রহরিদ্রা না পৌছালেই বুঝবে ব্যাপার অন্য রকম গড়িয়েছে। তারপর সংবাদের জন্যে লোক ত তাদের এখানে আসবেই তখন পণের যে আট শো টাকা দিয়ে গেছেন, ফিরিয়ে দিলেই হবে। খুব উবগারটাই করেছে পোলু আমাদের।"

নারায়ণবাবু নীরব। মুখ দিয়া বাক্স্ফূর্তি হইল না।

"দেখুন দেখিনি—ই একটা কথা আজ্ঞা?"

প্রহ্লাদ নারায়ণবাবুর গৃহে সমোদক জলযোগান্তে হৃষ্টচিত্তে চম্পকতটীতে ফিরিল, এবং নিজের সাফল্যের বার্তা সালঙ্কারে বিবৃত করিয়া তপেন্দ্র, ভাগবত ও গোপীবল্লভের অজস্র আশীর্বাদ কুড়াইল। নিকষ-সন্তান তিনটির সে কি আহ্লাদ! তপেন্দ্র-তনয় কিরীটি ত আহ্লাদে আটখানা। কানাকানি সুরু হইয়া গেল—চকাইদীঘিতে শিবু বড়ালের মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। কথাটা মেয়ের বাড়িতেও আসিয়া যে না পৌছাইল তাহা নয়। তবে সকলে সে কথায় ততটা কান করিল না। শিববাবু ত নয়ই

নির্মল কর্মস্থল হইতে স্ত্রী নির্মলাকে লিখিয়াছে—সে বিবাহ-বাড়িতে উপস্থিত হইতে পারিবে না—ছুটি হইবে না: কিন্তু নির্মলা যেন তাহাদের উভয়ের আবাল্যশিক্ষক আদর্শ-চরিত্র শিববাবুর মেয়ের বিবাহে সর্বকর্মে সহায়তা করে। প্রতিবেশী তপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে নির্মল ভাল করিয়াই চেনে।

(২)

পড়ন্ত বেলায় বাঁশবেড়ের বড়াল-বাড়িতে অনুষ্ঠানের কোলাহল এতটুকু নাই; কিন্তু কাতারে কাতারে নরনারীর সমাগম সুরু হইয়াছে। সজন বান্ধব বলিতে অতি আত্মীয় ছাড়া গ্রামে কয়জনই বা মিলে; তবু বিভাকরবাবু, ভূপালবাবু প্রভৃতি শিববাবুর পার্শ্বে বসিয়া এখনও যথাযোগ্য আশ্বাস দিতেছেন। কিন্তু কি বলিয়াই বা এ মুহূর্তে যথার্থ সান্ত্বনা দিবেন? সহানুভূতির পরিবর্তে চতুর্দিকে সহস্র কণ্ঠে এই অসাফল্যের আনন্দই সমধিক ঘোষিত হইতেছে। দুই-একটি পল্লীনারীর কৌতুকের নাটকীয় ভঙ্গিতে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। ভট্টাচার্য-গৃহিণী মেয়ের মার কাছে আসিয়া আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে সুরু করিয়াছেন—"ভেবে আর করবি কি? তখন তো আর আমাদের কথা শুনলি না! এগারো-বারো বছর বয়সে যদি সেরে দিতিস, তাহলে আর এত কাণ্ড হ'ত কি? তা আমাদের কথা আর শুনলি কই? শিবু-ঠাকুরপো তো আমাদের কথা কানেই তুলে না। আমরা মুক্খু মেয়ে, সে পণ্ডিত লোক। তাই এ কথার মধ্যে আসতেও চাই নি, বলতেও আসি নি। কিন্তু এই বিপদের সময় কি আর ঘরে থাকা যায়?"

কিরণবউ বলে—না মা, আমার খিরিটার যে সেই সাত বছর বয়সে সারে দিঁয়েছি, ভাবনার দায় এড়াইছি। মেয়্যা বড় রাখলেই বিপদ—তায় তুমাদের বামুনের ঘর।

ভট্টাচার্য-গৃহিণী নিজের ধান-ভানুনি কিরণকে লইয়া বাড়ি চলিয়াছেন। শিববাবুর দরজা পার হইয়াই অম্ল-মধুর আলোচনা সুরু হইয়া গেল। "দেখলি কিনুবউ, শিবু বড়ালের কীর্তি কেমন ধরে' ফেলেছে। তোমার ধূর্তপনা এইখানেই সাজতে পারে; সব জায়গা তো আর বাঁশবেড়ে নয়। আমরাও তো জানতাম —মেয়ের ঠাকুরদা' কাশে মরেছে। বড়াল-গিন্নির ফুরুক-ফারুক এতদিন বেশ চলে গেল। মেয়ে গোড়া থেকেই লিক্‌লিকে। ধরে'ওছে তাই তাকে এই বয়েসেই। অনেক দিন তো তিকিচ্ছেও করা'লে। বলে যে গোড়ায় গোড়ায় তিকিচ্ছে করা'লে এগুলো সেরে যায়!"

কিরণ বলে—বামুন মার এক কথা। উসব কেনে হতে যাবেক গো? শুন নি অই যে লক্ষ্মীডাঙ্গার নির্মলবাবু গো—খুব যাওয়া-আসা চলছিল যে ক দিন। গল্প-গজল্লা-হাসি-ঠাট্টা। মেয়্যা ত আগে থাকতেই তিয়ারি। ইবেরে সামলাও ঠেলা। ইন্‌জিংশন কিসের জান মা! কাল ত তুমাদের গেঁড়ু বউ বল-লেক গো—বলে, কি বেহায়া মেয়্যা বাবা—ছিঃ! কুমারী মেয়্যা—কদিন আর লুকান থাকবেক মা এই সঅ কাণ্ড।

অদূরেই কোথায় খোঁড়া গোপাল ছিল দাঁড়াইয়া; সোজা আসিয়া কিরণের মাথার উপর লাঠি তুলিয়াছে—"মাগি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। আপন মন নিয়ে তুনিয়ে শুদ্ধ দেখছিস পিণ্ডির চোখে। ফের যদি সৎলোকের চর্চায় থাকিস, জ্যান্ত রা'খব না মাগি। আর, হ্যাঁ ভট্‌চায-গিন্নি, তোমরা তো আড়ালে আড়ালে শিববাবুর বাড়ির শ্রাদ্ধটা করতে খুব মজবুত, ধান-ভানুনিটিও জুটিয়েছ তেমনই। বলি—চিরটা কাল কি এমনি করেই কাটবে? শেষ বয়েসটায় একটু হরিনামে মন দিলে হ'ত না?"

"হ্যাঁ রে ছোঁড়া, হরিনাম তোর বউকে করাগে যা,—পবিত্র হবে। আর না-হয় দুজনে শিবু বড়ালের ঘরগুষ্টির—বিশেষ করে' ঐ ধিঙ্গি মেয়েটার চরণামৃত পান করগে যা দুবেলা।"

কিরণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠে—চল মা চল, কেনে মিছামিছি দুষ্টুগুলার সঙ্গে? যাবি উচ্ছন্ন—অইত খড়া ল্যাং ল্যাং হইছন—ইবেরে আঙুলগুলি পড়ে মা-দুর্গা করে।

'মা দুর্গা তোর'…বলিয়া খোঁড়া গোপাল আরও কি বলিতে যাইতেছিল। শিববাবুর অন্য এক ছাত্র পূর্ণ তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল—কাজ কি বাবু এখন অত শত কথায়? ঘরের চার দিকে আগুন, পার তো সেইটে নেবাবার চেষ্টা কর—পরের ইতরামি.তে কান দেওয়ার সময় এখন নয়। শুনলাম—নির্মলা দেবী শিশু সন্তানকে নিয়েই ট্যাক্সিতে করে' চকাইদীঘি রওনা করেছেন—ভাঙা সম্বন্ধ গড়বার আশায়। ফলাফলটার উপর এখন নির্ভর।

"মাথার উপর ভগবান আছেন পূর্ণ কাকা। দেখবে তুমি, বলে রাখলাম এ বিয়ে আটক হবে না। তাহ'লে তো চন্দ্র-সূর্য মিথ্যা হে। কাল কন্দর্প খুড়ার কাছে আবার কি সব গল্প করেছে জান তপুর ছেলে কিরীটি?—বলে ভারি শিবু বড়ালের মুরোদ, তাই বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেছে!"

"বলুক ভাইপো বলুক। এখন সব সহ্য করে' চল। কাজ সিদ্ধ হ'লে তখন এর কথা। নির্মলা দেবী এমনি ফিরবেন না বলে'ই তো ভরসা। সঙ্গে যে তার হারু চাকর গেছে, সে-ও তার একটা কম বল নয়। দেখা যাক্—মা মঙ্গলময়ী কি করেন।"

(৩)

দুই দিন পরে—

প্রভাতে হারু ক্ষেতের কাজে চলিয়াছে। পথেই কিরীটির সঙ্গে দেখা। "কিরে হেরো, তোর মুনিব-গিন্নি নাকি চকাই-দীঘি ছুটেছিল! কি রকম, ছুঁচো মুখ বুঁচো করে' ফিরতে হয়েছে তো!"

"আজ্ঞা না, বিয়া-ঘরটা ত আর আপনারা আটকাতে লা'রবেন আজ্ঞা।"

"কেন, পাকাপাকি হয়ে গেল নাকি সব?"

"আজ্ঞা হঁ, কা'ল ত বিয়া হবেকেই।"

"ওরে, তপু মুখুয্যের ছেলে কিরীটি থাকতে নয়। অমন কত নির্মলা দেখলাম। আর তোর অত কিসের রে বাপু? কবে এক কালে ফাষ্টবুক পড়িয়েছে, তার জন্যে স্বামী-স্ত্রী চিরটাকাল করছে গোলামি।"

"তা আজ্ঞা; নির্মলবাবুকেও মানুষ করেছেন শিববাবু—আর মাকেও আমার মেট্রিক নাকি পাস করালেন ত তিনিই। শুধু তাও নয় আজ্ঞা, মায়ের যে এত পূজাআচ্চা, শাস্তর পাঠ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সৎ কথা, আমাদের মত গরিব-দুখীদের দেখাশুনা দু-বেলা, তার শিক্ষাও ত শিববাবুর কাছেই।"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ, ভারি তোর শিববাবু। যেমন গুরু, তেমনি তার শিষ্য-শিষ্যান্। গোটা গাঁটার ছেলে-মেয়েকে নষ্ট করতে বসেছে, আর বাউরি-চোয়াড়কে মাথায় তুলছে।"

"তা যদি বললেন আজ্ঞা, তবে আপনকাদের কাজগুলাই বামুনের মতন লয়থ "

"কি কাজগুলা বামুনের মতন লয়রে বেটা? তা বলে' ঐ বড়াল-ঘরের মেয়ে যাবে চাটুয্যে ঘরে, আর তাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে হবে নাকি?"

"কিন্তু বিয়া ত আর আটকাতে লারবেন আজ্ঞা।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ" বলিয়া কিরীটি গৃহাভিমুখী হইল। হারু আপনার কাজে যাইতে যাইতে আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে—"বামুন হইছিল? কুলীন বামুন?—নিকষ কুলীন? 'ঘরে নাই তুচি ভাং, বেটার নাম দুগ্‌গারাম'। এই ছেল্যার বৌ করে' আনবেন তপু মুখুয্যের শিবু বড়ালের মেয়্যাকে। হুঁ, কুথায় বিজয় চটরাজ, আর কুথায় এই অবগণ্ড—মুকখুর ঢেঁকি!"

"এত গজ গজ করতে করতে কোথা যাচ্ছ হারুদা?"—শিব-বাবুর মেয়ে জয়ন্তীর প্রশ্ন।"

"এই যে দিদিঠাকরুন। না দিদি—এই আমাদের মুখুজ্জা বামুনের কথা। তা' ছাড়ে' দাও উনাদের কথা। হ্যাঁ', কিন্তু পড়বে দিদি তুমি একটা ঘরে—রাজ-রাণী হবি দিদি। যেমন শ্বশুর, তেমনি শাশুড়ী, ঘর, বর।"

জয়ন্তী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"অত কাহিনী জুড়তে তোমায় কে বলেছে হারুদা?"

"না দিদি, তোমার ভাগ্যি দেখে আমাদের কি আনন্দ বল দেখিন। হ্যাঁ বিজয় তো বিজয়ই বটে। সাধে কি বাবু আমার অত করে' লিখেছেন মাকে—এ পাত্রকে হাত-ছাড়া হতে দিও না নিমু; জয়ন্তীর এই যোগ্য বর তোমার চেষ্টায় যেন বাঁধা পড়ে।"

"হারুদাদা একটা পাগল" বলিয়া জয়ন্তী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

(৪)

শঙ্খ-উলুতে বাঁশবেড়ের বড়াল-বাড়ি আজ মুখরিত। মণ্ডপে অতি-মনোহর পুষ্পহার শোভা পাইতেছে—নির্মলার নির্দেশক্রমে 'বিজয়-জয়ন্তী' লিপির পুষ্পহার। দেশ-বিখ্যাত সানাইদার মহেন্দ্রর সানাইয়ে আজকার 'বিজয়-জয়ন্তী'তে জয়-জয়ন্তীর মনোহর তান। তপেন্দ্রও সপরিবারে নিমন্ত্রিত। বুকে তার ঈর্ষ্যার বহ্নি-জ্বালা। ওদিকে নির্মলার সদর্প গতি-ভঙ্গি দেখিয়া কিরীটির গাত্রজ্বালা ধরিয়াছে। খুড়তুত ভাই সীতানাথকে ডাকিয়া কানে কানে বলিল—'হার'মজাদির ফরফরানি দেখেছ দাদা! ওঃ! আমাদের বংশে যেমন একটা কুলাঙ্গার জন্মেছিল, তেমনি তার একটা ধিঙ্গি বউও জুটেছে। সীতানাথ আজ শিবনাথের কাছে বাহ্যতঃ উপচিকীর্ষা দেখাইতে আসিয়াছে—আসলে সে তপেন্দ্রের যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে শিবনাথবাবু বরযাত্রের আতিথ্য সৎকারে ব্যস্ত। সীতানাথ চিৎকার করিয়া উঠিল—তুমি বস না শিবু। আমরা কি জন্যে রয়েছি—সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। একে তুমি উপোস করে রয়েছ। আর ভারি তো বরযাত্র! কোন্ শালা ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করবে হে এখেনে? বেশি কিছু করতে এলে দেবো'খন তেমনি শেখা শিখিয়ে।

"চুপ—চুপ! শুনলে এখনি কি মনে করবেন ভদ্রলোকেরা সীতুদা! সবটাই তোমার বাড়াবাড়ি।" সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথবাবু গলবস্ত্রে অতিথি অভ্যর্থনা করিয়া পাত্র বরণের অনুমতি চাহিলেন। "মা নির্মলার কল্যাণে আমি আপনাদের কৃপাকণা লাভ করে আজ কৃতার্থ—দিন—অনুমতি করুন পাত্র-বরণের। আপনাদের যথা-যোগ্য অভ্যর্থনা…" বলিতে বলিতেই শিববাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

শিববাবুর কাতরতায় শ্রীধর বাবু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—"নিশ্চয়—নিশ্চয়!"…মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া শ্রীধর বাবুর

জ্যেষ্ঠপুত্র নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল—না বাবা, আমরা জানতে চাই শিববাবুর কাছে—ঐ যে তাঁর বাড়িতে একটি কৃষ্ণকায় কালপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, ওটি তাঁর কে। খামোকা ওঁর মুখ থেকে গালি-গালাজ শুনে' আমাদের ধঞ্জ করতে তো ভদ্রলোকের ছেলেরা আসেন নি এখানে।

শিববাবু অতি সঙ্কুচিত। "না-না—সে কি? কে কি বলেছে বাবা?" শ্রীধরবাবু হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হেঃ হেঃ, বে-বাড়িতে অমন বরযাত্র কন্যাযাত্রের কত কাণ্ড হয় যে বাপু! তোমরা কালকের ছেলে—রক্ত গরম। যাও—যাও, ওসব ধরতে নেই।"

বরযাত্রেরা সমস্বরে রায় দিলেন—না না—চল নীচু। ছিঃ, ছেলেমানুষি করে না। তপেন্দ্রর সঙ্গে কথা হইতেছে লক্ষ্মী ময়রার। 'দেখো, একটু হুঁসিয়ার বাপু—লোকসান-টোকসান বেশি না হয়। তোমরা পাকা লোক—একটু নজর রেখো।'

ওদিকে কিরীটি সের পাঁচেক চিনি আঁচলে করিয়া সরাইবার মতলবে ছুটিয়াছে। হারু দূর হইতে দেখিতে পাইয়া হাতের কাজ ফেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—'এই করে বিয়া নষ্ট করবে ঠাকুর? চল, ওটি রাখবে চল দেখি ভাঁড়ারে।' 'হেরো, এ কথাটা নিয়ে আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিস নে—এই নে তোর' বলিয়া ভাঁড়ারে গিয়া ঢালিয়া দিয়া সীতানাথের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া কিরীটি গজরাইতে লাগিল। সীতুদা, নির্মলটাকে কিন্তু জব্দ করা চাই। বউমানুষ হয়ে গিন্নিপনা করে সামলাতে এসেছে বড়াল-ঘর, মায় চাকর নিয়ে। আমাদের কুলীনের ঘরের মান-মর্যাদা আর কিছু রাখলে না হে। বাব্বাঃ, মেয়ের এ বাড়। আলবাত! থাম না তুই—আজই মজাটা দেখাচ্ছি। বলিয়াই সীতানাথ উঠিয়া পড়িয়াছে। ওদিকে গোপীবল্লভ মাছের হেঁসেল হইতে কখন সকলের অলক্ষ্যে সের পাঁচেক ভাজা মাছ তুলিয়া অঞ্চলগত করিয়াছে। সীতানাথের আঁচলে দিয়াই বলিল—'এগুলো সরিয়ে ফেল বেয়াই, কাল হবে হে এখন।' খোঁড়া গোপাল দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে—'কি ঠাকুর! এসব কি? শিবনাথবাবুকে তোমরা একবারে পথে বসাতে চাও নাকি? এই তোমরা নিকষ কুলীন বলে বড়াই কর ঠাকুর? তোমাদের কাণ্ডকারখানাগুলো যে চামারেরও অধম।' অমনি গোপীবল্লভ ও সীতানাথের রায়বেশে নৃত্য। 'বেটা, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। পা-দুটো হারিয়েছিস, তবু হুঁস হয় নি—এবার কুষ্ঠ ব্যাধি হবে।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে। এখন ঐ মাছ-গুলি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে হেঁসেলে রাখবে চল তো।' হৈ-হৈ শুনিয়া তপেন্দ্র আসিয়া চিরাভ্যস্ত ভঙ্গিতে সর্বজয়ী মাতব্বরের অভিনয় শুরু করিল—'কি হচ্ছে এই গপলা! ওদিকে দেখ চেয়ে—বরযাত্রেরা রাগ টাগ করে না চলে যায়—জল, পান, তামাক সব ঠিক ঠিক দে যেয়ে। এ ধারে তো এতগুলো ভদ্রলোক রয়েছি। যার যে কাজ, তা না—এখানে হাঁকরানো হচ্ছে।' খোঁড়া গোপাল আর বিশেষ উচ্চবাচ্য না করিয়া হেঁসেলের কাছাকাছি গিয়া বসিল—'দেখি কোন্ বেটা মুরুব্বি এবার বাহাদুরি করে।'

ওদিক হইতে শ্রীপদ ছুটিয়া আসিয়াছে খোঁড়া গোপালের কাছে—দেখে যাও গোপাল-কাকা কাণ্ডটা। "কি কাণ্ড বাবা, আর তো পারি নে। এমন করে' কাউকে যেন মেয়ের বিয়ে দিতে না হয়। চল—দেখি। এই পূর্ণ, এইখানটায় বস্ ভাই একটি-বার।" পূর্ণ হেঁসেলের কাছে পাহারা দিতে লাগিল। গোপাল শ্রীপদর সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

কোটা ঘরের পিছনে আসিয়া দেখে—অজস্র ফল জানালার কাছে পড়িয়া। উপর হইতে জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন—ভট্টাচার্য-গৃহিণীর এক আত্মীয়—শ্রীনাথ মহাপাত্র। ভট্টাচার্য-গৃহিণী সকন্যকা অঞ্চলে ঐ ফল লইয়া গৃহাভিমুখী হইতেছেন। পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল খোঁড়া গোপাল। "হ্যাঁ ভট্চায-গিন্নি, এই-গুলো কি ভদ্রঘরের মেয়েদের কাজ? আচ্ছা, তোমরা কি মনে করেছ—শিববাবুর মেয়ের বে'টা বন্ধ করে দেবে নাকি বল দেখিন্! এই সব দুর্মূল্য ফল এই দুর্দিনে তোমরা লুট করতে দাঁড়িয়েছ।"

"খবরদার ছোঁড়া, মুখ সামলে কথা বলবি। ফল আমরা দেখি নি—না? দুর্জন মহাপাত্রর মেয়ে—ধুরন্ধর ভটচাযের বৌ ফল চুরি করতে এসেছে তোদের। দেখগে যা না, আমার দোরে ঐ অত বরযাত্র কি কাণ্ডটা লাগিয়েছে। একটু জল না, একটু চা না, বিয়েবাড়ি করছেন, খোঁড়া পায়ে জিনিস আগলাচ্ছেন। ঠাকুরপো বললে—যাও বৌদি, ওবাড়ি থেকেই কিছু ফল-সন্দেশ আন, আমি ওদের আটকাচ্ছি।' তবে না আসা। নইলে ভটচায-ঘরের বৌ কারুর দরজায় পা দেয় না রে ছোঁড়া।"

"খুব হয়েছে ঠাকরুন, যাও; আর বেশি বাড়াবাড়ি করো না। আমার এখন অত সময় নাই তোমার রামায়ণ শুনবার কিন্তু ধন্যি ঠাকরুণ।"

ভট্টাচার্য-গৃহিণী গজ-গজ করিতে করিতে অঞ্চলের ফল সযত্নে সুরক্ষিত করিয়া ধীরে সুস্থিরেই বাড়ি ফিরিলেন। এ অভ্যাসে তাঁহার অনেক দিন হাত পাকানো।

(৫)

চতুর্দিকে গ্রাম্য মহিলার ভিড়। আলোকমালায় বরের স্বভাব-সুন্দর মুখ-শ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মহিলা-মহলে একটা 'আহা'র কাণাকাণি পড়িয়া গিয়াছে। বিজয়োল্লাসের শঙ্খধ্বনি করিতেছে নির্মলা। ভট্টাচার্য-গৃহিণী অর্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন—তা জ্ঞেতির ভাগ্যি ভাল, নইলে ঐ তো চেহেরা, ও-সব মেয়ে আজকাল পার হওয়াই দায় হয়েছে। তাতে অমন পাত্র। তবে, আমার দোরে যে রকম জটলা শুনলাম—শেষরক্ষে হলে হয়। বরের কাকাটির সঙ্গে কিরীটি মুখুয্যের কথা হচ্ছিল কিনা! বলে উঠলেন—ছেলের আবার বে' দিতে হবে। এ মেয়ে ঘরে তুললে 'ছি ছি'তে দেশ ভরে যাবে।

পাড়ার সুশীলা মেয়ে গৌরী বলিল—ভটচায-কাকী, ওসব কথা তোলাটা কি এখন ভাল? যখন যা হবে, তখন তাই হবে; এখন বে'টা তো চুকুক।

"তোরা কালকার মেয়ে বই ত ন'স গৌরী। এ সবের ঢেউ কোথায় উঠে যে কোথায় মিলোয়, তোরা জানলে ভাবনা কি ছিল? ভাবনা তো তারই জন্যে। নইলে ভাল হলেই তো ভাল।"

সীতানাথ আসিয়া চুপি চুপি শিবনাথকে বলিল—"বাঃ ভাই, বর জুটিয়েছ বটে, যেন কন্দর্প-কান্তি। না হোক নিকষ, এমন রূপ কিন্তু দেখি নি। শুনছি—দেখেও মনে হচ্ছে—স্বভাব-চরিত্র ছেলেটির খুব ভালই। জমিদার-ঘর। এমন ছেলে! নাই বা হল নিকষ। নিকষ নিয়ে কি ধুয়ে খেতে হবে?

কথাটার মধ্যে আত্ম-গরিমার শ্লেষটুকু ধরিতে শিবনাথবাবুর বিলম্ব হইল না। শুধু স্মিতহাস্যের নীরব উত্তর দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

বিশিষ্ট অধ্যাপক স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বিবাহের মন্ত্রপাঠ করাইতেছেন—প্রায় অর্ধেক কাজ সমাধা হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় শিববাবুর কুল-পুরোহিত নিমাই ভট্টাচার্য বিক্রয়-নন্দিনী গ্রামের জরু গোসাঁইয়ের সহিত গুলতানি পাকাইতে পাকাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত পথ মশ্‌গুল করিয়া আসিতেছেন—"টাকার জোরে শিবু খুব মেরে দিলে জরু। আরে আমরা তো সাতপুরুষে পুরুত ওদের। কিন্তু ওদের কোনদিন···হা হা হা।" শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। জরু বলিয়া উঠে—"আর বল কেন ভাই? বলে যে টাকার অসাধ্যি কাজ নেই, তা সত্যি—কালে-কালে যে কতই দেখব?"

পুরোহিত নিমাইয়ের বিশিষ্ট পাদ্য-অর্ঘ্যের ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ হইয়া গেল। জরুসহ প্রথম জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া হুঁকায় টান দিতে দিতে নিমাই বাহিরের লোককে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"কেন, আমি কি এখনও কচি খোকাটি আছি যে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে হবে? তবে অতগুলো পরীক্ষা দিয়ে এলাম কিসের জন্যে? যে সে টোল নয়—তীর্থপতি টোল। আমার চেয়ে বড় হ'ল এই অপোগণ্ডগুলো—ছ' পাতা স্মৃতি পড়ে? কি জানে কি? কতটুকু পড়েছে? কই সাধুক তো দেখি নি 'কুশণ্ডিকা' পদ! শিবু কি শেষে শুভ কাজে একটা অকল্যাণ ঘটাতে চায় নাকি?"

শ্রীপদ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টায় একছিলিম গাঁজা ধরাইয়া দিয়া বলিল—তুমি আপনার পাওনা পেলেই তো হল ঠাকুর!

জরু গোসাঁই তখন নিমাইকে লইয়া একটু অন্তরালে আসিয়া দেখে কিরীটি। "হ্যাঁ কিরীটি, তুই তপুদাদার ছেলে হয়েছিলি রে? এই বে'টা আর বন্ধ করতে পারলি নে বাবা?"

"জরু খুড়ো, মেয়ে প্রবলা হলে সে সমাজের আর মান থাকে? তোমাদের নির্মলবাবু যে বড় ভদ্দর নোক গো—তাঁর ইস্ত্রীই হলেন কাল—অই যে ফর ফর করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

গ্রামের ক্ষত্রিয়-সন্তান কন্দর্প সিং নিমাই ও জরুর পথের আলোচনা হইতে কিরীটির সঙ্গে কথোপকথন পর্যন্ত সমস্ত শুনিয়াছে—আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিল না। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"সাধে কি বলেছে ঠাকুর 'মুখোটি কুটিল অতি, বন্দ্যঘাটি সাদা'। সাদা বন্দ্যঘাটি শিববাবু, তার ঘরে কুটিলপনা করতে এসেছ তোমরা।"

সঙ্গে সঙ্গে গোসাঁই ঠাকুর চিৎকার করিয়া উঠিল—"কি বললি?—কে রে তুই?"

"যে-ই হই ঠাকুর, তোমায় বলি নি। তবে তোমাকেও বলি শোন—বলি, শিববাবুর চর্চা করতে এসেছ যে বড়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই বাঁশবেড়েরই বামুনরা ঘুষ নিয়ে তোমাদের এক গাঁতায় চালিয়েছে না? তোমাদের সাতপুরুষে কলঙ্কের কথা এ অঞ্চলটায় জানে না কে? আমার নাম কন্দর্প সিং। হাটে হাড়ি ভেঙে দেবো ঠাকুর। এসেছ, এক পেট খেয়ে বিদেয় হও, চিরটাকাল যা চেটে চেটে মাছির জীবন যাপন করে' বেড়িও না।"

জরু গোসাঁই রাগে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। কিরীটি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—বাবা, সীতুদা, উঠে' চল এখান থেকে। ইতরের মুখে অপমান। উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

কন্দর্প আরও ফোড়ন দিয়া বলিল, "নাঃ, তোমার হাতে শিববাবু মেয়েটাকে সঁপে দিলেই ঠিক সম্মানটা হ'ত। বামুনের ঘরের বাঁদরের গলায় সোনার হার মানাত ভাল।"

তপেন্দ্র পুত্রের সিংহনাদ শুনিয়া উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। "কি হে, শিবু গেল কোথা? এখানে কি এই রকম ইতরের অপমান সহ্য করতে হবে নাকি? মেয়ের বিয়ে কি কেউ আর দেয় নি? যত সব চোল-চোয়াড়ের কাণ্ড-কারখানা।" কন্দর্পর আর সহ্য হইল না। তাহারও শরীরে ক্ষত্রিয়ের রক্ত বহিতেছে। সে জরুকে ছাড়িয়া তপেন্দ্রকে লইয়া পড়িল। "জানি ঠাকুর, বামনাই তোমাদের। খুব তো বিয়েটা ভাঙবার মতলব করেছিলে। শেষ স্যাঁকরার শ্রীচরণ সম্বল করতেও বাকি রাখ নি। এখন যে খুব আবার বামনাই দেখাতে এসেছ। কি মন্দ কথাটা বলেছি গোসাঁই ঠাকুরকে? না, পরচর্চাটা বুঝি আজকাল তোমাদের পেষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের তো নিকষ-কুলীন বলে লেজে হাত দেওয়া যায় না—আবার, জরু গোসাঁইয়েরও লেজ যে দেখি এত বড় ঠাকুর। আর এতে বামুনদের উপর ভক্তি থাকে? তোমাদের গোপীবল্লভ তো সেদিন পাড়াময় খুব বাহাদুরি করে' বেড়াচ্ছিল—হ্যাঁ, শিবু বড়ালের মেয়ে পড়বে চকাইদীঘিতে। তবে তো গোপীবল্লভ নামটাই মিথ্যা রে! তোমার পুত্তুরটিও তো শেষ পর্যন্ত কম খেলা খেললে না। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কার ছুঁচো মুখ বুচো হ'ল ঠাকুর?" তপেন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া চটিজোড়া পায়ে দিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। শিবনাথবাবু আসিয়া হাতে ধরিয়া ফেলিলেন—"কাকাবাবু, কার উপর রাগ করে যাচ্ছেন? আমার মাথায় তবে পা দিয়ে চলে যান। কিরীটিও রাগ করে' চলে যাচ্ছে—আপনিও। ওধারে মেয়েরা কি কান্নাকাটি করছে দেখবেন চলুন তো!"

"শিবু, আমরা তোমার শত্রু? আমারা তোমার চকাইদীঘির ঘর বেঁধে দিতে বাধা সাধব? তুমি আমার ভাইপো নও? কিরীটি, সীতানাথ, তুমি আমার কাছে পৃথক? তোমার নারাণবাবুকেই জিজ্ঞাসা করে' দেখ তো—তোমার বাপ-ঠাকুরদার কত কীর্তির কথা হচ্ছিল। তোমাদের বংশ যে চিরদিন সৎকাজ করে' এসেছে বাবা। আর, ঐ কন্দর্পটা খামোকা এই রকম অপমান করে তোমারই ঘরে?"

"ছিঃ, কন্দুদা কোথায়? ও চিরদিনের মাথা-গরম লোকই। কোথায় কি বলতে হয়, যদি এতটুকু ভেবে বলে। ও কথা মুছে ফেলুন কাকাবাবু, আমি ক্ষমা চাইছি। চলুন—আপনি, সীতুদা, কিরীটি, জরুভায়া আর ভটচায মশাইরাই যা বাকি। আত্মীয়-

স্বজন কয়েক জন আর পরিচালকগুলিও আছেন।"

কিরীটি নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জাইয়া উঠিল—ছোটলোক কোথাকার।

হারু কটিদেশের দুই পার্শ্বে দুই হাত দিয়া হা করিয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। অস্ফুটে বলিয়া উঠিল—"হঁ, তপু মুখুজ্জার যোগ্যি ছেল্যা বটে, ই পারবেক। এ কন্দু খুড়া, ই কি হে ক মাই'র!" দক্ষিণ হস্ততল প্রসারিত করিয়া অর্দ্ধস্ফুটে কন্দর্প উত্তর করিল—"আর কি, যেমন বাপ, তার তেমনি বেটা।"

৬

মঙ্গল-শঙ্খের ধ্বনি। নির্ম্মলা শঙ্খ-বাদ্য করিয়া মেয়ে জামাই ঘরে তুলিতেছে—আলোকে আলোকময় আঙিনায় অপূর্ব দৃশ্য। কন্দর্পও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এইখানেই। "হ্যাঁ, ঐ দেখ মেয়ে ঐ বংশেরই। আহা, লক্ষ্মী মা তুমি! ধন্য জীবন তোমার। সহস্র প্রণাম করতে হয় তোমাকে। আজ নির্ম্মলবাবু থাকতেন—আরও তৃপ্তি হ'ত আমাদের। আর এই বিট্‌লে বামুনগুলোকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম।"

তপেন্দ্র, সীতানাথ, কিরীটি, নিমাই, জরু এবং শিববাবুর রক্ত সম্পর্কের কয়েকজন বসিয়াছেন। খুল্লতাত তপেন্দ্রের তৃপ্তি-সাধনের দিকে ভ্রাতুষ্পুত্র সীতানাথের সতর্ক দৃষ্টি। তপেন্দ্র প্রথমেই বলিয়া উঠিল—"না না, আমাকে আর লুচি-টুচি না। আমার তো ও-সব সহ্যও হয় না। এই একটু মিষ্টি।" অমনি সীতানাথ মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিতে সুরু করিল—"না না, লুচি-টুচি ওঁকে দেওই না, শূদ্রের জলে হয়েছে তো ও-সব। উনি খাবেনই না। শিববাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কীয় ধরাধর পরিবেশন করিতেছে। সে আর থাকিতে পারিল না। নাত-ঠাকুরদা সম্পর্ক ধরিয়া বলিয়া উঠিল "ওঃ, তপুদার বুঝি শূদ্রের জলই চলে না। তাহ'লে তো মিষ্টিও চলবে না। ও-সব তো শূদ্রেরই জলে তৈরি। আচ্ছা, আপনাকে তাহ'লে ঠাকুরের প্রসাদ এনে দিই। কিন্তু ওঃ, ওতেও তো লকু ময়রার হাতেরই সন্দেশ।" "ওঃ নাতি সাহেব যে খুব ঠাট্টা জুড়েছ হে!"—এই বলিয়া তপেন্দ্র কথাটাকে হাল্কা করিয়া লইলেন। ভিতরে-ভিতরে যাহাই হউক, উপরে-উপরে হাসিমুখে বলিলেন—"না না, সে-সব নয় রে ভাই, সবই খাই; তবে, বুড়ো বয়সে সে দাঁতেরও জোর নেই, পাকস্থলীরও বল নেই। নইলে তোদের বয়সে একপণ লুচি এক পাতায় বসে খেয়েছি।"

ওদিকে নির্ম্মলা নিজের হাতে বরের আসন করিতে চলিয়াছে। শিববাবু নির্ম্মলাকে বলিলেন—'মা, আমাকে কিছু ফল আর ছানা-চিনি এনে দিতে পারিস!' 'এই যে আপনার আসন করে' রেখেছি—আসুন। আপনাকেই ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। নিন—এই সরবতটুকু আগে।' 'না মা, এখনও আমার খাবার সময় হয় নি, তপু কাকাকে দিয়ে আসি। উনি লুচি-টুচি খাবেন না তো!' 'কেন, এখনও শঠতা বুঝি শেষ হয় নি? কিছু বাকি রয়ে গেছে? তা নিয়ে যান—সদ্‌ব্রাহ্মণ—তায় পূজনীয়। শিববাবু সঙ্গে সঙ্গে লিচু, লেবু প্রভৃতি ফল ও ছানা-চিনি প্রভৃতি আনিয়া তপেন্দ্রের পাতায় দিলেন। ভোজন-পর্ব সমাধা হইল।

পূর্বাকাশে নির্ম্মল উষার আরক্ত রাগ দেখা দিয়াছে। শান্তি ও শ্রমের নিদ্রায় অনেকেই আচ্ছন্ন। দুই এক জন সাফল্যে উল্লাস করিতেছে। নির্ম্মলা গুন্ গুন্ করিতে করিতে ওদিকে আলিপনা সুরু করিয়াছে—"এমন দিনে তারে ...।"

সানাইয়ে আশাবরীর মধুর স্বর-বিতান আরম্ভ হইয়াছে। সাঁওতালের দলও মাদল বাজাইয়া গান ধরিল—

জৈতি দিদির বিহা রে, জৈতি দিদির বিহা—তপু খুড়ার চা'ল
চা'ললেক পলা পদ্দার ভেইয়া রে, পলা পদ্দার ভেইয়া,
ভাঙল বিহা, লা'গল বিহা, নিমু বাবুর মাইয়া রে, ঐ যে
মহামায়া ঐ যে মহামায়া রে, জৈতি দিদির বিহা।

এক বৎসরকাল কিরীটি ও সীতানাথ অযাচিত ভাবে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—শিবু বাঙাল মিথ্যাই এত খরচা করলে। ঐ তো ছেলের আবার তারা বিয়ে দিবে ঠিক হয়ে গেছে।

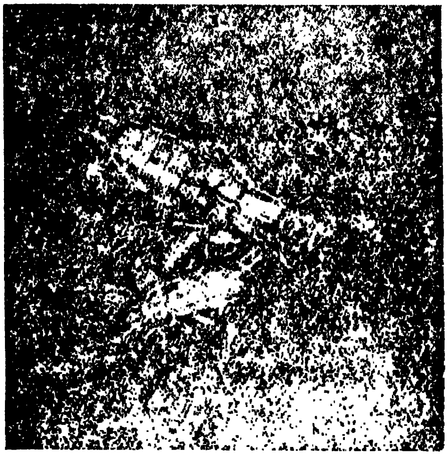
কানকোটারীর জীবন-কথা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মাছের ঘুম সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য নির্দ্ধারণের জন্য রাত্রির অন্ধকারে একবার কতকগুলি পরীক্ষা চালাইতে হইয়াছিল। পরীক্ষাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের সম্মুখে রাত্রিকালে একদিন কিছুক্ষণের জন্য টেবিল-ল্যাম্প জ্বালাইয়া কাজ করিতেছিলাম। আলোর ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হইয়া বিচিত্র আকৃতির রকমারি পোকা আসিয়া টেবিলের উপর পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র আকৃতির গঙ্গা-ফড়িঙের মত কয়েকটি বাদামী রঙের পোকার অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী এবং মস্তক সঞ্চালন লক্ষ্য করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে কয়েক জাতীয় ক্ষুদে জল-পোকাকেও আলোটার চতুর্দ্দিকে লাফালাফি করিতে দেখিতে পাইলাম। জল-পোকাগুলি যদিও আমার অপরিচিত নয় তথাপি উহারা যে কেমন করিয়া টেবিলটার উপরে আসিল ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আলোর চতুর্দ্দিকে পোকাগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছি এমন সময় সাঁড়াশির মত লেজওয়ালা একটা অদ্ভুত আকৃতির পোকা আসিয়া টেবিলের উপর পড়িল। ইহার শরীরে যে কোন রকমের ডানার অস্তিত্ব আছে তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। কেমন করিয়া পোকাটা টেবিলের উপরে আসিল? পোকাটা এত দ্রুতগতিতে ছুটাছুটি করিতেছিল যে, ভাল করিয়া উহাকে লক্ষ্য করিতেই পারিতেছিলাম না। দেখিতে দেখিতে ঐরূপ আরও কয়েকটি পোকা আসিয়া জুটিল। তাহাদের তড়িৎ-গতিতে ছুটাছুটি এবং অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী দর্শনে কাহারও কৌতূহল উদ্রিক্ত না হইয়া পারে না। মাঝে মাঝে ইহারা পরস্পর ঝগড়া-ঝাঁটি করিতেছিল, আবার কখনও কখনও ছুটিয়া উধাও

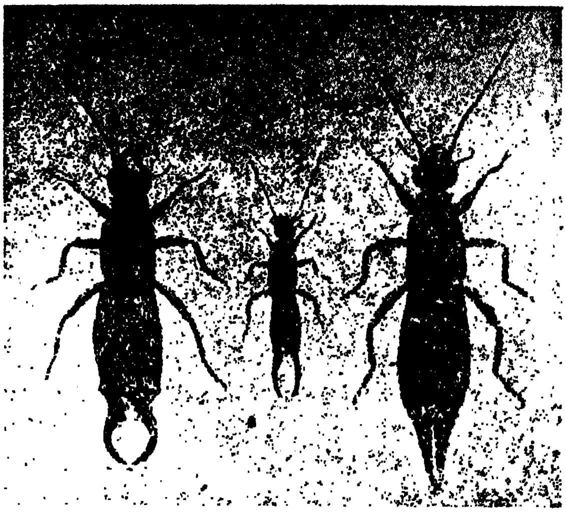
হইতেছিল। ইহারা এমনই চঞ্চল যে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন স্থানে একটু স্থির ভাবে থাকিতে দেখিলাম না। কেহ কেহ দেহের পশ্চাদ্ভাগের সাঁড়াশিটাকে একবার প্রসারিত ও আবার সঙ্কুচিত করিয়া অতি মসৃণ সর্পিল গতিতে যেন নৃত্যের ভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছিল।

এই পোকাগুলির সর্ব্বশরীর প্রায় উন্মুক্ত; কিন্তু পিঠের ঠিক উপরিভাগে শক্ত খোলার মত অতি ক্ষুদ্র দুইটি আবরণী আছে। একটাকে ধরিয়া তাহার পিঠের উপরের শক্ত খোলা দুইটি প্রসারিত করিয়া দেখিলাম—উহাদের নীচে প্যারা-সুটের মত ভাঁজ-করা দুটি চমৎকার ডানা রহিয়াছে। বাহির হইতে দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারা গেলেও এই ডানার সাহায্যেই ইহারা অনেক দূর উড়িয়া যাইতে পারে। ইহারা কিন্তু ফড়িং বা প্রজাপতির মত যতক্ষণ খুশী আকাশে বিচরণ করিতে



কানকোটারীর বাচ্চা প্রথম বার খোলস পরিবর্ত্তন করিয়াছে

পারে না। এক স্থান হইতে নিকটবর্ত্তী অন্য কোন স্থানে যাইতে হইলে কিয়ৎকালের জন্য ডানা দুটিকে কাঁপাইয়া একটানা খানিকটা অগ্রসর হইতে পারে মাত্র। তখন বুঝিলাম—ডানায় ভর করিয়াই ইহারা টেবিলের উপর উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অনেকক্ষণ ধরিয়া ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার কালে এক সময় দেখিতে পাইলাম—একটা পোকা আলোটার খুব নিকটে এক স্থানে অনেকটা স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া যেন ডানার আবরণী দুইটিকে অতি দ্রুতবেগে কাঁপাইতেছে। আনন্দের আতিশয্যেই এরূপ করিতেছে বলিয়া মনে হইল। পোকাটা থামিয়া থামিয়া এরূপ করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে এক এক বার দ্রুতগতিতে চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আসিতেছিল। কেন এরূপ করিতেছে—ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে দেখিলাম অপেক্ষাকৃত বড় আর একটা পোকা উহার কাছে আসিয়া ঘুরিতে লাগিল। পোকাটা মাঝে মাঝে ডানাও কাঁপাইতেছিল। খুব নিকটে কান পাতিয়া শুনিলাম—অতি অস্পষ্ট এক প্রকার ঝির্ ঝির্ শব্দ হইতেছে। আরও কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর বুঝিতে পারিলাম—



ছোট ও বড় দুই জাতীয় কানকোটারী। বাম দিকেরটি পুরুষ, ডান দিকেরটি স্ত্রী

ইহাই তাহাদের মিলনের পূর্ব্বরাগ। যাহা হউক, এতগুলি কীট-পতঙ্গের মধ্যে এই পোকাগুলির অপূর্ব্ব চঞ্চল গতিভঙ্গীতে যেন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। কাজেই ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় অবগত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি পোকা ধরিয়া বিশেষভাবে নির্ম্মিত কাচপাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। পরের দিন সুবিধামত স্থানে রাখিয়া ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। ইহাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে সন্তানবাৎসল্য এবং তাহাদের প্রতিপালন ব্যবস্থাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই পোকাগুলির মোটামুটি পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

এই পোকাগুলি আমাদের দেশে সাধারণতঃ কানকোটারী নামে পরিচিত। কানকোটারীর শরীর অনেকটা লম্বাটে গোছের সরু এবং মসৃণ। দেখিতে কতকটা ডানা ও পিছনের মোটা ঠ্যাংশূন্য উইচিংড়ির মত। মাথার সম্মুখভাগে ছোট ছোট দুইটি শুঁড় আছে। শুঁড় দুইটি বিভিন্ন খণ্ডে সংযুক্ত। বুকের পিছনে শরীরের বাকী অংশ অঙ্গুরীর মত বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত। লেজের প্রান্তভাগে ঠিক সাঁড়াশির মত একটি অদ্ভুত অস্ত্র আছে। এই সাঁড়াশির মত যন্ত্রটিই ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পিঠের উপর উভয় দিকে খুব ছোট ছোট দুইটি শক্ত খোলার মত আবরণী আছে। ক্ষুদ্র ডানা দুইটি ইহারই নীচে ভাঁজ করা থাকে। কয়েক জাতীয় কানকোটারীর আবার মোটেই ডানা থাকে না। কানকোটারী সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। ইহারা নাকি সুবিধা পাইলেই মানুষের কানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে এবং সাঁড়াশির সাহায্যে কর্ণপটহ কুরিয়া কুরিয়া খায়। এই প্রকার অদ্ভুত ধারণা হইতেই ইহারা কানকোটারি নামে পরিচিত হইয়াছে। আবার অনেকে বলে, ইহারা পত্র-পল্লবের আড়ালে লুকাইয়া থাকে এবং সুবিধা



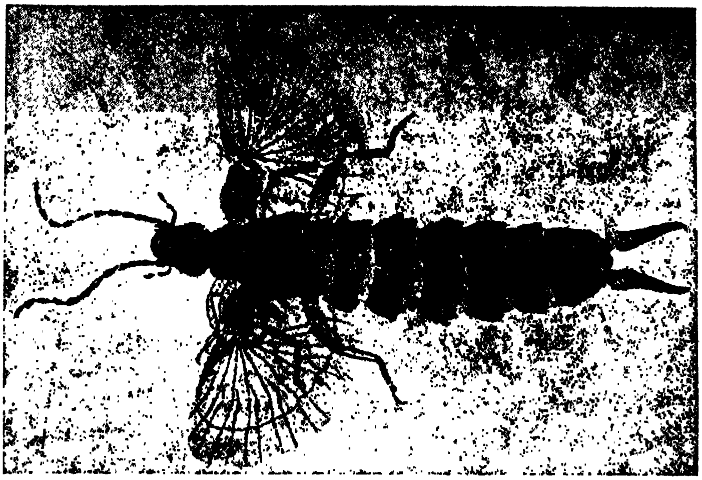
সবেমাত্র ডিম ফুটিয়া কানকোটারীর বাচ্চা বাহির হইয়াছে

মত মানুষের গায়ের উপর পড়িয়া সাঁড়াশির দ্বারা ক্ষত উৎপন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল ধারণার কোনই ভিত্তি নাই। ইহাদিগকে অতি নিরীহ প্রাণীই বলা যাইতে পারে। ইহারা কাহাকেও কামড়ায় না বা দংশনও করে না। নিরীহ প্রাণী হইলেও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই ইহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। ডালিয়া, ফ্লক্স্, কারনেশন এবং অন্যান্য বাগানে ফুলের পাপড়ি এবং বিভিন্ন জাতীয় ফলমূল অনেক সময় পোকায় কাটিয়া নষ্ট করে। বাগানের মালিদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা একবাক্যেই বলিবে যে ইহা কাণকোটারিরই কাজ। কানকোটারীই ফুলের পাপড়ি কাটিয়া এবং ফলের গায়ে ছিদ্র করিয়া অনিষ্ট করিয়া থাকে। প্রমাণস্বরূপ তাহারা হয়তো দুই একটা ফুল ঝাড়িয়া তাহা হইতে দুই একটা কানকোটারী বাহির করিয়া দেখাইবে। অথবা কোন ফলের গায়ে গর্ত্ত হইতেও দুই একটা কানকোটারী বাহির করিয়া দেখাইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, উহারাই ফলের গায়ে ছিদ্র করিয়া থাকে অথবা ফুলের পাপড়ির অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে ফলের গায়ের ছিদ্রের মধ্যে অথবা ফুলের পাপড়ির মধ্যে দেখিতে পাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু সেজন্য ইহারা সত্য সত্যই কোন ফল ফুলের অনিষ্ট সাধন করে না। কানকোটারী রাত্রিচর প্রাণী। দিনের বেলায় ইহারা গর্ত্তের মধ্যে বা কোন কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং রাত্রিবেলায় আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। কাজেই ইহাদিগকে ফুলের পাপড়ির আড়ালে অথবা ফলের গায়ে গর্ত্তের মধ্যে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য পোকারা ফুলের পাপড়ি কাটিয়া বা ফলের গায়ে ছিদ্র করিয়া চলিয়া যায়। সেই সকল ছিদ্রে অথবা কীটদষ্ট ফুলে কানকোটারিরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা হইতেই কানকোটারির সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা কিন্তু গাছপালার পক্ষে অনিষ্টকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ উদরসাৎ করিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকারই করিয়া থাকে। ইহাদের পেট চিরিয়া মাইক্রোস্কোপের নীচে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ, উকুন, শুঁয়াপোকা, শ্যামাপোকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুগ্‌লি প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রাণীর দেহাবশেষ রহিয়াছে। তাছাড়া ইহাদের পেটের মধ্যে বেশীর ভাগই অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের ডিম পাওয়া যায়। অবশ্য সুযোগ পাইলে তাহারা তাহাদের স্বজাতীয়দের ডিম উদরসাৎ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্তত: করে না। ইহারা কীটপতঙ্গভোজী হইলেও ফুল ফল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ যে একেবারে স্পর্শ করে না তাহা নহে। যখন গাছ-উকুন বা অন্যান্য অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ নিঃশেষিত হইয়া যায় তখন খাদ্যাভাবে ইহারা পাকা ফলের রস, ফুলের পাপড়ি বা কচিপাতা প্রভৃতি খাইয়া উদর পূরণ করে।

আমাদের দেশে ছোট বড় কয়েক জাতীয় কানকোটারী দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই লেজের দিকে সাঁড়াশির মত একযোড়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র রহিয়াছে। সাঁড়াশির আকৃতির পার্থক্য দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষ কানকোটারী চিনিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। স্ত্রী-কানকোটারীর সাঁড়াশির মুখ দুইটি প্রায় সরলভাবে প্রসারিত এবং পরস্পর গাত্রসংলগ্নভাবে অবস্থান করে। কিন্তু পুরুষ-পোকাদের সাঁড়াশি দেখিতে অবিকল বেড়ী বা বাউলির মত। পুং-পোকাদের এই বেড়ীর অগ্রভাগ দুইটি পরস্পর সংলগ্ন হইলেও মধ্যস্থলে গোলাকার ফাঁক থাকিয়া যায়। বিবর্ত্তনের দিক হইতে দেখিলে কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে দেহের পশ্চাদ্ভাগে এই অদ্ভুত অস্ত্রটার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কদাচিৎ ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁকড়া বা চিংড়ির দাঁড়ার মত আহার সংগ্রহে ব্যবহৃত হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পিঠের উপর ইহাদের ডানা দুইটি শক্ত খোলার নীচে ভাঁজ করা থাকে। অনেকের ধারণা—ডানা মেলিবার পর পুনরায় যথাস্থানে ভাঁজে ভাঁজে সন্নিবেশিত করা কষ্টকর ব্যাপার। সাঁড়াশির সাহায্যেই ইহারা ডানা গুটাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ কয়েক জাতীয় কানকোটারীর মোটেই ডানা নাই অথচ তাহাদের প্রত্যেকেরই সাঁড়াশি রহিয়াছে। তবে পুষিবার সময় দেখিয়াছি—যখন ডিম আগলাইয়া বসিয়া আছে তখন কোন কিছুর সাহায্যে শরীর স্পর্শ করিলে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ঘুরাইয়া সাঁড়াশির সাহায্যে তাহাকে চাপিয়া ধরে।

শীতের সময় অধিকাংশ পোকামাকড়ই কমবেশী নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। অনেকে আবার সারা শীতকালটাই ঘুমন্ত অবস্থায় কাটাইয়া দেয়। কানকোটারী শীতের সময় কেবল ঘুমাইয়া না কাটাইলেও অনেকটা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ইহাদের যৌন-মিলন সংঘটিত হয়, যৌন-মিলনের পর ইহারা কোন সুবিধাজনক গর্ত্ত বা ইট-কাঠ প্রভৃতির নীচে একবারে ত্রিশ-চল্লিশটি ডিম পাড়ে। কোন কোন জাতীয় কানকোটারীর শীতের সময়েই যৌন-মিলন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাহারাও ডিম পাড়ে শীতের অবসানে।

ইহাদের ডিম পাড়িবার ব্যাপার অনেকটা রাণী-মক্ষিকার মত। ডিমগুলি সম্পূর্ণ গোলাকার নহে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে ডিমের গায়ে রামধনুর মত রঙের আভা দেখিতে পাওয়া যায়। কীটপতঙ্গের মধ্যে দেখা যায়—তাহারা সাধারণতঃ ডিম পাড়িয়াই খালাস। মা তাহার ডিমের মোটেই তদারক করে না। অনেকে ডিম পাড়িয়া বাচ্চার আহারের জন্ম প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত করিয়া রাখে। অনেকে আবার বাচ্চার আহার্য্যোপযোগী গাছপালা বা প্রাণীদেহে ডিম পাড়িয়া যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এ নিয়মের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মৌমাছি, পিপীলিকার বাচ্চারা আগাগোড়া ধাত্রীর সাহায্যে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় মৎস্য শিকারী মাকড়সারা শতাধিক বাচ্চা পিঠে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে। কাঁকড়া-বিছারাও বাচ্চাগুলি বড় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পিঠে লইয়া বেড়ায়। এ ছাড়া কতকগুলি প্রাণী বাচ্চাদের কাছে থাকিয়া অনবরত তাহাদের তদারক করিয়া থাকে। আমাদের দেশের আড়-মাছ, শোল-মাছ যেমন অনবরত সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের বাচ্চাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে, কানকোটারীর সন্তানবাৎসল্যও ঠিক তদনুরূপ। ডিম পাড়িবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রী-পোকাটা পারতপক্ষে তাহাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যায় না। যখন খাদ্যসংগ্রহ করিতে বাহির হয় তখনও মাঝে মাঝে গর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া ডিমগুলিকে দেখিয়া যায়। কিন্তু নেহাৎ অসুবিধায় না পড়িলে এসময়ে খাদ্য সংগ্রহে বহির্গত হয় না। মাটির মধ্যে সাধারণ গর্ত্তের মত একটি স্থানে ডিমগুলিকে একত্রিত করিয়া শরীরের সম্মুখ ভাগ এবং সম্মুখের পায়ের সাহায্যে তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে। ঐ সময়ে শরীরের পশ্চাদ্ভাগের সাঁড়াশি ও পা দুটিকে উঁচু করিয়া এমনভাবে অবস্থান করে যে, কোন শত্রুর পক্ষে গর্ত্তে ঢুকিয়া কিছু অনিষ্ট সাধন করা অসম্ভব। তা ছাড়া শত্রুকে আঘাত করিবার জন্ম ডিম পাড়িবার পর তাহারা আর একটি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন



স্ত্রী-কানকোটারী ডানা মেলিয়া রহিয়াছে

করে। মুষ্টিযোদ্ধারা লড়াই করিবার সময় যেমন চামড়ার ভারী দস্তানা ব্যবহার করে ইহারাও সেইরূপ পিছনের পা দুইটির প্রান্তভাগে কাদা জমাইয়া পুরু দস্তানা তৈয়ারী করিয়া লয়। কাদা শুকাইয়া পা দুখানি ঠিক শক্ত মুগুরের আকৃতি ধারণ করে। এই অবস্থায় চলিবার সময় কানকোটারী তাহার সম্মুখের চারিখানি পা মাত্র ব্যবহার করে। পিছনের পা দুইটি ভারী বস্তুর মত ঘষ্‌টাইয়া চলিতে থাকে। এই সময়ে ডিম বা কানকোটারীর শরীর স্পর্শ করিলেই দেখা যাইবে সে তাহার মুগুরের মত পায়ের সাহায্যে ঝট্‌কা আঘাত করিয়া শত্রুকে হটাইয়া দিতে চাহিতেছে। কাজেই ইহারা যে ডিম রক্ষা করিবার জন্ম পা দুখানিতে এরূপভাবে ইচ্ছামত কাদা মাখাইয়া লয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সময় সময় কোন পায়ের কাদার আবরণ ভাঙিয়া গেলে পুনরায় জুড়িয়া লইতে দেখা যায়। পিপেটের সাহায্যে দুই পায়ের কাদার ডেলার উপর দুই-এক ফোঁটা জল নিক্ষেপ করিয়া দেখিয়াছি—মাটি ভিজিয়া কাদার ডেলা ক্রমশঃ গলিয়া গেলে পুনরায় দুই-এক দিনের মধ্যেই পা দুটিকে মুগুরের মত করিয়া লইয়াছে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কানকোটারী পায়ে আর মাটির প্রলেপ রাখে না।

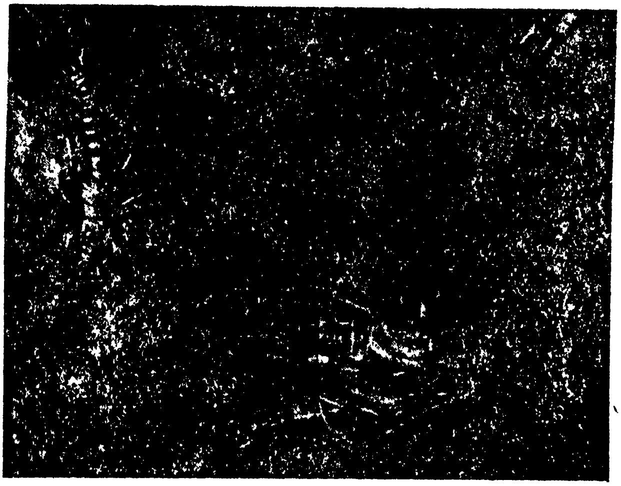


স্ত্রী-কানকোটারী ডানা গুটাইয়া আছে

পনর-ষোল দিন পরে কানকোটারীর ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। এ কয়দিন তাহার আর অবসর থাকে না। সর্ব্বদাই ডিম তদারক করে। ডিমগুলিকে প্রায়ই একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া সাজাইয়া রাখে। এক প্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে। একসঙ্গে সংলগ্ন এরূপ অনেকগুলি ডিমকে কানকোটারী চোয়ালের সাহায্যে প্রথমে স্থানান্তরিত করে। পরে আসিয়া বিক্ষিপ্ত ডিমগুলিকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া

যায়। যখন ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইতে সুরু করে তখন কানকোটারী অতি ব্যস্ত হইয়া উত্তেজিত ভাবে ডিমগুলির মধ্যে কখনও মস্তক প্রবেশ করাইয়া কখনও বা শুঁড় দিয়া বাচ্চাগুলিকে বাহির হইতে সাহায্য করে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যেই মায়ের চতুর্দিকে সম্পূর্ণ সাদা রঙের কালো চোখ বিশিষ্ট চল্লিশ-পঞ্চাশটি বাচ্চা মাছির মত কিলবিল করিতে থাকে। মা তাহাদের জন্য নূতন গর্ত্ত করিয়া সেখানে তাহাদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করে। মা যেদিকে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে চায় তাহারা যেন কি এক ইঙ্গিত পাইয়া সেই দিকেই যাইতেই থাকে। মুরগীর বাচ্চাগুলিকে তাহাদের মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। মা যেখানে থাকে তার আশেপাশেই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা আহার সংগ্রহ করে; কিন্তু কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে মুরগী এক প্রকার শব্দ করিলে বাচ্চাগুলি ছুটিয়া আসিয়া মায়ের ডানার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপদের ভয় কাটিয়া গেলেই মা বাচ্চাগুলিকে পুনরায় যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেয়। কানকোটারী মুরগী অপেক্ষা নিম্নস্তরের প্রাণী হইলেও বাচ্চাগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কোন অংশেই উন্নততর প্রাণী অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হয় না। কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই বাচ্চাগুলি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলেও কি যেন একটা সঙ্কেত পাইয়া মায়ের চতুর্দিকে একত্রিত হইয়া একেবারে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। এতগুলি বাচ্চা যে কি ভাবে এরূপ শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বোধ হয় বাচ্চাগুলি একে অন্যের শুঁড়ে শুঁড় স্পর্শ করিয়া বিপদের সঙ্কেত জানাইয়া দেয়। বিপদ কাটিয়া গেলে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাফেরা করিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাচ্চাগুলি বাহির হইবার পর সম্পূর্ণ সাদা থাকে; কিন্তু ধীরে ধীরে দেহের রং পরিবর্ত্তিত হইয়া গাঢ় বাদামী বা কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ডিম হইতে বহির্গত হইবার পনর-ষোল দিন পর বাচ্চাগুলি প্রথম বার খোলস পরিবর্ত্তন করে। তখন পুনরায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই রং পরিবর্ত্তিত হইয়া বাদামী বা ধূসর বর্ণে পরিণত হয়। বাচ্চাগুলি কিন্তু তখনও মায়ের সঙ্গ ছাড়ে না, অথবা মা-ই তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেয় না। দ্বিতীয় বারের খোলস পরিত্যাগের পরও মা তাহাদের জন্য আহার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাগুলির বয়স দুই-তিন সপ্তাহ হইলে কানকোটারী আবার নূতন করিয়া কতকগুলি ডিম পাড়ে। পূর্ব্বের বাচ্চাগুলিও সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। বাচ্চাগুলির জ্বালাতনে বিব্রত হইয়া মা-কানকোটারী সাধারণতঃ শেষের ডিমগুলিকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; কিন্তু বাচ্চাগুলিকে তাড়াইবার চেষ্টা করে না। বাচ্চাগুলিও আবার এমনই যে, সুবিধা পাইলে তাহাদের মায়ের এই নূতন ডিমগুলিকে খাইয়া নিঃশেষ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। একই ঋতুতে স্ত্রী-



হঠাৎ ভয় পাইয়া কানকোটারীর বাচ্চাগুলি মায়ের আশেপাশে চুপ করিয়া রহিয়াছে

কানকোটারী কিছুদিন পর পর প্রায় তিন-চার বার ডিম পাড়ে। প্রথম বারের অপেক্ষা ডিমের সংখ্যা ক্রমশঃই কম হইতে থাকে। বাচ্চাগুলি চার বার খোলস বদলাইবার পর পরিণতবয়স্ক কানকোটারীর আকার ধারণ করে। ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর বাচ্চারা খোলস বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রথমে তাহারা পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয়। পুত্তলী অবস্থায় ইহারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে। আবার পুত্তলী অবস্থা হইতে খোলস বদলাইয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া বহির্গত হয়। কানকোটারী চার বার খোলস পরিবর্ত্তন করিলেও তাহাদের এরূপ কোন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের দেহের আয়তন বাড়িয়া যায়; কিন্তু উপরের চামড়াটা শক্ত হওয়ায় তাহা আর শরীরের সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে না। কাজেই খোলস বদলাইবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় বার খোলস পরিবর্ত্তন করিবার পর পিঠের উপর ডানার আবরণ আত্মপ্রকাশ করে। কানকোটারী সাধারণতঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। স্ত্রী-কানকোটারী ক্রমাগত তিন-চার বার ডিম পাড়িলেও তাহার যৌন-মিলন একবারই ঘটিয়া থাকে। মৌমাছি, পিপীলিকার রাণীরা যেমন এক বার মিলনের পর অনবরত নিষিক্ত ডিম প্রসব করিতে পারে কানকোটারীরাও সেইরূপ এক বার মিলনের পর কয়েকবারই নিষিক্ত ডিম প্রসব করিয়া থাকে। গুবরে পোকা, মৌমাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গেরা তাহাদের দেহের ওজনের তুলনায় অনেক গুণ বেশী ভারী জিনিষ টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। গুবরে পোকা তাহার শরীরের ওজনের ১৮২ গুণ ভারী এবং ভ্রমর তিন শত গুণ ভারী জিনিস টানিতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে কানকোটারী তাহার ওজনের ৫৩০ গুণ ভারী জিনিস টানিবার শক্তি রাখে।

চিরন্তনী

সারা বাড়ীতে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। আজ ক'দিন হ'ল ছোটবৌ সুলতা একটি সন্তান প্রসব করে এমন কাহিল হয়ে পড়েছে যে, আর বুঝি বাঁচান যাবে না তাকে। নিরুপায় দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল অনাদি।

বড় বৌদি বললেন, "তোমায় বরাবরই ব'লে আসছি ঠাকুরপো, মেয়েদের এই অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক। গোড়া থেকে সাবধান না হ'লে শেষকালে পোয়াতি আর ছেলে দুই-ই বাঁচান শক্ত হয়।"

মেজদা ব'ললেন, "তুই একটা রাস্কেল। কোনকালে যদি বুদ্ধি হয় তোর। মাথার হাত নামিয়ে ডাক্তার ডাক এখন।"

বাধ্য হয়েই মাথার হাত নামাতে হ'ল অনাদিকে, বাধ্য হয়েই তাকে যেতে হ'ল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের কাছে যেতেই ডাক্তার প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন অনাদির ওপর, "এখন ডাকতে এসেছ কেন? গোড়াতে যখন ব'ললাম কথাটা কানে গেল না। এখন ঠেলা সামলাও।"

বেচারা অনাদি! বংশের ছোট বলেই তার দায়িত্ব-জ্ঞান একটু কম, আর সেই জন্যেই সকলের কাছে ধমক খেতে হয় যখন-তখন। কিন্তু আজকে তার মনের যে-রকম অবস্থা তাতে ধমকটা আর বরদাস্ত হ'তে চায় না। তবু ডাক্তার তার চাইতে বয়সে অনেক বড়, দাদাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, নিজের ছোট ভায়ের মতই তিনি দেখেন অনাদিকে। তাই ডাক্তারের খেঁকানি গায়ে না মেখে তাঁকেই আবার খোসামোদ করে' নিয়ে এল অনাদি।

ডাক্তার এসে রোগীকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন, তার পর প্রেসক্রপশনের ওপর ওষুধের নাম লিখে দিলেন কতকগুলো।

অনাদির আজকে মনটা খুবই খারাপ। ভয়ে ভয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল সে, "ও বাঁচবে ত ডাক্তারবাবু?"

ছেলেমানুষ অনাদির করুণ স্বর শুনে কেমন যেন মায়া হ'ল ডাক্তারবাবুর। গলায় সহানুভূতি এনে তিনি ব'ললেন, "আশা ত করছি। কিন্তু আজকাল দেশে ওষুধের যে অবস্থা, তাতে যদি **'ভাইনো-মল্টে'র** মত একটা টনিক ওয়াইন বের না হ'ত তবে এই আশা-টুকুও করতে পারতাম না। বাস্তবিকই এই ওষুধটা প্রসূতিদের পক্ষে অমৃততুল্য। প্রসবের পরে ত বটেই, তাছাড়া খুব বেশী মানসিক পরিশ্রম করলে অথবা দীর্ঘ দিন রোগে ভোগার পর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। যা' কিছু খাওয়া যায় কিছুতেই হজম হ'তে চায় না এই সময়। এই সব ক্ষেত্রে আমি **'ভাইনো-মল্ট'** ব্যবহার করে দেখেছি যে, এতে অতি অল্প সময়ের ভেতরই শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে। এই জন্যেই আজকাল আমি ভগ্নস্বাস্থ্য প্রসূতিকে কিংবা ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টায়ফয়েড, নিউমোনিয়া, কালা-জ্বর প্রভৃতি থেকে সদ্য আরোগ্য-প্রাপ্ত রোগী ও পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সকলকেই **'ভাইনো-মল্ট'** খেতে দিই। যাই হোক, তুমি ভয় পেয়ো না; আমার মনে হয় **'ভাইনো-মল্টে'র** জোরে ছোটবৌ শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে।"

দু'দিন পরে ডাক্তার আবার এলেন। চৌকাঠের ওপার থেকেই দেখলেন ছোটবৌ উঠে বসেছে বিছানার ওপর; দুধ খাওয়াচ্ছে তার সন্তানকে।

বিজ্ঞাপন

নিষ্কৃতির উপায়

চঞ্চল মহানগরী—উদ্দাম জনস্রোত—চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ততা। এরই মাঝে একটি সংসারের অবগুণ্ঠন তুলে দেখা গেল দু'টী প্রাণীর ছোট একটি নিটোল নিখুঁত হিসেবী সংসার—মাত্র দু'টি লোক—স্বামী ও স্ত্রী। ঐশ্বর্য্যও নেই অস্বচ্ছলতাও নেই। স্বামী কোন এক আফিসে অল্প বেতনের কেরাণী তবু তাদের সংসারে আনন্দ বিদ্যমান। দুঃখ তার কালো হাতের কঠিন পরশ এই গৃহের অধিবাসীদের উপর বুলিয়ে দেয় নি। ভোরের আলো যখন এই মহানগরীর সৌধের উপর তার সোনার ছোঁয়াচ দিতে সুরু করে তখন বউটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে সাংসারিক কাজ নিয়ে—স্বামীর চা ও জলখাবার তৈরী করে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে আফিসের রান্না আরম্ভ করে। স্বামী দশটায় আফিস যান। বউটি দুপুরবেলা পাশের ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে তার ঘরের ছোট্ট জানালা দিয়ে আলাপ করে' নিঃসঙ্গ সময়টাকে টেনে ছোট করে' আনে—আবার চারটে বাজতে-না-বাজতেই স্বামীর বিকেলের জলখাবার তৈরী করে' ও তার ছোট সংসারের খুঁটিনাটি অনেক কাজ সেরে রাখে। স্বামী আফিস থেকে ফিরে আসেন—আসবার সময় বাজার থেকে এটা-ওটা আনতে ভোলেন না। রাত্রে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীতে সুখ-দুঃখের কথা হয়—এমনি নিছক আনন্দের ভেতর বছর গড়িয়ে যায় আবার নতুন বছর ঘুরে আসে—নতুন অতিথির আগমনে সংসারে আনন্দের জোয়ার ব'য়ে যায়—কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই ধীরে ধীরে দেখা যায় দারিদ্র্যের কালো ছায়া। সংসারে খরচ বেড়ে গেছে—খোকার দুধ এবং আরও অনেক কিছু। অল্প বেতনে আর স্বচ্ছলতা হয়ে ওঠে না, তাই আরও রোজগারের জন্য টিউশনী নিতে হয়। কিন্তু ক্রমশঃই গৃহস্বামী দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগলেন।—একটুতেই হাঁপিয়ে ওঠেন—আফিসে আর পূর্ব্বের মতন পরিশ্রম করতে পারেন না—ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্রও দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে টিউশনী ছাড়তে হ'ল। এই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক গৃহে গৃহে হচ্ছে। কিন্তু এর সমাপ্তি এ ভাবে নাও হ'তে পারতো যদি সময়মত হৃদযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র সবল করার ঔষধ তাদের খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হ'ত। দরিদ্র কেরাণীর পক্ষে বেশী দামের ঔষধ খাওয়া অবশ্য কঠিন এবং হয়ত সম্ভবও নয় কিন্তু অব্যর্থ কার্য্যকরী অথচ সস্তা ঔষধ যেমন, "ভাইনো-মল্ট" খাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার হয়ত হ'ত না এবং এরূপ ভাবে নির্জীব ও অকর্ম্মণ্য না হয়ে অজ্ঞাত শত্রুর হাত থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পেত।

চোর যখন চুরি করতে আসে তখন ঢাক-ঢোল না বাজিয়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গৃহস্বামীকে সজাগ না করেই আসে তেমনি রোগও ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে' আমাদের জীবনী-শক্তি হরণ করে। তাই যথাসম্ভব রোগ-বীজাণুর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে শ্বাস-যন্ত্র ও হৃদযন্ত্র সবল করার জন্য **"পেট্রোমালসন উইথ গোয়াইকল"**এর মত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। এর দামও অল্প অথচ কার্য্যকরী।

হিন্দু আইনে বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশোভা হুই

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক গঠিত "রাও হিন্দু আইন কমিটি" হিন্দু-বিবাহ সংস্কার করিয়া যে বিলটি আনয়ন করিয়াছেন, আশা করি প্রগতিকামী হিন্দু মাত্রই তাহা ন্যায় ও বিবেক-সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। যদিও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ইহা লইয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সমাজপতিগণ নানারূপ বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ, একবিবাহ-প্রথা, হিন্দু নারীর দায়াধিকার ও অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে অনুকূল উক্তির অভাব নাই—কিন্তু বর্ণাশ্রম চালিত হিন্দুসমাজের প্রচলিত গতি অন্য দিকে।

প্রথমতঃ, বহুবিবাহ-প্রথা তুলিয়া দিয়া আইনের বলে একবিবাহ-প্রথা প্রচলন করা অত্যন্ত দরকার। প্রাচীনকালে একবিবাহ-প্রথাই প্রচলিত আইনসম্মত ছিল। মনু বলিয়াছেন যে, স্বামী ও স্ত্রীর সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য হইতেছে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। প্রাচীনকালে স্ত্রী যদি বন্ধ্যা, অসুস্থা কিম্বা ভ্রষ্টা হইত অথবা সে যদি স্ব-ইচ্ছায় পত্নীত্বের দাবী ত্যাগ করিত তবে পুরুষ স্ত্রী বর্ত্তমানে বিবাহ করিতে পারিত এবং বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে যুক্তির বৈধতা দেখাইতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দু আইন এমন হইয়াছে যে নির্ব্বিচারে ইচ্ছামত পুরুষ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে—ইহার জন্য আইন কিম্বা সমাজের নিকট তাহাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, রূপের মোহে কিম্বা টাকার প্রলোভনে অথবা অতি তুচ্ছতম কারণে পুরুষ এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুনরায় বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন অনেক পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা পদোন্নতির সহিত পুরাতন অশিক্ষিতা কিম্বা অর্দ্ধশিক্ষিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষিতা, নূতন পত্নী গ্রহণ করে। তাহারা এটুকু ভাবে না যে স্ত্রীও মানুষ, সেও রক্তমাংসের তৈয়ারী, তাহারও হৃদয় আছে যেখানে দুঃখ-কষ্টের তীব্র আঘাত সে অনুভব করিতে পারে। এইরূপ বহুবিবাহের ফলে কত নারীর জীবন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহারা সতীনের অধীনে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। যাহারা কিছুতেই সতীনকে সহ্য করিতে পারে না তাহারা পিত্রালয়ে যায়, কিন্তু পিতামাতা চিরদিন কাহারও বাঁচিয়া থাকেন না। কাজেই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূদের লাথি-ঝাঁটা খাইয়া বাকি জীবন কাটাইতে তাহারা বাধ্য হয়। হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ নাই, হিন্দু আইনে নারীর পিতার কিম্বা শ্বশুরের সম্পত্তিতে অধিকার নাই। কাজেই স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীদের সামনে দুইটি পথ খোলা থাকে—এক, সব অপমান সহ্য করিয়া, মান-অভিমান ভুলিয়া স্বামীর খোরপোষে সন্তুষ্ট থাকা, নয় তো আত্মহত্যা করা। এই বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণেরা এক একজনে ৭০।৮০টা করিয়া বিবাহ করিত এবং প্রত্যেকের খাতায় নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা লেখা থাকিত। এক এক পত্নীর ভাগ্যে বৎসরে কিম্বা দুই বৎসরে স্বামীর দর্শন মিলিত। ঐ সব পুরুষের হৃদয়ে তাহাদের পত্নীর জন্য বিন্দুমাত্র ভালবাসা কিম্বা বিশ্বস্ততার চিহ্ন থাকিত না। তাহারা কোন

প্রকার দায়িত্ব যাতে লইত না। বহু দিন পরে এক এক বার স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মিত তাহার ভার কন্যার মাতাপিতা লইতে বাধ্য হইতেন। এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন বহুবিবাহ-প্রথা কেবল অধিকাংশ পুরুষের লালসায় ইন্ধন জোগায় মাত্র। এইরূপ বিবাহ কখনই সমাজে মঙ্গল আনিতে পারে না। এইরূপ বিবাহের ফলে যে শত শত সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারা ঠিক উপযুক্ত অভিভাবক, অর্থ এবং শিক্ষার অভাবে হিন্দু সমাজের সম্পদ না হইয়া ঋণ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব হিন্দু নারীকে এবং সমাজকে অত্যাচার, অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে বহুবিবাহ-প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ করা দরকার তাহা বোধ হয় প্রত্যেক চিন্তাশীল হিন্দুই স্বীকার করিবেন।

তাহার পর অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করাও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জাতি ও গোত্রের প্রচলন কেমন করিয়া হইল তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার দরকার নাই। তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কালে আর্য্য-সভ্যতা এ দেশে সূত্রপাত হইবার কিছু পর হইতে কর্ম্ম-বিভাগ দ্বারা জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়। আর সেই সময়ের বিখ্যাত মুনি-ঋষির নামানুসারে গোত্রের প্রচলন হয়। হিন্দু বিবাহের প্রচলিত নিয়ম, এক জাতি হইবে কিন্তু এক গোত্র হইলে চলিবে না। সগোত্রে বিবাহ এদেশে নিষিদ্ধ, কারণ একই মুনির বংশধরগণের মধ্যে বিবাহ সমাজনীতি অনুসারে দোষ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ কাশ্যপ গোত্র উল্লেখ করা যাক। উভয় পক্ষে কাশ্যপ গোত্র হইলে বিবাহ হয় না। একই গোত্রে পাঁচ-ছয় পুরুষ ছাড়াছাড়ি হইয়া গেলে যুক্তি অনুসারে বিবাহে কোন দোষ নাই, কারণ পাঁচ-ছয় পুরুষ ছাড়াছাড়ি হইয়া গেলে রক্তের কোন সম্বন্ধ থাকে না। অথচ অনর্থক রক্ত-কৌলিন্যের ওজুহাতে অসবর্ণ বিবাহ ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। বরপণ এবং বেকার-সমস্যার দিনে হিন্দু বিবাহে যে জটিলতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে অনেকেরই বিবাহ নিয়মিত সময়ে হইতেছে না। ছেলে-মেয়ে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পাইতেছে এবং তাহারা নিজেদের পছন্দমত বিবাহ করিতে না পারিয়া নানারূপ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ইহা ছাড়া একটি সমবর্ণ পাত্র অপেক্ষা অসবর্ণ পাত্র হয় তো অধিকতর উপযুক্ত এবং তাহার সহিত বিবাহ দিলে কন্যা অধিকতর সুখী হইবে এইরূপ আশা করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র বর্ণ-বৈষম্যের জন্য ঐ পাত্রে বিবাহ না দিয়া অযোগ্যতর সমবর্ণের পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, এবং চিরদিনের জন্য তাহাকে দুঃখে কষ্টে ফেলা হয়। অতএব আইন দ্বারা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিতে পারিলে যুগোপযোগী হইবে এবং সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না।

এইবার বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে, কিন্তু অবস্থা-বিশেষে অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধন যে বহু

দুঃখের কারণ হইয়া উঠে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনে স্বীকৃত হইলেই যে কথায় কথায় স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হইবে তাহা নয়। অনেকে আশঙ্কা করেন সামান্য মনোমালিন্যেই স্ত্রী কিম্বা স্বামী কোর্টে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য ছুটিবে, কিন্তু এ ধারণা ভুল। মাত্র কয়েকটি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারে—

(১) স্বামী কিম্বা স্ত্রী কমপক্ষে সাত বৎসর যদি উন্মাদ হইয়া থাকে।

(২) দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে স্বামী কিম্বা স্ত্রী যদি আক্রান্ত হয়।

(৩) স্বামী কিম্বা স্ত্রী অন্ততঃ সাত বৎসরের জন্য যদি অনুদ্দেশ হয়।

(৪) উভয় পক্ষের কেহ যদি হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

(৫) উভয় পক্ষের যে-কোন পক্ষ যদি যৌন ব্যাধিতে ভুগে, কিন্তু কমপক্ষে সাত বৎসর হওয়া চাই।

(৬) স্বামী যদি উপপত্নী রাখে কিম্বা স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা হয়।

এই কয়টি কারণকে ভিত্তি করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারে। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় অতি তুচ্ছতম কারণে যে এদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ কোন ক্রমেই হইতে পারিবে না সে বিষয় নিশ্চিত। উপরিউক্ত কারণগুলি বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে যে অতি ন্যায়সঙ্গত কারণ সে বিষয়ে আশা করি সকলেই এক-মত হইবেন।

(১) স্বামী কিম্বা স্ত্রী যদি উন্মাদ হইয়া যায় তবে যে-পক্ষ সুস্থ থাকে তাহার উন্মাদকে লইয়া সমস্ত জীবন কাটানো এক ভীষণ ব্যাপার। এখানে বলা যাইতে পারে, হিন্দু আইনে পুরুষদের পক্ষে সবরকম সুবিধা থাকার জন্য উন্মাদ স্ত্রী লইয়া তাহারা কোন দিনই তাহাদের জীবন ব্যর্থ করে না। কিন্তু হিন্দু মেয়েদের এক্ষেত্রে কোন সুবিধা না থাকার জন্য জীবন তাহাদেরই ব্যর্থ হয়। শুধু যে তাহাদের জীবন ব্যর্থ হয় তাহা নয়, অসংযমের ফলে যে-সকল সন্তানের জন্ম হয় তাহারাও পাগল হইতে পারে। বাহ্যিক আদর্শের ঠাট বজায় রাখিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় ভিতরে ভিতরে অনেকে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এই সব কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ যদি আইনসঙ্গত হয় তবে সেই পথে গিয়া অনেক রমণী পুনর্বিবাহ দ্বারা সুস্থ ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে এবং সমাজ হইতে ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি পাপও দূরীভূত হয়।

(২) দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষই কুষ্ঠব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন, কখনই সুস্থ পক্ষের ঐ ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির নিকট থাকা উচিত নয়। যদি অসংযমের ফলে দূষিত রক্ত হইতে সন্তানের জন্ম হয় তাহা হইলে মাতাপিতার পক্ষে তাহা মহাপাপ এবং সমাজের পক্ষেও তাহা মঙ্গলজনক নয়।

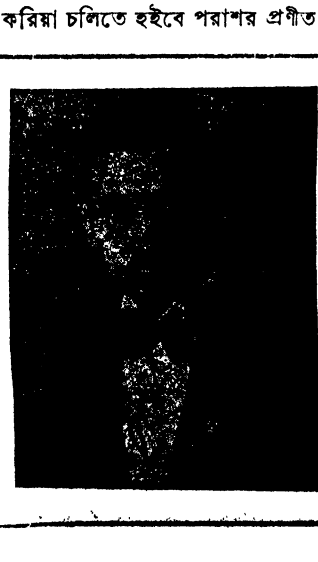
(৩) স্বামী কিম্বা স্ত্রী কোথাও চলিয়া গেলে অন্ততঃ সাত বৎসর তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তাহার পর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার আইনে থাকা উচিত। এক পক্ষ যে-কোন কারণেই হউক চলিয়া গেলে অপর পক্ষ কেবল হা-হুতাশ করিয়া তাহার জন্য চোখের জল ফেলিবে ইহা কখনও ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

(৪) যে কোন পক্ষ যদি হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে এবং অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে তবে নিশ্চয়ই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়া উচিত। এক পক্ষ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মে চলিয়া গেল আর অপর জন তাহার জন্য চিরজীবন শোক করিবে কেন? তাহার জন্য নিজের বাসনা-কামনাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলার সার্থকতা কোথায়? তাহার চেয়ে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনে স্বীকৃত হয় তবে সে ঐ পথে যাইতে পারে।

(৫) উভয় পক্ষের কেহ যদি যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সুস্থপক্ষের নিশ্চয়ই অসুস্থ সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। ঐ সব ভীষণ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর নিকট কোন নির্ম্মলচরিত্র পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর থাকা উচিত নয়। ঐ সব ব্যাধিগ্রস্ত পিতা-মাতার দ্বারা অন্ধ, কাণা, কালা, হাবা, জড় সন্তানের জন্ম হয় এবং সমাজ-স্বাস্থ্যকে কলুষিত করে। অতএব এ সব ক্ষেত্রে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার থাকা উচিত নয় কি?

(৬) স্বামী রক্ষিতা রাখিলে কিম্বা স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়া দরকার, বোধ হয় এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। দুশ্চরিত্র স্বামী লইয়া কিম্বা দুশ্চরিত্রা স্ত্রী লইয়া সংসার করা চলে না। ইহাতে তাহাদের সংসারের, তাহাদের সন্তানদের, এবং সমাজের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। স্বামী যদি স্ত্রীর কিম্বা স্ত্রী যদি স্বামীর হৃদয়েই না স্থান পাইল তবে দুই জনকে এক সংসারে বাঁধিয়া লাভ কি? ঐরূপ সংসারে নিয়ত কলহ, চীৎকার এবং অশান্তি লাগিয়াই থাকে। সন্তান-গুলির কোন সুশিক্ষা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। এবং নির্দ্দোষ পক্ষ অনবরত অশান্তি ভোগ করিতে করিতে পাগল হইয়া যায় এরকমও দেখা যায়। অতএব এ সকল ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী, সন্তান এবং সমাজ সকলের পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঙ্গল-জনক।

এখন এই বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের শাস্ত্র অনুমোদন করেন কিনা তাহা দেখা দরকার। কোন্ যুগে কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে পরাশর প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সে সমুদয়ের



নিরূপণ আছে। পরাশর সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে মনু-নিরূপিত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম, গোতম-নিরূপিত ধর্ম্ম ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিত নিরূপিত ধর্ম্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম, পরাশর-নিরূপিত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম।

অতএব পরাশর সংহিতা যে কলিযুগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। উক্ত গ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত।

নারদ সংহিতাতেও (সত্যযুগ) আছে—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

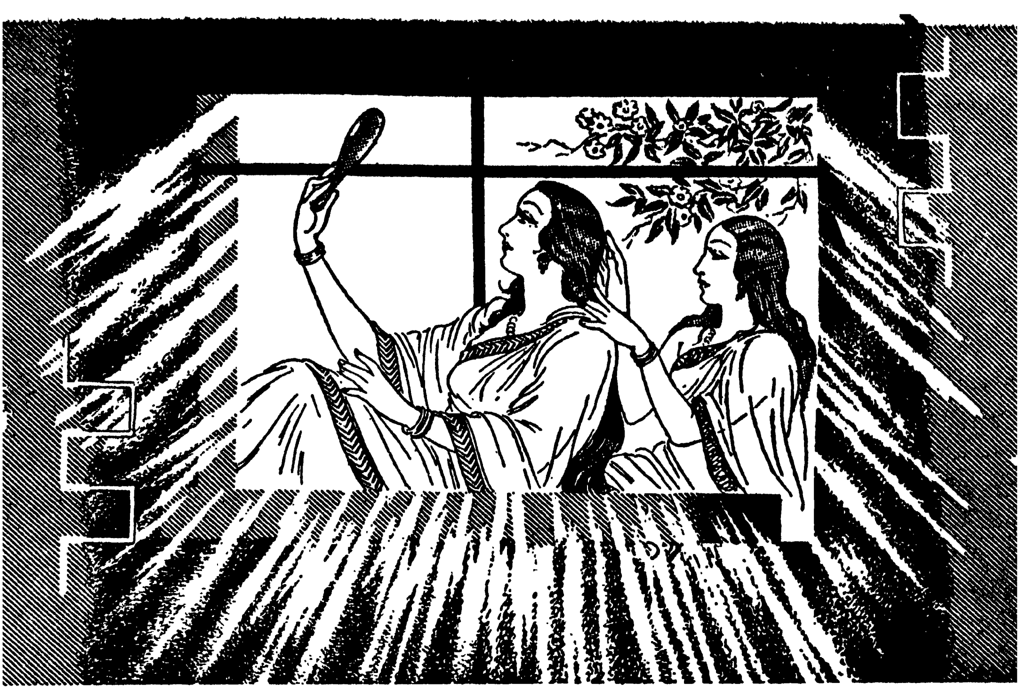
আদি পুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে, কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু পরাশর পাঁচটি স্থল ধরিয়া কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধি দিতেছেন। সুতরাং আদি পুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে নিষেধ থাকিলেও পরাশর বিশেষ বিধি অনুসারে ঐ পাঁচ স্থলে বিবাহ হইতে পারিবেক। (বিদ্যাসাগর)

আবার আমরা দেখিতে পাই কাত্যায়ন, বশিষ্ট, নারদ যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে পতি পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেচ্ছাচারী, চিররোগী, অপস্মারগ্রস্ত, প্রব্রজিত, সগোত্র, দাস, অন্য জাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে অথবা মরিলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কারের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। (বিদ্যাসাগর)

নারদ সংহিতা মনুসংহিতার সার ভাবা মাত্র হইতেছে। (বিদ্যাসাগর)

অতএব কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, নারদ সকল যুগের পক্ষেই উপরোক্ত কয়েকটি স্থলে বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। মহর্ষি পরাশর তো পাঁচটি স্থলে বিবাহিতা নারী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে তাহা লিখিয়াই গিয়াছেন। কিন্তু কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, নারদ, পরাশর লিখিয়া গেলেও আমাদের সমাজে ইহা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। পিতামহী, মাতামহী ইত্যাদির নিকট হইতে স্বামী দেবতা, স্বামীর দোষ ধরিতে নাই ইত্যাদি শুনিয়া শুনিয়া সেকালের হিন্দু নারীদের মনে এমন একটা অন্ধ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, সত্যই স্বামী শত দোষে দোষী হইলেও তাহারা স্বামীদের দোষ ধরিতে বা তাহা লইয়া আলোচনা করিতে ভয় পাইত। "পতি পরম গুরু, তাঁহার দোষ ধরিতে নাই" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পতি দেবতার নানারূপ অত্যাচার মুখ বন্ধ করিয়া সহ্য করিত। পতির সুখেই স্ত্রীর সুখ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পতি রক্ষিতাই রাখুক কিম্বা যত ইচ্ছা বিবাহই করুক কিম্বা মদ খাইয়া মাতলামিই করুক তাহারা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিত। এই সব অত্যাচার সহ্য করিতে কি তাহাদের কষ্ট হইত না? নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু কতক সংস্কারের বশে, কতক নিজেদের উপায়হীনতার জন্য আর কতক সমাজের ভয়ে তাহাদের বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিত না। কিন্তু সেকাল আর একালে বহু প্রভেদ। যুগের পরিবর্ত্তনের সহিত সমাজেরও পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার, সেকালে যাহা সম্ভবপর হইত বা সেকালে যে সমাজ বিধানগুলি চলিত একালে তাহা চলিতে পারে না। এখন নারীরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, বুদ্ধিতে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি স্থান রাখিয়া চলিতেছে। কাজেই সেই প্রাচীন হিন্দুসমাজ-বিধানগুলি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকিলে কিছুতেই মঙ্গল হইতে পারে না। সমাজের ক্রমবিবর্ত্তনকে হিন্দুসমাজ স্বীকার করে না। সমাজের ভিতর যতই ভাঙন ধরুক না কেন সনাতন নিয়মের ছক-কাটা দাগে পা ফেলিয়া চলাকেই আদর্শ মনে করে। এই অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের দিনে দুই হাজার বছরের পুরাতন সমাজ-বিধানকে ধরিয়া রাখিলেই সমাজের উন্নতি হইবে না। রক্ষণশীলতার আবর্ত্তনে পাক খাইয়া সমাজ দিনের পর দিন অধোগামী হইবে। ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি, পলায়ন ইত্যাদির বিস্তৃতি কেন হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই না কি সমাজের জটিলতর এই সব বিধানগুলি এজন্য দায়ী। সমাজের ভিতরে ভিতরে এই সব ব্যাধি এমন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, বাহিরের কাঠামো আপাতদৃষ্টিতে ঠিক থাকিলেও দুষিত ক্ষতের ন্যায় ইহা গোপনে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

অনেকে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার ঘোরতর বিরোধী। তাঁহাদের মতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার মেয়েরা পাইলেই কথায় কথায় স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে আর তাহাতে সমাজও ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে যাইবে। এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাত্র ছয়টি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কারণের উপর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে। কাজেই কথায় কথায় ছাড়াছাড়ি কি করিয়া হইবে? তাছাড়া আমাদের জীবনের অধিকাংশই আপোষ-নিষ্পত্তি এবং সহ্য করিয়া লওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হইলেই যে সকলে ইহা করিতে ছুটিবে তাহার কোন কারণ নাই। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অবাঞ্ছনীয় দাসদাসীদের ছাড়িবার পূর্ব্বে কত বার ভাবিয়া থাকি যে ইহার স্থলে যে আসিবে সে আরও অবাঞ্ছনীয় হইবে না তো? বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক নারী এবং পুরুষ এই কথাই ভাবিবে যে বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা অধিকতর অবাঞ্ছনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িবে কিনা। যেমন কবিরাজের ঔষধ-পেটিকায় মধ্যে উগ্রবিষ "সূচিকা-ভরণ" থাকে, রোগীর চরম অবস্থায় প্রয়োজন





মনে করিলে ইহা প্রয়োগ করা হয়। তেমনি সূচিকা-ভরণেরই ন্যায় বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা ভিন্ন নয় কিংবা নারী বিবাহ-বিচ্ছেদের সহায়তা কেন গ্রহণ করিবে?

আমাদের দেশে খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, এবং মুসলমান সমাজে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার অধিকার আছে। কয়জন খ্রীষ্টান, কয়জন ব্রাহ্ম, কয়জন মুসলমান বিনা কারণে, অপ্রয়োজনে কিংবা অতি তুচ্ছতম কারণে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতেছেন? আমাদের সমাজেই বিধবাবিবাহ আইনে স্বীকৃত হইয়াছে, কয়জন বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেছেন?

আজকাল প্রায় হিন্দু নারী অবাঞ্ছিত বিবাহ হইতে মুক্তি লাভের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতেছে এইরূপ সংবাদ আমরা প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। অনিবার্য্য বিপাকেই যে সমাজ-জীবনে এই ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইতেছে তাহা বিবেচক মাত্রই স্বীকার করিবেন। অনগ্রসর নারীসমাজ দাম্পত্য জীবন যন্ত্রণাদায়ক হইলে নিরুপায় হইয়া এই দুর্ভাগ্য নিঃশব্দ বেদনায় বহন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে যাহাদের ব্যক্তিত্ব-বোধ জাগ্রত হইয়াছে তাহারা কেহ কেহ এখন ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে, এবং সোজাভাবে ইহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় না থাকায় তাহারা ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নিজেদের কার্য্য হাসিল করিতেছে। কিন্তু সমাজ-জীবনে এই লুকোচুরির খেলা কোনক্রমেই প্রশংসনীয় নয়। সমাজ এখনও চলিয়াছে বহু পুরানো বর্ণাশ্রমিক আদর্শেরই লেজুড় ধরিয়া, কিন্তু বাস্তব প্রয়োজন তাহাকে টানিতেছে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। এই অবস্থা-সজ্ঞাতের ফলেই পারিবারিক জীবনে দিন দিন নানারূপ ঝঞ্ঝাট দেখা দিতেছে। তাহারই ফলে হিন্দু নারীর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং আবশ্যক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদ যে ইহার চেয়ে অনেক ভাল একথা সনাতনীদের পক্ষে যতই পীড়াদায়ক হউক না কেন, বাস্তব সত্যকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন আশা করি তাঁহারা সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। কোন সনাতন প্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে গেলে চিরকালই সনাতনীরা বাধা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন না ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে কি হইবে না। যখন সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদসাধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল তখনও সনাতনপন্থীরা কম বাধা দেন নাই। কিন্তু সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল হইয়াছে কি হয় নাই তাহা সমাজপতিদেরই বিচার্য্য।

পুস্তক-পরিচয়

বহ্ন্যুৎসব—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

নবপ্রকাশিত এই গল্প-সঙ্কলনে বহ্ন্যুৎসব, তৃতীয় পক্ষ, নীড়ের মায়া, মাকড়সার জাল, একাকিনী ক্ষণিকা, নহবৎ, তিনপুরুষের কাহিনী, জ্যাঠামশাই প্রভৃতি গল্পগুলি স্থান পাইয়াছে।

সরোজবাবুর গল্প-বলার একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত রাখিয়া কোথাও না ফেনাইয়া, অভ্যস্ত লিপি-সংযমে অত্যন্ত সহজভাবে কাহিনীকে অগ্রসর করিয়া দিবার কৌশল তিনি জানেন। নিত্য চোখে-দেখা অবহেলিত বিষয়বস্তুগুলি তাই কাহিনীর মধ্যে অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠে। সুনির্ব্বাচিত এই গল্পগুলি যে সুধীসমাজে সমাদৃত হইবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বসংগ্রামের গতি—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটাজ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

মহাচীনের নব জন্ম—শ্রীঅনাদিনাথ পাল। পূরবী পাবলিশার্স, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

জাপানী রণনীতি—শ্রীবিজনকুমার ব্যানার্জ্জী। শতাব্দী সাহিত্য মন্দির, ৫১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বর্ত্তমান মহাসমরকে উপলক্ষ্য করিয়া ইংরেজীতে বিস্তর পুস্তক লিপিবদ্ধ হইতেছে। বাংলা ভাষায়ও ইদানীং এই সব রচনার উপর নির্ভর করিয়া এই মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে নানা আলোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। এই যুদ্ধে এক দিকে প্রধান পক্ষ রুশিয়া, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এবং অন্য দিকে জার্ম্মানী ও জাপান। ইটালীর পতনে ইহা আর এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। এই দুইটি যুদ্ধরত রাষ্ট্রের রাজনীতিক অবস্থা ও সমরনীতিক কলকৌশল জানিতে ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক, এবং ইহাদের সহিত পরাধীন ভারতবাসীদেরও কি সম্পর্ক তাহাও জানিতে আগ্রহ হয়। আলোচ্য পুস্তকত্রয় এই ঔৎসুক্য কতকটা মিটাইতে পারিবে। প্রথম পুস্তকখানিতে লেখক কয়েকটি প্রবন্ধে বর্ত্তমান মহাসমরের নানা দিক আলোচনা করিয়াছেন। 'আর্থিক যুদ্ধ'; জার্ম্মানী, রুশিয়া ও জাপানের রণকৌশল; এবং সমরাবর্ত্তে ভারতবর্ষ ও দুর্গত বাংলা সম্বন্ধে লেখকের সুষ্ঠু আলোচনা এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

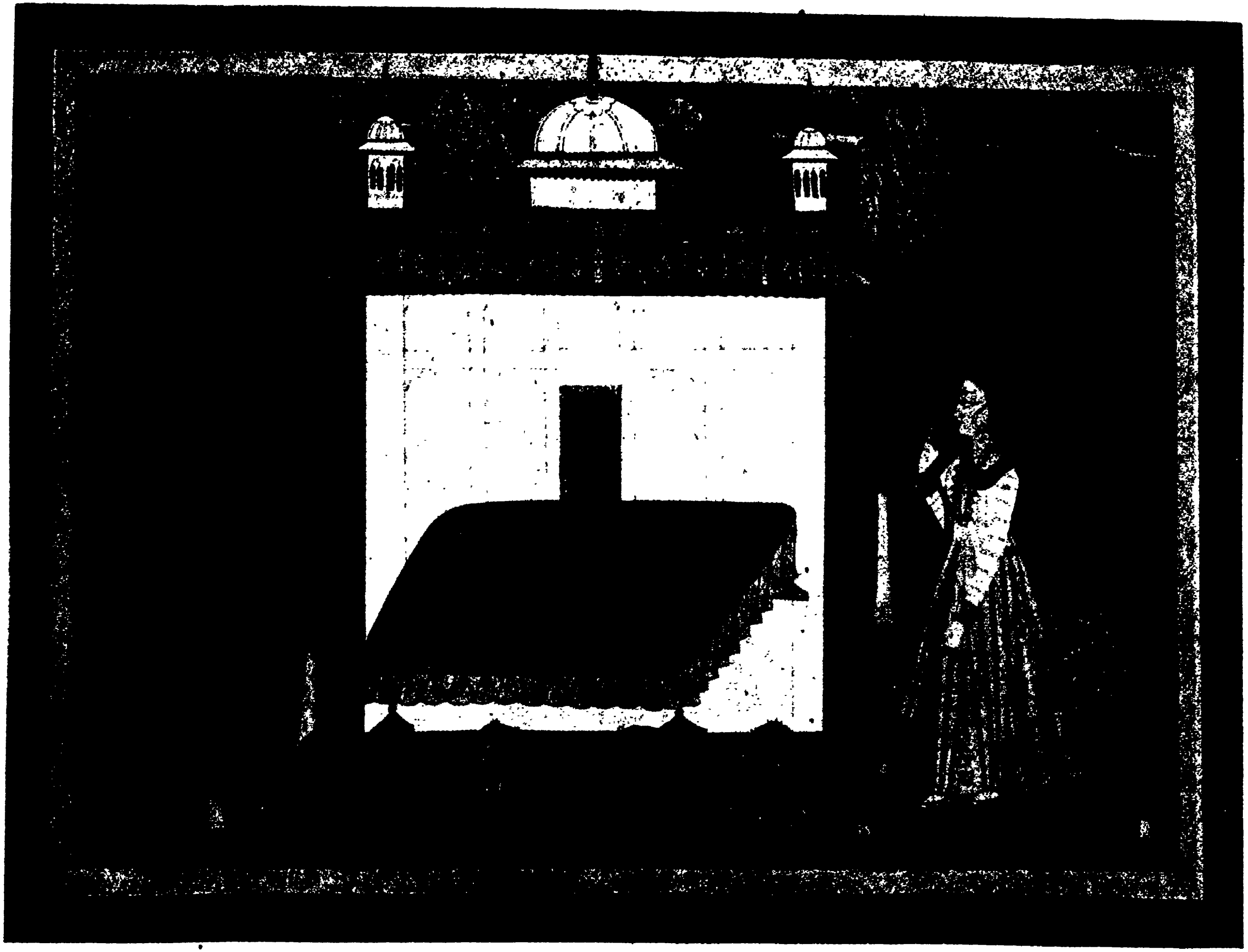
দ্বিতীয় পুস্তকে অনাদিবাবু বর্ত্তমান চীনের কথাই সবিশেষ বলিয়াছেন। ডক্টর সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর হইতে মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে চীনের পুনর্গঠনের কথা এবং বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধকালীন চীনের বিচিত্র কার্য্যকলাপ ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই জীবন-মরণ সংগ্রামের মধ্যেও চীনের শিক্ষাদান কার্য্য ব্যাহত হয় নাই—ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয় পুস্তকের বিষয়বস্তু ইহার নামেতেই প্রকাশ। জাপানের শক্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন, সংগ্রাম-স্পৃহা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও জঙ্গলে জাপানীদের যুদ্ধকৌশল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে তাহাদের কৃতিত্ব ও লাভালাভ, রুশিয়া ও জাপানের আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই বইখানিতে পাওয়া যাইবে। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু বর্ণাশুদ্ধি বিস্তর। বাংলায় 'ব্যানার্জ্জী' স্থলে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' লেখাই শোভন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ছোটদের ষ্টালিন—শ্রীসতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা। ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী, ১০৫ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

লেনিনের পরে ষ্টালিনের নাম রুশিয়ার, রুশিয়ার কেন পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। লেনিনের কৃতিত্ব তাঁহার স্বদেশের সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে ধনিকতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা করায় আর ষ্টালিনের গৌরব বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ফ্যাসী শক্তির হস্ত হইতে স্বদেশ ও সভ্যতাকে বাঁচানোয়। এত বড় বিরাট পুরুষ ষ্টালিন জর্জ্জিয়া প্রদেশের এক চর্ম্মকারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্য, দুঃখ, রাজরোষ ও কারাগারে তাঁহার জীবনের অনেক দিন কাটিয়াছে কিন্তু কখনও তাঁহার সাহস দমে নাই। রুশিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। কিশোরগণ এইরূপ জীবনী হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারিবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাসক-শয্যা সজ্জা

(প্রাচীন বাঙালী পদ্ধতি)



রাত্রির অন্ধকারে—মহানগরীর পথে
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

গান্ধীজীর উপবাস কল্পনা

গান্ধীজী পুনরায় অনশনের কল্পনা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি ঈশ্বরের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, উহা পাইলেই অনশন আরম্ভ করিবেন ইহা তিনি জানাইয়াছেন। সত্যাগ্রহীর চরম অস্ত্ররূপে উপবাসের অপরিহার্য্যতা গান্ধীজী বিশ্বাস করেন কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে অনশনের স্থান অথবা অনশনের দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার লাভের সার্থকতা বা যৌক্তিকতা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমরা বুঝিতে অক্ষম ইহা সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি। অনশনের দ্বারা লব্ধ পুণাচুক্তি ভারতবাসীর পক্ষে সর্বত্র কল্যাণপ্রদ হইয়াছে ইহা মনে করা কঠিন।

গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক জীবন তাঁহার নিজস্ব, কিন্তু ঐহিক জীবন তিনি দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। দেশবাসীও তাঁহার এই আত্মোৎসর্গের পুর্ণ মর্য্যাদা এযাবৎ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীজীর আহ্বানে প্রতিবার দেশ সাড়া দিয়াছে, তাঁহার নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতেও দেশবাসী দ্বিধা করে নাই। ১৯২০ সালের অসহযোগ এবং ১৯৩০-৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতবাসী গান্ধীজীর নেতৃত্বে চরম ত্যাগ স্বীকার ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছে। এক একটি আন্দোলনে বহু লোক সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি পরের আন্দোলনে যোগদানের লোকের অভাব হয় নাই। ১৯৪২-এ গান্ধীজীর পরিকল্পিত ভারত ত্যাগ (Quit India) আন্দোলনেও দেশ যখন তাঁহার আহ্বানের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিতেছিল এমনি সময় তাঁহার গ্রেপ্তারে দেশব্যাপী যে বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহাকে গান্ধীজীর জনসঙ্ঘের বিক্ষোভ প্রকাশ বলাই অধিকতর সঙ্গত। মুক্তিলাভের পর এই আন্দোলনের ফেরারী নেতাদের আত্মসমর্পণের জন্য গান্ধীজী আহ্বান করিবামাত্র তাঁহারা আসিয়া পুলিসের নিকট ধরা দিয়াছেন। লিনলিথগোর নিকট লিখিত গান্ধীজীর পত্রে এবং মুক্তিলাভের পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও ডাঃ সৈয়দ মামুদের যে বিবৃতি ও পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় এই আন্দোলন গান্ধীজী আরম্ভ করেন নাই, ওয়ার্কিং কমিটিরও উহার উপর কোন হাত ছিল না।

গান্ধীজীর লাঞ্ছনায় দেশবাসীর ক্ষোভই ছিল এই আন্দোলনের মূল কারণ। গান্ধীজীর আবেদনে অর্থদানেও দেশবাসী কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য তিনি এক কোটি টাকা চাহিয়া পাইয়াছেন, কস্তুরবা স্মৃতি-ভাণ্ডারের জন্য তাঁহার আবেদনে ৭৫ লক্ষের স্থলে প্রায় সওয়া কোটি টাকা উঠিয়াছে। দেশবাসী গান্ধীজীকে গ্রহণ করে নাই, তাঁহার আহ্বানে যথোপযুক্ত সাড়া দেয় নাই, এই ধারণা যাঁহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিকামী নরনারীর উপর গান্ধীজীর একচ্ছত্র প্রভাব শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও সর্বত্র স্বীকৃত।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপদেশে ও নির্দেশে নিখিল-ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘ, নিখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘ, গান্ধী সেবাসঙ্ঘ ও হরিজন সঙ্ঘ দেশের অসামান্য উপকার সাধন করিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহারই পরামর্শে ও আদর্শে প্রস্তুত ওয়ার্দ্ধা বনিয়াদী পরিকল্পনার ছাঁচে বর্তমান ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতিকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায় না। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তি একমাত্র গান্ধীজী। রাজনীতিক্ষেত্রেও কংগ্রেস গান্ধীজীর আদর্শ ও কার্য্যক্রম সম্পূর্ণ ও সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজীর কংগ্রেসে প্রবেশের পর ২৪ বৎসরে দেশ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁহার প্রত্যেক আহ্বানে সাড়া দিয়াছে এবং তাহার জন্য প্রয়োজন হইলেই শোণিত-মূল্য দিয়াছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টা বাঁচাইয়া রাখা এবং উহাদিগকে আরও অগ্রসর করিবার জন্য গান্ধীজীর নিজ দেশ আরও সময় ও শক্তি চাহে, অনশনের দ্বারা একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ভিন্ন স্থায়ী কাজ হইবে না ইহাই আমরা মনে করি।

কংগ্রেস আজ দুর্বল। বাংলায় উহার অস্তিত্ব প্রায় নাই বলিলেই চলে। আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার অবস্থাও তদ্রূপ। অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা সঠিক কি তাহা আমরা অবগত নহি। তবে ইহা সত্য মোটামুটি ভাবে কংগ্রেস সর্বত্র দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রগতিকামী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই হয় কারারুদ্ধ নতুবা অন্তরীণ। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার পথে বাধা ও বিঘ্ন আজ প্রচুর। কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা এখনও অপসারিত হয় নাই। এই

চূড়ান্ত অসুবিধার মধ্যে কংগ্রেসের প্রাণশক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সুদক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন গান্ধীজী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভবে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির ঘূর্ণাবর্তে ভারতবর্ষ তৃণখণ্ডের ন্যায় যেভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার মত কাণ্ডারী গান্ধীজী ভিন্ন আর কেহ নাই দেশবাসী সর্বান্তঃকরণে ইহা বিশ্বাস করে। জাতীয় জীবনের এই মহাসন্ধিক্ষণে অনশনের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইয়া গান্ধীজী দেশকে সত্যপথের সন্ধান দিয়া সেই পথে জাতিকে পরিচালিত করুন ইহাই আমাদের নিবেদন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপায়স্বরূপ একটি পঞ্চদশ বা বিংশবার্ষিকী পরিকল্পনা নির্দ্ধারণের জন্য 'প্রবাসী'র গত সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যবস্থা-পরিষদে আসনের ভাগ অথবা চাকুরীর বখরা দান বা গ্রহণ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপায় নহে। সমগ্র মুসলমান সমাজ এবং হিন্দু সমাজের বহু অংশ এখনও যথেষ্ট পিছনে পড়িয়া আছে, সুপরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন এবং শিক্ষাদানের দ্বারা তাহাদিগকে প্রগতিশীল হিন্দুর সমকক্ষ করিয়া তোলা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়াই আমরা মনে করি। দুই দিক দিয়া আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি দেখিতে চাই। মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুর কতকগুলি দাবির মধ্যে যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু কতকগুলি দাবি একান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়। সমস্ত দাবি প্রথমে একবার বিচার করিয়া দেখা দরকার। ইহার জন্য মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন। অনুসন্ধানের ফলে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগের যে-সব দাবি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত হইবে এবং গ্রহণ করিবার সময় কত দিনের জন্য ঐগুলি বহাল থাকিবে তাহা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর সে সম্বন্ধে আর কোন দাবি চলিবে না। এই সঙ্গে অপরের স্থায়ী কোন ক্ষতি না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অগ্রসর হিন্দু কোন্ কোন্ বিষয় কত দিনের জন্য ত্যাগ করিল, মুসলমান, অনুন্নত ও অগ্রসর হিন্দু তিন্ জনেরই তাহা ভাল করিয়া জানা থাকিবে। দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই উদারচিত্তে দান ও গ্রহণ করিতে হইবে। এই বন্দোবস্ত করিতে গিয়া কাহাকেও জন্মগত মূল অধিকার ত্যাগ করিতে বলা আমাদের উদ্দেশ্যে নহে, সুশৃঙ্খল, সুগঠিত, সর্ববিষয়ে উন্নত হিন্দু মুসলমান সমানাধিকারের ভিত্তিতে মিলিত হইয়া শান্তিপূর্ণ ও শক্তিশালী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তুলুক ইহাই আমরা চাই। আজিকার উন্নত হিন্দু যে ত্যাগ স্বীকার করিবে, তাহারই সন্তানসন্ততি সামাজিক শৃঙ্খলা শান্তি ও প্রগতিরূপে তাহারই সাতগুণ ফিরিয়া পাইবে। প্রকৃতপক্ষে এই দান দান নয়, ইহা বিনাসুদে ঋণদান মাত্র। আন্তরিকতার সহিত দানের সর্ত প্রতিপালিত হইলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই ইহাতে সমানভাবে লাভবান হইবে।

প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুর নামে যে-সব অবাস্তব ও অন্যায় দাবি তুলিয়াছেন, তাহা যে কাহারও পক্ষে কল্যাণপ্রদ নহে এ সত্য আরও ভাল করিয়া দেশবাসীকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। শুধু মুষ্টিমেয় এইসব নেতারই ইহাতে লাভ, ক্ষতি সমগ্র দেশের। সাম্রাজ্যবাদীর একান্ত বাঞ্ছিত ভেদনীতি অসম্ভব কতকগুলি দাবির ফলে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই দাসত্ব কায়েম হইবে, পরাধীনতার বিষ উভয়কেই সমান জর্জরিত করিবে। দেশের অনিষ্ট করিয়া নিজের ইষ্ট সাধন দেশদ্রোহীর কাজ, শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে নিজেরও লাভ হয় না। মুসলমানের সাহায্যে হিন্দুকে একবার পিষিয়া মারিতে পারিলে বিদেশী শাসক মুসলমানকে আর মাথায় তুলিয়া রাখিবে না; তাহাকেও হিন্দুরই ন্যায় দলিয়া পিষিয়া ধ্বংস করিবে। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ইহার নজিরও আছে। ইংরেজের নিকট শ্রেণী-বিশেষের ভারতীয় মুসলমান যে সুবিধা আজ ভোগ করিতেছেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল আন্দোলন নষ্ট করিবার জন্য ইঁহাদের সাহায্য দরকার। পরিবার ও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অর্থের লোভে ইঁহারা যে কাজ করিতেছেন তাঁহাদের সম্প্রদায়কেও তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। দুর্ভিক্ষে মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দু মরিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। প্রতিক্রিয়াশীল লীগওয়ালা মন্ত্রীদল ইহার প্রতিকার করিতে পারে নাই, বিদেশী শাসক করে নাই। দুর্ভিক্ষের পর মুসলমানদের জন্য একটি বিশেষ জেলায় একটি অনাথ আশ্রম স্থাপনের দ্বারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে বলিয়া মুসলমান নিজেও বিশ্বাস করিতে পারে না। সুবিধাবাদীর সুবিধা লাভ সম্প্রদায় বা দেশের স্বার্থের সহায়ক নহে, উহার পরিপন্থী।

হিন্দু মুসলমানে ভেদসৃষ্টির চেষ্টা বাংলার বঙ্গভঙ্গ হইতে সুরু হইয়াছে। মুসলমানকে অধিকতর সুবিধাদানের যে মৌখিক অভিপ্রায় সেদিন হইতে সতত বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, ৪০ বৎসরে তাহার ফল মুসলমানের নিকট কল্যাণকর হয় নাই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান আজও সেই ১৯০৫ সালেরই ন্যায় অনগ্রসর। ইহার মধ্যে অ-বাঙালী মুসলমান বাংলায় আসিয়া কোটি কোটি টাকা পকেটে পুরিয়াছে, বাঙালীর দারিদ্র্য ঘুচে না। বাঙালী মুসলমান পাট-চাষী পূর্ব্বেরই ন্যায় রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া পাট চাষ করে। মুসলমান মন্ত্রী, ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য তাহাকে ইংরেজ বণিকের শোষণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ইংরেজ কলওয়ালা এবং মাড়োয়ারী ফাটকাবাজ তাহাকে পূর্ব্বেরই ন্যায় দোহন করে, লীগওয়ালা মুসলমান মন্ত্রীরা তাহাদের সহায়। চাষীর মজুরি পোষায় না, উপরি লাভ ম্যালেরিয়া। মুসলমানের জন্য চাকুরির বখরা লইয়াও যথেষ্ট কোন্দল হইয়াছে।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর ধ্বংস-সাধন

মধ্যবিত্ত বাঙালীর ধ্বংস-সাধন-কার্য অবাধে চলিয়াছে। নিবৃত্তির কোন চিহ্নমাত্র আজও দৃষ্টিপথে পড়ে না। শহরে ও

গ্রামে অবস্থা সমান সঙ্গীন, সমান বিপন্ন, সমান অনিশ্চিত। যুদ্ধোদ্যমে যে কয় লক্ষ বাঙালীর সাহায্য অপরিহার্য তাহারা ভিন্ন আর সকলের অবস্থা সমান ভয়াবহ। মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন বাঙালীর নিকট আজও চাউলের মূল্য অত্যধিক, সাধারণ ও শীতবস্ত্র সমান দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য, ঔষধ মহামূল্য বিলাস সামগ্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শহরে রেশনিঙের কল্যাণে জঘন্য ও অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে লোকে বাধ্য, ফল ক্রমাগত স্বাস্থ্যহানি, রোগবৃদ্ধি ও মৃত্যু। গ্রামের অবস্থা আরও মারাত্মক। প্রবল মহামারীরূপে ম্যালেরিয়া জেলায় জেলায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে। পুষ্টিকর খাদ্য আজ কল্পনার বস্তু, ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ কুইনাইনের অস্তিত্ব সরকারী প্রচার বিভাগের ইস্তাহারে নিবদ্ধ। ভাগ্যবান ব্যক্তি চার টাকা দিয়া ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করিতে পারিলে সাত আনায় কয়েক বড়ি কুইনাইন "সস্তায়" সংগ্রহ করিতে পারে। বাংলার সর্বজনমান্য চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বার বার বলিয়াছেন যে কুইনাইন সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। ধন-প্রাণের নিশ্চয়তা গ্রামে নাই। ডাকাতি নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বিপদের জন্য সঞ্চিত সামান্য পুঁজি যাহাদের ছিল তাহাদের পক্ষে উহা রক্ষা করাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

যাতায়াতের অব্যবস্থায় গ্রামে যাহারা গিয়াছে তাহাদের পক্ষে শহরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি নানাবিধ কর্মোপলক্ষে বহুজনকে প্রায়ই শহরে আসিতে হয়। ট্রেনে যাতায়াত যেমন অসুবিধা তেমনি বিপজ্জনক। বাস বন্ধ। কলিকাতার ন্যায় শহরে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিতে বাসস্থানের তীব্র অভাব ঘটিয়াছে। কতকগুলি নূতন বাড়ী করিবার মালমশলা দিলে অথবা শহরতলী অঞ্চলগুলি হইতে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাড়তি লোকদের নগরের উপকণ্ঠে সরিয়া যাওয়ার সুযোগ দিলে বহু জনে অযথা কষ্ট ও লাঞ্ছনা হইতে রেহাই পাইতে পারিত। মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন যে তিনটি জিনিষ—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান—সেই তিনটিই ইংরেজের সুশাসনে আজ মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীন বাঙালীর আয়ত্তের বাহিরে।

শিক্ষার অবস্থাও তদ্রূপ। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি তো প্রায় উঠিয়া যাওয়ার উপক্রম, শহরের অবস্থাও তার চেয়ে ভাল নয়। গত দুই বৎসরে স্কুল কলেজগুলির অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, এখনও সেগুলি দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের শাণিত ছুরি পূর্বেরই ন্যায় উদ্যত রহিয়াছে। কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশে বই খাতার অভাব চরমে উঠিয়াছে। কাগজের অভাবে পরীক্ষা বন্ধ, বইয়ের অভাবে পড়া অসম্ভব। কাগজ নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে বইয়েরও ব্ল্যাক মার্কেটিং সুরু হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্বে মুদ্রিত পুস্তককেও রবার ষ্ট্যাম্প মারিয়া তিন টাকা দাম বেশী আদায় করিলে বাধা দিবার কেহ নাই। কাগজের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ীতে পাঠ চর্চা প্রায় তিন বৎসর যাবৎ বন্ধ, ইহার ফল কি ভয়াবহ হইয়াছে তাহা এখনকার স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী বাংলা ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান পরীক্ষা করিলেই বুঝা যায়।

সর্বাপেক্ষা অধিক ভয়ের কথা এই যে, জীবনযাত্রা দুরূহ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বাড়িয়া চলিয়াছে, আত্মমর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতা বোধ ক্রমাগত কমিতেছে। তীব্র অভাবের ইহা অপরিহার্য পরিণাম। ঘুষ দেওয়া ও ঘুষ লওয়া কেহ আজ অন্যায় মনে করে না। সময় ও লাঞ্ছনা বাঁচাইবার জন্য ঘুষ দেওয়া একান্ত আবশ্যক; ঘুষ খাওয়া আমলাতন্ত্রের সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে।

বাংলার ও ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালী এতকাল নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে মুঠার মধ্যে পাইয়া তাহার ধ্বংসসাধন উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া মনে করা শক্ত। ধনে প্রাণে মনে ও আত্মায় বাঙালীকে মেরুদণ্ডবিহীন নির্বীর্য্য এবং অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির জন্য বিদেশী সরকারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার চেষ্টার পিছনে কোন পরিকল্পনা নাই, নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন অপরে ইহা বিশ্বাস করিবে না।

ভারতীয় মুসলমানের পৃথক জাতীয়ত্বের ভ্রান্ত ধারণা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য বহরমপুরের মিঃ আবদুস সামাদ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ জিন্নার দুই জাতি সম্পর্কিত প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মিঃ জিন্নার মতে ভারতের মুসলমানগণ পৃথক জাতি; কিন্তু বহু প্রমাণ উপস্থিত করিলেও মিঃ জিন্না সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ অর্থাৎ জাতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। মিঃ সামাদ স্বীকার করেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক হিন্দুধর্ম হইতে ধর্মান্তরিত। তিনি বলেন, "ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও কাহারও জাতির পরিবর্তন হয় না।" তিনি দেখান যে পশ্চিমদেশীয় মুসলমানদিগের বাঙালী মুসলমানের প্রতি কোন সহানুভূতি নাই। তাহার কারণ সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি নীতি এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান বিষয়ে বাংলার মুসলমানদিগের সহিত তাঁহাদিগের পার্থক্য আছে। বাংলার মুষ্টিমেয় কয়েক জন মুসলমান ব্যতীত অধিকাংশ মুসলমানেরই অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান অপেক্ষা এই প্রদেশের হিন্দুদের সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে।

লাহোরের অধ্যাপক আবদুল মজিদ খাঁও এক বিবৃতিতে দেখাইয়াছেন মুসলমান হিন্দু হইতে পৃথক একটা জাতি নহে। তাঁহার মতে মুসলমানের ভিন্নজাতীয়তার দাবীর সপক্ষে কোন যুক্তি সুদূর কল্পনাতেও আনা যায় না। অধ্যাপক মজিদও স্বীকার করিয়াছেন জাতি হিসাবে শতকরা ৯৫ জন মুসলমানেরই পূর্বপুরুষ হিন্দু।

বাংলার প্রথম সেন্সসেও ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের পথ মুক্ত করিবার জন্য মুসলমান শাসনকালেই উর্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় মধ্যযুগের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে মিলিয়া একসঙ্গে গড়িয়াছে। স্বাধীনতা হারাইয়া উভয়েই একসঙ্গে অনাহারে রোগে শোকে

মরিতেছে। ভাষা, ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থানের একত্ব জাতীয়তার আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞানুসারে হিন্দু মুসলমান একই জাতি।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ হইতে সাহায্যদান

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজা যুবরাজ দত্ত সিংহ কর্তৃক সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্য ও পুনর্গঠন সম্পর্কিত কমিটির প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুত রামচন্দ্র বলেন যে, যদিও চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক ভারত-সরকার উহার সভ্য, কিন্তু উক্ত ভাণ্ডারে ভারত-সরকারকে কত চাঁদা দিতে হইবে তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্য ও পুনর্গঠন সম্পর্কিত কমিটিতে স্থির হইয়াছে যে, যদি সুবিধা সঙ্কুলান হয়, তবে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলসমূহও উক্ত কমিটির সাহায্য লাভ করিতে পারে। অতএব ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত বা ব্যাধিকবলিত অঞ্চল সকলও ঐ সাহায্য পাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক সাহায্যনীতি গ্রহণ করার ফলে সম্মিলিত জাতিসমূহের সাহায্য ও পুনর্গঠনসম্পর্কিত কমিটির নিকট হইতে ভারতবর্ষ অর্থে বা শস্যে কোন্ প্রকারে কতটা সাহায্য পাইয়াছে, বা পাইবার আশা রাখে, এই প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য-সচিব জানান যে, ভারতবর্ষ এপর্যন্ত কোন সাহায্য প্রার্থনা করে নাই বা সাহায্য লাভ করে নাই। দুই জন ভারতীয় শ্রীযুত স্মুর্ ও পোগেট যদিও উক্ত কমিটিতে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কি পদ, তাহা জানা যায় নাই।

এই প্রতিষ্ঠান (U N R R A) হইতে ভারতবর্ষ সাহায্য প্রাপ্তির আবেদন করে নাই এই কথাটা বিলাতের হাউস অফ কমন্সে মিঃ আমেরীও ঘটা করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ভাবখানা এই যেন ভারতে বিদেশ হইতে সাহায্য আনয়নের কোন আবশ্যক নাই। সাহায্যের আবেদন প্রেরণ সম্বন্ধে ভারতবাসীর কোন হাত নাই, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ইঙ্গিতে অথবা সম্মতিতে ভারত-সরকার উহা করিবেন। ইহার জন্য অবশ্য ভারতীয় করদাতার অর্থ হইতে চাঁদার বরাদ্দ এবং যথাসময়ে কয়েক লক্ষ বা কোটি টাকা প্রেরণে বাধা হইবে না। ভারত-সরকারের প্রিয়পাত্র দুই ব্যক্তির মোটা চাকুরী ত ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে।

শুধু ভারতবর্ষ নয় চীন দেশ সম্বন্ধেও ঐ একই নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। চীনা সরকারের সহিত দেশবাসীর যোগ আছে বলিয়া সেখান হইতে আবেদনটা গিয়াছে যদিও কাজ বিশেষ কিছু হয় নাই। ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর মিঃ লেহ্‌ম্যান এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, চীন দেশ জানাইয়াছে প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহাদের যে-সব দ্রব্য পাওয়ার কথা হইয়াছে, চীনের অভাবের পক্ষে তাহা একান্ত অপর্য্যাপ্ত। মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলির জন্য যত জিনিষ দরকার পৃথিবীতে তত বেশী আজকাল উৎপাদন হয় না। ইহারা অর্থাৎ জার্মানকবলিত ইউরোপীয় দেশগুলি মুক্ত হইবার পর যে পরিমাণ মাখন, মাংস, চিনি ও বস্ত্র প্রয়োজন তাহাই সংগ্রহ করা কঠিন।

ইউরোপের জার্মান কবলমুক্ত দেশগুলিতে সাহায্য প্রেরণই UNRRA-এর প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, সাহেবেরা আগে বাঁচিলে তারপর কালা বা পীত জাতির কথা ভাবিবার চেষ্টা হইতে পারে। ভারতবাসী বা চীনদেশবাসীকে অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য খাদ্য প্রেরণ অপেক্ষা ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের জন্য মাখন ও মাংস প্রেরণ সঙ্ঘের নিকট অনেক বড় কাজ। বাংলা বা চীনের হোনান প্রদেশের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিতে দেখিয়াও UNRRA বিচলিত হন নাই বা ভারতবর্ষে ব্রিটেনের তাঁবেদার গবর্মেণ্ট সাহায্য প্রার্থনা করাও আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। চাঁদার টাকাটার বেলায় অবশ্য ভারতবর্ষে বা চীনের সহিত ইউরোপীয়দের ব্যতিক্রম করা হইবে না এটুকু বিশ্বাস ভারতবাসীর আছে।

আইনের অজ্ঞতা

আইনভঙ্গের অপরাধ করিয়া আইন না জানার যুক্তি প্রদর্শন কোন দেশের আদালতেই গ্রাহ্য হয় না, অবশ্য পরাধীন দেশ ছাড়া। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টর-জেনারেল আইনভঙ্গের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনে আইনের অজ্ঞতার যুক্তি দেখান এবং উক্ত প্রদেশের এডভোকেট-জেনারেল নিঃসঙ্কোচে ঐ কৈফিয়ৎ হাইকোর্টে পেশ করেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই: শ্রীযুক্ত সাওজী নামক জনৈক কংগ্রেসকর্মী যখন নাগপুর, সেণ্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন তখন তিনি হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করেন। জেলের নিয়ম অনুসারে ঐ দরখাস্ত প্রথমে ইন্সপেক্টর-জেনারেলের কাছে যায় এবং তিনি উহা হাইকোর্টে পাঠাইবার অনুমতি না দেওয়ায় উহা দপ্তরে চাপা পড়িয়া যায়। ঘটনাটি অন্য সূত্রে হাইকোর্টের গোচর করা হইলে আদালত কৈফিয়ৎ তলব করেন। ইন্সপেক্টর-জেনারেলের পক্ষ সমর্থন করিতে উঠিয়া মধ্যপ্রদেশের এডভোকেট-জেনারেল কবুল জবাব দিয়া বলেন, ইনসপেক্টর-জেনারেল আইন না জানায় ভুল করিয়াছেন।

হাইকোর্ট অবশ্য এই কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রায়ে জজেরা বলিয়াছেন, "আইনে অজ্ঞতা কখনও, বিশেষ ইহার পরে আর কখনও, কৈফিয়ৎ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। শাসন বিভাগের কর্মচারীরা যখন সাধারণ লোককে অভিযুক্ত করেন তখন আইনের অজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমার্হ হয় না—এই মূল নীতি প্রবল ভাবেই প্রযুক্ত হয়। যখন কোন লোক নির্দ্ধারিত মূল্য সম্বন্ধে আদেশ না জানিয়া এক জোড়া তাস বা এক বস্তা গম নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করে তখন তাহাদিগের নামে মামলা রুজু করা হয় এবং বলা হয় তাহারা কঠোর দণ্ড পাইবার উপযুক্ত। তখন বলা হয় অজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমার্হ হয় না এবং সেই সকল সামান্য লোকেরও আইন ও আদেশ জানা কর্তব্য। আমরা সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করিতে চাহি না। নিয়ম সকলের সম্বন্ধে একই ভাবে প্রযুক্ত হউক। কিন্তু যাহা সাধারণ লোকের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে তাহা যে-সকল সরকারী কর্মচারী ইচ্ছা করিলেই আইন জানিয়া লইতে পারেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কেন প্রযুক্ত হইবে না? তাঁহাদিগের অজ্ঞতার অজুহাত গ্রাহ্য হইতে পারে না।" হাইকোর্ট অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ইনসপেক্টর-জেনারেলটিকে দণ্ড প্রদান করেন নাই, তাঁহার কার্য্যের নিন্দা করাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন

সহস্র প্রকারের নিত্য পরিবর্তনশীল নিষেধাজ্ঞার একটিও না জানার কৈফিয়ৎ দিয়া আজ পর্য্যন্ত একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও অব্যাহতি পাইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

এডভোকেট-জেনারেলের কৈফিয়তে আরও একটি যুক্তি ছিল এই যে, ইন্সপেক্টর-জেনারেলটি একজন কর্ণেল এবং সমর বিভাগে তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। হাইকোর্টে এই কৈফিয়ৎও গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে ইহাও ভয়ের কথা। সম্মুখ সমরের বীরত্ব এবং কারাগারে দণ্ডিত ও বিনাবিচারে আটক সম্পূর্ণ অসহায় ব্যক্তিদের উপর বীরত্ব ভিন্ন পর্য্যায়ের বস্তু। সম্প্রতি শাসনকার্য্যে সামরিক কর্মচারী আমদানী বাড়িতেছে, নিরীহ নাগরিকের উপর অত্যাচারের কৈফিয়ৎ দানে ইঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব কাজে লাগিলে দেশের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইবার সম্ভাবনা।

সাংবাদিকদের বেতন

ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের মালিকদের পরামর্শ সভার স্থায়ী পরিষদ সাংবাদিকদের ন্যূনতম বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজী পত্রিকার সাংবাদিকদের নিম্নতম বেতন হইবে ১০০ টাকা এবং ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত পত্রিকার বেলায় ৭৫ টাকা। ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের বেতন নির্দ্ধারণের এই তারতম্যের প্রতিবাদে "বেতনভুক্ বার্ত্তাজীবী সমিতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র সেন নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

রাজভাষায় পরিচালিত পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রজার ভাষায় পরিচালিত পত্রিকার সাংবাদিকদের নূনতম যোগ্যতা একই থাকিবে, কিন্তু দেশীয় ভাষার সাংবাদিকরা রাজভাষার সাংবাদিকদের তুলনায় টাকা প্রতি চারি আনা কম বেতন পাইবে। পরিষদের যে সমস্ত সদস্য এই তারতম্যে সম্মতি দিয়াছেন, তাঁহারা যদি একবার বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিতেন তবে বুঝিতে পারিতেন যে, দেশীয় ভাষার সাংবাদিকদের ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান ইংরেজী ভাষার সাংবাদিকদের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া দরকার। সমস্ত সংবাদ ইংরেজীতে আসে। খুব ভাল ইংরেজী জ্ঞান না থাকিলেও দুই একটা দাঁড়ি কমা বসাইয়া এবং একটা শিরোনামা করিয়া দিলেই ইংরেজী সাংবাদিকদের চলে, কিন্তু দেশীয় ভাষার সাংবাদিককে তাহা অনুবাদ করিতে হয়। সেই অনুবাদ অতিশয় শ্রমসাধ্য এবং তাহার জন্য ইংরেজী ভাষা এবং বিষয়টি খুব ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। কোনও ইংরেজী সাংবাদিকের পক্ষে তাহা করিয়া উঠা কখনও সম্ভব নহে। এমতাবস্থায় ইংরেজী সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের তুলনায় দেশীয় ভাষার সাংবাদিকগণ কেন হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন বা কম পারিশ্রমিকের যোগ্য বিবেচিত হইবেন, তাহা আলোচ্য পরামর্শদাতারা পরিষ্কার বুঝাইয়া না বলিতে পারিলে ভবিষ্যতে কোনও উপযুক্ত লোকই দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে সহজে কাজ করিতে আসিবে না। ফলে কোনও দিনই দেশীয় ভাষার কাগজগুলির উন্নতি হইবে না।

ট্যাক্স না দেওয়ায় রেশন কার্ড বন্ধ

মাদারিপুর, ২৭শে অক্টোবর—খাদ্যশস্য এবং কেরোসিন তৈলের জন্য যে নূতন রেশন কার্ড এখানে বিলি করা হইয়াছে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, যে-সমস্ত পরিবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিতে পারে নাই তাহাদিগকে উক্ত কার্ড দেওয়া হয় নাই। —ইউ, পি

পরাধীন দেশে কণ্ট্রোল ব্যবস্থা বিদেশী শাসকের সুবিধা বা অভিপ্রায়ানুসারে প্রযুক্ত হইলে আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকে না, বরং উহাই স্বাভাবিক। সংবাদপত্রের বরাদ্দ কাগজ বিতরণ সম্বন্ধে যে হুকুমনামা জারী হইয়াছিল তাহার রাজনৈতিক প্রয়োগের কথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা হইলেও বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায় নাই। সাধারণ বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ে যে মানুষকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাকে পরিমিত খাদ্য সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব গবর্মেণ্টের ; মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেওয়া না-দেওয়ার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই, থাকিতেও পারে না। মাদারিপুরের ঘটনা নিশ্চয়ই সেন্সরের মঞ্জুরী প্রাপ্তির পরে প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার কোন প্রতিবাদ সরকারী প্রচার বিভাগ করে নাই। সুতরাং ঘটনাটি মোটামুটি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নহে।

ট্যাক্স আদায়ের জন্য রেশন কার্ড বন্ধ করা একটিমাত্র স্থানেও প্রচলিত হইলে ইহার ফল সমগ্র সমাজের প্রতি সাংঘাতিক হইবে। ইহার পর ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের রেশন কার্ড বন্ধ হইলে লোকে বিস্মিত হইবে না কিন্তু বিপদে পড়িবে। সংবাদ প্রকাশ করিয়া জনমত জাগ্রত করিবার ক্ষেত্র যেখানে সঙ্কুচিত, জনসাধারণের প্রতিনিধি নামে মন্ত্রীদল যেখানে বিদেশী বণিকের ক্রীতদাস, ঐ রেশন কার্ডের রাজনৈতিক প্রয়োগের প্রতিকার সেখানে অসাধ্যই হইবার কথা।

কয়লা রপ্তানী

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে সর রামস্বামী মুদালিয়র স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালেও বহু কয়লা ভারতের বাহিরে, গ্রীসে ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, রপ্তানী হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতবাসী যখন জ্বালানি কয়লার অভাবে হাহাকার করিয়াছে, দেশীয় শিল্পগুলি যখন কয়লা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অচল হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের প্রয়োজনে সেই সময়েও ভারতবর্ষ হইতে কয়লা রপ্তানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষের বন্দরে যে-সব জাহাজ আসিয়াছে সেগুলিকেও প্রয়োজন হইলেই ভারতের কয়লা দেওয়া হইয়াছে। সর রামস্বামী বলিয়াছেন যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্ব্বে গড়ে যে পরিমাণ কয়লা ব্যয় হইত, তাহা অপেক্ষা ২০ লক্ষ টন অধিক যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসরে ব্যয় হইয়াছে। রেলওয়ে এবং দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির জন্যই এত বেশী কয়লা লাগিয়াছে।

১৯৪৩ হইতে কয়লা তোলা হ্রাস পায়। কয়লার অধিকাংশ এবং ভাল ভাল খনি ইংরেজ বণিকদের হাতে। অতিরিক্ত লাভকর লইয়া সরকারের সহিত এবং মজুরী লইয়া শ্রমিকদের সহিত ইহাদের বিরোধ কয়লা উত্তোলন হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ। ভারত-সরকারকে কোণঠাসা করিয়া দুই দিক দিয়াই ইহারা সুবিধা করিয়া লইয়াছে—অতিরিক্ত লাভকর প্রদান সম্বন্ধে কড়াকড়ি ইহাদের বেলায় অনেক কমিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ভারত-সরকার ইহাদিগকে খনিতে সস্তা নারী শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি দিয়াছেন।

গৃহস্থের প্রয়োজনীয় জ্বালানি কয়লা-সমস্যা আজও সমান তীব্র রহিয়া গিয়াছে। নূতন নিয়মে কলিকাতায় আধ

মণের বেশী কয়লা কাহাকেও একবারে দেওয়া হয় না এবং প্রতি বারে দুই আনা করিয়া কুলি ভাড়া আদায় করা হয়। কয়লার দামও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পরাধীন দেশে রেশনিঙের অপরিহার্য অঙ্গগুলিও এই বন্দোবস্তে পুরাদমে দেখা দিয়াছে। কয়লার নামে যাহা পাওয়া যায় তাহার তিন-চতুর্থাংশই মাটি, গুঁড়া ও পাথর। উপরিপাওনা সময় নষ্ট, হয়রাণি ও প্রতিবাদ করিতে গেলে অপ ন।

চায়ের মূল্য

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত মনু সুবেদার এক প্রশ্নোত্তরের মধ্যে উল্লেখ করেন যে ব্রিটেনের অ-সামরিক অধিবাসীদের জন্য ভারতবর্ষে পাঁচ আনা কিম্বা ছয় আনা মূল্যে চা ক্রয় করা হয়, অথচ ভারতের সাধারণ নাগরিকদিগকে উহার কয়েক গুণ অধিক মূল্যে চা ক্রয় করিতে হয়। অর্থসচিব মন্তব্য করেন যে ঐ চা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হইয়া থাকে।

কথাটা সত্য। গ্রেট ব্রিটেনের সামান্যতম ব্যক্তিটিরও যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও তাহার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যুদ্ধোদ্যমেরই অঙ্গ। ব্রিটেনের অধীন ভারতবর্ষে অবশ্য উহা বিপরীত অর্থে প্রযোজ্য। এখানে যে-সব অঞ্চলকে যুদ্ধ-ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত করা চলে সেখানেও অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরিলে বা অল্প ও অপুষ্টিকর আহারে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে তাহা যুদ্ধোদ্যমের বিরোধী হয় না।

ভারতে এটাব্রিন প্রস্তুতের চেষ্টা ব্যর্থ

বাঙ্গালোর, ১১ই নবেম্বর—ওয়াকিফহাল মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, ভারতের কোন একটি বিখ্যাত 'ভাক্সীন ইনষ্টিটিউট''-এর ডিরেক্টার 'এটাব্রিন' তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার জন্য জাহাজে ২৭ টনের জায়গার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত করা হইয়াছে।

"এটাব্রিন" ম্যালেরিয়ার একটি চমকপ্রদ ঔষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এতদিন আমাদের দেশে গোপন রাখা হইয়াছিল। উক্ত ডিরেক্টারের অনুরোধে রুশিয়া হইতে বিস্তৃত বিবরণসহ ইহার প্রস্তুত প্রণালী পাওয়া গিয়াছে। এদেশে উহা প্রস্তুত করিতে পারিলে ঔষধটির দাম অপেক্ষাকৃত কম হইবে।—ইউ পি

অল্পদামে এদেশে এই অতি প্রয়োজনীয় ঔষধটি তৈরি হইলে ভারতবাসীর লাভ যথেষ্ট, কিন্তু বিলাতী ঔষধ কোম্পানীর ইহাতে ক্ষতি আছে। এটাব্রিন তৈরির যন্ত্র আনিবার জন্য জাহাজে ২৭ টনের স্থান হইল না। মদ আমদানীর জন্য প্রতি মাসে জাহাজে কত টন স্থান বরাদ্দ আছে সে হিসাব কেহ প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

রেশনিং মাহাত্ম্য

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ জ্যোতির্ভূষণ কর্তৃক লিখিত নিম্নলিখিত পত্রখানি ২২শে কার্তিক তারিখের দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে :

"আমার ৮০।১।২ গ্রে ষ্ট্রীট বাড়ীর পার্শ্বে খোলা জায়গায় কোন ঠিকাদার প্রায় ২৫ হাজার বস্তা চাউল, গম ইত্যাদি রাখিয়াছেন। তাহা হইতে প্রায় এক শত বস্তা অতি দুর্গন্ধযুক্ত পচা চাউল খুলিয়া রৌদ্রে চালা হইয়াছে। তাহার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হইয়া আমি কর্পোরেশনের ১নং ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ করিলে তিনি একজন ফুড ইন্সপেক্টারকে পাঠাইলেন। সেখানে উপস্থিত মালিককে ঐ গুদামের মালিকের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব দিলেন—His Excellency the Governor of Bengal, পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই চাউল দিয়া কি হইবে। তাহাতে তিনি জবাব দিলেন, Go and enquire of His Excellency এই বলিয়া মোটরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কর্পোরেশনের ইন্সপেক্টারও চলিয়া গেলেন। এই চাউল কাহার এবং ইহা মনুষ্য-খাদ্যরূপে বিক্রয় করা হইবে কিনা, সেই সম্পর্কে কেহ কি কিছু আলোকসম্পাত করিতে পারেন ?"

খোলা জায়গায় চাউল, গম ইত্যাদি বস্তাবন্দী করিয়া রাখায় উহার বহুলাংশ পচিয়াছে। ঐ পচা জিনিষ প্রথমে মানুষকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়া পরে উহা পশুখাদ্য অথবা শ্বেতসার রূপে ব্যবহারের জন্য বিক্রয় করা হইয়াছে। বিক্রয়ের পর ঐসব দ্রব্যই পুনরায় মানুষে ক্রয় করিয়া খাইতে বাধ্য হইয়াছে এরূপ অভিযোগও প্রকাশ্যে করা হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখিবার সুবন্দোবস্তের অভাবে সহস্র সহস্র মণ মূল্যবান খাদ্য নষ্ট হইয়াছে। যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়াও কোন ফল হয় নাই।

রেশনের দোকানের অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বিক্রয়ের প্রতিকার বাংলা গবন্মেণ্ট নিজে ত করেনই নাই, মিউনিসিপালিটিকেও করিতে দেন নাই। অথচ বোম্বাই এবং দিল্লীর রেশনিং কর্তৃপক্ষ রেশনের দোকান হইতে নমুনা সংগ্রহে মিউনিসিপালিটিকে বাধা দেন নাই। বাংলায় এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ এই যে, এখানে গবর্মেণ্ট জানেন তাঁহারা জঘন্য খাদ্য সরবরাহ করিয়াছেন, কাজেই নিজেদের বিরুদ্ধে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য-বিক্রয়-নিবারক আইনের প্রয়োগ বন্ধ রাখিবার জন্য তাঁহাদের এই প্রাণান্ত প্রয়াস।

বাংলায় ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া মহামারীতে বাঙালীর কি ভাবে দ্রুত স্বাস্থ্যহানি হইতেছে এবং সহস্র সহস্র লোক কি ভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহা দেখাইয়াছেন। শুধু বাংলার গ্রামে গ্রামে নয়, কলিকাতা শহরেরও কয়েকটি অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মড়করূপে দেখা দিয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে মেজর-জেনারেল ষ্টুয়ার্ট এই মহামারীর আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া বাংলা-সরকারকে সতর্ক করিয়াছিলেন, আরও বহু জনে বহুস তর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন কিন্তু বাংলা-সরকার নিশ্চল। জনমত অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিলে তাঁহারা ইস্তাহার জারী করিয়া কয়েক লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন বা তাহার অনুকল্প বড়ি বিতরণের হিসাব দিয়া কর্তব্য সমাপন করেন। প্রদত্ত ঔষধ প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু সে হিসাব কোন ইস্তাহারেই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয় না। পক্ষাধিক কাল পূর্ব্বে কলিকাতার বেলেঘাটা ও নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রবলভাবে দেখা দিলে কর্পোরেশন ও গবর্মেণ্ট উভয়কেই চিকিৎসকেরা সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে অতি সত্বর উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে মড়ক ক্রমেই বিস্তারলাভ করিবে। কোন কর্তৃপক্ষই রোগ প্রতিরোধের যথাযথ আয়োজন করেন নাই। আজ ঐ দুটির সঙ্গে ইটালী ও টেংরা পল্লীদ্বয়ও মড়কের কবলে পড়িয়াছে। আক্রান্ত স্থানগুলির অবস্থা সম্বন্ধে ডাঃ বিধান রায়ের অভিজ্ঞতা তাঁহারই কথায় এইরূপ :

"ওয়ার্ডগুলি হইতে যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, অধিবাসীদিগের শতকরা প্রায় ৬৫ জন এই রোগে আক্রান্ত হন এবং যে কয়দিন যাবৎ তথ্য সংগৃহীত হইতেছিল, সেই কয় দিনে রোগাক্রান্ত অধিবাসীদিগের শতকরা ৪০ জন শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ ৪টি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার এবং খুব অল্প করিয়া হিসাব করিলেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে। বেলিয়াঘাটা ও নারিকেলডাঙ্গায় কোন কোন বাটীতে পরিবারস্থ সকলেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া ছেন।

"দুর্গতদিগের মধ্যে সেবাকার্য্যের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যায়, বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশন ও বে-সরকারী ব্যক্তিদিগের দ্বারা সর্বসাকুল্যে ১৭টি চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। কর্পোরেশনকে কিয়ৎপরিমাণে ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বে-সরকারী চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলি কিছুই পান নাই। এই হেতু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ম্যালেরিয়ার ঔষধ ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রত্যেকটি কেন্দ্রে প্রত্যহ প্রায় একশত চল্লিশ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইতেছে; একটি কেন্দ্রে সমাগত রোগীর সংখ্যা ৩ শত পঞ্চাশ জন। সুতরাং যাহাদিগের চিকিৎসা হইতেছে না, তাহাদিগের সংখ্যা অত্যধিক। বস্তুতঃ যে হারে চিকিৎসা করা হইতেছে, তাহাতে আক্রান্তদিগের শতকরা ৩ জনের অধিক চিকিৎসিত হইতে পারেন না।

"সরকার এবং সেই সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনেরও অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ অজ্ঞ। কিন্তু যাহা কিছুই বলা হউক না কেন, সরকার এবং কর্পোরেশন এতদুভয়ই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ রোধ করার জন্য দায়ী।"

গবর্মেণ্ট সর্বত্র প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করিতে পারেন নাই ইহারও প্রমাণ ডাঃ রায়ের বিবৃতিতে আছে। ঔষধ সরবরাহের কার্পণ্য মফঃস্বল অপেক্ষা কলিকাতায় আরও বেশী। কলিকাতায় বে-সরকারী সাহায্যকেন্দ্রগুলিকে গবর্মেণ্ট কিছুতেই ঔষধ দিতে চাহেন না। কর্পোরেশন সম্প্রতি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বড়ি ম্যাপাক্রিন ক্রয়ের অনুমতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু উহা মাত্র হাজার দশেক রোগীর অর্থাৎ পীড়িত ব্যক্তিদের শতকরা দশ জনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা গিয়াছে এই রোগ একেবারে উচ্ছেদ করাও খুব কঠিন নয়। গত যুদ্ধের পর বল্কান হইতে ম্যালেরিয়া দূর হইয়াছে। আমাদের দেশে আসামের ও উত্তর বঙ্গের চা-বাগানগুলিও বহুলাংশে ম্যালেরিয়ামুক্ত হইয়াছে। এনোফিলিস মশার প্রজনন নিবারণের জন্য দুই-তিন রকম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহারই কোন একটি বা কয়েকটি ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ করিলে মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়, ম্যালেরিয়াও দূর হয়। রস ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ট্রপিকাল হাইজিনের ভারতীয় শাখার গত বৎসরের কার্য্যকলাপের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ভারতবর্ষের ম্যালেরিয়াকে "মানুষের সৃষ্টি" (Man-made) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বিশেষ ভাবে আসাম সম্বন্ধে তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া সামরিক প্রয়োজনের নামে যথেচ্ছভাবে খাল খুঁড়িয়া ম্যালেরিয়া বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে-সব স্থানে পূর্বে কিছু কিছু ম্যালেরিয়া ছিল, এখন সেগুলি যমপুরীতে পরিণত হইয়াছে। রস ইন্‌ষ্টিটিউট আশা করেন যুদ্ধশেষে সৈন্য সরাইয়া লইবার সময় এই সব খাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কলিকাতার স্লিট ট্রেঞ্চগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলি যে অবস্থায় আছে বিমান আক্রমণের সময় তাহা কাহারও কাজে লাগিবার কথা নয়, অথচ কর্পোরেশনের অনুরোধ সত্ত্বেও বাংলা-সরকার ঐগুলি বুজাইয়া ফেলিতে অনিচ্ছুক। মোটামুটিভাবে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে রস ইন্‌ষ্টিটিউট বলিয়াছেন: "ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া প্রধানতঃ মানুষের সৃষ্টি। বেপরোয়া জঙ্গল কাটা এবং কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের খালগুলি তো বিপজ্জনক বটেই, তাহা ছাড়া ম্যালেরিয়া বিস্তারের আরও কারণ আছে। তন্মধ্যে সেচ ও হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীমসমূহ, রেলওয়ে ও রাস্তার বাঁধ, খনির কতকগুলি স্থান প্রভৃতি প্রধান এবং কারখানা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য জল-সরবরাহের খাল, বাড়ীর ছাদের জলের ট্যাঙ্ক যথাযথভাবে বন্ধ না করা প্রভৃতিও অন্যতর।

"ভবিষ্যতে প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া নিবারণ ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্যেই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের আয়োজন করিতে হইবে। এই ধরণের শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ারদের নিযুক্ত করিলে সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগগুলির পক্ষে গ্রাম্য ম্যালেরিয়া দমন সহজ হইবে।" অর্থাৎ ম্যালেরিয়া এখন ডাক্তারের পরিবর্তে ইঞ্জিনীয়ারের কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলার মফঃস্বলে মর্মন্তুদ অবস্থা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু মফঃস্বলে লোকের স্বাস্থ্য ও সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন। দিনাজপুর জেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, সাধারণভাবে বাংলার অপর সমস্ত জেলার পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য। শ্রীযুক্ত কুণ্ডুর বিবৃতির মূল বিষয়গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"লোকের জীবনীশক্তি ক্ষয়ের ফলে ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে এখন তাহাদিগের অবস্থা এমন হইয়াছে, যাহাতে তাহারা সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং আক্রান্ত হইলেই সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রত্যেক স্থানেই কুইনাইনের অভাব। জেলা-কর্তৃপক্ষের নিকট যাহা কিছু কুইনাইন থাকে তাহাও প্রয়োজনের সময়ে উপযুক্তভাবে বিতরণ করা হয় না। গ্রামাঞ্চলের সকল স্থানে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান নাই। গ্রামাঞ্চলের ডাক্তাররা ও ঔষধালয়গুলি অনেক হয়রানির পর তবে কুইনাইন পায়। এজন্য তাহাদিগকে জেলার সদরে গিয়া ট্রেজারীতে টাকা জমা দিয়া জেলা হইতে কুইনাইন পাইতে হইলে তাহাদিগকে ৪৮ ঘণ্টা বা তাহার চেয়েও বেশী সময় সদরে অপেক্ষা করিতে হয়। ইন্‌জেকশন দিবার কুইনাইন ও মেপাক্রিন সব ডাক্তারকে দেওয়া হয় না।

"তাহার পর টাইফয়েড, রক্তামাশয়, নিউমোনিয়া প্রভৃতি যে-সকল রোগে লোকে আক্রান্ত হইতেছে, তাহার কোন চিকিৎসা আদৌ হইতেছে না বলিলেই ঠিক হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে মজুত ঔষধের পরিমাণ দেখিলে সেগুলিকে ঔষধালয় বলিয়াই মনে হয় না। রোগীদিগের জন্য ঔষধ ও পথ্য হয় একেবারেই পাওয়া যায় না, নয় ত নিয়ন্ত্রিত দরের অনেক বেশী দামে বিক্রয় হয়।

"ধান ও চাউল ছাড়া অন্যান্য প্রধান খাদ্যদ্রব্য দিনাজপুর জেলায় এত চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে যে, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা কেনা সম্ভব নয়। ঐ সকল জিনিষের পরিমাণও এত অল্প যে, যাহারা পয়সা দিতে পারে তাহারাও জিনিষ খুঁজিয়া পাইতেছে না। খাঁটি দুধ, ঘি, মাখন ও তেল প্রভৃতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। টিনে রক্ষিত দুগ্ধজাত রোগীর পথ্যাদি একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। শিশুরা দুধ পাইতেছে না। মাছ, মাংস, ডিম ও তরিতরকারী অসম্ভব চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। কোন কোন খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, কিন্তু লোকে নিয়ন্ত্রিত দর অপেক্ষা অনেক বেশী দাম দিয়া এই সকল জিনিষ কিনিতে বাধ্য হইতেছে। ধান, চাউল ও পাটের দাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত নামিয়া যাওয়ায় ঐ সকল ফসলের উৎপাদকদিগের দুরবস্থা বাড়িয়া গিয়াছে। উৎপাদনের ও জীবিকানির্বাহের ব্যয় বাড়িয়াছে অথচ উৎপাদিত ফসলের দাম কমিয়া গিয়াছে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চীফ এজেণ্টরা উৎপাদনকারীদিগকে ফসলের নির্দ্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য দিতেছে না।

"কয়লা ও কেরোসিনের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। যাহারা সরকারী চাকরী করে না, বহু দিন অন্তর তাহাদিগের এক এক পরিবার এক মণ করিয়া কয়লা পায়। কয়লার চালান আসিবার পর তাহা বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদিগকে আদেশ দিতে কর্তৃপক্ষ অসম্ভব দেরি করিয়া থাকেন। দিনাজপুর জেলার ১৯ লক্ষ লোকের জন্য কেরোসিন বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৪৮৬০ টিন। যাহাদিগের প্রয়োজন প্রথম মিটান দরকার বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহাদিগের জন্য ইহার মধ্য হইতে ১৪৮৬ টিন সরকার হইতে প্রথমে সরাইয়া রাখা হয়। কেরোসিনও দিনাজপুরে চোরাবাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। একটি ব্যাপারের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানীয় সিভিক গার্ড'রা কেরোসিনের একটি চোরাই কারবার ধরিয়া ফেলে ও ক্রেতাকে থানায় লইয়া যায়। কিন্তু পরে যখন জানা গেল যে, বিক্রেতা বালুরঘাট মহকুমা হাকিমের চাপরাসী তখন বিষয়টি সম্বন্ধে আর কিছুই করা হইল না। ব্যাপারটা স্বয়ং মহকুমা হাকিমের দৃষ্টিগোচর করা হইলেও বিক্রেতার বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। আর দুইটি ব্যাপারের কথা আমি উল্লেখ করিব। কালিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত ডালিম গাঁওয়ের একাবুদ্দীন সরকার ও শঙ্করপুরের কবির মহম্মদকে যথাক্রমে ১০ ও ২০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল; অথচ তাহাদিগকে বিক্রয়ের কার্য্য সমানে চালাইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

"বহু খাদ্যদ্রব্য গুদামে পচান হইয়াছে। দিনাজপুরের ময়দা ব্যবসায়ীরা বলিতেছে যে, তাহাদিগের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ ময়দা মজুত আছে; কিন্তু অসামরিক সরবরাহ কর্তৃপক্ষ তাহা বিক্রয়ের জন্য যথেষ্ট ছাড়পত্র দিতেছেন না। ফলে মজুত ময়দা অকারণে ঘরে পচিতেছে।"

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বাংলার জেলায় জেলায় এই ভয়াবহ অবস্থা চলিতেছে। প্রতিকার দূরে থাকুক, আন্তরিকতার সহিত তাহার কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত আজও হয় নাই।

ফসলবৃদ্ধি আন্দোলনের পরিণতি

ফসলবৃদ্ধি আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মন্তব্য করা হইলে তাহা খণ্ডনের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ জে ডি টাইসন কতকগুলি তথ্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে, যুদ্ধপূর্ববর্তী ৩ বৎসর ভারতবর্ষে মোটামুটি ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধান্য উৎপাদিত হইত। ফসলবৃদ্ধি আন্দোলনের ১ বৎসর পরে ঐ জমির পরিমাণ ৭ কোটি ৫০ লক্ষ হয় এবং গত বৎসরে ধান্যের জমি বস্তুতঃ ৮ কোটি একরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আপাততঃ এরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ জমির পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত না হইলেও ধান্যের জন্য ঐ পরিমাণ জমিকে কোনপ্রকারে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে দেওয়া হইবে না। যুদ্ধের পূর্বে সর্বপ্রকার ফসলের জন্য মোটামুটি ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমি ব্যবহৃত হইত; আন্দোলনের ১ বৎসর পরে ঐ জমির পরিণাম ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ একরে এবং গত বৎসরে ২০ কোটি ৬৩ লক্ষ একরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব ৩ বৎসরে মোটামুটি ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টন ধান্য উৎপন্ন হইত। আন্দোলনের ১ বৎসর পরে ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টন ধান্য উৎপন্ন হয়। গত বৎসরে ৩ কোটি ৬ লক্ষ টন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ, যুদ্ধপূর্ব সময় অপেক্ষা ৪০ লক্ষ টন অধিক ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্রহ্ম হইতে যে পরিমাণ আমদানী করা হইত, এই বাড়তি ধান্য তাহার দ্বিগুণ। সমস্ত প্রকারের শস্যের পরিমাণ যুদ্ধের পূর্বে যে ক্ষেত্রে মোটামুটি ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ছিল, সেক্ষেত্রে তাহা আন্দোলনের ১ বৎসর পরে ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। গত বৎসরে তাহা ৬ কোটি ১০ লক্ষ টনে উপনীত হয়।

মিঃ টাইসন বলেন যে, তিনি ইহাকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না, ইহা আরম্ভ মাত্র। তবে যাঁহারা বলেন যে, ফসলবৃদ্ধি আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, এই সংখ্যাগুলিতে তাঁহারা উত্তর পাইবেন।

ফসলবৃদ্ধি আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, টাইসন সাহেব-প্রদত্ত সংখ্যা বা তথ্য পাঠ করিয়া তাঁহাদের মত পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটে নাই। সারাভারতব্যাপী "আন্দোলনে"র ফলে ফসল মাত্র শতকরা দশভাগের মত বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধি সরকারী প্রচার-কার্য্যের দ্বারাই ঘটিয়াছে—ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ফসলের দাম যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে সরকারী প্রচার-কার্য্য একেবারে না হইলেও এইরূপ বৃদ্ধির স্বাভাবিক সম্ভাবনা ছিল। আরও একটি কথা টাইসন সাহেব বলেন নাই। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি এই আন্দোলনে কত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, বাড়তি ৪০ লক্ষ টন ধানে টন প্রতি কত টাকা করিয়া প্রচার-কার্য্যের ব্যয় পড়িয়াছে, অশিক্ষিত দেশের ইংরেজী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, ইংরেজী প্রাচীরপত্র এবং রংবেরঙের পুস্তিকা ছাপিয়া কত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার হিসাব প্রকাশিত হওয়া উচিত।

ফসলবৃদ্ধির ইচ্ছা থাকিলে অতি বড় বিপদের মধ্যেও তাহা করা সম্ভব টাইসন সাহেবের নিজের দেশ তাহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধ বাধিবার পূর্বেই ব্রিটেন খাদ্য বিভাগ গঠন করিয়া ফসলবৃদ্ধি আন্দোলনে মন দিয়াছিল। পূর্বে ব্রিটেনে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ যাহা ছিল বর্তমানে উহা

তাহার ঠিক দ্বিগুণ। অথচ এদেশে অপেক্ষাকৃত অনেক কম অসুবিধার মধ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াও শতকরা দশ ভাগের বেশী ফসল বাড়িল না।

মুন্সীগঞ্জ কমলাঘাটের অগ্নিকাণ্ড

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রামনগর গ্রামে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জন লইয়া একটি গোলযোগ ঘটিয়াছিল। হিন্দুরা যে পথে প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন সেই পথে একটি মসজিদ আছে বলিয়া মুসলমানদের পক্ষ হইতে আপত্তি উঠে। মহকুমা হাকিম মিঃ আমিনুল্লা হিন্দুদের উপর আদেশ জারী করেন যে, ঐ পথে তাঁহারা প্রতিমা লইয়া যাইতে পারিবেন না। হিন্দুরা ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মহকুমা হাকিমের আদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নোরানহা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া রায় দেন যে মহকুমা হাকিম মিঃ আমিনুল্লার আদেশ ভ্রমাত্মক। প্রতিমা বিসর্জ্জনের বিরুদ্ধে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা তিনি বাতিল করিয়া দেন কিন্তু শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া তিনি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে স্থানীয় মুসলমানদের উপর আদেশ দেন যে তাঁহারা ঐ পথে দুর্গাপ্রতিমা লইয়া যাইতে কোনরূপ বাধা দিতে পারিবেন না। ইহা লইয়া সাম্প্রদায়িক মন-কষাকষি চলিতে থাকে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া ঐ পথেই প্রতিমা বিসর্জ্জনের লাইসেন্স দেন এবং প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হয়।

ইতিমধ্যে রামনগর গ্রামের নিকটবর্ত্তী কমলাঘাট বন্দরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং উহাতে প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়। যে রাত্রিতে কমলাঘাট বন্দরে আগুন লাগে সেই রাত্রেই রামনগর গ্রামের যে বাড়ীর প্রতিমা লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল সেই বাড়ীতেও আগুন লাগে। স্থানীয় হিন্দুরা এই অগ্নিকাণ্ডটি কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানের কীর্ত্তি বলিয়া সন্দেহ করেন। স্থানীয় লোকেরা এবং কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্রও উপরোক্তরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তদন্তের দাবি করেন। মহকুমা হাকিম মিঃ আমিনুল্লার আচরণ এবং কমলাঘাট হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে তাঁহার অফিস অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অগ্নিকাণ্ডের ১৮ ঘণ্টার পর ঘটনাস্থলে তাঁহার উপস্থিতি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বলিয়া অভিযোগ করা হয়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে যে-সব গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে অবিলম্বে তাহার তদন্ত হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলা-সরকার অগ্নিকাণ্ডের ১৯ দিন পরেও (২৮শে কার্তিক পর্য্যন্ত) তদন্তের ব্যবস্থা করেন নাই। এক সরকারী ইস্তাহারে জানানো হইয়াছে যে "এই ঘটনা যে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিণতি তাহার কোন প্রমাণ নাই।" বিনা তদন্তে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বী মন্ত্রীদের এরূপ মন্তব্যে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে না ইহা বলাই বাহুল্য। সরকারের এই মন্তব্যের পর বাংলার হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী সমস্ত ঘটনার এক আনুপূর্বিক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং রামনগর ও কমলাঘাটে গিয়া যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার বিবৃতি উহারই ভিত্তিতে রচিত। তদন্ত সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিতেছেন :—"এই সাঙ্ঘাতিক অপরাধ সম্পর্কে তদন্তের তেমন কোন চেষ্টা আমি দেখিতে পাইলাম না। আমি অনেক লোককে যাহা বলিতে শুনিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ যদি সাক্ষীদিগের ধনপ্রাণ সম্বন্ধে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন এবং প্রকাশ্যে একটি তদন্ত হয়, তবে এই অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ সহজেই বাহির করা যাইবে। ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-সচিব সর নাজিমুদ্দীন মুন্সীগঞ্জ হইয়া ঢাকা যান এবং মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম মিঃ আমিনুল্লার সঙ্গে কমলাঘাটের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনাও করেন, কিন্তু কমলাঘাটে একবার তিনি যাওয়া দরকার বোধ করিলেন না। মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম মিঃ আমিনুল্লাকে ঢাকা জেলা হইতে না সরাইলে কোন তদন্তই সফল হইতে পারে না।"

ব্যাপারটির মূলে সাম্প্রদায়িক মনকষাকষি থাকুক বা না থাকুক, ইহার তদন্ত একান্ত আবশ্যক এইজন্য যে ইচ্ছাপূর্বক অগ্নি সংযোগের দ্বারা এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকিলে দুর্বৃত্তগণকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা আবশ্যক। সমাজদ্রোহী এই সব দুর্বৃত্তকে সাম্প্রদায়িকতার নামে অব্যাহতি লাভের সুযোগ দিলে তাহারা যে সম্প্রদায়ের লোক সেই সম্প্রদায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। দুর্বৃত্ত দুর্বৃত্তই, তাহার কোন জাতি নাই, ধর্ম নাই—সে সমাজদ্রোহী, সমাজের ক্ষতি করিবার অপরাধে সে কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য। এই অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের এক ইউনিয়ন মুসলিম লীগের সেক্রেটরীর নিম্নোক্ত বিবৃতি আজাদে প্রকাশিত হইয়াছে :—"বিশ্বস্তসূত্রে শুনা গিয়াছে যে, মুছলমানদের ঘাড়ে দোষারোপ করিবার জন্যই রামনগরের সুরেন্দ্র পালের বাড়ীতে কে বা কাহারা আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। সুরেন্দ্র পালের বাড়ী চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। নবমী পূজার পর হইতে প্রত্যহই তাহাদের বাড়ীতে অনেক লোক জমায়েত থাকে এবং রাত্রে রীতিমত পাহারার ব্যবস্থা আছে। এরূপ অবস্থায় বাহিরের কোনও লোকের পক্ষে তাহাদের বাড়ীতে ঢুকিয়া আগুন লাগাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।"

দুর্বৃত্তদের দ্বারা অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকিলে অবিলম্বে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা গবর্মেণ্টের কর্তব্য। হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কোন দুর্বৃত্ত দয়া বা দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা করিতে পারে না। তদন্ত আরম্ভের বিলম্ব নিন্দনীয়, কারণ ইহাতে প্রমাণ লোপের সম্ভাবনা, সাম্প্রদায়িক উগ্রতার প্রশ্রয়দাতা বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল তদন্তে বিলম্ব করিলে লোকের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হইবে দেশের বা গবর্মেণ্টের পক্ষে তাহা কল্যাণকর নহে।

মিঃ জিন্না সম্বন্ধে প্রগতিকামী ইংরেজের ধারণা

বিলাতের প্রগতিশীল প্রধান পত্রিকাগুলির মধ্যে 'নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন' অন্যতম। সম্প্রতি এই পত্রিকা মিঃ জিন্না সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, "গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আশু মীমাংসার আশা চূর্ণ হইয়াছে।" পত্রে আরও বলা হয়—মিঃ জিন্না স্বয়ং পাকিস্থান চাহেন কিনা, বা পাকিস্থান সম্ভব বলিয়া মনে করেন কিনা সে সম্বন্ধে আমরা এই প্রথম বার সন্দেহ করিতেছি না।

সম্প্রতি কয়েক বৎসরে তিনি কেবলমাত্র মুসলমান ও হিন্দুদিগের মধ্যে বিভেদ বাড়াইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ইহা অপেক্ষা অধিক গঠনমূলক উদ্দেশ্য আছে, এরূপ প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

পাকিস্থান সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার নিজেরই কোন স্পষ্ট ধারণা আছে কিনা অথবা ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃত মঙ্গল সত্য-সত্যই তিনি চাহেন কিনা এ সম্বন্ধে এ দেশে এবং বিদেশেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। নিউ ষ্টেটসম্যানের মন্তব্য উহারই অভিব্যক্তি। বৎসরাধিক কাল পূর্বে মিঃ জিন্না মুসলমানদের উন্নতির জন্য মুসলিম লীগ মারফৎ পাঁচ কোটি টাকার একটি ফণ্ড খুলিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ ফণ্ডে কত টাকা উঠিয়াছে এবং উঠিয়া থাকিলে মুসলমানদের উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ কাজে তাহা ব্যয় হইতেছে আমরা জানি না। কয়েক দিন পূর্বে মিঃ জিন্না মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি বাঞ্ছনীয় এরূপ একটা কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কি ভাবে তাহা সংঘটিত হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি নীরব। দরিদ্র মুসলমান সাধারণের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণের জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনা মুসলিম লীগ আজও করিতে পারে নাই।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুর জন্মতিথি-উৎসব

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুর পঞ্চপঞ্চাশত্তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া ভারতবর্ষে ও বিদেশে সম্প্রতি সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পণ্ডিত জবাহরলাল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি আজ কারাগারে বন্দী। কারাগারের অন্তরালে থাকিয়াও তিনি স্বাধীনচিত্ততা ও মনসশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা জবাহরলালের দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিয়োজিত তাঁহার কর্মশক্তি সম্পূর্ণ অটুট থাকিবে আমরা এরূপ বিশ্বাস করি। তাঁহার সম্বন্ধে বিদেশীরাও কিরূপ উচ্চ মত পোষণ করেন, মিঃ ফেনার ব্রক্ওয়ের নিম্নের উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে :

"আমি এই অভিমত পোষণ করি যে ব্যক্তিবিশেষের নেতৃত্বের দ্বারা নহে, কিন্তু গভীরতর সামাজিক শক্তির প্রভাবেই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনসমূহ সাধিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও নেতৃত্বের গুরুত্ব আছে এবং সময় সময় তাহা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদের মধ্যে আজ দুই জনকে নেতৃরূপে পাওয়া ভারতবর্ষের সৌভাগ্য, আমি অবশ্য মিঃ গান্ধী এবং নেহ্রুর কথাই বলিতেছি। নেহ্রুর পঞ্চপঞ্চাশত্তম জন্মদিনে বাণী প্রেরণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। আজও যে তিনি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ইহা চরম কলঙ্ক। এই অন্যায় আরও অসহনীয় এই জন্য যে যে-সকল ক্ষুদ্র রাজনীতিক তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের পরিমাপে পণ্ডিতজী তাঁহাদের তুলনায় বিরাট ও মহান্। তাঁহার সহিত তুলনায় মিঃ আমেরি শুধু দেহের দিক দিয়া নয়, মানসিক এবং আত্মিক শক্তির দিক দিয়াও অকিঞ্চিৎকর। ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলীতে এমন এক জনও নাই যুগযুগান্তের মানবজাতির ইতিহাসের জ্ঞানের গভীরতার দিক দিয়া যিনি জবাহরলালের সমকক্ষ। খুব কম লোকই তাঁহার মত গভীরভাবে ব্রিটেন, আমেরিকা এবং জার্মানীর সমাজনীতি এবং রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়াছেন। গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বিরল। চরিত্র এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। জবাহরলালকে লইয়া ভারতবর্ষ বাস্তবিকই গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। যে-সমস্ত রাজনীতিক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের লজ্জিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। হয়ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইহাই চরম কথা যে, ইহা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে মহৎকে কারারুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে।"

কবিরাজ গণনাথ সেন

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও স্বদেশের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আমৃত্যু এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন। কবিরাজ হিসাবে গণনাথ সেনের খ্যাতি ভারতব্যাপী ছিল। তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং বিশ্বনাথ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষরূপে তাঁহার কার্য্য বিশেষ স্মরণীয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। শুধু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক হিসাবে নয়, সংস্কৃতবিদ্‌রূপেও ভারতের সর্ব্বত্র বিদগ্ধ সমাজে গণনাথের খ্যাতি ছিল। তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের বিশেষ ক্ষতি হইল।

গ্রাহকদের প্রতি

প্রতি মাসে যাঁহারা বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রবাসী না পাইবেন তাঁহারা যেন তাঁহাদের স্থানীয় ডাকঘরে লিখিতভাবে অভিযোগ করেন কেন উহা তাঁহারা পাইলেন না। অভিযোগের উত্তর আমাদিগকে তাঁহাদের স্বস্ব গ্রাহক নম্বরসহ পত্রের দ্বারা জানাইবেন। ডাকঘরের উত্তর সহ জানাইলে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিব।

গবর্মেণ্টের নির্দেশে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠাসংখ্যা অত্যধিক হ্রাস করিতে বাধ্য হওয়ায় বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম খণ্ডের সূচী কার্ত্তিক সংখ্যায় সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয় নাই। বর্ষশেষে আমরা উভয়খণ্ডেরই সূচী স্বতন্ত্রভাবে গ্রাহকবর্গের নিকট পাঠাইতে ইচ্ছা করি।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাযুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা অতিশয় জটিল। ইউরোপের রণভূমিগুলিতে এখন জার্ম্মানী প্রায় একক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সঙ্গে কয়েক ডিভিজন হাঙ্গেরীয় সৈন্য, কিছু শ্লোভাকীয় এবং ক্রোয়াটীয় অস্থায়ী সহায়ক সেনা ভিন্ন আর অন্য কোনও সহযোগী নাই। কোনও সৈন্যদল একবার আতঙ্কগ্রস্ত বা হতভোম হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে পুনরায় তাহাদের যুদ্ধ শক্তি গঠন করা অতি কঠিন ব্যাপার এবং ইটালীতে ও রুমানিয়াতে তাহা হইয়াছে, হাঙ্গেরীতেও তাহা ঘটা কিছু অসম্ভব নহে। যদি হাঙ্গেরীতে তাহা ঘটে তবে জার্ম্মানী সম্পূর্ণ সহায়হীন অবস্থায় লড়িতে বাধ্য হইবে। যুদ্ধসম্ভারের ব্যাপারেও জার্ম্মানীর অবস্থা ক্রমে বিগত যুদ্ধের অবরুদ্ধ ভাবের ন্যায় হইয়া আসিতেছে। রুমানিয়া ও পোলণ্ডের খনিজ তৈলের আকরগুলি এখন রুশ সেনার হস্তগত, কেবলমাত্র আলবানিয়ার সামান্য কয়েকটি খনি এখনও জার্ম্মানীর হাতে, এবং তাহাও এখন যায় যায় অবস্থায়।



চেকোশ্লোভাক সীমান্তে সোভিয়েট গোলন্দাজ-বাহিনী

এলুমিনিয়মের খনিগুলির মধ্যে ফ্রান্সের উৎকৃষ্ট খনিগুলি এবং দক্ষিণ রুশের বিরাট্ খনিগুলি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, ফিনল্যাণ্ডের বিশাল নিকেল খনি ও বলকান অঞ্চলের তাম্র খনিও যায় যায়। তুর্কি তাম্র এবং ক্রোম ও রুশ দেশজাত মাঙ্গানীজ আর আয়ত্তের মধ্যে নাই। খাদ্যের দিক দিয়া এখন কেবলমাত্র স্কাণ্ডিনেভিয়া কিছু দিতে পারে, অন্য সকল খাদ্যভাণ্ডারের পথ এখন অবরুদ্ধ। মোটের উপর জার্ম্মানীর অবরোধ ক্রমেই দৃঢ়তর হইয়া চলিতেছে।

অন্য দিকে এশিয়ায় জাপানের কাঁচামালের পথ এখনও খোলা তবে তাহার মাল সরবরাহের বিষম প্রতিবন্ধক জাহাজের কম্‌তি এবং এ বিষয়ে কোনও প্রতিকারের পথ জাপান করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। সম্প্রতি চীনদেশের উত্তর-দক্ষিণের প্রধান রেলপথগুলি জাপানের হস্তগত হইয়াছে বটে, এবং সেটি ঠিকমত সচল হইলে জাপানের এই সমস্যা পূরণ কতকটা হইতে পারে, কিন্তু সেই পথ মেরামত করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া তোলা এক বিষম ব্যাপার, তাহা এই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে অল্প সময়ের ভিতর করা অসম্ভব। তবে জাপানের উদ্যোগের বা লোকবলের অভাব নাই সুতরাং চেষ্টার ক্রটি হইবে না নিশ্চয়। বোধ হয় এই কারণেই চীনে জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ যুদ্ধপরিষদ আরও বিস্তৃত ভাবে আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বস্তুত এখন পূর্ব্ব এশিয়ায় দুই পক্ষের মধ্যে দৌড়ের পাল্লা চলিতেছে, জাপান তাহার মাল ও সৈন্য সরবরাহের পথ সোজা করার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে এবং মার্কিন তাহার পূর্ব্বেই জাপানের সৈন্যশক্তিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। জাপানের লোকবলের কোনই অভাব নাই, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা হইলে জাপান তাহার স্থল ও আকাশ সেনা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ অনায়াসেই করিতে পারে। তাহার অভাব ছিল অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা-কারিগরের এবং কাঁচামালের—তাহার মধ্যে কারখানা ও কারিগরের ব্যবস্থা এতদিনে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে হয়ত, কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যাপারে এখনও অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে। সেইগুলি শোধ্‌রাইবার পূর্ব্বে জাপানের যুদ্ধশক্তিতে আঘাত দিতে পারিলে ভাল, নহিলে এশিয়ার যুদ্ধ ইউরোপের মতই প্রচণ্ড এবং ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

জার্ম্মানীর লোকবল এখন ক্ষয়ের পথে। যুদ্ধশিক্ষার পর প্রতি বৎসর যে পরিমাণ নূতন সৈন্য ভর্ত্তি হয় তাহাদের দ্বারা যুদ্ধে হতাহত সৈন্যের স্থান পূরণ হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ। সৈন্যের অভাব নূতন অস্ত্রের দ্বারা পূরণ করিবার চেষ্টা জার্ম্মানীতে খুবই চলিতেছে এবং সম্প্রতি তাহার পূর্ব্ব লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ায় মিত্রপক্ষের সমর-পরিষদ অবহিত হইয়াছে। সুতরাং এখানেও জার্মানী লোকবলের সমস্যা পূরণ করার পূর্ব্বেই তাহার রক্ষণশক্তি ভাঙিয়া জার্ম্মানীর ভিতরে মিত্রপক্ষের শক্তির প্রবেশ করা প্রয়োজন। বেশী দেরি হইলে জার্ম্মানীর যুদ্ধশক্তির পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে, যাহার ফলে জার্ম্মানীর পরাজয়ের দিন পিছাইয়া যাইতে পারে। এবং সেদিন যতই পিছাইবে জাপানের পক্ষে ততই ভাল, কেননা এখনও সম্মিলিত জাতির সমর-পরিষদে চার্চ্চিলের "এশিয়া অপেক্ষা করুক" এই উক্তিই প্রবল আছে।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমানে সম্মিলিত জাতীয় দলের অবস্থা সকল দিকেই অতিশয় উন্নত। বিপক্ষদলের মধ্যে

কেবলমাত্র দুইটি শক্তি এখন লড়িতেছে, অন্যগুলি পরাজিত বা প্রায় হতোদ্যম। কিন্তু সময় মিত্রশক্তির সপক্ষে আর বেশী দিন থাকিবে না তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়াছে। মিত্রপক্ষ যদি বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুযোগ সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তবেই যুদ্ধ আগামী বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে মিত্রপক্ষের আয়ত্তে আসিতে পারে, নহিলে যুদ্ধ-বিরতি এখন সুদূরপরাহত। ইউরোপে শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে। মিত্রপক্ষে চার্চিল প্রমুখাৎ উচ্চ অধিকারীবর্গের "এই গ্রীষ্মে—পরে শরৎকালে—ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবে" ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইয়া গেল। চার্চিল তো এখন আর বলিতেই চাহেন না যে ইউরোপের যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, অন্যেরাও এখন নানা প্রকার কথা বলিতেছেন। বিগত এক মাসের যুদ্ধের ফলাফল দৃষ্টে একথা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-পরিষদ পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে রণ চালনার যে পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহার কিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ জার্মান সেনা তাহাদের দেশ রক্ষার জন্য যে এরূপভাবে লড়িবে ইহা প্যারিস-দখলের অব্যবহিত পরে কেহ ভাবিতে পারে নাই। তখন সকলেরই ধারণা হইয়াছিল যে পলায়মান জার্মান সেনা জার্মানীর সীমান্তে দাঁড়াইতে পারিবে না এবং সেই ধারণা প্রথমে বেলজিয়ম, হলাণ্ড এবং জার্মানীর উত্তর-পশ্চিম কোণে আখেন অঞ্চলের যুদ্ধে আরও সমর্থিত হইয়াছিল। তাহার পর জার্মানী তাহার দেশরক্ষার জন্য নূতন তেজীয়ান সেনাদল ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় এবং পশ্চাদপদ সেনাদলগুলির বিশেষ অংশকে জিগ্‌-ফ্রিড দুর্গমালার পিছনে লইয়া আসিতে সমর্থ হয়। সেই সময় হইতে পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ এক নূতন রূপ ধারণ করে। এই যুদ্ধে জার্মান রণনায়কগণের চেষ্টা চলিতেছে যুদ্ধের তরল ও সচল গতিকে রোধ করিয়া তাহাতে স্থাণুভাব আনিবার জন্য। ঐরূপ যুদ্ধে উভয় পক্ষই ক্রমে স্থিতিশীল হইয়া পড়ে এবং সীমাবদ্ধ প্রান্তের উপর ঘাত-প্রতিঘাত চলে।

এখন পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধরেখার উত্তর সীমায় আণ্টওয়ার্প বন্দরের সমুদ্রমুখ শত্রুশূন্য করিয়া তাহা ব্যবহারে আনিবার চেষ্টায় ব্রিটিশ ও কানাডীয় সেনার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত রহিয়াছে। এই চেষ্টা অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু প্রতি পদে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। হলাণ্ডের উপকূল অঞ্চলে জার্মান সেনা প্রতি ভূমিখণ্ডের জন্য লড়িতেছে এবং তাহার উদ্যমে কোনও ভাটা পড়ার লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। আরও নীচে আখেন অঞ্চলে মার্কিন সেনা দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া নগর দখল করিয়াছে। নগরের পার্শ্বেই জিগফ্রিড দুর্গ-মালার আরম্ভ এবং এখন তাহা ভেদ করার ব্যবস্থা চলিতেছে। আরও দক্ষিণে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল প্যাটনের যুদ্ধশকট-বাহিনী মেৎস দুর্গ ঘিরিয়া লইবার চেষ্টায় প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিতেছে এবং এখন একমাত্র এখানেই ব্যাপকভাবে যুদ্ধশকটের ব্যবহারে যুদ্ধের গতি সচল রহিয়াছে। তবে এখান হইতে ম্যাজিনো দুর্গমালা অল্পই দূর এবং তাহার পর জিগফ্রিড দুর্গমালা রহিয়াছে, সুতরাং জেনারেল প্যাটনের বর্ম্মশকটবাহিনী কত দিন এইরূপে সচল থাকিবে বলা যায় না। ওদিকে শীতের তুহিন-তুষার পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আকাশপথও মেঘ-কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, যাহার ফলে স্থলে ও আকাশে যুদ্ধের গতি ক্রমেই মন্দীভূত হওয়া সম্ভব। শীঘ্রই যদি নূতন যুদ্ধ-কৌশল বা অপরিসীম শক্তি প্রয়োগের ফলে জার্মানীর এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা বিকল না হয় তবে অন্ততঃপক্ষে কিছুকালের জন্য পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ স্থাণু হইয়া পড়িতে পারে।

ইউরোপের পূর্ব্ব প্রান্তের দিগন্তবিস্তৃত যুদ্ধরেখার অধিকাংশ অংশে এক প্রকার যুদ্ধবিরতিই ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধ অল্পবিস্তর তেজের সহিত চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার অধি-কাংশই সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে এবং তাহার বিস্তৃতিও সর্ব্ব-প্রকারেই অল্প। কেবলমাত্র হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেস্তের জন্য এখন প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে কিন্তু তাহাও বিগত গ্রীষ্মের অভিযান-গুলির মত বিশাল ও প্রচণ্ড নহে। পূর্ব্ব ইউরোপের যুদ্ধরেখা এখন অনেক স্থলেই সুদৃঢ় দুর্গমালার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, রুশদেশের শীতও ক্রমে ভীষণ হইয়া উঠিবে এবং সোভিয়েট সেনা এখন তাহার বিশ্রাম ও সরবরাহ কেন্দ্র হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

চীনদেশে "এশিয়া অপেক্ষা করুক" এই নীতির ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ এবং প্রায় চার বৎসর ব্যাপী সম্পূর্ণ অবরোধের ফলে চীন-সেনার যুদ্ধশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। অন্য দিকে জাপান নূতন অস্ত্র ও তেজীয়ান সৈন্যের ব্যবহার করায় স্বাধীন চীনের সুদীর্ঘ রক্ষাব্যূহের প্রধান দুর্গগুলি একে একে শত্রু-অধিকৃত হইতে চলিয়াছে। অবশ্য স্বাধীন চীনের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকেন্দ্র এখনও শত্রুর আক্রমণের পাল্লার বহু দূরে রহিয়াছে, কিন্তু কেলিন ও তাহার অনতিদূরের বিরাট্‌ মার্কিন বিমান পোতাশ্রয় যদি জাপানের করায়ত্ত হয় তবে চীনদেশে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান গঠনে বিষম বাধা পড়িবে। ফুচাও বন্দর এবং ক্যাণ্টন-হাঙ্কাও রেলপথ জাপানী-দিগের হস্তগত হওয়ায় শুধু যে স্বাধীন চীন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাই নহে, উপরন্তু জাপানের স্থলপথে শ্যাম, ব্রহ্ম ও মালয় দেশের সহিত যোগসূত্র রচনার সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য এই স্থলপথে যোগের ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ, কিন্তু সময় কাহারও অধীন নহে, সুতরাং এক জনের দেরিতে অন্যের সুযোগ-সুবিধা বাড়িতে পারে। মার্কিন যুদ্ধ-পরিষদ এ বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠি-য়াছে এবং মার্কিন দেশে এই সম্পর্কে অনেক কথাই উঠিয়াছে, যাহার মধ্যে অনেক কিছুই, যাহা ভিত্তিহীন বা অবান্তর, আমা-দের দেশে অন্য সংবাদের সহিত তারযোগে প্রেরিত হইয়াছে।

যাহা হউক, সম্প্রতি ফিলিপাইন দ্বীপমালার লেইটে দ্বীপে মার্কিন সেনার আক্রমণের সঙ্গে পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধের এক নূতন পর্য্যায়ের আরম্ভ হইল। আক্রমণের পূর্ব্বে এবং পরের নৌযুদ্ধ-গুলিতে জাপানের নৌবল বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। ফিলিপাইনের যুদ্ধের প্রগতি হইতেই সেই ক্ষতি কতটা সাংঘাতিক হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এতদিন প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দ্বীপের উপর আক্রমণ চলিতেছিল। এইবার প্রকৃতপক্ষে জাপানের ভিতরের দুর্গমালার প্রথম সারির উপর আঘাত পড়িল। এই আক্রমণের ফলাফলের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিবে এবং সেইজন্যই এখানে জাপান প্রবল বাধা দিবে। লেইটে দ্বীপের যুদ্ধ এখন প্রায় পঁচিশ দিন চলিয়াছে এবং যুদ্ধ ঘোর হইতে ঘোরতর আকৃতি ধারণ করিতেছে। প্রকৃত নিষ্পত্তি এখনও অনেক দূরে, সুতরাং সে বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করা বৃথা।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে ছাত্রসমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

নেপালচন্দ্র রায়

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমি তখন সাত-আট বৎসরের বালক। বাংলা দেশে সে এক গৌরবের যুগ। তখন কলিকাতায় যাঁহারা পড়িতে আসিতেন তাঁহারা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার শিষ্যবর্গের সংস্পর্শে কি এক নূতন প্রাণ ও উৎসাহ লইয়া গ্রামে ফিরিতেন তাহা ভাবিলে আমি এখন বিস্মিত হই। বালিকা বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা, অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টায় এই যুবকগণ তাঁহাদের সমস্ত অবকাশ অকাতরে ব্যয় করিতেন। এইরূপ একদল যুবকের উৎসাহ ও চেষ্টায় আমাদের পল্লীগ্রামে একটি সাধারণ পুস্তকালয়* স্থাপিত হয়। 'সোমপ্রকাশ', 'নব-বিভাকর', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্র, 'আর্য্যদর্শন' ও 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক পত্র এই পুস্তকালয়ে নিয়মিত গ্রহণ করা হইত। বালক হইলেও এই সকল সংবাদপত্র অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতাম। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধের বিবরণ সংবাদপত্রগুলিকে আমাদের নিকট বিশেষ আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভারতীর স্তম্ভে বাল্য-কালেই রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত আমার পরিচয় ঘটে। সৌভাগ্যবশতঃ ঠাকুরবাবুদের এস্টেটে আমার এক নিকট আত্মীয়ের কর্ম্মোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাঁহার মুখে ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রদের অসাধারণত্বের অনেক গল্প শুনিতাম। প্রায় উপন্যাসের মতই সমুদয় গল্প আমাকে আকৃষ্ট করিত।

সমস্ত বুঝিতে না পারিলেও আমাদের পক্ষে 'ভারতী'র একটু স্বতন্ত্র আকর্ষণ ছিল। এইজন্যই বোধ হয় 'ভারতী'র পৃষ্ঠে স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের বাক্-যুদ্ধ মহা আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পড়িয়া যাইতাম, এই তর্কবিতর্ক কতটা বুঝিতে পারিতাম জানি না, কিন্তু এই লেখার মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে খোঁচা থাকিত তাহাই আমাকে বিশেষ আমোদ দিত। বাল্যের এই স্মৃতি আমার প্রাণে এতই গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল যে অতি অল্পদিন পূর্ব্বে পুরাতন 'ভারতী' খুঁজিয়া এই বাদানুবাদ পড়িবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। 'ভারতী'র স্তম্ভে রবীন্দ্রনাথের বিলাতের পত্রগুলি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমার মনে হয় বিলাতের এমন সরল ও সুন্দর বর্ণনা আর কোথাও পড়ি নাই। এই পত্রগুলি আমাকে এমনিই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, শিশুদের জন্য রচিত একখানি ভূগোলে ইহার কোন কোন অংশ গুরুদেবের অনুমতিক্রমে কোথাও কিছু স্বীকার না করিয়া আমার রচিত অংশের সহিত জুড়িয়া দিয়াছি। যত দূর মনে পড়ে প্রায় এই সময়েই 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় বৌঠাকুরাণীর হাট পাঠ করি। আমাদের দেশ, প্রতাপাদিত্যের দেশ; রামমোহন মালো, রমাই ভাঁড় ও বৌঠাকুরাণীর হাটের গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। বইখানি আমাদের এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে তাহাকে নাটক করিয়া আমাদের গ্রামে অভিনয় করি। সেও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পরে আশ্রমে আসিয়া দেখি বৌঠাকুরাণীর হাটের মূল গল্প লইয়া প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচিত হইয়াছে এবং এই আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের সহিত এই নাটক অভিনয়ে সামান্য অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তখন এই বাল্যস্মৃতি আমার নিকট যে কত মধুর লাগিয়াছিল তাহা আর কি বলিব। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে আমি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া খুলনায় পড়িতে আসিলাম। খুলনা তখনও জেলা হয় নাই। যশোহরের একটি সাবডিভিশনের হেড-কোয়ার্টার মাত্র। অতি ছোট শহর, পল্লীগ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় আমরা যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' নামক গীতিনাট্যখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। বড় কবি বলিয়া ছাত্রমহলে রবীন্দ্রনাথের আসন তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার লেখার সহিত পরিচয় তখন ছাত্রদিগের অহঙ্কারের বিষয় হইয়াছিল। কাজেই 'ভগ্নহৃদয়' পাঠ করা একটা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। অতিকষ্টে বইখানি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। বলা বাহুল্য, বহু স্থানই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কাজেই বিশেষ রসও পাই নাই। শেষ পর্য্যন্ত পড়ার ধৈর্য্য রক্ষা করা বিশেষ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত পড়াও হয় নাই, তবু কোন্ আকর্ষণে জানি না বইখানির দু'একটি অংশ প্রায় মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

খুলনা শহরটি ক্ষুদ্র হইলেও ছাত্রজীবনে আমাদের উত্তেজনার অভাব ছিল না। দেশব্যাপী দুইটি তুমুল আন্দোলনের ঢেউ ছাত্রদিগকে বিচলিত করিয়াছিল। প্রথম, ইলবার্ট বিলের তুমুল আন্দোলন ও গবর্ণমেণ্টের ছাত্রদমন নীতি,—দ্বিতীয়, দেশ-ব্যাপী হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন, ইহার কথা পরে বলিব। যাহা হউক, এই দুই আন্দোলনের মাতামাতিতে স্কুলের নিয়মিত পড়ার সহিত সম্পর্ক এক প্রকার ঘুচিয়া গেল। সভা সমিতি করিতেই প্রায় সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত। ইহার উপর আমাদের তৃতীয় আর একটি কাজ জুটিয়া গেল। এই সময়ে খুলনায় প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। তখন খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একটি ইংরেজ কোম্পানী ষ্টীমার লাইন খুলিলেন। ইলবার্ট আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী হাওয়াও একটু একটু বহিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকখানি ষ্টীমার লইয়া এই সাহেব কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলেন। রেলওয়ে কোম্পানী ফ্লোটিলা কোম্পানীদের বিধিমত সাহায্য করিতে লাগিল। ঠাকুরবাবুর ষ্টীমারে যাত্রীদের অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন আমরা দল বাঁধিয়া যাত্রীদের ভজাইতে সুরু করিলাম। এই উপলক্ষ্যে রেল কোম্পানীর সহিত ছোটখাট একটি বিবাদ ঘটিয়া গেলে পুলিস খোঁজ করিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা ধরা পড়িলাম না। এই সময়ে এক দিনকার ঘটনা মনে পড়িতেছে। জ্যোতি-রিন্দ্র বাবু "সরোজিনী" জাহাজে খুলনায় আসিয়াছিলেন। আমাদের কয়েকটি বন্ধুর খেয়াল চাপিল জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে দেখিতে হইবে। রাত তখন প্রায় আটটা। "সরোজিনী"

* অধুনা বীণাপাণি গ্রন্থাগার। মূলঘর।

জাহাজ মাঝ নদীতে নোঙ্গর ফেলিয়াছে, জ্যোৎস্না রাত্রি, আমরা তীরে দাঁড়াইয়া সরোজিনী ষ্টীমারখানি দেখিতেছিলাম। অনেক সঙ্কোচ ও বাধা এড়াইয়া কোনমতে জাহাজে খবর পাঠাইলাম। শেষে এক জালি বোট আসিয়া আমাদের লইয়া গেল। জ্যোতিবাবু ষ্টীমারের ডেকে দাঁড়াইয়া আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। এমন সুপুরুষ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, পরেও দেখিয়াছি এমন মনে হয় না। রং যেন দুধে-আলতায় মেশান, উজ্জ্বল বিস্তৃত চোখ, কি প্রশান্ত স্নিগ্ধ চাহনি। জ্যোতিবাবু বোধ হয় অল্পভাষী ছিলেন, দুই-এক কথায় আমাদের বিদায় করিয়া দিলেন। কি কথাবার্তা হইয়াছিল মনে নাই। এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'পুরুবিক্রম' প্রভৃতি নাটক সাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খুলনায় সরোজিনী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বোধ হয় আমরা যখন এনট্রান্স পড়ি তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বাংলা দেশে নানা দিক দিয়া এক প্রবল আন্দোলনের ঢেউ চলিতে থাকে। ইলবার্ট বিলের আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস, ন্যাশনাল ফণ্ড স্থাপন প্রভৃতি নানা কারণে বাংলা দেশে এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে দেশমধ্যে দেশাত্মবোধ নূতন ভাবে জাগ্রত হয়। তখন ইংরেজীতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'দি বেঙ্গলী' ও 'দি অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রচলিত ছিল। ইহা ভিন্ন 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামে একটি দৈনিক পত্র প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক। আমরা ছাত্রগণ মিলিয়া বেঙ্গলী পত্রিকা গ্রহণ করিলাম। বেঙ্গলীরই তখন সমধিক প্রচলন ছিল। জাতীয় জাগরণের ফলে আর দুইটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র জন্মগ্রহণ করে। ইণ্ডিয়ান একো (Indian Echo) ও ইণ্ডিয়ান নেশ্যন (Indian Nation)। এই দুইটি পত্রিকা অপেক্ষাকৃত সুলভ ছিল। আমি নিজে ইণ্ডিয়ান একো পত্রিকাটি গ্রহণ করিতাম। 'একো' পত্রিকাটি শীঘ্রই উঠিয়া যায়। নেশ্যন-এর সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় এন্ এন ঘোষ। তাঁহার সম্পাদকতায় কাগজটী অনেক দিন টিকিয়াছিল। বাংলাতেও এই নবজাগরণের ফলে সুলভ সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'সুলভ সমাচার' ইহার বহু পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছিল। 'বঙ্গবাসী' সুলভ সমাচারের পরে প্রথম সুলভ সংবাদপত্র। তখন ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা। কি আনন্দ ও আগ্রহের সহিত আমরা এই 'বঙ্গবাসী' পাঠ করিতাম। বাংলার প্রায় সমুদয় বিখ্যাত লেখক তখনকার সে 'বঙ্গবাসী'তে লিখিতেন। কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই বঙ্গবাসীর সুর অনেকটা নামিয়া যায়। তখন উন্নতিশীল ও উদারনৈতিক দলের মুখপত্র 'সঞ্জীবনী' প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বালকদিগের প্রথম মাসিক পত্র 'সখা' স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। ছাত্রমহলে সখার তখন বিলক্ষণ আদর ছিল। গম্ভীর মাসিক পত্রের মধ্যে ভারতী তখন পূর্ব্বের মত চলিতেছিল।

এই সময় আর দুটি মাসিক পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করে। এই নূতন জাগরণের আদর্শ লইয়া সাধারণীর সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবন' প্রকাশ আরম্ভ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বেই তখনকার বাংলার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কলুটোলায় বাস আরম্ভ করেন। বঙ্গদর্শনের শেষকালের খ্যাতনামা লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের চারিদিকে আসিয়া জুটিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা বোধ হয় নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ বঙ্কিমের লেখা লইয়াই 'প্রচার' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। উভয় পত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণচরিত্র নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে বলিয়া রাখি—অল্পদিনের মধ্যেই অস্তগমনোন্মুখ প্রবীণ সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত উদীয়মান নবীন সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমাদের উৎসাহের নূতন খোরাক জুটিল। কিন্তু হায় এই বিবাদ অল্পেই থামিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একবার আক্রমণ করিয়া নিরস্ত হইলেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তরে আর প্রত্যুত্তর দিলেন না।

১৮৮৩ কি ১৮৮৪ সালেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের নূতন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। টিকির মধ্যে ইলেক্‌ট্রিসিটি আছে অতএব টিকি ধারণ অবশ্যকর্ত্তব্য ইত্যাদি যুক্তি বর্ত্তমানে হাস্যোদ্দীপক হইলেও সে সময়ে শুধু ছাত্রগণ নহে অনেক পলিতকেশ প্রবীণ বৃদ্ধও সাদরে ও পরম উৎসাহে এই সকল যুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরীগণ জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, অবরোধ-প্রথা ও বাল্য-বিবাহের প্রতিবাদ করিতে গিয়া হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মকে তীব্র আক্রমণ করিতেন। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রই অবজ্ঞার সহিত নিন্দিত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইলবার্ট বিল উপলক্ষে দেশাত্মবোধের সহিত আত্মসম্মান বোধ অতিমাত্রায় জাগ্রত হইয়াছিল ; সুতরাং তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, সমস্ত হিন্দুসমাজ যেন ফিরিয়া দাঁড়াইল। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহের পক্ষে, স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কত নূতন নূতন যুক্তি দেখা দিল, তর্কচূড়ামণির ন্যায় অনেক সুবক্তা হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকের আবির্ভাব হইল। তাঁহাদের মধ্যে পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুক্তির সারবত্তা বা শৃঙ্খলা না থাকিলেও তাঁহার ভাষা বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী হইত। যাহা হউক, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হিন্দুসভা, হরিসভা, সুনীতি সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল ও অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিক টিকি রাখিয়া, ফোঁটা কাটিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক ঘটা করিয়া আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণের ত কথাই নাই, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল ; মেসে মেসে প্রথমে তর্কযুদ্ধ, শেষে হাতাহাতি। অনেক মেস ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা নির্ব্বিচারে সকল যুক্তি মানিয়া লইতে আরম্ভ করিল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—একজন হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন—"খৃষ্টানদের ভাষায় ভগবানের নাম God তাহা উল্টাইলে হয় Dog যাহার অর্থ কুকুর। কি বিসদৃশ পরিণতি। পক্ষান্তরে হিন্দু দেবতার নাম যেদিক দিয়াই পড়না কেন—নন্দনন্দন—নন্দনন্দন"। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও

দুঃখের বিষয় ছিল, আর্য্যামিগ্রস্ত ইতর প্রকৃতির ছাত্রগণের অভদ্র ব্যবহার—যাহারা অভদ্র ভাষায় অন্য ধর্ম্মের লোকদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের লোকদের কুৎসিত নিন্দা প্রচার করিত। একদল যুবক একজন স্যালভেশন আর্ম্মির মাথা কাটাইয়া দিয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে গুরুদেবের ধর্ম্মপ্রচার লিখিত হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসি। তখন ছাত্রসমাজ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই দলে বিভক্ত ছিল। এক দল রবীন্দ্রনাথের একান্ত ভক্ত, এমন কি বেশবিন্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরায় সর্ব্ববিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত। অন্য দল ছিল তাহার দুরন্ত বিরোধী। রবীন্দ্রভক্তদিগকে "রাবীন্দ্রিক" প্রভৃতি উপাধি দিয়া তাহাদের নানাবিধ ভাবে উপহাস করিত। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কেশ দীর্ঘ ও কুঞ্চিত ছিল, দাড়ি গোঁফ সুন্দর ভাবে ছাঁটা থাকিত। তাঁহার সুদীর্ঘ সুন্দর আকৃতি পরিচ্ছদের পারিপাট্যে আরও মনোহর হইত। দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যাইত। তাহার উপর তাঁহার সুন্দর সুমিষ্ট স্বর; তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার বক্তৃতা বা গান শুনিবার জন্য ভক্ত বা অভক্ত—দুই দলের আগ্রহের তারতম্য ছিল না। সেখানে সমান প্রতিযোগিতা সমান ঠেলাঠেলি। তাঁহার গানের সর্ব্বত্রই সমান আদর।

কলিকাতায় আসিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার একান্ত আগ্রহ ছিল। কিন্তু তাঁহার ধন ও আভিজাত্যের গণ্ডী আমাদের পক্ষে দুর্লঙ্ঘনীয় ছিল। তাঁহার দর্শন বা সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন জোড়াসাঁকোর একখানা কার্ড সংগ্রহ করিয়া উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ—চারি ভাইকে একত্রে সন্দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানো সংযোগে রবীন্দ্রনাথের গান শুনি। সে দৃশ্যের স্মৃতি কখনও হৃদয় হইতে মুছিবে না। যাহা হউক, অন্য এক দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের কথা বলিয়াছি। তখন ব্রাহ্ম না হইলেও আমি উন্নতিশীল দলভুক্ত ছিলাম। কাজেই আর্য্যামির আতিশয্য আমার নিকট একান্ত অসহনীয় ছিল। যে-সকল শক্তিশালী মহাপুরুষ এই স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ঐ স্রোতের গতি ফিরাইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সব্যসাচীর ন্যায় তিনি গদ্যে, পদ্যে, নাট্যে ও ব্যঙ্গ-কবিতায় পুনরুত্থানকারীদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতেছিলেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতেই যুক্তিতর্ক, মালমশলা সংগ্রহ করিতাম। তাঁহার এই সময়ের লেখা বঙ্গবীর, দেশের উন্নতি, নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ, হিংটিং ছট আজিও প্রচলিত। অনেকে সে সমস্ত পাঠে প্রচুর আনন্দ লাভ করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা সম্যক্ ও সমগ্র ইতিহাস না জানায় এই সমস্ত কবিতার রসগ্রহণে বহুল পরিমাণে অসমর্থ হন। প্রচলিত কবিতাগুলি অনেকেই পড়িয়াছেন বিশ্বাস করি। একটি অপ্রচলিত কবিতার দুই-একটি লাইন যাহা মনে আসিতেছে দিয়ে দিতেছি:

কলিকালে প্রজাপতি তুলিলেন একটি হাই
গুড়গুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন হিন্দু দুটি ভাই।
আমার দামু—আমার চামু
অতি হিন্দু দামু ঘোষ আরও হিন্দু চামু

* * *

আমার দামু আমার চামু
নাইক বটে ব্যাস বশিষ্ঠ—যে যার গেছে সরে
হিন্দু দামু চামু এলেন কলম হাতে করে।

শেষ দুটি লাইন এইরূপ—

দন্ত দিয়ে খুঁড়িতেছি হিন্দু শাস্ত্রের মূল
বাজারে লেগে গেল কচুর হুলুস্থুল।
আমার দামু আমার চামু···

দামু চামু ও চিন্তামণি কুণ্ডহেঁয়ালী নাট্যটি প্রচলিত আছে কি-না জানি না।

এইরূপ তীব্র কশাঘাত সত্ত্বেও মোটামুটি সমগ্র ছাত্রসমাজের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অসাধারণ। অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ হয়। কিন্তু স্থান ও সময়ের ভদ্রসীমা বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—রুক্মাবাঈ নামে একটি মহারাষ্ট্র বালিকার বাল্য বয়সে একটি অতি অশিক্ষিত যুবকের সহিত বিবাহ হয়। জাতিতে বোধ হয় উভয়েই ব্রাহ্মণ। রুক্মার বাল্যবয়সে তাহার স্বামী কোন খোঁজ নেন নাই। মিশনরী স্কুলে রুক্মা সুশিক্ষিত হইয়া উঠেন। রুক্মার বয়স যখন ১৯ কি ২০ তখন তাহার স্বামী আসিয়া স্বামিত্বের দাবী উপস্থিত করিলেন। রুক্মা এই অপরিচিত অশিক্ষিত বর্ব্বরের গৃহে যাইতে অস্বীকৃত হইলে তাহার স্বামী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিচারে রুক্মাবাঈয়ের পরাজয় ঘটে, তাহার প্রতি স্বামী-গৃহে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় তাহার দু-বৎসরের কারাদণ্ড হয়। অগত্যা রুক্মাকে কারাবাসেই যাইতে হয়। এই ঘটনা লইয়া খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম ও অন্যান্য প্রগতিশীল হিন্দুদিগের মধ্যে অত্যন্ত উদ্বেগের সঞ্চার হয়। এই সময়ে খ্রীষ্টানগণের একটি কনফারেন্স হয়। বাবু জয়গোবিন্দ সোম নামে শ্রীহট্টের এক জন খ্রীষ্টান উকিল ছিলেন। জয়গোবিন্দ খ্রীষ্টান ছিলেন কিন্তু দুরন্ত ন্যাশানালিষ্ট ছিলেন। তিনি কনফারেন্সে খ্রীষ্টান মিশনরীদের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন, এবং বাহিরে আসিয়া বাল্য-বিবাহ দিবার সপক্ষে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হিন্দুসমাজে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বক্তৃতার ধুম দেখে কে?

এই সময়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বহুবাজার সায়ান্স এসোসিয়েশন গৃহে এই সভার অধিবেশন হয়, সভাগৃহে লোক আর ধরে না, সমগ্র ছাত্রদল গৃহ অধিকার করিয়া লইল। সভা গৃহে জাষ্টিস্ সর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি কলিকাতার গণ্যমান্য নেতাগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। Audience সম্পূর্ণ Hostile, তাহারা গোল করিতেই গিয়াছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

বক্তৃতা পাঠ আরম্ভ করিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্রোতৃমণ্ডলী যেন কোন যাদুকরের মন্ত্রবলে মুগ্ধের মত হইয়া রহিল। সভা এমন নিস্তব্ধ যে ছুঁচটি পড়িলে তাহার পতনশব্দ শুনা যায়। যেমনি যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলা—ভাষার লালিত্য, তেমনি পঠনের ভঙ্গী, সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিল। সভার শেষে হিন্দু নেতাগণ বক্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

তাহার মধ্যে চন্দ্রনাথ বাবু ও গুরুদাস বাবুই প্রধান, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মজা করিলেন ন্যায়রত্ন মহাশয়। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেন—গুরুদাসবাবু দু-হাতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আমি মহেশ চারি হাতে বক্তাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। সর্ব্বশেষে বক্তৃতা করিতে উঠিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রে তাঁহার সমকক্ষ শ্রদ্ধেয় হিন্দুসমাজে অধিক ছিল না, কিন্তু হইলে কি হয় শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ের অসন্তোষের অগ্নি যাহা কবি মন্ত্রবলে নির্ব্বাপিত রাখিয়াছিলেন, সভাপতি প্রতিবাদের দুই-এক কথা বলিতে না বলিতেই তাহা দ্বিগুণ রোষে জ্বলিয়া উঠিল। তখন কে কাহাকে থামায়, প্রায় মারামারি ব্যাপার। যখন এই উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত যুবকমণ্ডলীকে আর শান্ত করা যায় না তখন সকলের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গান ধরিলেন—

—আমায় বোলোনা গাহিতে বোলো না
একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা।
*　　*　　*
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজ নিয়ে যাবনা।
ইত্যাদি।

তখন ক্রোধের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।*

* রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নেপালচন্দ্র রায়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "কবি সম্বন্ধে আপনি কিছু লিখিতেছেন না কেন? আমার মনে হয় কবি সম্বন্ধে আপনার কোন লেখা না বাহির হইলে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জানিবার বিষয় পৃথিবীর কাছে অজানা থাকিয়া যাইবে।" তারপরেই এই প্রবন্ধটি লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই।—প্র. স.

বিস্মরণী

শ্রীকরুণাময় বসু

এখনো রয়েছে চাঁদ, অরণ্যের উত্তাল সমীর,
লাল নীল পরীদের লঘু পায়ে যাওয়া আর আসা;
জোনাকি-পাখায়-আনা মুক্তাময় সমুদ্রের তীর,
অস্ফুট মর্ম্মর শব্দ; এখানে রাখিনু ভালোবাসা।

মনে মনে ভাবিতেছি আধখোলা বাতায়ন-পথে
একটি স্বর্গের মেয়ে যদি নামে শিথিল চরণে,
আমারে কহিবে হেসে এস যাই স্বপ্নের জগতে,
জীবনের প্রান্তখানি বেঁধে দিব মধুর মরণে।

দু'খানি করুণ আঁখি সমুদ্রের অতল হৃদয়,
হৃদয়ের কত কথা চিরকাল রহস্যেতে ঢাকা;
এতটুকু ঢেউ ওঠে, কত লজ্জা, কত যেন ভয়,
এত কাছে তবু দূরে, চিত্রার্পিত রহিল সে আঁকা।

রজনীর চাঁদখানি চলিয়াছে মেঘের ছায়ায়,
এখনি মিলায়ে যাবে পূর্ব্বাচলে পাণ্ডুর গগনে;
ভোরের শীতল বায়ু কেঁপে ওঠে অরণ্যশাখায়,
বলিবার কথা ছিল এই দণ্ডে অপূর্ব লগনে।

মুগ্ধচিত্তে জাগে মোর স্নেহসিক্ত সকরুণ মায়া,
সহসা দুয়ারপ্রান্তে দেখিলাম নিশান্তের ছায়া।

অস্তরাগ

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী ও শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা

নারিকেল-বনে সন্ধ্যা ঘনালো, যত যত দূর চাই
দিবস-রবির শেষ আভাটুকু করিতেছে যাই যাই!
সর্পিল পথ স্বপ্নিল দিন, উন্মনা মনে যাযাবর বীণ্,
দূর থেকে দূরে মন চলে যায় ঠিকানা খুঁজে না পাই!

কোন দিগন্তে কার চাহনিতে ছন্দ দিয়েছে ধরা,
যুগ যুগ হতে নিত্য-নূতন কাব্য চলেছে গড়া।
পলাশে পলাশে আজো রঙ্ মাখা, সুনীল সায়রে নীল আঙ্ রাখা,
মিছে পুরাতন, মিছে সে নূতন, মিছে যৌবন-জরা।

কাব্যের মাঝে পুরাতন কথা ছন্দ-বাণীতে জাগে,
চক্ষে বুলায়ে নতুন স্বপন মন ভরে অনুরাগে।
গোধূলি বেলায় তাই বুঝি আজ, নয়ন ভুলালো মধুর এ সাঁজ,
পৃথিবীর আলো, পৃথিবীর হাওয়া সব কিছু ভাল লাগে!

ভালো লাগে এই শ্যামলা ধরণী, ফুলে ফুলে তার হাসি,
উদাস বুকেতে সুরের কাঁপন, 'ভালোবাসি', 'ভালোবাসি'।
স্নিগ্ধ-সজল এলোমেলো বায়ু, কিসের নেশায় চঞ্চল স্নায়ু,
কার আগমন-আশায় এ মন উঠিল গো উচ্ছ্বাসি?

কার বাঁশরীর সকরুণ সুর প্রাণে দিয়ে যায় দোলা,
একেলা নীরবে পরাণ আমার হয়েছে আপনা-ভোলা।
মেঠো গ্রামপথে ঘনালো গোধূলি, উদাস সুরেতে বুক ওঠে দুলি,—
"বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।"



চুংকিং-এ যাইবার পথে জেনারেল ষ্টিলওয়েলের সহিত আলাপ-আলোচনায় রত ইউ-এস ওয়ার প্রোডাকশন বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ডোনাল্ড এম্ নেলসন এবং মেজর জেনারেল হার্লি। ইঁহারা উভয়েই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি



চুংকিং-এ চিয়াং কাই-শেকের সহিত করমর্দ্দনরত মিঃ ডোনাল্ড নেলসন



চীনা এবং মার্কিন-বাহিনী কর্ত্তৃক মিট্‌কিনা অধিকার। পশ্চাতে ইরাবতী নদীর তীরে একটি ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা দেখা যাইতেছে



ফ্রান্সের সার্ত্রেতে মার্কিন সৈন্য-বাহিনী। পশ্চাতে সু-উচ্চ গুম্বজদ্বয়বিশিষ্ট দ্বাদশ শতাব্দীর রমণীয় গির্জ্জা

যবনিকা

শ্রীআর্যকুমার সেন

আশ্চর্য! যাহাদের উভয়কে একত্র দেখিলে একচক্ষু শিশু পর্যন্ত ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে কুমারসেনের এতখানি সময় লাগিল? এ শুধু অন্ধ ঈর্ষার ফল। কিন্তু কেন ঈর্ষা? দুইটি অলোকসামান্যরূপ ভ্রাতাভগিনী সুখে একত্র রহিয়াছে, তাহাতে কুমারসেনের কি আসিয়া যায়? উভয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া তাহার বক্ষের উপর হইতে যেন একটি ভার নামিয়া গেল, তাহার কারণ কি? আর গত কয়েক দিন যাবৎ জাগ্রৎকল্পনায় এবং স্বপ্নে এক কুৎসিতদর্শন কাল্পনিক ইন্দ্রগুপ্তের মস্তক রক্তাক্ত করিতেছিল, তাহাই বা কেন?

বৌদ্ধধর্মের যতটুকু সে জানে তাহাতে সে বুঝিয়াছে যে সদ্ধর্মের প্রথম সোপান জীবহিংসাত্যাগ নহে, কাঞ্চনবিরাগও নহে, কামিনীত্যাগ। নারী নরকের দ্বার, তুমি গৃহী সংসারী হইয়া সৎপথে থাকিবার চেষ্টা করিলেও মারমিত্রা রমণী তোমাকে কুটিল পথ দিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে বহু দূরে, অন্ধকার, পূতিগন্ধময় প্রেতসঙ্কুল নরকে লইয়া যাইবে। সে নিজের জীবনে এ তথ্যের আংশিক সত্যতা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। না হইলে কোথায় ক্ষুদ্রপরিসর নিবিড় শান্তিময়ী ছায়াশীতলা মালিনী, কোথায় তাহার কর্মস্থল লোককোলাহলপূর্ণ অশ্বরথগজাদির শব্দমুখর নগরশ্রেষ্ঠ পাটলিপুত্র, আর কোথায় সহস্র ক্রোশ দূরে, আর্যাবর্তের অপর প্রান্তে সিন্ধুনদসন্নিকটা শতদ্রুপারবর্তিনী তক্ষশিলা। সে ত মগধে বেশ ছিল কি প্রয়োজন ছিল তাহার এত দূরে আগমন করিবার? কে তাহার নির্বাসনের জন্য দায়ী? সে ত শুধু এক অনুপমা, অনবদ্যরূপা রমণী, যে রূপ অমৃতভ্রমে পান করিতে গিয়া সে আকণ্ঠ হলাহলে নিমজ্জিত হইয়াছিল!

এই দুই বৎসর যেন চরম দুঃস্বপ্নে কাটিয়া গিয়াছে। সে চাহিয়াছিল মগধ হইতে দূরে, বহু দূরে পলায়ন করিতে, যেখানে ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক কুমারসেনের নামও কেহ শুনে নাই। সে চাহিয়াছিল শান্তি, আর্যাবর্তের নানা স্থানে, বহু বৌদ্ধসঙ্ঘের দ্বারে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে, কোথাও পায় নাই। সে চাহিয়াছিল অতল বিস্মৃতি, যাহা তাহার অতীত জীবনের কয়েকটি বৎসর গাঢ় অন্ধকারে চিরকালের মত নিমজ্জিত করিয়া দিবে।

সহসা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কুমারসেন কহিল, "বন্ধু ইন্দ্রগুপ্ত, আমি প্রতিসন্ধ্যায় তোমার গৃহে আসিব মূর্তি নির্মাণ-কৌশল শিখিতে।"

ইন্দ্রগুপ্ত সানন্দে সম্মতি দিল, প্রিয়দর্শিকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

প্রত্যাবর্তনকালে সমস্ত পথ যেন কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব মাদকতায় কুমারসেনের মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। বর্ষাকাল শেষ হইয়া শরৎ আসিয়াছে, আকাশে চন্দ্রকলা। সমস্ত প্রকৃতি যেন একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার নেশা ধরাইয়া দিতেছে, কে যেন কর্ণের পার্শ্বে ওষ্ঠাধর আনিয়া বলিতেছে, "কি হইবে মুক্তি দিয়া, বন্ধনই ভাল।"

শান্ত নিস্তব্ধ সঙ্ঘ, কিন্তু কুমারসেন বিনিদ্ররজনী যাপন করিল।

পরদিবস হইতে কুমারসেনের শিল্পশিক্ষা আরম্ভ হইল। যাহা শিখিল তাহা ভারতীয় শিল্প নহে, নির্জলা হেলেনীয় ভাস্কর্য। দেবতার নাম করিয়া যে মূর্তি গঠন করিল তাহা দেবতা হইল না, হইল মানুষ। বজ্রহস্ত শতক্রতু জিউসের রূপ ধারণ করিলেন। শতদলবাসিনী বাণী দেবী বীণাহস্তা হইয়াও আথেনিই রহিয়া গেলেন, যাবতীয়া স্বর্গবাসিনী অপ্সরা আফ্রোদিতির বিভিন্ন সবসন ও বিবসন রূপ ধারণ করিল।

সেদিন গভীর রজনীতে মহাস্থবিরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সূপকার অতিরিক্ত মশলা সহযোগে যে-সকল ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা অতীব রসনাতৃপ্তিকর হইলেও সুপাচ্য নহে। মহাস্থবির মুখবিকৃত করিয়া বারকয়েক উদ্গার তুলিলেন, পরে মুক্ত বায়ুতে উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য বাহিরে আসিলেন।

সহসা অলিন্দে আলোকবর্তিকা দেখিয়া মহাস্থবির থামিয়া গেলেন। প্রেতযোনির ভয় তাঁহার বিশেষ ছিল না, কিন্তু সঙ্ঘে স্বর্ণরত্নাদির অভাব নাই, চোর নহে ত? মহাস্থবির একটি বৃহদাকার লগুড় হস্তে লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আলোকবর্তিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। কাছে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভয় দূর হইয়া তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "কুমারসেন এসব কি হইতেছে?"

এতরাত্রে কাহারও আগমনসম্ভাবনার কথা কুমারসেন ভাবিয়া দেখে নাই। অপ্রতিভ কণ্ঠে কি যেন বলিতে গিয়া চুপ করিল। মহাস্থবির পুনরপি পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "সঙ্ঘে নারীমূর্তি গঠন করিতেছ, লজ্জা হইতেছে না?"

বুদ্ধিবৃত্তির প্রাবল্য কুমারসেনের কোনওদিনই বিশেষ ছিল না। কিন্তু আজ বিপদে পড়িয়া তাহার উপস্থিতবুদ্ধির উদয় হইল। কহিল, "ভদন্ত, সিদ্ধার্থজননী মায়ার মূর্তি গড়িতেছি।"

মহাস্থবির ক্ষণকাল নির্বাক রহিলেন। বুদ্ধপত্নী যশোধারাকে সঙ্ঘ হইতে নির্বাসিত করা চলে, অপরাপর রমণীর ত কথাই নাই। কিন্তু বুদ্ধজননী মায়ার সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া একটু ব্যতিক্রম করিতে হয়।

আমতা আমতা করিয়া মহাস্থবির কহিলেন, "তা মন্দ কি! উত্তম, তুমি মূর্তি গঠন কর। কিন্তু রাত্রিকালে কেন? সারাদিন কি দোষ করিল?"

হাস্য গোপন করিয়া কুমারসেন কহিল, "দিবসে বারিবহন করিয়া সময় থাকে না।"

মহাস্থবির চিন্তা করিতে লাগিলেন সঙ্ঘে বুদ্ধমূর্তির অভাব নাই, কিন্তু সে-সকল মূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, কুমারসেনের সহিত তুলনায় তাহারা শিশু। ইহাকে দিয়া গোটাকয়েক মূর্তি যদি গড়িয়া লওয়া যায় ত মন্দ কি? প্রকাশ্যে কহিলেন,

"উত্তম, কল্য হইতে তোমায় জল বহন করিতে হইবে না। শঙ্কু জল বহন করিবে, তুমি মূর্তি নির্মাণ করিতে থাক।"

তাহাই স্থির হইল। বারিবাহক কুমারসেন ভাস্করের কার্য আরম্ভ করিল, এবং শঙ্কু পুনর্মূষিক হইল।

সাধারণত যাহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, দুই-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত তাহারা যথার্থই সংসারবিরাগী ও ধর্মোন্মাদ। শঙ্কু সেই ব্যতিক্রমের মধ্যে একটি। তাহার যথার্থ আশ্রম সঙ্ঘ নহে, রাজকারাগার। যথার্থ মুক্তি নির্বাণমুক্তি নহে, শ্মশানে তীক্ষ্ণ শূলশলাকা। কিন্তু শঙ্কু কাশীরাজের রোষ হইতে পলাতক, তক্ষশিলায় তাহার পূর্বাপরাধের সংবাদ কেহই রাখে না, মহাস্থবির বন্ধুগুপ্ত ত নয়ই।

শঙ্কুর সহিত জীবজগতের অনেক প্রাণীরই সাদৃশ্য ছিল। মানবজাতির সহিত তাহার আকার-সাদৃশ্য সম্ভবত নিতান্তই ঘটনাচক্রের ফল। খর্বকায় একচক্ষু শঙ্কুর মুখমণ্ডলের সহিত বানরের সাদৃশ্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাহার চক্ষে শৃগালের ধূর্ত দৃষ্টি, নাসিকায় শকুনির লোভী ছিদ্রান্বেষী দীর্ঘতা, অন্তরে শশকের ভীরুতা এবং ব্যাঘ্রের হিংস্রতা। যোগাযোগ অসাধারণ, কাজেই শঙ্কু লোকটিও অসাধারণ।

কুমারসেনের আগমনের পূর্বে শঙ্কুই ছিল সঙ্ঘের বারিবাহক। কিছুকালের জন্য সে কঠিন শ্রম হইতে মুক্তি পাইয়াছিল, কিন্তু সেজন্য কুমারসেনের নিকট লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা অনুভব করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। আকৃতি ও প্রকৃতিতে দুইটি মানুষের মধ্যে এতখানি প্রভেদ সংসারে বিরল। শঙ্কু কুমারসেনকে যে শুধু ঈর্ষা করিত তাহা নহে, মনে-প্রাণে ঘৃণা করিত।

যখন পরদিবস হইতে বারিবাহকের কার্যে পুনর্নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ পাইল, তখন ক্রোধে কিছুক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। দৃঢ়চরিত্র মহাস্থবিরের আদেশ লঙ্ঘন করার সাহস তাহার ছিল না, কিন্তু সে কুমারসেনের উপর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া রহিল, এবং প্রাণপণে ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল।

বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্তি শেষ হইয়াছিল। মহাস্থবির মূর্তি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, কারণ তিনি জানিতেও পারিলেন না, এ আর কেহ নহে, যবনী তরুণী ক্রেসিস্। কুমারসেনের প্রতি অনাদরের দৃষ্টি ইতিমধ্যে তাঁহার অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল। তাহার উপর মহাস্থবিরের স্নেহভাবের যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই শঙ্কুর হৃদয়ে ঈর্ষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া চলিল।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কুমারসেন এখন অনেকটা স্বাধীন। সে উপসম্পদা গ্রহণ করে নাই, কাজেই মঠের বিধিনিষেধ তাহার উপরে চলিত না। সেজন্য কারণে অকারণে নগরপ্রান্তে ক্রেসিসের সহিত খানিকটা বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ পাইত। ইন্দ্রগুপ্ত দেখিত, এবং মনে মনে হাসিত।

এই বিদেশী যুবক এবং ইন্দ্রগুপ্তের মধ্যে বিলক্ষণ প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে এই সখ্য যে গাঢ়তর আত্মীয়তারূপে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে ইন্দ্রগুপ্তের সন্দেহ ছিল না। কুমারসেনের বংশ-পরিচয় সে জানিত না, কিন্তু সে যে ক্ষত্রিয় সন্তান, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাহা ছাড়া সে নিজে যবনবংশোদ্ভূত, বংশপরিচয়ের জন্য ঔৎসুক্য তাহার একেবারেই ছিল না।

ইতিমধ্যে কুমারসেন মূর্তি গড়িয়া চলিল। সঙ্ঘের যে কয়টি কন্দর খালি ছিল, সব বুদ্ধমূর্তিতে ভরিয়া গেল। গতানুগতিক মূর্তি নহে, যেন স্বয়ং তথাগতের জীবন্ময়ী মূর্তি। মহাস্থবির একদা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মূর্তি পরিদর্শন করিতেছিলেন। আশ্চর্য এই যুবকের দক্ষতা! বুদ্ধের মহাপুরুষ-লক্ষণ সব কয়টি বর্তমান রহিয়াছে, কোথাও এতটুকু খুঁত নাই। মূর্তি মানুষের, দেহগঠন সম্পূর্ণ মানুষের, কিন্তু কোথায় যেন প্রভেদ যাহার ফলে নরদেহী বুদ্ধমূর্তিও অতিমানুষে পরিণত হইয়াছে। মহাস্থবির মুগ্ধ হইলেন।

কাশকুসুম হিমাগমে ধূসর হইয়া ঝরিয়া গেল, হেমন্ত বিদায় লইল শিশির ঋতুর আগমনে। স্খলিতপত্র বৃক্ষরাজি, সমস্ত প্রকৃতিতে নিরানন্দ রিক্ততা। কিন্তু কুমারসেনের মনে সে রিক্ততার আভাষ মাত্র লাগিল না। নির্বাণ-মুক্তির আশা সে অনেক দিন আগেই বিসর্জন দিয়াছিল।

শীতের শেষে একদিন মহাস্থবির কহিলেন, "বৎস, ভগবান তথাগতের বহু মূর্তি গঠন করিয়াছ, এখন শুধু একটি কাজ বাকী। শ্রেষ্ঠী বিষ্ণুদত্ত সঙ্ঘের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তুমি তাঁহার কল্যাণার্থে তথাগতের এমন একটি মূর্তি গঠন কর, যাহার তুলনা সমস্ত আর্যাবর্তে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

কুমারসেন মূর্তিগঠন আরম্ভ করিল। পরিত্রাতা তথাগতের ধ্যানমগ্নরূপ কল্পনা করিয়া মৃত্তিকার সাহায্যে সেই রূপ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। সফলতা একদিনে আসিল না, কত ব্যর্থতা, কত আশাভঙ্গ, কত পূর্ণগঠিত মূর্তির ধূলিপরিণতির পর অবশেষে একদিন তাহার কল্পনা বিগ্রহে মূর্ত হইল।

অপূর্ব সুন্দর সে মূর্তি। প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় করযুগল অংসদেশে ন্যস্ত, চক্ষু অর্ধনিমীলিত। সমস্ত মুখে বিশ্বের তাপ-কোলাহল, দুঃখদৈন্য, জরামৃত্যু সকলের অতীত অখণ্ড শান্তি। উত্তরীয়াবৃত বক্ষ ও স্কন্ধদেশ। পশ্চাতে ব্যজনকারী ও বজ্রপাণি। উভয়পার্শ্বে আরও দুইটি দণ্ডায়মান ক্ষুদ্রকায় বুদ্ধমূর্তি।

দীর্ঘ পঞ্চদশ দিবস কুমারসেন অবিরাম কাজ করিয়া চলিল। সহসা তাহার মনে হইল সে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে, যে আনন্দ এই তাপদগ্ধ মৃত্যুসঙ্কুল পৃথিবীর কোন কন্দরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে আনন্দের বিরতি নাই, পরিবর্তন নাই, মৃত্যু নাই। হয়ত এই আনন্দই বৃহত্তর আনন্দ নির্বাণমুক্তির এক কণা!

শত শত সঙ্ঘ এত দিন যাহা করিতে পারে নাই, নবগঠিত বুদ্ধমূর্তি কুমারসেনের মনে সেই পরিবর্তন আনয়ন করিল। কুমারসেন বুঝিতে পারিল না, কি সে ইন্দ্রজাল, যাহা তাহার দ্বিধাবিভক্ত মনকে সরল পথে টানিয়া আনিল। সে ত নিজেই এই মূর্তি গড়িয়াছে! কিন্তু এ কি বিপুল আকর্ষণ! এ কি অজ্ঞাতপূর্ব তরঙ্গ!

যে তরঙ্গ আসিল তাহাতে এক ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র যবনী তরুণী ক্রেসিস্-স্রোতের মুখে মৃত তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া গেল। যেখানে ভগবান তথাগতের বৃহত্তর আহ্বান, সেখানে পৃথিবীর ধূলিনির্মিত ক্ষুদ্রা রমণীর স্থান কোথায়!

কি অসীম প্রশান্তি মূর্তির সমস্ত আননে, কি অপূর্ব আশ্বাস, বদ্ধ ওষ্ঠাধরে কি অপরূপ মুক্তির অশ্রুত বাণী! কুমারসেনের কর্ণে সে বাণীর আকুল আহ্বান আসিল, অস্ফুটস্বরে সে কহিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

কুমারসেন স্থির করিল, মহাস্থবিরের অনুমতি পাইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।

ইহার পূর্বে কুমারসেন বহু চেষ্টা করিয়াও সঙ্ঘের প্রতি কোনও আকর্ষণ অনুভব করে নাই। আজ মনে হইল, দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ পরে তাহার জীবন-তরণী অকূল সমুদ্রে প্রথম তীরের সন্ধান পাইয়াছে।

মূর্তিনির্মাণ শেষ হইয়াছিল। মহাসমারোহে বিহারের এক অংশে এক সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠা-কার্য শেষ হইল। যে শ্রেষ্ঠীর কল্যাণকামনায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা, তিনি কৃতার্থ হইলেন।

মহাস্থবির প্রফুল্লমনে বিহারের অলিন্দের একপার্শ্বে শিলাসনে বসিয়াছিলেন। কুমারসেন সসঙ্কোচে তাঁহার কাছে তাহার সঙ্কল্প জানাইল।

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া আনন্দোদ্ভাসিতবদনে মহাস্থবির উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারসেনকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "পুত্র, তুমি ভগবান তথাগতের কৃপাকটাক্ষ লাভ কর।"

কিন্তু বহুকালপরে সেই দিনই সন্ধ্যাকালে কুমারসেনের সহসা তক্ষশিলা নগরীর উপান্তে একটি ক্ষুদ্র গৃহে গমন করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে গিরিশীর্ষ হইতে অবতরণ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইল।

পক্ষাধিক কাল সে এদিকে আগমন করে নাই। সন্তর্পণে দ্বারে করাঘাত করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রেসিস্।

মুহূর্তের জন্য ক্রেসিসের লোলাপাঙ্গে বিদ্যুদ্দাম খেলিয়া গেল। পরক্ষণেই স্ফুরিতাধরে কহিল, "সহসা এ দীনার কুটিরে আগমন! অধীনা যেন আজ প্রাতঃকালে কাহার মুখদর্শন করিয়া উঠিয়াছিল!"

কুমারসেন সরলভাবে কহিল, "এ কয়দিন বড় কাজে ব্যস্ত ছিলাম।"

ক্ষুব্ধস্বরে ক্রেসিস্ কহিল, "সম্ভব! সে কার্যটির নাম কি? মধুরিকা না মাধবিকা? তক্ষশিলা নগরীতে ত সেরূপ কার্যের কোনও অভাব নাই!"

শ্রান্তভাবে কাষ্ঠাসনের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কুমারসেন কহিল, "ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি গঠন করিতেছিলাম।"

"কেমন হইল?"

প্রসন্ন কণ্ঠে কুমারসেন কহিল, "চমৎকার! আত্মগরিমার মত শুনাইতে পারে, কিন্তু সত্যই এ মূর্তির তুলনা তক্ষশিলায় কোথাও পাইবে না।"

"ইন্দ্রগুপ্তের শিল্পগৃহেও নহে?"

সহাস্যে কুমারসেন কহিল, "না। ইন্দ্রগুপ্ত যদি বুদ্ধ-মূর্তি নির্মাণ করিত তবে হয়ত পাইতে। কিন্তু ইন্দ্রগুপ্ত রমণী ভিন্ন অপর কিছু ত বড় একটা গঠন করে না!"

ক্রেসিস্ কহিল, "সত্য! তুমি অবশ্য আর রমণী-মূর্তি গঠন কর না, বৌদ্ধসঙ্ঘে নারীর স্থান কোথায়?"

ধীরে ধীরে কুমারসেন কহিল, "তবু একটি গড়িয়াছিলাম।"

"কাহার?"

অকারণে কুমারসেনের শ্যামল মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল কহিল, "বুদ্ধজননী মায়ার।"

বুদ্ধজননী মায়ার নামে এতটা ভাব-বৈলক্ষণ্যের কারণ ক্রেসিস্ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

বাহিরে চতুর্দশী রজনীতে আকাশে আলোকের মহোৎসব চলিতেছে। শিশির ঋতুর শেষ হইয়া ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে, বনভূমি নবপত্রপুষ্পে ভরিয়া গিয়াছে। প্রবাসী পুরুষ ও পথিকবনিতা ভিন্ন আর কাহারও মনে দুঃখের লেশমাত্র নাই।

ইন্দ্রগুপ্তের ক্ষুদ্র উদ্যানে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমারোহ। শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া উদ্যানকে শিল্পীর চিত্রপটে পরিণত করিয়াছে। অলক্ষ্যে কখন আর একটি কুসুম যবনী তরুণী প্রিয়দর্শিকার অন্তরে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

বহুক্ষণ কেহ কথা কহিল না। কুমারসেন ক্ষুদ্র গবাক্ষের বাহিরে অদূরস্থিত বিহারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সহসা কুমারসেন কহিল, "প্রিয়দর্শিকে, আজ তোমাকে কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

কুমারীহৃদয়ে আশা-আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া গেল। ঊর্দ্ধ নীলাকাশে চতুর্দশীর চন্দ্র সহাস্যে ক্রেসিসের দিকে তাকাইল। সমস্ত বনভূমি পত্রপুষ্পশোভিত শাখা আন্দোলিত করিয়া কহিল, "ক্রেসিস্, তোমার মনের গোপন কথা আমরা ধরিয়া ফেলিয়াছি। আর কেন, মধুমাস আসিয়াছে, আমরা কুসুমসম্ভার লইয়া তোমার মিলন-রজনীর প্রতীক্ষা করিতেছি ত্বরায় প্রস্তুত হও।" বসন্তের বাতাস কানে কানে কহিল "প্রিয়দর্শিকে, আজিকার রজনী যেন ব্যর্থ না হয়, সাবধান!" যবন প্রেমের দেবতা ইরস্ পুষ্পধনু আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, "ভয় কি? আমি আছি।" আর্য প্রেমের দেবতা কন্দর্প সহাস্যে কহিলেন, "আমিই বা কম কিসে?" চন্দ্র কহিল, "ক্রেসিস্, ভয় নাই, আজিকার রজনী না হইলেও কাল আছে। মধুযামিনী এক দিনে বিফল হয় না।"

তরুণীর আবেশবিহ্বল নয়নের দিকে চাহিয়া কুমারসেন ধীরে ধীরে কহিল, "প্রিয়দর্শিকে, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছি।"

মূঢ়ের মত শূন্যদৃষ্টিতে ক্রেসিস্ উচ্চারণ করিল, "প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছ? কেন?" কিন্তু পরক্ষণেই উপলব্ধির মৃত্যুবাণ তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল। দলিতা সর্পীর ন্যায় তাহার বিশাল নয়নদ্বয় হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইতে লাগিল।

কুমারসেন কিছুই লক্ষ্য করিল না। কহিল, "আমার পূর্ব-ইতিহাস তুমি জান না প্রিয়দর্শিকা।"

রুদ্ধকণ্ঠে প্রিয়দর্শিকা কহিল, "জানিবার জন্য কোনও দিন ত কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করি নাই!"

"না। কিন্তু আমার সংসারাশ্রমের শেষ কয়েক দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। আজ আমি আমার ভারাক্রান্ত মনের দুই একটি গোপন কথা তোমার কাছে খুলিয়া বলিতে চাই, শুনিবে?"

নিরুৎসুক কণ্ঠে ক্রেসিস্ কহিল, "শুনিব।"

প্রায় চারবৎসর পূর্বের কথা। বঙ্গ ও মগধের সীমান্তে ক্ষুদ্র নগরী মালিনী। পাটলিপুত্র বা কাশীর সহিত তাহার তুলনা হয় না। ছায়াচ্ছন্ন বনানীবেষ্টিত নগরী। নিদাঘে তাহার সুনীল আকাশ হইতে যে তাপ নির্গত হয় তাহা দুঃসহ নহে; প্রাবৃটে সেই আকাশই ঘনকৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, দেবতার কৃপাবর্ষণের ন্যায় মুষল ধারে বৃষ্টি নামিয়া আসে, অগণিত ক্ষেত্র শস্যে ভরিয়া যায়। হেমন্তে হরিৎ শস্যে স্বর্ণের প্রলেপ পড়ে, চারিদিকে শুধু কষিতকাঞ্চনের ন্যায় পক্ব শস্য। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপের মধ্যে অবস্থিতা মালিনী, অর্ধসুপ্তা, শান্তিময়ী নগরী।

মালিনী হইতে কোনও রাজা মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে সসৈন্যে দিগ্বিজয়ে বাহির হয় না। হতাহত যোদ্ধার ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং উষ্ণ রক্তে ধরিত্রী ব্যথিত হইয়া উঠেন না। যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় যাহারা আছে তাহারা দ্যূতক্রীড়া করিয়া, গৌড়ী, মাধ্বী, মৈরেয় প্রভৃতি সুমধুর আসব পান করিয়া এবং অবশিষ্ট সময়টা প্রিয়তমার পেলব বাহুবন্ধনের মধ্যে যাপন করিয়া কাল কাটায়। অসিফলকে মরিচা ধরিয়া যায়, ধনুর্বাণ মূষিক কর্তৃক শতছিন্ন হয়।

এই মালিনীতে এইরূপই এক ক্ষত্রিয়বংশে কুমারসেনের জন্ম। নিতান্ত কর্তব্যবোধে কিছুদিন ধনুর্বাণ লইয়া ক্রীড়া করিয়া কুমারসেন সহসা এক দিন মাটি দিয়া মূর্তি গড়িতে আরম্ভ করিল।

ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধ-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তরবারি দিয়া শস্য কর্তন করিলে হয়ত মাতাপিতার সহ্য হইত। কিছুই না করিয়া যদি অক্ষক্রীড়া, সুরা এবং যুবতী সঙ্গে দিবারাত্রি যাপন করিত তাহাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি কাহারও ছিল না। কিন্তু কুম্ভকার বৃত্তি? অসম্ভব, এবং অসহনীয়।

বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়া একদা নিশীথে কুমারসেন মরিচা-ধরা তরবারি লইয়া প্রিয় অশ্বে আরোহণ করিয়া পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিল। পরদিন বহু সন্ধানেও কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। ধূলিধূসর রাজপথের উপর অশ্বক্ষুর চিহ্নের দিকে তাকাইয়া জননী অশ্রু বিসর্জন করিলেন, এবং মালিনীর যাবতীয় অনূঢ়া কিশোরী গোপনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

পাটলিপুত্র সৈনিকের দেশ। কুমারসেন বিনাদ্বিধায় রাজ-সভায় উপস্থিত হইল, এবং মহাপরাক্রান্ত পরম সৌগত পরম-ভট্টারক মগধাধিপতি তাহার বিশাল দীর্ঘোন্নত দেহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ফলে অচিরে কুমারসেন মহারাজের দেহরক্ষী সৈন্যদলে নিযুক্ত হইল।

পৃথিবীতে সকল দেশে এবং সকল কালে নরপতিগণকে প্রাণ হাতে লইয়া ফিরিতে হয়। মগধাধিপতিও তাহার ব্যতি-ক্রম ছিলেন না। ফলে কুমারসেন দুই তিন বার আততায়ীর হস্ত হইতে রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়া শৌর্য দেখাইবার সুযোগ পাইল, এবং অত্যল্পকাল মধ্যে রক্ষীদলের অধিনায়ক পদ প্রাপ্ত হইল। তাহার পর সহসা একদা রাজকুমারী ভদ্রার নয়নপথে পতিত হইয়া তাহার নিশ্চিন্ত জীবন আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল।

প্রকাশ্য প্রেম অপেক্ষা গুপ্ত প্রেম যে অনেক বেশি মধুর তাহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। বলিষ্ঠদেহ কুমারসেন অচিরকাল মধ্যে রাজ-অবরোধের উদ্যান-প্রাচীর লঙ্ঘন কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিল।

এই ভাবে কয়েক মাস কাটিল। তাহার পর একদা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অল্প পরে কুমারসেন প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে পড়িল, এবং সম্মুখে চাহিয়া দেখিল রাজকুমারী ভদ্রার সহিত অপর এক ব্যক্তি, স্বয়ং মগধাধিপতি।

বিস্মিত কণ্ঠে মগধরাজ কহিলেন, "কুমারসেন, ইহার অর্থ?" কুমারসেন উত্তর দিতে পারিল না, চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজকুমারী ভদ্রা এতক্ষণে ভীতিবিহ্বলভাব কাটাইয়া উঠিয়া-ছিলেন, কহিলেন, "পিতা, এ ব্যক্তি নিশ্চয় চোর, অথবা আমার কোনও দাসীর গুপ্ত প্রণয়ী।"

কুমারসেনের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। মগধরাজ গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "রাজ-অবরোধে বাহিরের লোকের অনধিকার প্রবেশের শাস্তি কি জান?"

অস্ফুটস্বরে কুমারসেন কহিল, "মৃত্যু।" ভদ্রা শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোনো কথা কহিলেন না।

মগধাধিপতি কহিলেন, "উত্তম। সেই দণ্ডই তুমি পাইবে। আজ রজনী কারাকক্ষে যাপন কর, কাল প্রভাতে দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিবে। পরিজনবর্গকে সংবাদ দিবার প্রয়োজন বোধ করিলে কারাধ্যক্ষকে বলিও।"

অন্ধকার কারাকক্ষে কুমারসেন মৃত্যুর মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

নিষ্প্রদীপ অন্ধকারের মধ্য হইতে একটি আশার আলোক ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। গভীর রজনীতে যখন অকারণে লৌহ-দ্বার খুলিয়া গেল, তখন ক্ষণেকের জন্য সেই আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু না, যে আসিয়াছে, সে রাজকুমারী ভদ্রা নহে, কারাগৃহের প্রহরী।

নিস্পৃহভাবে কুমারসেন চাহিয়া দেখিল। প্রহরী বদ্ধ ওষ্ঠাধরে তর্জনী সংলগ্ন করিয়া নিকটে আসিয়া কুমারসেনের বন্ধন মোচন করিল। তাহার পরে দুইটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া বন্দী ও তাহার প্রহরী নক্ষত্রবেগে জনবিরল রাজপথ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল।

এই প্রহরী কুমারসেনেরই অধীনস্থ একজন সৈনিক।

প্রাণ রক্ষার জন্য মগধরাজের ন্যায় সেও কুমারসেনের নিকট ঋণী। কিন্তু সে নরপতি নহে, সামান্য সৈনিক, ফলে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা সহজে ভুলিতে পারে নাই।

দীর্ঘ দুই বৎসর কুমারসেনের যাযাবরবৃত্তি চলিল। প্রাণ-দাতা সৈনিক প্রথম দিকেই দস্যুহস্তে প্রাণ দিয়াছিল। একাকী কুমারসেন বহু দেশ ঘুরিয়া অবশেষে আর্যাবর্তের শেষপ্রান্তে তক্ষশিলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রিয়দর্শিকা কুমারসেনের কাহিনী শুনিল।

বাহিরে বসন্ত-প্রকৃতি আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সারা তক্ষ-শিলা নগরী নিদ্রিতা, শুধু নগরীর প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গৃহে একটি তরুণ ও একটি তরুণী জাগিয়া আছে।

ধীরে ধীরে ক্রেসিস্ কহিল, "আমি ত রাজকুমারী ভদ্রা নহি, আমি সামান্যা নারী ক্রেসিস্।"

আকুলকণ্ঠে কুমারসেন কহিল, "না না! ক্রেসিস্, আমাকে ভুলিয়া যাও।"

শান্তকণ্ঠে ক্রেসিস্ কহিল, "অসম্ভব।"

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া কুমারসেন কহিল, "অসম্ভব? কেন?"

ততোধিক শান্ত কণ্ঠে ক্রেসিস্ কহিল, "পৃথিবীতে মৃত্যু ভিন্ন এমন কোনও শক্তি নাই যে আমার নিকট হইতে তোমাকে দূরে সরাইতে পারে। তোমার সঙ্ঘ, তোমার মহাস্থবির, এমন কি ভগবান তথাগতেরও সাধ্য নাই যে আমার আলিঙ্গন হইতে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে।"

করতলে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া কুমারসেন কহিল, "ক্রেসিস্, আমাকে ক্ষমা কর। আমি গৃহী নহি, আমি উপ-সম্পদাকামী।"

ধীর কণ্ঠে ক্রেসিস্ কহিল, "তুমি আমার।"

হায় রমণীর মন! প্রেমাস্পদকে চিরদিনের জন্য হারাইবার পূর্বমুহূর্তে কি অসীম বিশ্বাস, কি পরম নিশ্চিন্ততা!

কেহ আর একটিও কথা কহিল না। কুমারসেনের রুদ্ধ হৃদয়ে অনেক কথা অনুক্ত রহিয়া গেল। সে কি করিয়া ক্রেসি-সের প্রেম গ্রহণ করিবে?

কুমারসেন বিদায় লইল।

বাহিরে আসিতেই একটা ছায়ার মত মূর্তি সরিয়া গেল। বিস্মিত কুমারসেন ইতস্তত চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। কুমারসেন পুনর্বার সঙ্ঘাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করার কিছু পরেই মূর্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে সম্মুখে আসিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। (ক্রমশঃ)

রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ছিল বাংলায় এক ভাব-বিপ্লবের যুগ। পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি, ভাব ভাষা ও আদর্শের সংস্পর্শলাভে প্রাচ্য চিত্তক্ষেত্রে এক আলোড়ন সুরু হইল। বাংলাদেশ এই চিন্তা-বিপ্লবে অগ্রণী। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রেই নবজাগরণের কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিল। বহুমুখী প্রতিভা লইয়া যে-সকল মনীষী এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন-সাধনায় বাংলাদেশ গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কর্মবীরগণ এক নবযুগের রচয়িতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সহিত বর্তমান যুগের তুলনা করিলে একটা বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বিংশ শতাব্দীর সরকারী চাকুরিয়াগণ জনসাধারণ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। জনস্বার্থ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাদের সংকীর্ণ কক্ষপথে নীরবে তাঁহারা চলিয়াছেন। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা তাঁহাদের অন্তর স্পর্শ করে না। রমেশচন্দ্রের মত সিভিলিয়ান কর্মচারী এ যুগে দেখা যায় না। সিভিল সার্ভিসে আজকাল ভারতীয়ের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে কিন্তু তাঁহার ন্যায় দীপ্ত স্বদেশপ্রেম, ভারতবাসীর দুঃখমোচনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণের নির্ভীক সমালোচনা এ যুগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে একান্ত দুর্লভ। রমেশচন্দ্র অতি তীক্ষ্ণধী পুরুষ ছিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য অর্থনীতিতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। এমন সাবলীল প্রসাদগুণযুক্ত ইংরেজী তিনি লিখিতে পারিতেন যে তখনকার দিনের ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও অল্প লোকই সেরূপ পারিতেন। ইংরেজী সাহিত্যের ভাবধারা আকণ্ঠ পান করিয়া এবং ইংরেজ সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া রমেশচন্দ্র ইংরেজ জাতির মহৎ গুণরাজি, যথা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনতা-প্রীতি, ন্যায়ানুরাগ প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কালচক্রের আবর্তনে অধুনা-পতিত জাতি যে আবার পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হইবে এ জ্বলন্ত বিশ্বাস তিনি নিজ হৃদয়ে পোষণ করিতেন এবং দেশবাসীর অন্তরেও ইহা একান্ত অনুরাগের সহিত সঞ্চারিত করিতেন। তিনিই ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই উচ্চ পদ ও বিপুল সম্মান লাভ করিয়াও তিনি পরাধীনতার গ্লানি বিস্মৃত হন নাই বা দরিদ্র জনসাধারণের জীবন-সমস্যা উপেক্ষা করিয়া নিজের সফল জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই নিজেকে সমাহিত রাখেন নাই। ভারতের দারিদ্র্য ও দেশবাসীর অসহায় অবস্থা তাঁহার মত স্থিতধী বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও বিচলিত করিয়াছিল। ভারতভূমিকে তিনি ভাল-বাসিতেন; ভারতের কৃষককুলের জন্য তাহার দরদের অন্ত ছিল না। তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার সমকক্ষ নির্ভীক যোদ্ধা কেহ ছিল না।

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে (১৮৯৯) সভাপতির অভিভাষণে রমেশচন্দ্র ভারতের কৃষকের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্দশার জন্য ভারতসরকারকে দায়ী করিয়া বলিলেন, জমির অত্যধিক খাজনা কৃষককে সর্বস্বান্ত করিয়া দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। তাঁহার এই উক্তি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল এবং ভারতে জমির খাজনার হার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কমিশন গঠনের কথা হইল। চাষীর দুরবস্থা নিরাকরণের জন্য যাহাতে প্রবল জনমত জাগ্রত হয় তজ্জন্য রমেশচন্দ্র 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' নামক একখানি পুস্তক বিলাতে প্রকাশ করিয়া ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে বহুল প্রচার করিলেন। ইহার কিছু দিন পর তাঁহার বিখ্যাত 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' (Economic History of India) প্রকাশিত হইল। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের মূল কাঠামো কি এবং

কেমন করিয়া উহা বিদেশী শাসকের শোষণ-যন্ত্রে পড়িয়া ঘুণ-ধরা শুক্না কাঠের মত ভাঙিয়া পড়িতেছে তিনি তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিলেন। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির নিরপেক্ষ সরস রচনা বলিয়া তাঁহার বইগুলি আজ পর্যন্ত প্রামাণিক হইয়া রহিয়াছে।

রমেশচন্দ্রের ন্যায় দায়িত্বসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করায় কোন কোন ইংরেজ এবং ইঙ্গ-ভারতীয় মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সম্মান-প্রতিপত্তি যাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টির মত বর্ষিত হইয়াছে তিনিও মূক জনগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সর্বশক্তিমান গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি দুর্বলতা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিবেন! মাদকদ্রব্য প্রয়োগে সুন্দরবনের ব্যাঘ্ররাজ সার্কাসের মাস্টারের ইসারায় ওঠে বসে, আর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উপাধি, অর্থ, পদগৌরব এত বিতরণ করার পরও রমেশচন্দ্র ভারত-শোষণের নিগূঢ় সত্য ও তথ্যগুলি প্রকাশ না করিয়া পারিলেন না! অকৃতজ্ঞ আর কাহাকে বলে! 'সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট' পত্রিকা প্রকারান্তরে রমেশচন্দ্রকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া উষ্মা প্রকাশ করিলেন। লিখিলেন:

"ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব না থাকিলে মিঃ দত্ত তাঁর সকল যোগ্যতা সত্ত্বেও কোন মুসলমান বা মারাঠা সর্দারের অধীনে আমিনের অপেক্ষা উচ্চতর পদপ্রাপ্তির আশা করিতে পারিতেন না। উপরি-পাওনা সমেত তার মাহিনা পড়িত হয়ত পঞ্চাশ টাকা। তাঁর শিক্ষা, সুযোগ, উচ্চ পদ, সম্মান, মোটা পেন্সন এবং গবর্ণমেণ্টের দুর্নাম করিবার অধিকার তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেই পাইয়াছেন।"

রমেশচন্দ্র দাবি করিলেন যে, ভারতশাসন ব্যাপারে ভারত-বাসীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলে চলিবে না; তাহাদের হাতেও কিছু ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদের জীবন-মরণ-সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাহাদের মতামত মানিতে হইবে।

অর্থনৈতিক সমস্যা

এক কালে ভারতবর্ষ "সোনার ভারত" বলিয়া ইউরোপে পরিচিত ছিল। ইহার বিপুল অর্থ, জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, শস্যসম্ভার, নৌশিল্প, বস্ত্রশিল্প, বাণিজ্য বিদেশীর বিস্ময় উৎপাদন করিত। এখন সে-সব কথা স্বপ্নের মত অলীক বোধ হইবে। শস্যপূর্ণ দেশের অধিবাসী এক মুষ্টি অন্ন এক অঞ্জলি ফেনের অভাবে রাজপথে শুকাইয়া মরে; নদীমাতৃক সুজলা দেশ নদীবিমাতৃক জলহীন মরুদেশে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ভারতীয়দের দারিদ্র্যের ও ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন:

"কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যই হইল দেশের সম্পদের মূল। কল্যাণপ্রদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা এগুলির সংরক্ষণ করা আবশ্যক। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব বৃহত্তর সভ্যতার সুযোগ ও শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয়দিগের জাতীয় সম্পদের মূলক্ষেত্র প্রসারলাভ করে নাই; কাজেই জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নাই।"

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের কৃষির উন্নতিকল্পে চেষ্টিত হওয়া উচিত। 'ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশন' (১৮৮৪) ব্যাপকভাবে সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রেল-পথ বিস্তার দ্বারা ব্রিটিশ মূলধন প্রসার করিয়া লাভের সুযোগ ব্রিটিশ মহাজনগণ ছাড়িবেন কেন? তাঁহাদের চাপে পড়িয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধাহারশীর্ণ ভারতবাসীর জমির জন্য সেচের ব্যবস্থার পরিবর্তে লৌহবর্মের বেড়াজাল বাড়াইয়া চলিলেন। রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন, 'দেশের খাদ্য সরবরাহে রেলপথ এক কণা শস্যও দেয় না কিন্তু জলসেচ দ্বারা শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করা, ফসল রক্ষা করা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর।' তথাপি আকাশ কৃষ্ণ ধূমে আচ্ছন্ন করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লৌহশকট পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। স্রোতস্বিনী নদী শ্বাসরুদ্ধ শীর্ণকায়া হইতে লাগিল, জমির উর্বরা শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে আরম্ভ করিল। তিনি সখেদে লিখিলেন:

"ব্রিটিশের দেড় শত বৎসর ব্যাপী শাসন-কালে সমস্ত দেশে জল-সেচের সুব্যবস্থা হইতে পারিত। অনাবৃষ্টির কুফল হইতে সব প্রদেশ রক্ষা করা সম্ভব হইত। ভারতের শস্য উৎপাদন স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু মারাত্মক অজ্ঞতায় ও দূরদৃষ্টির অভাবে রেলপথের বিস্তার-সাধন এবং জলসেচ অবহেলিত হইয়াছে। ভারতের ২২ কোটি একর আবাদী জমির মধ্যে ২ কোটির বেশী সেচের সুবিধা পায় না।"

বর্তমান যুদ্ধে ব্রহ্মদেশ হস্তচ্যুত হওয়ার পর হইতে বাংলায় খাদ্যসমস্যা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইল কেন? 'দুধ ও মধুর দেশ' এমন অর্দ্ধাহারী ও শুষ্কচর্মাবৃত কঙ্কালের দেশে পরিণত হইল কিরূপে? বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলী ইহার উত্তর দিয়াছেন। বর্ষার জল নিকাশের প্রশস্ত পথ না রাখিয়া রেল-পথ নির্মাণ বাংলার পক্ষে প্রাণঘাতী হইয়াছে। তিনি বলেন:

"যথাযোগ্য জলসেচের ব্যবস্থা থাকিলে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতের খাদ্য সরবরাহ করিতে পারিত। স্পেনে একর প্রতি যেরূপ শস্য ফলে বাংলায় বর্তমান জমিতে সেই অনুপাতে ফলিলেই ইহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। জাপানের ধানী জমিতে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় সেরূপ হইলে বাংলার জমি ২০ কোটি লোকের খাদ্য যোগাইতে পারে।"

সার অথবা পলিমাটির অভাবে বাংলার জমি অনাহারে শুকাইয়া রিক্তশস্য হইয়া উঠিতেছে, ফলে এক বৎসরের মন্বন্তরে ২০ লক্ষাধিক বাঙালীকে শুকাইয়া মরিতে হইয়াছে। যাহাকে রাখা যায় সেই রাখে। নদী বাঁচিলে জমি বাঁচিত, আমরাও বাঁচিতাম।

শিল্প-বাণিজ্য সমস্যা

ভারতের শিল্প এক সময়ে অতুলনীয় ছিল, বাণিজ্য ছিল বহুবিস্তৃত। ভারতের রেশম ও কার্পাসজাত দ্রব্যাদি ইউরোপে সমাদৃত হইত। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় বস্ত্র বিলাতে প্রস্তুত বস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাহার অর্দ্ধেক মূল্যে ইংলণ্ডে বিক্রীত হইত। ভারতীয় দ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক বসাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পীদিগের প্রতি-

যোগিতার হাত হইতে বিলাতের বস্ত্রশিল্পীকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ভারতের শিল্পবাণিজ্য দাবাইয়া রাখিয়া ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার সুবিধা-দান না করিলে প্রতিযোগিতায় তাহাদের টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইংরেজ কেবল এদেশের শাসক হইলে ভারতের এত হীন অবস্থা হইত না। ইংরেজ একাধারে শাসক ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতের প্রতিযোগী। কাজেই তাহারা রাজনৈতিক শক্তির সুবিধা লইয়া প্রতিযোগীকে পঙ্গু করিয়া এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে যে, ভারতবাসী কেবল কাঁচা মাল উৎপাদন করিয়া তাহাদের নিকট বিক্রয় করিবে এবং তাহাদের দেশে, তাহাদের মূলধনে চালিত কারখানায় তাহাদের মজুর দ্বারা তৈরি, তাহাদের জাহাজে এদেশে আনীত দ্রব্য (finished goods) অধিক মূল্যে কিনিবে। ভারতবাসী বিনা শুল্কে কোন দ্রব্য ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারিবে না কিন্তু বিলাতী দ্রব্যের এদেশে আগমন শুল্কমুক্ত, অবাধ। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মিঃ হোরেস হেম্যান উইলসন "ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"স্বাধীন থাকিলে ভারতবর্ষ ইহার প্রতিশোধ লইত। বিলাতী মালের উপর শুল্ক বসাইয়া তাহার নিজের শিল্প রক্ষা করিত। আত্মরক্ষার এই অধিকার তাহাকে দেওয়া হইল না; সে বিদেশী শক্তির করায়ত্ত হইয়া অসহায়। বিনা শুল্কে বিলাতী মাল আমদানী হইতে লাগিল। সমান সুযোগ-সুবিধা লইয়া প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীর পক্ষে আঁটিয়া উঠা সম্ভব ছিল না। কাজেই ইংরেজ ব্যবসায়ী রাজনৈতিক শক্তির অপপ্রয়োগ দ্বারা ভারতকে দাবাইয়া গলা টিপিয়া ধরিল।"*

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, "অন্য সকল দেশের ধনরত্ন অবিরল ধারায় ভারত অভিমুখে যাইত, কখনও ফিরিত না। কিন্তু এখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দরিদ্রতম দেশ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ব্যবহার বিষয়ে অন্য দেশের সহিত এ দেশবাসীদিগকে তুলনা করিলে দেখা যাইবে জনসাধারণ প্রায় বন্য পশুর স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি?† কারণ অর্থাগমের প্রধান পন্থাগুলি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কালচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। ভারত হইতে এখন 'অবিরল ধারায়' অর্থ বাহিরে যাইতেছে, ফিরিতেছে না। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন :

"সমগ্র ভারতের রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ প্রতি বৎসর 'হোম চার্জ' রূপে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। ইহার সঙ্গে ভারতে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীর বেতন যোগ করিলে বৎসরে ২ কোটি পাউণ্ডের বেশী ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অর্থশালী দেশ দরিদ্রতম দেশের নিকট হইতে বার্ষিক এই টাকা আদায় করিয়া থাকে। যাহারা মাথা পিছু ৪২ পাউণ্ড উপার্জন করে তাহারাই মাথা পিছু ২ পাউণ্ড উপার্জনকারীর নিকট হইতে জনপ্রতি ১০ শিলিং আদায় করে।"

অন্যত্র লিখিয়াছেন :

"১৯০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ঐ বৎসরে 'হোম চার্জে'র পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতের সকল প্রদেশে যত রাজস্ব আদায় হয় তাহার প্রায় সবই হোম চার্জের খতিয়ানে বিলাতে পার হয়। ইউরোপীয় কর্মচারীর বেতন বাবদ আরও কয়েক লক্ষ চলিয়া যায়।"

এরূপ অবস্থায় ভারতের দরিদ্র হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়া থাকেন ভারত আয়ের সম্পত্তি নহে। ইহার দেনার ভার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভারতের ঋণভার সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

"ভারতের ঋণ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, সমগ্র টাকা ব্রিটিশরা ভারতের উন্নতির জন্য নিয়োগ করিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের ঋণের কারণ নহে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ক্ষমতা লোপ করা হইল তখন ভারতের ঋণের পরিমাণ ৭ কোটি পাউণ্ড। ইতিমধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে সুদ বাদে ১৫ কোটি পাউণ্ড কর আদায় করিয়াছেন। আফগান যুদ্ধ, চীন যুদ্ধ ও ভারত সীমান্তের বাহিরে আরও অন্য যুদ্ধের খরচও তাঁহারা ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। কাজেই ন্যায়তঃ কোম্পানীর আমল শেষে ভারতের কোন ঋণ থাকিতে পারে না; তাহার ঋণ ভুয়া। পক্ষান্তরে ভারতেরই ১০ কোটি পাউণ্ড পাওনা ছিল।"

নিরপেক্ষ সভ্য সমাজের ন্যায় ও ধর্মবুদ্ধির উপর তিনি বিচারের ভার অর্পণ করিয়া বলিয়াছেন :

"ভারতীয় ঋণের ইতিহাস অর্থনৈতিক অজ্ঞতা ও অন্যায়ের মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক পক্ষপাতরহিত পাঠক স্থির করিতে পারেন ভারতীয় ঋণের কতখানি ভারতবাসীর ন্যায়ত দেয়।"

ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা ও দুর্দশার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া উপসংহারে রমেশচন্দ্র বলিয়াছেন :

"ভারতীয় অর্থনীতির খাঁটি তথ্য এই। এরূপ অবস্থায় পড়িলে পৃথিবীর যে-কোন উর্বর, উদ্যমশীল, শান্তিপূর্ণ দেশ ভারতের বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইত। যদি রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়, শিল্প পঙ্গু ও কৃষি করভার-প্রপীড়িত করা হয় পৃথিবীর যে-কোন দেশ চিরস্থায়ী দারিদ্র্য ও পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পতিত হইতে বাধ্য। অর্থনীতির মূল সূত্র এসিয়ায় যেমন ইউরোপেও তেমনি প্রযোজ্য। ভারত যে আজ দরিদ্র তাহা ঐ অর্থনীতির প্রয়োগ প্রভাবেই।"

দত্ত মহাশয় যখন এ কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী গত হইয়াছে কিন্তু অর্থনৈতিক নীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। দুর্ভিক্ষ ভারতের বুকে দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া আছে। রমেশচন্দ্র চল্লিশ বৎসরে দশটি দুর্ভিক্ষের

* The History of British India by Horace Hayman Wilson, Vol. I. p. 385.

† The Economic Background (Oxford Pamphlets on Indian Affairs)

ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হতভাগ্যদের দুঃখে তাঁহার অন্তর বিগলিত হইত, তাঁহার রসনায় উৎসারিত হইয়া উঠিত বেদনাতুর হৃদয়ের সমবেদনার উচ্ছ্বাস। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের আবহাওয়া যখন সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই, মাদ্রাজে এক জনসভায় দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন :

"এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহা অপেক্ষা তীব্রতর দুর্ভাগ্য এবং ব্যাপকতর মৃত্যু আর কোন দিন হয় নি। অন্য কোন সভ্য, উর্বর, উদ্যমশীল দেশে এ দেশের চেয়ে বিস্তৃততর দারিদ্র্য ও ধ্বংসলীলা দেখা যায় নি।"

সেই বক্তৃতাতেই ১৯০১-০২ সালের দুর্ভিক্ষে লোকের চরম দুর্গতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর সম্বন্ধেও তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি বলিয়াছিলেন :

"যদি এমন কোন বিষয় থাকে যা দলগত বিতর্কের উর্ধ্বে এবং যা সকলের করুণার উদ্রেক করতে পারে, তবে তা অধুনাকালের দেশধ্বংসী দুর্ভিক্ষ। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কেউ যদি আমার মত সাহায্য-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে থাকেন এবং আমাদের ভাই-বোন শত সহস্র অনাহারী মুমূর্ষু পুরুষ ও স্ত্রীলোককে রাস্তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে, গাছের নীচে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে থাকতে দেখে থাকেন তবে আপনারাও আমার মত অনুভব করে থাকবেন যে, মানুষের এই চরম দুর্দশা স্থায়ী প্রতিকারের জন্য স্বর্গাভিমুখে ক্রন্দন তুলছে।"

রমেশচন্দ্রের মধ্যে বহুগুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একাধারে ভাবুক সাহিত্যিক, আবার অর্থনীতির জটিল বাস্তব ক্ষেত্রেও তাঁহার দক্ষতা অনন্যসাধারণ। তিনি ছিলেন স্নেহপ্রবণ পিতা ও অমায়িক সহানুভূতিশীল বন্ধু। তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল ন্যায়ানুরাগ ও দৃঢ়তা। রয়্যাল কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য রমেশচন্দ্র অন্যান্য ইংরেজ সদস্যদিগের সহিত কতক বিষয়ে একমত হইতে না পারিয়া পৃথক রিপোর্টে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

দূরদর্শিতা : ভেদনীতির অভাব

সমসাময়িক ভারতের দুর্দশায় ব্যথিত হইলেও দত্ত মহাশয় ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হন নাই। তিনি বলিতেন, "যে দেশের অতীত উজ্জ্বল তাহার ভবিষ্যৎও একদিন উজ্জ্বল হইবেই।" তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব মহলে এই আশার বাণী শুনাইয়া তিনি সকলকে সর্বভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমবেত শক্তি প্রয়োগে রাজনৈতিক অধিকার লাভার্থে অগ্রসর হইতে বলিতেন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শি সকল সম্প্রদায়ের বহু লোকের সহিত তাঁহার প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এক বার জন্মদিনের উপহার স্বরূপ জাঞ্জিবার বেগমকে ইংরেজীতে রচিত একটি কবিতা পাঠাইয়াছিলেন। 'জাতিধর্মের পার্থক্য ভুলিয়া দেশবাসীর সেবা, মাতৃভূমির সেবা করিয়া যাও' ইহাই তাঁহার আশীর্বাদ। কবিতার ভাব এইরূপ :

"দেশের কৃষিশিল্প প্রাণবান করে তোল। সেবা যত ক্ষুদ্রই হোক তার মূল্য কম নয়। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশীল হও। আমাদের অনাগত সন্তানসন্ততি আমাদের চেয়ে মহত্তর, বলবত্তর হবে। জাতিধর্মের বিদ্বেষ জেগে উঠে আমাদের একতা ক্ষুন্ন করতে পারে; নিঃস্বার্থ ত্যাগ দ্বারা যা অর্জন করা হয়েছে, স্বার্থান্ধ লোভ হয়ত তা প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু মহৎমনা স্ত্রীলোক এবং পুরুষ—তা তিনি হিন্দুই হোন বা মুসলমানই হোন—ধর্মবিশ্বাস-প্রভাবেই আমরণ মাতৃভূমির সেবা করে যাবেন।"

ভারতের স্বরাজ তাঁহার একান্ত কামনার বিষয় ছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হয়ত কোন কোন স্বার্থান্ধ মহল ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ, অনৈক্য ফেনাইয়া তুলিয়া জাতীয় একতা ও স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা হীনবল করিতে চেষ্টা করিবে। রমেশচন্দ্রের দেশবাসীর প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ—কবির ভাষায় :

"বিভেদ ভুলিবে জাগায়ে তুলিবে একটি বিরাট হিয়া।"

লক্ষ্ণৌ বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন :

"ইহাই ধর্ম। চারাগাছের পক্ষে সূর্যালোক-লাভের বাসনা যেমন স্বাভাবিক, প্রত্যেক জাতির পক্ষে উন্নতির জন্য একতাবদ্ধ হয়ে কর্মকুশল হওয়া তেমনি স্বাভাবিক।...অসত্য এবং স্বার্থের মোহ আমাদের চলার পথের প্রতিবন্ধক, কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ আমাদের অগ্রগতির সহায়ক।"

সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালীর নিকট রমেশচন্দ্র একজন করিৎ-কর্মা সিভিলিয়ান কর্মচারী, বরোদার প্রধানমন্ত্রী এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। রাজনীতি, অর্থনীতি সংক্রান্ত তাঁহার সকল বইই ইংরেজীতে লিখিত। তাঁহার দীপ্ত স্বদেশ-প্রীতি, তাঁহার সর্বভারতীয় উদারতা ও নিরন্ন কৃষক ও হতোদ্যম মজুরদের কল্যাণের নিমিত্ত অদম্য অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁহার আদর্শের আলোচনা করা দেশবাসীর কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

লটারীর টিকেট

শ্রীকল্যাণী কর, এম্-এ

বিনয়েন্দ্র একটা ইজিচেয়ারে দেহ এলাইয়া অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল। খবর অনেকক্ষণ আগেই পড়া হইয়া গিয়াছে, তবুও নিতান্ত সময় কাটাইবার জন্য বিজ্ঞাপনের পাতার উপরেই চোখ বুলাইয়া যাইতেছিল। স্ত্রী মালতী পুত্র-কন্যাকে ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত, তাহার আশাপথ চাহিয়া বিনয়েন্দ্র আরাম-কেদারার সুখ-আলিঙ্গন উপভোগ করিতেছিল।

বিনয়েন্দ্রের হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, মুখে একটা তৃপ্তির ছাপ; গৃহে ঐশ্বর্যের আতিশয্য নাই, অভাব-অনটনের অশান্তিও নাই, স্বল্প

উপার্জ্জনে ক্ষুদ্র সংসার সচ্ছলভাবেই চলিয়া যায়; বিলাসিতা হয়ত চলে না, কিন্তু তাহা লইয়া কাহারও কোনও অভিযোগও নাই। মালতী সুন্দরী নয়, সুশ্রী; তাহাকে লইয়া ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চা চলে না, বন্ধু-মহলে 'স্মার্ট' খ্যাতি অর্জ্জনেরও আশা নাই, নিতান্তই সাধারণ বঙ্গবধূ; কিন্তু সেজন্য বিনয়েন্দ্রের মনে কখনও বিন্দুমাত্র অতৃপ্তির ছায়াপাত হয় নাই।

ভোর হইতেই মালতী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, মধ্যাহ্নে সকল কাজের শেষে একবার স্ত্রীকে একান্তে পাওয়া যাইবে, সেই আশায় বিনয়েন্দ্র খবরের কাগজটাকে নাড়াচাড়া করিতেছিল। মালতী ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর হাতে কাগজটা দেখিয়া বলিল,—সে লটারী-টার ফল বেরিয়েছে নাকি দেখ না।

লটারী-লব্ধ ভাগ্যের উপর বিনয়েন্দ্রের একেবারেই আস্থা নাই, তবুও নিরুৎসুকভাবে একবার কাগজটা দেখিয়া বলিল—হ্যাঁ বেরিয়েছে তো দেখছি, তুমিই পেয়েছ নিশ্চয়ই, কি বল? আচ্ছা, তোমার কত নম্বর?

মালতী অভিমান করিয়া বলে—বেশ, আমি বলব না তাহলে—

—না গো রাগ করো না, বলই না কত?

মালতী বলে—সাতাশ, বলিয়া কাগজটার উপর ঝুঁকিয়া দেখিতে থাকে। হঠাৎ দুই জনেই সমস্বরে বলিয়া উঠে—এই যে ২৭······

ধপ্ করিয়া কাগজটা বিনয়েন্দ্রের হাত হইতে পড়িয়া গেল, এ যে সত্যই সাতাশ, তাহারা যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। প্রবল উত্তেজনায় বিনয়েন্দ্রের মাথার শিরাগুলি দপ্দপ্ করিতেছিল। বিনয়েন্দ্র আবার কাগজটা তুলিয়া লইল, আবার দুই জনেই দেখিল কালো রঙের জলজলে সেই দুইটি অঙ্ক—দুই ও সাত, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে একটা বিপুল সম্ভাবনা লইয়া। তাহাদের তীব্রতায় যে চোখ ধাঁধাইয়া যায়, তাহাদের নিকষ-কৃষ্ণতায় মন ত্রাসে কাঁপিয়া উঠে, তাহাদের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যে দেহ পুলকে শিহরিয়া উঠে। শুধু দুইটি মাত্র অঙ্ক, তাহারই অন্তরালে কি বিরাট্ বিপুল ঐশ্বর্য্যের বার্ত্তা লুক্কায়িত রহিয়াছে। বিনয়েন্দ্র ভাবে, তাহার মালতী সত্যই ভাগ্যবতী। মালতীর দেহের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া যেন একটা তুষার-শীতল হিমপ্রবাহ বহিয়া যায়, সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। দুই জনে চোখাচোখি হয়, কেহ কোনও কথা বলিতে পারে না, এক লক্ষ টাকার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনায় তাহারা যেন আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। দেহের শিরায়-উপশিরায় যেন একটা নেশা ধরিয়াছে, বাহিরের আলোয়, সুনীল আকাশে, গাছের শ্যামলিমায়ও যেন কিসের নেশা! সমস্ত মনটা যেন বিকল হইয়া পড়িয়াছে, কোনও চিন্তা করিবারও সামর্থ্য তাহাদের নাই, শুধু চোখের সম্মুখে দুইটি অঙ্ক ভাসিয়া চলিয়াছে··· ২৭ ও ১০০,০০০; ১০০,০০০ ও ২৭···

কিছুক্ষণ পরে বিনয়েন্দ্র কহিল, আচ্ছা মালতী, টাকা পেলে কি করবে বলত?

মালতী হাসিল। কি করিবে তাহা তো সে বলিতে পারে না, তাহা তো সে ভবিয়াও দেখে নাই। সঙ্গিনীরা অনেকে টিকেট কিনিতেছে, শুনিয়া সেও কিনিয়াছিল, তাহার ভাগ্যেই যে প্রতিশ্রুত ঐশ্বর্য্য জুটিয়া যাইবে ইহা সে কখনও কল্পনাও করে নাই। টাকা পাইলে সে কি করিবে তাহা তো ভাবিতেও পারিতেছে না। মনের ভিতর সমস্ত চিন্তা যেন এলোমেলো হইয়া একটা আর একটার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে···বিশ টাকা নয়, ত্রিশ টাকা নয়,···এক লক্ষ টাকা!

বিনয়েন্দ্র বলে, আমি কি বলি জান? প্রথমেই একটা সুন্দর জায়গা কিনব গঙ্গার ধারে······

অকূল সাগরে মালতী যেন হঠাৎ থই পাইয়াছে। এবার মালতী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটা খুব সুন্দর ছবির মতো বাড়ী, সাম্নে মস্ত বাগান, সিঁড়ির উপর সারবাঁধা ক্রিসান্থিমামের টব, বারান্দায় অর্কিড ঝুলানো, গেটের উপর বোগেনভিলিয়ার ঝাড়···

বিনয়েন্দ্র বাধা দেয়।

মালতী বলে—নীচে থাকবে তোমার ষ্টাডি, ড্রয়িংরুম, খাবার ঘর···দোতলার উপর কিন্তু হবে আমার ঘর, ঘরের সাম্নে রজনী-গন্ধার টব, ভিতরে স্নিগ্ধ নীল আলো···

—আর আমি হরদম সেই ঘরে গিয়ে হানা দেব!—দুই জনেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

হঠাৎ বিনয়েন্দ্র বলে—বাঃ রে, খালি বুঝি বাড়ীতে বসে খাব আর ঘুমোব? পশ্চিমে বেড়াতে বেরুব এবার পূজোয়। এলাহাবাদ, আগ্রা, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, হরিদ্বার, মুসৌরী···

—কাশ্মীর যাবার বড্ড সখ আমার, 'ভূস্বর্গ' কাশ্মীর, সেখানে কিন্তু একবার যেতেই হবে।

দুই জনে মিলিয়া ভ্রমণের ফর্দ্দ রচনা করিয়া চলে। বাধা দিবার কেহ নাই, ভারতবর্ষের খ্যাত-অখ্যাত কোনও স্থানই বাদ পড়ে না।

অবশেষে বিনয়েন্দ্র বলে—জান মালতী, একটা চমৎকার ড্রয়িংরুম সেট কিনব, বার্ড সাহেবের সেটটা আমার ভারী পছন্দ···

—আমি একটা মিনে-করা টেবিল কিনব কিন্তু, আর একটা মিনে-করা ট্রে, তার উপর একটা সুন্দর ধব্ধবে শাঁখ, মঞ্জুদির বাসায় যেমন আছে···ঘরের একপাশে থাকবে রেডিও···

—আর এক পাশে পিয়ানো, তুমি শিখবে···আর, সেতার শিখবে, না, গিটার শিখবে বল?

মালতী বলে—ধ্যাৎ, বুড়ো বয়সে আমি কি শিখব? দীপু বড় হলে শিখবে···কিছুক্ষণ থামিয়া বলে—তোমার ষ্টাডিতে একটা টেলিফোন থাকবে কিন্তু···

—না বাপু, ষ্টাডিতে নয়, তাহলে সারাদিন কানের কাছে এক যন্ত্রণা, ড্রয়িংরুমেই রেখো।

একে একে মালতীর গহনা, শাড়ী, ব্লাউজ হইতে আরম্ভ করিয়া খোকন, দীপুর পোষাক বিনয়েন্দ্রের রিষ্টওয়াচ সব কিছুরই ফর্দ্দ হইয়া যায়।

বিনয়েন্দ্র বলে— বাঃ রে, মোটরের কথা ভুলেই গেছি···

দুই জনে অসীম পুলকে হাসিতে থাকে, ভবিষ্যতের রঙীন ছবি তাহাদের মনের পর্দ্দায় রঙ ধরাইয়া দিয়াছে, সে-রঙের নেশা লাগিয়াছে তাহাদের নয়নে, রঙীন হইয়া উঠিয়াছে সমস্ত জগৎ। *জীবন এত সুন্দর, এত আলো-ঝলমল!* মালতীর যেন চোখ ধাঁধাইয়া যায়। মস্তবড় বাড়ী, গাড়ী,...হাল্কা রঙের জর্জ্জেট পরনে, পায়ে হাই-হীল 'সু', হাতে ভ্যানিটী ব্যাগ, মালতী মোটরে উঠিতেছে; খোকন, দীপু ঝলমলে পোষাকে সজ্জিত, বিনয়েন্দ্র পরিয়াছে ধব্‌ধবে মূল্যবান্ ধুতি, পাঞ্জাবী, হাতে সোনার ঘড়ি,... চারিদিকে দাস-দাসী সন্ত্রস্ত; মার্কেটে সে যাহা খুশী কিনিয়া যাইতেছে, খোকন, দীপু যাহা চায় তাহাই পাইতেছে, তাহাদের মুখ আনন্দে ঝলমল করিতেছে...জীবনে যাহা কিছু উজ্জ্বল, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কাম্য, সমস্তই তাহাদের আয়ত্তের ভিতরে।

বিনয়েন্দ্রও স্বপ্ন দেখিতেছে—কোথাও এতটুকু অন্ধকার নাই, চতুর্দ্দিক আলোয় আলোময়, শত শত উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে চারিদিকে, চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। নূতন করিয়া যেন মালতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেছে, নূতন জীবন, নূতন স্বপ্ন...মালতী এত সুন্দর! তাহা তো সে এত দিন খেয়াল করিয়া দেখে নাই। দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত মালতীর মধ্যে এই যে সুদূরের মালতী লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা তো সে বুঝিতে পারে নাই। চাকুরী আর সে করিবে না...আঃ! কি সুখ কি শান্তি! আপিসের তাড়া নাই, বড়সাহেবের চোখ-রাঙানি নাই, মাসের শেষে মাহিনার জন্য বুভুক্ষু হইয়া চাহিয়া থাকিতে হইবে না। যত খুশি সাহিত্যচর্চ্চা কর, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র, কালিদাস পড়িয়া দিন কাটাইয়া দাও; বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ব্রীজ খেল, শ্যামল দূর্ব্বাচ্ছাদিত লনে টী-পার্টি দাও; যতক্ষণ ইচ্ছা বসিয়া বসিয়া মালতীর গান শোন, গল্প কর; পুত্র-কন্যাকে লইয়া যতক্ষণ খুশি খেলা করিয়া কাটাইয়া দাও, কেহ বাধা দিতে আসিবে না। অর্থের জন্য সমস্ত দিনটাকে বিকাইয়া দিতে হইবে না।

কল্পনার বন্যায় দুই জন ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে, তাহার প্রতি তরঙ্গে প্রবল উচ্ছ্বাস, প্রতি তরঙ্গ নৃত্য করিতেছে আনন্দোচ্ছল ভঙ্গীতে।

বিনয়েন্দ্র বলে—শোন, মণিকে কয়েকশ' টাকা দিয়ে দেব, ও একটা বিজনেস ষ্টার্ট করতে চায়, এবার বলব ওকে আরম্ভ করে দিতে...চাকরীতে আজকাল তো সুবিধে নেই।

মণীন্দ্র বিনয়েন্দ্রর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মালতী বলে—নিশ্চয়ই, তারপর ঠাকুরপোর একটি বৌ আনতে হবে, বেশ একসঙ্গে থাকব—আচ্ছা, নিরুদিদের কিছু টাকা দিলে হয় না? ওরা বড্ড গরীব, কি কষ্ট বেচারীদের!

—আমাদের ক্লার্ক হরিচরণবাবু সেদিন বড্ড দুঃখ করছিলেন মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না দুশো টাকার জন্যে, খুব ভাল একটা সম্বন্ধ আছে...ভাবছি সে বেচারীকেও কিছু দিয়ে দেব, কি বল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দিও নিশ্চয়ই, আহা! মেয়েটার ভাল বিয়ে হয়ে যাক্।

দুই জনে আজ ঐশ্বর্য্য-লাভের স্বপ্নে পরম বদান্য হইয়া উঠিয়াছে। *তাহাদের যত দুঃখী, যত দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছে, তাহাদের প্রত্যেককেই তাহারা আজ অর্থ বিলাইয়া যাইতেছে অকৃপণ হস্তে।* নিজেদের প্রাচুর্য্যের উপচাইয়া-পড়া সম্পদে জগতের সমস্ত অভাব-অনটন লুপ্ত করিয়া দিয়া একটা পূর্ণ সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত জগতের ছবি তাহারা আঁকিয়া তুলিতে চায়।

মাথার উপরের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, বকুল গাছের তলায় কালো ছায়া চপলা বালিকার মত অস্থির ভাবে নাচিয়া ফিরিতেছে, আম্রশাখায় বায়স-দম্পতীর প্রেম-গুঞ্জন চলিয়াছে; নিমফুলের মদির গন্ধ ঘরের বাতাস মাতাল করিয়া তুলিয়াছে, আকাশের নয়ন-ইসারার মত এক টুকরা কালো মেঘ শ্যাম ধরিত্রীর দিকে প্রেমসজল দৃষ্টিপাত করিতেছে।

বিনয়েন্দ্র হঠাৎ যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠে। খবরের কাগজটা তুলিয়া লইয়া আবার নম্বরটা খুঁজিয়া বাহির করে, মালতীও ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে থাকে—২৭ নম্বর। আঃ—এক—লক্ষ—টাকা! সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে বিনয়েন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠে—ওঃ, তোমার সিরিজ কত? মালতী চমকাইয়া উঠে—সিরিজ? তা তো জানিনে?—

—নিয়ে এসো তো টিকেটটা—

মালতী ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে কম্পিতবক্ষে টিকেটটা বাহির করিয়া আনে। সিরিজের নম্বর মিলাইতে গিয়া বিনয়েন্দ্রের মুখ পাংশু হইয়া যায়, মালতী অপরাধীর মত সরিয়া দাঁড়ায়। দুইজনেই কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। একটা অসহ্য নীরবতা যেন বিরাট পাষাণখণ্ডের মত সমস্ত ঘরের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে; একটা দারুণ অস্বস্তি, দুইজনেই যেন দুইজনের চোখের সম্মুখ হইতে কোনও রকমে সরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। বিনয়েন্দ্র খবরের কাগজটা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতে থাকে, অর্থহীন অক্ষরগুলি যেন কালো কালো ভূতের মত চোখের সম্মুখে বিদ্রূপ করিয়া নাচিয়া বেড়ায়। মালতী অনন্যোপায় হইয়া টেবিলের বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে থাকে, গুছানো বইগুলি আবার গুছাইবার চেষ্টা করে।

সহস্র প্রদীপের আলো যেন হঠাৎ এক ফুৎকারে নিবিয়া গিয়াছে। ঘরটা যেন নিতান্তই স্বল্পপরিসর মনে হইতেছে। এক ঘরেই শোওয়া, পড়া, আবার বন্ধু-বান্ধব আসিলে বসিতে দেওয়া, এটা বড় বিশ্রী। ঘরের পর্দ্দাটা বড় পুরানো; টেবিলটা জীর্ণশীর্ণ, তিনখানার বেশী চেয়ার নাই, না-আছে একটা ফুলদানী, না-আছে ভাল বই—চতুর্দ্দিকের সহস্র অভাব-অভিযোগ যেন সহসা সজীব হইয়া তাহাদের উভয়কে আক্রমণ করে—

বিনয়েন্দ্র হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া ঘড়িটা দেখিয়া বলে—আঃ সাড়ে পাঁচটা বেজে যাচ্ছে, সুধীরবাবুর ওখানে পাঁচটায় পৌঁছবার কথা। তোমার আজকাল আর কোনও কথাই মনে থাকে না

মালতী, আমি দেখছি ক'দিন থেকেই, তোমাকে বলেছি যে বড় জরুরি কাজ আছে, ভদ্রলোক হয়তো কি ভাবছেন!

জুতাজোড়ার ভিতর পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে বিনয়েন্দ্র পাঞ্জাবীটা টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল; পায়ে লাগিয়া ওয়েষ্ট-পেপার-বাস্কেটটা পড়িয়া গিয়াছিল, সেটাকে এক লাথি দিয়া ফেলিয়া দিয়া কি যেন বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

মালতীর চোখে জল টলমল করিতেছিল—তাহার স্বামী যেন আজকাল কি রকম হইয়াছেন, আগে তো এ রকম ছিলেন না!···

পাশের ঘরে দীপু জাগিয়া কান্না সুরু করিয়াছে; খোকন কুল-তলায় ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে কুলের সন্ধান করিতেছে, কাল রাত্রিতে গায় একটু জ্বর-জ্বর হইয়াছিল, এখন একটা ছেঁড়া জামা গায়ে কুল খাইয়া বেড়াইতেছে। মালতী একা আর কত দিক দেখিবে? মালতীর মন তিক্ত হইয়া উঠিল। সংসার-চক্র তাহাকে আবর্ত্তিত করিয়া চলিয়াছে অবিরাম, সে যে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বসিবে তাহারও ফুরসৎ নাই। বৈচিত্র্যহীন সংসারাবর্ত্তে অবিরাম ঘুর-পাক খাইতে খাইতে মালতী যে জগতের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত ঔজ্জ্বল্য, সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই বেদনায় তাহার বুকের ভিতর টনটন করিয়া উঠিল।

দীপু কাঁদিতেছে কাঁদুক, সন্ধ্যা নামিতেছে নামুক; সে আর পারে না। মালতী অবসন্ন ক্লান্ত নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, দূরে গাছের সারি কালোয় একাকার হইয়া গিয়াছে, জোনাকীর আলো যেন আঁধারের বিদ্রূপের হাসির মত ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছে; বাদুড়গুলি অন্ধকারের জয়যাত্রা ঘোষণা করিতে বাহির হইয়াছে দল বাঁধিয়া।*

* বিদেশী গল্পের ভাবাবলম্বনে

সোভিয়েট রুশিয়ায় শিক্ষা-বিস্তার

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এক-একটা খণ্ড প্রলয়ের পর, হয়ত তাহারই ফলে, মানব সভ্যতার ধারা নূতন খাতে পরিচালিত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রাচীন যুগের (খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ১৪১৬ অব্দ ?) কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালে কনষ্টান্টিনোপলের পতন (১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) ও ফরাসী-বিপ্লবের (১৭৮৯) উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের পরেও ইতিহাসের এমনিতর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জার-তন্ত্রের অত্যাচারে জর্জ্জরিত রুশিয়ার সর্ব্বহারার দল অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) পর এক অভিনব রাষ্ট্র এবং সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। জীবনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদের এই প্রথম প্রয়োগ। দীর্ঘ যুগ-নিদ্রার পর রুশিয়ায় গণদেবতার জাগরণ হইল।

এই অভিনব প্রচেষ্টার ফল শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিরোধের অবসান আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। Sherwood Eddy রুশিয়াকে "great laboratory of life" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। পৃথিবীর এই বৃহত্তম দেশের অধিবাসীরা বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ এক দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন নূতন পরীক্ষা চলিতেছে। কিছুদিন পরীক্ষার পর হয়ত ভুল ধরা পড়িল। তখন আবার নূতন করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ইঁহারা বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত লাভ অপেক্ষা উচ্চতর এবং মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। বলিয়া রাখা ভাল যে এই ব্যক্তিগত মুনাফার মোহই পুঁজিবাদী সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রাণ। Stuart Chase-এর কথায় বলিতে গেলে রুশিয়া

"needs no further incentive than the burning zeal to create a new heaven and new earth which flames in the heart of every good communist."

বিগত ২৫ বৎসরের রুশ ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই স্বল্প কালের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে এক অভিনব সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং তাহার প্রভাব কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সর্ব্বক্ষেত্রেই অনুভূত হইয়াছে। এই সংস্কৃতির নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সাম্যবাদী' অথবা 'সোভিয়েট' সংস্কৃতি।

১৯১৮ সালে All Russian Congress of Soviets-এর তৃতীয় অধিবেশনে লেনিন এই সংস্কৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলেন—

"Formerly all human knowledge, all human talent laboured only in order to provide some with the benefits of technique and culture and, on the other hand, to deprive the others of those things which were most essential—education and self-development. But now all the marvels of technique, all the achievements of culture, will become the general property of the whole people, and, from now on, human intelligence and human talent will never again be converted into a means of oppression, a means of exploitation. We know this. Can we then deny that this mighty historical task is worth working for, worth devoting the whole of our strength to? And the toilers will accomplish this gigantic historical labour, for in them lie latent the great forces of revolution, renaissance and regeneration."

অর্থাৎ, পূর্ব্বে মানুষের সমস্ত জ্ঞান এবং মনীষার উদ্দেশ্য ছিল কাহাকেও কাহাকেও সাধন এবং সংস্কৃতির সুবিধা ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া এবং অন্যান্য সকলকে মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য শিক্ষা এবং আত্মোন্নতির সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা। কিন্তু আমরা জানি এখন হইতে সাধন এবং সংস্কৃতির যাবতীয় উপাদান এবং ফল জাতীয় সম্পদ রূপে পরিগণিত হইবে। মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভা মানুষের উপর অত্যাচার এবং মনুষ্য-শোষণের যন্ত্রে পরিণত হইবে না। এ কথা কি

অস্বীকার করা চলে যে এই ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য পালনের জন্য (আমাদের) সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করা উচিত? শ্রমজীবিগণের মধ্যে বিপ্লব, পুনরুজ্জীবন এবং পুনরভ্যুত্থানের শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তাহারা এই বিরাট ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইবে।

সোভিয়েট সংস্কৃতি নিছক গণ-সংস্কৃতি। ইহার স্রষ্টা দেশের জনসাধারণ এবং জনগণের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধন ইহার উদ্দেশ্য। এই সংস্কৃতি গণ-দেবতার আশা-আকাঙ্ক্ষার 'প্রতীক' এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ। সুতরাং ইহার সহিত দেশের ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ রহিয়াছে। অক্টোবর-বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশিয়াতে যাবতীয় মানস-সম্পদ—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিত-কলা, সঙ্গীত—ছিল কেবল মাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের মানসিক বিলাসের উপকরণ। জনসাধারণের তাহাতে অধিকার ছিল না। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংস্কৃতির মহামহোৎসবে আজ সকলের অবারিত দ্বার। সাম্যবাদী সংস্কৃতির ইহাই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কোন সময়েই ভুলিয়া যান নাই যে সংস্কৃতির গোড়ার কথা শিক্ষা। সেইজন্য প্রথম হইতেই তাঁহারা শিক্ষার উপর জোর দিয়া আসিতেছেন। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সংস্কৃতি বিস্তারের প্রধান সহায়। বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গামী ছাত্রসংখ্যা শিক্ষা প্রসারের জন্য রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টা পরমাপের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। এই মাপকাঠির সাহায্যে এইবার বিগত ২৫।২৬ বৎসরের সোভিয়েট রুশিয়া জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে কি বিরাট্ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে দেখা যাউক।

১৯১৪-১৫ সালে রুশ-সৈন্যদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষম ছিল শতকরা মাত্র ৩৮ জন। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩·৩ জন বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। এই সময়ে রুশিয়ার সমস্ত প্রার্থমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৭,০৩০,০০০ এবং ৮৬৫,০০০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। দেশের শিশু এবং তরুণদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই শিক্ষা লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল।

লেনিন বলিলেন, "Civilization—that is what we need to build socialism", তিনি আরও বলিলেন যে সাম্যবাদকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানো দরকার। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা-বিস্তার। অক্ষর-জ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তির পক্ষে যথোচিত ভাবে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা ও সমাধান করা এবং সুষ্ঠুভাবে শিল্প-বাণিজ্য পরি-চালনা করা সম্ভব নহে।

নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টার কোন ত্রুটিই সোভিয়েট সরকার করেন নাই। ১৯১৮ সালে অর্থাৎ অক্টোবর-বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই ১৭ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু গৃহযুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই নীতিকে কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই। ১৯৩০ সালে ষ্টালিন ঘোষণা করিলেন যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের পথে তাহাই হইবে প্রথম পদক্ষেপ।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা (১৯২৮ এবং ১৯৩৩) সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা হয়। বহু সংখ্যক প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সোভিয়েট রাষ্ট্রে যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেক ভাষাভাষীর জন্যই বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

১৯১৪-১৫ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের ছাত্রসংখ্যার হিসাব ধরিলেই বুঝা যাইবে কি বিস্ময়কর ভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছে। ১৯১৪-১৫ সালে আজেরবাইজান, আর্মেনিয়া, তুর্ক-মেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান এবং কিরঘিজিয়াতে ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৩,০০০; ৩৫,০০০; ৭,০০০; ১৭,০০০; ৪০০; ১০৫,০০০ এবং ৭,০০০। আর ১৯৩৮-৩৯এ সে-সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ৬২৭,০০০; ৩০৩,০০০; ২০৫,০০০; ১,১০৬,০০০; ২৫২,০০০; ১,১০২,০০০; এবং ২৯৭,০০০তে দাঁড়াইল!

বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য বহু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৪ সালে সমগ্র রুশিয়ার ২৯৫টি মধ্যম শ্রেণীর কার্য্যকরী বিদ্যালয়ে মোট ৩৬,০০০ বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করিত। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া হইল ৪০০০ এবং তাহাদের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,০০০,০০০।

প্রাক্-সোভিয়েট রুশিয়াতে একমাত্র সম্পন্ন ব্যক্তিগণই প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেন। মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা কেবল মাত্র বিত্তবান্, সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

"If in tsarist Russia elementary education was the privilege of the well-to-do, secondary education was within the means only of the nobility, merchants and government officials whereas university education was the exclusive privilege of the elite."—*P. Yudin's Soviet Culture*, p. 15.

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ার মোট ৯১টি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ১১২,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ১৯৩৯-৪০এ এই সংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছিল যথাক্রমে ৭৫০ এবং ৬১৯,০০০। ইহা ছাড়া আরও ২৫০,০০০ শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রকার উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছিল। ১৯৩৯ সালের আদমসুমারী অনুসারে রুশিয়াতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারীর সংখ্যা ছিল ১৩,০০০,০০০র বেশী। ইহাদের মধ্যে ১ কোটির বয়স ছিল ২৯ বৎসরের কম অর্থাৎ ইহাদের শিক্ষালাভ হইয়া-ছিল সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। এই হিসাব অনু-সারেই দেখা যায় যে উপর দিকে ৩৯ বৎসর বয়স হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই প্রকার দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৭৫২,৮৫১ সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী।

২৫-২৬ বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে আজ রুশিয়ার প্রায় প্রত্যেক শ্রমজীবী এবং কৃষক পরিবারেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই এক জন লোক আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের বহু ছাত্রছাত্রী শ্রমিক এবং কৃষক পরিবার হইতে আসিয়া থাকে।

১৮৯৭ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে রুশিয়াতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ২৪·০ জন (পুরুষ ৩৫·৮+স্ত্রী ১২·৪)। সোভিয়েট-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দশ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে ১৯২৬ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া হয় ৫১.১ জন (পুরুষ ৬৬·৫+স্ত্রী ৩৭·১)। পরবর্ত্তী ১৩ বৎসর এই সংখ্যা আরও বাড়িয়া ৮১·২ জন হয় (পুরুষ ৯০·৮+স্ত্রী ৭২·৬)।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সাধারণতন্ত্রে শিক্ষা-বিস্তারের বেগও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। জার-শাসনের যুগে এ সমস্ত সাধারণতন্ত্রে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্ব্বব্যাপী। ১৮৯৭ সালের লোক-গণনায় দেখা যায় যে 'alien' বা অরুশীয়-দের মধ্যে (অর্থাৎ যাহারা রুশজাতীয় নহে) লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা প্রতি হাজারে ৩৬ জন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে করাসীয় ছাত্র-সংখ্যা ছিল নগণ্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বর্ত্তমান Bashkirian Republic-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত সাধারণতন্ত্রের ছাত্রসংখ্যার শতকরা ১·৪ জন মাত্র ছিল তাতার জাতীয় এবং বাস্কির জাতীয় কোন ছাত্র ছিল না বলিলেও চলে। ১৯১০ সালে উফাগুবার্ণিয়ার বিদ্যালয়-সমূহের মোট ৫০০০ ছাত্রের মধ্যে মাত্র বার জন বাস্কির এবং ২৩ জন তাতার ছিল। উজবেকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১ জনেরও অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। ধর্ম্মযাজক, রাজকর্ম্মচারী এবং বণিকদিগের সন্তান ভিন্ন অপর কাহারও বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার ছিল না। কি হারে শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

সাধারণতন্ত্র	প্রতি হাজারের ছাত্রসংখ্যা		বৃদ্ধি
	১৯১৪	১৯৩৯	
ইউক্রেন	৬৪	১৯০	প্রায় ৩ গুণ
বাইলোরাশিয়া	৫০	২১০	৪ গুণের বেশী
আজেরবাইজান	৩১	২১৯	৭ " "
জর্জিয়া	৬০	২২০	প্রায় ৪ গুণ।
আর্মেনিয়া	৩৫	২৬৩	৭॥ গুণ
তুর্কমেনিস্তান	৭	১৭৭	২৫ গুণের বেশী
উজবেকিস্তান	৪	১৮৮	৪৭ গুণ
তাজিকিস্তান	০·৪	১৭৮	৪৪৫ "
কাজাকস্তান	১৯	১৮৭	প্রায় ১০ গুণ
কিরঘিজিয়া	৭	২১০	৩০ গুণ

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন কারখানা-সংলগ্ন কার্য্যকরী বিদ্যালয়-গুলিতে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতেছিল।

উচ্চশিক্ষার প্রসারের বেগও চমকপ্রদ। ১৯১৪ সালে রুশিয়াতে সর্ব্বমোট ৭১টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। আর তাহাদের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৮৫,০০০। ২৫ বৎসর পরে ১৯৩১ সালে উচ্চবিদ্যালয় এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা হয় ৪৭০টি এবং ৪০০,০০০ জন (বৃদ্ধির হার যথাক্রমে প্রায় ৭ গুণ এবং প্রায় ৫ গুণ)। ১৯১৪ সালে ইউক্রেনের ১৯টি কলেজে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মোট ২৬,৭০০ ছাত্র ছিল। ১৯৩৯ সালে সেই ইউক্রেনের উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৯টিতে এবং তাহাদের মোট ছাত্র-সংখ্যা ১২৭,০০০ জনে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিদ্যার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ গুণ এবং বিদ্যায়তনের সংখ্যা প্রায় আট গুণ বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বে জর্জ্জিয়ার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০ জন ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিত। ২৫ বৎসর পরে সেই জর্জ্জিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া ২১ এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া ২২,৭০০ হয়। অক্টোবর-বিপ্লবের পূর্ব্বে বাইলোরাশিয়া, আজেরবাইজান, আর্মেনিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকস্তান এবং কিরঘিজিয়াতে কোন উচ্চবিদ্যালয় ছিল না। সোভিয়েট সরকার ইহার প্রত্যেকটিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র তরুণের বিদ্যার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। ১৯৪১ সালে জার্ম্মানী যখন রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন একমাত্র ইউক্রেনের বিদ্যালয়সমূহে যত ছাত্র ছিল, অক্টোবর-বিপ্লবের পূর্ব্বেকার সমগ্র রুশিয়াতেও তত ছাত্র ছিল না। ঐ সময়ে একমাত্র কিরঘিজিয়া সাধারণতন্ত্রের বিদ্যালয়-সংখ্যা অক্টোবর-বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী রুশিয়ার পল্লী অঞ্চলের সমুদয় বিদ্যালয় অপেক্ষা অধিক ছিল। আর তাহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯১৪ সালের সমগ্র রুশিয়ার পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-সংখ্যার আড়াই গুণ।

শিক্ষায়-দীক্ষায় রুশিয়া বরাবরই জার্ম্মানীর বহু পিছনে পড়িয়া ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, রুশিয়ার ছাত্রসংখ্যা জার্ম্মানীর ১০ গুণ হইয়াছে। একমাত্র লেনিনগ্রাডেই ফাসিষ্ট-শাসিত সমগ্র জার্ম্মানী অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক ছাত্র ছিল।

পূর্ব্বে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তাজিক, বাস্কির তুর্কমেনিয়ান, কাবার্দিনিয়ান, আদিজিস, চেচেন, কারাকাল্পাক, মর্দভিনিয়ান, নোগাই, ইঙ্গুশ, এবং লেজগিন্ প্রভৃতি ৪০টি জাতির কোন লিখিত ভাষা ছিল না। আজ ইহাদের প্রত্যেকের ভাষার জন্যই বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ছাড়া এমন অনেক জাতি ছিল যাহাদের ভাষার বর্ণমালা থাকা সত্ত্বেও কালে-ভদ্রে তাহার ব্যবহার হইত। বর্ত্তমানে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

উল্লিখিত তুলনামূলক সংখ্যাগুলির কথা মনে রাখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে মাত্র ২৫ বৎসর কালের মধ্যে রুশিয়াতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় যুগান্তর ঘটিয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ২৫ বৎসরের মধ্যে পুরাপুরি ২০ বৎসরও সম্পূর্ণ ভাবে শিল্প, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইতে পারে নাই।

আর ভারতবর্ষ? ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুসারে দেখা যায় যে, প্রায় ২০০ বৎসর ইংরেজ শাসনের পরেও এ দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ১০ জন। কোন কোন প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকিলেও এমন প্রদেশ এখনও আছে যেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। ৪০ কোটি মানুষের বাসস্থান একটা বিরাট উপ-মহাদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ১৯টি (সদ্যপ্রতিষ্ঠিত উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় সমেত এবং 'বিশ্বভারতী' ও পুনাতে ডাঃ কার্ভের "মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়" ব্যতীত)।

সোভিয়েট শিক্ষানীতির সহিত বিগত যুগের রুশীয় শিক্ষা-নীতির এবং অন্যান্য দেশের আধুনিক শিক্ষা-নীতির মৌলিক

পার্থক্য বিদ্যমান। বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয় নাই এমন অথবা স্বশ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী কোন বিষয়ই সোভিয়েট বিদ্যালয়সমূহে শিখানো হয় না। আর ইহারই ফলে এক শ্রেণীর নূতন মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে সোভিয়েট ভূমিতে। এই অভিনব মানুষের দল অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াও প্রায় একক দুর্ব্বার জার্ম্মানবাহিনীর সঙ্গে এ পর্য্যন্ত পাল্লা দিয়া চলিয়াছে।

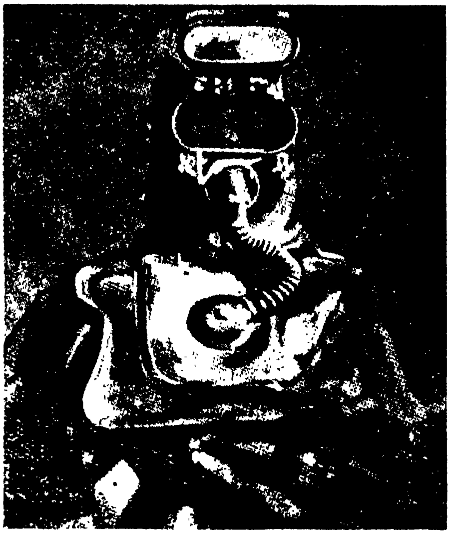
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রুশিয়ার অভিনব সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন-প্রচেষ্টার পরিণাম সম্বন্ধে শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই। কিন্তু এ সত্য অনস্বীকার্য্য যে জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েট-প্রচেষ্টা সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক হইয়াছে।*

* প্রবন্ধে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি Friends of Soviet Union কর্ত্তৃক প্রকাশিত P. Yudin প্রণীত *Soviet Culture* নামক পুস্তিকা হইতে লওয়া হইয়াছে।

মানুষ-টর্পীডো

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আধুনিক যুদ্ধে যে-সকল অভিনব মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদের ধ্বংস-লীলার ভীষণতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা শুনিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। মোটের উপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত ইহাদের ভীষণতার বিষয় আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও



মানুষ-টর্পীডো চালকের মুখোসের কাচের ঢাকনা খুলিয়া দেখান হইয়াছে

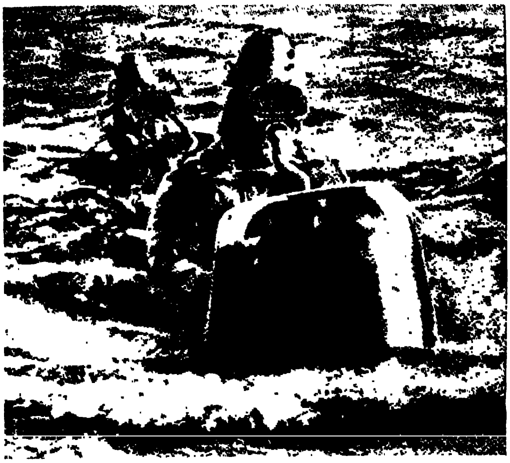
অসম্ভব। টর্পীডো, ট্যাঙ্ক, মাইন, ডেপ্‌থ-চার্জ্জ, বোমারু বিমান প্রভৃতি বর্ত্তমান যুদ্ধে সাংঘাতিক মারণাস্ত্ররূপে অহরহ ব্যবহৃত হইতেছে। বোমারু-বিমান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি যন্ত্রগুলি পূর্ব্বে সুদক্ষ চালক কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইত। বর্ত্তমানে কিন্তু এগুলি আবার চালক-বিহীন যন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ঘটাইয়া তুলিতেছে। অতিআধুনিক উড়ন্ত-বোমা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ট্যাঙ্ক অথবা বিমান-চালক যতই দুঃসাহসী হউক না কেন, প্রাণের মায়া একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে না। চালক-বিহীন যন্ত্রের কিন্তু এ সকল কোন অসুবিধাই নাই। কাজেই চালক-বিহীন-যন্ত্র সাহায্যে বেপরোয়া ধ্বংসকার্য্য চালাইতে পারা যায়। প্রথম যখন উগ্রবিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ মাইন ও টর্পীডো প্রভৃতি মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল তখন লক্ষ্যবস্তুর নিকটে লইয়া গিয়া অল্প দূর হইতে নানা প্রকার কায়দা-কৌশলে ইহাদের বিস্ফোরণ ঘটাইতে হইত। যাহারা এই সকল ধ্বংসকার্য্যে



ব্রিটিশ নৌ-বহরের মানুষ-টর্পীডোর মুখোস পরিহিত চালকদ্বয়

প্রবৃত্ত হইত অনেক সময় তাহারা নিজেরাই বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। অন্যথায়, রক্ষা পাইলেও সহজেই শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিত। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্যই ক্রমশঃ যান্ত্রিক কৌশলে বিস্ফোরণ ঘটাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ মারণাস্ত্রসমূহ যতই ভয়াবহ হউক না কেন ইহাদের গতি-বিধি এবং কার্য্যকারিতা নির্দ্দিষ্ট পথ এবং নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। শত্রুপক্ষের অনিষ্ট ঘটিবার মত কিছু থাকুক বা না থাকুক, যান্ত্রিক কৌশলে পরিচালিত মারণাস্ত্র সে স্থলে আঘাত করিবেই। তাছাড়া অকস্মাৎ কোন বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইলে যান্ত্রিক কৌশলে পরিচালিত মারণাস্ত্র তাহার গতিপথ পরিবর্ত্তন করিয়া বাধা এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য-পরিচালিত মারণাস্ত্র চালকের ইচ্ছামত সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া শত্রুর বহুল পরিমাণে অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। তাছাড়া চালক-বিহীন মারণাস্ত্রগুলি যতই অব্যর্থ হউক না কেন-প্রতিপক্ষ

অনেক ক্ষেত্রেই অতি সহজ উপায়ে ইহাদিগকে ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, নাৎসীদের চুম্বক-মাইনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিছুকাল পর্য্যন্ত চুম্বক-মাইন মিত্রপক্ষের অনিষ্ট সাধন করিবার পর বহু গবেষণার



মানুষ-টর্পীডো অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় অগ্রসর হইতেছে। চালকেরাই পেরিস্কোপের কাজ করিতেছে

ফলে 'ডিগসিং-সিষ্টেমে' ইহাদের উৎপাত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। জার্মান বোমারুর 'ডাইভ্-বমিং' প্রতিরোধের জন্য 'বেলুন-ব্যারেজে'র ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা গেল—নাৎসি বোমারুগুলির সম্মুখ ভাগে ত্রিভুজের মত করিয়া অতি সাধারণ একটি তারের দুই প্রান্ত ডানা দুইটির প্রান্তভাগে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে বোমারু বিমানগুলি অনায়াসে 'বেলুন-ব্যারেজে'র ঝাঁকের মধ্য দিয়া রাস্তা করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। ইহা হইতেই দেখা যায় বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত বিরাট্ পরিকল্পনা কত সহজে ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। এমন যে দুর্দ্ধর্ষ ট্যাঙ্ক তাহাকেও যে কত সহজ উপায়ে নানা ভাবে নাস্তানাবুদ করা হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এলোমেলোভাবে স্থাপিত স্তূপীকৃত কাঁটাতার এক সময়ে সাফল্যের সহিত শত্রুপক্ষের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারিত বটে; কিন্তু পরে দেখা গেল—প্রতিপক্ষ লৌহনির্ম্মিত এক ধরণের অতি হাল্কা মাদুর বিছাইয়া সেই কাঁটাতারের জঞ্জাল অনায়াসে পার হইয়া যাইতেছে।

সকলেই জানেন—উগ্রবিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ সিগারের আকৃতিবিশিষ্ট টর্পীডো এক প্রকার ভীষণপ্রকৃতির মারণাস্ত্র। বিস্ফোরক পদার্থ থাকে ইহার সম্মুখের দিকে। ইহার পিছনের বাকী অংশ অসংখ্য জটিল কলকব্জায় পরিপূর্ণ। ইহার গতিবিধি জলের নীচে। টর্পীডো-বোঝাই ডুবুরি-জাহাজ প্রথমতঃ জলের উপর ভাসিয়া চলিতে চলিতে সমুদ্রবক্ষে শত্রু-জাহাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। অনেক দূরে কোন শত্রু-জাহাজ দেখিতে পাইলে দ্রুত গতিতে তাহার দিকে অগ্রসর হয় এবং দুই-তিন মাইল ব্যবধানে থাকিতে চলতিমুখেই ক্রমশঃ জলের নীচে ডুবিতে থাকে। প্রায় এক মাইল ব্যবধানে কেবলমাত্র পেরিস্কোপটি ছাড়া ডুবুরি-জাহাজের আর কোন অংশই জলের উপর দেখা যায় না। এই অবস্থায় জলের নীচ হইতেই শত্রু-জাহাজ লক্ষ্য করিয়া টর্পীডো ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উচ্চ চাপের আবদ্ধ বায়ুর সাহায্যে টর্পীডো ভীম বেগে ছুটিয়া চলে। জাইরোস্কোপ নামক অপূর্ব্ব যন্ত্র সাহায্যে ইহা নির্দ্দিষ্ট দিক রক্ষা করিয়া জাহাজের জলনিমজ্জিত পার্শ্বদেশে আঘাত করে। বিশালকায় একখানি জাহাজের পক্ষেও একটিমাত্র টর্পীডোর আঘাতই যথেষ্ট। কামান হইতে গোলা নিক্ষেপের মত টর্পেডো ছুড়িতে পারিলেও সমানই কাজ হইত; কিন্তু ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—শত্রুর অলক্ষ্যে নিঃশব্দে কাজ করা। নচেৎ কোন রকমে শত্রুপক্ষের নজরে পড়িলে বিপদ অনিবার্য্য। অবশ্য রেডিও-চালিত চালক-বিহীন মারণাস্ত্রের সুবিধা অনেক বেশী। কারণ রেডিও-তরঙ্গের সাহায্যে বহু দূর হইতেই মারণাস্ত্রকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। রেডিওর সহিত টেলিভিসনের ব্যবস্থা থাকিলে ইহা আরও অধিক পরিমাণে কার্য্যকরী হইতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে রেডিও-টেলিভিসনের ব্যবস্থায় যান্ত্রিক সংগ্রামে কোন্ শক্তি কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় না থাকিলেও প্রচলিত টর্পীডোগুলিকে ঐরূপ ব্যবস্থায় পরিচালিত করিতে পারিলেও অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা কম। কারণ টর্পীডোগুলি জলতলেই পরিচালিত হয় এবং জলের নীচে টেলিভিসনের দৃষ্টিশক্তিও বন্ধ। আকাশ হইতে এরূপ টর্পীডো ছুড়িলেও 'অ্যান্টি-এয়ার ক্র্যাফ্টে'র ভয় থাকিয়া যায়।



পোতাশ্রয়ের জালের বেড়ার কাছে আসিয়া টর্পীডো জালের নীচে নামিয়াছে। একজন জালখানিকে উঁচুতে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং সেই ফাঁক দিয়া টর্পীডো ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

টর্পীডো প্রয়োগ করিবার প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে—প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাইয়া শত্রু-জাহাজ ধ্বংস করা। উগ্রবিস্ফোরক পরিপূর্ণ একটা ভারী বোমা বা বম্বার মত পদার্থই এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু শত্রুর অলক্ষ্যে অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদের জন্যই বহু অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত অসংখ্য জটিল যন্ত্রপাতি টর্পীডো পরিচালনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ বিস্ফোরণ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিও ধ্বংস হইয়া যায়। যাহা হউক, টর্পীডোর



টর্পীডো-বোট জাহাজের নিকটে আসিবার পর টর্ ...টিকে খুলিয়া জাহাজের গায়ে লাগাইয়া দেওয়া হইতে ।

ধ্বংসকারী শক্তি অপরিসীম। টর্পীডোর ভয়ে প্রত্যেক জাহাজ, প্রত্যেক পোতাশ্রয়কে সর্ব্বদা সন্ত্রস্তভাবে থাকিতে হয়। অবশেষে অভূতপূর্ব্ব শক্তিশালী এই মারণাস্ত্রকে প্রতিরোধ করিবার এক সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হইল। টর্পীডোর উৎপাতে বিব্রত শক্তি-সমূহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। অতি সহজ উপায়ে টর্পীডোকে প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। জাহাজের চতুর্দ্দিক শক্ত তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হয়। শয়ান ভাবে প্রসারিত খুঁটির সাহায্যে তারের জাল জাহাজ হইতে কিছুদূরে জাহাজের নীচ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিবার ফলে টর্পীডো আসিয়া জালে আটকাইয়া যায়। কাজেই আর জাহাজের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় ফাঁদে আটকাইয়া শত্রুপক্ষ অবিকৃত অবস্থায় টর্পীডোটাকে সংগ্রহ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারে। কিছুদূর অন্তর অন্তর স্থাপিত অর্দ্ধনিমজ্জিত মাইনের সহিত তারের জাল টাঙ্গাইয়া পোতাশ্রয়গুলিকেও সাবমেরিণ টর্পীডোর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। অবশ্য টর্পীডো-আক্রমণকারীরাও নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। টর্পীডোর সম্মুখ ভাগে স্থাপিত ঘূর্ণায়মান তারকাটা যন্ত্র সাহায্যে তাহারা জালের বাধা অপসরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারও পাল্টা ব্যবস্থা আবিষ্কারের ফলে টর্পীডোর উপদ্রব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, টর্পীডো বা ঐ ধরণের অন্যান্য মারণাস্ত্রের অপরিসীম ধ্বংসকারী শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহাকে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

বর্ত্তমান যুগে অক্ষ-শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই স্বয়ং-ক্রিয় কামান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছে। এই সকল মারণাস্ত্র রেডিও না যান্ত্রিক কৌশলে পরিচালিত হয়, সাধারণ খবর হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব নহে যাহার ফলে হয়ত সর্ব্বপ্রকার মারণাস্ত্রই রেডিও এবং টেলিভিসনের সাহায্যে সুদূর গুপ্তঘাঁটি হইতে অব্যর্থ ভাবে লক্ষ্যভেদ করিবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রচলিত টর্পীডোগুলিকে এরূপ ব্যবস্থায় কার্য্যকরী করা সম্ভব নহে। এই জন্যই বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন ধরণের অভিনব টর্পীডোর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন শক্তির নৌ-বিভাগ বিভিন্ন রকমের টর্পীডো ব্যবহার করিলেও প্রত্যেকটিই মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। এগুলি ঠিক ছোটখাট ডুবুরি-জাহাজের মত। জাপানীরা অনেক দিন পূর্ব্বে একটি মানুষ কর্ত্তৃক পরিচালিত এক প্রকার টর্পীডোর পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিয়াছিল। লোকটি ইচ্ছামত টর্পীডোকে জল-তলে পরিচালিত করিয়া শত্রুপক্ষের অলক্ষ্যে অব্যর্থ ভাবে লক্ষ্যভেদ করিতে পারে। এই মারণাস্ত্রের লক্ষ্যভেদ যেমন অব্যর্থ, টর্পীডো এবং তাহার চালকটির ধ্বংসও তেমনই অব-ধারিত। অর্থাৎ টর্পীডো-চালক মৃত্যু বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু একটি লোক-পরিচালিত এই টর্পীডো যতই কার্য্যকরী হউক না কেন তারের জালে ঘেরা জাহাজে আঘাত করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব না হইলেও তত সহজসাধ্য নহে। কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটিশ নৌ-দপ্তর টর্পীডো-চালক ছয় জন লোকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করায় একথা জানা গিয়াছে যে, ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী দুইটি মনুষ্য চালিত টর্পীডো ব্যবহার করিয়া শত্রুপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। এই ছয় জন টর্পীডো চালক যাহা করিয়াছিল তাহা সত্যসত্যই অতিবড় দুঃসাহসিকতার ব্যাপার।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল সিসিলির পালার্মো বন্দরে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে। পালার্মো পোতাশ্রয়ের বহির্ভাগে সমুদ্রের ঘনকৃষ্ণ জলের মধ্যে দুইটি উঁচু কুঁজবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের মত একটা পদার্থ যেন ধীরে ধীরে পোতাশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বন্দরের প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টিও যে উহাকে সাধারণ একটা কাষ্ঠখণ্ড বা ঐরূপ কিছু বলিয়াই ভ্রম করিয়াছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পোতাশ্রয়ের মধ্যে নাৎসীদের কতকগুলি জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে Ulpio Traiano নামক নবনির্ম্মিত ক্রুজারখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। যাহা হউক, কাষ্ঠখণ্ডের মত পদার্থটি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে বন্দরের প্রবেশ-পথের নিকটবর্ত্তী হইয়াই বুঝিতে পারিল—কিছুদূর অন্তর অন্তর স্থাপিত ভাসমান মাইনের সহিত আটকাইয়া তারের জাল জলের তলা অবধি ঝুলাইয়া প্রবেশপথ সুরক্ষিত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরী। নিখুঁৎ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোথাও কোনরূপ শব্দ হইলে প্রহরীদের কাণে গিয়া পৌঁছায়। কোনও আততায়ীর পক্ষে অলক্ষিত ভাবে এই বেষ্টনী পার হইয়া পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ এই দুঃসাধ্য ব্যাপারকে সহজসাধ্য করিবার জন্যই কাষ্ঠখণ্ডের মত পদার্থটি নিঃশব্দে বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই পদার্থটি আর কিছুই নহে—ব্রিটিশ নৌ-বহরের এক প্রকার অভিনব মারণাস্ত্র—মনুষ্যচালিত সাবমেরিণ-টর্পীডো। ডুবুরীর শিরস্ত্রাণ এবং অক্সিজেন-মুখোস পরিহিত দুই ব্যক্তি এই অভিনব টর্পীডোর

আরোহী। বন্দরের আশেপাশে সমুদ্র জলে নানা প্রকার শ্রবণ-যন্ত্র ওৎ পাতিয়া থাকা সত্ত্বেও শত্রুপক্ষ ইহাদের আগমনবার্ত্তা টের পায় নাই। তাহার কারণ, যে ছোট্ট স্ক্রু-প্রোপেলারের সাহায্যে মানুষ-টর্পীডো অগ্রসর হইতেছিল তাহা হইতে সাধারণ একটি ইলেকট্রিক-ফ্যানের চেয়ে বেশী শব্দ হয় না। যাহা হউক, অর্দ্ধনিমজ্জিত ভাবে ভাসমান টর্পীডোটি জালের বেষ্টনীর নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে জলের নীচে ডুবিতে লাগিল।



টর্পীডোটিকে জাহাজের গায়ে লাগাইবার পর বোট চালাইয়া চালকেরা নিরাপদ স্থানে পলাইয়া যাইতেছে

টর্পীডো জলের নীচে পৌছিবার পর পিছনের আরোহী নামিয়া গিয়া তারের জালটার কিয়দংশ উপরে তুলিয়া ধরিল। তখন সম্মুখের আরোহী টর্পীডোটিকে সেই উন্মুক্ত পথে চালাইয়া জালের ভিতরে উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় আরোহীটি অতঃপর স্বস্থানে আসন গ্রহণ করিবার পর জলের নীচেই টর্পীডো চালাইয়া উভয়ে নবনির্ম্মিত Ulpio Traiano নামক ক্রুজারখানির পাশে উপনীত হইল। পিছনের আরোহীটি পুনরায় অবতরণ করিয়া টর্পীডো-বোটের বিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ সম্মুখভাগ খুলিয়া লইল এবং ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা জাহাজের তলদেশে সংলগ্ন করিয়া 'টাইম ফিউজ' খুলিয়া সরিয়া পড়িল। এইবার তাহারা সম্মুখভাগবিবর্জ্জিত ডুবুরী-যানে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জাল অতিক্রম



লক্ষ্যবস্তুর কিছু দূরে থাকিতেই সাবমেরিণ হইতে মানুষ-টর্পীডো ছোড়া হইতেছে

করিয়া জলের নীচ দিয়াই দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। ইতিমধ্যেই বন্দরে ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে সেই নবনির্ম্মিত ক্রুজারখানি ভীষণ অগ্নি-পরিবেষ্টিত অবস্থায় ধীরে ধীরে জলের নীচে চলিয়া গেল। ক্রুজারখানি মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের অনিষ্ট সাধনের জন্যই প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে একটিও মাত্র আঘাত হানিবার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই সলিল সমাধি লাভ করিল। এই ক্রুজারখানি নিমজ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জেটীর নিকটে ৮৫০০ টনের Viminale নামক আর একখানি জাহাজের গায়েও ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। 'এই জাহাজখানিও এমন ভাবে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, ইহাকে মেরামতের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে টানিয়া লইয়া যাইবার সময়েই নিমজ্জিত হইয়া গেল। তিনখানি মানুষ-টর্পীডো এই অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিল। এই ছয় জন আরোহী সাফল্যের সহিত তাহাদের কাজ শেষ করিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেও সাবমেরিণে ফিরিয়া যাইতে না পারায় ইটালীর উপকূলে অবতরণ করার সময় শেষ পর্য্যন্ত শত্রুর হস্তে বন্দী হয়।

সাধারণ টর্পীডোগুলিকে যেমন সাবমেরিণ বা ডুবুরি-জাহাজে বহন করা হয় এবং দূর হইতেই লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশ্যে চালাইয়া দেওয়া হয় মানুষ-টর্পীডোগুলিও সেইরূপ সাবমেরিণেই রক্ষিত থাকে। কোন লক্ষ্যবস্তুর দুই তিন মাইলের নিকটবর্ত্তী হইয়া সাবমেরিণ হইতে এই মানুষ-টর্পীডোগুলিকে জলে নামাইয়া দেওয়া হয়। অক্সিজেন-মুখোস ও ডুবুরীর শিরস্ত্রাণ পরিহিত দুইটি করিয়া লোক এক একটি টর্পীডোতে আরোহণ করে। টর্পীডো-বোট এমন ভাবে নির্ম্মিত যে চালক দুই জন তাহাতে আসন গ্রহণ করিবার পর তাহাদের শরীরের উপরের অংশ পেরিস্কোপের মত বোটের বাহিরেই থাকে। ইহার ফলে বোটটি জলনিমজ্জিত ভাবে চলিবার সময়ে চালকের চোখ দুইটিই পেরিস্কোপের কাজ করিতে পারে। এইজন্যই চলিবার সময় ইহাকে কুঁজবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের মত মনে হয়। মানুষ-টর্পীডোর সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে নির্ম্মিত। এই সম্মুখ ভাগেই প্রায় ছয় মণ বা ততোধিক পরিমাণ উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ রক্ষিত থাকে। বিস্ফোরক পদার্থ পরিপূর্ণ এই অংশটিকে সাধারণ কীলকের সাহায্যে টর্পীডো-বোটের সম্মুখে আঁটিয়া দেওয়া হয়। বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য এইটিকেই খুলিয়া লইয়া লক্ষ্যবস্তুর গায়ে আঁটিয়া দেয়। আঁটিয়া দিবার পর পলায়ন করিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতে যতটা সময় লাগিতে পারে তদনুযায়ী 'টাইম-ফিউজ' বাঁধিয়া আরোহীরা বোটে চড়িয়া পলায়ন করে। অনেক সময়ই তাহাদের পক্ষে এ অবস্থায় নিজেদের সাবমেরিণে ফিরিয়া আসা সম্ভব না হইলেও টর্পীডো-বোট চালাইয়া নিরাপদে কূলে অবতরণ করিতে পারে। অবশ্য জীবনহানির আশঙ্কা না থাকিলেও শত্রুহস্তে বন্দী হইবার ভয় পুরাপুরিই আছে। সাধারণ টর্পীডো যেমন উচ্চশক্তির এঞ্জিনের

সাহায্যে ঘণ্টায় ৬০ মাইলেরও বেশী বেগে চলিতে পারে, এই মানুষ-টর্পীডোতে সেরূপ এঞ্জিনের ব্যবস্থা থাকে না। ইহা ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে শত্রুর সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া অপেক্ষাকৃত ধীরে এবং নিঃশব্দে চলিবার জন্যই পরিকল্পিত এই ধরণের মানুষ-টর্পীডো যে কেবল জাপানী বা ব্রিটিশ নৌবহর কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে, জানা গিয়াছে যে জার্ম্মান এবং ইটালিয়ান নৌ-বহরও বর্ত্তমান যুদ্ধে এইরূপ মানুষ-টর্পীডো নিয়োগ করিয়াছে। ইটালিয়ানরা জিব্রাল্টার বন্দরে এরূপ মানুষ-টর্পীডোর আক্রমণ চালাইয়াছিল। নাৎসীরাও নাকি একরূপ মানুষ-টর্পীডোর সাহায্যে তারের জালে সুরক্ষিত স্থানে চড়াও হইয়াছিল। তবে অক্ষশক্তি যে এই অস্ত্র সাহায্যে মিত্রপক্ষের অনিষ্ট সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল এরূপ কোন খবর জানা যায় নাই।

ঝড়ের পরে

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

যতীন ডাক্তার নিজের ডিস্‌পেন্সারীতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এই ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে যে-রোগীটি দেখিয়া আসিয়াছে তাহার কথাই ভাবিতেছিল সে। শুধু একটি মাত্র রোগীর কথা বলিলে ভুল হইবে, সারা রতনপুর গ্রামখানি এবং আশেপাশের আরও তিন-চারিখানি গ্রামের কথাই ভাবিতেছিল। ঝড়ের পরে পাখী যেমন তাহার ভগ্ন নীড় পুনরায় বাঁধিতে থাকে তেমনি করিয়া এই মন্বন্তরের পরে যাহারা বাঁচিয়া আছে—গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহারা পুনরায় নিজেদের ঘর-সংসার গোছাইয়া লইতেছিল। নিদারুণ হতাশার পরে প্রাণে এবার খানিকটা বল আসিয়াছে—কারণ ধান ফলিয়াছে মাঠে প্রচুর। কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে নানা অসুখ-বিসুখ আসিয়া এমনি করিয়া চাপিয়া ধরিল সারা দেশটাকে? এই চারি-পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে বলিতে গেলে যতীনই একমাত্র ডাক্তার। সেই বছরদশেক আগে মাইল দুই দূরের থানায় সে কয়েক বৎসর ধরিয়া ছিল নজরবন্দী। তারপর বন্ধন তাহার ঘুচিল বটে; কিন্তু সে আর এদেশ ছাড়িয়া গেল না। নজরবন্দী হইবার পূর্ব্বে ক্যাম্বেল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়াছিল—তাহারও পূর্ব্বে লইয়াছিল স্বদেশ-সেবার দীক্ষা। সংসারে তাহার বন্ধন নাই, তাই সেই সময় হইতে এখানে রহিয়া গিয়াছে জনসেবার জন্য। জনসেবার জন্যই তাহার ডাক্তারী।

সে বসিয়া বসিয়া হিসাব করিতে লাগিল কয়টা মাসে এই কয়খানা গ্রামের মধ্যে কত লোক গেল মারয়া—গণিলে কয়েক শত হইবে নিশ্চয়। হঠাৎ একটু ম্যালেরিয়া জ্বর হইল—কি একটু সর্দ্দি-কাস, একটু পেটের অসুখ এমনি যে-কোন ছলছুতায় যেন লোক এ সংসার হইতে চিরবিদায় লইতে লাগিল। না খাইয়া না খাইয়া জীবনীশক্তি শেষ হইয়া আসিয়াছে—কিছু একটু হইলেই আর সামলাইতে পারে না। তা ছাড়া কলেরা আর বসন্ত ইহাদের তো কথাই নাই। বিশেষতঃ সারা দেশ ছাইয়া এবার বসন্ত দেখা দিয়াছে। মাস ছয়েক আগে ডিস্‌পেন্সারীতে তাহার অন্ততঃ হাজার দুই টাকার ঔষধ ছিল। কিন্তু আজ সারা ডিস্‌পেন্সারী কুড়াইয়া একটা কঠিন রোগীরও যে দুই দিনের ঔষধ দিবে—সে উপায় নাই। এই কয়টা মাসে নিঃশেষ করিয়া সমস্ত ঔষধ এই কয়টি গ্রামের রোগীদের জন্য ঢালিয়া দিয়াছে।

যতীন ডাক্তারী শিখিয়াছিল কিন্তু ব্যবসাদারী শিখে নাই—আর মূলেও তাহার ব্যবসাদারী উদ্দেশ্য ছিল না। জনসেবাই সে চাহিয়াছিল—জনসেবাই সে করিতেছিল। তাই জোর করিয়া কোন রোগীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারিত না। তা ছাড়া যে বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে যাইত, ক্রমে ক্রমে সেই বাড়ীতেই এমনি অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া যাইত যে, শেষটায় অন্নারম্ভ হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই তাহাকে পরামর্শ দিতে হইত। কাজেই ঔষধের দাম তাহার আর আদায় হইত না। তা ছাড়া ইহারা যে কত গরীব কত অসহায় তাহা জানিতে তো যতীনের বাকী ছিল না, তবু কোন প্রকারে এ কয়টি বৎসর চলিয়াছে কিন্তু গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে খড়কুটাকে যেমন করিয়া ঘূর্ণি হাওয়া উড়াইয়া লইয়া যায় তেমনি করিয়া কাহাকে কোথায় যে লইয়া গেল, কয় মাস আর তাহার উদ্দেশই রহিল না। যতীন প্রথম প্রথম খানিকটা চেষ্টা করিয়াছিল মানুষগুলিকে কোন রকমে বাঁচাইতে পারা যায় কিনা কিন্তু কি তাহার সাধ্য—কি সে করিতে পারে? তাই হাল ছাড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তারপর আজ ছয়টা মাসের ভিতরে যাহারা ক্রমে ক্রমে আবার দেশে ফিরিয়া আসিল যতীন তাহাদেরই সেবায় লাগিয়া গেল। কিন্তু এখন সমস্যা হইয়াছে—বিনা ঔষধে কি করিবে সে। কোথায় মিলিবে টাকা আর টাকা মিলিলেও যে ঔষধ মিলিবে এমন কোন সম্ভাবনাই নাই। এই ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে যে নিউমোনিয়া-রোগীটি দেখিয়া আসিয়াছে—তাহার কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবার তাহার উপায় নাই। যে ছোক্‌রা তাহার রান্না করিয়া দিত, ঘরদোর পরিষ্কার রাখিত সে কখন আসিয়া চায়ের কাপ টেবিলের উপরে রাখিয়া গিয়াছিল; কিন্তু যতীনের সেদিকে খেয়াল মাত্র ছিল না; কাপের ভিতরে চা জুড়াইয়া জল হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ বাহিরের আবছা অন্ধকারে যেন কাহার ছায়া ভাসিয়া উঠিল।

যতীন প্রশ্ন করিল—কে ওখানে?

ছায়াটি ধীরে ধীরে একপাশে সরিয়া গেল।

যতীন পুনরায় বলিয়া উঠিল—কে ওখানে—কথা কইছ না কেন?

তথাপি কেহ কোন কথা কহিল না। যতীন বাহিরে আসিয়া দেখে এক পাশে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে।—কে তুমি—কি চাই—কথা বলছ না কেন?

অস্ফুটস্বরে মেয়েটি জবাব দিল—আমি সরলা।

সরলা ?

কোন্ সরলা ?

মেয়েটি পুনরায় বলিল—পাল-পাড়ার সরলা।

—ও—তুমি ? ঘরে এসো।

ঘরের ভিতরে আসিয়া ডাক্তার নিজের চেয়ারে বসিয়াছিল। সরলা টেবিলের পাশে তাহারই পায়ের কাছে বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছিল। অনেক কথা ডাক্তারের মনে উঠিতে লাগিল—সরলা শশী পালের বোন। ছোটবেলায় বিধবা হইয়া ভাইয়ের সংসারে এতকাল কাটাইল। আজ বয়স তাহার বছর বাইশ-তেইশের কম নয়। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত সপ্রতিভ। ভাইয়ের সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়াও পাড়ার আর দশ জনের সাহায্য সে যথাসাধ্য করিয়া বেড়াইত। বিশেষতঃ যেখানেই অসুখ-বিসুখ হউক অমনি তাহার ডাক পড়িত—সরলা আসিয়া রোগীর ভার লইলে বাড়ীর লোকে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। এমনি বহু দিন যতীন ডাক্তারী করিতে গিয়া সরলাকে দেখিয়াছে—তাহাকে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিবার নানা উপদেশ দিয়াছে। মেয়েটির সৎস্বভাবের জন্য, পরোপকার-প্রবৃত্তির জন্য সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তারপর যখন সারা দেশ জুড়িয়া হাহাকার পড়িল—তখন এক দিন এই সরলারও পতন হইল। তার পর হইতে এই মেয়েটির কথা ডাক্তার অনেক বার ভাবিয়াছে—ভাবিয়া দুঃখ পাইয়াছে। সরলার অপরাধ যতই হোক—তাহার ভাই শশীই যে এজন্য বিশেষ করিয়া দায়ী—একথা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাল যখন এক টাকা সেরে আসিয়া দাঁড়াইল—তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের স্ত্রী ও ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া শশী এক দিন রাত্রে আট-দশ মাইল দূরে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে পলাইয়া গেল। ছোট বোনটি যে এত দিন তাহার সংসারে খাটিয়া মরিল—তাহার কথা একটি বারও ভাবিয়া দেখিল না। সরলা কত দিন অনশনে অর্দ্ধাশনে কাটাইয়াছে তাহার কোন খবরই ডাক্তার জানিত না—কাহারও খবর তখন লইবার মতো অবস্থাও তাহার ছিল না। পথে ঘাটে মাঠে প্রতিদিন পাঁচ-সাতটি করিয়া মানুষ মরিয়া পড়িয়া থাকিত। সমস্ত গ্রাম ভাঙিয়া যে যে-দিকে পারিতেছিল স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পলাইতেছিল। ডাক্তার নানা কাজে তখন কি করিয়া এই সর্ব্বনাশের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইতে পারা যায় সেই চেষ্টায় ছিল। কিছুদিন ধরিয়া এই অঞ্চলে কয়েক জন বিদেশী লোক মিলিটারীর মালপত্র খরিদ করিবার জন্য ঘোরাফেরা করিতেছিল—হঠাৎ এক দিন শুনিতে পাওয়া গেল তাহাদেরই এক জনের সহিত সরলা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। খবরটি শুনিয়া ডাক্তার আঘাত পাইয়াছিল। সেই হইতে আর সরলার খবর কেহ জানিত না। শশী কিছুদিন হইল শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় সংসার পাতিয়াছে।

সহসা ডাক্তার মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত দিন কোথায় ছিলে সরলা ?

সরলা কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না—পরে মুখ তুলিয়া বলিল—সব কথা তো বলতে পারবো না দাদা !

ডাক্তার বলিল—তবু যেটুকু বলা চলে তাই বল ?

—কয়েকটা দিন যেতেই নিজের অন্যায়কে অন্যায় বলে বুঝতে পারলাম। পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। পথে পথে না খেয়ে ঘুরতে লাগলাম কিন্তু পেটের জ্বালার চাইতে অনুতাপের জ্বালাই হ'ল আমার বড়। মনে ভাবলাম—আত্মঘাতী হব—কিন্তু সাহস পেলাম না। তারপর কিছুদিন পরে আমাদের মহকুমা শহরটিতে এসে পৌছলাম। সেখানকার স্বদেশী বাবুরা অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা আশ্রম করেছিলেন। সারা ভারতবর্ষের বড় বড় মেয়েছেলেরা নাকি টাকা তুলে—শহরে শহরে এমনি অনাথ আশ্রম খুলেছেন। আমাদের মহকুমা শহরটির অনাথ আশ্রমের ভার ছিল যাঁর উপরে তিনিও মেয়েছেলে—তাঁকে গিয়ে ধরলাম—কেঁদে সব কথা তাঁকে জানালাম—তিনি দয়া করে আমাকে আশ্রয় দিলেন। আশ্রমে থাকতাম—ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করতাম—রোগে সেবা-শুশ্রূষা করতাম—এমনি করে দিন কাটছিল কিন্তু আজ দিন কয়েক হ'ল—সে আশ্রম উঠে গেছে—ভাবলাম কোথায় যাই—গ্রামের কথাই সকলের আগে মনে পড়ল—কিন্তু গ্রামে কি কেউ আমাকে ঠাঁই দেবে একথাও মনে এল। তখন ভাবলাম আপনার কথা—আপনি যে অগতির গতি—একথা তো আমি ভাল করেই জানি—তাই আপনার পায়ের তলায়ই এলাম দাদা—আমার একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। বলিয়া মেয়েটি পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ বোন—কোন ভয় নাই তোমার। আপাততঃ এখানেই থাক তুমি—দেখি কি করতে পারি। তারপর ছোকরা চাকরটিকে ডাকিয়া বলিল—আমি বেরুচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে—আমার ভাত একে খেতে দে—আর আমার জন্যে চাট্টি ভাতে সেদ্ধ ভাত তুলে দিয়ে রাখ—আমি ঘুরে এসে খাব। বলিয়া ডাক্তার বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

২

একটা বাড়ীর নিকটে আসিয়া যতীন ডাকিতে লাগিল—কবরেজ বাড়ী আছ নাকি—কবরেজ ? ভিতর হইতে কে চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে ?

—যতীন জবাব দিল—আমি যতীন ডাক্তার। হৃদয় বাড়ী আছ নাকি ?

ভিতর হইতে হৃদয় জবাব দিল—সবুর কর, আসছি।

মিনিট খানেকের মধ্যে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হে ব্যাপার কি। এই রাত করে যে ?

—একটা রুগী দেখতে যেতে হবে—নিউমোনিয়া কেস।

হৃদয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তা আমাকে যে ?

—হাঁ তোমাকেই—কারণ আমি আজ হাতিয়ার শূন্য—আমি "ডায়গনোসিস" করে দেব, তুমি তোমার মতো ওষুধ দেবে—নাও আর দেরী করো না—কিছু ওষুধ বেঁধে নিয়ে চল—রোগীর অবস্থা ভাল নয়—যে-কোন সময় "হার্টফেল" করতে পারে।

পথে নামিয়া হৃদয় বলিল—আমাদের ওষুধ বিশ্বাস হবে তো যতীন।

—যে-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিনে—তা নিয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

—তবে আমাকে ডাকছ কেন?

—ডাকছি—আমি নিজে নিরুপায়—তুমি যদি কিছু করতে পার। তবে একটা কথা, এবার ঠিক বুঝেছি ভাই—ডাক্তারীই হোক আর কবিরাজী ওষুধ যাই হোক, আমরা ব্যবহার করব, আমাদের দেশে তৈরী হওয়া চাই—এমনি করে বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকার যে কি ফল তা ত এবার স্পষ্টই দেখতে পেলাম।

রোগী দেখিয়া ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। ফিরিবার পথে হৃদয় প্রশ্ন করিল—আচ্ছা এমনি যদি হয়—অর্থাৎ ডাক্তারী শাস্ত্র দেখে রোগ নির্ণয় কর—আর কবিরাজী শাস্ত্র দেখে ওষুধ দাও—তা হলে কেমন হয়?

যতীন হাসিয়া বলিল—কিন্তু ডাক্তারী ভাল ভাল ওষুধ আর ইনজেক্‌শানগুলো অপরাধ করলে কি?

—বেশ, যথাসম্ভব সেগুলোও না হয় সঙ্গে রাখ।

যতীন বলিল—তাতে ডাক্তারী শাস্ত্রের অন্ততঃ জাত যাবে না—এ কথা তোমায় আমি বলতে পারি। দেখছ না বড় বড় এলোপ্যাথিক ওষুধের ফার্ম্মেসী—আজকাল মকরধ্বজ আর চ্যবন-প্রাশ বের করছে? তবে চিকিৎসা ব্যাপারে কিছু ওলটপালট করতে হলে রাজশক্তি চাই, কাজেই এ বিষয়ে এখন আমাদের বেশী কিছু ভাববার আছে বলে মনে করি না। কিছু দূরে আসিয়া পথের একটি বাঁকে যতীন সহসা থামিয়া গেল।

হৃদয় বলিল—থাম্‌লে যে?

—ছেলেটি মারা গেল।

—কে?

—রাইপুরের করিম সেখের ছেলে। শুন্‌ছ না কান্নার শব্দ আসছে?

পুনরায় চলিতে চলিতে যতীন বলিতে লাগিল—কিছু করতে পারলাম না, অথচ যখন ওষুধ ছিল তখন এমনি কেস কত ভাল করেছি। শিশি ভরে ওষুধ দিয়েছি বটে, কিন্তু সে ত প্রায় সাদা জলের সামিল। নিজেকেই যে অপরাধী মনে হয় ভাই।

বাসায় ফিরিয়া দেখে সরলা তাহার ডিসপেন্সারী-ঘরে একটা মাদুর পাতিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যতীন দরজা ভেজাইয়া দিয়া নিজের ঘরে গিয়া আহার করিয়া শুইয়া পড়িল।

৩

পরের দিন শশীর সহিত তাহার ঝগড়া হইয়া গেল। শশী একেবারে বাঁকিয়া বসিল অমন দুশ্চরিত্রা বোনকে সে কিছুতেই আর ঘরে লইবে না। যতীন তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছে, ভয় দেখাইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। ইহার পর ক্রমাগত কয়েক দিন ধরিয়া সরলার বিষয় ভাবিয়া কোন পথই খুঁজিয়া পায় নাই। যে মরণ-দূতের আনাগোনা ইতিপূর্ব্বে পাড়ায় পাড়ায় দুই একদিন অন্তর চলিতেছিল তাহারই পদ-ধ্বনিতে এখন সারা গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল অর্থাৎ ইতিমধ্যে কলেরা এবং বসন্ত একেবারে আসর জমাইয়া তুলিল। কলিকাতা হইতে কিছু ওষুধপত্র ও বসন্তের "ভ্যাক্‌সিন" পাওয়া গিয়াছিল তাহার সহিত হৃদয়ের কবিরাজী ওষুধ মিলাইয়া যতীন ও হৃদয় চিকিৎসায় নামিয়া পড়িল। দুই বন্ধুর পণ হইল আমৃত্যু তাহারা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেখিবে।

এমনি করিয়া মাস দুয়েকের মধ্যে কয়খানি গ্রামের এক চতুর্থাংশ লোককে নিজের গহ্বরে টানিয়া লইয়া মৃত্যুদূতের খানিকটা শ্রান্তি দেখা দিল। এই দুইটি মাসের ভিতরে যতীনের অন্য কোনদিকে দৃক্‌পাত করিবার মতো অবসর ছিল না, সরলার কথাও সে আর চিন্তা করে নাই। শেষবেলায় বাসায় ফিরিয়া আজকাল দেখে আহার্য্য তাহার পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, স্নানের জল ঠিক আছে। রাত্রেও তেমনি করিয়া আহারের সামগ্রী ঠিক করিয়া রাখা থাকে, বিছানা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া পাতা থাকে। পূর্ব্বের মত ধূলিমলিন বিছানার চাদর আর খাটের একপাশে দড়ির মত জড়াইয়া পড়িয়া থাকে না। আহারে বসিয়া কোন কোন দিন যতীন বুঝিতে পারে ইহা নিশ্চয়ই তাহার ছোক্‌রা চাকরটির কাজ নয়, ইহার পশ্চাতে সরলা আছে। মাস দুই পরে হঠাৎ এক দিন হৃদয় আবিষ্কার করিয়া বসিল গ্রামে যতীন আর সরলাকে লইয়া একটা দুর্নামের কাণাঘুষা চলিতেছে। খবর শুনিয়া যতীন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল।

দুই চোখ রাঙা করিয়া বলিল—বল ত কোন্‌ হারামজাদা বলে তার মাথাটা আমি ভেঙে দেব নিশ্চয়!

হৃদয় তাহাকে থামাইয়া বলিল, ফল তাতে কিছু হবে না তার চেয়ে এই আপদটাকেই বিদেয় কর না কেন?

যতীন বলিল—বিদেয় কেমন করে করব, যুবতী মেয়েছেলে কোথায় আবার কোন্‌ খারাপ লোকের হাতে পড়বে শেষে।

অনেক ভাবিয়া হৃদয় বলিল—বিধবা-বিয়ে দাও না—সব হাঙ্গামা মিটে যাক্‌।

যতীন বলিল—কিন্তু সরলা রাজী হলে তো হয়!

—কেন রাজী হবে না শুনি—এমনি করে পথে পথে বেড়ানোর চেয়ে সে ভাল নয়?

কয় দিন ধরিয়া যতীন সরলাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছে, কিন্তু সরলা রাজী হয় নাই। অবশেষে সে রাগিয়া তাহাকে গালমন্দ পর্য্যন্ত দিয়াছে, সরলা কথাটি না কহিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিয়াছে।

কিছুদিন পরে পুনরায় একদিন হৃদয় আসিয়া বলিল—তোমার কথায় তো আর গ্রামে কান পাতা যায় না হে। কি আশ্চর্য্য—যাদের জন্যে তুমি এত করলে—তারা নিঃসন্দেহে তোমাকে অসচ্চরিত্র ঠাওরালে। যতীন অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—কিন্তু বুলি তো রোজ রোজ ঝাড়ছো খুব—বল্লাম একটা পাত্র ঠিক করে দাও।

—কিন্তু সরলা যে রাজী নয়?

—তুমি ঠিক করতো, রাজী না অরাজী, সে আমি বুঝব।

ইহারই দিনদশেক পরে সত্যই হৃদয় একটি পাত্র ঠিক করিয়া ফেলিল। পাত্রটি পাশের গ্রামের বনমালী পাল—বয়স তাহার বছর পঁয়তাল্লিশের বেশী নয়—সংসারে তাহার গুটিকয়েক ছেলে-মেয়ে আছে। সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে—তাই বিবাহের

প্রয়োজন। কোন খরচপত্র লাগিবে না—উপরন্তু যতীনের মতো একজন পরোপকারী লোক হাতে থাকিবে, তাই বিধবা-বিবাহে রাজী হইয়াছে।

সরলার কোন প্রকার অসম্মতিতে কাণ না দিয়া যতীন বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলা হইতে সরলাকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যতীন বিব্রত মুখে হৃদয়ের নিকট আসিয়া বলিল—এখন উপায়?

হৃদয় হাসিয়া বলিল—তোমার কি, আপদ যখন অমনি অমনি বিদেয় হয়েছে—এই তো ভাল। বনমালীকে একটা খবর পাঠিয়ে দাও—বিয়ে হবে না—চুকে গেল ল্যাঠা। কিন্তু যতীনের মন মোটেই ভাল লাগিতেছিল না—কোথায় গেল মেয়েটি? নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তো আসিয়া তাহার আশ্রয় লইয়াছিল—আজ প্রকারান্তরে সে-ই তো তাহাকে তাড়াইয়া দিল। তাহার অসম্মতিতে এমনি জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া ছাড়া কি আর কোন পথই ছিল না? সারাটা রাত্রি যতীন ঘুমাইতে পারিল না।

পরের দিন সন্ধ্যার পরে ডিস্পেন্সারীতে ঢুকিয়া দেখে—সরলা এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। যতীন খানিকক্ষণ বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—কাল থেকে কোথায় ছিলে?

সরলা মুখ নীচু করিয়া জবাব দিল—নদীর ধারের জঙ্গলের ভিতরে পালিয়েছিলাম।

—কেন পালিয়েছিলে শুনি?

সরলা এবার তাহার দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল—তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনাকে তো আমি ছোট মনে করে আশ্রয় নেই নাই দাদা?

—কিন্তু আমাকে এমনি করে অপমান করলে কেন—বলতে পার?

—অপমান? অপমান আপনার হয় নি দাদা! কিন্তু আমার অন্তরটার দিকে তো একবার ফিরেও তাকান নি। অপরাধ আমার সেদিন হয়েছিল সত্যি কিন্তু পেটের জ্বালায় সেদিন তো ন্যায়-অন্যায় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। যেদিন পাপের অন্ন পেটে গেল—সেই দিনই বুদ্ধি আমার ফিরে এলো—তাই তো সেখান থেকে পালিয়ে মরতে গিয়েছিলাম। আজ আপনার ব্যবস্থাও তো তাই দাদা—দুটি অন্নের জন্য আজ এই বিয়ের ছল। যে-কোন প্রকারে আজ আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চান্ বলেই তো—অমন একটা অসৎ লোকের কাছেও আমাকে সঁপে দিতে একটুও আপত্তি করেন নি?

—কিন্তু গ্রামময় যে আমার নামে কি সব দুর্নাম রটে গেছে—শুনেছ বোধ হয়?

—দুর্নামের ভয়? যারা নিজেদের ক্ষুদ্র সংসার নিয়ে ব্যস্ত—মনের এতটুকু উদারতা যাদের নাই—তাদের মত এই মিথ্যে দুর্নামের ভয় করবেন আপনি? শক্তি আপনার আছে—সাহস নাই। আজ আমাকে হাত ধরে নিয়ে দাঁড়ান দেখি সকলের সামনে—বলুন—ও আমারই বোন্—দেখি কে অস্বীকার করতে পারে? রোগে শোকে ভুগছে যারা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান তাদের ঘরে ঘরে সেবা-শুশ্রূষার জন্যে—দেখি কে অস্বীকার করে?

সহসা বাহির হইতে দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল হৃদয়।

হাসিয়া বলিল—আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম—সব শুনেছি। তোমার কথাই সত্যি বোন—আমরা কোন পথই খুঁজে পাই নি—তুমিই তো সত্যিকারের পথ দেখিয়ে দিয়েছ। কাল থেকে গ্রামের সমস্ত রোগীর—দুঃখীর ভার নেবে তুমি! আমাদের দু-ভায়ের তুমি হবে উপযুক্ত বোন। যতীন ও সরলা বিস্মিত হইয়া হৃদয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম্-এ, পিএইচ-ডি

আধুনিক কথাসাহিত্য নূতন প্রাণের স্পন্দনে নব নব ভাবের হিল্লোলে গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবনের, রাষ্ট্রের ও সমাজের নানা সমস্যা কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং আধুনিক কথাসাহিত্য কোথায়ও বা সমাজের কঠোর নিষ্পেষণে নিপীড়িত ব্যক্তির সংগ্রাম ফুটাইয়া তুলিয়া, কোথায়ও বা ধনীর চরণে দলিত অসহায় মূকের বেদনার করুণ কাহিনীকে ভাষা দিয়া, কোথায়ও পতিপত্নীর প্রেমহীন সুখস্বপ্নের মধ্যে বাস্তবের করাল ছায়াকে টানিয়া আনিয়া নূতন নূতন রসে মানুষের হৃদয় পরিপূর্ণ করিতেছে। তাই আধুনিক কথাসাহিত্যের একটা বড় উপকরণ মানবজীবনের নিত্য নূতন সমস্যা। মানব-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার মানুষ তাহার আদিম জীবনের ছোটখাট সুখ-দুঃখ লইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না; জীবনের পথে তাহাকে বহু কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্য দিয়া যাত্রা করিতে হইতেছে। সুতরাং জীবনযাত্রায় ক্ষতবিক্ষতদেহ মানুষের সমস্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ইহা সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট হইয়াছে আজিকার রাষ্ট্র, সমাজ ও সাংসারিক জীবনে।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কথাসাহিত্যে ছিল একটা সার্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বকালীনতা অর্থাৎ উহার মধ্যে এমন একাংশ ছিল যাহা সকল যুগে সকল মানবের পক্ষে সমান ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারিত। কথাসাহিত্যের এই সার্ব্বজনীন সুর বহুদিন ধরিয়া উহার প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে রচিত গল্প ও উপন্যাসেও এই সার্ব্বজনীনতা ও বিশ্ব-কালীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা মানুষের জীবনের প্রেম, হাসি-কান্নায় মধুর ও সমুজ্জ্বল। কিন্তু আধুনিক যুগের বিভিন্ন ভাবধারা হইতে যে-সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহারও বহুল প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে।

আধুনিক জীবনের একটি জটিল সমস্যা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

বনাম ব্যক্তিতন্ত্রের প্রাধান্য। কেহ বা বলিতেছেন যে সমাজের নির্ম্মম পেষণে মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ববোধ নষ্ট হইয়া গিয়া কতকগুলি যন্ত্রের সৃষ্টি হইবে, আবার কেহ বা বলিতেছেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের সৃষ্টি করিবে। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ আদর্শ 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ। সে মানুষমাত্রেরই ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলে, কাহারও স্বাতন্ত্র্যের দাবির উপর নিজের ব্যক্তিত্বকে চাপাইতে চাহে না ; তাহার জীবনের ভিতর এতটুকু বিশৃঙ্খলা, এতটুকু অসামঞ্জস্য নাই। ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতী আর একটি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র পরেশবাবু—একান্ত আদর্শবাদী পুরুষ, সুতরাং অন্যের তুলনায় কতকটা নির্জ্জীব। ইহার ঠিক বিপরীত চরিত্র রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে"র সন্দীপ, ব্যক্তিত্বের খেয়ালকে সে সবার উপর স্থান দিয়াছে, সে সমাজ-জীবনে একটা বিপ্লবের প্রতীক ; সভ্যজগতে যে উগ্র বাস্তববাদ বা ভোগবাদের অভিনয় চলিয়াছে, যাহার পেষণে নীতি, সংস্কার, ধর্ম্ম, এমন কি প্রেম সকলই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহারই সংহারমূর্ত্তির একটি রূপবিগ্রহ সন্দীপ, আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্যমানবের ধর্ম্মলেশহীন সংস্কারমুক্ত উদ্দাম ভোগ-লালসার প্রতিমূর্ত্তি। ব্যক্তিত্বের খেয়ালের জন্য আধুনিক সমাজে যাহারা সমস্ত শৃঙ্খলাকে পদদলিত করিতে চায়, সন্দীপ তাহাদেরই চরম পরিণতি।

বাংলাদেশের তথা ভারতের সমাজে ব্যক্তির পূজাই চলিয়া আসিয়াছে, সমষ্টি অপেক্ষা ব্যষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়াই এ দেশের রীতি। যেখানে সমাজ বড় নির্জ্জীব ও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক, সেখানে সম্ভব হইলেই ব্যক্তির অভিযানকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে এই কথাটাই বার বার বলিতে চাহিয়াছেন। চারিধারের নির্জ্জীব, অনুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রার মধ্যে 'গোরা'র ব্যক্তিত্ব, তাহার বিরাট্ চাঞ্চল্য ও অনলস জীবন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং তাহার সম্বর্দ্ধনা এ সমাজে অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'গোরা' একটি বিরাট্ মানব, নানা ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, অনুভূতির সঙ্কীর্ণতা ও গভীরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল গুণ বাঙালী তথা ভারতীয় চরিত্রে দুর্লভ বলিয়া তাহার অভিযান এমনই জয়যুক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যে একটা সমস্যা এখন বেশ প্রাধান্য-লাভ করিয়াছে, উহা শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্বের সমস্যা। প্রথমতঃ, রুশিয়ার সাহিত্যেই গোর্কি প্রভৃতির রচনায় ইহার প্রতিষ্ঠা, পরে ধনিক পরিচালিত দেশ মাত্রেই কথা-সাহিত্যে ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ারের 'অয়েল', 'জাঙ্গল' প্রভৃতি রচনায় ইহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা কথা-সাহিত্যে উহার আগমন এখনও তেমন ভাবে সূচিত হয় নাই ; উহার কারণ বোধ হয় বাংলাদেশ তথা ভারত এখনও তেমন শিল্পপ্রধান দেশ হইয়া উঠে নাই, যান্ত্রিক জীবনের যে সংঘাত তাহা এখনও এখানে তেমন ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই ; কিন্তু এই সংঘাতের সূচনা ক্রমেই দেখা দিতেছে, সুতরাং কথাসাহিত্যে উহার আগমনও মাত্র সময়সাপেক্ষ, বিশেষ বিলম্ব হইবে বলিয়াও মনে হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে বাংলা কথাসাহিত্যে জমিদার ও রায়তের বিরোধ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে ; এই সমস্যা বাংলার এবং ভারতের অন্য কোন কোন প্রদেশের বিশেষ সমস্যা। সুতরাং বাংলা ভাষায় জমিদার ও রায়তের বিচিত্র সম্পর্ক লইয়া বহু উপন্যাস ও গল্প রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি গল্পগুলিতে জমিদার ও রায়তের বিরোধ-সমস্যা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে ; প্রজার পক্ষ লইয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য শশিভূষণের অদম্য চেষ্টা, তাহার বিফলতা ও শেষ পরিণাম এই সমস্যাকে করুণ ও মর্ম্মন্তুদ করিয়া তুলিয়াছে।

এই মর্ম্মেরই আর একটি সমস্যা বাংলা তথা ভারতীয় কথা-সাহিত্যের সহিত জড়িত হইয়াছে, উহা বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান। পরাধীন দেশে যখন শত বন্ধনের নাগপাশ নানাভাবে পীড়ন করিতে থাকে তখনই সাহিত্যে তাহার প্রকাশ হইতে বাধ্য। ইহা পরাধীন দেশের এক বিরাট্ সমস্যা। আমলাতন্ত্রের সহিত সমস্ত দেশবাসীর বিরোধ বঙ্কিম-চন্দ্রের সময় হইতেই কথাসাহিত্যে দেখা দিয়াছে,—'আনন্দ-মঠ'ই এই সাহিত্যের অগ্রদূত। কিন্তু ইহার পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরায়'। বিদেশী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তর্জ্জন-গর্জ্জন বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে 'গোরা'র কার্য্যকলাপে। যাহা কিছু বিদেশী বা যাহা কিছু স্বদেশের ধারার সহিত সম্পর্কবিহীন—সকলই 'গোরা'র নিকট পরিত্যাজ্য, তাহার আদর্শ ইহার বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসও এই সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে নিখিলেশ ও সন্দীপের প্রথম জীবনে ব্যক্ত হইয়াছে এই বিদেশী আমলাতন্ত্রের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্রই উগ্র স্বাদেশিকতার নিন্দা করিয়াছেন, সাজাত্যবোধ ও বিশ্বপ্রেমের মিলনের জন্যই তাঁহার চেষ্টা পরিস্ফুট হইয়াছে। 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার-অধ্যায়ে' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বঘাতী সাজাত্যবোধ ও বিপ্লবপথের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আমন্ত্রণ করিয়াছেন। 'গোরা' ভারতবর্ষের ভালমন্দ বিভেদ-নিষেধ সমস্ত লইয়াই ভারতকে ভালবাসিত, তাহার দেশপ্রেম অতীব উগ্র, তাহাতে বিচার-বিবেচনার স্থান ছিল না, তাহা যাহা কিছু বিদেশী তাহারই বিরোধী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, পরে গোরা যথার্থ স্বদেশপ্রেম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল ; 'গোরা' উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের দুইটি বাণী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; পশ্চিম দেশ হইতে ভারত যে স্বদেশপ্রেম লাভ করিয়াছে, তাহা উগ্র ও প্রবল, তাহা পরের একান্ত বিরোধী, ভারতের মাটিতে এ স্বদেশ-প্রেমের স্থান নাই ; ভারত আপনাকে ভালবাসিতে গিয়া বিশ্ব-মানবকে ভালবাসিয়াছে—আর্য্য, অনার্য্য, গ্রীক, হুন সকলেই এখানে স্থান পাইয়া মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং ভারতের স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ উগ্র স্বাদেশিকতার প্রতীক, বিলাতীবর্জ্জন, বয়কট প্রভৃতিই তাহার নিকট স্বদেশী কার্য্যপন্থা। 'নিখিলেশ' এই জুলুম-করা স্বদেশীর বিরুদ্ধে তর্ক চালাইয়াছে এবং ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছে যে, স্বাধীনতা-অভিযান জুলুমের ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে

না। রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়ে' এই জুলুমের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম প্রকাশের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষিত হইয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, বিভীষিকা-পন্থীরা আত্মঘাতী, তাহারা শুধু যে দেশের কোন উপকার করিতে পারে না তাহাই নহে, তাহাদের নিজেদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী; উপন্যাসের নায়ক অতীন্দ্র ও নায়িকা এলার এই প্রকারের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়ে'র যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন কবি বিপ্লব-পন্থীদের প্রতি অযথা কঠোর হইয়াছেন এবং তাহাদের পথ ভ্রান্ত হইলেও তাহাদের অনেকের সর্ব্বত্যাগী আত্মোৎসর্গের আদর্শকে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। যাহা হউক, কবি যে বিভীষিকা-পন্থার নিন্দা করিয়াছেন তাহা শুধু বাংলার সন্ত্রাস-বাদীর পন্থা নহে, উহা সমগ্র পৃথিবীর ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদের পন্থা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অভিযান কেবল এই দেশীয় বিভীষিকা-পন্থার বিরুদ্ধে নহে, য়ুরোপীয় জাতীয়তাবাদ যাহা পরস্পরকে ধ্বংস করিতে উদ্যোগী তাহার বিরুদ্ধেই অধিক। রবীন্দ্রনাথ 'রাজটীকা', 'নামঞ্জুর' প্রভৃতি গল্পেও স্বদেশসেবার উন্মত্ত আন্দোলনের আড়ম্বরের পশ্চাতে যে শূন্যতা আছে তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন; সভা-সমিতি করিয়া দেশসেবাকে বিলাতী ঢঙে সাজাইলে তাহা কিরূপে খণ্ডিত ও খর্ব্ব হয় তিনি তাহারই চিত্র আঁকিয়াছেন। সুখের বিষয়, নবজাগ্রত ভারত এখন মহাত্মা গান্ধীর দেশসেবার একাগ্রতার দ্বারা কবিগুরুর এই শ্লেষের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে।

বৃহৎ রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও ধনিক-শ্রমিক সমস্যার পরেই আধুনিক সাহিত্যের ধারাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোড়িত করিয়াছে বর্ত্তমান নারীসমস্যা। রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানেই বলিয়াছেন, "মেয়েরা দুই জাতের, একজাত প্রধানতঃ মা আর একজাত প্রধানতঃ প্রিয়া।" পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যা লইয়া বহু আন্দোলন চলিয়াছে, তাহারা বিশেষতঃ প্রিয়ার আদর্শই বড় করিয়া দেখিয়াছে এবং ইহারই পরিণাম ইব্‌সেনের 'ডলস্ হাউস' প্রভৃতি রচনায়। কিন্তু ভারতের আদর্শ এখনও বাহিরের ঝড়-ঝাপ্‌টায় ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার বাণী মাতৃত্বেই নারীত্বের চরম ও পরম পরিণতি। 'গোরা'য় আনন্দময়ী বিশ্বসাহিত্যে মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই আনন্দের আবেগে গোরা আনন্দময়ীর নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "মা, তুমিই আমার মা, যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।" বাংলাদেশে মাতার আসন চিরদিন গৌরবের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে স্থাপিত। তাই 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার ন্যায় আত্মবিস্মৃত রমণীও আত্মস্থ হইল মাতৃত্বের স্নেহধারায়; যেদিন সে অমূল্যের নিকট হইতে মাতৃত্বের সুধার আস্বাদ পাইল, সেইদিনই তাহার মধ্যে প্রিয়ার উন্মাদনা ও বাধাবন্ধনবিহীন অভিসারিকার মূর্ত্তি খসিয়া গেল, সগর্ব্বে বাহির হইয়া আসিল শান্ত, শুচি, সুন্দর মাতৃত্বের রূপ। 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ মাতৃত্বের অপূর্ব্ব শক্তির জয়বার্ত্তা ঘোষিত করিয়াছেন। মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য-জীবন একটা অশোভন বিরুদ্ধ মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরম বিতৃষ্ণার মধ্যেও কুমু যখন আপনার অজ্ঞাতসারে মাতৃত্বপদে বৃত হইতে চলিল, তখন সে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেও সন্তানকে বঞ্চিত করিতে পারিল না; সুতরাং তাহাকে পুনরায় স্বামীর ঘর করিতে আসিতে হইল। এই পরিণতি হইতে সহজে অনুমিত হয় যে কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, সন্তানের শুভ আগমনে নর-নারীর বিরুদ্ধতা কি ভাবে পরাহত হইয়া যায়। ভারতের ইহাই চিরন্তন আদর্শ, মাতৃত্বই সর্ব্বথা বরণীয়, উহার নিকট অন্য সকল মনোভাব ও বিরুদ্ধাচরণ পরাজিত হইয়া যায়। এ দেশের নারী-জীবনের ইহাই বড় গৌরব।

নারীজীবনের নানা সমস্যা লইয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী য়ুরোপে নানা আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, অনেক নির্যাতন সহ্য করিয়া সেদেশের নারী-সমাজ অনেক অধিকার লাভ করিয়াছে, এই সমস্ত আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতের তটে আসিয়াও আঘাত করিয়াছে, তাই নূতন শিক্ষা, নূতন জ্ঞান ও পরিস্থিতির মধ্যে এ দেশেও নানা সমস্যার স্থান পাইয়াছে—নারীর বিবাহবন্ধনের ভালমন্দের বিচার, তাহার মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিক, তাহার রাষ্ট্রীয় অধিকার—এই সমস্তের স্বরূপ নির্ণয়। দাম্পত্য-জীবন যে সর্ব্বত্র একটানা মাধুর্য্যের ধারায় বহিয়া গিয়াছে, তাহা নহে, উহার মধ্যে নানা স্থানে যে বেদনা ও দাহ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সামাজিক জীবনে সহনশীলতা ও সহযোগিতার অভাবে নানা স্থানে মতানৈক্যের ছোট সূচিছিদ্র যে বৃহৎ রন্ধ্রে পরিণত হইতেছে, পরস্পরের মানিয়া চলার সামর্থ্যহীনতা যে স্বৈরতন্ত্রের সৃষ্টি করিতেছে তাহা আর দাবাইয়া রাখা যাইতেছে না। ইহারই ফলে আজ হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদ আইন, স্ত্রীর সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি বাদবিসম্বাদ জড়িত আইন প্রণয়নের দাবি। রবীন্দ্রনাথ বহু উপন্যাস ও গল্পে এই মনোভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থলেই উহার স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন নাই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল বিদ্রোহ করিয়াছে যৌথ পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে, সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক, মিথ্যা আবহাওয়া তাহাকে বিদ্রোহী করিয়াছিল, সে তাই বিধাতার সহিত সম্পর্কটা বাছিয়া লইয়া পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল। বিবাহিত জীবনের পাষাণকারার মধ্যে যে বেদনা গুমরিয়া উঠে তাহার সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'; চারু ও অমলের মধ্যে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা আমাদের দেশে দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, উহা প্রথমতঃ শুধু বন্ধুত্বমাত্র ছিল, অথচ পরে যৌনপ্রেমের গোপনতা ইহাতে আসিয়া পড়িল। চারু কায়মনোবাক্যে সতী স্ত্রী হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহার মনের কথা ভূপতিও বুঝিল না, অমলও বুঝিল না। বাস্তবজগতে নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যে যে ইতরতা আসিয়া পড়ে তাহাতেই গোল বাধিল, চারুর মর্ম্মবেদনা স্বামী ধরিতে পারিল না, ইহাতেই নষ্টনীড়ের কালিমার সৃষ্টি। এ দেশের বিবাহবন্ধনের মধ্যে যে কল্যাণ ও সুন্দর বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীহীন মলিনতার ভিতর দিয়াও যাহা নিজের সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'তে তাহাও দেখাইয়াছেন; সেখানে উদার অকপট স্বামী নিখিলেশ ও সদাচঞ্চল উদ্দাম

স্ত্রী বিমলার দাম্পত্যজীবনে সন্দীপের আগমনে যে প্রচণ্ড ঝটিকা রচিত হইয়াছিল তাহাও দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতাকে নষ্ট করিতে পারিল না, নিখিলেশের প্রেমই জয়যুক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোন' উপন্যাসেও বিবাহবন্ধনের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন, প্রিয়ার জাতের উপর মায়ের জাতের জয়লাভ দেখাইয়াছেন। শর্মিলা শশাঙ্ক মজুমদারের স্ত্রী, সে মায়ের জাতের, সেবার দ্বারা শশাঙ্কের জীবনের সমস্ত অভাব সে পূর্ণ করিয়াছিল, আর উর্মিলা তাহার ছোট বোন, সে প্রিয়ার জাতের, তাহার মধুর মায়ামন্ত্র দিয়া সে শশাঙ্কের রক্তে উত্তপ্ত তরঙ্গ তুলিয়াছিল; কিন্তু শশাঙ্কের জীবনের এই লজ্জাজনক অধ্যায়ের শেষ হইল উর্মিলার পলায়নে, শর্মিলার দাম্পত্য-প্রেমই জয়গৌরবে অভিষিক্ত হইল। এই বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্রই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, নারীকে কোথায়ও তিনি বাধাবন্ধনহীন অভিসারিকার মূর্ত্তিতে পছন্দ করেন নাই, তাঁহার 'মালঞ্চ' উপন্যাসেও তিনি এই আদর্শই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাই ইহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইয়াছে নীরজা-চরিত্রে। নারীর যে সদাচঞ্চল প্রিয়ার মূর্ত্তি তাহার উন্মাদনার মূলে আছে একটা সম্মোহন মন্ত্র তাহাই মনস্তত্ত্বরূপে কল্পিত হইয়াছে। কোনও পুরুষের তথাকথিত বিরাট্ প্রভাব বা অলৌকিকত্ব নারীর প্রিয়ামূর্ত্তিকে অভিভূত করিয়া তাহার মানসিক বিকার উপস্থিত করে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' এইরূপ প্রিয়াজাতীয় অভিসারিকা-মূর্ত্তিতে ভরপুর; সেখানে অমিত রায় এক বিরাট্ চরিত্র, সে শুধু আনন্দ দেয় না, ধাঁধাও লাগায়, সে জীবনের অভিব্যক্তিতে আস্থাবান্, প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার কাছে মূল্যবান্ এবং এই প্রতি মুহূর্ত্তের সজীবতাকে সে চিরন্তন করিয়া রাখিতে চায়, জীবনের পথে কবিতার ছন্দের মত বাধাবন্ধনহীন গতিতে অভিসারে সে অগ্নির মত আকর্ষণ করে 'কেটি'র দলের প্রিয়ার জাতের মেয়েদের, যাহাদের মধ্যে গভীরতা নাই, কেবল আছে একটা ভাসা ভাসা উন্মাদনা। তাই রবীন্দ্রনাথ এই জাতের মেয়েদের ঘড়ার জলের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন, তাহাদের বাহিরের চাকচিক্যে ও বিলাসলাস্যে ক্ষণিক আনন্দ দেয়, দীঘির জলে অবগাহনের মত প্রাণভরা তৃপ্তি দেয় না। এই প্রিয়ার জাতের জীবন যে কেবল বুদ্বুদের রূপ ও রামধনুর বর্ণ-চ্ছটা লইয়া ব্যস্ত, ইহাতে যে গভীরতর অনুভূতির সহিত সংস্পর্শ নাই, তাহাই রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন লিলি গাঙ্গুলি, বিমি বোস কেটি মিটার জাতীয় সমাজের চঞ্চল প্রজাপতিদলের আচরণে।

আমাদের বাংলাদেশের অনেক সমস্যার মধ্যে ইহার সামাজিক জীবনে পতিতা-সমস্যা ও বালবিধবা-সমস্যাও একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। অনেক স্থলে এই দুইটি পরস্পরসংশ্লিষ্ট, এবং প্রায়ই ইহার উদ্ভব পুরুষের কঠোর বিধান ও স্বার্থপর আচরণে। পাশ্চাত্ত্য দেশের সমাজে ইহাদের বালাই নাই, সুতরাং সাহিত্যেও ইহাদের স্থান নাই। বাল-বিধবা-সমস্যা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে একটা করুণ চিত্রের সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যেও ইহার অভিযান অনিবার্য্য। ইহার প্রথম আবির্ভাব বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনীতে এক কুণ্ঠিত, সলজ্জ, প্রেম-ভারাতুর মূর্ত্তিতে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিনোদিনী চরিত্র অন্য ধরণের, তাহার লজ্জা ও কুণ্ঠা চলিয়া গিয়াছে, চায় বিজয় ও প্রতিহিংসা; বালবিধবার এই মূর্ত্তি বাংলা সাহিত্যে অভিনব, তাই বাংলা সাহিত্যে 'চোখের বালি' যুগান্তর আনিয়াছিল। 'আশা' বুঝিতে পারে নাই, তাহার সখী 'বিনোদিনী' কেন তাহাকে চোখের বালি বলিয়া ডাকিত এবং তাহার স্বামীর সঙ্গে তাহার সখীর কি সম্বন্ধই বা গড়িয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনী সর্ব্বত্র আশার জয় দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছে, মহেন্দ্রকে পতঙ্গের মত আকর্ষণ করিয়া কলের পুতুলের মত চালাইয়াছে, সে সর্ব্বত্র স্বার্থ দেখিয়াই চলিয়াছে। মহেন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া যখন বিনোদিনী দেখিল যে মহেন্দ্রের উপর একান্তভাবে সারা জীবন নির্ভর করা যায় না তখনই সে মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, ইহা শুধু নিঃস্বার্থ প্রেম বা ভক্তির প্রেরণায় নহে। যাহা হউক, এই উপায়ে রবীন্দ্রনাথ এই বালবিধবা-সমস্যার সমাধান করিলেন, হয়ত বা সমাপ্তিটা কতকটা নাটকীয় ভাবে সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি বালবিধবা-জীবনের মনস্তত্ত্বের সর্ব্বপ্রকার বিশ্লেষণ করিয়া 'মহেন্দ্র' ও 'আশা'র বিবাহিত জীবনের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেই তিনি বিনোদিনীকে বিহারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন। পুরুষের অযৌক্তিক উন্মাদনা বা মোহ যাহা নারীজীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে প্রশ্রয় দিলেন না। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা হইতেই যে বাংলাদেশে পতিতার সমস্যা জটিল হইয়াছে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি 'বিচারক' গল্পে জজ মোহিত-মোহনের শুচিতার উপরে ন্যায্য শ্লেষ করিয়াছেন। বালবিধবা হেমশশী যাহার প্ররোচনা ও মিথ্যা আশ্বাসে বারবনিতা ক্ষীরোদায় পরিণত হইল, সে সমাজে সুন্দর চলিয়া গেল এবং বিচারক হিসাবে শাস্তি দিল তাহারই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলার আহুতি সরল পল্লীবালিকা যে তাহারই পরিত্যক্ত ব্যর্থ জীবন কদর্য্যতায় ডুবাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রণয়ের স্মৃতির প্রতি হেমশশীর যে শ্রদ্ধা, জজ মোহিতমোহনের তাহার বিন্দু-মাত্রও নাই। অথচ হেমশশীকে হইতে হইল অবজ্ঞাত বার-বনিতা ক্ষীরোদা, আর তাহার জীবনের প্রধান অপরাধী মোহিতমোহন বিচারকের আসনে বসিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে শুচিতা রক্ষা করিতে লাগিল। ইহাও যে নিষ্ঠুর সামাজিক বিধানের অপরিহার্য্য পরিণতি—বালবিধবার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত পদস্খলনের যে ক্ষমা নাই—তাহার বিরুদ্ধেও রবীন্দ্র-নাথ তীব্র শ্লেষ করিয়াছেন। পতিতা-সমস্যাকে এমন সহানু-ভূতির দিক দিয়া দেখিতে কবি-হৃদয়ই অগ্রসর হইতে পারে, আধুনিক কথাসাহিত্যে এইরূপ সহানুভূতি বিরল।

বর্ত্তমান জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যে-সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল সমস্যাসম্বলিত সাহিত্যকে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতন্ত্রতার নামে কথাসাহিত্যে যে নিছক দেহতত্ত্ব, যৌন-তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের অনধিকারপ্রবেশ হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ চির-কালই তাহার বিরোধী ছিলেন। কালের অগ্রগতির সহিত

মানুষের জীবনে যত প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের অবজ্ঞা করিয়া সরিয়া থাকেন নাই, কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি তাহাদের সমাধানের উদ্যোগ করিয়াছেন। সমস্যার খাতিরেই সমস্যার সৃষ্টি তিনি আদৌ পছন্দ করেন নাই; তবে মানুষের জীবনের জটিলতা বর্ণনা করিতে গিয়া যখন যে-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই, বহু স্থলে তাঁহাকে সমাজের বর্ত্তমান সংস্কারের বিরুদ্ধে বিরাট্ সাহসের পরিচয় দিতে হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তাঁহার দৃষ্টি ছিল একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের দিকে। যে সমস্যার যেরূপ সমাধান পাশ্চাত্য দেশে সম্ভব হইয়াছে, স্থান কাল ও জাতির আদর্শ-বিশেষে সেইরূপ সমাধান এ দেশে সম্ভবপর নাও হইতে পারে; রবীন্দ্রনাথ এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণে যে বস্তুতান্ত্রিক কথাসাহিত্য বাংলা দেশে এখন গড়িয়া উঠিতেছে, রবীন্দ্রনাথের সমস্যামূলক কথা-সাহিত্যের সহিত তাহার বিপুল পার্থক্য। জীবনে নানা সমস্যার মধ্য দিয়া জীবন কিরূপে চিরসুন্দরের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, ক্ষতবিক্ষত হইলেও শেষে শান্তির প্রলেপে কিরূপে ধন্য হয়, ইহাই অনবদ্য রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে; সকল সমস্যার সমাধানে মূর্ত্ত হইয়াছে সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুভূতি।*

* নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ

অধিকতর দুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীন. ভ.

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৮০ কোটী মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। সমগ্র পৃথিবীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, তারপরেই ভারতবর্ষের স্থান। ইহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অনুপাতে উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ এত কম যে, গড়পড়তা প্রত্যেকের ভাগ্যে দৈনিক প্রায় ৭ আউন্স মাত্র দুগ্ধ বা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য জোটে। যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যহ ৩৫ আউন্স করিয়া দুধ খাইতে পায়। পুষ্টি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, শিশুদের প্রাত্যহিক খাদ্য-তালিকায় দুগ্ধের পরিমাণ ৩২ আউন্স এবং পূর্ণবয়স্কদের তদূর্দ্ধ হওয়া উচিত। পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের লোকেরা খাদ্যতত্ত্ববিদ্‌দের নির্দ্দেশানুযায়ী দেহের পুষ্টিসাধনোপযোগী খাদ্য-বস্তু প্রচুর পরিমাণেই পাইয়া থাকে। ভারতবাসী আমরা নিশ্চিতই তাহা পাই না।

বাছুরে যে-পরিমাণ দুগ্ধ পান করে তাহা বাদ দিলে এদেশে বছরে প্রত্যেকটি দুগ্ধবতী গাভী হইতে ৬২৫ পাউণ্ড দুধ পাওয়া যায়। যদি এই দুধের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে তিন গুণ বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে তাহা দ্বারা টায়টোয় দেশবাসীর প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকটি গাভী হইতে বৎসরে ১৮৭৫ পাউণ্ড এবং সর্ব্বসাকুল্যে ২,৪০০,০০০০০০ মণ দুগ্ধের প্রয়োজন। ইহা দ্বারা আমাদের দেশবাসীর ন্যূনতম চাহিদা মিটিতে পারে বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা অত্যন্ত কম।

কানাডা, ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে প্রতিটি গাভী হইতে বৎসরে সাড়ে তিন হাজার হইতে চার হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া যায়। ডেনমার্কে প্রাগ্-যুদ্ধকালে প্রত্যেকটি গাভী হইতে উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ গড়পড়তা ছিল বাৎসরিক ৮,০০০ পাউণ্ড।

ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার গো-ধন তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়। কেননা, তাহাদের খাদ্যের সংস্থান করা কঠিন। বস্তুতঃ যত গরু বর্ত্তমানে আমাদের দেশে আছে তাহাদেরই যথোপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান আমরা করিতে পারিতেছি না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যে পরিমাণ খড়, তৃণ ইত্যাদি গো-মহিষাদির ভক্ষ্য-দ্রব্য এদেশে আছে তাহা হইতে গড়পড়তা প্রত্যহ প্রতিটি গরুর ভাগ্যে সাড়ে চার পাউণ্ড মাত্র খাদ্য জুটিতে পারে। কিন্তু যে প্রাণীর দৈহিক ওজন ৬০০ পাউণ্ড কেবল মাত্র শরীর ধারণের জন্যই তাহার দৈনিক ৮ পাউণ্ড শুষ্ক তৃণাদি-জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার কর্ম্মশক্তি বা দুগ্ধোৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে তো আরো বেশী খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজের মাত্রা এবং দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে এই খাদ্যের তারতম্য হইবে। গর্ভবতী গাভীদের জন্যও অধিকতর খাদ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের গো-মহিষাদি এখন তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অর্দ্ধেক মাত্র পাইয়া থাকে। যদি গো-ধন বাড়ানো যায় তাহা হইলে সেই অনুপাতে তাহাদের খাদ্য-বস্তুর উৎপাদনও বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা খাদ্যাভাব গো-জাতির পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর হইবে। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া আমাদের গাভীসমূহের দুগ্ধোৎপাদিকা শক্তি যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলেই শুধু ইহার প্রতিকার হইতে পারে। দেশের লোকের নিম্নতম চাহিদা মিটানোর উপযোগী দুগ্ধের ব্যবস্থা করিবার জন্য, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে খড়, ঘাস ইত্যাদি যে পরিমাণ গো-খাদ্য আছে তাহা এবং গো-জাতির দুগ্ধোৎপাদিকা শক্তি তিন গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর কিনা, সে সম্বন্ধে গভীর সংশয় বিদ্যমান। ইহা নিশ্চিত যে, আমাদিগকে গো-জাতির খাদ্য উৎপাদন এবং তাহাদের দুগ্ধোৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি এই উভয় দিকেই মনোযোগী হইতে হইবে। এই দুইটি সমস্যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত।

এ দেশের অধিকাংশ লোকই পল্লীগ্রামের কৃষক অথবা শ্রমজীবী-সম্প্রদায়। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের তুলনায় ইহারা অনেক কম দুধ পাইয়া থাকে। যেহেতু ইহাদের বেশীর ভাগই গ্রামে বাস করে সেজন্য সেখানেই দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মোটামুটি বলিতে গেলে বর্ত্তমান উৎপাদনের তুলনায় আমাদের দুগ্ধের প্রয়োজন অন্ততঃ তিন গুণ বেশী। যদি ইহা পুরাপুরি

না হউক অন্ততঃ তিন গুণের কাছাকাছিও বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বাজারগুলির বাহিরে বিক্রয়াদির ব্যবস্থা করিতে হইবে অথবা এজন্য নূতন হাট খুলিতে হইবে। অধিকতর গো-খাদ্য উৎপাদন এবং দুগ্ধদা প্রাণীসমূহের দুগ্ধোৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি এই উভয় দিকেই আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে।

গো-ধন এবং দুগ্ধাদির ব্যবসায়ে উন্নতির সুযোগ ভারতবর্ষের যত তত আর কোনো দেশের নয়। এই সুযোগ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ভারতবর্ষেরই সবচেয়ে বেশী।

যাঁহারা জাতীয় বা সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকামী, দুগ্ধোৎপাদন অথবা দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে যাঁহারা আগ্রহান্বিত, পল্লী-উন্নয়ন এবং শ্রমজীবীদের হিতসাধন যাঁহাদের কাম্য, নিজ পরিবার এবং স্ব-সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যাঁহারা উদ্যমশীল—তাঁহাদের সকলেরই এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আশু প্রয়োজন। দুগ্ধ-সমস্যার সমাধানে আমরা সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত কিছুকিছু কাজ করিতে পারি। অধিকতর দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যবস্তু-উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার পর এই সমস্যাকে অবহেলা এবং উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে একান্ত অনুচিত।

* *Indian Farming*. Vol. V. No. 1. January 1944 হইতে।

পুস্তক-পরিচয়

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাবলী—৯২—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ সিকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে-সব বাণীসাধক কাব্য রচনা করিয়া কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ঈশানচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু হয় বিয়াল্লিশ বৎসর মাত্র বয়সে ১৮৯৭ সালে। এখানি সঙ্কলন গ্রন্থ, ঈশানচন্দ্রের সম্পূর্ণ কথাকাব্য "যোগেশ", এবং "চিত্তমুকুর" "বাসন্তী" "চিন্তা" প্রভৃতি কাব্যের অনেকগুলি কবিতা ইহাতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয় কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতারও সন্ধান দিয়াছেন। কবি হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও ঈশানচন্দ্র জ্যেষ্ঠের পথ একান্তভাবে অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার ভাব তাঁহারই নিজস্ব এবং রচনাভঙ্গীর মধ্যেও একটি বিশেষত্ব আছে। 'যোগেশ' কাব্যখানি একটি মর্ম্মন্তুদ বেদনায় পরিপ্লুত। কথাকাব্যে যেমন গীতি-কাব্যেও তেমনি এক দারুণ অন্তর্জ্বালা তাহার রচনাগুলির মধ্যে দেখিতে পাই। ঈশানচন্দ্রের কাব্য ভাবাবেগবিধুর।

"নারীর অধিক ভাবি দেখেছিনু মুগ্ধনেত্রে
নরের অধিক হয়ে হয়েছি বিকল।"

ঈশানচন্দ্রের কবিতাগুলির মধ্যে একটি আকুল আন্তরিকতা আছে বলিয়া একালের পাঠকের নিকট তিনি পরিচিত হইবার যোগ্য।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কোরাণ প্রবেশিকা—শ্রীবিবেকবন্ধু মিত্র। দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোম্পানী লিমিটেড। ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ৪৪ পৃষ্ঠা। চারি আনা।

ইস্‌লাম গৌরব—শ্রীব্রজসুন্দর রায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন, ৯৩ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

বিভিন্ন ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও পাঠককে উদার করিয়া তোলে। বাংলা সাহিত্যে এ জাতীয় গ্রন্থের আপেক্ষিক অল্পতা দুঃখের বিষয়। খ্রীষ্ট ও ইস্‌লাম ধর্ম্মবিষয়ে বাংলা গ্রন্থ যাহা আছে তাহা খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বাহিরে একরূপ অপরিচিত। অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধে বাংলায় বিশেষ কিছু আলোচনা হইয়াছে বলা চলে না। অথচ এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, মৌলিক ও সাধারণ সর্ব্ববিধ রচনার বিশেষ প্রয়োজন।

এই হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানির মূল্য আছে। সাধারণ পাঠকের উপযোগী ভাবে গ্রন্থ দুইখানিতে ইস্‌লামের রহস্য ও মহত্ত্বের ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থে কোরাণের বিভিন্ন অংশ হইতে লৌকিক আচরণ সম্পর্কিত ঔদার্যব্যঞ্জক কতকগুলি মনোহর বচন সংকলিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে মহম্মদ ও কয়েকজন খলিফার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

অস্বীকার—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

উপন্যাস। নায়ক কল্লোল পাঠ্য-জীবনে কলিকাতার সৌখীনসমাজ অবলম্বনে জন্মগত আচার-রীতি ত্যাগ করিয়া প্রগতিশীল নাম কিনিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, এবং নায়িকা শিপ্রাকে ভালবাসিলেও তাহাদের মিলন ঘটে না। অতঃপর বাংলা ছাড়িয়া সে বর্ম্মায় আসে। কিছুদিন পরে ঘটনাক্রমে শিপ্রাও সেখানে উপস্থিত হয়। তারপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে-কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে ছায়াছবির প্রেরণা যেন পরিমাণে বেশী। যদিও নায়ক-নায়িকা বহুবার ঘোষণা করিয়াছে—জীবন গল্প-উপন্যাসের মত সর্ব্ব-সমস্যা-সমাধানকারী সহজ বস্তু নহে, এবং সস্তা 'মেলোড্রামার'ও স্থান সেখানে অত্যল্প, তথাপি সে প্রভাব তাহারা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের কেন্দ্র করিয়া যে চরিত্রগুলি উপন্যাসের মধ্যে ভিড় জমাইয়াছে তাহারা রুটিন-মাফিক নিয়মে অতি অনায়াসে—কখনও-বা বিনা নোটিশে আসিয়া গল্পকে অনেক দূর পর্য্যন্ত টানিয়াছে।

বাস্তব স্পর্শকে পাশ কাটাইয়া কাহিনী পড়িতে ভালবাসেন এমন পাঠকের সংখ্যা হয়ত বেশী। কিন্তু চিন্তাশীল ও সংখ্যা-লঘু পাঠক সম্প্রদায়ের কথাও যশস্বী সাহিত্যিকদের ভুলিলে চলিবে কেন? সৌরীনবাবু প্রবীণ এবং ক্ষমতাশালী লেখক। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সৃষ্টির

মূল্য আছে। তাঁহার অভিজ্ঞতার দানে বাংলা কথা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে এই আশাই আমরা পোষণ করিয়া থাকি।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত। সরস্বতী লাইব্রেরী—সি ১৮-১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২৬। মূল্য দুই টাকা।

বর্ত্তমানে সভ্যতার খুবই উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পর্দ্দার অন্তরালে যে অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ চলিয়াছে তাহার তুলনা নাই। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২-৯৮) হইতে যে সম্পদ-সন্ধানের যুগ আরম্ভ হইয়াছে, আজ সমস্ত পৃথিবী আবিষ্কৃত হইয়াও এবং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থল ও জল-ভাগ শ্বেতজাতির অধিকৃত হইয়াও তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। এই শোষণ-প্রবৃত্তি ক্রমেই অন্যান্য জাতির মধ্যে সংক্রামিত হইতেছে বা হইয়াছে। নিছক আবিষ্কার, ধর্ম্মপ্রচার, বাণিজ্য, উপনিবেশ স্থাপন বা খোলাখুলি পরদেশ অধিকার ইহার এক বা একাধিকের সুযোগ লইয়া পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে। সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ তাহারা নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা ও আদিম জাতিগুলি ধ্বংস হইয়াছে। এসিয়া মহাদেশ তাহার প্রাচীন গৌরব লইয়া পাশ্চাত্ত্যের পদতলে। দুর্দ্ধর্ষ আরব, প্রাচীন ভারত, সুসভ্য চীন আজ নানা ভাবে লাঞ্ছিত ও শোষিত। একমাত্র জাপানই নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু সেও সাম্রাজ্যবাদী এবং শোষকগণের অন্যতম। গত মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ (১৯৩৯—) সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহের এই বিশ্বলুণ্ঠনের ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া কলহ-মাত্র এবং যত দিন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ থাকিবে তত দিন ইহার শেষ নাই এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

লেখক সুন্দর ভাবে আফ্রিকা এবং এসিয়ার পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদীর লীলাখেলার ছবি আঁকিয়াছেন। কিরূপে ধর্ম্মপ্রচার, অস্ত্রবল ও কূট রাজনীতির অমোঘ প্রয়োগে জাতির পর জাতি পাশ্চাত্ত্যের কবলিত হইয়াছে তাহা লেখকের ভাষায় সুন্দর ফুটিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ জানিতে হইলে এরূপ গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন আছে। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মেয়েদের পিকনিক—শ্রীবীণাপাণি দেবী সাহিত্য-সরস্বতী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ২০০, মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানিতে গল্পচ্ছলে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত অথচ রসনাতৃপ্তিকর বহু প্রকার খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। ভাষার প্রসাদগুণ এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের দরুন ইহা বাংলা শিল্প-বিদ্যা সম্পর্কিত সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

পুস্তকের গোড়ার দিকে 'রন্ধনের ইতিহাস' নামক তথ্যসমৃদ্ধ অধ্যায়টিতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ডিউক অব্ উইণ্ডসর প্রমুখ পাশ্চাত্ত্যের কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা এবং পুরুষের রন্ধন-বিদ্যায় নৈপুণ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। লেখিকা এপ্রসঙ্গে আমাদের দেশের বরণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের রন্ধন-কুশলতা এবং রবীন্দ্রনাথের 'নব নব রান্না আবিষ্কারের সখে'র কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে খুল্লনার রন্ধনের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে তাহা হইতে কিছু-কিছু উদ্ধৃতি থাকিলে পুস্তকখানির সাহিত্যিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইত। বইখানির ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম। বাংলার গৃহলক্ষ্মীদের হেঁসেলে অন্যান্য টুকিটাকি জিনিষের সঙ্গে 'মেয়েদের পিকনিক' এক খণ্ড না থাকিলে তাঁহাদের গৃহস্থালি অঙ্গহীন থাকিবে।

অজানার পথে—অরূপ। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স সিণ্ডিকেট লিঃ। ৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

দুঃসাহসী বালক বীরু একদিন ঘর ছাড়িয়া অজানার পথে বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতা হইতে একখানি যাত্রী-জাহাজে চড়িয়া সে কাছাড় জেলার শিলচরে গিয়া পৌছিল। সেখান হইতে তার অভিযান সুরু হইল আসামের পাহাড়-জঙ্গলে নাগা আর কুকিদের পল্লীতে। সংক্ষেপে ইহাই এই শিশুপাঠ্য উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ থাকায় সরতুই গ্রাম, কুকি মেয়েদের নৃত্য, কুকিদের মদ্যপান ইত্যাদির বর্ণনা একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। টোনা, তইমু, থাংপা তিলুং প্রভৃতি পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষের চরিত্রগুলিকেও সজীব বলিয়া মনে হয়। শিশুদের কৌতূহলকে কি ভাবে ক্রমবর্দ্ধমান করিয়া কাহিনীকে সুষ্ঠু পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে হয় সে কৌশলটি লেখকের ভাল করিয়াই জানা আছে। পুস্তকখানা শিশুমহলে সমাদর লাভ করিবে। কুকিদের মধ্যে খ্রীষ্টান পাদরিদের ধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে কুকি-সর্দ্দারের জবানিতে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বয়স্ক, চিন্তাশীল পাঠকও ভাবিবার খোরাক পাইবেন।

বেদুইনের দেশে—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। পর্যটক প্রকাশনা ভবন। ১৫৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস দ্বিচক্রযানে আরবদেশে ভ্রমণ কালে নিজের চোখ এবং কাণ দুটাই যে খোলা রাখিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাই তাঁহার সদ্যপ্রকাশিত 'বেদুইনের দেশে'। রামনাথবাবুর ভাষায় বেগ এবং প্রবাহ আছে, জোরালো ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গীর গুণে খর্জ্জুর-কুঞ্জ-শোভিত আরবের দিগন্তবিলীন মরু প্রান্তরে, বেদুইনদের মুক্ত স্বাধীন জীবনযাত্রার দৃশ্যটি মনশ্চক্ষে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠে। এক জায়গায় লেখক বলিতেছেন—"আমি পথের মানুষ। সে জন্য পথের কথাই বলতে ভালবাসি।" পথের কথা যে তিনি চিত্তাকর্ষক ভাবেই বলিতে পারেন তাহার পরিচয় পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়।

সিন্ধুর বন্ধন—শ্রীপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈলশ্রী, ১।১।১এ, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

গ্রীসদেশের বিখ্যাত ইউলিসিসের উপাখ্যান অবলম্বনে ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া পুস্তকখানি লিখিত। ট্রয়নগরী ধ্বংস করিয়া ইউলিসিস্ কয়েকজন অনুচর সহ অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেন এবং অনেক বিপদ-আপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক, লেখকের ভাষাও সহজ সরল অনাড়ম্বর। বইখানি ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দিনান্ত—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড্, ১৩৫০। ২২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

একজন কৃতী ব্যবসায়ীর পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসের কাহিনী। প্রভূত ঐশ্বর্য্য এবং যশের অধিকারী হইয়াও অবনী বাবু তাঁহার জীবনের সায়াহ্ন হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন। উচ্ছৃঙ্খল পুত্র, উদাসীন বিধবা কন্যা, পরিত্যক্তা পুত্রবধূ, আর ভাঙনধরা ব্যবসায় তাঁহার প্রমোদ-উদ্যানকে অরণ্যে পরিণত করিল। গভীর নিরাশায় তাঁহার মৃত্যু হইল। এই গ্রন্থে চরিত্রাঙ্কনের পরিবর্ত্তে কতকগুলি সামাজিক পরিস্থিতির অবতারণা করাই লেখকের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। দীপকের যুক্তিতর্কে এবং সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণে লেখকের মতবাদ দেখিতে

পাই ; কিন্তু তাহার চরিত্র দুর্ব্বল। উপন্যাসের নায়ক সে নয়, শুধু নেপথ্যে থাকিয়া জীবনকে বিশ্লেষণ করিতেছে। সঞ্জয় বাবুর কাছে পাঠক আরও চিত্তাকর্ষক উপন্যাস এবং উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি প্রত্যাশা করে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

ঋণ—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—পূর্ব্বাশা লিঃ, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

ঋণ, শিকড়, বাংলার মাটি, শিকল, পৌত্তলিক, দায় ও সিঁড়ি—এই সাতটি গল্প পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পেই লেখকের শক্তি সুপরিস্ফুট। বাংলার মাটি, শিকল ও পৌত্তলিক, গল্প তিনটিতে লেখকের যে শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অনন্যসাধারণ। "দায়" গল্পটি পড়িয়া লেখকের সহানুভূতিসমৃদ্ধ অন্তরের পরিচয় পাইলাম।

সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির সঙ্গে বাঙালী-জীবনের দুঃখবেদনার প্রতি মমতাবোধ মিলিত হইয়া যে রস-সাহিত্যের উপাদান যোগাইয়াছে সংযত ও শিল্পময় ভাষায় লেখক তাঁহার সঠিক মর্য্যাদা দান করিয়াছেন—ইহা কম কথা নহে।

মরুপথের যাত্রী—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।—শ্রীঅনিতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১২ হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

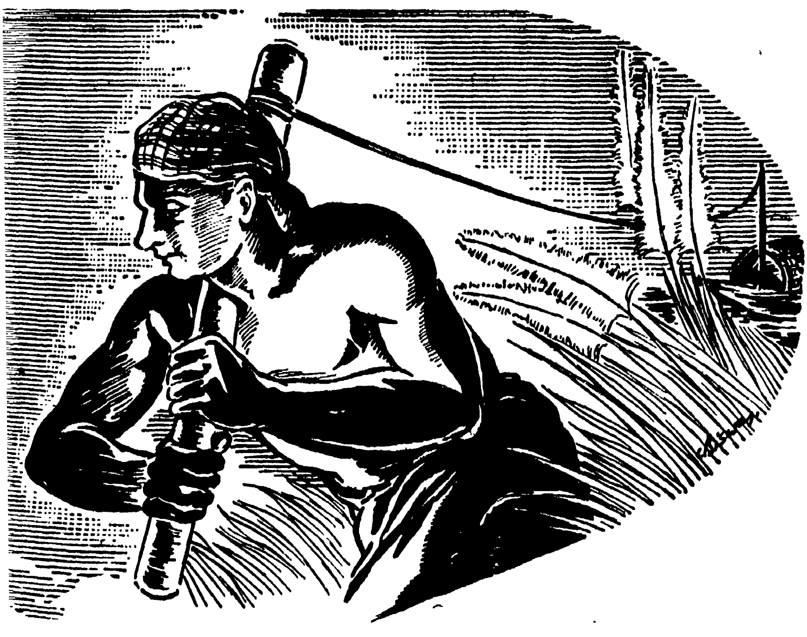
লেখক পুস্তকখানিতে যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঠিক মত বলিতে পারেন নাই। ভাষায় যথেষ্ট আবেগ আছে এবং স্থানে স্থানে চিন্তাশক্তির নবীনতা মনকে দোলা দেয় -তথাপি উপন্যাসটি রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মানুষ কি করে বড় হল—শ্রীগিরীন্ চক্রবর্ত্তী। পূরবী পাবলিশার্স, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ১৮১ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

বইখানি মিথাইল ইলিনের "How Man became a Giant" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ কি করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে খুব সহজ কথায় গল্পের মত করিয়া সেই বিবর্ত্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়াছে। বইখানি বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে কিশোর-কিশোরীদের মনে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করিবে বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য



দেশ-বিদেশের কথা

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন এবার কানপুরে ২৪শে ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর হইবে স্থির হইয়াছে। সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পাটনার "প্রভাতী" পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুদের উদ্যোগে সম্মেলনের সময় বাংলা পত্র ও পত্রিকাগুলির একটি প্রদর্শনী হইবে। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার সঞ্চালকবর্গের নিকট আমাদের নিবেদন তাঁহারা যেন অবিলম্বে নিজেদের পত্রিকার এক একটি সংখ্যা শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ সরকার, "বিহার হেরাল্ড" ও "প্রভাতী" অফিস, পোঃ আঃ কদমকুঁয়া, পাটনা এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরেও সম্মেলনে সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্প, মহিলা ও বৃহত্তর বঙ্গশাখা থাকিবে। এই শাখাগুলিতে যাঁহারা লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে চান তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহাদের প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, কর্ম্মসচিব, অভ্যর্থনা-সমিতি, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ২৪।১৯, দি মল, কানপুর এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

পরলোকে মহিলা কবি

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুরাপাড়া গ্রামের বিদুষী স্বর্ণময়ী দেবী বিগত আষাঢ় মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর। তিনি 'গীতিমালা' ও 'স্বর্ণাঞ্জলি' পুস্তক রচনা করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে তিনি সাধারণ মহিলাদের ন্যায় আড়ম্বরবিহীন ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী

গত ১৪ই অক্টোবর নাগপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণতম ব্যবহারজীবী দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী অশীতিবর্ষ বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সমস্ত মধ্যপ্রদেশে বাঙালীদের তিনি শীর্ষস্থানীয় ও অতি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রথমে রায়পুরে পরে নাগপুর হাইকোর্টে তিনি ওকালতী করেন। প্রায় ১৫ বৎসর রায়পুর মিউনিসিপালিটির প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি সেই শহরের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। রায়পুরের লরী মিউনিসিপাল হাই স্কুল, বাঙালী কালীবাড়ী ও বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলা মিডল স্কুল তাঁহার কীর্ত্তি। দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত লোকের আপদ-বিপদে তিনি গোপনে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে কবিতা লিখিতেন ও তাহা পুস্তকাকারে ছপাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সাধারণ সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১৯২৪ সালে তাঁহারই আহ্বানে রায়পুরে প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মিলনের অধিবেশন হয়। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে দাদাভাই নৌরোজী, গোখলে প্রভৃতি মনীষী ও দেশনেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন ও কলিকাতা ও বেনারস কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালী ছিলেন ও সর্ব্বদা সকল স্থানে বাঙালীর ও বাংলার সম্মান রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন।

বিষ্ণুচিত্ত স্বামী

আচার্য্য বিষ্ণুচিত্ত স্বামী (পূর্ব্বাশ্রমের নাম—বিমলেন্দুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এম-এ, বি-এল পাশ করিবার পর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া কাশীর পরমহংস পরিব্রাজক লোকসারঙ্গ মহামুনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর বার বৎসর তিনি অজ্ঞাতবাসে কাটান। এই সময়ে তিনি মানসসরোবর, তিব্বত, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি বহু দুর্গম তীর্থ পর্য্যটন করেন। পরমহংসদেবের তিরোধানের পর তিনি নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বারকায় "তোতাদ্রী মঠ" নামে এক সুন্দর মঠ নির্ম্মাণ করেন। মঠে যাত্রীনিবাস, পান্থনিবাস, সাধুনিবাস প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীদিগের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ও বৈষ্ণবদের দ্বারকায় থাকিবার এক বিশেষ অসুবিধা দূর হইয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিকী

পাঁচ হাজার বৎসর বা তার চেয়েও আগের মেসোপটোমিয়ার প্রাচীন নগর 'সুমের' বা আক্কড়ে'র কথা যখন শুনি, মিশরের নীল নদীর বন্যাপ্লাবিত দুই তীরে মানুষের সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পরিচয় পাই, প্রাচীন সিন্ধুর লুপ্তধারার কোলে, 'মহেঞ্জদারো'র মত ভূ-গর্ভলীন নগরস্তূপের সন্ধান লাভ করি তখন মানুষের সভ্যতার প্রাচীনত্বের কথা ভেবে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। সেই সুদূর অতীতেও দেখা যায়, বর্ত্তমান নাগরিক জীবনের সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্যেরই আভাস আছে।

এখনকার মরুভূমি নয়, তখনকার ইউফ্রেটিসের উর্ব্বর উপকূলে নাতিগৌর দ্রাবিড়াত্মক 'সুমের'বাসীরা গৃহনির্ম্মাণ থেকে আরম্ভ করে বয়ন পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছে, মৃৎ-শিল্পে তাদের নিপুণতা সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের নাগাল পেয়েছে, লিপিচিহ্নের ব্যবহার পর্য্যন্ত তাদের অজ্ঞাত নয়। তাদের লিখনের আধার অবশ্য ছিল স্থূল মাটির টালি মাত্র। কিন্তু সেই মৃৎ-ফলক খোদিত নাতিস্ফুট লিপিই সভ্যতার প্রথম কাহিনী সংগ্রহ করে রেখেছে ভাবীকালের জন্য।

সে কাহিনীর পুরানত্ব আমাদের বিস্মিত করে বটে, কিন্তু সত্যই আমাদের সভ্যতার বয়স এমন কিছুই নয়। সৌরমণ্ডল বা এই পৃথিবীর কল্পনাতীত আয়ুর তুলনায় বলছি না। সৃষ্টি-প্রভাতের ঘন বাষ্পাচ্ছাদিত আকাশের তলায় উষ্ণ, উদ্বেলিত আদি সাগরে, প্রথম যেদিন অপূর্ব্ব ঘটনা-সমাবেশে আদি প্রাণকণিকার আবির্ভাব হয়েছিল, সেই দিনকার অন্তহীন দূরত্ব স্মরণ করেও নয়; জীব-জগতের বিশিষ্ট ধারা হিসাবে মানুষ যতদিন পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে তারই হিসাবে এ সভ্যতা ক্ষণকালের; মানুষের উদ্বর্ত্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের শেষের কটি লাইনে মাত্র এ সভ্যতার সূচনা দেখা যায়।

পৃথিবীর বর্ত্তমান রূপ ভূতত্ত্বের হিসাবে বেশী দিনের নয়। দুই মেরুর তুষারাবরণ নির্ম্মমভাবে অভিযান করে সমস্ত পৃথিবীকে একাধিক বার মরণ-আলিঙ্গনে বেষ্টন করে ধরেছে। আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবী নাকি শেষ তুষার-আলিঙ্গন থেকে এখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় নি। প্রথম পৃথিবীর তুষারবেষ্টন অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষই অরণ্য ছেড়ে বেড়িয়েছিল, না অরণ্যই মানুষের আদি পূর্ব্বপুরুষকে অসহায় ভাবে ফেলে সরে গেছল সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু অরণ্য-আবেষ্টন থেকে মুক্ত আদি মানুষকে নাগরিক জীবনে প্রবেশ করবার আগে, হাজার নয়, বহু অযুতবর্ষ ধরে যে ভবিষ্যৎ নিয়তির জন্য আর সমস্ত বন্যপ্রাণীর সহচররূপে প্রস্তুত হতে হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিনকার অতিকায় গুহা-ভল্লুক আর বিশাল অসি দন্তী শার্দ্দূলকে এড়িয়ে বিলুপ্তপ্রায় লোমশ হস্তীর বিচরণক্ষেত্রে সে তৃণভোজী পশুপালের পিছু পিছু শিকার করে ফিরেছে। যে পশুযূথকে সে মৃগয়ার জন্য অনুসরণ করেছে তারাই ক্রমশঃ আশ্রিত হয়ে উঠে তাকে নিশ্চিন্ততার স্বাদের সঙ্গে সভ্যতার প্রথম সুযোগ দেবে একথা তখন কে জানত।

যন্ত্র-বিজ্ঞান-মুখরিত বর্ত্তমানের মধ্যে বাস করে আমরা সে সুদূর অতীতের কথা ভুলতে পারি কিন্তু আমাদের দেহ এখনও তা ভোলে নি। সত্য কথা বলতে কি এখনও এ সভ্যতাকে সে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নি। আদিম আরণ্য শিকারীর জীবনের ধারার সঙ্গেই এখনও তার সঙ্গতি। সভ্য জীবনের সঙ্গে সেইজন্যে সব সময়ে তার বনিবনাও হয় না। আমাদের বৃহদন্ত্রে দীর্ঘতা এমনি ছিল আরণ্যজীবন ও আহার সম্বন্ধে তার অনিশ্চয়তার উপযোগী। সভ্যতার খাদ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে বদলায় নি বলেই, অনেক সময়ে গোলযোগ বাধে, শরীরের আবর্জ্জনা যথারীতি নিষ্কাশিত হয় না, এবং বিবাদ এড়াবার জন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় বেঙ্গল ইমিউনিটির **'বাই আগার অয়েল'** ব্যবহার করে।

বিজ্ঞাপন

মাতা ও শিশু

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি একত্র করিলে দেখা যাইবে তাহাদের অধিকাংশকে একটি বিষয় অনুপ্রাণিত করিয়াছে—সে বিষয় মাতা ও শিশু। ইহার ভিতর এত মাধুর্য্য সঞ্চিত যে যুগে যুগে নানাভাবে আঁকিয়াও শিল্পীরা তাহা নিঃশেষ করিতে পারে নাই। চিত্রজগতের বাহিরেও এই পবিত্র রূপের মহিমা মানুষের কল্পনাকে চিরকাল অধিকার করিয়া আছে। অধিকাংশ খৃষ্টান-ইউরোপ মেরী ভিন্ন যীশুকে পৃথক্‌ভাবে ভাবে না, আমাদের দেশে যশোদা ও কৃষ্ণের কাহিনী চিরন্তন অপরূপ রসধারা সৃষ্টি করিয়াছে। মাতা ও শিশুর মিলিত রূপের প্রতি মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কারণ সৃষ্টির গভীরতম অর্থ ও মহিমা এই সম্মিলিত রূপের মধ্যে নিহিত।

কিন্তু মাতা ও শিশুর এ চিত্র কি শুধু কল্পনার জগতেই মধুর হইয়া থাকিবে? বাস্তব জীবনে কি এ চিত্র সত্য হইয়া থাকিবে না? সুস্থ প্রফুল্ল শিশু, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি—এই অপরূপ সমাবেশ দেখিবার জন্য কি আমাদের চিত্র-শালায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। বাংলা দেশের চারি-দিকে চাহিয়া ত সেই সন্দেহই জাগে। শিল্পীকে আজ তাহার আদর্শ খুঁজিতে যে বহুদূর ব্যর্থ পর্য্যটন করিতে হইবে। চারিধারে রুগ্ন, বিবর্ণ মাতৃমূর্ত্তি—নয়নে মাতৃত্বের মমতা আছে কিন্তু নাই জ্যোতিঃ, নাই স্বাস্থ্য। দেশব্যাপী এই দৃশ্যের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া শুধু কল্পনায় কেমন করিয়া আমরা সান্ত্বনা পাইতে পারি। সেই কল্পনা দাঁড়াইবেই বা কিসের আশ্রয়ে?

শিল্পের আদর্শের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু মাতা ও শিশুর কল্যাণ সম্বন্ধে অবিলম্বে অবহিত না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিই যে নষ্ট হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য জগতের দিকে চাহিয়া আর কিছু না হউক এ বিষয়ে আমরা অনেক শিখিতে পারি, তাহারা শুধু শিল্পে নয়, ব্যবহারিক জগতেও মাতৃত্বের মর্য্যাদা দিতে জানে। আমাদের দেশের জনমত যে একেবারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই তাহা নহে। বালিকার মাতৃত্ব, অস্বাস্থ্যকর আঁতুরঘর প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব বদলাইতেছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই বাকী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া যতটুকু পারা যায় আমাদের করিতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে প্রসূতি-কল্যাণের তথ্য প্রচার করিতে হইবে। দেশে শিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা যাহাতে বাড়ে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। শিল্পকলা হইতে ঔষধের প্রথা অনেক দূর হইলেও সে কথাও না পাড়িয়া উপায় নাই। বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষিত ঔষধের সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া উচিত, যেমন সন্তান-সম্ভবা জননীর জন্য এবং প্রসবের পর প্রসূতির নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেঙ্গল ইমিউনিটির **"ভাইনো গ্লণ্ট"**—এই ঔষধের কথাও সকলের জানা কর্ত্তব্য।

কাশীধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবাসস্থান-উদ্ধার সমিতি

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার পথে কাশীধামে যতনবড় নামক মহল্লায় চন্দ্রশেখরের ভিটায় আসন পাতিয়াছিলেন। সম্প্রতি চন্দ্রশেখরের ভিটাটি উদ্ধার করিয়া তথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও শাস্ত্রালোচনার চেষ্টা করা হইতেছে। চন্দ্রশেখরের ভিটাটি ক্রয় করিবার জন্য ল্যাণ্ড একুইজিশনের ধারা অনুযায়ী ৮৫০০৲ টাকার প্রয়োজন। অচিরে ঐ টাকা জমা না দিলে কালেক্টরের হুকুম বাতিল হইয়া যাইবে। মহাপ্রভুর কাশীপ্রবাসস্থান উদ্ধারের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। টাকা-পয়সা ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড, এই ঠিকানায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের নিকট প্রেরিতব্য।

প্রবাসে বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

এ বৎসর (১৯৪৪) উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গৃহীত আই, এ ও আই এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রবাসী বাঙালী শ্রীমান অমিয় বসু প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫৲ সিনিয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ পাইয়াছেন। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়াও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। ইনি উড়িষ্যার স্বনামধন্য ডাক্তার রায় বাহাদুর ৺আনন্দলাল বসু মহাশয়ের পৌত্র এবং কটকের জনপ্রিয় ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রলাল বসু মহাশয়ের পুত্র।



শ্রীঅমিয় বসু

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী শোভা মিত্র এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া



শ্রীশোভা মিত্র

উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী শোভা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ডেপুটি মোটিভ পাওয়ার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মোহনলাল মিত্রের কন্যা।



শ্রীদীপ্তি সান্যাল

শ্রীমতী দীপ্তি সান্যাল বর্ত্তমান বৎসরে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় অনার্স লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভের অধিকারী হইলেন। ভারতীয় নৃত্যকলায়ও ইনি বিশেষ পারদর্শিনী।

রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা গ্রাম নিবাসী ৺ললিত-মোহন সেন বাণীভূষণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কণা সেন, বি-এ বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-টি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ১৯৩৮ সালে বেথুন



শ্রীকণা সেন

কলেজ হইতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আই-এ এবং ১৯৪০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এ পাস করেন।

লণ্ডনের কেম্ব্রিজ স্কুলের বিগত জুনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের ১৪ বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী রমলা বসু ইউ, পি, প্রদেশে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

হে ধরণী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

হে ধরণী! সময়ের কলোল্লাসে তব ছন্দ নাচে,
আনন্দের উদ্বোধন করিতেছ সৃষ্টি-উৎস ধরি'।
সুখদুঃখ আলোছায়া অশ্রুহাসি জন্মমৃত্যু মাঝে
মধুর পরশ তব মাতৃস্নেহ সম চিত্ত ভরি'
অনিত্য যে, তারে নিত্যে রাখিয়াছে শান্তি আবরণে।
তুমি মিথ্যা যাদুকরী!—কেন জাগে দার্শনিক-মনে!

অনন্তের ঘনরূপ বস্তুপুঞ্জে করি' বিচিত্রিত
ভাবের নিগূঢ় সত্য মানবিক মর্ম্মে দিলে আনি;
কথার অতীত যাহা, সুরে সুরে করি সমুত্থিত
বিস্মিত করেছ নরে। প্রকৃতির খুলে গ্রন্থখানি
অচেনার পরিচয় সাজায়েছ আলোর অক্ষরে
অসীমের অভিসারে তব পুণ্য প্রেমজ্যোতি ঝরে।

দূর বনান্তের দিকে নীলাকাশ যেথা নেমে আসে
তোমার রূপের মোহে দৃষ্টিদীপ কেঁপে কেঁপে ওঠে,
মেঘের মতন যেথা চ'লে-যাওয়া দিনগুলি ভাসে
সেথায় হৃদয় তব নির্ঝরের দীপ্তিসম ফোটে।



ছরি-শা-মাদার

মীর কালান খ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা। মোগল পদ্ধতি



লণ্ডনের হক্সটন ষ্ট্রীটস্থ "পোলোকের" শিশু-পুতুল-নাট্যের দোকানে একটি পুতুল-নাট্যের অভিনয়। শত শত শিশু এই দোকানে আসিয়া ভিড় জমায়।



শিশু-পুতুল-নাট্য-বিপণির মালিকের কন্যা কুমারী লুইসা পোলোক। সম্প্রতি ইনি এই বিখ্যাত দোকানটি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫১

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন

প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগের মতে যুক্তিগুলি ভ্রমপূর্ণ।

লেখকের প্রথম যুক্তি :—

ইহাতে বিবাহিতা রমণীগণের লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক হইবে। ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তিই দরিদ্র; এজন্য অধিকাংশ স্থলে মৃত ব্যক্তি বাসগৃহ এবং কিছু জমি ভিন্ন কোনও সম্পত্তি রাখিয়া যান না। প্রস্তাবিত আইন বাসগৃহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে, কারণ কেন্দ্রীয় সমিতি চাষের জমি সম্বন্ধে আইন করিতে পারেন না। হিন্দু আইন কমিটি আশা করেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সমিতি চাষের জমি সম্বন্ধে প্রস্তাবিত আইনের অনুরূপ আইন প্রণয়ন করিবেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে বিবাহিতা কন্যা পিতার বাসভবনের কিয়দংশ পাইবেন, কিন্তু ঐ কন্যার ননদিনীগণ তাহার শ্বশুরের বাসভবনের কিয়দংশ পাইবেন। সুতরাং প্রত্যেক বিবাহিতা রমণী দূরস্থ পিতৃগৃহের কিয়দংশ পাইবেন, যে গৃহে বাস করেন, সেই গৃহের কিয়দংশ হইতে বঞ্চিত হইবেন। বলাবাহুল্য, যে গৃহে কেহ বাস করে, সেই গৃহের কিয়দংশের মূল্য অধিক, দূরবর্তী গৃহ—যেখানে সে বাস করে না, তাহার মূল্য অল্প। প্রস্তাবিত আইনের ফলে বিবাহিতা রমণীগণ যে গৃহে বাস করেন, সে গৃহের অংশ হারাইবেন, দূরবর্তী গৃহের অংশ পাইবেন। যাহা হারাইবেন, তাহার অংশ অধিক, যাহা পাইবেন, তাহার অংশ অল্প।

"বিবাহিতা রমণী দূরস্থ পিতৃগৃহের কিয়দংশ পাইবেন, যে গৃহে বাস করেন সেই গৃহের কিয়দংশ হইতে বঞ্চিত হইবেন,··· যাহা হারাইবেন তাহার অংশ অধিক, যাহা পাইবেন তাহার অংশ অল্প"—এই যুক্তি স্বীকার করা কঠিন। বিবাহিতা নারীর স্বামী বর্তমানে সম্পত্তিতে নিজস্ব প্রয়োজন থাকে না, বৈধব্য ঘটিলেই সম্পত্তির আবশ্যকতা দেখা দেয়। বর্তমান আইনে বিধবা মৃত স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন ইহা সত্য, কিন্তু চাকুরীজীবী সম্পত্তিবিহীন লোকের লক্ষ লক্ষ বিধবার কথাই এখানে প্রণিধানযোগ্য। পিতা বা ভ্রাতার গলগ্রহ হইয়া দাসীর অধম জীবনযাপন ইঁহাদের নিয়তি। এ দেশে ইংরেজ আগমনের প্রাক্কালে দেশের অর্থনৈতিক চরম অবনতির সঙ্গে বিধবার ভরণপোষণ সমস্যা তীব্র হইয়া উঠে; এক দল লোক তাঁহাদিগকে স্বামীর চিতায় পুড়াইয়া মারিয়া এই সমস্যার সহজ সমাধান করিতে আরম্ভ করেন। সহমরণ অতি প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে ছিল বটে, কিন্তু ব্যাপক প্রয়োগ মুসলমান আমলের শেষভাগে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অরাজকতার সময়েই বৃদ্ধি পায়। রাজা রামমোহন রায় এই পাপ দূর করেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় বিধবা সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সমস্যার তীব্রতা স্বীকার করিলেন কিন্তু তিনিও উহার সমাধানের কোন আভাস দিতে পারিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইতিপূর্বে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু দেশ ব্যাপক ভাবে উহা গ্রহণ করিল না। যে বিধবা নারীকে আজ পুত্রকন্যার হাত ধরিয়া পিতৃভিটায় ফিরিয়া আসিতে হইতেছে দাসীবৃত্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাহার নিজস্ব সম্পত্তির একান্ত প্রয়োজন। যে ভাগ্যহীনা কন্যা বা ভগিনী পিতা বা ভ্রাতার নিকট উপযুক্ত মর্য্যাদার সহিত আশ্রয় লাভ করেন পৃথক্ সম্পত্তিতে প্রয়োজন তাঁহার না হইতে পারে কিন্তু যে বিধবা সর্বত্র বঞ্চিত, নিজস্ব সম্পত্তি ভিন্ন তাঁহার কোন উপায়ান্তর থাকে না। সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান ইহাতেও হইবে না, চাকুরীজীবী পিতার কন্যার অবস্থা সমানই থাকিবে, তথাপি ইহাতে বহু নিরাশ্রয়া নারীর সুবিধা হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বিবাহিতা রমণী মোটের উপর যে সম্পত্তি পাইবেন, প্রস্তাবিত আইনে তাহার মূল্য কমিয়া যাইবে। কারণ, নিকটবর্তী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিয়া দূরবর্তী ব্যক্তিকে সম্পত্তি দেওয়া হইবে। মোট সম্পত্তির মূল্য কমিয়া যাওয়ার অন্য কারণও আছে। সম্পত্তি খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভাগ করিলেই উহার মূল্য কমিয়া যায়। আজকাল চাষের জমি এত বেশী অংশে বিভক্ত হইয়াছে যে, তাহাতে চাষের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। আজকাল সম্পত্তি যত খণ্ডে বিভক্ত হইতেছে, প্রস্তাবিত আইন অনুসারে তাহার দ্বিগুণ অংশে বিভক্ত হইবে (সমাজে মোটামুটি পুত্র ও কন্যার অংশ সমান ধরা যাইতে পারে)। সম্পত্তি বিভাগের ব্যয়ভার সম্পত্তির মূল্য কমাইয়া দিবে। আজকাল সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যেই বিভক্ত হয়, পুত্রেরা সেই গৃহেই বাস করে, এজন্য অনেক সময় গৃহ বিভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে বিভাগ করা হয় না। বিবাহিত কন্যার অংশ ভাড়া দেওয়া হইবে বা বিক্রয় করা হইবে। সুতরাং তাহা নির্দিষ্ট ভাবে বিভক্ত করা প্রয়োজন হইবে।

বর্তমানে সম্পত্তি খণ্ডীকরণ ও মূল্যহ্রাস যে ভাবে চলিতেছে, কন্যাকে উত্তরাধিকার না দিলে তাহা বন্ধ হইবে না, এক পুরুষ পিছাইবে এই মাত্র।

তৃতীয়তঃ, কন্যার বিবাহের সময় আজকাল যাহাদিগের যথেষ্ট অর্থ নাই, তাহারা ঋণ করিয়াও সৎপাত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে। কন্যা আর

সম্পত্তির অংশ পাইবে না, এজন্ত তাহার বিবাহের সময় কিছু অধিক ব্যয় করিতে কেহ আপত্তি করে না। কন্যা যদি পরে সম্পত্তির অংশ পায়, তাহা হইলে তাহার বিবাহের সময় ব্যয়সঙ্কোচ করিবার চেষ্টা হইবে, ফলে সৎপাত্র পাইবার সম্ভাবনা কম হইবে। ধনীর কন্যার পক্ষে ইহাতে অনিষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কন্যার পিতা ধনী নহে। ঐ পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি বিশেষ কিছু পাইবার আশা অল্প, সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৎপাত্র পাইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

সকল কন্যার পিতা সৎপাত্রের ক্রয়-মূল্য একযোগে কমাইয়া দিলে বিবাহের ব্যয় অনেক কমিবে, ইহাতে সমগ্র সমাজেরই লাভ। সৎপাত্রের ক্রয়-মূল্য কমিয়া গেলে দেশে ভাল ছেলে জন্মিবে না এ যুক্তি মানিয়া লইতে আমরা অসমর্থ।

চতুর্থতঃ, বর্তমান আইনে অবিবাহিতা কন্যার খোরপোষ এবং বিবাহের ব্যয় পিতার সম্পত্তি হইতে দিতে হয়। কন্যার মাতা এবং ভ্রাতারা সম্পত্তি থাকিলে তাহা হইতে, না থাকিলে ঋণ করিয়া বিবাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। প্রস্তাবিত আইনে কন্যারা সম্পত্তির অংশ পাইবে তাহা হইতে বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। সুতরাং মাতা ও ভ্রাতাদিগের দায়িত্ব কমিয়া যাইবে। কন্যার বয়স ১৮ বৎসরের কম হইলে সে সম্পত্তির নিজ অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে না। ১৮ বৎসরের পরেও তাহার পক্ষে বাসভবনের অংশ বাহির করিয়া বিক্রয় করিয়া নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করা আমাদিগের সমাজে অস্বাভাবিক। ভ্রাতাগণ স্বভাবতঃ এ বিষয়ে অনিচ্ছুক থাকিবেন; কারণ, বাসভবনের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

কন্যা সম্পত্তির অংশ পাইলেই পিতামাতা বা ভ্রাতা তাহার বিবাহের ব্যয় বহনে অস্বীকৃত হইবেন, ভারতীয় পিতা বা ভ্রাতাকে আমরা এতটা নিষ্করুণ বা হৃদয়হীন মনে করিতে পারি না। অনাগত দুর্দ্দিনের জন্য কন্যার অংশটুকু যাহাতে বজায় থাকে তৎপ্রতি দায়িত্বশীল পিতা বা ভ্রাতার লক্ষ্য থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক। কন্যাকে নিজের বিবাহের ব্যয় সংগ্রহ করিতে হইলেও ভয়ের কারণ নাই—লেখকের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতেও তাহাই মনে হয়। বিবাহের ব্যয় কমিয়া গেলে, বিশেষতঃ পাত্রের ক্রয়-মূল্য উঠিয়া গেলে স্বল্প ব্যয়েই বিবাহ সম্ভব হইবে।

পঞ্চমতঃ, পূর্ব্ববঙ্গে অনেক সময় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী গুণ্ডারা হিন্দু রমণী হরণ করে এবং এই সকল রমণী দায়ে পড়িয়া ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করে। প্রস্তাবিত আইনে এই সকল রমণী পিতার সম্পত্তির অংশ পাইবে। ইহাতে ঐ সকল গুণ্ডার অপহরণ করিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে।

মুসলমান রমণীর সম্পত্তিতে অধিকার আছে, তৎসত্ত্বেও গুণ্ডারা মুসলমান নারী হরণে উৎসাহিত হয় নাই। হিন্দু নারীকে গুণ্ডার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা হিন্দুসমাজের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। নারী সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পাইলে দলে দলে গুণ্ডারা তাঁহাদিগকে হরণ করিবে—যে সমাজ এই আশায় নারীর উত্তরাধিকার দানে কুণ্ঠিত সভ্য সমাজে মুখ দেখাইবার অধিকারও তাহার নাই।

ষষ্ঠতঃ, হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক ব্যবস্থা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দু সমাজের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, (ক) ইহাতে জাতিবিভাগ আছে, (খ) স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, (গ) বিবাহ-বিচ্ছেদ নাই, (ঘ) বিবাহিতা কন্যা পিতার সম্পত্তির অংশ পায় না। প্রস্তাবিত আইনে হিন্দুসমাজের এই সকল বিশেষত্ব বিনষ্ট হইবে। সুতরাং হিন্দুর অবনতি হওয়া সম্ভব। একথা বলা যায় না যে, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে এই সকল বিশেষত্ব নাই; তথাপি তাহারা উন্নত। তাহারা স্বাধীন জাতি, তাহাদিগের অর্থসম্পত্তি অধিক, জলবায়ু বিভিন্ন. এজন্য তাহাদিগের সহিত হিন্দু জাতির তুলনা করা দুরূহ।

উপরোক্ত বিশেষত্ব চতুষ্টয় হিন্দু সভ্যতার আদর্শ নহে। যে অবস্থায় ও যে কারণে গুণ কর্ম্ম বিভাগের জন্য জাতিভেদ-প্রথা সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, বর্তমান অবস্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই, আপাততঃ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে জাতিভেদ-প্রথার কিছুমাত্র বর্তমান যুগে অবশিষ্ট নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি সকল বর্ণের লোকেই পরাধীন ভারতবর্ষে এক মহা শূদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। স্বগোত্রে বিবাহ হিন্দু-সমাজে নিষিদ্ধ, এবং পৃথিবীর অন্য অনেক সমাজে কার্য্যতঃ অচল। ইহার কারণ প্রধানতঃ জাতিতত্ত্বমূলক। স্বগোত্রে বিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বৈজ্ঞানিক আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। হিন্দুসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ নাই এ ধারণা ভ্রান্ত; কৌটিল্য বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করিয়াছেন এবং অথর্ববেদে পর্যন্ত উহার উল্লেখ আছে। হিন্দুসমাজে বিবাহিতা কন্যা সম্পত্তির অংশ পাইত না এই কারণে যে, যৌথপরিবার প্রথায় উহার প্রয়োজন ছিল না। যৌথপরিবার পদ্ধতি যত দিন আমাদের দেশে সক্রিয়ভাবে প্রচলিত ছিল তত দিন অভাগিনী নারীর আশ্রয়ের অভাব ঘটে নাই, তাঁহার মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিধবার জীবন শান্তিপূর্ণ করিবার জন্য যৌথপরিবারের প্রত্যেকে চেষ্টা করিত, সহানুভূতি ও সহৃদয়তার অভাব সেখানে ছিল না। ইংরেজ আমলে বিলাতী সভ্যতা আমদানীর পর যৌথপরিবার ভাঙিয়া যাওয়াতেই স্বামীহীনা নারীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে এবং তাঁহার পক্ষে নিজের ও নাবালক পুত্র কন্যা থাকিলে তাহাদের ভরণপোষণের জন্য পৃথক সম্পত্তির আবশ্যকতাও এত তীব্র হইয়াছে।

কলিকাতার বস্তি এবং মিঃ কেসির মন্তব্য

বাংলার গবর্ণর মিঃ কেসি কলিকাতার কয়েকটি বস্তি পরিদর্শন করিয়া লাটভবনে ফিরিয়া আসিয়া এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—"যাহা দেখিয়া আসিলাম তাহাতে শঙ্কিত হইয়াছি। আমি এইমাত্র প্রধান মন্ত্রী, কলিকাতার মেয়র ও মিঃ ই. ডব্লিউ, হল্যাণ্ডের (জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের সেক্রেটারী) সহিত কলিকাতার বস্তি অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিলাম। লক্ষ লক্ষ লোক কি ভাবে জীবন ধারণ করিতেছে তাহাই আমি দেখিলাম। কোন মানুষই এরূপ অবস্থার মধ্যে অন্য কোন মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারে না। তাহাদিগের এই অবস্থার জন্য কাহারা দায়ী—এ প্রশ্ন আমি তুলিতে চাহি না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, এই অবস্থার উন্নতিসাধন করা এবং রাজনীতি কিংবা কায়েমী স্বার্থকে এই পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে না দেওয়া। ছয় মাসের মধ্যে এ সম্বন্ধে কি করা হইয়াছে, কলিকাতার অধিবাসিগণের এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে।"

এই ব্যাপার লইয়া ইহার পর আরও আলোচনা হইয়াছে এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বস্তির উন্নতির জন্য তিন কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহাদি নির্মাণের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত

করিতেছেন বলিয়াও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যে সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের কথা চলিতেছে এবং কর্পোরেশনের শ্বেতাঙ্গ দল তাহাতে যথাসাধ্য বাধাদান করিতেছেন ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ লাটসাহেবকে বস্তি দেখাইবার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না কেহ কেহ এ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, দৈনিক বসুমতী ইহা লিখিয়াছেনও। বস্তিগুলি পরিষ্কার রাখিবার দায়িত্ব কর্পোরেশনের।

এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমরা করিতে চাহি না। কিন্তু মিঃ কেসির একটি উক্তি—"তাহাদিগের এই অবস্থার জন্য কাহারা দায়ী এ প্রশ্ন আমি তুলিতে চাহি না"—আমরা আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি। মিঃ কেসি বস্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন, বাংলার গ্রামগুলির বর্তমান অবস্থা দেখিলে কি মনে করিতেন আমরা জানি না। লাটসাহেবের মফঃস্বল ভ্রমণের যাত্রাপথ এবং গন্তব্য স্থান পূর্বে নির্ধারিত হয় এবং তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই সেগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে মেরামত ও সজ্জিত করা হয়। দারিদ্র্যের ও দুর্দশার প্রতিমূর্তি পল্লীগ্রামগুলিতে লাট-বেলাটের পদধূলি পড়ে না, পড়িলেও তাহার বাহিরের রূপটাই তাঁহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হয়। মিঃ কেসি বিনা নোটিশে কলিকাতা হইতে ৫০ মাইলের মধ্যে হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার আগে সুন্দরবন অঞ্চলের পল্লীগ্রামগুলি বিনা নোটিশে পরিদর্শন করিয়া ঐ সব স্থানের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহিত স্থানীয় অবস্থার আলোচনা করিলে দেশের বর্তমান ভয়াবহ দুরবস্থার অন্ততঃ কতকটা পরিচয় পাইবেন। দুর্দশার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নও অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। গ্রামবাসী বাঙালী এবং অন্যান্য প্রত্যেক প্রদেশের লোক মর্মে মর্মে জানে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত সমস্ত দুর্দশার মূল রাজনৈতিক পরাধীনতা। গত দুর্ভিক্ষে পরাধীন ভারতবাসী দেখিয়াছে রেল ও ষ্টীমারের উপর কর্তৃত্বের অভাবে বাহির হইতে যথাসময়ে খাদ্য আমদানী সম্ভব হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়াছে; আর স্বাধীন ব্রিটেনে ঐ দুটির উপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব আছে বলিয়া প্রচণ্ড ইউ-বোট সংগ্রামের মধ্যেও ব্রিটেনে খাদ্যাভাব ঘটে নাই।

বঙ্গীয় স্বদেশী শিল্প সম্মেলনে সর্ এম. বিশ্বেশ্বরায়ার অভিভাষণ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বদেশী শিল্পসঙ্ঘের প্রথম সম্মেলন কলিকাতায় সর্ এম. বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে সম্মেলনের আহ্বায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বক্তৃতা করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এস, কে, রায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাপতি সর্ এম, বিশ্বেশ্বরায়া সভাপতির অভিভাষণে বলেন: "নিখিল-ভারত স্বদেশী শিল্প-প্রণেতা সঙ্ঘের উদ্দেশ্য শুধু ইহাই নহে যে, প্রত্যেক প্রদেশে তাহারা বড় বড় শিল্প গড়িয়া তুলিবে। কুটিরশিল্পের উন্নয়নও সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫টি এজেন্সী এই শিল্পগঠন-প্রচেষ্টায় কাজ করিতেছে। এই কাজে যদি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদিগের সহিত সহযোগিতা করেন, তবে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। এ সম্পর্কে আমরাও নানাভাবে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

"গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, শত বৎসরেরও অধিককালব্যাপী আমরা যে রাজনীতিক অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করিতেছি, তাহাতে পদে পদে এই সকল শিল্প-গঠন-প্রচেষ্টায় আমাদিগের উদ্যম নিয়োজিত করিতে পারি না। প্রাথমিক গণ-শিক্ষা এবং ব্যবসা ও শিল্প চালাইতে হইলে যে সকল ট্রেনিং প্রয়োজন, আমরা তাহা পাই না বা দিতে পারি না। এই বাধা-বন্ধনই আমাদিগের অগ্রগতির একমাত্র অন্তরায়। ফলে বেকার-সমস্যা আমাদিগের দেশে চরম আকার ধারণ করিয়াছে; দুঃখ ও দারিদ্র্যই আজ হইয়াছে আমাদিগের জীবনের পথের সাথী। সরকার এ বিষয়ে নির্বাক, নেতৃবৃন্দের মধ্যেও অনেকে সমাজসেবামূলক কাজে অগ্রসর হন না। কেহ বা আবার সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়েও এ ব্যাপারে মাথা ঘামান না। এই সকল কারণে দেশ যে কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে, গত বৎসর কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে তাহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল।"

উপসংহারে সর্ এম, বিশ্বেশ্বরায়া আমেরিকা ও রাশিয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন, শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলেই এই সব দেশ এত বড় হইয়াছে। গণশিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় সেখানকার জনগণ আত্মসচেতন হইয়াছে। শিক্ষার উন্নতি এবং প্রকৃত গণশিক্ষার বিস্তার না হইলে কখনই দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে বড় হইতে পারিবে না। শিক্ষিত ইংরেজ গবর্মেণ্ট এই কঠিন সত্য মর্মে মর্মে অবগত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষে গণশিক্ষা বিস্তার বন্ধ রাখিবার জন্য দুই শতাব্দীব্যাপী তাহার প্রাণান্ত চেষ্টা এবং উচ্চশিক্ষা পঙ্গু ও সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিবার জন্য এত ব্যাপক ও তীব্র প্রয়াস।

সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কর্মবীর আলামোহন দাশ বলেন, গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী শিল্পসম্ভার গড়িয়া না তুলিলে কখনই পাশ্চাত্যের নিকট দাঁড়াইতে পারিবে না। এই দেশের শিল্পপতিরা যত দিন পর্য্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব হইতে মুক্ত হন, তত দিন এদেশের শিল্পপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

স্বদেশী মিল-মালিকদের অনেকের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দেখা যায় ইহা দুঃখের বিষয় হইলেও কঠোর সত্য। বাঙালীর স্বদেশী মনোভাবের ফলে যে মিল-মালিক আজ লক্ষপতি হইয়াছেন, অপর এক স্বদেশী শিল্পকে একটুখানি সাহায্যদানেও তিনি কুণ্ঠিত। "বাংলার পণ্য কিনে হও ধন্য"—আপিস কক্ষে এই বাণী টাঙ্গাইয়া রাখিয়া মিল-মালিক অতি উৎকৃষ্ট স্বদেশী দ্রব্য পাইয়াও উহা না লইয়া বিলাতী জিনিষ কিনিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। ইহা প্রত্যেক স্বদেশী শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। স্বদেশী শিল্পসঙ্ঘ এ দিকে যেন দৃষ্টি রাখেন। স্বদেশী মিল-মালিকেরা একে অপরকে সাহায্য না করিলে নিজেদের ধ্বংসের দিনই আগাইয়া আনিবেন। স্বদেশী শিল্পসঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে।

ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ

ছাত্রসমাজের উদ্যোগে গত ১৬ই অগ্রহায়ণ শিবনাথ মেমোরিয়াল হলে সাধু টি এল ভাস্বানী "ভারতের আদর্শ ও শিক্ষা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশাত্মবোধ, ত্যাগ ও সেবাধর্মে দীক্ষিত হওয়াই শিক্ষার মহান্ আদর্শ। বস্তুজগৎকে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না, উহার প্রতিও যথোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে। জাতীয় জীবনে কার্য্যকরী শিক্ষারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

তরুণদিগকে লক্ষ্য করিয়া সাধু ভাস্বানী বলেন: "তরুণ-হৃদয়ের মধ্যেই বিপুল আশা ও আকাঙ্ক্ষার হিল্লোল বহিয়া যায়। ভারতের যে আদর্শের দিকে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, তাহা হইতেছে 'বহুর মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি কর'। এই একমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে আর্য, বৌদ্ধ ও ইসলাম—এই তিনটি শক্তি সভ্য ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন আর্য ঋষিগণের কণ্ঠ হইতে যে ঐক্যের বাণী প্রচারিত হইয়াছে তাহাই ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র সম্পদ। আজ পৃথিবীর আয়তন প্রসারিত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান অগ্রগামী জগতে ভারতবর্ষের ছাত্রদিগকে জার্মানী, আমেরিকা ও রুশিয়ার নিকট হইতে অনেক কিছুই শিখিতে হইবে। রুশিয়া আজ জগতের সম্মুখে যে নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষার বিষয়। রুশিয়ার স্কুল কলেজ হইতে আমাদের দেশের ন্যায় চিরাচরিত পরীক্ষাগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। সেখানকার ছাত্ররা ইহাই শিক্ষা করে, কেমন করিয়া অপরকে ভালবাসিতে হয়—কেমন করিয়া দেশের সমৃদ্ধিসাধনে আত্মনিয়োগ করা যায়।"

সাধু ভাস্বানী শিক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করেন—(১) শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা, (২) বাস্তবের প্রতি যত্নশীলতা, এবং (৩) দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি। তাঁহার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাস করাই ছাত্রদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, দেশীয় শিল্প ও সম্পদ যাহাতে সমৃদ্ধ হয় সে বিষয়েও ছাত্রসমাজকে অবহিত হইতে হইবে।

কলিকাতায় যানবাহন সমস্যা

কলিকাতার যানবাহন সমস্যা ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। চালু বাসগুলির প্রায় সবই বহু পুরাতন, মাঝপথে প্রায়ই আজকাল বাস বিকল হওয়ায় যাত্রীদের চূড়ান্ত অসুবিধা হইতেছে। ট্রামের ভিড় সব সময়েই সমান। পূর্বে রাত্রে যতক্ষণ বাস ও ট্রাম চলিত বর্তমানে তদপেক্ষা সময় অনেক কমাইয়া দেওয়ায় সন্ধ্যার পর ভীড় আরও বাড়িয়াছে। গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই রাত্রে বাস ও ট্রাম চলার সময় বাড়াইবার সুযোগ ও আদেশ দিয়া এই অসুবিধা অনেকটা দূর করিতে পারেন। এ আর পির জন্য যে কয়েক শত বাস আটকাইয়া রাখা হইয়াছে সেগুলি ছাড়িয়া দিবার সময় হইয়াছে কলিকাতাবাসী ইহা মনে করে। ইহাদের সবগুলি অযথা আটকাইয়া না রাখিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধেকও আপাততঃ ছাড়িয়া দিলে যাত্রীদের অনেক সুবিধা হইতে পারে। বাংলায় কয়েকটি স্থান ভিন্ন সর্বত্র এ. আর. পি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কলিকাতায় এ বিষয়ে অন্ততঃ একটু সুবিধা দেওয়ার সময় নিশ্চয়ই হইয়াছে। লণ্ডনে ত ব্ল্যাক আউট পর্য্যন্ত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতায় বাসে ট্রামে যাত্রীবৃদ্ধির একটা বড় কারণ যুদ্ধ। যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত লোককেই দিনের মধ্যে বহু বার ভ্রমণ করিতে হয়। সৈন্তদের ভ্রমণ ত ঐ সঙ্গে আছেই। সৈন্তদের ও সামরিক কার্য্যে রত ব্যক্তিদের জন্য শহরের প্রধান প্রধান বাস রুটগুলিতে মিলিটারী লরীর সাহায্যে কয়েকটি বিশেষ লাইন খুলিয়া দিলে বে-সামরিক যাত্রীদের লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা অনেক কমিতে পারে।

কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ

কেন্দ্রীয় সরকার গত বৎসর কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা প্রত্যাহার করিয়াছেন। সর্ জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ৩০শে নবেম্বর ভারত-সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমানে বাংলার খাদ্যের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকার গত বৎসর যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বহন করিবার প্রয়োজন তাঁহার মতে আর নাই। তিনি বলেন, "সরকার কলিকাতার গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বাংলা-সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবেন যে কলিকাতার প্রয়োজন যথোপযুক্ত ভাবে মিটানো হইবে। সুতরাং আমরা গত বৎসর যে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলাম, এখন আমরা তাহা প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছুক।" সর্ জোয়ালাপ্রসাদ আশ্বাস দিয়াছেন যে ভারত-সরকার মাঝে মাঝে অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবেন এবং কলিকাতাসহ বাংলার ন্যায্য প্রয়োজন মিটানো হইতেছে এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইবার চেষ্টা করিবেন। তবে বাংলায় যে পরিমাণ গম পাঠানো আবশ্যক তাহা তাঁহারা পাঠাইতে থাকিবেন। বাংলা-সরকারের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহারা ইতিমধ্যেই প্রায় দশ লক্ষ টন ধান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সংগ্রহ-কার্য্য এখনও চলিতেছে। সর্ জোয়ালাপ্রসাদ ভরসা করেন যে, ঘাটতি জেলাগুলির বর্তমান বৎসরের অভাব পূরণ করিয়াও বহু পরিমাণ ধান আগামী বৎসরের জন্য মজুদ রাখা যাইবে।

ভারত-সরকার গত বৎসর কলিকাতার খাদ্য সরবরাহের ভার গ্রহণ করাতে কলিকাতাবাসী খাদ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে এক মারাত্মক অনিশ্চিত অবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বাংলা-সরকারের কার্য্যকলাপের ফলে উহার প্রতি লোকের আস্থা নিতান্ত শিথিল হইয়া গিয়াছিল ভারত-সচিব পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ভারত-সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত খাদ্য বিতরণেও ইঁহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, অতি জঘন্য খাদ্য লোককে দেওয়া হইয়াছে এবং মজুদ রাখিবার অব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ মণ মূল্যবান্ খাদ্য নষ্ট হইয়াছে। লোককে যে অপকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে সর্ জোয়ালাপ্রসাদ ইহা স্বীকার করিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে প্রদেশে প্রদেশে খাদ্যশস্যের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার জন্য একটি পরীক্ষাবিভাগ (ইন্‌সপেক্‌সন্ ডিরেক্টোরেট) গঠিত হইতেছে। শস্যের উৎকর্ষ এবং মজুদ ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য এরূপ ডিরেক্টোরেট গত

বৎসরেই গঠিত হওয়া উচিত ছিল। এই দুইটি বিষয়েই বাংলা-সরকার জনমতের প্রতি যে নিদারুণ উপেক্ষা ও শৈথিল্য দেখাইতেছেন তাহাতে তাঁহাদের প্রতি লোকের আস্থা ফিরিয়া আসা ক্রমেই কঠিন হইতেছে। জনসাধারণের ধারণা গতানুগতিক ভাবেও অবস্থার যেটুকু উন্নতি হইবে ইঁহারা তাহারই কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইঁহাদের হস্তক্ষেপে উন্নতির যেটুকু আশা স্বাভাবিক ভাবে আছে তাহাও ব্যাহত হইবে।

কলিকাতা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এই শহরে যুদ্ধের কাজে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বে-সামরিক বহু লক্ষ লোক আসিয়াছে। সৈন্যদল তো আছেই। ইহাদের জন্য খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেই থাকা উচিত ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পরিত্যাগের পরিণাম কি হইবে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা বুঝা যাইবে। যানবাহনের উপর বাংলা-সরকারের হাত নাই, ইহাতে কলিকাতায় খাদ্য আমদানী বাধা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। গুদামে শস্য মজুত রাখিবার সুবন্দোবস্তের উন্নতি হইয়াছে বলিয়াও আমরা অবগত নহি। সরকারী গুদামে হাজার হাজার মণ আটা প্রভৃতি পচিবার সংবাদ এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

ব্রিটেনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচারকার্য

ব্রিটেনের ভারতীয় কংগ্রেস কর্মীসঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বসু ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে পৌঁছিলে 'বোম্বে ক্রনিকেল' পত্রের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ ও কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রচারকার্যের ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত বসু বলেন, "ইংলণ্ডে সংরক্ষণশীল দলের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। এই দলের সদস্যদিগের মধ্যে আমরা খুব সামান্যই প্রচারকার্য চালাইয়াছি, এই দিক দিয়া একটা ভুল হইয়া গিয়াছে—কংগ্রেসের দাবীর যৌক্তিকতা না হউক কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে তাহাদিগের মনে একটা ধারণা সৃষ্টি করার জন্য আমাদিগের চেষ্টা করা উচিত। চার্চিলের বিশ্বজনীন নীতির বিরুদ্ধে সংরক্ষণশীল দলের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে—ব্রিটেনের শ্রমশিল্প এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ইহাদিগের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে, জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যে মার্কিণের প্রভাবে উঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। সংরক্ষণশীল দলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কংগ্রেসের পশ্চাতে দেশের অধিকসংখ্যক জনগণের সমর্থন আছে এবং স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন চলিতে থাকিবে। সংরক্ষণশীল সদস্যগণ যদি বুঝিতে পারে যে, কংগ্রেস ও ভারতীয়দিগের আশা-আকাঙ্ক্ষা দমন করা কঠিন হইবে তাহা হইলে কংগ্রেস সম্পর্কে তাহাদিগের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন হইতে পারে। হিন্দু মুসলমান অনৈক্যের ধুয়া তুলিয়া বিলাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চালান হইয়া থাকে, মিঃ জিন্না ও মোসলেম লীগের প্রাধান্য খুব ফলাও করিয়া প্রচার করা হয়। কংগ্রেস একটি ধনিক প্রতিষ্ঠান এই মর্মেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালান হয় এবং বলা হয়, কংগ্রেসের শাসনে ভারতের জনগণকে নিপীড়িত করা হইবে।"

দাদাভাই নৌরজী, ডব্লিউ সি বোনার্জি প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী কংগ্রেস-নেতারা ভারতবর্ষের বাহিরে, বিশেষতঃ ব্রিটেনে ভারতবর্ষ ও কংগ্রেস-সংক্রান্ত প্রচারকার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেন। এজন্য প্রচুর পরিমাণে সময় শক্তি ও অর্থ-ব্যয়ে তাঁহারা কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। লণ্ডনে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকাটির পুরাতন সংখ্যাগুলি দেখিলে বুঝা যায় কি অসামান্য নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে অকাট্য তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা করিতেন। এই পত্রিকাটি তুলিয়া দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে ভুলই হইয়াছে। বর্তমান জগতে জনমতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার বা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। এই যুদ্ধে ইহা আরও তীব্র ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এশিয়ার পক্ষে পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা যুদ্ধের পর আরও বাড়িবে। কংগ্রেসের পক্ষে একটি সুগঠিত বিশ্ব-প্রচার-দপ্তর এখন হইতেই গড়িয়া তোলা কর্তব্য।

বাংলার নৌকাবিভ্রাট

সর্ জন হার্ব্বার্ট কর্তৃক নৌকাপসারণের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। এক দিকে যেমন উহা লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ও চূড়ান্ত দুর্দশার কারণ হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই উহার ফলে কতক লোকের কপাল ফিরিয়াছে, কেহ কেহ লক্ষপতি হইয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব পরীক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্তা, অডিটর-জেনেরাল সর্ ক্যামেরণ ব্যাডেনকের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে বাংলায় নৌকা সাইকেল চাউল প্রভৃতি সরাইবার জন্য যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকার হিসাব পাওয়া যায় নাই। সর্ ক্যামেরণের কথায় মনে হয় যেন টাকাটা লুট হইয়াছে, যে বা যাহারা ট্রেজারীতে গিয়াছে তাহারাই টাকা পাইয়াছে। বাংলার একাউন্টেন্ট-জেনারেল বাধা দিতে গিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। ট্রেজারী সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সুযোগ লইয়া বাংলা-সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা বাহির করিয়া লইবার ঢালা হুকুম দিয়াছেন।

অপসারিত নৌকাগুলিকে অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়া নষ্ট করা হইয়াছে। তারপর নূতন করিয়া নৌকা নির্ম্মাণের জন্য আরও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। নৌকা-ব্যবসায়ীদিগকে সোজাসুজি টাকা দিয়া সহজ ভাবে কাজটা না করিয়া সরকারী আওতায় নৌকা নির্মাণে কতক লোক বিপুল লাভ করিতেছে প্রকাশ্যে এই অভিযোগ উঠিয়াছে। এই কাজের ভার লইয়াছেন বাংলা শিল্প-বিভাগ।

ডিরেক্টর মিঃ মিত্রের অধীনে এই শিল্প-বিভাগ কিছুদিন ছাতার বাঁট, বোতাম, আঠা প্রভৃতি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল। শিল্প প্রতিষ্ঠার যে-সব বিবরণ এই বিভাগ কর্তৃক ফলাও করিয়া জাহির করা হইত, কলিকাতার কোন বিখ্যাত পত্রিকা তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করেন। রাজবন্দিগণকে শিল্প শিক্ষাদানের

নাম করিয়াও কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট করা হয়। যুদ্ধ বাধিবার পর এই বিভাগ সরকারের জন্য শোলার টুপী, তাঁবু, গেঞ্জী, জাল প্রভৃতি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে, সমগ্র বিভাগটি সাপ্লাই বিভাগের একটি শাখায় পরিণত হয়। বাংলায় যে-সব শিল্প এই যুদ্ধের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের একটিও শিল্প বিভাগের নিকট সাহায্য পাইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ডিরেক্টরের স্বজন লইয়া গঠিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট নামক প্রতিষ্ঠানটিও কোন শিল্পকে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাংলার শিল্প-প্রচেষ্টায় সাহায্য করা দূরে থাকুক, মিঃ মিত্রের পরিচালনায় এই বিভাগ দেশের শিল্পোন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টিই করিয়া আসিয়াছে, করদাতাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ইহার পরিচালনায় অপচয় হইয়াছে। গবর্ণ্মেণ্টের তাঁবেদারীর পুরস্কার অবশ্য ইনি পাইয়াছেন, সম্প্রতি ইঁহার পদোন্নতি হইয়াছে। ইঁহার পর যিনি ডিরেক্টর হইয়াছেন, চামড়ার বাজারে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়ের সংবাদ আমরা পাইতেছি, যথাসময়ে তাহা প্রকাশিত হইবে।

নৌকা নির্মাণ সম্পর্কে দৈনিক বসুমতী ১২ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। শিল্প-বিভাগ বা বাংলা-সরকার আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন জবাব দেন নাই। বসুমতী লিখিয়াছেন:—

"প্রকাশ, নৌকাগুলির মধ্যে বহু নৌকা জ্বালানী কাঠের হিসাবে নামমাত্র মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে এবং যাহা এক হাজার টাকায় সরকার বিক্রয় করিয়াছেন, তাহাই ক্রেতা ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে জিজ্ঞাস্য—

(১) কে কাহার আদেশে নৌকাগুলি জ্বালানী কাঠের জন্য বিক্রয় করিয়াছিল?

(২) যে কিনিয়া লাভবান হইয়াছিল, সে কে এবং কাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে?

(৩) কেন নৌকাগুলি যত্নে রক্ষা করা হয় নাই? এক একখানি নৌকা, যত্নে রাখিলে, বহু দিনেও নষ্ট হয় না এবং যত্ন করিবার ব্যবস্থা এ দেশে ধীবর প্রভৃতির অজ্ঞাত নাই—"গাব দেওয়া" প্রভৃতি প্রথা সহজেই অবলম্বিত হইতে পারিত।

(৪) গঠনের সুবিধা হইবে বলিয়া ভাল নৌকাও ভাঙা হয় নাই ত?

(৫) লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে সকল নৌকা এখন নির্মিত হইতেছে, সে সকল সরকারের তাঁবেই নির্মিত হইতেছে কি? যাহাদিগের নৌকা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ বাবদে অর্থ দিলে তাহারা চিরাগত নিয়মে তাহা নির্মাণ করিতে বা করাইতে পারিত—তাহাতে সমগ্র বাংলার বহু লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে কাজটা কেন্দ্রীভূত করিয়া লাভ—কাণ্টি ক্রাফটস প্রভৃতিতে কয় জনের তহবিল পুষ্ট করিত না।

(৬) যে কাঠ নৌকা নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা নৌকা নির্মাণের কতদূর উপযোগী?

(৭) নৌকা নির্মাণ করা হইবে স্থির হইলে কাঠের সন্ধানে [illegible] শিল্প-বিভাগের সচিবের জঙ্গলে লোক পাঠান হইয়াছিল কি? সে কাজ যিনি করিয়াছিলেন, তিনিই কি নবাব গোলাম কাদের ফরোকী হইতে আরম্ভ করিয়া যিনি যখন ঐ বিভাগের সচিব হইয়াছেন, তাঁহাকেই তুষ্ট করিয়া আসিয়াছেন? নবাব ফারোকীর নির্বাচনের মামলায় তাঁহার নাম কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল?

(৮) যে হাঙ্গেরিয়ান ইহুদিটি আজ ডেপুটির দক্ষিণ হস্ত, সে—

(ক) পূর্বে কোন মাড়বারীর বা ঐরূপ কোন ব্যবসায়ীর চাকরী করিত কিনা?

(খ) সে চাকরীতে তাহার মাসিক বেতন কিরূপ ছিল?

(গ) এখন তাহার বেতন কত?

(ঘ) তাহাকে যে কাজে রাখা হইয়াছে সে কাজে তাহার অভিজ্ঞতা সে কোন্ দেশে, কোথায়, কবে, কিরূপে অর্জন করিয়াছে?

আর তাহার সাধারণ শিক্ষা কিরূপ এবং সে সমাজের কোন্ স্তরে উদ্ভূত? কর্মচারী ও জনসাধারণের সহিত তাহার ব্যবহারের অভিযোগ আমরা পাইয়াছি, সেই সকলের জন্যই আমাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে।

ইংরেজীতে যাহাকে "বুলি" বলে—সরকারের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে কি তাহার স্থান থাকিতে পারে?

ঐ হাঙ্গেরিয়ান ইহুদীটির সহিত ঠিকাদারদিগের ব্যবহার কিরূপ? কাণ্ট্রিক্রাফটস্ সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার কিরূপ হইয়াছে?

আমরা আজ আর শোলার টুপীর কথা—স্থানাভাবহেতু—বলিব না, কিন্তু আমাদিগের হস্তে প্রমাণ আছে, সামরিক প্রয়োজন বলিয়া বহু লোকের ব্যবসা বন্ধ করিয়া ব্যবসায়ীদিগকে নিরন্ন করিয়া যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধানের অনেক সুত্র আছে, এবং সেই সকল সুত্র অবলম্বন করিলে অনেকের ক্যামুফ্লেজ জালের রহস্য ভেদ করা যাইবে।

আজ অনুসন্ধান করিবার সময় আসিয়াছে—

(১) কিরূপ যোগ্যতাবলে কোণ্ কোন্ লোক উৎপাদন বিভাগে কাজ পাইয়াছে এবং পূর্বে বাংলার শিল্প-বিভাগে চাকরীতে হাত পাকাইয়াছিল।

(২) কি ভাবে বিভাগের কাজ চলিয়াছে ও চলিতেছে।

(৩) প্রয়োজনের সুযোগ লইয়া উৎপাদনের ব্যয় অযথা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে কি না।"

হাঙ্গেরিয়ান ইহুদীটির নাম আলেকজাণ্ডর কোভাক্স। হিন্দ মেশিনের ব্যাপারে এই ব্যক্তির সুনাম লাটপ্রাসাদেও পৌঁছিয়াছিল কি না এবং ইনি পূর্বেও বাংলার ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজের পরামর্শ দাতা ও ঐরূপ আরও কিছু ছিলেন কি না, বসুমতী সে প্রশ্ন তুলিয়াও কোন জবাব পান নাই। গত জুন মাসে দশ হাজার নির্দিষ্ট মূল্যে নৌকা নির্মাণের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল এবং ডিসেম্বরের মধ্যে উহা শেষ করিয়া আরও নৌকা নির্মাণের কথা ছিল। কিন্তু ঐ দশ হাজার নৌকা নির্মাণও এখনও শেষ হয় নাই। যেভাবে এখন নৌকা নির্মাণ কার্য্য চলিতেছে তাহাতে মনে হইতে পারে যে নৌকা নাশে যেমন বহুলোকের সর্বনাশ হইয়াছে, তেমনই কতকগুলি লোক নৌকা তৈয়ির কণ্ট্রাক্ট পাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছে।

এক দিকে চালু নৌকা অযত্নে রাখিয়া নষ্ট করা হইয়াছে, জ্বালানী কাঠের জন্য ঐগুলি সস্তায় কিনিয়া কেহ কেহ লাভবান হইতেছে, আর এক দিকে পঞ্জাবী প্রভৃতি ঠিকাদারদের কারখানায় বাংলার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে নৌকা নির্মিত হইতেছে। এই ব্যাপারে রুংটা, রিজেন্ট ষ্টেটস প্রভৃতি যাহাদের নাম উঠিয়াছে তাহাদের সবিশেষ পরিচয় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

বাংলার শিল্প-বিভাগ এবং উহার প্রাক্তন ও বর্তমান ডিরেক্টর উভয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ব্যাপক তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল জে, সি, দে বিহার ও বাংলা দেশের জন-স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন: "এই বছরের প্রথম হইতেই বিহারে কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। কেবলমাত্র ত্রিহুত জেলায়ই নাকি জানুয়ারি হইতে জুলাই মাসের মধ্যে দুই লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। ঠিক এই সময়ই একাদিক্রমে ৩২ সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতায় মহামারীর আকারে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং বাংলার কয়েকটি জেলায় কলেরা ও বসন্ত ভীষণ আকার ধারণ করে। এখন বাংলায় বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ প্রকোপ চলিতেছে—অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। গ্রামাঞ্চলের মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা পাওয়া সহজ নহে। ম্যালেরিয়ার ঔষধপত্রও দূর গ্রামাঞ্চলে সহজলভ্য নহে। ঔষধ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও এ বছর ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। প্রকাশ পাইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গে এমন কোন বাড়ী নাই যেখানে ম্যালেরিয়া নাই। মহামারীর আকারে উহার প্রকোপ সর্বত্র—মৃত্যুর হারও অত্যধিক—ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব এলাকায়ই ইহার প্রকোপ সর্বাধিক। যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তবে কুইনাইন এবং মেপাক্রিন যুদ্ধের আগে যেমন হইত সেইভাবে পোষ্ট অফিসগুলির মারফৎ বিক্রয় করা যায় না কি? ইউনিয়ন বোর্ডের ডিস্পেন্সারীগুলি ছাড়া গ্রাম্য পাঠশালা, মক্তব, বিদ্যালয়, গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মাতব্বর—ইঁহাদিগের মারফৎ বিনামূল্যে বিতরণ করাও চলে না কি? এই সঙ্গে অবশ্য পরিদর্শনের জন্য অর্থাৎ ঔষধ ঠিক রোগীর কাছে পৌঁছিতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত রাখা দরকার। ব্যাপক ম্যালেরিয়া-নিরোধ আন্দোলনই আজিকার দিনে চরম কর্তব্য।"

পোষ্টাফিসের মারফৎ পূর্বের ন্যায় কুইনাইন বিক্রয়ের যে প্রস্তাব কর্ণেল দে করিয়াছেন, চোরাবাজারের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ভিন্ন অপর সকলেই তাহা সমর্থন করিবেন। এরূপ প্রস্তাব পূর্বেও হইয়াছে কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। চোরাবাজারে ঔষধপত্র জমাইয়া রাখা, অতিলাভ, ঔষধে বাজে জিনিষ মেশানো এবং ভুয়া লেবেল মারিয়া ঔষধ বিক্রয় প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া কর্ণেল দে বলেন যে, এই সমুদয়ের বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং রোগীরা ইহাতে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শুধু কর্ণেল দে নহেন সমগ্র দেশবাসী বিশ্বাস করে যে এই অবস্থার প্রতিকার-ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে।

চাঁদপুরের খ্রীষ্টান ধর্মযাজক

চাঁদপুর হিন্দু মহাসভার সম্পাদক এবং স্থানীয় জনৈক উকীল ইউনাইটেড প্রেসকে জানাইয়াছে যে সরকারী খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন ভারতীয় খ্রীষ্টান ধর্মযাজক অধিক খাদ্য ও বস্ত্র দিবার প্রলোভন দেখাইয়া দুঃস্থা স্ত্রীলোকগণকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা উহাদের নিকট হইতে এই কারণে খাদ্য ও বস্ত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ কয়েকটি পরিবার এই প্রলোভন সম্বরণ না করিতে পারিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক বিভাগ নামক একটি সরকারী দপ্তর আছে, উহা স্বয়ং বড়লাটের অধীন এবং উহার ব্যয় নির্বাহের জন্য বার্ষিক ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এই ব্যয়ের উপর কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন ব্যবস্থা-পরিষদেরই হাত নাই। লোককে বুঝাইয়া ধর্মান্তরিত করিবার অধিকার হিন্দু মুসলমান করদাতাদের প্রদত্ত অর্থে পুষ্ট এই সব পাদ্রীদের আছে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষে দুর্দশার সুযোগে সরকারী সাহায্যদানে তারতম্য করিয়া ফুসলাইয়া কাহাকেও ধর্মান্তরিত করিবার নৈতিক বা আইনসঙ্গত কোন অধিকারই ইহাদের নাই। অভিযোগটি গুরুতর, এ সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিথ্যা হইলে তাহাও জনসাধারণকে জানান উচিত।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা বন্ধের আয়োজন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রচলিত নিয়মানুসারে কোন বিলের আলোচনার সময় স্পীকার স্থির করিতে পারিতেন, আলোচনার সময় নির্ধারণের উপর সরকারের কোন হাত ছিল না। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী খাজা সর্ নাজিমুদ্দীন পরিষদের নিয়মাবলী পরিবর্তন করিয়া আলোচনা বন্ধের আদেশদানের অধিকার গবর্ণরের উপর অর্পণ করিবার জন্য এক বিল আনিয়াছেন। গবর্ণর মন্ত্রীদের উপদেশানুসারে এই আদেশ দিবেন বিলের ইহাই মর্ম। পরিষদের কংগ্রেস দল, বসু-দল, জাতীয় দল, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল প্রভৃতি সরকার-বিরোধী দলসমূহ এই বিলের বিরোধিতা করিয়াছেন, লীগ ও ইউরোপীয় এবং কিছু তপশীলী সদস্য ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সরকারপক্ষে এই বিলের সমর্থনে খাজা সর্ নাজিমুদ্দীন এবং ইউরোপীয় দলের প্রধান হুইপ মিঃ ষ্টার্ক ভিন্ন আর কেহই বিলের সমর্থনে বক্তৃতা করিতে উঠেন নাই, হুইপদের চাবুকে ভোটের লবীতে গিয়া ভোট দিয়াছেন।

আলোচ্য বিলটি বিশেষ ভাবে নিন্দনীয় এই জন্য যে উহা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী। পরিষদে কোন বিষয়ের আলোচনা অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হইলে সদস্যেরা নিজেরাই আলোচনা বন্ধের প্রস্তাব (closure motion) আনিয়া উহা শেষ করিতে পারেন। সদস্যদের এই মূল অধিকার সাময়িক ভোটের জোরে বিদেশী গবর্মেণ্টের প্রতিনিধির হাতে সমর্পণ করা কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। গণতন্ত্রবিরোধী এই লীগ-অভিযানে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের শ্বেতাঙ্গ

দলের উৎসাহ লক্ষণীয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নামে যে সামান্ত কয়েকটি অধিকার দেশবাসী পাইয়াছিল, তাঁবেদার লীগ মন্ত্রীদের বেনামীতে তাহা পুনরায় হরণ করিবার বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পুনর্গঠন ভাণ্ডার

ইউরোপের নাৎসী কবলমুক্ত দেশগুলিতে খাদ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহে ব্যস্ত UNRRA ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষে অথবা দুর্ভিক্ষাক্রান্ত মড়ক নিবারণে মন দিবার অবসর পান নাই। ভারত-সরকারের তরফ হইতে এরূপ কোন অনুরোধও তাঁহাদের নিকট যায় নাই, সঙ্ঘের কর্মকর্তা এবং ভারত-সচিব মিঃ আমেরী তাহাও সাড়ম্বরে জানাইয়াছেন। অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতবর্ষে সাহায্য না আসিলেও ভারতবর্ষ হইতে উহার জন্য মোটা রকমের চাঁদা আদায়ের আয়োজনের ত্রুটি হয়ত হইবে না। আমাদের আশঙ্কা ফলিয়াছে, ভারত-সরকার UNRRA-কে ছয় কোটি টাকা চাঁদা দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে চলিয়াও গিয়াছে। যে ছয় কোটি টাকা ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইত, সেই টাকায় ইউরোপের সাহেবদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিস্কুট, জুতা প্রভৃতি প্রদত্ত হইবে ইহাই পরাধীনতার অভিশাপ।

ভারতবর্ষের সহিত কানাডার অর্থনৈতিক চুক্তি

কানাডা ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি পরস্পর সাহায্য-বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। চুক্তিটি অটোয়ায় স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারত-সরকারের পক্ষে গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতে সেনাবাহিনীর জন্য যে মোটরগাড়ীর প্রয়োজন তাহার একটি মোটা ভাগ কানাডা হইতে সরবরাহ হইতেছে। উক্ত চুক্তি অনুসারে কানাডা ভারতবর্ষস্থ সেনাবাহিনীতে ব্যবহারের জন্য ভারত-সরকারকে যে-সব মাল সরবরাহ করিবে তাহাতে মোটরগাড়ী ও উহার সরঞ্জাম থাকিবে। শত শত রেলওয়ে ইঞ্জিন, যাহা যুদ্ধের মধ্যেই অনায়াসে ভারতবর্ষে নির্মিত হইতে পারিত, তাহারও অর্ডার কানাডাকে দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিশ ডোমিয়নগুলি হইতে বর্তমান সঙ্কটে ব্রিটেনের বহু দ্রব্য প্রয়োজন। উহার মূল্য দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। কাজেই কামধেনু ভারতবর্ষ হইতে অর্ডার পাওয়াইয়া দিয়া নিজের সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। ভারত-সরকার নামে ভারতবর্ষে যে ব্যক্তিমণ্ডলী পরিচিত, দেশের জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের বিন্দুমাত্র যোগ নাই। তাঁহাদের নিয়োগ, কর্মকাল ও পদচ্যুতি সবই নির্ভর করে বড়লাট তথা ভারত-সচিবের মর্জির উপর। ইঁহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বার্থবিরোধী ও নিজেদের সুবিধাজনক কাজ করাইয়া লওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। সর্ গিরিজাশঙ্কর যাহা করিয়াছেন এই পরিষদের অথবা তাঁহাদের প্রভু ভারত-সচিবের নির্দেশেই তাহা করিয়াছেন, এবং ইঁহারাই তাঁহাকে সমর্থন করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃতা করিবেন।

সিন্ধুর শ্বেতাঙ্গ সচিব

সিন্ধুতে ইউরোপীয় মন্ত্রী নিয়োগ লইয়া প্রধান মন্ত্রী সর্ গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লার সহিত মিঃ জিন্নার যে বিরোধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে। সর্ গোলাম হোসেন মিঃ জিন্নার জিদ মানিয়া লইয়াছেন, মন্ত্রী মিঃ টমাস পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে কৃষি-বিভাগের উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলে ইউরোপীয় মন্ত্রী নিয়োগে দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মিঃ জিন্না এবং আরও অনেকে ইহাতে তীব্র আপত্তি করেন এই যুক্তিতে যে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সাহেবদের মন্ত্রীমণ্ডলে প্রবেশ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। মিঃ টমাসের নিয়োগের সহিত এই যুক্তির কোন সম্পর্ক নাই। টমাস সাহেব ইউরোপীয় হইলেও তিনি সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে জমি কিনিয়া চাষবাস করিতেছেন এবং প্রাদেশিক কৃষির উন্নতির জন্যই তিনি নামমাত্র বেতনে মন্ত্রীমণ্ডলে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইঁহার বা এই শ্রেণীর ইউ-রোপীয়ের সহিত ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সাহেবদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মিঃ টমাসের 'হোম' সিন্ধু, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সাহেবদের 'হোম' ব্রিটেন। শেষোক্ত শ্রেণীর সাহেবদের এদেশে অবস্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন, প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহের পর ইঁহারা স্বদেশে প্রস্থান করেন। ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি এই কারণে ইঁহাদের কোন দরদ হয় না, হইতেও পারে না।

মিঃ জিন্না ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সাহেবদের মন্ত্রীমণ্ডলে প্রবেশের কথা ভাবিয়া শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহাদেরই ভোটের উপর লীগ দলের মন্ত্রিত্ব জীয়াইয়া রাখিতে তিনি কুণ্ঠা-বোধ করেন নাই। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সাহেবরা বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে যে প্রভুত্ব করিয়া থাকেন, মন্ত্রীমণ্ডলে স্থান লাভ তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। তাঁহাদের আদেশ বা নির্দেশ উপেক্ষা করিবার অধিকার বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলের নাই, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ভোটের উপর মন্ত্রীদলকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়া তাঁহাদের উপর যে প্রভুত্ব ইঁহারা করিয়া থাকেন, মন্ত্রীমণ্ডলে একটি বা দুইটি আসন লইয়া তাহা করা অসম্ভব। মিঃ জিন্না ইহাতে আপত্তি করেন নাই, তিনি মাথা পাতিয়া এই অবস্থা মানিয়া লইয়াছেন।

সিন্ধুর এই ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রতি মিঃ জিন্নার প্রধান অভিযোগের অসারতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে জিন্না সাহেবের সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই ছিল যে তাঁহারা প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল নিয়োগ প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অপহ্নব ঘটাই-তেন। সিন্ধুর ঘটনায় প্রমাণিত হইল যে মিঃ জিন্নার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রয়োজন হইলেই তিনি প্রাদেশিক রাজ-নীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিবেন না।

মানবের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ

মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জর্জ বার্ণার্ড শ সম্প্রতি কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা এমন সুন্দরভাবে করা সম্ভব, যাহাতে

কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিরা বার্ষিক ২০ হাজার পাউণ্ড উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে ও ৪০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিবে ; এবং অল্প পরিশ্রমী লোকেরা বার্ষিক ছয় শত পাউণ্ড রোজগার করিতে পারিবে ও ৬০ বৎসর বয়সে অবসর লইবে। ভবিষ্যতে সকলকে কাজ দেওয়াই কেবল গবর্মেণ্টের কর্তব্য হইবে না, প্রত্যেকের পক্ষে কাজ বাধ্যতামূলকও করিতে হইবে।"

বার্ণার্ড শ-এর মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করা যে সম্পূর্ণ সম্ভব সোভিয়েট রাশিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। ২০ হাজার বা ছয় শত পাউণ্ড উপার্জন অথবা অবসর গ্রহণের বয়সের বাঁধা-ধরা নিয়ম সকল ক্ষেত্রে কাম্য আদর্শ না হইতে পারে, কিন্তু দেশের প্রত্যেকটি মানুষের কর্মপ্রাপ্তির পন্থা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহার পরিশ্রমলব্ধ অর্থে সম্পূর্ণ সচ্ছল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সুযোগ গবর্মেণ্ট চেষ্টা করিলে দান করিতে পারে, সোভিয়েট রাশিয়া ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেশবাসী প্রতিটি মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আদর্শ গ্রহণ না করিলে অবশ্য কোন দেশের গবর্মেণ্টের পক্ষে ইহা করা সম্ভব নহে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের নাগরিকদের মধ্যে পরস্পর অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া বার্ণার্ড শ বলেন, "আমেরিকানদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে, কেবল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাল নাগরিক হওয়াই যথেষ্ট নয় ; তাহা-দিগকে ভাল ইউরোপীয় ও ভাল এসিয়াবাসী হইতে হইবে—সমগ্র বিশ্বের উত্তম নাগরিক হইতে হইবে। নূতন ও ব্যাপক-তর দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন ; যাহার ফলে কোলন, রটারডম বা লণ্ডনে বোমা বর্ষিত হইলে মার্কিন ও ইংরেজ সবাই বলিবে, "ইহা আমারও ক্ষতি—আমারই একটি শহর ধ্বংস হইয়াছে।"

এই মনোভাবের পরিচয় আমেরিকা বা ইউরোপবাসীর নিকট হইতে এসিয়ার অধিবাসীরা এখনও পায় নাই।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ৬৬তম জন্মতিথি

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ৬৬তম জন্মতিথি দিবসে তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী বাংলার কাব্য-ভাণ্ডারে তাঁহার দানের কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া গত ১৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে এক জয়ন্তী উৎসবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর মঙ্গলাচরণের পর শ্রীযুত নলিনীকান্ত সরকার কর্তৃক কবি-সম্বর্ধনা উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত একটি সঙ্গীত গীত হয়। কবি নজরুল ইসলাম এই সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর দেশবাসীর পক্ষ হইতে কবিকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাহা পাঠ করেন। অভিনন্দন-বাণী একখানি রৌপ্য ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া উহা একটি চন্দন কাঠের আধারে কবির হাতে অর্পণ করা হয়।

অতঃপর কবিশেখর কালিদাস রায়, শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীযুত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুনির্মল বসু, শ্রীযুত প্রভাতকিরণ বসু, শ্রীযুত অখিলচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুত বিজন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত মৃণাল বাগচী প্রভৃতি তাঁহাদের স্বরচিত কবিতায় এবং শ্রীযুত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুত বীরেন ভদ্র, শ্রীমতী উমা মজুমদার, শ্রীযুত ননী দাশগুপ্ত, শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুত প্রবোধকুমার সান্যাল কবি-রচিত বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করিয়া কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতা রেশনিঙে খাদ্যের অবস্থা

কলিকাতা রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কলিকাতা রেশনিঙে প্রদত্ত খাদ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে নিকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহের জন্য শহরবাসীর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট হানি হইয়াছে। ইহার পর চাউলের উন্নতি কতকটা হইয়াছে বটে, কিন্তু আটার অবস্থা এখনও খুবই খারাপ।

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন পাঠানো হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ওয়ার্ড-সমূহের চিকিৎসকদের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যায় এবং ইহার মধ্যে শহরের কয়েক জন সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসকের উত্তরই ছিল :

১—৬, ৮, ১০—১৪, ১৬, ১৮—২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০ এবং ৩১ অর্থাৎ ৩২টির মধ্যে ২৪টি ওয়ার্ড হইতেই উত্তর আসিয়া-ছিল। চিকিৎসকগণকে ৭টি প্রশ্ন করা হইয়াছিল। প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে দেওয়া হইল। রেশনের চাউল ও আটা ভাল অথবা চলনসই এরূপ কথা একজন চিকিৎসকও বলেন নাই।

প্রশ্ন ১। শহরে রেশনিং আরম্ভ হইবার পর আপনার হাতের রোগী অথবা পাড়ার লোকদের মধ্যে কোনরূপ স্বাস্থ্যহানি লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকিলে উহা কি ধরণের এবং রেশনের খাদ্যকে উহার জন্য দায়ী করা যায় কি ?

উত্তর। হাঁ,, হজমশক্তি এবং ওজন হ্রাস, উদরাময়, আন্ত্রিক প্রদাহ, অজীর্ণরোগ, আমাশয়, মিউকাস কোলাইটিস, অন্ত্রের অন্যান্য রোগ, কর্মশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দেখা যাইতেছে।

প্রশ্ন। ২। এই সময়ে সাধারণতঃ অন্ত্রের রোগ একটু বাড়ে ইহা স্বীকার করিয়াও আপনি কি মনে করেন পাকস্থলী ও আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বাড়িতেছে ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন ৩। রেশনের চাউল ও আটাই রোগের কারণ আপনার রোগীরা কি এই অভিযোগ করিয়া থাকে ? আপনার পরীক্ষায় এই অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে হয় কি ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন ৪। নিকৃষ্ট চাউল ও আটা লোককে খাইতে বাধ্য করিবার জন্যই আজকাল উদরাময়, অজীর্ণতা ও আমাশয় অত্য-ধিক বাড়িতেছে এই অভিযোগ আপনি নিজে প্রকৃতই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন কি ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন ৫। কলিকাতায় রেশনিং প্রবর্তনের পর শহরবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনার আর কিছু বলিবার আছে কি ?

উত্তর। লোকের চেহারা ক্যাকাসে, অম্ল বৃদ্ধি, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু বৃদ্ধি, সাধারণ স্বাস্থ্যহানি, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে রক্তহীনতা, বেরিবেরি, ভাবা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস প্রভৃতি হইতেছে।

প্রশ্ন ৬। তরকারি, মাছ, ডিম, মাংস, দুধ, ঘি, লবণ ও তৈলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে পুষ্টিকর আহারে বঞ্চিত হওয়ায় শহরের শতকরা ৯০টি পরিবারই অপুষ্টিজনিত রক্তহীনতায় ভুগিতেছে বলিয়া কি আপনি মনে করেন?

উত্তর। হাঁ। কয়েকজন ডাক্তারের মতে শতকরা হার আরও বেশী।

প্রশ্ন ৭। প্রদেশের সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় আপনি রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধির আশঙ্কা করেন কি? আপনার মতে ১৯১৮ সালের ন্যায় ইনফ্লুয়েঞ্জা মড়ক ঘটিতে পারে কি?

উত্তর। হাঁ।

উত্তরের সঙ্গে চিকিৎসকেরা সাধারণ ভাবে নিজ নিজ মন্তব্যও করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১১ নং ওয়ার্ডের জনৈক বিশিষ্ট চিকিৎসক যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"কয়েক দিন পূর্বে সরকারী দোকান হইতে আমি যে আটা পাই তাহা দেখিয়া পচা মনে হইল, উহাতে পোকাও ছিল। আমি উহার নমুনা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসারকে পাঠাইলে তিনি পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে উহা 'মানুষের খাদ্যের অনুপযুক্ত।' আমি ঐ চিঠির নকল রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইলে তাঁহারা আমাকে ঐ বিভাগের টেকনিকাল এডভাইসারের নিকট পত্র লিখিতে উপদেশ দিলেন। সন্ধান লইয়া জানিলাম উক্ত তথাকথিত টেকনিকাল এডভাইসরের পদে কোন বৈজ্ঞানিককে বসানো হয় নাই, বাটা সু কোম্পানী হইতে জনৈক ব্যক্তিকে আনিয়া ঐ পদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কয়েক মাস আগে বাংলা-সরকারের স্যানিটারী বোর্ড সিভিল সাপ্লাই বিভাগকে বলিয়াছিলেন যে রেশনিং দোকানে বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যগুলি পূর্বে রাসায়নিক পরীক্ষা করা এবং উহাতে রোগের বীজাণু আছে কি না তাহা দেখা দরকার। ঐ সঙ্গে আমি বাংলা-সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটরীকেও এ বিষয় জানাইয়াছিলাম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত স্যানিটারী বোর্ডের পরামর্শানুসারে কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই।

খাদ্য মজুত সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নাই ইহা সর্বজনবিদিত। যে আটা আজকাল দেওয়া হয় তাহার স্বাদ তিক্ত এবং উহা খাইলে পেটে ব্যথা হয়। চাউলের সামান্য উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ডাল এখনও জঘন্য। খাদ্যে ভেজাল দেওয়া অবাধে চলিতেছে, খাদ্য পরীক্ষা করিবার এবং ভেজাল বন্ধ করিবার কোন. ব্যবস্থা নাই। খাদ্যের পরিমাণ কম, এবং উহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। জনস্বাস্থ্যের উপর ইহার ফল খারাপ হইতে বাধ্য। কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবেন প্রতিরোধ-সাধ্য রোগে মৃত্যুহার অত্যধিক বাড়িতেছে, গরীব এবং অল্প বয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে অবস্থা আরও খারাপ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

রেশনিং প্রবর্তনের পর কলিকাতাবাসী এবং কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক খাদ্যে ভেজাল নিবারণের সমস্ত চেষ্টা গবর্মেণ্টের বাধায় ব্যর্থ হইয়াছে দেশবাসী ইহা ভুলে নাই।

লবণের মূল্য

যুদ্ধের পূর্ববর্তী দর অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ অধিক মূল্যে লবণ বিক্রয়ের কারণ সিভিল সাপ্লাই বিভাগ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা ষ্টেটসম্যানে পত্র লিখিয়া জনৈক ক্রেতা তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে এবং বর্তমানে লবণ তৈরির তুলনামূলক ব্যয়, জাহাজে লবণ আমদানীর ভাড়া, বোঝাই করিবার ও নামাইবার ব্যয় প্রভৃতির হিসাব দিয়া লবণ বিক্রয়ে যে অতিলাভ করা হইতেছে না কর্তৃপক্ষ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেন কি? লবণ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য; এই অত্যাবশ্যক দ্রব্য বিক্রয়ে অতিলাভ আইনের সাহায্যে করা হইতেছে বলিয়া লোকে মনে করিলে সে ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিতে সরকার প্রস্তুত আছেন কি? পত্রখানি ২৯শে নবেম্বর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার ১৫ দিন পরেও (১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) উহার কোন প্রতিবাদ বা হিসাব গবর্মেণ্ট প্রকাশ করেন নাই; বিপুল অর্থব্যয়ে অল্পদিন পূর্বে সম্প্রসারিত সরকারী প্রচার-বিভাগের দৃষ্টিপথে পত্রখানি পড়ে নাই, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। লবণ রেশনের দোকান ভিন্ন বিক্রয় হয় না। সরকারী কৈফিয়ৎ প্রকাশিত না হইলে গবর্মেণ্ট জানিয়া শুনিয়া এই বিপুল লাভ করিয়াছেন লোকে ইহাই বিশ্বাস করিবে।

চিত্র-পরিচয়

ছড়ি-শা-মাদার কথাটির মানে হইতেছে পীর শা মাদারের বাঁশের পতাকা। উত্তর-ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় এবং নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে এখনো দম-ই-মাদার একটি প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান। আগে আগে লোকেরা একটি বাঁশের পতাকা (ছড়ি) হাতে করিয়া "দম-ই-মাদার" (মাদারের শ্বাস) বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইত। তাহাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, এই ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে সাপের বিষে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

ছবিতে পীর শা মাদারকে একটি চাঁদোয়ার নীচে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে। ভক্তদের নিকট হইতে ভেট গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন।

শা মাদার আলেপ্পোতে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান ইব্রাহিম শারকির রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কানপুরের নিকটবর্তী মাকুনপুরে তিনি ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সেখানে তাঁহার সমাধির উপর সুলতান ইব্রাহিম কর্তৃক একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপের যুদ্ধে এখন এক পক্ষ অর্থাৎ জার্ম্মানি স্থাণুভাব আনিবার চেষ্টা করিতেছে এবং বিপক্ষ অর্থাৎ মিত্রপক্ষ এবং সোভিয়েট যুদ্ধের গতিতে তরলভাব রাখিবার চেষ্টা চালাইতেছে। বিগত শরৎকালে যুদ্ধের পরিস্থিতি যাহা ছিল এখন তাহার তুলনায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পশ্চিম প্রান্তের উত্তর ভাগে, অর্থাৎ যেখানে ব্রিটিশ ও ক্যানাডিয় সেনা ফিল্ডমার্শাল মণ্টগোমেরীর তত্ত্বাবধানে লড়িতেছে, যুদ্ধ প্রায় স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত খুলিবার পর হইতে অদ্যাবধি মার্শাল (পূর্ব্বে জেনারেল) মণ্টগোমেরী ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে বা হলাণ্ডের সীমানায় বিশেষ কোন দ্রুত প্রগতি বা পরিবর্ত্তন দেখাইতে পারেন নাই। বর্ত্তমানেও জার্ম্মান রক্ষীদল মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-প্রান্তের ঐ অংশকে প্রায় স্থানাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আরও দক্ষিণে আমেরিকান সেনার অগ্রগতির উপর মণ্টগোমেরীর সচলতা নির্ভর করিতেছে। আমেরিকান সেনাদলগুলি, বিশেষতঃ জেনারেল প্যাটনের দল, প্রচণ্ড যুদ্ধ দানে বিপক্ষের প্রতিরোধ-শক্তি ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেখানেও, অতি প্রবল শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও, যুদ্ধরেখা অতি মন্থর গতিতে হেলিতেছে। বস্তুতঃপক্ষে বর্ত্তমানে যে অবিশ্রাম অগ্নিবর্ষণের মধ্য দিয়া দারুণ সংগ্রাম চলিয়াছে ইহা জার্ম্মান দলের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থার মুখবন্ধ মাত্র। ইহাতে মিত্রপক্ষের অভিযানমুখগুলির গতিবেগ হ্রাস করাইয়া, তাহাদের পথের দিক ফিরাইয়া, সেগুলিকে সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক ভাবে অচল করার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা সফল হইলে মিত্রপক্ষের অভিযান খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বিপক্ষের দুর্গমালার উপর ঘাত-প্রতিঘাত চালাইতে বাধ্য হইবে। ইহার ফলে যুদ্ধের সম্মুখগতি অতি মন্থর হইয়া পড়িবে এবং বিপক্ষের দুর্গমালার সম্মুখের অংশ বিধ্বস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে আরও দুর্গপরিখা ইত্যাদি নির্ম্মিত হইতে থাকিবে। রক্ষীদল এই ভাবে অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে মিত্রপক্ষের বিশাল বাহিনীগুলিকে প্রত্যেক স্থলেই কিছু দিনের মত ঠেকাইতে সমর্থ হইবে। এইরূপ যুদ্ধে আক্রমণকারীর ক্ষয় ও ব্যয় দুই-ই রক্ষীদল অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইতে পারে। বলাবাহুল্য, জার্ম্মান সমর-পরিষদের এই চেষ্টা সফল হইলে পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ অতিশয় ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে এবং সেই কারণেই এখন মিত্রপক্ষ সমস্ত স্থল ও আকাশ শক্তির যুগপৎ প্রয়োগে এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রান্তের অভিযান গঠনে মিত্রপক্ষ প্রতিপদে অতিসুনিপুণ যুদ্ধকৌশলের সম্মুখীন হওয়ায়, পশ্চিম রণাঙ্গনে তাহাদের যুদ্ধশক্তির পূর্ণ প্রয়োগে অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে এখন অতিশয় প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্য দিয়া মিত্রপক্ষের অভিযান চলিতেছে এবং যুদ্ধরেখার প্রত্যেক অংশেই যুদ্ধের গতিবেগ ক্রমেই মন্থরতর হইয়া পড়িতেছে। যে সময় জার্ম্মান সেনা পশ্চাৎপদ হইয়া, ফ্রান্স ছাড়িয়া, নিজ সীমান্তের দিকে চলিতেছিল এবং তিনটি আমেরিকান বাহিনী সেন নদী পার হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হয়, তখন ফ্রান্সে যুদ্ধের অবস্থা অতিশয় তরল ছিল, অর্থাৎ কোনও নির্দ্দিষ্ট যুদ্ধরেখা ছিল না বলিলেই চলিত, এবং কোথায়, কখন ও কিরূপ



প্রিন্সেস এলিজাবেথ ব্রিটেনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ জলে ভাসাইতেছেন

ওজনে মিত্রপক্ষের চরম শক্তি জার্ম্মান রক্ষাব্যূহের ছেদনে নিযুক্ত হইবে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। তখনকার অবস্থা এবং এখনকার অবস্থায় অনেক প্রভেদ আসিয়া পড়িয়াছে, কেননা, এখন জার্ম্মান রক্ষাব্যূহ কঠিন ও সুসংলগ্ন ভাবে গঠিত এবং তাহার পিছনে দিগন্তবিস্তৃত দুর্গমালা এখন সতর্ক ও সজাগ ভাব গ্রহণ করিয়াছে। এখন মিত্রপক্ষকে প্রতি গজ জমী প্রচণ্ড যুদ্ধে লাভ করিতে হইতেছে এবং দুর্গমালা ছেদন সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রের ভারে ও সৈন্যশক্তির বলে অল্পে অল্পে করিতে হইতেছে। এক কথায় এখন "ধারে কাটা" আর নাই, "ভারে কাটা" চলিতেছে। অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়ার ফলেই জার্ম্মান সমর-পরিষদ মিত্রপক্ষের সৈন্যবলের এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ সৈন্য লইয়াই এরূপ বিষম প্রতিরোধ চেষ্টায় সমর্থ। এরূপ অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটা খুব সম্ভব মনে হয় না, কিন্তু পরিবর্ত্তন না ঘটিলে পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ সময়সাপেক্ষ এবং অত্যন্ত ব্যয় ও ক্ষয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। মিত্রসেনা সবেমাত্র এক অংশে জার্ম্মানির পশ্চিম দুর্গমালার (জিগফ্রিড লাইন) সংস্পর্শে আসিয়াছে, অন্য সকল অংশে এখনও তত দূরও পৌঁছায় নাই, সুতরাং যুদ্ধ আরও প্রখর এবং স্থাণু হওয়াই সম্ভব এবং সেই যুদ্ধ বর্ত্তমান প্রাকৃতিক অবস্থায় ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে। অনুকূল অবস্থার প্রতীক্ষায় অভিযান স্থগিত রাখার উপায় নাই বোধ হয়, নহিলে এসময়ে এরূপ ঘোর রণ চালিত হইত না। কেন উপায় নাই, অর্থাৎ সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে মিত্রপক্ষের কি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে অনেক জল্পনাকল্পনা

হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভয়ের কারণ বোধ হয় জাপানের সমরশক্তির বৃদ্ধির রকম।

পূর্ব্বপ্রান্তের যুদ্ধে সোভিয়েট সেনাও এখন আরও নিদারুণ প্রাকৃতিক অবস্থার প্রকোপে আপেক্ষিক ভাবে আড়ষ্ট। এখন পূর্ব্ব-ইউরোপের সুদূর প্রসারিত রণাঙ্গনের একটি মাত্র অংশে যুদ্ধ চলিতেছে, অন্য সকল দিকে যুদ্ধ বিরতিই স্পষ্ট, তবে দুই পক্ষই সে সকল স্থানে স্থানাবদ্ধ, কেহই শক্তি সরাইতে সমর্থ নহে। বুদাপেস্তের নিকট এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে ইহা প্রায় দুই মাসের খণ্ড যুদ্ধের পরিণতি, সুতরাং এখানে কোনও রূপ নিষ্পত্তিবাচক ফলাফল সম্ভব নহে। এখানে বুদাপেস্ত রুশ সেনার হস্তগত হইবার পর যুদ্ধ সমভাবেই চলার সম্ভাবনা দেখা যায়, যদিও যুদ্ধরেখা বেশ কিছু সরিয়া যাইতে পারে। রুমানিয়ায় রুশ সেনা প্রবেশ করিয়াছিল রুমানীয় রাষ্ট্রপতিদিগের সহায়তায়, সুতরাং সেখানে দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটে যাহার ফলে সমস্ত রুমানিয়ায় এবং বল্কান অঞ্চলের অধিকাংশে মিত্রপক্ষের ও সোভিয়েটের আধিপত্য সহজেই বিস্তৃত হয়। হাঙ্গেরীতে যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে—যদিও সে যুদ্ধের আরম্ভ রুমানিয়ার পতনের এত পরে হইল কেন তাহা বুঝা যায় না—সুতরাং সে ক্ষেত্রে রুশ সেনার অগ্রগতি অতি ধীর ভাবে হইয়াছে। ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রান্তে, বল্টিক অঞ্চলে, পূর্ব্ব প্রুসিয়ায়, পোল্যাণ্ডে এবং কার্পাথিয় পর্ব্বতমালায় যুদ্ধের আগুন মাঝে মাঝে জ্বলিয়া নিবিয়া আসিয়াছে এবং এ সকল অঞ্চলে গত মাসে সোভিয়েট সেনা বিশেষ কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই। এ সকল অঞ্চলেই সৈন্য রসদ ইত্যাদির সরবরাহ ব্যাপারে এবং আশ্রয়-ব্যবস্থায় এখন জার্ম্মান দলের অবস্থা সোভিয়েট সেনার তুলনায় অনেক ভাল—সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে কারণেই হউক ইউরোপের পূর্ব্ব-রণাঙ্গনেও জার্ম্মান রক্ষীসেনা এখনও প্রবল বাধা দানে সমর্থ রহিয়াছে তাহা বিগত তিন মাসের যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

ইটালীতে যুদ্ধের অবস্থার কোনও বিশেষ প্রভেদ গত মাসে ঘটে নাই, সেখানে যুদ্ধের গতি পূর্ব্বেকার মতই আছে। বল্কান অঞ্চলে অক্ষশক্তির সঙ্গে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ ঘটে নাই। যুদ্ধ যাহা হইয়াছে তাহা ব্রিটেনের—এবং পরে সোভিয়েটের হয়ত—কূট রাষ্ট্রনীতির এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়, যাহার সঙ্গে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের কোন মুখ্য সম্পর্ক নাই, গৌণ সম্পর্ক ঘটিবার আশঙ্কা অবশ্য আছে, এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে আগামী মহাযুদ্ধের সূত্রপাত এখানে হইলেও হইতে পারে। পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য লইয়া মন-কষাকষি আজ প্রায় ৯০ বৎসর চলিয়াছে, যাহার আরম্ভ হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে।

সুদূর পূর্ব্বে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ যোজনার উদ্যোগপর্ব্ব এখন চলিতেছে। ফিলিপিনের লেইটে দ্বীপে মার্কিন খণ্ড অভিযান, মূল পূর্ব্ব এসিয়ার অভিযানের এক অত্যাবশ্যক—যদিও ছোট—অংশ বিশেষ। লেইটে ও সামর দ্বীপদ্বয়ে মার্কিন অধিকার স্থাপিত হইলে ক্রমে সমস্ত ফিলিপিন দ্বীপমালায় মার্কিন আধিপত্য সুদৃঢ় হইতে পারে এবং চীনের মহাদেশ অঞ্চলে মার্কিন সেনার অভিযানের অন্যতম ভিত্তিস্থল ঐখানেই হইতে পারে। জাপানের সমর-পরিষদ এ বিষয়ে সজাগ, সুতরাং যুদ্ধ এখানে ঘোর হইতে ঘোরতর রূপ ধারণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি জাপানের নৌবল বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাপান জলপথে সৈন্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রাদির চলাচল চালাইতেছে। যে আঘাত জাপান ফরমোসা ও ফিলিপিন অঞ্চলের নৌযুদ্ধে পাইয়াছে তাহা কতটা সাংঘাতিক তাহার প্রকৃত অনুমান অসম্ভব, কেননা, প্রথমতঃ জাপানের নৌশক্তির পরিমাণ অজ্ঞাত। যাহাই হউক, এখনও যে জাপানের নৌবল যুদ্ধক্ষম তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি ব্রিটিশ বহরাধ্যক্ষ ফ্রেজারের পূর্ব্ব এসিয়ায় প্রেরণে এবং ব্রিটেনে বিরাট্ রণতরী নির্ম্মাণের সংবাদে। জাপানের নৌশক্তির বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক, প্রশান্ত মহাসাগরের সম্পূর্ণ আধিপত্যের বিষয়ে শেষ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে আরও প্রচণ্ডতর জলযুদ্ধ যে ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অবস্থা যাহাই হউক, চীনের মহাদেশ অঞ্চলে জাপানের যে অবস্থার সমূহ উন্নতি হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। মাঞ্চুরিয়া হইতে সিঙ্গাপুর যাইবার রেলপথ এখন সম্পূর্ণভাবে জাপানের অধিকারে। ইন্দোচীন ও স্বাধীন চীনের সীমান্ত অঞ্চলে জাপানের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহা কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর প্রতিরোধের চেষ্টা চলিতেছে। চীনের সমতল ভূমিতে মার্কিন ও চীনা এরোপ্লেন আশ্রয়গুলি এখন জাপানের হস্তগত এবং স্বাধীন চীন এখন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতরভাবে অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত। এক কথায় স্বাধীন চীনের সামরিক অবস্থা ভয়াবহ বলিয়া যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহা মূলতঃ সত্য যদিও এই অবস্থা আসিবার কারণ হিসাবে যাহা রটান হইতেছে তাহার অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধেকাংশ বাজে কথা মনে হয়। চীনে এখন যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহাতে মনে হয় জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিলেও যুদ্ধ-চালনা যাহাতে অব্যাহত থাকে তাহার সম্যক্ ব্যবস্থায় ব্যস্ত এবং সে কার্য্যের প্রথম পর্ব্বে সে প্রায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান চীন অভিযানে জাপান যদি কোয়াংসি ও য়ুনান অঞ্চলে আরও অগ্রসর হইতে পারে তাহা হইলে বর্ত্তমান ব্রহ্ম অভিযানের সমস্ত রূপ পরিবর্ত্তন হইতে বাধ্য। যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য করিয়া লেডো রোড নির্ম্মাণ, মিচিনা দখল এবং অন্য দিকে ব্রহ্ম-চীন পথে যুদ্ধ চালনা ইত্যাদি হইয়াছে সে সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। স্বাধীন চীন অস্ত্রবলে অতি ক্ষীণ এবং বর্ত্তমান অভিযানের ফলে জাপান তাহাকে আরও সম্বিৎহীন এবং লোক বলে অশক্ত করিয়া দিয়াছে। ফলে আশু প্রতিকার না হইলে জাপানের বিরুদ্ধে সমর অভিযানে চীনের নিকট কোনও বিশেষ সাহায্য পাওয়া সম্ভব হইবে না।

মিত্রপক্ষের উচ্চতম সমর-পরিষদের "এসিয়া অপেক্ষা করুক" এই মূলনীতির বিষময় ফল প্রথমে ফলিল স্বাধীন চীনের অধিকৃত অঞ্চলে। জাপান যদি আরও বৎসর কাল অবসর পাইয়া যায় তবে তাহার ফল কি ঘটিবে তাহা এখন ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। মার্কিন যুদ্ধ-পরিষদ এখন চিন্তিত এবং সেইজন্য সেখান হইতে যে-সকল মতামত প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে জাপানের শক্তি বৃদ্ধির নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যুর স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পরিস্ফুট প্রধান দুইটি বিষয়ের প্রতি কবি নিজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ; প্রথমটি, তাঁহারই ভাষায়, "সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনের পালা," অথবা "বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা।"

দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, "আর একটি প্রবল প্রবর্ত্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্যকে মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। 'কড়ি ও কোমলে'ই তার প্রথম উদ্ভব।" কিন্তু "মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি" রবীন্দ্র-সাহিত্যের "একটি বিশেষ ধারা" জানিয়াও অল্পসংখ্যক লোকই তাঁহার রচনা এই তত্ত্ব জানিবার জন্য পাঠ করিয়া থাকেন ; যদিও তাঁহার পরিত্যক্ত আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডারের এই বহু-বাঞ্ছিত পরলোক-তত্ত্ব-সম্পদের পরিচয় লাভ করা তাঁহার স্মৃতি-তর্পণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে প্রার্থনীয়।*

রবীন্দ্র-সাহিত্য শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে প্রথমেই দেখা যায় যে মৃত্যুকে তিনি সাধারণ অর্থে, অর্থাৎ অস্তিত্ব লোপের অর্থে, স্বীকার বা বিশ্বাস করেন নাই ; তাহার পর দেখা যায়, মৃত্যু যে অমৃত লাভের উপায় এই কথা তিনি যে কেবলমাত্র উপনিষদাদি শাস্ত্র-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন তাহা নয়—মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাইয়া তাহাকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, ও সেই উপলব্ধি কাব্যে, সঙ্গীতে ও নানা রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই নিবিড় উপলব্ধির ছাপ বা পরোক্ষ প্রমাণ বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকতায় বা অভিনবত্বে ও ভাবের মর্ম্মস্পর্শী আবেদনে। এইজন্যই তাঁহার বাণী শোকার্ত্ত সাধারণের চিত্তে অমৃত লোকের আভাস দিয়া প্রকৃত সান্ত্বনা দানে সমর্থ। জীবন্ত তাহার ভাব, জ্বলন্ত তাঁহার ভাষা, ইহা কোনও শাস্ত্রবাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র হইতে পারে না।

তাঁহার রচনাবলীতে মৃত্যুতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া কি জানা যায় তাহা দেখিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। পরলোকের অস্তিত্ব উপলব্ধির ভিত্তি দুইটি—(১) প্রথমটি জ্ঞানের ; কোন্ বস্তুর জ্ঞান ?—"তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৮), পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অর্থাৎ মৃত্যুর প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা যায় ;—মৃত্যু সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি স্বতন্ত্র শক্তি নয়, তাঁহারই আজ্ঞাবহ শক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম একটি শক্তি যাহা আমাদের জীবনকে অনন্তের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

(২) দ্বিতীয়টি বিশ্বাসের ভিত্তি। পরলোকে বিশ্বাস আমাদের স্বতঃসম্ভূত, "কেননা প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার আমাদের দুঃসাধ্য" (রবীন্দ্রনাথ, "শান্তিনিকেতন")। বিচ্ছেদকাতর হৃদয়ের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমার প্রিয়জন আছে ও থাকিবে—এই আশা ও আকাঙ্ক্ষাই পরলোকে বিশ্বাসের ভিত্তি ও তাহাতেই প্রকৃত সান্ত্বনা। এই বিশ্বাস-ভূমির উপর স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিলে মৃত্যুতে শূন্যতা না দেখিয়া অসীম পূর্ণতাকেই দেখি। এই ভাবেও, অর্থাৎ বিশ্বাসের মধ্য দিয়াও মৃত্যু অমৃতলাভের সোপান হয়। রবীন্দ্রনাথের "মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি"র পরিচায়ক রচনাবলী জ্ঞান ও বিশ্বাস এই উভয় প্রকার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

১। কবি বলিয়াছেন, "মৃত্যুর উপলব্ধির ধারার প্রথম উদ্ভব 'কড়ি ও কোমলে'।" কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে রচিত ভানুসিংহের পদাবলীর নিম্নোদ্ধৃত সুপরিচিত কবিতাটির দুইটি চরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান…
তাপবিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।

এখানে মৃত্যুর সহিত শ্যামের রূপের তুলনা বোধগম্য, কিন্তু "তাপবিমোচন…মৃত্যু…দান" এই কয়টি কথা আকস্মিক বা অসংলগ্ন বোধ হয়। কবি কি অর্থে এই কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বীয় মত ও রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তবে সূত্র বা context অনুযায়ী একটি অর্থ এই হয় যে, মৃত্যুতে যখন শ্যামের বা হৃদয়-বাঞ্ছিতেরই রূপ দেখি, দুইয়ের মধ্যে যখন কোনও প্রভেদ দেখি না তখন মৃত্যুতে অসীম পূর্ণতাই দেখি ; মৃত্যুতে তখন এই অসীমের সহিত মিলনে সকল শোক তাপ দূরে যায়, তখন মৃত্যুর "তাপ বিমোচন করুণ কোর" যিনি "অমৃত" তাঁহাকে দান করে, মৃত্যু অমৃত লাভের উপায় হয়। সম্ভবতঃ এই কথাটিই কবি অনেক পরে গদ্যে আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন—"মৃত্যুর মধ্য দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না" (শান্তিনিকেতন।২।)

"মৃত অমৃত করে দান"—ইহাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যু-বিষয়ক সকল রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় বা keynote ; ভানু-সিংহে তাহার সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রথম অবতারণা। "সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনের পালা"—তাঁহার কাব্যের এই প্রধান ধারাটির উদ্ভব কোথায় বলিতে যাইয়া কবি "জন্মদিনে" নামক (মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক ১ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত) প্রবন্ধে "আবাল্য উপনিষদ আবৃত্তি"র প্রভাবকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; তেমনই, তাঁহার কাব্যের অপর ধারা "মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি"র প্রেরণাও আসিয়াছিল সম্ভবতঃ উপনিষদ হইতে। তথা হইতে এই ধারা উদ্ভূত হইয়া তাঁহার বিশ বৎসর বয়সে "ভানুসিংহের পদাবলী"তে প্রথম দেখা দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত পরবর্ত্তী কাব্যের "বহির্দৃষ্টি প্রবণতা"র অন্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া চলিয়াছে ও 'কড়ি ও কোমলে' স্থান-বিশেষে* দেখা দিয়া পুনরায় অদৃশ্য

* রবীন্দ্র স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজে পঠিত

* 'কড়ি ও কোমল'—'চিরদিন' শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য

হইয়াছে, এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে 'নৈবেদ্যে'র ডালি লইয়া নূতন রূপে সেই কাব্যক্ষেত্রকে অধ্যাত্মসম্পদে চূড়ান্ত রূপে সমৃদ্ধ করিয়া দেখা দিয়াছে।

১৩০৮ সালে, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে, 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথমের দিকে রচিত প্রসিদ্ধ কবিতার অনেকগুলিই সঙ্গীতাকারে অন্য পুস্তকে এবং পরে "গীতাঞ্জলি"তে (কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া) প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে পরলোক-বিষয়ক সঙ্গীতগুলিতে তিনি এক পরিপূর্ণ সত্তার নিবিড় উপলব্ধিতে নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুর প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি যাই।
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি নিশিদিন কাঁদি তাই। (১৪)

পরের একটি সঙ্গীতের প্রথমেই আছে—

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।

—এই উভয় সঙ্গীতের ভাব উপনিষদের বাণীকেই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অভিনব রূপে প্রকাশ করিতেছে—

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। কঠ, ৪।২

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরে অনুসরণ করে, এইজন্যই তাহারা সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়।

আবার—

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—কঠ, ৪।১০

যিনি এখানে তিনিই সেখানে, যে উঁহাকে নানারূপে দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

ঠিক এই সকল ভাবই কবি "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে (১৩২১, ২৭শে আশ্বিন) বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—"আত্মাকে কেবলি যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখো—যদি তাকে কেবল কার্য্য থেকে কার্য্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাকো, বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে জানো তা হ'লেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলি শোক করতে থাকবে।" ইহাই হইল জ্ঞানের ভিত্তিতে, অর্থাৎ "বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতা"র উপলব্ধিতে মৃত্যুর প্রকৃত রূপ দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাণী। উহা উপনিষদের "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি"—এই ঋষি-বাক্যের সহিত এক; তবে রবীন্দ্রনাথ আরও একটি বিশিষ্ট কথা বলিয়াছেন, যাহা সম্ভবতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-লব্ধ—"মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন সম্পূর্ণ ক'রে পাওয়া যায় না"। কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানের ভিত্তিতে মৃত্যুর প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ-বিবৃত পরলোকতত্ত্ব আবদ্ধ নয়। যাঁহারা পরমাত্মাকে জানিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহারা তো শোকাতীত হইয়াছেন; কিন্তু যাঁহাদের এই জ্ঞান ক্ষীণ বা স্থির নয় তাঁহারা তো শোকার্ত্ত হন। যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।

—এই সাধারণ মানবের মধ্যেই যিনি স্থান লাভ করিতে ইচ্ছুক তিনি তাহাদের শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কোনও "সংগীতের কুসুম" কি ফুটান নাই? তিনি জানিতেন যে শোকানলদগ্ধ হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল—তাঁহার প্রিয়জন আছে ও থাকিবে এই আকুল আকাঙ্ক্ষার সফলতার আশায়। এই আশার বাণীর মধ্য দিয়াই তিনি সাধারণের বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছেন এবং সান্ত্বনাবাক্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রথমতঃ দেখা যাউক এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি। এ সম্পর্কে প্রথম কথা হইতেছে, "প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।" পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যে যাঁহারা এই পরলোক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে টেনিসন অন্যতম এবং তাঁহার কোনও কোনও ভাবধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে। টেনিসনের In Memoriam নামক কবিতার ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রিয়জন যে মৃত্যুতে বিনষ্ট হইবে না এই বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে তিনি সর্ব্বোপরি ইহাই বলিতে চাহেন যে এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে তাঁহার অন্তর তৃপ্ত হয় না বা প্রবোধ মানে না*। যাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি দেহ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে আর থাকিবে না অথবা থাকিলেও তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসীমে বিলীন হইয়া যাইবে এ চিন্তা অতীব কষ্টদায়ক ও অসার—

That each, who seems a separate whole,
Should move his rounds, and fusing all
The skirts of self again, should fall
Remerging in the general soul,
Is faith as vague as all unsweet.

রবীন্দ্রনাথ অন্য স্থলে আবেগময়ী ভাষায় একই কথা বলিতেছেন—

মৃত্যুভয় কী লাগিয়া, হে অমৃত? দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান,
এত প্রাণ দৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব?

এই বিশ্বাসই বিয়োগকাতর হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল, সুতরাং অবলম্বনীয়; ইহাতে তর্কের স্থান নাই। তিনি বলিতেছেন, "জানি এ বিষয়টা তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্তের বিষয় নয়, যে একে মানবে না সে মানবেই না" (প্রবাসী, ১৩৪৭ বৈশাখ) …"অতএব মনকে শান্ত ক'রে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা করো, মৃত্যুকে না। যাকে ভালোবেসেছ, যাকে সত্য বলে জেনেছ সে মৃত্যুও সত্যই আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত করো" (শান্তিনিকেতন, ২৭ আশ্বিন, ১৩২১)। টেনিসনও তাহাই বলিয়াছেন—

* "Tennyson thinks that the emotions or 'heart' cannot be satisfied without a belief in God and immortality, and that is the sole ground of his belief."—Bradley, Commentary on In Mem. p. 61.

Wherefore thou be wise,
Cleave ever to the sunnier side of doubt
And cling to faith beyond the forms of Faith.
—*The Ancient Sage.*

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধারণ উপদেষ্টার মত—"শোক থেকে মনকে মুক্ত কর"—নির্লিপ্তভাবে এই উপদেশ মাত্র দেন নাই; তাহা হইলে তাঁহার বাণী এত মর্ম্মস্পর্শী হইত না। উপরোদ্ধৃত দ্বিতীয় সঙ্গীত—"অল্প লইয়া থাকি"—আলোচনা করিলে দেখিতে পাই উহা এক দিকে যেমন কাব্য-"সংগীতের কুসুম" সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, অপর দিকে সকল শোকার্ত্ত হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত ভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি। প্রথমে, কবি-হৃদয়ের স্বাভাবিক* গভীর সহানুভূতি প্রণোদিত হইয়া শোকার্ত্ত ব্যক্তির হৃদয়ের বেদনার স্বরূপ নিজ ভাষায় প্রকাশপূর্ব্বক যেন তাহাকে সমবেদনার আলিঙ্গন দিতেছেন—

"নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়।

তাহার পর শোকার্ত্ত হৃদয়ের চরম আকাঙ্ক্ষার নিবেদন—

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু
আমার ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে না কি তব পায়?

ভাবের বিশালতা ও আবেগের তীব্রতা সম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক, উহা অনুভূতিতেই সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া আইসে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস—দার্শনিকের বিচারের মধ্য দিয়া নয়, মানব মনের সহজ বা স্বাভাবিক (spontaneous) আকুলতা ও আশার পথ ধরিয়া; কিন্তু তাহা যে পথেই আসুক না কেন এ বিশ্বাস আমাদের নিতান্তই কাম্যবস্তু, যেহেতু একমাত্র সান্ত্বনার স্থল।

কিন্তু এ বিশ্বাস কেবলমাত্র আবেগ বা আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত অন্ধ বিশ্বাস নয়, ইহা আরও স্থির ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই কবি বলিতেছেন, "যে মানবে সে আপন আত্মপ্রত্যয়ের সাক্ষ্য দিয়েই মানবে। বাদ-প্রতিবাদ থাক" (প্রবাসী, ১৩৪৭ বৈশাখ) এবং ইহার পূর্ব্বে কবিতায় বলিয়াছেন—

জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়।

ইহা অনুভূতিলব্ধ বা আত্মপ্রত্যয়লব্ধ জ্ঞান। টেনিসনও ঠিক এইরকম ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, যদি কখনও ঈশ্বর বা পরলোক সম্পর্কে আমার বিশ্বাস লুপ্ত হয়, তখন

A warmth within the breast would melt
The freezing reason's colder part,
And like a man in wrath *the heart*
Stood up and answered, "I have *felt.*"

এখানে 'heart' কথাটির বিশেষ অর্থ প্রণিধানযোগ্য,—যাহা হইতে অনুভূতি বা আত্মপ্রত্যয় বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। ফরাসী দার্শনিক প্যাসক্যাল-এর উক্তি ইহার প্রকৃত টীকা—"The heart has its logic which the reason does not know" (ইংরেজী অনুবাদ)।

টেনিসন 'In Memoriam' কবিতায় একটি বিশিষ্ট কথা বলিয়াছেন তাহা এই—মানবাত্মা যে অবিনাশী এবং অনন্ত পথের যাত্রী এই বিশ্বাসের হেতু বা আভাস (intimations) মানবের অসম্পূর্ণ ইহজীবনেই পাওয়া যায়—

My own dim life should teach me this,
That life shall live for evermore;

এই বিশ্বাসের হেতুগুলির মধ্যে মানব-হৃদয়ের ভালবাসা প্রধান। ভালবাসার প্রকৃতি এই যে তাহা প্রিয়জনের বিনাশ চিন্তার সহিত থাকিতে পারে না। মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি এই চিন্তায় ভালবাসার প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইবে, অথবা নীরস সাহচর্য্যমাত্রে পরিণত হইবে। (In Memoriam, xxxv)

আরও একজন ইংরেজ কবি মুর এই ভাবই সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

Who ever loved, but had the thought
That he and all he loved must part?

আমার প্রিয়জন এবং যাহা কিছু ভালবাসি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে—এই কথা ভাবিয়া কে কবে ভালবাসিতে পারিয়াছে? সুতরাং যে সৃষ্টিকর্ত্তা মানবহৃদয়ে ভালবাসার বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন হইতে প্রিয়বস্তুর বিনাশচিন্তা অপসারিত করিয়াছেন তিনি যদি খেয়ালী সৃষ্টিকর্ত্তা না হন তবে প্রিয়জনের বিনাশ নাই এই সত্যেরই আভাস মানবজীবন হইতে পাই। কথিত আছে, টেনিসন একবার বলিয়াছিলেন,

"If there is God that has made the earth, and put this hope and passion in us, it must foreshow the truth."

রবীন্দ্রনাথের Encyclopedic রচনাবলী হইতে এই ভাবটিও বাদ পড়ে নাই।—

তিনি নিজে মৃত্যু কথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসার কুলায়ে।
—"অভয়", চৈতালি, ১৩০২

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি কবিতার কয়েকটি চরণও এ সূত্রে উল্লেখযোগ্য।

ওরে মূঢ়, জীবন সংসার
কে করিয়া রেখেছিল এত আপনার
জনম-মুহূর্ত্ত হতে তোমার অজ্ঞাতে,
তোমার ইচ্ছার পূর্ব্বে।...
জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়। নৈবেদ্য, ৯০

'কড়ি ও কোমলে'র 'চিরদিন' নামক কবিতা এই সংস্রবে পাঠযোগ্য। স্থানাভাবে উহা হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করা গেল না। তাঁহার কাব্য সাহিত্যের মধ্যে পরলোকবিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত ও কবিতা আছে যেগুলিকে একাধারে ভাবের ঐশ্বর্য্য ও কাব্যপ্রতিভার একত্র সমাবেশের জন্য সর্ব্বোচ্চ স্তরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে; যেমন—

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়?
জয় অজানার জয়।

* "The poet is chiefly distinguished from other men by a greater promptness to think and feel . . . (he) thinks and feels in the spirit of human passions . . . (which) are connected with storm and sunshine, with loss of friends and kindred . . ." etc.—Wordsworth's Preface, on Poetry and Poetic Diction.

জানা-শোনার বাসা বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।

প্রত্যেকটি কথা গভীর ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের এবং আবেগের আলোকে প্রদীপ্ত। তিনি বলিয়াছেন মরণও প্রিয়, কেননা তাহা প্রিয়তমকে নিকট করে; তাই পূর্ব্বোদ্ধৃত সঙ্গীতে বলিতেছেন—

মরণকে তুই পর করেছিস্, ভাই,
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হ'ল তাই।
দু'দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়?
জয় অজানার জয়!

মৃত্যুকে আর কোন দেশের কবি এমন করিয়া আশা ও নির্ভয় বিশ্বাসে বক্ষ পাতিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন? এই আবেগের বাণী আ[র]ও শুনিতে পাই (তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর লিখিত) "স্মরণ" নামক কবিতায়। অজানা রাজ্যের ডাক তাঁহাকে আকুল করিয়া ডাকিয়াছে—

দুলেরে দুলেরে অশ্রু দুলেরে,
আঘাত করিয়া বক্ষকূলে রে।
সম্মুখে অনন্তলোক
যেতে হবে যেথা হ'ক,...
আঁকড়ি' থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী।
অশান্ত পালের 'পরে
বায়ু লাগে হাহা করে
দূরে তোর থাক্ পড়ে ধরণী।'
আর না রাখিস রুদ্ধ তরণী।

মৃত্যুবিষয়ক এই সকল রচনাপাঠে মনে হয় তাঁহার লিখিত নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলি তাহার প্রতি সম্যক্ প্রযুক্ত—

তাঁহারি আলোকে
চক্ষু মোর দৃষ্টিদীপ্ত, তাঁহারি পরশে
অঙ্গ মোর স্পর্শময় প্রাণের হরষে

দৃষ্টিদীপ্ত চক্ষুতে মৃত্যুর প্রকৃত রূপ দেখিয়া তিনি আমাদিগকে দেখাইতেছেন—

স্তন হতে তুলে নি[লে] কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।—নৈবেদ্য

জগতের আর কোনও কবির লেখনী হইতে পরলোক সম্পর্কে এমন আশা ও বিশ্[বা]সের বাণী এমন অপূর্ব্ব তুলনা-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া নিঃসৃত হইয়াছে কি? এই 'দৃষ্টি-দীপ্ত' চক্ষুর শেষ ও শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে "স্মরণ" কবিতাটিতে লিখিয়াছিলেন,—

জীবনের দিক চক্রসীমা
লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা
অশ্রুধৌত হৃদয়-আকাশে
দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।

মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্ব্বে প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া লিখিত নিম্নের কবিতাটিতে দেখি, অধ্যাত্মরাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতেছেন "স্বর্গপুরী" দূরে নয়—

আজি জন্ম বাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয় মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ,...
সায়াহ্ন বেলার ভালে অস্তসূর্য্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা
স্বর্ণময়ী ক'রে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিম সীমায়।
আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।

মৃত্যুর এমন মনোহর অথচ সত্যরূপ এই ভাবে অপূর্ব্ব কাব্য-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া জগতের আর কোনও কবি দেখাইয়াছেন কি? শেষোদ্ধৃত পংক্তিগুলির সৌন্দর্য্য পাঠকবর্গ সহজেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে বিশ্বকবির কাব্য-প্রতিভা শেষ সময়েও কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। এমারসন জীবিত থাকিলে রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতার সহিত পরিচয়ের পরও কি এই খেদোক্তি করিতেন—

"The world still wants its poet-priest, a reconciler, who shall not trifle with Shakespeare the player, nor shall grope in the graves with Swedenborg, the mourner."

তাঁহারই শিক্ষার প্রেরণায় আমরা অনুভব করি তিনি দেশকালের ব্যবধান ঘুচাইয়া আমাদের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, যে হেতু তিনি আজ সমগ্র বিশ্বে—

অনন্ত তোমার গৃহ, বিশ্বময় ধাম
বিশ্ব মাঝে পাই সেই হারানো পরশ... (৫)
মিলন সম্পূর্ণ আজি হ'ল তোমা সনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে।
এসেছ একান্ত-কাছে, ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।—"স্মরণ"

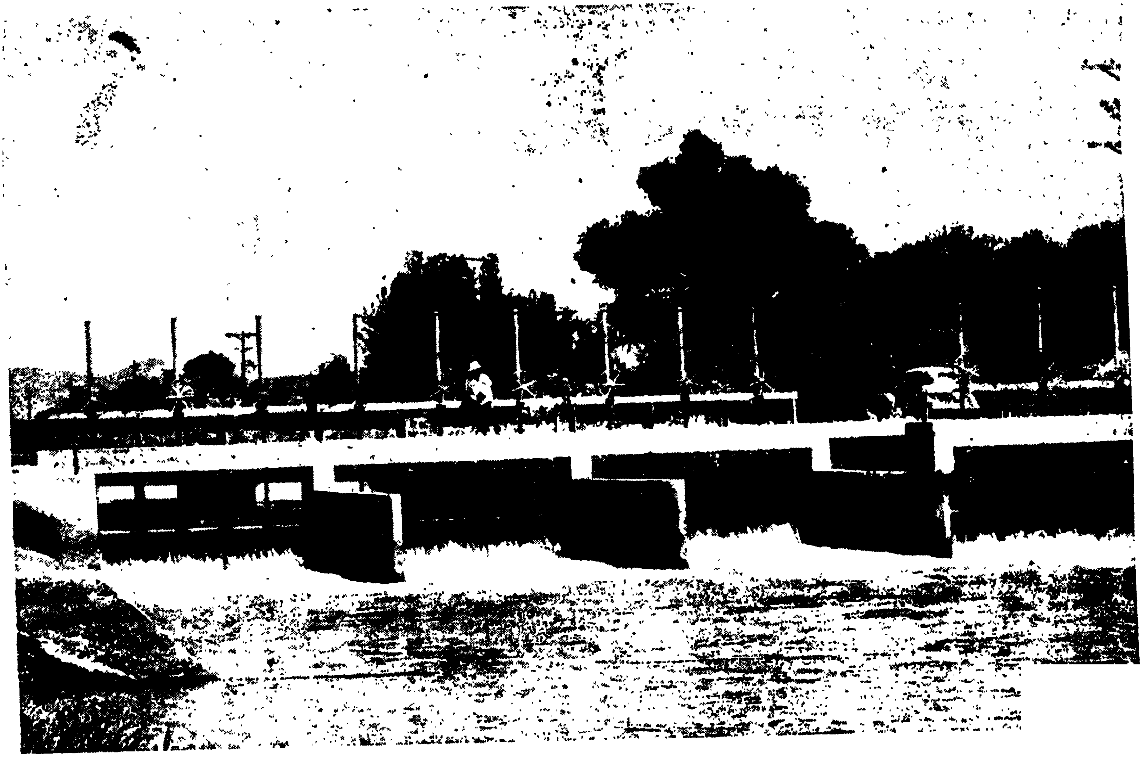
ইংরেজ কবি শেলীও এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই অনুভূতি প্রকাশ করিয়া কীট্‌স্ সম্পর্কে লিখেন—

He is a presence to be felt and known
In darkness and in light, from herb and stone,
Spreading itself where'er that Power may move
Which has withdrawn his being to its own . . .
He is a portion of loveliness
Which once he made more lovely.
—*Adonais*

আর বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদের ঋষি কণ্ঠে এই উপলব্ধির বাণী উত্থিত হইয়াছিল—

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে। (১০ম, ৫৮, ১০)

তোমার যে আত্মা আজ এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।



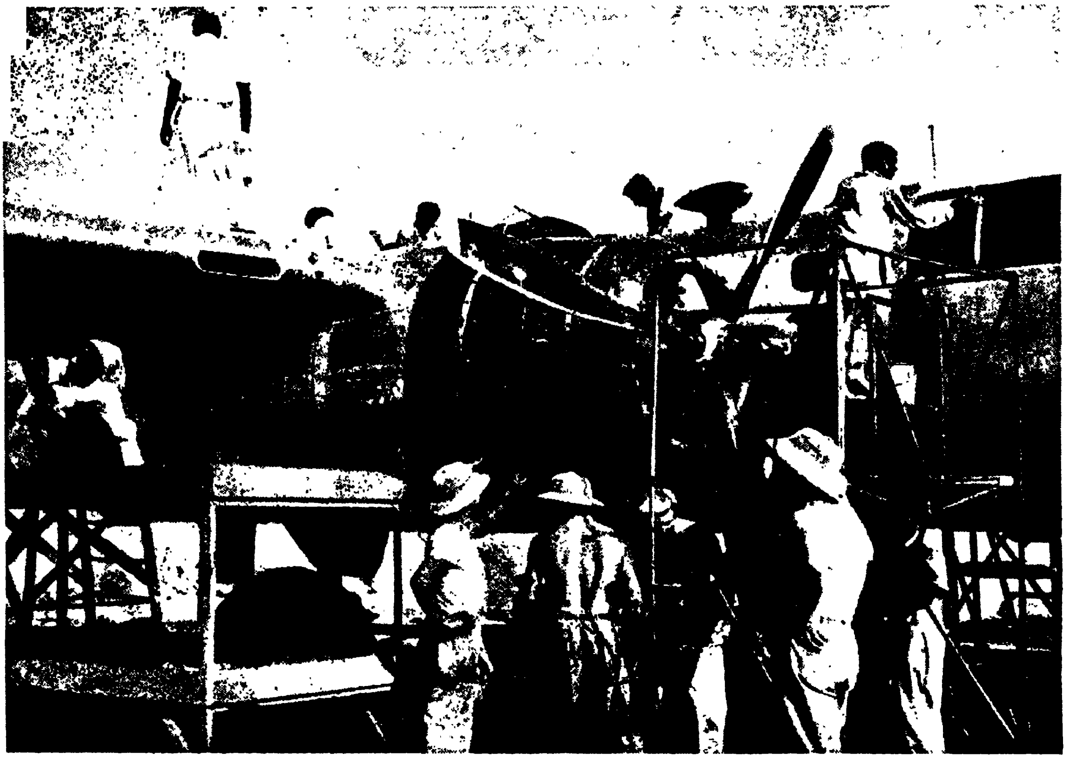
পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো প্রদেশে জল-সেচনের আধুনিক ব্যবস্থা। এই গেটের ভিতর দিয়া জলরাশি বহু মাইল দূরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে পতিত হইয়া সেগুলির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে



পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ওরগোন স্টেটে আধুনিক জল-সেচনব্যবস্থার সহায়ক প্রধান খাল—দক্ষিণ তীরে গোচারণভূমি



সমররত লণ্ডনে নার্স এবং মেডিক্যাল ছাত্রগণ হাসপাতাল হইতে রোগীদিগকে ষ্ট্রেচারে করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে



ভারতবর্ষের কোনো এক বিমান-ঘাঁটিতে ভারতীয় বিমান-কারিগরগণ মার্কিন এঞ্জিনীয়ারদের নির্দেশানুযায়ী একটি বি-২৫ বিমান মেরামতে রত

যবনিকা

শ্রীআর্যকুমার সেন

প্রভাতে আরক্তিম চক্ষু লইয়া বাহিরে আসিতেই মহাস্থবির কহিলেন, "কুমারসেন, কাল রজনীতে তুমি সঙ্ঘে ছিলে ?"

চেষ্টা করিয়াও মিথ্যা কথা কুমারসেনের মুখ দিয়া বাহির হইল না। কহিল, "না।"

"কোথায় ছিলে ?"

"বন্ধু ইন্দ্রগুপ্তের গৃহে।"

মহাস্থবির ক্রূর হাস্য করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রগুপ্তের গৃহে, না তাহার ভগিনী প্রিয়দর্শিকার গৃহে ?"

চকিতের মত কুমারসেনের মনে পূর্বরাত্রে দৃষ্ট অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তির কথা মনে পড়িয়া গেল। সে যে কে, তাহা বুঝিতে আর কষ্ট হইল না। আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "হাঁ।"

তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুখণ্ডের ন্যায় মহাস্থবির জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "নির্লজ্জ! কালই না তুমি আমার নিকট উপসম্পদাকামী হইয়া আসিয়াছিলে ? আর সেই দিনই রজনীতে গোপনে ভ্রষ্টচরিত্রা যবনীর গৃহে নিশাযাপন করিতে গিয়াছিলে ?"

ক্রুদ্ধস্বরে কুমারসেন কহিল, "সে ভ্রষ্টচরিত্রা নহে, কুলকন্যা।"

"কুলকন্যা ?" মহাস্থবির সব্যঙ্গে বলিলেন, "কুলকন্যাই বটে! কুলকন্যা অনাত্মীয় যুবকের সহিত নিভৃতে রাত্রি যাপন করে এই প্রথম শুনিলাম। কিন্তু তুমি সেখানে গিয়াছিলে কি জন্য ?"

"বিদায় লইতে।"

"বিদায় লইতে লইতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল ?"

এতক্ষণ শঙ্কু স্তম্ভের অন্তরাল হইতে সমস্ত কথা শুনিতেছিল। এইবার সম্মুখে আসিয়া দশনপংক্তি বাহির করিয়া কহিল, "রাত্রি প্রভাত হইতে দণ্ডকয়েক মাত্র বাকী ছিল।"

মহাস্থবির কহিলেন, "প্রিয়দর্শিকা একাকী গৃহে ছিল ?"

শ্বাপদের মত হাসিয়া শঙ্কু কহিল, "সম্পূর্ণ একাকী। তাহার ভ্রাতা ইন্দ্রগুপ্ত সারারাত্রি শৌণ্ডিকালয়ে যাপন করিয়াছে।

এইবার সবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া মহাস্থবির কহিলেন, "উত্তম। কিন্তু তুমি এত রজনীতে বিহারের বাহিরে কি করিতেছিলে ?"

"কুমারসেনের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলাম। আমার পূর্ব হইতেই সন্দেহ ছিল কুমারসেন দুশ্চরিত্র, সঙ্ঘের সংস্পর্শে থাকিবারও যোগ্য নহে, ভিক্ষু হইবার যোগ্য ত নহেই। কুমার-সেন মগধ হইতে পলায়ন করিয়াছিল কেন জানেন ?" গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের আনন্দে শঙ্কুর এক চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

এ যেন চিরদিনের সেই কুমারসেন নহে। যে কুমারসেনের অসি মণিবন্ধের সঞ্চালনে বিদ্যুদ্বেগে আততায়ীর মস্তক দেহচ্যুত করিতে পারিত, এ সে নহে। যদি সেই কুমারসেন হইত, তবে শঙ্কুর মৃতদেহ এতক্ষণে পর্বতগাত্র দিয়া গড়াইয়া উপল-বহুল সমতলভূমিতে আশ্রয় লইত। এ যেন এক মোহাবিষ্ট কুমারসেন।

পার্শ্বেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাহার রচিত বুদ্ধমূর্তি। কুমারসেন সেই দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

সহসা মহাস্থবির কহিলেন, "না, আমি তোমাকে মারের করতলগত হইতে দিব না। তুমি সঙ্ঘের বাহিরে নির্বাসিত হইবে না। ভুল করিয়াছ, অন্যায় করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আজ হইতে সপ্তদিবস নির্জন প্রকোষ্ঠে অনাহারে বাস করিয়া চিত্তশুদ্ধি কর। সপ্তাহান্তে তোমাকে আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

মার পরাভূত হইয়া দূরে অপসৃত হইল। কুমারসেন নির্জন প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইল। শঙ্কু তাহার শ্বাপদের ন্যায় দশনপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল। মহাস্থবির তাহার দিকে একটি অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিবস দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভগিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রগুপ্ত চমকিয়া উঠিল। কহিল, "কি হইয়াছে ? শরীর অসুস্থ বোধ করিতেছিস্ নাকি ?"

নির্লিপ্তস্বরে ক্রেসিস্ কহিল, "হাঁ, কাল রজনীতে সম্ভবত জ্বরভাব হইয়াছিল।

শঙ্কিতস্বরে ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "সর্বনাশ, বসন্তকালে জ্বরভাব হওয়া ত মোটেই শুভ লক্ষণ নহে। বৈদ্য ডাকিয়া আনিব ?"

ত্রস্ত হইয়া ক্রেসিস্ কহিল, "না না, সামান্য জ্বরের জন্য বৈদ্য ডাকিবার প্রয়োজন নাই। আপনিই সারিয়া যাইবে।"

ইন্দ্রগুপ্ত নিরাশ হইল। নগরোদ্যানে তক্ষশিলার যাবতীয় তরুণতরুণী বসন্তোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। সেই সময়ে কি না প্রিয়দর্শিকা জ্বর বাধাইয়া বসিল!

ক্রেসিস্ সম্ভবত তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। কহিল, "তুমি অকারণে গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া কি করিবে ? বসন্তোৎসবে গেলেই ত পারিতে।"

ইন্দ্রগুপ্তের চক্ষুলজ্জা বাধা দিল। কহিল, "পীড়িতা ভগিনীকে গৃহে একাকী রাখিয়া মদনোৎসবে যোগ দিবার মত পাষণ্ড আমি নই!"

বিগত রজনীতে যে ভগিনীকে একাকী গৃহে রাখিয়া শৌণ্ডিকা-লয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিল, সে কথা সম্ভবত ইন্দ্রগুপ্তের মনে পড়িল না।

অপরাহ্ণের দিকে কিন্তু ক্রেসিসের পীড়ার লক্ষণ অন্তর্হিত হইল। কৃষ্ণাগুরুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শিল্পগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার প্রসাধন দেখিয়া ইন্দ্রগুপ্ত যুগপৎ বিস্মিত এবং কিছু রুষ্ট হইল।

প্রিয়দর্শিকা নবারুণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছে, বক্ষে নীল নিচোল এবং পীত উত্তরীয়। সারা দেহ ভরিয়া উদ্যানের যাবতীয় পুষ্পরাজি আভরণরূপে বিরাজ করিতেছে। কর্ণে কুরুবক পুষ্পের অবতংশ, বাহুতে কিংশুকের অঙ্গদ ও বলয়। শ্রোণীদেশে পুষ্পকাঞ্চী। চরণে রক্তমঞ্জীর। ঘনকৃষ্ণ কুন্তলভার কবরীবদ্ধ হইয়া স্তরে স্তরে শ্বেতকুসুমশোভিত।

ইন্দ্রগুপ্ত রুষ্টস্বরে কহিল, "এ সবের অর্থ ?"

প্রিয়দর্শিকা নির্বিঘ্নমনে চরণে লাক্ষারস লেপন করিতেছিল,

মুখ না তুলিয়াই কহিল, "কেন? ইচ্ছামত একটু সাজিবারও কি কোনও উপায় নাই নাকি?"

"সে কথা বলিতেছি না। কিন্তু তুই অসুস্থ, সেইজন্য আমি উৎসবে যোগ না দিয়া ঘরে বসিয়া রহিলাম, আর এ দিকে তুই—"

বাধা দিয়া ক্রেসিস্ কহিল, "তুমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পার। আমার অসুখ সারিয়া গিয়াছে।"

"তবে তুইও চল্।"

রহস্যময় মৃদুহাস্য করিয়া ক্রেসিস্ কহিল, "আমার আজ যাওয়ার উপায় নাই।"

বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ইন্দ্রগুপ্ত স্ত্রীজাতির চরিত্রের রহস্য সম্বন্ধে বহুবিধ কটূক্তি করিতে করিতে শিল্পগৃহে প্রবেশ করিল, এবং অচিরকাল মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। শুভ্র প্রকৃতিতে স্বচ্ছ নীল আকাশে এবং বাতাসে বসন্তের মাদকতা। অন্যমনস্কভাবে কবরী-বিচ্ছিন্ন একটি কুসুম কুড়াইয়া লইয়া প্রিয়দর্শিকা বাতায়নের পার্শ্বে গিয়া বসিল।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। ভীতশঙ্কিতহৃদয়ে তরুণী অস্ফুট স্বরে বলিল, "হে বসন্তসখা, হে দেবি আফ্রোদিতি, আজিকার রজনী যেন বিফলে না যায়!"

সহসা দূরস্থিত একটি মনুষ্যমূর্তি ক্রেসিসের নয়নগোচর হইল। অপলক নেত্রে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া সে চিনিতে পারিল এবং কম্পিত বক্ষে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল।

প্রব্রজ্যা কুমারসেন গ্রহণ করিবে। কিন্তু প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে শেষ বিদায় না লইয়া চিরকালের জন্য তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতে কুমারসেন পারিবে না। অধিক রজনীতে নিঃশব্দে প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া সে দ্রুতপদে ইন্দ্রগুপ্তের গৃহাভিমুখে চলিল প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে শেষ বিদায় লওয়ার জন্য।

যদি বিহারে কেহ তাহার অনুপস্থিতির কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কি হইবে ভাবিয়া কুমারসেন শিহরিয়া উঠিল। সঙ্ঘ হইতে চিরনির্বাসন অবশ্যম্ভাবী। যে গৌতম-মূর্তি সে দীর্ঘ অর্ধমাস ধরিয়া এত যত্নে গঠন করিয়াছে, তাহা আর তাহার রহিবে না। মোহাচ্ছন্ন কুমারসেন ভাবিল, তাহার চেয়ে প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে চিরনির্বাসন শ্রেয়ঃ।

দ্বারে করাঘাত করিবার পূর্বেই দ্বার খুলিয়া গেল, এবং দুইটি কোমল বাহু তাহার কণ্ঠ আবেষ্টন করিল।

সভয়ে কুমারসেন কহিল, "ক্রেসিস্, প্রিয়দর্শিকে, ভুল করিও না। আমি তোমার নিকট আত্মনিবেদন করিতে আসি নাই, বিদায় লইতে আসিয়াছি।

পরিতৃপ্তির হাসি হাসিয়া প্রিয়দর্শিকা কহিল, "বিদায়? তুমি সঙ্ঘ হইতে চিরবিদায় লইয়াছ!"

কুমারসেনের উপবাসক্লিষ্ট শুষ্ক অধরে ক্রেসিসের কোমল রক্তাধর নিষ্পিষ্ট হইল। পরমুহূর্তেই সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া কুমারসেন কহিল, "অসম্ভব, প্রিয়দর্শিকে অসম্ভব!"

ইন্দ্রগুপ্তের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। কক্ষমধ্যে আসিয়া উভয়কে দেখিয়া বিস্মিতভাবে কহিল, "ব্যাপার কি?"

ক্রেসিস্ কহিল, "আমি কুমারসেনকে ভালবাসি।"

হাসিয়া ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "সে ত খুব নূতন সংবাদ নহে। কিন্তু সেজন্য এত অভিনয়ের প্রয়োজন কি ছিল? অসুস্থতা, জ্বরভাব, আরও কত কি!"

সহসা ক্রেসিস্ কহিল, "তোমরা উভয়ে এইখানে বসিয়া থাক, আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিতেছি।"

বাধা দিয়া কুমারসেন কহিল, "না ক্রেসিস্, আমার প্রত্যাবর্তনের সময় হইয়াছে।"

অন্তরের অগ্নি সবলে দমন করিয়া ক্রেসিস্ করুণ স্বরে কহিল, "বেশ, যেখানে যাওয়ার হয় যাইও, কিন্তু আমি পার্শ্ব-কক্ষ হইতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত কোথাও যাইও না।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ক্রেসিস্ চলিয়া গেল।

কুমারসেন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ইন্দ্রগুপ্ত এই প্রণয়-কলহের মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কহিল, "ব্যাপার কি কুমারসেন?"

ব্যাকুলকণ্ঠে কুমারসেন কহিল, "ইন্দ্রগুপ্ত, আমাকে ভুল বুঝিও না, আমি তোমাদের উভয়ের নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছিলাম।"

বিস্মিতকণ্ঠে ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "বিদায় লইতে আসিয়াছিলে? কেন?"

"আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছি।"

কথাটার মর্মগ্রহণ করিতে ইন্দ্রগুপ্তের কিঞ্চিৎ সময় লাগিল। তাহার পর ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তাহার অর্থ? তুমি ক্রেসিসের পাণিপ্রার্থী নহ?"

"না।"

অধিকতর উত্তপ্তস্বরে ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "তবে কি এতদিন আমার সহোদরার হৃদয় লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলে?"

"প্রিয়দর্শিকা আমাকে ভুল বুঝিয়াছিল।"

"ভুল বুঝিয়াছিল? সম্ভবত তাহাই। প্রিয়দর্শিকা তোমাকে সাধুচরিত্র ক্ষত্রিয়সন্তান মনে করিয়াছিল। বুঝে নাই যে তুমি ভণ্ড তপস্বী, অসহায়া তরুণীর হৃদয় ও প্রেম ক্রীড়নক বলিয়া মনে কর।"

কুমারসেন কথা কহিল না। ইন্দ্রগুপ্ত রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে লাগিল। আশ্চর্য, ইহাকেই সে বন্ধু বলিয়া মনে করিয়াছিল। ইহাকে বিষকুম্ভ পয়োমুখ বলিয়া চিনিতে না পারিয়া শুধু নিজের গৃহে নহে, ক্রেসিসের হৃদয়দ্বারে করাঘাত করিবার অধিকার দিয়াছিল!

কয়েক দণ্ড অতীত হইয়া গেল। সহসা ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "ও কি?"

চমকিত হইয়া তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কুমারসেন দেখিল, গিরিপৃষ্ঠে অগ্নি। সভয়ে কুমারসেন উপলব্ধি করিল, বিহার অগ্নিসমাচ্ছন্ন।

দ্রুত গমনোদ্যত হইতেই ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "কোথায় যাইতেছ?"

"দেখিতেছ না, সঙ্ঘে আগুন লাগিয়াছে!"

"ভালই হইয়াছে। কতকগুলা মুণ্ডিতশির স্থূলোদর শ্রমণ জীবিতবর্জিত হইলে পৃথিবীর কিছু আসিয়া যাইবে না।"

আর সময় নাই। অগ্নি তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিহারকে গ্রাস করিতেছে। কাহারও সাধ্য নাই সে প্রলয় নিবারণ করে। পাহাড়ের উপরে জল নাই, প্রস্রবণ হইতে জল আনিয়া সে অগ্নি নির্বাপিত করা অসম্ভব।

রক্তিম আলোকে কুমারসেন দেখিতে পাইল ভীতসন্ত্রস্ত শ্রমণগণ দ্রুত পদক্ষেপে পর্বতগাত্র দিয়া অবতরণ করিতেছেন। পলায়নের কোনো অসুবিধা নাই, কাজেই প্রাণহানির সম্ভাবনা অল্প।

সহসা সকল চিন্তা ভেদ করিয়া কুমারসেনের অন্তর মথিত করিয়া আর্তস্বর নির্গত হইল, "আমার বুদ্ধমূর্তি। সে ত এতক্ষণে নিঃশেষ হইয়া গেল।"

বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "হইলই ত। মূর্তি উদ্ধার বিষয়ে তোমার প্রিয় ক্ষপণকগণের কোনো উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। নির্বাণপ্রার্থিগণ প্রাণভয়ে শশকের ন্যায় পলায়ন করিতেছে।"

বৃক্ষলতাদি শুষ্ক তৃণের ন্যায় পুড়িতেছে। হুতাশনের ক্ষুধা পর্বতের তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত ভস্মীভূত না করিয়া নিবৃত্ত হইবে না।

অলক্ষ্যে প্রিয়দর্শিকা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কুমারসেন একবার করুণনয়নে চাহিয়া দেখিল।

প্রিয়দর্শিকার ঘনঘন শ্বাস বহিতেছে, পীবরবক্ষ দ্রুত উত্থিত-পতিত হইতেছে। কবরীবদ্ধ কেশ অর্ধোন্মোচিত, বিস্রস্ত বসন। অঙ্গের পুষ্পাভরণ যেন দারুণ রৌদ্রে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

বিস্মিত ইন্দ্রগুপ্ত কহিল, "এ কি রূপ হইয়াছে? এতক্ষণ কি করিতেছিলি?"

"কাঁদিতেছিলাম।"

হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করিয়া ইন্দ্রগুপ্ত চুপ করিয়া রহিল।

কুমারসেন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রেসিসের দিকে চাহিয়া কহিল, "প্রিয়দর্শিকে, আমাকে ক্ষমা কর।"

চকিতে প্রিয়দর্শিকা কুমারসেনের বাহুবন্ধনের মধ্যে আশ্রয় লইল। হাসি-অশ্রু মিশাইয়া কহিল, "তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে না?"

"না প্রিয়দর্শিকে, আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে। আমার নির্বাণমুক্তির প্রয়োজন নাই, তুমিই আমার মুক্তি।"

অসহ আনন্দে ক্রেসিসের নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারা নির্গত হইতে লাগিল।

ইন্দ্রগুপ্ত এতক্ষণ নির্বাক ছিল। এইবার কহিল, "কিন্তু সঙ্ঘে আগুন লাগিল কি করিয়া?"

কুমারসেন কহিল, "আমি জানি কে সঙ্ঘে অগ্নিপ্রদান করিয়াছে।"

কম্পিত বক্ষে শঙ্কিত স্বরে ক্রেসিস্ কহিল, "তুমি জান? কে সে?"

"শম্ভু, বিহারের একজন শ্রমণ।"

অসীম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ক্রেসিস্ কহিল, "হয় ত সেই।" কিন্তু তাহার পরে সবিস্ময়ে বলিল, কিন্তু সে সঙ্ঘের ধ্বংসকামনা করিল কেন?"

কেন যে, সেই কথাটাই কুমারসেন ভাবিয়া পাইল না। কহিল, "কি জানি কেন? কিন্তু শম্ভু ভিন্ন আর কেহ এমন দুষ্কার্যের জন্য দায়ী হইতে পারে তাহা আমার মনে হয় না।"

ক্রেসিস্ কহিল, "শম্ভু কি তোমার শত্রু?"

একটু ভাবিয়া কুমারসেন কহিল, "না, সে আমার পরম মিত্র।"

কুমারসেনের বক্ষে মাথা রাখিয়া ক্রেসিস্ কহিল, "অগ্নিকাণ্ডের জন্য যেই দায়ী হউক, শম্ভু শত্রুই হউক বা মিত্রই হউক, কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু এখন আর কোনো কথা নয়, আমি ত বলিয়াছিলাম সৃষ্টিতে এমন কোনও শক্তি নাই যে আমার নিকট হইতে তোমাকে দূরে সরাইতে পারে।"

কক্ষে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া ইন্দ্রগুপ্ত পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার শিল্পগৃহে প্রবেশ করিল। শিল্পগৃহে পুষ্পধনু কন্দর্প, পুষ্পধনু ইরস্ এবং প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি পরিতৃপ্তির হাস্য করিলেন।

পূর্ব দিন চন্দ্র ঠিকই বলিয়াছিল। মধুযামিনী একদিনে বিফল হয় না।

সহস্রাধিক বর্ষ অতীত হইয়া গেল। দগ্ধ পর্বতগাত্রে আবার বৃক্ষলতাদি জন্মিয়া মৃত সঙ্ঘের ধ্বংসাবশেষ অসীম করুণায় আবৃত করিয়া দিল।

আবার বৈদেশিক আসিল। তক্ষশিলার আর্যসভ্যতা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, সব বিলুপ্ত হইয়া গেল। শতসহস্র বুদ্ধমূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ হইল। শুধু পাহাড়ের উপরে বৃক্ষলতাগুল্মাদির আবরণের অন্তরালে একটি দগ্ধ বিহারের সন্ধান কেহ পাইল না।

আরও সহস্র বৎসর পরে নূতন বৈদেশিক আসিল। সহসা একদা পর্বতপৃষ্ঠ খনন করিয়া মৃত সঙ্ঘের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইল।

অসংখ্য মৃন্ময় বুদ্ধমূর্তি, ভগ্নদেহ, ভগ্নাঙ্গ। শুধু একটি মূর্তি অক্ষত।

মূর্তির পশ্চাতে বজ্রপাণি ও ব্যজনকারী, উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় যুগল বুদ্ধমূর্তি।

নির্মম কাল তাহার কোনও অংশে হস্তস্পর্শ করিতে পারে নাই। দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে মূর্তি যেমন ছিল, আজও তেমনি উজ্জ্বল। সেই অখণ্ড শান্তি, সেই স্বপ্নমায়াপূর্ণ অর্ধমুদ্রিত নতদৃষ্টি।

যে মূর্তি ধ্বংস করিবার জন্য এত আয়োজন, যাহা উন্মুক্ত স্থানে এক রজনীর বর্ষণে গলিয়া বিনষ্ট হইতে পারিত, এক রাত্রির অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইয়া সেই ক্ষয়িষ্ণু মৃন্ময় মূর্তি অবিনশ্বর প্রস্তরমূর্তির কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

কুমারসেন, প্রিয়দর্শিকা, ইন্দ্রগুপ্ত, মহাস্থবির সকলেই কালের বিস্মৃতির অতল তলে আশ্রয় লইয়াছে।

শুধু এক যবনী তরুণীর সুতীব্র প্রেমের সাক্ষ্যস্বরূপ বাঁচিয়া আছে এক মৃন্ময় বুদ্ধমূর্তি।

মহাকালের স্রোত অবিরাম বহিয়া চলে। সমাপ্ত

মণিপুর

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্য আজ সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মণিপুরের ঐশ্বর্য্য নাই, লোকসংখ্যাও অধিক নহে। কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই এই পর্ব্বতবেষ্টিত ক্ষুদ্র উপত্যকা বারংবার ঐতিহাসিক বিপ্লবের সহিত জড়িত হইয়াছে। মণিপুরের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির প্রভাব বড় কম নহে।

মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। মহাভারতে মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার কাহিনী আছে, রবীন্দ্রনাথের অমর প্রতিভা সেই কাহিনীকে কাব্যরূপ দান করিয়াছে, কিন্তু ঐতিহাসিকের নীরস বিচারে সেই কাহিনীর সত্যতা অদ্যাপি প্রমাণিত হয় নাই। নৃতত্ত্বের মাপকাঠি অনুসারে মণিপুরবাসীদিগকে মোঙ্গোলীয় জাতির অন্যতম শাখারূপে গণ্য করিতে হইবে। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর ইংরেজ সেনানী পেম্বার্টন ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্ত-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে মণিপুরবাসীরা চীন দেশ হইতে আগত তাতার ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে বিতাড়িত তাতারগণ উত্তর-ব্রহ্মে ও মণিপুরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পেম্বার্টনের এই অনুমান সত্য কিনা তাহা অদ্যাপি পরীক্ষিত হয় নাই।

মণিপুরে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মণিপুর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কিংবদন্তী মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তর-ব্রহ্মের শান রাজ্যের সহিত মণিপুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই যুগেই মণিপুর ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী কুবো উপত্যকা মণিপুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

মণিপুরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে পানহেইবা নামক জনৈক নাগা-নায়ক এই রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি পরে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং গরীব নেওয়াজ নাম গ্রহণ করেন। মণিপুরবাসীরাও রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। আসামে প্রধানতঃ শাক্ত মত প্রবল হইলেও মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রচলিত হইয়াছিল। এই সুদূর পার্ব্বত্য রাজ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার বাঙ্গালীরই কীর্ত্তি। সম্ভবতঃ নাগা-নায়ক পানহেইবাকে ক্ষত্রিয়ত্বের মর্য্যাদা দিয়া নবপ্রচারিত হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মণেরা অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর সহিত মণিপুরের রাজবংশের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পানহেইবার উৎপত্তি রহস্য-সমাচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তিনি মণিপুরে শান্তি স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বারংবার ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া এবং ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। একবার ব্রহ্ম-রাজধানী আভা শহর তাঁহার হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু আকস্মিক ঝড়ে তাঁহার পতাকা ভূপতিত হওয়ায় তিনি পরাজয় আশঙ্কা করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। এই ঘটনায় তাঁহার অনুচরগণের উপর তাঁহার প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পরে তিনি নিজের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র অজিত শাহকে সিংহাসন প্রদান করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র শ্যাম শাহের প্রতি অবিচার করা হইল, কিন্তু পিতৃভক্ত শ্যাম শাহ পিতার কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নাই। সম্ভবতঃ গরীব নেওয়াজ বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশতঃই জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে অজিত শাহের ষড়যন্ত্রেই বৃদ্ধ রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, অজিত শাহ সিংহাসন লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পিতাকে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া নিজের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একবার ব্রহ্মরাজের সহিত রাজনৈতিক আলোচনা চালাইবার জন্য গরীব নেওয়াজ ও শ্যাম শাহ ব্রহ্মদেশে গমন করেন। তাঁহাদের ব্রহ্মদেশে অবস্থিতি কালে অজিত শাহের মনে সন্দেহ হয় যে তাঁহারা মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিবার প্রয়াস করিবেন। ফলে অজিত শাহের প্রেরিত কয়েকজন লোক পথিমধ্যে বৃদ্ধ রাজাকে ও শ্যাম শাহকে হত্যা করিল। মণিপুরে গৃহবিবাদ ও রক্তপাত আরম্ভ হইল।

অজিত শাহ পাপার্জ্জিত রাজ্য বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। পিতৃহন্তার বিরুদ্ধে মণিপুরে এক প্রবল দল গঠিত হইল। এই দলের নেতা হইলেন অজিত শাহের কনিষ্ঠ সহোদর ভরত শাহ। অজিত শাহ সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; জনমতের সমর্থনে ভরত শাহ রাজা হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই নূতন রাজার মৃত্যু হইল। তখন মণিপুরের প্রধানগণ শ্যাম শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌর শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

মণিপুর যখন আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত ও শক্তিহীন, ঠিক সেই সময়েই মহাবীর আলংপায়া ব্রহ্মরাজ্যে নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রহ্মদেশে রাজশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল, তাই ক্ষুদ্র মণিপুরের অধিপতি গরীব নেওয়াজ ব্রহ্মদেশে হানা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাবতী উপত্যকার অধিবাসী মন্ বা তেলেঙ্গ জাতি বিদ্রোহী হইয়া বারংবার উত্তর-ব্রহ্ম বিধ্বস্ত করে। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে আভা নগরী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। ব্রহ্মদেশের এই নিদারুণ সঙ্কটে সোয়েবোর গ্রাম-নায়ক আলংপায়া জাতির ভাগ্যনির্ণয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। মাত্র আট বৎসরের মধ্যে তিনি সমগ্র ব্রহ্মদেশে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং বারংবার শ্যামরাজ্য ও মণিপুর আক্রমণ করিয়া অসাধারণ সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আলংপায়ার ন্যায় কৃতী শাসকের পরিচয় কমই পাওয়া যায়। আলংপায়া-বংশের শাসনকালেই (১৭৫২-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) ব্রহ্মদেশ সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে

আরোহণ করিয়াছিল, আবার আলংপায়ার বংশধরগণকে পরাজিত করিয়াই ব্রিটিশ-সিংহ আসাম ও ব্রহ্মদেশ পদানত করিয়াছিল।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিভিন্ন জাতীয় ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যার্থ ব্রহ্মদেশে যাতায়াত আরম্ভ করে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর পুর্ব্বে তাহারা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। তখন রেঙ্গুন সহর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই (১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আলংপায়া রেঙ্গুনের ভিত্তি স্থাপন করেন)—ইরাবতী উপত্যকায় সিরিয়াম বন্দর বিদেশী বণিকগণের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলংপায়া সিরিয়াম অধিকার করেন। এই সময় ফরাসী ও ইংরেজ বণিকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে তেলেঙ্গদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেসিনের নিকটবর্ত্তী নিগ্রাইস উপদ্বীপে অবস্থিত ইংরেজ কুঠির কর্ম্মচারিগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করাইয়া আলংপায়া নিজের প্রতিশোধ-বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের শক্তি ও সাহস ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল না; সুতরাং আলংপায়ার অত্যাচার ইংরেজ বণিকদিগকে নীরবে সহ্য করিতে হইল। আলংপায়ার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নংডয়ী (১৭৬০-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) ব্রহ্মসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তখন ব্রহ্মদেশের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য মাদ্রাজের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা কাপ্তেন আল্ভ্স নামক সামরিক কর্ম্মচারীকে ব্রহ্মরাজসভায় প্রেরণ করেন। কাপ্তেন আল্ভ্স নিগ্রাইস হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মরাজ উত্তর দিলেন যে বিধির বিধানেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে মানুষের কোন দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য নাই। পরে ইংরেজ-দূতের অনুনয়-বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি কয়েকজন ইংরেজ বন্দীকে মুক্তিদান করেন এবং বেসিনে কোম্পানীর কুঠি স্থাপনে সম্মতি দেন।

গরীব নেওয়াজের মৃত্যুর পর আলংপায়া দুইবার মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মণিপুরের কিয়দংশ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। আত্মকলহে ক্ষীণ মণিপুরের পক্ষে দিগ্বিজয়ী ব্রহ্মবাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। ভরত শাহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নকালে অকস্মাৎ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া আহত হন। তখন তিনি কনিষ্ঠ সহোদর জয়সিংহকে রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করেন এবং স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। মণিপুর-রাজবংশের ইতিহাসে সৌভ্রাত্রের এরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই।

জয়সিংহ ব্রহ্মযুদ্ধের ভার গ্রহণ করিয়াই সংবাদ পাইলেন যে রাজ্যচ্যুত অজিত শাহ সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। অজিত শাহের সৈন্যবল ছিল না, প্রজাদের সমর্থন লাভও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাই তিনি বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর বাঙ্গালায় ইংরেজদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের কাহিনী সুদূর মণিপুরেও পৌঁছিয়াছিল। ত্রিপুরার মহারাজার মধ্যস্থতায় অজিত শাহ কোম্পানীর দরবারে সাহায্যের জন্ত আবেদন প্রেরণ করিলেন। তিনি জনাইলেন যে শত্রুদের ষড়যন্ত্রে তিনি অন্যায়ভাবে পিতৃদত্ত সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, অতএব তিনি কোম্পানীর সাহায্যে শত্রুদমন করিতে উৎসুক। এই নূতন বিপদের সম্মুখীন হইয়া জয়সিংহ চট্টগ্রামের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ভেরেল্‌ষ্ট সাহেবের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। দূতের নাম হরিদাস গোস্বামী; খুব সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। সেকালে আসাম, কাছাড়, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ দৌত্যকার্য্যে বাঙ্গালীর সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং বাঙ্গালা ভাষাকেই রাজনৈতিক পত্রালাপের বাহনরূপে ব্যবহার করিতেন।* যাহা হউক, হরিদাস গোস্বামীর কার্য্যকুশলতায় অজিত শাহের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল; কোম্পানী তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকৃত হইল।

সেকালে কোম্পানী পূর্ব্ব-ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য উৎসুক ছিল, কিন্তু ঐ অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকায় 'বণিকের মানদণ্ড' বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকগণের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দেও বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "চীনদেশের অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতটুকু আছে, আসাম ও নেপালের অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তদপেক্ষা বেশী নহে।" হরিদাস গোস্বামী সম্ভবতঃ ইংরেজদের এই দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইয়াছিলেন; তাই তিনি বাণিজ্য-বিস্তারের প্রলোভন দেখাইয়া ইংরেজদিগকে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ভেরেলষ্ট সাহেবকে জানাইলেন, উত্তর-ব্রহ্মে ও মণিপুরে যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকিলে চীনদেশের বণিকেরা নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া মণিপুর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে, সুতরাং কোম্পানী মণিপুরের সহিত স্থায়ী ভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলে ইংরেজ বণিকদের পক্ষে চীনদেশের সহিত স্থলপথে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হইবে। ভেরেলষ্ট এই প্রলোভনে আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং ব্রহ্ম-যুদ্ধে জয়সিংহকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত মণিপুরে সৈন্য প্রেরণের অধিকার তাঁহার ছিল না। তাই তিনি ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার শাসনকর্ত্তা ভ্যান্সিটার্ট সাহেবকে সকল বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। বোধ হয় তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে কেবলমাত্র বাণিজ্যবিস্তারের অনিশ্চিত ভরসায় কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গম মণিপুরে অভিযান প্রেরণ করিতে সম্মত হইবেন না, তাই তিনি লিখিলেন—ইংরেজবাহিনী মণিপুরে উপস্থিত হইলে নিগ্রাইস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লওয়া সম্ভব হইবে।

ভেরেলষ্টের পত্র পাইয়া স-কাউন্সিল গবর্ণর ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সিদ্ধান্ত করিলেন, কোম্পানীর পক্ষে সুদূর মণিপুরে সৈন্য প্রেরণ করা নানাকারণে যুক্তিসঙ্গত না হইলেও নিগ্রাইস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের এরূপ সুবর্ণ সুযোগ

* ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় জয়সিংহের একখানি বাঙ্গালা পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। জয়সিংহের অপর নাম ভাগ্যচন্দ্র সিংহ।

উপেক্ষা করা অকর্ত্তব্য ; অতএব ইংরেজ সৈন্যের পরিবর্ত্তে মণিপুরে দেশীয় সিপাহী প্রেরণ করা হউক। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভেরেলষ্ট সাহেব সিপাহীদলের অধিনায়করূপে চট্টগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া এপ্রিল মাসে কাছাড় রাজ্যের রাজধানী বর্ত্তমান বদরপুরের নিকটবর্ত্তী খাসপুরে পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে বৃষ্টিতে এবং নানাবিধ রোগে সিপাহীদের এমন দুর্দ্দশা হইল যে ভেরেলষ্ট আর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না, কিছুদিন পরে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পরেও জয়সিংহ কোম্পানীর সহায়তা লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভেরেলষ্টের শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ আর তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই।

অপর কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্মবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা জয়সিংহের সাধ্যাতীত ছিল। নংডয়ীর পরবর্ত্তী ব্রহ্মরাজ সিন-ব্যু-সিন (১৭৬৩-১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) আলংপায়ার ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ব্রহ্মবাহিনী বার-বার শ্যাম, চীন ও মণিপুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহ পরাজিত হইয়া কাছাড় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহের সহায়তায় তিনি মণিপুরে স্বীয় আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরেও তিনি কয়েক বার ব্রহ্মবাহিনী কর্ত্তৃক মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ব্রহ্মরাজ বোদাপায়ার রাজত্বকালে (১৭৮২-১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ) জয়সিংহের সহিত ব্রহ্মদরবারের স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর জয়সিংহ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুশাসনে মণিপুরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থযাত্রাপথে পদ্মাতীরবর্ত্তী ভগবানগোলায় জয়সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হর্ষচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে জনৈক আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে গৃহবিবাদ মণিপুরের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল এতদিন পরে তাহার পুনরাবির্ভাব হইল। হর্ষচন্দ্রের মৃত্যুর পর জয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র মধুচন্দ্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৌরজিৎ সিংহের ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত হন। মধুচন্দ্র কাছাড়রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহায্যে সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চৌরজিতের সৈন্যদল তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করে। কিছুদিন পরে জয়সিংহের চতুর্থ পুত্র মারজিৎ সিংহ ব্রহ্মরাজ বোদাপায়ার সাহায্যে চৌরজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং মণিপুরের অধিপতি হন (১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ)। সিংহাসনের সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারজিৎ কাছাড় আক্রমণ করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কাছাড়ী জাতিই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আদিমতম অধিবাসী। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে কাছাড়ীদের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণের সহিত কাছাড়ী রাজবংশের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রচার করিলেন যে কাছাড়ের অধিপতিগণ মহাভারতোক্ত ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার উত্তরাধিকারী গোবিন্দচন্দ্র ভীমের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র জামাতা মধুচন্দ্রকে মণিপুরের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। জনৈক ইরাণী ভাগ্যান্বেষীর আক্রমণ হইতে স্বরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ইংরেজদের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্র দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও অত্যাচারী এবং প্রজাদের বিরাগভাজন ছিলেন। তুলারাম নামক তাঁহার একজন সামান্য চাপরাসী বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি বার-বার ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। চৌরজিৎ সিংহ মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া গোবিন্দচন্দ্রের সাহায্যপ্রার্থী হন, কিন্তু মণিপুরের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করা কাছাড়রাজ সঙ্গত মনে করেন নাই। অতঃপর চৌরজিৎ কলিকাতায় আসিয়া বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু এখানেও তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। তখন তিনি আসামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জয়ন্তিয়াপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং জয়ন্তিয়া-রাজ রাম সিংহ এবং বিদ্রোহী তুলারামের সহিত যোগ দিয়া কাছাড়ে আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন। মারজিৎ কাছাড় আক্রমণ করিলে চৌরজিতের সুযোগ উপস্থিত হইল। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ গোবিন্দচন্দ্রকে সাহায্য করিতে সম্মত না হইয়া কেবলমাত্র শ্রীহট্ট সীমান্তে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। অগত্যা গোবিন্দচন্দ্র চৌরজিতের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জয়সিংহের পঞ্চম পুত্র গম্ভীর সিংহ মারজিতের সিংহাসন লাভের পর মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন ; তিনি গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতি হইয়া মারজিতের আক্রমণ রোধ করিলেন। মণিপুরী সৈন্যদল কাছাড় পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু কাছাড়ের দুর্ভাগ্যের অবসান হইল না। চৌরজিৎ ও গম্ভীর সিংহ কাছাড়ে আধিপত্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে মণিপুর রাজবংশে আবার ভাগ্যবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। কাছাড় হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মারজিৎ ব্রহ্মরাজের রোষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। সামন্ত নৃপতি রূপে ব্রহ্মরাজের দরবারে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিয়া তিনি যে দাম্ভিকতার পরিচয় দিলেন তাহারই শাস্তিস্বরূপ ব্রহ্মবাহিনী পুনরায় মণিপুর আক্রমণ করিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মারজিৎ সিংহাসনচ্যুত হইয়া কাছাড়ে পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মরাজের অনুগ্রহে সুবল নামক এক ব্যক্তি মণিপুরের সিংহাসন লাভ করিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মারজিতের ভ্রাতুষ্পুত্র পীতাম্বর সিংহ সুবলকে পরাজিত করিয়া মণিপুর অধিকার করেন। অল্পদিন পরেই গম্ভীর সিংহ মণিপুর আক্রমণ করিয়া পীতাম্বরকে পরাজিত করেন। পীতাম্বর পলায়ন করিয়া আভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজের ভয়ে গম্ভীর সিংহ মণিপুরে রাজত্ব করিতে সাহসী হইলেন না, সৈন্যসামন্তসহ কাছাড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মারজিৎ কাছাড়ে আসিয়া চৌরজিতের সহিত সম্মিলিত হইয়া গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বল গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদিগকে বাধা দিতে না পারিয়া রাজ্য ত্যাগ

করিয়া শ্রীহট্টে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিরুপায় হইয়া বড়লাটের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার রাজ্য শ্রীহট্টের সহিত সংযুক্ত করিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন করা হউক, কিন্তু লর্ড হেষ্টিংস এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। এদিকে গোবিন্দচন্দ্রের পলায়নের পর মণিপুরের রাজকুমারদিগের মধ্যে কলহ ও মতভেদ উপস্থিত হইল। গম্ভীরসিংহ কাছাড়ের দক্ষিণাংশ এবং মারজিৎ হাইলাকান্দী অধিকার করিলেন; চৌরজিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কাছাড়ে ও মণিপুরে যখন অরাজক অবস্থা তখন নানা কারণে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত ব্রহ্মরাজের সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিল। ১৩৫০ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে আমি প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই সামরিক কারণে কাছাড় ও জয়ন্তিয়া রাজ্য কোম্পানীর প্রভাবাধীন করা হইল। চৌরজিৎ কাছাড়ের করদ-রাজা রূপে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু কাছাড়ের কোন অংশে তাঁহার আধিপত্য নাই জানিয়া বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। মারজিতের অধিকার এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। গম্ভীর-সিংহের আধিপত্য দক্ষিণ-কাছাড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু তিনি ব্রহ্মরাজের সহিত গোপনে পত্র ব্যবহার করিতেন এবং প্রকাশ্যে কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তাঁহার দাবি উপেক্ষা করিয়া লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকেই কাছাড়ের বিধিসঙ্গত অধিপতিরূপে স্বীকার করিলেন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এক দল ইংরেজ সৈন্য কাছাড় হইতে মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পথ এত দুর্গম ছিল যে এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই; কাছাড়ের পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে পথশ্রমে ক্লান্ত সৈন্যদল ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন মণিপুর হইতে ব্রহ্মবাহিনী বিতাড়নের ভার পড়িল গম্ভীরসিংহের উপর। তিনি এত দিন ইংরেজদের আশ্রয়ে শ্রীহট্টে বাস করিতেছিলেন। কোম্পানীর অর্থে তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি মণিপুরে প্রবেশ করেন। তাঁহার সহযোগী ছিলেন লেফ্‌টেনাণ্ট পেম্বার্টন। গম্ভীরসিংহের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই ব্রহ্মবাহিনী মণিপুর হইতে পশ্চাদপসরণ করে। তিনি অনায়াসে কুবো উপত্যকা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারী ইয়ান্দাবুর সন্ধি দ্বারা প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে গম্ভীরসিংহ মণিপুরের অধিপতি হন। ব্রহ্মরাজের সহিত মণিপুরের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়; গম্ভীরসিংহ কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজ কুবো উপত্যকায় মণিপুররাজের অধিকার স্বীকার করিতে অসম্মত হন। এই বিষয়ে দীর্ঘকালব্যাপী বাদানুবাদের পর ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কুবো উপত্যকা ব্রহ্মরাজকে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করেন। মণিপুর-রাজকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ভারত-সরকার হইতে মাসিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়। অদ্যাপি মণিপুররাজ এই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

রাজ্য লাভের পরও গম্ভীরসিংহ পূর্ব্বশত্রু গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি বৈরিতা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানের পর গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজ-সরকারের অনুগ্রহে কাছাড়ের সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন গম্ভীরসিংহ নানা প্রকারে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে গম্ভীরসিংহের ষড়যন্ত্রে জনৈক আততায়ী গোবিন্দচন্দ্রকে হত্যা করে। গোবিন্দচন্দ্রের কোন বৈধ উত্তরাধিকারী ছিল না। গম্ভীরসিংহ প্রস্তাব করিলেন যে, বার্ষিক ১৫,০০০ টাকা খাজনায় বিশ বৎসরের জন্য কাছাড় রাজ্য তাঁহাকে ইজারা দেওয়া হউক। কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট পেম্বার্টন মন্তব্য করিলেন যে কাছাড়ের অধিবাসিগণ দীর্ঘকাল গোবিন্দচন্দ্রের অত্যাচারে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহাদিগকে গম্ভীরসিংহের ন্যায় অত্যাচারী শাসকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাদের ভার বৃদ্ধি করা সঙ্গত নহে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নির্দ্দেশে কাছাড় কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইল।

এত দিন পরে জাপানীদের অনুগ্রহে মণিপুর যবনিকার অন্তরাল হইতে পুনরায় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইল।

হরবোলা পাখী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গেলেও অনুকরণ-দক্ষতায় মানুষের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। ইচ্ছা করিলে মানুষ যে-কোন প্রাণীদের হাবভাব, চালচলন, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি অবিকল অনুকরণ করিতে পারে। মনুষ্যেতর প্রাণী, বিশেষভাবে নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে অপূর্ব্ব অনুকরণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহারা মানুষের মত যে-কোন বিষয়ে অনুকরণ-শক্তির পরিচয় দিতে পারে না। মনুষ্যেতর প্রাণীদের অনুকরণ-শক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গের মধ্যে কোন কোন প্রজাপতি, মাকড়সা, ক্যাটারপিলার, মথ, ফড়িং, কাটি-পোকা প্রভৃতি প্রাণীরা আকৃতি, বর্ণ অথবা হাবভাবে শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এমন অপূর্ব্ব অনুকরণ-দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে যে, দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। ইঁদুর, খরগোস, হরিণ, ছাগল, বাঘ-ভালুক এবং বিভিন্ন জাতীয় মৎস্যাদি জলচর প্রাণী স্থানীয় পরিবেশের সহিত এমন বর্ণসাম্যের সৃষ্টি করে যে, তেমন সন্ধানী চোখেরও দৃষ্টি বিভ্রম না ঘটিয়া পারে না। বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সারা তাহাদের গায়ের রং এবং



আমাদের দেশের অতিপরিচিত হরবোলা পাখী ময়না

শারীরিক গঠন এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে যে, তাহাদিগকে সহজে মাকড়সা বলিয়া চিনিবার কোনই উপায় নাই। বিভিন্ন জাতীয় ক্যাটারপিলার এবং প্রজাপতিরাও এরূপ অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানুষের কথা বাদ দিলে একমাত্র পক্ষিজাতীয় প্রাণী ছাড়া অপরের কণ্ঠস্বর অনুকরণে অন্য কাহারও কোন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি বানর জাতীয় প্রাণীরা স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয়; কিন্তু তাহাদের অনুকরণ-ক্ষমতাও কেবল অঙ্গভঙ্গী এবং হাবভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মানুষের মতই অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইলেও মানুষের কণ্ঠস্বর তো দূরের কথা ইহারা অপর কোন প্রাণীর কণ্ঠস্বরও অনুকরণ করিতে পারে না। পাখীরাই কেবলমাত্র এ বিষয়ে অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। যদিও সকল জাতীয় পাখীরাই অপরের কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করিতে পারে না তথাপি কয়েক জাতীয় পাখীকে এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়। যে-সকল পাখী মানুষ অথবা অপর কোন প্রাণীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে পারে এস্থলে তাহাদিগকেই হরবোলা নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যেও আবার দুই রকমের পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ময়না, কাকাতুয়া, শালিক প্রভৃতি পাখীরা মানুষের কণ্ঠস্বর হুবহু নকল করিতে পারে। কেহ কেহ আবার কেবল শিস্‌ই দিতে পারে, কথা বলিতে পারে না। কণ্ঠস্বর অনুকরণকারী পাখীরা কেহ কেহ বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীদের শব্দও নকল করিতে পারে। আমাদের দেশের ময়না, টিয়া প্রভৃতি পাখীরা মানুষের কোন কোন কথা এমন নিখুঁৎ ভাবে উচ্চারণ করে যে, তাহা কৃত্রিম বলিয়া মনে করিবার কোন কারণই থাকে না। তবে একথা ঠিক যে, মানুষের কথা তাহারা নিখুঁৎ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেও অর্থবোধ করিয়া প্রয়োগ করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ যাহা কানে শুনিয়াছে যন্ত্রের মতই তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারে মাত্র। খেয়ালখুসী মত এরূপ দুই একটা কথা অসংলগ্ন ভাবে উচ্চারণ করিতে করিতে দৈবাৎ তাহা সময়োপযোগী হইয়া পড়িতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই দর্শকের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বের একটা ঘটনার কথা বলিতেছি। ১৭।১৮ বৎসরের একটি ছেলে একদিন দুপুর বেলা নির্জ্জন বাগানে একটা গাছে উঠিয়া আম চুরি করিতেছিল। কিছু আম কোঁচড়ে ভরিয়া নীচের দিকের একটা ডালে দাঁড়াইয়া সে অন্যমনস্কভাবে একটা কাঁচা আম চিবাইতেছে হঠাৎ কোথা হইতে কে যেন মনুষ্যকণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"কে রে?" আকস্মিক ভয়ে ছেলেটা আঁৎকাইয়া উঠিয়া পা পিছলাইয়া প'ড়য়া গিয়া আঘাত পায়। সংবাদ পাওয়ার পরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জানিতে পারিলাম। কিন্তু কে যে এরূপ ভাবে চীৎকার করিয়াছিল তাহার কোনই সন্ধান মিলিল না। ইতিমধ্যেই গাছের উপর হইতে অবিকল মনুষ্যকণ্ঠে ক্রমাগত দুই তিন বার 'কে-রে'—'কে-রে' শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর একজনের নজরে পড়িল—গাছের অনেক উপরে পাতার আড়ালে একটি সুদৃশ্য ময়না বসিয়া রহিয়াছে। বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কাহারও পোষা ময়না উড়িয়া আসিয়াছে এবং সে-ই ঐ রকম কথা বলিতেছে। পাখীটাকে ধরিবার চেষ্টা করা হইল কিন্তু সে উড়িয়া গিয়া আর একটা ছোট গাছে বসিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেখান হইতে উড়িয়া গিয়া একটা বাড়ীর দোতলার বারান্দায় ঢুকিয়া পড়ে। সেখান হইতে পুনরায় তাহাকে অনায়াসেই বন্দী করা হয়। খাঁচার মধ্যে থাকিয়া সে মানুষের অনেকগুলি কথা সুস্পষ্ট এবং নিখুঁৎভাবে বারংবার উচ্চারণ করিত। হঠাৎ কোন আগন্তুক উপস্থিত হইলে, কবাটের শব্দ শুনিলে অথবা কুকুর বিড়াল দেখিলে সে উচ্চৈস্বরে 'কে-রে—কে-রে' করিয়া চীৎকার করিতে সুরু করিত। ঝগড়ার সময় বিড়ালেরা যেমন ফোঁস-ফোঁস, ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ শব্দ করে এই ময়নাটাকেও মাঝে মাঝে ঠিক সেরূপ শব্দ করিতে শুনিয়াছি।

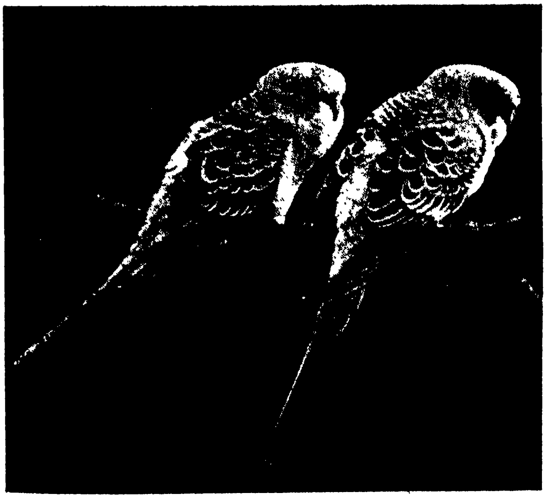
অনেক দিন আগের কথা। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের একটা পোষা ময়না ছিল। ময়নাটা কতকগুলি কথা ঠিক মানুষের মত পরিষ্কার উচ্চারণ করিতে পারিত। শিখানো কথা ছাড়াও শুনিয়া শুনিয়া সে কয়েকটা কথা নিজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। কারণে, অকারণে তাহাকে প্রায়ই মাঝে মাঝে বলিতে শোনা যাইত—মনিয়া, দেখতো কে? বাড়ীর চাকরের নাম ছিল মনিয়া। আগন্তুক কেহ আসিলে বাড়ীর লোকেরা হয়ত চাকরটাকে এই ভাবেই ডাকিয়া বলিতেন। শুনিয়া শুনিয়া ময়না ঐ বুলিটাই শিখিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্রিবেলায় খাঁচা সমেত ময়নটাকে সিঁড়ির পাশে ঝুলাইয়া রাখা হইত। গভীর রাত্রিতে একদিন একটা লোক কোন রকমে বোধ হয় পাঁচিল টপকাইয়া

ভিতরে প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়াই ময়নাটা চেঁচাইয়া ওঠে—"মনিয়া, দেখতো কে?" মানুষের এরূপ কথা শুনিয়া লোকটা ভয়ে কলতলার দিক দিয়া পলাইবার সময় শেওলায় পা পিছলাইয়া ভয়ানকভাবে আছাড় খাইয়া পড়ে। পাখীটার চীৎকার এবং গুরুভার বস্তুর পতনের শব্দে সকলে ছুটিয়া আসিয়া লোকটাকে ধরিয়া ফেলে। উভয় ঘটনাতেই দেখা যায় পাখীর কথাগুলি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এই যোগাযোগ যে দৈবাৎ ঘটিয়াছিল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।



এমাজন নামক একজাতীয় টিয়া পাখী

ময়না আমাদের দেশের অতি পরিচিত পাখী। মনুষ্যের কণ্ঠস্বর অতি সুস্পষ্টভাবে নকল করিতে পারে বলিয়া অনেকেই অতি যত্নসহকারে ময়না পুষিয়া থাকেন। ইহাদের ডানার পালকের রং কালো অথচ উজ্জ্বল। ঘাড়ের কাছে কানের মত হলুদ বর্ণের একটা পাতলা পর্দার জন্য ইহাদিগকে খুবই সুশ্রী দেখায়। স্বাধীন অবস্থায় ইহারা পাহাড়-পর্ব্বতের আশেপাশে বৃক্ষকোটরে বাস করে এবং দলে দলে আহারান্বেষণে নির্গত হয়। তখন ইহাদের কণ্ঠস্বর কিন্তু মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। খাঁচায় পুষিয়া যত্ন করিয়া শিক্ষা দিলে ইহারা মানুষের অনেক কথাই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতে পারে।



অষ্ট্রেলিয়ার একজাতীয় ক্ষুদ্রকায় সুদৃশ্য টিয়া পাখী

আমাদের দেশে বন্য অবস্থায় যথেষ্ট টিয়া পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আহারান্বেষণে বহির্গত হয়, এবং ফুল, ফল ও শস্যাদির যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং কচি পাতার মত সবুজ এবং ঠোঁটের রং টকটকে লাল বলিয়া খুবই সুন্দর দেখায়। সাধারণতঃ ইহারা বৃক্ষকাণ্ডের উপরিভাগে কোটরে বাস করে। বন্য অবস্থায় কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিলেও পোষা অবস্থায় শিক্ষা দিলে মানুষের অনেক কথা উচ্চারণ করিতে পারে। অনেকের ধারণা টিয়া পাখীরা মানুষের কথা উচ্চারণ করিতে শিখিলে তাহার অর্থ বুঝিয়া যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—যে-সকল টিয়া মানুষের কথা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে পারে তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ খাদ্যবস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করিতে শিখানো হইয়াছিল। অভ্যাসের ফলে তাহারা অনুরূপ অবস্থায় সেই শিখানো বুলি উচ্চারণ করে মাত্র। অবশ্য কথাটাকে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিলে খাবার পাওয়া যাইবে নচেৎ পাওয়া যাইবে না—একথাটা তাহারা বুঝিতে পারে। ইহাই যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সময় সময় খেয়াল বশে কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় দৈবাৎ যদি অবস্থানুযায়ী মিলিয়া যায় তবে লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকে না এবং ভাবে যে পাখীটা বিচার-বুদ্ধি খাটাইয়া সময়োপযোগী কথাটা বলিয়াছে। অলিভার পাইক্‌ একটি টিয়ার কথা বলিয়াছেন। পাখীটি কতকগুলি কথা অবিকল উচ্চারণ করিতে পারিত। বাড়ীতে এক দিন একটা চোর ঢুকিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেই পাখীটা মনুষ্যকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল—'কে যায়'? 'কে যায়?' চোর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে টিয়াটা যে বুঝিয়া শুনিয়া চোর তাড়াইবার জন্য একথা বলে নাই—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আকস্মিক ভাবেই তাহার ঐ শিখানো বুলিটা বাহির হইয়া গিয়াছিল মাত্র।

ম্যাক টিয়া জাতীয় এক প্রকার পাখী। ইহারা আকারে প্রায় তিন ফুট লম্বা হয়। বন্য অবস্থায় ইহারা বড় বড় ঝাঁক বাঁধিয়া বিচরণ করে এবং তখন এমন কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে যে কানে তালা লাগিয়া যায়। ম্যাকরা বেশ পোষ মানে। পোষা অবস্থায় শিক্ষা দিলে ইহারা খুব সুন্দর ভাবে মানুষের কথা উচ্চারণ করিতে পারে। নীল ও খয়েরী রঙের এক জাতীয়

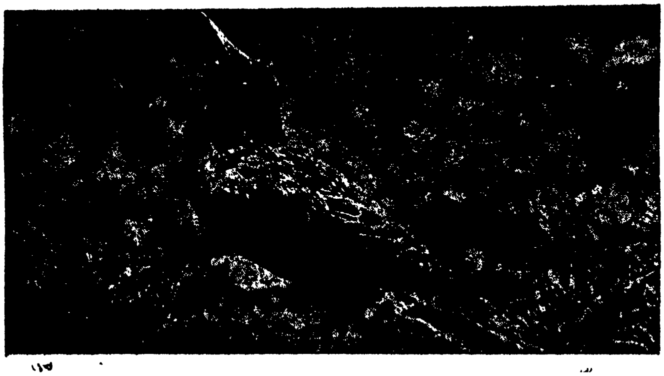


অপরের স্বর অনুকরণকারী "মকিং-বার্ড"

ম্যাকই মনুষ্যকণ্ঠ অনুকরণ করিতে সর্ব্বাধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লাল এবং হলদে রঙের ম্যাক এবং হায়াসিন্থাইন ম্যাকরাও মোটামুটি মনুষ্যকণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে পারে। দক্ষিণ-আমেরিকা এবং আফ্রিকার কয়েক জাতীয় টীয়া অতি সুন্দরভাবে মনুষ্যকণ্ঠে কথা বলিতে পারে। প্যারাগয় এবং ব্রেজিলে 'এমাজন' নামে একজাতীয় অসংখ্য টিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দেহের সম্মুখভাগ নীল বর্ণের পালকে আবৃত। রীতিমত ভাবে শিক্ষা দিলে ইহাদের অনেকেই নিখুঁৎভাবে মানুষের কতকগুলি কথাবার্ত্তা উচ্চারণ করিতে পারে। ইহাদের কেহ কেহ নাকি কথাবার্ত্তা নকল করিতে এমনই সুদক্ষ যে, সম্পূর্ণ এক একটি গান পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া থাকে। তবে এই জাতীয় পাখীদের কোন কোনটি অবশ্য যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও কথা বলিতে শিখে না। আফ্রিকায় একজাতীয় ধূসর বর্ণের টিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা এমন সুন্দর এবং নিখুঁৎভাবে মনুষ্যকণ্ঠস্বর নকল করে যে শুনিয়া কিছুতেই পাখীর কণ্ঠস্বর বলিয়া মনে হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার লাভবার্ড নামক টিয়া জাতীয় ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার সুদর্শন পাখী আমাদের দেশে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থকে পুষিতে দেখা যায়। ইহারা সর্ব্বদাই জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এবং সুমিষ্ট কণ্ঠে এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে। খাঁচার মধ্যেও পরম সুখে এমন নিশ্চিন্ত মনে কাল যাপন করে যে দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হইবে ইহারা যেন শান্তি ও সুখের প্রতীক। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অগাধ ভালবাসার কথা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ ইহারা মনুষ্যকণ্ঠস্বর অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে না; কিন্তু ইহাদের কেহ কেহ পর পর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অতি সুন্দরভাবে অনেক কথা উচ্চারণ করিতে পারে। টিয়ার মত কাকাতুয়ারাও মানুষের অনেক কথা অবিকল উচ্চারণ করিতে পারে। কথা বলিবার সময় তাহাদের হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে।



শালিক-জাতীয় এক প্রকার হরবোলা পাখী



ষ্টার্লিং নামক হরবোলা পাখী

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকটা চড়ুই পাখীর মত। দেখিতে 'মকিং-বার্ড' নামক লম্বা লেজওয়ালা একজাতীয় পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। কণ্ঠস্বর ইহাদের খুবই মধুর। পোষা অবস্থায় শিক্ষা পাইলে ইহারা অতি নিখুঁৎভাবে মানুষের মত কথা বলিতে পারে। আমাদের দেশীয় শালিক পাখীরাও শিক্ষা পাইলে মনুষ্যকণ্ঠে দুই-চারিটা বুলি উচ্চারণ করিতে পারে। শালিকের সাধারণ স্বর কর্কশ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্বাধীন অবস্থায় অবসর সময়ে যখন নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে তখন ইহাদের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে এবং বৈচিত্র্যে সকলকেই মুগ্ধ করিয়া থাকে। খাঁচায় আবদ্ধ শালিকের



"জে" নামক হরবোলা পাখী



সাদা পিঠওয়ালা ম্যাগ্‌পাই নামে পরিচিত কাক-জাতীয় পাখী

কাছে অন্যান্য শালিকেরা আসিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে কত রকম কণ্ঠস্বর বাহির করিয়া আলাপ করিয়া থাকে তাহা দেখিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকে স্বজাতীয় অপর পাখী মনে করিয়া শালিকেরা যেরূপ সুমিষ্ট এবং বিচিত্র কণ্ঠে আলাপ জুড়িয়া দেয় তাহা সত্যসত্যই উপভোগ্য। শালিক পাখীদের এরূপ আমোদ-আহ্লাদ করিবার প্রকৃতি দেখিয়া স্বভাবতঃই ইহাদিগকে হরবোলা পাখী বলিয়া মনে হয়। ষ্টার্লিং নামক বৈদেশিক পাখীরাও শিক্ষা পাইলে খুব সুস্পষ্টভাবে মনুষ্য-কণ্ঠে কথা বলিতে পারে। এক সময়ে ইংলণ্ডের লোকেরা মনে করিত—পাখীর জিভ্‌ চিরিয়া দিলে তাহারা অধিকতর স্পষ্টতার সহিত মনুষ্যকণ্ঠে কথা বলিতে পারে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই ষ্টার্লিং এবং অন্যান্য হরবোলা পাখীর জিভ্‌ চিরিয়া দিত। অবশ্য আমাদের দেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার ফলে পাখীর কথা বলিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা বরং তাহাদের স্বাভাবিক স্বর সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইত। কিন্তু প্রচলিত ধারণার এমনই প্রভাব যে, নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ করিয়াও লোকে অস্ত্র প্রয়োগের দোষ-ত্রুটিই তাহার কারণ বলিয়া মনে করিত।

অনেকে শুনিয়া হয়তো বিস্ময় বোধ করিবেন যে, বিভিন্ন জাতীয় কাকেরাও সুন্দর ভাবে মনুষ্য কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করিতে পারে। কাককে খাবারের প্রলোভন দেখাইয়া বিভিন্ন বুলি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌ অলিভার পাইক তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন যে, তিনি একটি দাঁড়কাক পুষিয়াছিলেন এবং খাদ্যের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে এমন সুন্দর কথা বলিতে শিখাইয়াছিলেন যে, তাহার উচ্চারিত হুবহু মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইত। অবশ্য কাককে কথা বলাইতে হইলে খাঁচায় পুষিয়া সুবিধা হয় না। স্বাভাবিক পরিবেশে সজ্জিত পক্ষি-গৃহে রাখিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যকণ্ঠ উচ্চারণে সক্ষম করা যাইতে পারে। কাক ভয়ানক চতুর পাখী। কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিলে তাহার খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ইহা বুঝিতে পারিলে সে মনুষ্যকণ্ঠ



মনুষ্যকণ্ঠ অনুকরণে সক্ষম একজাতীয় দাঁড়কাক



সাদা ঘাড়ওয়ালা ম্যাগ্‌পাই। ইহারা মনুষ্যকণ্ঠস্বর উচ্চারণ করিতে পারে

অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে। ইহা কাকের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কুকুরেরা মানুষের কথা উচ্চারণ করিতে না পারিলেও তাহাদের অনেক কথার অর্থ বোধ করিতে পারে। ইহাতে যত বুদ্ধির প্রয়োজন হয় খাবার লোভে ইঙ্গিত অনুযায়ী কয়েকটা কথা উচ্চারণ করা ততদূর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। যাহা হউক, উক্ত পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌ বলিয়াছেন যে, কাকেরা এমন সুন্দর কথাবার্ত্তা বলিতে শিখে যে, একদিন তিনি পক্ষি-গৃহে গিয়া দূর হইতে কতকগুলি কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, বাগানের মালীরা বোধ হয় পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেছে। কিন্তু পরে দেখিলেন—বাগানের পোষা কাকটি আপন মনে তাহার শেখা-বুলি ঠিক মানুষের মত করিয়া বলিয়া যাইতেছে। দাঁড়কাক সাধারণতঃ কর্কশ কণ্ঠেই চীৎকার করিয়া থাকে; কিন্তু খাবারের প্রলোভন দেখাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে দিয়া ইচ্ছানুযায়ী কথা বলাইতে পারা যায়। তবে প্রথমতঃ অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত হইয়া থাকে। কাক জাতীয় 'জ্যাক-ড'কে বাচ্চা বয়স হইতে পুষিয়া শিক্ষা দিলে সুন্দরভাবে মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে পারে। অনেকে অবশ্য চেষ্টা করিয়াও শব্দগুলিকে যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না; কতকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে অদ্ভুত উচ্চারণ-ভঙ্গীতে মনুষ্যকণ্ঠ অনুকরণে চেষ্টা করে।

ম্যাগপাই নামে পরিচিত অষ্ট্রেলিয়ার 'পাইপিং-ক্রো'গুলি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে পারিলে ইহাদের অনেকেই কিছু না কিছু কথা বলিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ায় সাদা-পিঠ এবং সাদা-গলা সমন্বিত দুই জাতীয় কাক দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় জাতীয় কাকই বেশ পোষ মানে এবং শিখাইলে অতি চমৎকারভাবে মনুষ্যকণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে পারে। ইহাদের অনেকেরই শিস্‌ দিবার ক্ষমতা অপূর্ব্ব। আমাদের দেশীয় কাকেরা যখন অবসর সময় জোড়া বাঁধিয়া নিরালায় বসিয়া কাটায় তখন লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে—তাহারা বিচিত্র ভঙ্গীতে কতরকমের অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়—স্বাভাবিক অবস্থায় যাহাদের এরূপ বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে তাহারা শিক্ষা পাইলে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর অনায়াসেই উচ্চারণ করিতে পারে।

ইহা ছাড়া কতকগুলি পাখী দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা মনুষ্যকণ্ঠস্বর উচ্চারণ করিতে না পারিলেও অপরের সুর হুবহু নকল করিতে পারে। সাদা-কালোয় বিচিত্রিত মাঝারিগোছের লেজওয়ালা 'জে' নামে এক প্রকার বিদেশীয় পাখী অপর পাখীদের সুর নকল করিতে ভয়ানক ওস্তাদ। ইহারা অপরাপর পাখীর শিস্‌ ও সুর অবিকল নকল করিয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় কিন্তু ইহারা ভয়ানক কর্কশ কণ্ঠে কিচিরমিচির শব্দ করিয়া অস্থির করিয়া তোলে। এই পাখীগুলির যান্ত্রিক শব্দ অনুকরণ করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। পোষা অবস্থায় চেষ্টা করিলে মানুষের দুই একটি কথাও নকল করিতে পারে। তবে এই পাখীগুলিকে পোষা অবস্থায় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ ইহারা সাধারণতঃ গভীর জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালেই বাস করিয়া থাকে। এই পাখীগুলি অস্থির প্রকৃতির হইলেও আত্মগোপনে ভয়ানক পটু। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশীয় দোয়েল, শ্যামা, বুলবুল এবং বিদেশীয় ক্যানারি প্রভৃতি পাখীরা মনুষ্যকণ্ঠস্বর নকল করিতে না পারিলেও অপরাপর পাখীদের শিস্‌ বা যে-কোন একটানা সুর অনুকরণ করিতে পারে।

গুপ্ত সংবাদ

শ্রীপুষ্পরাণী ঘোষ

ছোট ছোট গ্রামগুলির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আসন্ন বিপদের কথা তাদের জানিয়ে দেবার ভার পড়েছিল চি-লিনের ওপর। মাঝে মাঝে যখন মাথার ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছিল সে বন্দুকটা উঁচু করে ধরে গুলি ছুঁড়ছিল কিন্তু বলাই বাহুল্য যে তাতে কোন কাজ হচ্ছিল না, কারণ অত দূর থেকে ছোঁড়া একটি মাত্র বন্দুকের গুলির আঘাত এরোপ্লেনের গায়ে লাগা সম্ভব নয়।

সামনের একটা কুটির থেকে একটি তরুণী একটা পাত্রে কিছু খাবার নিয়ে চি-লিনের কাছে এসে বললে, "এই নিন আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।"

"কি এনেছ ?"

"গরম ভাত ও কিছু মাংস।"

"কেন আনলে ? তুমি কি ভাবছ নাকি যে আমার খিদে পেয়েছে ?"

"চুপচাপ খেয়ে ফেলুন তো কথা না বলে, এমন ভাব করছেন যে আমি যেন ওঁকে বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টায় আছি"—মেয়েটি রাগের ভান করে বললে।

চি-লিন বললে, "আমরা যখন সৈনিকের কাজে নিযুক্ত থাকি অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলা আমাদের নিয়ম নয়।"

মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "আমারও বয়স হয়নি সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলবার মত।"

"কত বয়স তোমার ?"

"সতের।"

"গম্ভীরভাবে মুরুব্বীর মত চালে চি-লিন বললে, "নেহাতই ছোট দেখছি তাহলে"

"আপনার নিজেরও তা হলে এমন কিছু বেশি বয়স হয় নি।"

"তা হয়েছে বৈকি—আমার বয়স হ'ল উনিশ"

"সে আর এমন কি বেশি ?"

"দু বছরের তফাৎ অনেকটা তফাৎ, সতের বছর আর উনিশ বছরের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। দু-বছর আগে আমি ছিলাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র আর আজ দেখ কি হয়েছি"—চি-লিন গর্ব্বিতভাবে তার সৈনিকের পোষাকটা দু'হাত দিয়ে টেনে সমান করে দিতে দিতে বললে।

মেয়েটি বললে, "আমিও পড়েছি উচ্চ বিদ্যালয়ে।"

"কতগুলো অক্ষর পড়তে পার তুমি ?"

"খবরের কাগজে যে চার হাজার অক্ষর ব্যবহার হয় তার সবগুলোই পড়তে পারি, তা ছাড়া লিখতেও পারি প্রায় সবগুলোই।"

"একজন মেয়ের পক্ষে তা বেশ ভালই বলতে হবে।"

"মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে চালাক হয় বেশি, তা ছাড়া আমার বাবা ছিলেন অক্ষর খোদাইকার, ওঁর কাছ থেকেই আমি শিখেছি অক্ষরগুলো।"

"কোথায় ? এইখানে ? এই গাঁয়ে ?"

"না না, আমরা থাকতাম শহরে, তারপর তিনি মারা গেলেন, আমাকেও চলে আসতে হল এখানে কাকা-কাকীমার কাছে।"

চি-লিন সজোরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বললে, "ও আচ্ছা, তা এবার আমি চলি। শোনো, তোমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে ; কাল এতক্ষণে হয়ত এ গ্রামটা ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে"—

মেয়েটি সাহসভরে চি-লিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি অত সহজে ভয় পাই না।"

"মিথ্যা বলছ—রীতিমত ভয় পেয়েছ তুমি।"

"কেমন করে জানলেন আপনি ?"

"আমি জানি সব জানি," তার চেয়ে এই বেলা ভালয় ভালয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়। অবশ্য শত্রুদের যদি তোমার ভাল লাগে সে আলাদা কথা। তোমার মত মেয়েদের পেলে তারা যে কি করবে সে ত বুঝতেই পারছ।"

"হ্যাঁ—তা জানি," মেয়েটির চোখে এবার জল এসে পড়ল, "আমার কাকীমা বলেছেন যে আমাকে ঘরবাড়ী তদারক করবার জন্য রেখে যাবেন।"

"তিনি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন কিম্বা ভয় দেখাচ্ছেন"

"না তিনি ঠাট্টা করবার লোক নন্। আমার কাকা গেছেন যুদ্ধে, ইনি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।"

"সম্ভব হলে আমাকে বিক্রী করে দেওয়াই তাঁর ইচ্ছা। যদি—যদি আপনার কাছে টাকা থাকত আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম।"

"এ রকম বলা তোমার উচিত নয়—এ অন্যায়। তুমি কেমন করে জানবে আমি কে কিম্বা কেমন লোক ?" চি-লিন জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া তোমার মত সুন্দরী মেয়ের কি প্রথম যাকে দেখবে তাকেই বিশ্বাস করা উচিত ?"

মেয়েটি জামার হাতায় মুখ লুকিয়ে আস্তে আস্তে কাঁদতে লাগল। একটু পরে চি-লিন জিজ্ঞাসা করলে, "কত টাকা চান তোমার কাকীমা ?"

"কুড়িটা রুপোর ডলার"—এই বলে মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি আবার বললে, "আমি অন্যায় ভেবে কিছু বলি নি, আমি শুধু এই বলতে চেয়েছিলাম যে আপনি যদি আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান তা হলে সেজন্য আপনাকে কখনও অনুতাপ করতে হবে না, কারণ আমি রান্নাবান্না, ঘরকন্নার সবরকম কাজই জানি আর খুব অল্পতেই চালিয়ে নিতে পারি—ক্রমে ক্রমে আমি আপনার টাকাটা শোধ করে দিতে পারব হয়ত কিছু বেশিও দিতে পারব।"

"কেমন করে ?"

"এই দিয়ে"—মেয়েটি জামার হাতার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট সিল্কের ফিতে বার করে দেখালে, "এটার ওপর আমি নিজে নক্সা কেটে সেলাই করেছি। এক সময় এটার জন্য আমি পাঁচটা চীনে ডলার দাম পেয়েছিলাম"—

"বল কি, এটার দাম পাঁচ ডলার ?"

জামার পকেট থেকে একটি ছোট্ট অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বের করে চি-লিনের হাতে দিয়ে মেয়েটি বললে, "দেখুন, এই ছোট্ট ফিতেটার ওপর কনফিউসিয়াসের জীবনের চব্বিশটি চিত্র আঁকা আছে।"

প্রথমে চি-লিনের বিশ্বাস হয়নি কথাটা ; কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করবার পর সে দেখতে পেল সত্যিই অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম চিত্রাবলী সেই এক হাত লম্বা ও এক আঙুল চওড়া ফিতেটার ওপর নিপুণভাবে আঁকা রয়েছে।

প্রত্যেকটি ছবি ভাল ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখে ও ঠিক চব্বিশটা আছে কিনা পৃথকভাবে গুণে নিয়ে চি-লিনকে স্বীকার করতেই হ'ল যে, সে আগে আর কখনও এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখে নি। মেয়েটি বললে, "এর চেয়েও সূক্ষ্ম কাজ আমি জানি তবে সে সিল্কের ওপর নয়।"

"তাহলে কিসের ওপর ?"

"সে আমি আপনাকে পরে দেখাব—এখন নয়।"

"তা হলে এখন কথা হচ্ছে এই যে জাপানীদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্ত আমাকে কুড়িটা রুপোর ডলার দিতে হবে —যদিও জাপানীরা তোমাকে এমনিতেই নিয়ে নিত।"

"আমি কাজ করে ক্রমে ক্রমে সব টাকাই শোধ করে দেব।"

"শোন, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, তুমি পালিয়ে যাও না কেন?"

"পালাতে আমি পারব না, আধুনিক মেয়েরাই খালি পালাতে পারে; আমি আজকালকার মেয়েদের মত নই, সেকেলে ধরণের—আমার বাবা আমাকে খুব কড়া শাসনে মানুষ করেছেন। তা ছাড়া একবার পালিয়ে গেলে আর কখনও আমি বাড়ী ফিরে আসতে পারব না—যুদ্ধ থেমে গেলেও না। ছেলেরা যখন খুশি ফিরে আসতে পারে কিন্তু মেয়েরা একবার ঘর ছেড়ে বেরুলে আর কোন মতেই ফিরে আসতে পারে না।"

"তুমি যা বলছ তা সত্যি বটে, কিন্তু কুড়িটা রুপোর ডলার আমি এখন পাই কোথায়? তা ছাড়া আমি হলাম এক জন সৈনিক—আমি কেমন করে একটি মেয়ের ভার নিতে পারি?"

"আমার জন্ত আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না—আমি শুধু আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। আমি রান্না জানি, ব্যাণ্ডেজ তৈরি করতে পারি, জামা কাপড় রিপু করতে পারি; নিজের খাওয়া-পরার বদলে অনেক কাজ আমি করে দেব।"

টুপী খুলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে চি-লিন বললে, "তুমি যা বলছ তা করলে অবশ্য মন্দ হয় না, কিন্তু করা উচিত কিনা তাই হচ্ছে সন্দেহ। তুমি এখন ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছ আর সেইজন্যই যাকে প্রথম হাতের কাছে পেয়েছ তার কাছেই নিজেকে সঁপে দিতে চাইছ; কিন্তু ভবিষ্যতে হয়ত তোমার আর আমাকে ভাল নাও লাগতে পারে, তখন হয়ত তুমি আমাকে এই বলে দোষ দেবে যে তোমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমি অত সস্তায় তোমাকে কিনে নিয়েছিলাম।"

"মেয়েরা এক দৃষ্টিতেই অনেক কিছু বুঝতে পারে, প্রথম যাকে হাতের কাছে পেলাম তাকেই আম বেছে নিইনি।"

"তোমার ধারণা আমার কাছে তুমি সুখে থাকবে?"

"আপনি যদি আমাকে নিতে রাজী থাকেন তো আমিও রাজী আছি আপনার সঙ্গে যেতে, আমি খুব সুখেই থাকব।"

"বেশ তাহলে ডাক তোমার কাকীমাকে।"

"সত্যি বলছেন?"

"হ্যাঁ—সত্যি।"

"ও, কি মজা! কি মজা! আমি জানতাম। আমি ঠিক জানতাম—আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল—" আনন্দে মেয়েটি প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠল।

চি-লিন বললে, "দাঁড়াও তোমার নামটাই যে জিজ্ঞাসা করা হয় নি—"

"আমার নাম শ্যামা।"

হেসে চি-লিন বললে, "শ্যামা? তা বেশ নাম, খাসা নাম। হয়ত খুব কবিত্বপূর্ণ কিম্বা আধুনিক নয় কিন্তু চমৎকার ঘরোয়া নাম।"

"ভাল লেগেছে আপনার?"

"হ্যাঁ শ্যামা, ভাল লেগেছে—"

"খুব খুশী হলাম শুনে—এবার আপনার নামটা কি বলুন?"

"আমার নাম চি-লিন"

"চি-লিন"—শ্যামা ধীরে ধীরে নিজের মনে উচ্চারণ করলে কথাটি, "আমি হচ্ছি চি-লিনের দাসী যে চি-লিন আমাকে শত্রুর হাত থেকে, বিষম লজ্জা ও গ্লানির হাত থেকে রক্ষা করেছেন—আমার বীর চি-লিন।"

শ্যামার কাকীমা এই সময় দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন অতিরিক্ত চালাক আর তাঁর সারাজীবনই দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেটেছে। শেষ পর্য্যন্ত এই ছোট্ট গোলাবাড়ীটিও বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে সংসারের সবকিছুর এবং সব লোকের ওপরই তিনি বিরূপ হয়ে উঠেছেন।

ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলে উঠলেন, "কি ব্যাপারটা কি?"

চি-লিন বললে, "আমি ওকে কিনে নিতে চাই—"

কোমরের ওপর হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে চি-লিনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কাকীমা বললেন, "কি দিয়ে কিনবে শুনি? শুধু একটা গান শুনিয়ে দিয়েই নাকি?"

"না, কুড়িটা রুপোর ডলার দিয়ে—"

"কেন, অত সস্তায় কেন?"

"আপনি তো ওকে ফেলে রেখেই যাচ্ছেন—" ধীর ভাবে বললে চি-লিন।

"সে আমি বুঝব—তাতে তোমার কি?"

"তবে কি আপনি চান যে শত্রুরা ওকে বিনামূল্যেই নিয়ে নিক?"

"ওর বাবা যদি ওর বিয়ের জন্ত টাকা রেখে যেতেন তো গত বছরই আমরা ওর বিয়ে দিয়ে দিতাম—কিন্তু তিনি কিছুই রেখে যান নি—এক আধলাও না।"

চি-লিন আবার বললে, "কুড়ি ডলার।"

"নেহাতই কম বলছ।"

"কুড়ি ডলার।"

"ওর বয়স কম, দেখতেও সুন্দর—ওর জন্ত অন্ততঃ পঁচিশ ডলার দেওয়া উচিত।"

"কুড়ি ডলার।"

"বেশ তাই, তাই; অত দরকষাকষির কি আছে? দাও টাকা দাও, দিয়ে ওকে নিয়ে যাও।"

চি-লিন পকেট থেকে চারটে ডলার বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বললে, "এই নিন্—বাকীটা—"

"হ্যাঁ—বাকীটা কই? দাও এখনই—তুমি কোথায় থাকবে তার নেই ঠিক।"

"শুনুন চীন এখন ভীষণ শত্রু কবলে কবলিত; আমরা সকলে দেশের জন্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আর আপনি কিনা সামান্ত টাকার জন্ত এরকম করছেন? আমি তো আপনার ভালই করছি, একটি মেয়ের দায়িত্বভার থেকে আপনি রেহাই পাচ্ছেন, আমার কাছে সে নিরাপদে থাকবে। আর টাকা?—সেও আপনি পাবেন

ঠিক। আমি একজন সাধারণ সৈনিক নই, উঁচুদরের লোক— যদি নেহাত জানতেই চান তো বলি আমি এক জন ক্যাপ্‌টেন।"

"ক্যাপ্‌টেন বলে মনে তো হয় না তোমাকে, সে হিসেবে তোমার বয়স বড় কম।"

"মাত্র গত সপ্তাহে আমি ক্যাপ্‌টেন হয়েছি। শত্রু-অধিকৃত এলাকা দিয়ে যাবার সময় আমরা আমাদের পদমর্য্যাদাসূচক নিশানা ব্যবহার করি না, কিন্তু আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ-স্বরূপ কাগজপত্র দেখতে চান তো দেখাতে পারি" এই বলে সে কোটের বোতাম খুলে কাগজপত্র বের করতে যাচ্ছে এমন সময় শ্যামা হেসে বললে, "ওসব কিছু ওকে দেখাবার দরকার নেই, উনি পড়তে জানেন না।"

এই কথা শুনে চি-লিনের সাহস আরও বেড়ে গেল, সে গম্ভীরভাবে বললে, "শুনুন, আমি যা করা প্রয়োজন মনে করব সেই ভাবে কাজ করবার অধিকার আমার আছে। ইচ্ছা হলে শহরে গিয়েই আপনি আমার নামে নালিশ করতে পারেন— এই নিন্ আমার নাম ও রেজিমেন্টের নম্বর, আর এই নিন্ বাকী ষোলটা ডলারের জন্ম হ্যাণ্ডনোট। শ্যামা তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও শীঘ্র, এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।"

"এক্ষুনি আসছি আমি" বলে শ্যামা বাড়ীর ভিতর তার সামান্ত জিনিসপত্র যা ছিল গুছিয়ে পুঁটলীতে বেঁধে নেবার জন্ম বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

তার কাকীমা কাগজটা হাতে করে বললেন, "ষোলটা ডলার গাছে ফলে না।"

"সত্যি সে কথা—আর শ্যামা আজকালকার মেয়েদের মত নয়—বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে না বলেই আপনি অনায়াসে পাচ্ছেন অতগুলো টাকা।"

"ওঃ—এর মধ্যেই তাকে সে কুবুদ্ধি দেওয়া হয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু সে একালের মেয়েদের মত নয়—"

"একালের মেয়ে! পিটিয়ে তার একেলেপনা বের করে দেব না!"

শ্যামা তার পুঁটুলী বেঁধে যাবার জন্ম তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল।

চি-লিন বললে, "আমাদের অনেক কাজ আছে, এবার যেতেই হবে। আচ্ছা আসি তবে। সাবধানে থাকবেন আর যত শীঘ্র পারেন এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন।"

'আচ্ছা তাই করা যাবে। আর দেখ, তুমি যেন ভুলো না ষোল ডলারের কথাটা—"

চি-লিন ও শ্যামা হাঁটতে আরম্ভ করলে। শ্যামাকে একবারও পিছন ফিরে তাকাতে না দেখে চি-লিন বললে, "কৈ তুমি তোমার কাকীমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলে না ত?"

"না, তাঁর রুক্ষ মূর্ত্তি আমি যথেষ্ট দেখেছি আর দেখবার ইচ্ছা নাই। এখন আমি সামনে এগিয়ে চলেছি, আর কেন পিছনে তাকাব? আমি দেখছি এখন আকাশে কোন শত্রু-বিমান দেখা যায় নাকি—ওর দিকে তাকিয়ে আর কি লাভ হবে আমার?"

তারা নীরবে হাঁটতে লাগল। একটা গোলাবাড়ীর কাছে এসে চি-লিন সেখানকার লোকদের আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে দিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলে।

খানিকটা পরে শ্যামা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি সত্যিই ক্যাপ্‌টেন চি-লিন?"

"হ্যাঁ শ্যামা, সত্যিই"

"তুমি কিন্তু নেহাত ছোট সে হিসেবে?"

"দু-বছর রয়েছি আমি সৈন্য-বিভাগে—"

"কোথায় থাকব আমরা আজ রাত্রে?" শ্যামা জিজ্ঞাসা করলে।

"কোন একটা গোলাবাড়ীতে—যে গোলাবাড়ীটা পড়বে প্রথম পথের ধারে সেখানেই।"

"সেখানে আমি তোমার সব পরিষ্কার করে গুছিয়ে দেব, তোমার সব কাজ আমি করে দেব।"

"তুমি খুব ভাল মেয়ে শ্যামা!"

"খুব ভাল হতেই আমি চেষ্টা করব।"

"এর আগে যে শহর, সেখানে যেতে যেতেই আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে—সেখানে গিয়েই আমি সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলব আমাদের বিয়ে দিয়ে দিতে।"

"বিয়ে?" শ্যামা বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল।

"হ্যাঁ—বিয়েই—"

"কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে কিনে নিয়েছ শুধু—আর আমি তোমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিলাম এইজন্ম যে শত্রুরা আমাকে পেলে—"

"ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবেন—শোন শ্যামা, তুমি যেমন একালের মেয়েদের মত নও আমিও তেমনি একালের ছেলেদের মত নই—এই ভাল বুঝলে?"

সেদিন সন্ধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসে তাদের বিয়ে হ'ল। সেই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের সময় তাদের মাথার উপর দিয়ে শত্রু-বিমান মৃদুগুঞ্জনে উড়ে যাচ্ছিল; অনুষ্ঠানের শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী শ্যামাকে রূপোর বালা দিলেন একজোড়া। তারপর তারা আবার পথে বেরিয়ে পড়ল।

"তাড়াতাড়ি চল" শ্যামা বললে, "রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসবার আগেই একটা জিনিস দেখাতে চাই তোমাকে—একটা গোপন জিনিস—যা একমাত্র তোমাকেই দেখাব আমি।"

শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর আসার পর সে তার পকেট থেকে সাধারণ একটা তামার পয়সা বের করলে, পয়সাটা পরম যত্নে একটা রুমালের কোণে বাঁধা ছিল।

"এই নাও, এই আমি রেখেছি তোমার জন্ম, এটাকে একটা সাধারণ পয়সা ভেবো না—এই দেখ, এই পয়সাটার ধারে আমি খুব সরু সূঁচ দিয়ে একটা পুরানো কবিতার এই কথা কয়টি লিখেছি।" এই বলে সে চি-লিনের হাতে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রটি দিলে।

চি-লিন পয়সাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে তাতে লেখা রয়েছে, "তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব; তুমি যেখানে থাকবে, আমার স্থানও সেখানে—ইহলোকে, পরলোকে আমার দেহ-প্রাণ-মন সবই তোমার।"

চি-লিন ভাল করে দেখলে প্রত্যেকটা অক্ষর খুব স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে লেখা অথচ খালি চোখে কিছু দেখা বা বোঝা অসম্ভব।

সে রাত্রে তারা পথের ধারে একটা গোলাবাড়ীতে নরম খড়ের ওপর শুয়ে ঘুমোল।

দু-দিন পরে তারা পৌছল সামরিক কেন্দ্রে। চি-লিন তার উপরিতন কর্ম্মচারীর কাছে নিজের কাজের বিবরণ জানিয়ে শ্যামাকে নিয়ে খোদ সেনাপতির কাছে গেল। অত বড় একজন লোকের সামনে উপস্থিত হয়ে প্রথমে দু-জনেই খানিকক্ষণ অত্যন্ত লজ্জিতভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর চি-লিন সোজাসুজি বললে, "আমি একে নিয়ে এসেছি আমার সঙ্গে। প্রথম যে শহর আমাদের সামনে পড়েছে সেখানেই একে আমি বিয়ে করেছি, তার পর এখানে নিয়ে এসেছি।"—গম্ভীরভাবে সেনাপতি বললেন, "সে ত দেখতেই পাচ্ছি।"

"শুধু তা নয়—এইছোট্ট ফিতেটার ওপর কনফিউসিয়াসের জীবনের চব্বিশটি ঘটনা চিত্রিত আছে আর এই পয়সাটার ধারে—"এই বলে সে পয়সাটা আর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রটা সেনাপতির হাতে দিলে।

"এ ছাড়া শ্যামা দশ পনেরটা শব্দের একটা পুরো বাক্য একটা পিনের মাথার ওপর লিখতে পারে—হবে সত্যি একথা। এসব বাক্সে কাপড়জামা রিপু করা, বাণ্ডেজ তৈরী করা, রান্না এসবও জানে অবশ্য কিন্তু সেগুলো তত দরকারি মনে করছি না কারণ আমি ভাবছি—"

"থাক তা আর তোমাকে বলতে হবে না, কারণ তুমি যে কি ভাবছ সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি।

"শত্রু-অধিকৃত এলাকার ভিতর দিয়ে সংবাদ প্রেরণ করতে আমাদের ভীষণ বেগ পেতে হচ্ছে।" এই বলে তিনি শ্যামাকে কাছে ডেকে বললেন, "শোন শ্যামা, তুমি এসে ভালই হয়েছে। কোথায় তোমার সুঁচ বার কর, তারপর এই আফিসেরই এক কোণে বসে যাও। অনেক কাজ আছে আমাদের—তা এ বিদ্যা তুমি শিখলে কোথায়?"

"আমার বাবা ছিলেন খোদাইকার"

"বেশ! বেশ! এই নাও এই পয়সাগুলো ধর, এখনই আরম্ভ করে দাও কাজ। প্রত্যেকটি সংবাদ খুব সাবধানে টুকে ফেল। দেখা যাচ্ছে চীন সব সমস্যারই সমাধান খুঁজে পায়। যত দিন চীনে চি-লিনের মত ছেলে আর তোমার মত মেয়ে জন্মাবে তত দিন চীনকে কেউ হারাতে পারবে না।*

* ইংরেজী হইতে

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অক্সফোর্ড আর কেম্‌ব্রিজ ব্রিটেনের এই দুইটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-কালের ব্যবধান সামান্য। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় অক্সফোর্ডের কিছুকাল পরে ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। মধ্যযুগে ছাত্রেরা সময় সময় নিজ বাস-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইত। তখনকার দিনে অক্সফোর্ডের এমনি একদল ছাত্রের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিবার জন্যই সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। যে কারণেই হোক্, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে কেম্‌ব্রিজে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। সুদক্ষ শিক্ষাব্রতাদের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এবং স্বল্পকাল মধ্যেই ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পিটারহাউসে প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরে সেই শতাব্দীতে এবং তৎপরবর্ত্তী দুই শতাব্দীতে ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলি কলেজ স্থাপিত হইল। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলেজের সংখ্যা দাঁড়াইল সবশুদ্ধ ষোলটি। তার পর এই সুদীর্ঘ চার শতাব্দীর মধ্যে পুরুষদের জন্য একটি মাত্র কলেজ (ডাউনিং, প্রতিষ্ঠা-কাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) স্থাপিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

ব্রিটেনের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় মহিলারা কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সদস্য হইবার অধিকারী নহেন যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গার্টন এবং নিউনহাম এই দুইটি কলেজের ছাত্রীরা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামালা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন।

মধ্যযুগের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কেবল যে কতকগুলি কলেজ লইয়াই গঠিত ছিল তাহা নহে, ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল বহুসংখ্যক হোস্টেল অথবা ছাত্রাবাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-কামী (undergraduate) ছাত্রেরা সেগুলিতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত এবং একই উদ্দেশ্যে একত্রে বাস করার ফলে তাহারা সঙ্ঘ-জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইত।

ক্রমে ক্রমে উপাধিপ্রার্থী ছাত্র-সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের শিক্ষা, শাসন, নিয়মানুগত্য ইত্যাদি সম্পর্কিত বহু সমস্যার উদ্ভব হইল। এগুলির কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যা-পারঙ্গম (Masters of Art) অধ্যাপকগণ এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বাধ্যক্ষ (Chancellor) এবং তত্ত্বাবধায়ক (Proctor) প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করিলেন। প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজসমূহ এক দিকে স্বভাবতই যেমন আইন এবং শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবার নীতি সমর্থন করিল তেমনই অন্য দিকে নিজেদের নিয়ম-কানুনসমূহও যাহাতে কলেজের চতুঃসীমার মধ্যে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয় সে-বিষয়ে মনোযোগী হইল। এই রূপেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব এবং কলেজসমূহের নিয়মানুগত্য—এই দ্বৈত-নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

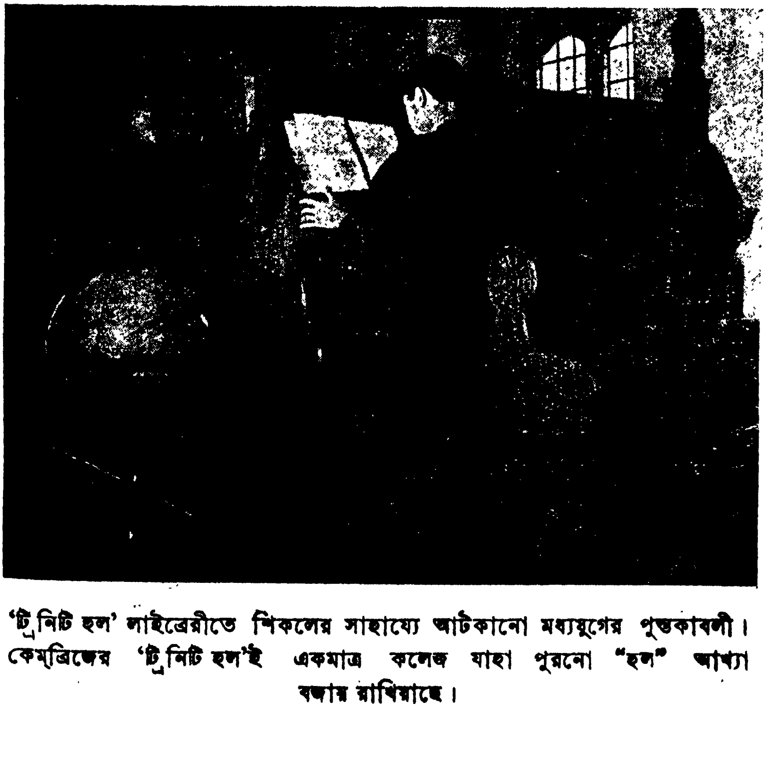
ক্রমিক সংস্কারের ফলে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ হইতেছে, বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা এবং ঔপপত্তিক (theoretical) ও ব্যাবহারিক (practical) উভয়বিধ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাদান। কলেজগুলিকে কিন্তু শিক্ষাদান ব্যতিরেকেও ছাত্রদের আহার-বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং তাহাদের প্রাত্যহিক কর্ম্মসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইতেছে কিনা তাহার তত্ত্বাবধানও করিতে হয়। তাই, কলেজ-কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থানুসারে প্রত্যেক উপাধিকামী ছাত্রকেই একজন সদস্যের অভিভাবকত্বাধীনে থাকিতে হয়—তাঁহাকে তাহার পিতৃস্থানীয় বলা যাইতে পারে। উপাধিপ্রার্থী ছাত্র দুঃসময়ে সুপরামর্শের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হয়। তাহার নিজের কলেজের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যদি তার আচরণ সম্বন্ধে অননুকূল মন্তব্য করেন তবে উক্ত অভিভাবক তাহাকে তলব করিয়া থাকেন।



ইংলণ্ডের সর্ব্ব-প্রাচীন পুস্তকের দোকান কেমব্রিজস্থ 'বাউইস্' বিগত তিনশ চল্লিশ বৎসর যাবৎ একই ভবনে অবস্থিত থাকিয়া অগণিত ছাত্রকে পুরুষানুক্রমে পুস্তক সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ক্যামব্রিজের পুস্তক-বিক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্বান।

তা'ছাড়া উপাধিপ্রার্থী ছাত্রদের অধ্যয়ন-ব্যাপারে উপদেশ-দান এবং সহায়তা করিবার জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষ একজন সদস্যকে নিয়োজিত করেন। শিক্ষাদান ও শিক্ষা-গ্রহণ ব্যপদেশে ছাত্র এবং আচার্য্য প্রত্যেক সপ্তাহে আন্দাজ এক ঘণ্টার জন্য একত্রে সম্মিলিত হন। ছাত্র তখন নিজের কোনো রচনা তাঁহাকে পড়িয়া শোনায়, নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এবং সমালোচনা শ্রবণ করে এবং এ সম্বন্ধে যে-কোনো প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগে সে বিষয়েই বিশদভাবে আচার্য্যের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পারে। এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা-তালিকার বক্তৃতামালা উত্তমরূপে অনুধাবন করিবার জন্যও সে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে। বক্তৃতাশ্রবণ এবং যোগ্য-ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন—এই দ্বিবিধ পদ্ধতির সমন্বয়ের ফলে ছাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ-সহকারে অগ্রসর হইয়া চলিতে পারে।



'ট্রিনিটি হল' লাইব্রেরীতে শিকলের সাহায্যে আটকানো মধ্যযুগের পুস্তকাবলী। কেমব্রিজের 'ট্রিনিটি হল'ই একমাত্র কলেজ যাহা পুরনো "হল" আখ্যা বজায় রাখিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার রূপে যে-সমস্ত মহিলা এবং পুরুষ নির্ব্বাচিত হন তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষ ভাবে ব্যুৎপন্ন, তন্মধ্যে অধিকাংশই তৎপরতার সহিত গবেষণা-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ফলে অধিকাংশ বিষয়েই, বিশেষতঃ বিজ্ঞান-বিভাগে, একটা সজীবতার ভাব নিয়ত বর্ত্তমান। উক্ত বিভাগে গবেষণারত বিশ্ববিখ্যাত গবেষকগণের

ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া কাজ করিবার সুযোগ ছাত্রগণ লাভ করিয়া থাকে।



১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ্যাবিষয়ক ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগার। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত ক্যাভেণ্ডিশ অধ্যাপক সর উইলিয়ম লরেন্স ব্রাগকে একটি 'লেণ্ড-লিজ' ইলেক্‌ট্রন অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারটি সম্প্রতি যুদ্ধ-সম্পর্কিত গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র।

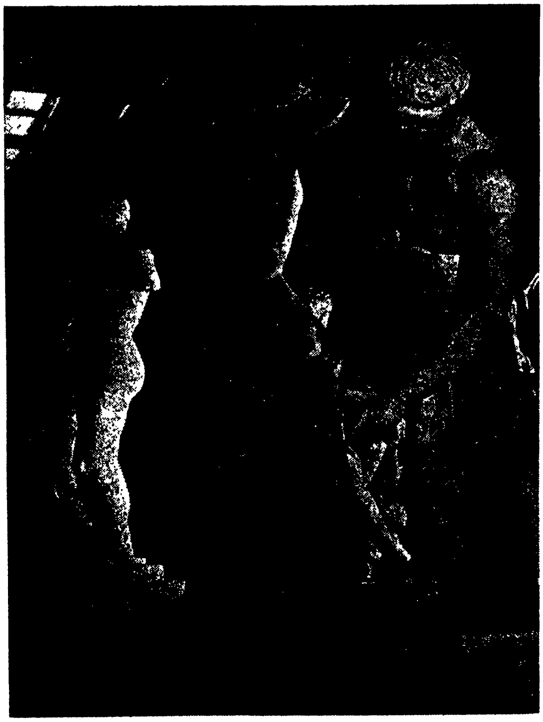
মামুলি পুঁথিগত বিদ্যা অধিগত করা ছাড়া ছাত্রগণ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষারও অফুরন্ত সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। সমস্ত উপাধি-প্রার্থী ছাত্রকেই তিন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ কিছুকালও কলেজ-ভবনে যাপন করিতে হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ইঁহারা সকলে রোজই ভোজনাগারে সমবেত হয় অথবা সৌজন্যের খাতিরে এবং গালগল্প করিবার জন্যও ইঁহারা মাঝে মাঝে পরস্পরের কক্ষে সম্মিলিত হয়।

বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নকারী এবং ভিন্ন ভিন্ন গৃহ ও পরিবার হইতে আগত বহু লোকের এই যে ঘনিষ্ঠ সংস্রব, শিক্ষার দিক দিয়া তাহার মূল্য অপরিসীম। এই প্রাত্যহিক মেলামেশা এবং লঘু-গুরু নানা বিষয়ে অজস্র আলাপ-আলোচনা হইতে এমন একটি অমূল্য সম্পদ্ তাহারা লাভ করিয়া থাকে যাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ সহজ নহে, বাজার-দরে তাহা যাচাই করাও যায় না, কিন্তু বাস্তবিকই তাহা ছাত্রদের প্রতি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ দান।

মামুলি বক্তৃতা-শ্রবণ এবং ক্লাস-করা ছাড়া কলেজের বাহিরেও প্রভূত শিক্ষালাভের ব্যবস্থা রহিয়াছে। লণ্ডন হইতে কেম্‌ব্রিজে আসিতে এক ঘণ্টার সামান্য কিছু সময় বেশী লাগে মাত্র। সুতরাং পরিষদের মন্ত্রিমণ্ডলী, পার্লামেণ্টের সভ্য, ধর্ম্ম-নেতা, শিল্প এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির নায়কেরা নিরূপিত কালে লণ্ডন হইতে অনবরত কেম্‌ব্রিজে যাওয়া-আসা করিয়া থাকেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করিতে তাঁহারা সকল সময়েই প্রস্তুত।

বিখ্যাত আণ্ডার-গ্রাজুয়েট সোসাইটির প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র 'দি ইউনিয়ন সোসাইটি'তে এই সমস্ত সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করা যায় অথবা বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়নের জন্য যে-সমস্ত সমিতি আছে তাহাদের কোনো-একটির উদ্যোগেও সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এগুলিতে এবং অন্যান্য ঘরোয়া প্রীতি-সম্মেলনে রাজনীতি, সাহিত্য, আর্ট এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ের প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে বহু নেতার মতবাদ শুনিবার দুর্লভ সুযোগ ছাত্রেরা লাভ করে। ছাত্রকে তাহার স্ব-মত উপস্থাপনে, সঙ্ঘ-গঠন ও সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে এবং সমাজে দায়িত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করা হয়।

পারিবারিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বয়োজ্যেষ্ঠদের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই বাঁধা-ধরা কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হওয়ায় ছাত্রেরা পরিণত-



কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট মহিলা-কলেজের একজন 'আণ্ডার-গ্রাজুয়েট' ছাত্রী গ্রীক্-মূর্ত্তিসমূহের প্লাষ্টারের ছাঁচের নিকট দাঁড়াইয়া পুরাতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন।

বুদ্ধি এবং আত্মশক্তিতে আস্থাবান্ হয়। যে ছাত্র এই সমস্ত সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং খেলাধুলার যে অফুরন্ত সুবিধা সেখানে রহিয়াছে তাহাকেও উপেক্ষা করে নাই, কলেজ-জীবন সমাপনপূর্ব্বক যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে সংসারে প্রবেশ করে, শুধু বুদ্ধিজীবীর আদর্শ নহে, বিচিত্রভাবে বহুধা-বিকশিত।*

* গত ডিসেম্বর মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত অধ্যাপক এইচ. এস. বেনেটের প্রবন্ধ অবলম্বনে।

অতি-পরমাণুবাদ ও সাইক্লোট্রোন

শ্রীগণেশ কর্মকার, এম্-এস্‌সি ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ

বিশ্বসৃষ্টির মূলতত্ত্ব নিয়ে দার্শনিক পণ্ডিতেরাই প্রথম বিচার-বিশ্লেষণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটু পরিচয় দিলে তার প্রমাণ মিলবে। গোতম, কণাদ প্রভৃতি ঋষিরা ছিলেন পরমাণুবাদী; তাঁদের মতে মাটি, জল, তেজ ও বাতাস বিশ্বের এই চার রকম উপাদান; এদের পরমাণুগুলি কার্য-কারণের নিয়মে মিলে মিশে ক্রমে ক্রমে এই বিরাট্ স্থূল জগতের সৃষ্টি সম্ভব করে তুলেছে; এই পরমাণু নিত্য—অর্থাৎ এগুলির আর অংশ নেই। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে আছে পরিণামবাদ। পরিণামবাদীদের মতে অব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমে এই ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়েছে। বিশ্বের অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ যখন সমানভাবে থাকে তখন হ'ল অব্যক্ত অবস্থা। এই তিন গুণের বৈষম্যই বিশ্বসৃষ্টির প্রথম অবস্থা। তারপর মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ। মায়াবাদীরা বলেন, আমাদের চারদিকে এই যে দৃশ্যমান জগৎ, সবই মায়া। যা কিছুর পরিবর্তন হয়, বিনাশ হয়, তাহাই মায়া। একটি মাত্র বস্তু মায়া নয়, নিত্য—সে আমাদের আত্মা, বা ব্রহ্ম বা জ্ঞান। অতি সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শনের মূল কথাগুলি এই।

গ্রীক দার্শনিকও এবিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের মতে সব জড় পদার্থই অতি সূক্ষ্ম কণা দিয়ে গড়া, কণাগুলি এত সূক্ষ্ম যে শেষ পর্যন্ত অবিভাজ্য হয়ে থাকে—এই কণাগুলিকে তাঁরা বলতেন :.t m অর্থাৎ পরমাণু। এই রকম অসংখ্য পরমাণু অনন্তকাল ধরে অসীম শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, একটার সঙ্গে আর একটার মিল হয়েও যাচ্ছিল, শেষে দৈবাৎ তাদের পরস্পর এমন মিলনও সংঘটিত হ'ল যার ফলে এই জড় জগতের উদ্ভব হয়েছে। সৃষ্টির এই সব ব্যাখ্যার মধ্যে যুক্তিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।

বিজ্ঞানও বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের সন্ধানী। তবে বিজ্ঞানের পথ শুধু পরোক্ষ তর্ক আর যুক্তি নয়, প্রত্যক্ষ পরীক্ষাই তার ভিত্তি। কবির কল্পনা আর দার্শনিকের তত্ত্ব বিজ্ঞানের এলাকায় যখন এসে পড়ে তখন সবগুলিকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দেয় না। তথ্যের যাথার্থ্য যেখানে টিঁকে যায় বৈজ্ঞানিক বিচারে সেই-খানেই ঐগুলি গ্রাহ্য, সেইখানেই দর্শনের বা কাব্যের সঙ্গে তার মিতালি। অপ্রমাণিত কল্পনাকে বিজ্ঞান কিছুতেই ক্ষমা করে না।

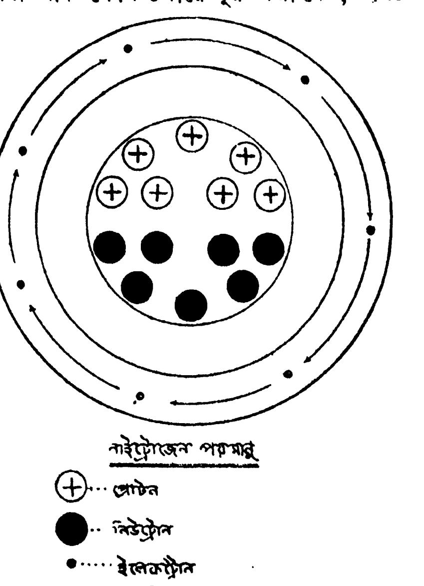
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ বিষয়টি প্রথম লক্ষ্য করা হয়েছিল। জন ডাল্টনের Atomic Theory বা পরমাণুবাদ একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বা সিদ্ধান্ত। অবশ্য এই অতি সূক্ষ্ম পরমাণু চোখে দেখা যায় নি; কিন্তু তার ওজন নেওয়া যায়, পরিমাণও নির্দেশ করা সম্ভব। পরমাণু আবার একা থাকে না; যদি একটি অণু (m lecule) ভাঙা হয়, তার মধ্যেকার একটি পরমাণু আর একটির সঙ্গে মিলতে চাইবে, অন্যটি স্বজাতীয়ই হোক্ আর বিজাতীয়ই হোক্। পরমাণু থেকে অণু, অণু থেকে জড়বস্তু—ক্রমে ক্রমে জড়জগৎ।

এক সময়ে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন যে ভিন্ন উপাদানের পরমাণুপুঞ্জের প্রকৃতিও ভিন্ন, উপাদান হিসাবে যার যা পরমাণু তার আর পরিবর্তন নেই। প্রতিটি পরমাণু ছিল নিত্য এবং তার স্বভাবের আর বদল নেই—মূল উপাদানের পরমাণুগুলির বস্তুগত ও রাসায়নিক গুণ আগেকার মতই বজায় থাকে। এই সব সিদ্ধান্ত পরে বিজ্ঞানের নির্মম বিচারে ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে অধ্যাপক উইলিয়ম ক্রুকস্ (Crookes) একটি চমৎকার পরীক্ষা করেছিলেন। তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল বলেই সে-কথা উত্থাপন করা হ'ল। কয়েকটি কাচ-নলের মধ্যস্থ গ্যাসকে তিনি অভিনব উপায়ে বায়ুমণ্ডলের চেয়ে দু-কোটি গুণ সূক্ষ্মতর করে তার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছেড়ে দিলেন। ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহের ঋণাত্মক (negative) প্রান্তে যে আলোর উদ্ভব হ'ল তাতে ঐ সূক্ষ্ম গ্যাসের অণুগুলি ক্ষীণভাবে আলোকিত হ'ল এবং নলের কাচের গায়ে অতি সুন্দর নীলারুণ রশ্মির ঝলক দেখা দিল। রশ্মিগুলি যে কি সে সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণা চলতে লাগল। প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে বহু পরীক্ষার পর তাদের স্বরূপ জানা গেল। সেসব পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন সর জে. জে. টম্‌সন ও সর ই. রাদারফোর্ডের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের দল। প্রমাণিত হ'ল,—সেকেণ্ডে হাজার থেকে এক লক্ষ মাইল বেগে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যুৎ-ভরা (charged) অতি সূক্ষ্ম কণিকা-প্রবাহ দিয়েই এ রশ্মি গড়া। পরমাণু-ভাঙা এই অতি সূক্ষ্ম কণিকার সাধারণ নাম হ'ল ইলেক্‌ট্রন—আমরা বলতে পারি অতি-পরমাণু। অতি-পরমাণু সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা গেল।

প্রতিটি পরমাণু এক একটি সূক্ষ্মতম সৌরজগৎ। তার কেন্দ্রে আছে একটি বা একাধিক কণিকা, তাদের মধ্যে একজাতীয় কণিকার নাম প্রোটন, আর তাকে বা তাদেরকে ঘিরে লাটিমের মত প্রদক্ষিণ করছে আর কতকগুলি কণিকা অতি দ্রুতবেগে, তাদের নাম ইলেক্‌ট্রন। এ সম্বন্ধে আর একটি মতও আছে: ডাঃ ল্যাংম্যুর (Langmuir) বলেন, ইলেক্‌ট্রনগুলি কেন্দ্রবস্তু থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে অতি চঞ্চল অবস্থায় থাকে, কেন্দ্রবস্তুকে

প্রদক্ষিণ করে না। এ মত কিন্তু অচল। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে মাত্র একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্‌ট্রন। ইলেক্‌ট্রনের ওজন পরমাণুর ওজনের প্রায় দু-হাজার ভাগের এক ভাগ, আর প্রোটনের ওজন প্রায় পরমাণুটিরই সমান—অর্থাৎ $\frac{১\cdot৬৬}{১০^{২৪}}$ গ্রাম্ (৫৭ গ্রাম্=প্রায় ১ ছটাক)। দেখা যাচ্ছে পরমাণুর ওজনের জন্যে দায়ী এই প্রোটন। এখন কথা হচ্ছে একটি মূল উপাদানের পরমাণুর সঙ্গে অন্য মূল উপাদানের পরমাণুর মিল কোথায়, তাদের মধ্যে প্রভেদই বা কোথায়। মিল হচ্ছে, সব পরমাণুতেই প্রোটন ইলেকট্রন থাকে, প্রভেদটা হয় সংখ্যা নিয়ে। কারও মধ্যে এইগুলি বেশী থাকে, কারও মধ্যে কম। তা'ছাড়া, প্রতি পরমাণুর মধ্যেকার ইলেকট্রনগুলির কক্ষ নির্দিষ্ট সীমানায় বাঁধা, এর নড়চড় হলে তার স্বভাব বদ্‌লে যাবে। আর একটি কথা। ইলেকট্রন ঋণাত্মক (negative), আর প্রোটন ধনাত্মক (positive), অর্থাৎ এরা বিপরীতধর্মী। যে-সব পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে ভারী, তাদের কেন্দ্রবস্তুতে প্রোটনের সঙ্গে আর এক জাতের অতি-পরমাণু যোগ দিয়েছে, তার নাম নিউট্রন। প্রোটন আর নিউট্রনের ওজন এক রকম, তবে নিউট্রন বৈদ্যুত ব্যাপারে নিরপেক্ষ—না ঋণাত্মক, না ধনাত্মক। কেন্দ্রবস্তু থেকে অনেকটা দূরে ইলেকট্রনগুলি ঘুরে বেড়ায়। এই কেন্দ্রবস্তু আর ইলেকট্রনগুলির আপেক্ষিক আকৃতি ও দূরত্বের সঙ্গে আমরা সূর্য ও গ্রহগুলির আপেক্ষিক আকৃতি ও দূরত্বের তুলনা করতে পারি। সৌরজগতে যেমন মহাকাশ বা অন্তরীক্ষ আছে, পরমাণুর মধ্যেও সেই অনুপাতে অনেকটা অন্তরীক্ষ আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই অন্তরীক্ষ বা ফাঁকা জায়গা সম্বন্ধে ধারণাটা স্পষ্ট হতে পারে। আমাদের শরীরের কোষগুলির (cells) পরমাণুর কথা ধরা যাক্। এই পরমাণুগুলির আভ্যন্তরিক ফাঁকা জায়গা যদি কোন উপায়ে দূর করা যেত, তাহলে এক



এ ছবিতে অতি-পরমাণুগুলির আকৃতি ও আপেক্ষিক দূরত্বের অনুপাত রক্ষা করা হয় নাই।

একটি বিরাট্ মানববপু এত সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হত যে শুধু চোখে দেখা দূরে থাকুক, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রেও তার চেহারা স্পষ্ট ধরা পড়ত না।

পরমাণুর গঠনে যে বিভেদ-বৈচিত্র্য আছে তা দেখা গেল। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক্। নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুতে ৭টা প্রোটন ও ৭টা নিউট্রন আছে, তার চারপাশে ঘুরছে ৭টা ইলেক্‌ট্রন। পারদের কেন্দ্রবস্তুতে আছে ৮০টা প্রোটন, আর ১২১টা নিউট্রন এবং তার চারপাশে ঘুরছে ৮০টা ইলেক্‌ট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে একক ধরে হিসাব করলে একটা পারদ পরমাণুর ওজন হবে ৮০+১২১ অর্থাৎ ২০১ এবং প্রোটন ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা সমান বলে পরমাণুটি বৈদ্যুত ব্যাপারে নিরপেক্ষ। সেই রকম, একটি স্বর্ণপরমাণুর হৃৎকেন্দ্রে আছে ৭৯টি প্রোটন ও ১১৮টি নিউট্রন, তাদের পরিমণ্ডলে ঘোরে ৭৯টি ইলেক্‌ট্রন, সুতরাং স্বর্ণপরমাণুর ওজন হবে ১৯৭।

ইতিমধ্যে 'রেডিয়াম' নামে একটি মূল পদার্থের আবিষ্কারে বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর এসে গেল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুক্‌স্ এবং লেনার্ডের পরীক্ষা-সূত্র অনুসরণ করে, রণ্টজেন (Rontgen) 'এক্স্-রে' নামে এক নতুন ধরণের অন্তর্ভেদী রশ্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। তারপর ব্যাকেরেল (Bacquerel) য়ুরেনিয়ম্ ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, তা থেকেও 'এক্স-রে'র মত এক রকম রশ্মি নিঃসৃত হচ্ছে। ফ্রান্সের ক্যুরি-দম্পতি লক্ষ্য করেছিলেন—পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে য়ুরেনিয়মের চেয়ে বেশী পরিমাণ রশ্মি বিকিরণ হয়। এই রশ্মি য়ুরেনিয়ম্ থেকেই বেরিয়ে আসে, না তার সম্পর্কিত কোন বস্তু থেকে, সেটা নিঃসন্দেহে জানবার জন্যে তাঁরা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে ৩০ টন পিচব্লেণ্ড থেকে মাত্র ২ মিলিগ্রাম্ 'রেডিয়ম' পরিস্রুত করতে পেরেছিলেন। দেখা গেল, এই রেডিয়ম থেকে স্বতঃই অবিচ্ছিন্ন ভাবে অদৃশ্য তেজ নিঃসৃত হয়, অথচ তার বিশেষ ক্ষয় লক্ষ্য করা যায় না। হিসাব করে জানা গেল, প্রায় ১৬০০ বৎসরে এর শক্তি মাত্র অর্দ্ধেক কমে যায়। রেডিয়মের শক্তি এ-ভাবে নিঃশেষ হয়ে গেলে শেষে তার পরিণতি সীসা। তাহলে একটি মূল পদার্থ থেকে আর একটির পার্থক্য কোথায় রইল ?

'রেডিয়ম' ও সমজাতীয় কয়েকটি পদার্থকে আমরা বলতে পারি তেজস্ক্রিয় মূল পদার্থ (radio-active elements)। সাধারণ মূল পদার্থ থেকে এই শ্রেণীর মূল পদার্থের পার্থক্য হচ্ছে —এর পরমাণু থেকে ক্রমাগতই অদৃশ্য 'আল্‌ফা'-কণা, 'বিটা'-কণা ও 'গামা'-রশ্মি ভীষণ বেগে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, অন্য পদার্থের বেলায় তা হয় না। এই বিটা-কণা যে ইলেক্‌ট্রন সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছে। রেডিয়ম থেকে যে আল্‌ফা-কণাগুলি বেরিয়ে আসে তাদের প্রত্যেকটি ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রনে গড়া। হিলিয়ম-পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু ঐ রকম একটি আল্‌ফা-কণা দিয়ে গড়া। গামা-রশ্মির শক্তি সাধারণ আলোর চেয়ে অনেক গুণ বেশী। আল্‌ফা-কণা ও ইলেক্‌ট্রন যখন রেডিয়ম্ থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে, তখন তাদের গতি যথাক্রমে প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার ও এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল পর্যন্ত হতে পারে। তাদের তেজও এত বেশী যে কোন কঠিন পদার্থে প্রবেশ করার সময় সে তেজ বাধা পায় না।

রেডিয়ম জাতীয় পদার্থের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা এখানে অবান্তর হবে না। দুরারোগ্য ক্যান্‌সার নামে দুষ্টক্ষত রোগে এর ব্যবহার বর্তমানে হচ্ছে। জীবদেহে অতি সূক্ষ্ম যে মাংসতন্তু বা অণুকোষ থাকে, কোন কারণে সেগুলির একরকম ক্ষতিজনক অসঙ্গত বৃদ্ধি ঘটলে এ রোগ হয়ে থাকে। এ বৃদ্ধি বন্ধ হয় না—শেষ পর্যন্ত রোগীর মৃত্যুও ঘটে। দেহের যে অংশ এই রোগদুষ্ট হয় সেখানে যদি রেডিয়ম-জাতীয় পদার্থের শক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহলে ঐ অদৃশ্য শক্তিকণাগুলি রোগদুষ্ট অণুকোষগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত করতে থাকে। সে বেগ এত প্রবল যে ঐ অণুকোষগুলি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে রোগদুষ্ট অণুকোষের উপরই ঐ শক্তি-কণার প্রকোপ বেশী। তবে রেডিয়ম ব্যবহার করার অসুবিধাও আছে। রোগীর শরীরের ভিতরে যখন কোথাও, ধরা যাক্—যকৃতে বা অন্ত্রে, ক্যান্‌সার হয়, তখন সমূহ বিপদ। খাদ্যের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ রেডিয়ম সেবনে রোগ বিনষ্ট হবে সন্দেহ নেই, তবে বিপদ হচ্ছে এই যে কোন কারণে যদি রেডিয়মের কয়েকটি পরমাণু শরীরের ভিতরে কোথাও থেকে যায়, তাহলে সুস্থ অণুকোষগুলিও তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। তবে যদি আমরা এমন কোন রেডিয়ম-জাতীয় পদার্থ পাই যার 'অর্ধায়ু' মাত্র কয়েকটি মিনিট, তাহলে বিপদ কেটে যেতে পারে। এই সব স্বল্পায়ু তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বল্পকালেই রোগদুষ্ট অণুকোষগুলিকে নষ্ট করবে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের আয়ুও ফুরিয়ে যাবে, সুতরাং সুস্থ অণুকোষগুলিকে নষ্ট করার সময় এগুলি পাবে না। প্রকৃতিদেবীর ভাণ্ডার থেকে এই রকম স্বল্পায়ু পদার্থের সন্ধান মিলে নি, তাই মানুষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এগুলি সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছে।

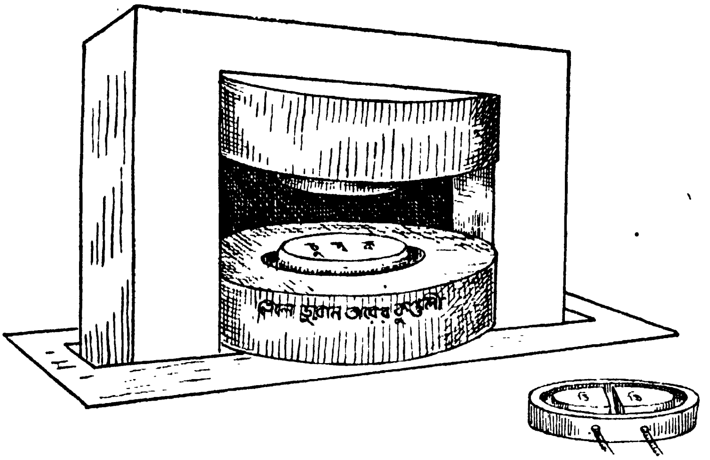
কি করে পরমাণুকেন্দ্রের পরিবর্তন সাধন করা যায় বা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করা যায় সে-বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। যদি কোন একটি পরমাণুকে অন্য পরমাণু দিয়ে আঘাত করা হয়, তাহ'লে তার ফল হয় অদ্ভুত রকমের। একটি নাইট্রোজেন পরমাণুকে একটি হিলিয়াম পরমাণু দিয়ে আঘাত করলে একটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এলুমিনিয়ম পরমাণুকে যখন কোন আল্‌ফা-কণা প্রবল রকমের আঘাত করে তখন তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের সঙ্গে নিউট্রনও সৃষ্ট হয়। নিউট্রন যখন আবার বোরন পরমাণুকে আঘাত করে তখন আল্‌ফা-কণার সৃষ্টি হয়। বেরিলিয়ম পরমাণুর সঙ্গে আল্‌ফা-কণার সংঘাতেও নিউট্রন পাওয়া যায়। নিউট্রন একটি মূল কণা এবং এটি কোন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট নয় বলে অন্য পরমাণুকেন্দ্রের কাছে যেতে পারে এবং তার সঙ্গে একটা প্রবল সঙ্ঘর্ষও লাগাতে পারে। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাওয়া গেছে—নিউট্রনের শক্তি এক্স-রে বা গামা-রশ্মির চেয়ে অনেক বেশী। রোগদুষ্ট অণুকোষগুলির উপর এই নিউট্রন-রশ্মির ব্যবহারও আরম্ভ হয়েছে। এই বিষয়ে বহু পরীক্ষার ফলে পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই বদলে গেছে।

এই রকম আঘাত বা সংঘাতের ফলেই পরিবর্তন বা বিপ্লব। কিন্তু সাধারণতঃ সংঘাতের সংখ্যা খুবই কম। সংঘাত বেশী হবার সম্ভাবনা থাকে যদি ঐ প্রচণ্ড আঘাতকারী পরমাণু-কণিকাগুলির সংখ্যা ও গতি কোনক্রমে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। রেডিয়ম জাতীয় পদার্থ থেকে যে-সব কণিকা বিস্ফুরিত হয় তাদের গতিও বেশী, সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এই প্রচণ্ড আঘাতকারী কণিকাগুলির তীব্রতা মাপা হয় 'ইলেকট্রন ভোল্ট' হিসাবে। 'ইলেকট্রন ভোল্ট' কি একটু বুঝিয়ে বলা যাক। একটি ইলেকট্রনকে যদি কোন তড়িৎ-ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ইলেক্‌ট্রনটি ঐ ক্ষেত্রের যে দিকে ধনাত্মক প্রান্ত সেই দিকেই ছুটবে। যখন কোন তড়িৎ-ক্ষেত্রে দশ লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ-রাশি থাকে তখন ইলেক্‌ট্রনটি ঐ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাবার ফলে যে প্রচণ্ড গতিশক্তি লাভ করে তার নাম দশ লক্ষ ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট। একটি আড়াই লক্ষ ভোল্টের প্রোটন-কণিকা যদি কোন একটি লিথিয়ম পরমাণুকে আঘাত করে, তাতে দুটি আল্‌ফা-কণিকার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১০০ কোটি আঘাতের মধ্যে একটি মাত্র আঘাত সফল হবার সম্ভাবনা। যখন ভোল্ট বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ করা হয় তখন ঐ ১০০ কোটির মধ্যে একটির জায়গায় দশটি সফল আঘাত পাওয়া যেতে পারে। এই ভাবে দেখা গিয়েছে—আঘাতকারী কণিকাগুলির গতিশক্তি বাড়িয়ে দিতে থাকলে ফল আরও বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু কণিকাগুলির সংখ্যা ও গতি যথেচ্ছ বাড়ান যায় না। বাড়াবার একটা সীমারেখা আছে। বাড়াতে হলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ এত বেশী হওয়া দরকার যা দুর্লভ। পাওয়া গেলেও কণিকাগুলির সংখ্যাই বাড়ে—গতি বাড়ে না। সুতরাং এ অবস্থায় ব্যাপকভাবে পরমাণুকেন্দ্রের বিপ্লব সাধনদুঃসাধ্য।

মধ্যযুগে যাঁরা কিমিয়াবিদ্যা চর্চা করতেন তাঁদের আশা ও বিশ্বাস ছিল—তামা, লোহা ইত্যাদি নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনা, রূপা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করা যায়। তাঁদের অনুসন্ধানও চলেছিল, তবে কোন বিজ্ঞানসম্মত পথ ধরে তাঁরা চলেন নি। সে যেন "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর"। এ পথের সন্ধান এখন মিলে গেছে। তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ফ্রান্সের মাদাম ক্যুরি ও জোলিও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁরা ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন—এলুমিনিয়মকে আল্‌ফা-কণা দিয়ে আঘাত করলে, এলুমিনিয়মের কয়েকটি পরমাণু তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসে রূপান্তরিত হয়, ফলে এলুমিনিয়ম তেজস্ক্রিয়তা লাভ করে। তা থেকে পরে পজিট্রন বার হতে থাকে। 'পজিট্রন' ইলেক্‌ট্রনের অনুরূপ একরকম বৈদ্যুত কণা, ইলেক্‌ট্রন ঋণাত্মক, পজিট্রন ধনাত্মক। ঐ কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু তিন মিনিট কাল মাত্র। যখন কোন সিলিকন পরমাণুকে কোন হিলিয়ম কণিকা দিয়ে আঘাত করা যায় তখনও একরকম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয়—যার অর্ধায়ু মাত্র ১৪ দিন।

এতদিন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বস্তু-সৃষ্টি অল্পস্বল্প হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে হয় নি। সেটা সম্ভব হ'ল সাইক্লোট্রোন নামক যন্ত্রটির উদ্ভাবনে। ই. ও. লরেন্স নামে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী এই অভিনব যন্ত্রের উদ্ভাবক। এই আবিষ্কারের ফলে তিনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন। আঘাতকারী কণিকাগুলির সংখ্যা ও গতিবৃদ্ধি করাই এ যন্ত্রের উদ্দেশ্য।

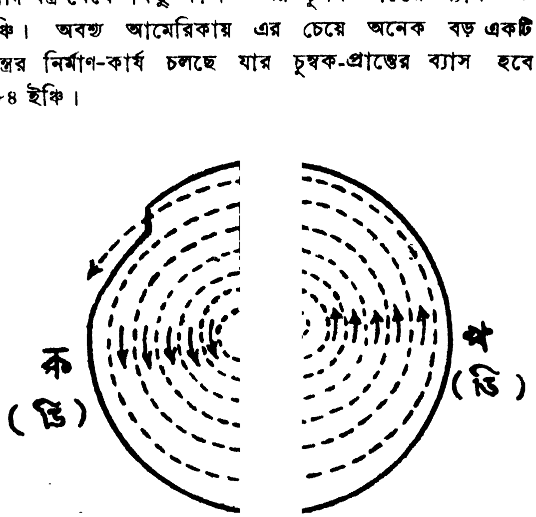
যন্ত্রটির গঠন বর্ণনা করা যাচ্ছে। সবসুদ্ধ প্রায় ৬০।৭০ টন ওজনের পাঁচ-সাতটি লৌহখণ্ডকে এমন ভাবে সাজিয়ে বসানো হয় যাতে কতকটা ইংরেজী বর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর (C)এর মত দেখায়। সাজানো লৌহদণ্ডের দুটি প্রান্ত, ঐ প্রান্তের ব্যাস দুই ফুটের কিছু বেশী। প্রতি প্রান্তে একটি বাক্সের ঘেরাটোপে প্রায় ৯ টন ওজনের তামার তারের কুণ্ডলী তেলে ডোবানো থাকে।



যখন ঐ কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বৈদ্যুত প্রবাহ চলে তখন ঐ লোহার চৌম্বক শক্তি সঞ্চারিত হয়ে লোহা চুম্বকে পরিণত হয়। ঐ চুম্বকের দুটি মেরুর মাঝখানে ৮।১০ ইঞ্চি পরিসর ফাঁকা জায়গায় একটি বাক্স থাকে। এই বাক্সের মধ্যে অর্ধ-বৃত্তাকার দুটি ফাঁকা বাক্স থাকে, এদের নাম 'ডি' (D)। যন্ত্রটি ব্যবহার করবার আগে ভিতর থেকে সব বাতাস বার করে ফেলা হয়। তারপর অল্প চাপে খানিকটা হাইড্রোজেন গ্যাস পুরে দেওয়া হয়। তারপর ইলেক্ট্রিকের সাহায্যে একটি তার গরম করে বৈদ্যুত কণিকা তৈরি করা হয়। তৈরি হবামাত্র সেগুলি বৈদ্যুত ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়। ধরা যাক্—'ক' থেকে 'খ'এর দিকে আকর্ষণ চলে। 'ডি'-এর এলাকায় চৌম্বক ক্ষেত্র সুরু হ'ল। কণিকাগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রে এলে তাদের চলার পথ ক্রমশঃ বাঁকা হতে থাকে অর্থাৎ তাদের কক্ষের আকার তখন হয় বৃত্তের মত। ঐ পথ অতিক্রম করার পর কণিকাগুলি বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যে স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক ভোল্টেজের অদল-বদল হয় অর্থাৎ যে প্রান্ত ঋণাত্মক ছিল, সেটা হয়ে যায় ধনাত্মক, যেটা ছিল ধনাত্মক সেটা হয়ে যায় ঋণাত্মক। এখন কণিকাগুলি 'খ'-এর দিকে না গিয়ে 'ক'-এর দিকে চলতে থাকবে। 'ক' নামক 'ডি'-এর এলাকায় এদের বৃত্তাকার কক্ষ বৃহত্তর হয়ে যাবে। 'ক' নামক 'ডি' থেকে বেরিয়ে এসে এ-গুলি আবার বৈদ্যুত ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হবে এবং আবার 'খ' নামক 'ডি'-এর এলাকায় আসবে। এই ভাবে কণিকাগুলি কয়েক-শ বার 'ডি'এর এলাকায় আবর্তন করবে। চৌম্বক-ক্ষেত্রের শক্তি বৈদ্যুত ক্ষেত্রের শক্তি এবং 'ডি' দুইটির মধ্যে যে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তার পর্যায়সংখ্যা (frequency of alter-nation) এমন ভাবে নির্ধারিত করা হয় যে, যে সময়ের মধ্যে 'ক' ও 'খ'এর ভোল্টেজের অদল-বদল হয়, তার ভিতরেই কণিকাগুলি যেন একটি অর্ধবৃত্ত পরিভ্রমণ করে। ঐ কণিকা-গুলি ক্রমে বৃহৎ হতে বৃহত্তর বৃত্তাকারে চলতে থাকে বলে শেষ পর্যন্ত 'ডি'এর ধারে একটি জানালার মধ্যে দিয়ে এগুলি বাইরে আসতে পারে। জানালার সামনেই যদি কোন বস্তু রাখা হয় তাহলে ঐ বস্তুর পরমাণুগুলিকে গতিশীল কণিকাগুলি প্রচণ্ড আঘাত করবে এবং পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে। তার ফলে বস্তুটিতে তেজস্ক্রিয়তা সঞ্চালিত হবে।

ধরা যাক্, 'ডি'এর মধ্যে দশ হাজার ভোল্ট-শক্তি আছে এবং কণিকাগুলি দু-শ বার ঘুরে এসেছে অর্থাৎ চার-শ বার আঘাত পেয়েছে। সুতরাং ঐ গতিশীল কণাগুলি যখন বেরিয়ে আসবে তখন ৪০০ × ১০,০০০ বা ৪০ লক্ষ ভোল্ট-শক্তির সংস্পর্শে এসে যতটা গতিশক্তি হওয়া উচিত তাদের গতিশক্তি সেই রকম হবে। সাইক্লোট্রোন দিয়ে যেমন প্রোটন ইত্যাদি বৈদ্যুত কণার গতিবৃদ্ধি করা যায়, তেমনি তাদের সংখ্যাও অগণিত করা যায়। সুতরাং ব্যাপকভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি এখন সম্ভব হ'ল।

এ যন্ত্র নির্মাণে বেশ সুনিপুণ কারিগরের প্রয়োজন। ভারত-বর্ষে একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজ এ বিষয়ে পথিকৃৎ। বহুখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহার বিপুল উৎসাহ ও কর্মপ্রচেষ্টায় এখানে ঐ যন্ত্র নির্মাণ-কার্য কিছুকাল আগে আরম্ভ হয়েছিল, এখন শেষ হয়ে গেছে। এই যন্ত্রটি লরেন্সের আদি যন্ত্র থেকে কিছু বড়। এর চুম্বক-প্রান্তের ব্যাস ৩৮ ইঞ্চি। অবশ্য আমেরিকায় এর চেয়ে অনেক বড় একটি যন্ত্রের নির্মাণ-কার্য চলছে যার চুম্বক-প্রান্তের ব্যাস হবে ১৮৪ ইঞ্চি।



সাইক্লোট্রোন যন্ত্র উদ্ভাবনের পর যে-সব কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া হ'ল,—

তেজস্ক্রিয়তার উপযোগী

উপাদান	বিকিরণ	অর্ধায়ু
১। অঙ্গার (কার্বন)	পজিট্রন ও গামা	২০·৫ মিনিট
২। সোডিয়ম	বিটা ও গামা	১৪·৮ ঘণ্টা
৩। আয়োডিন	”	১৩ দিন
৪। ফস্‌ফরাস	বিটা	১৪·৩ দিন
৫। লোহা	বিটা ও গামা	৪৭ দিন
৬। গন্ধক (সালফার)	বিটা	৮৮ দিন
৭। ক্যালসিয়ম	বিটা ও গামা	১৮০ দিন

এই সব তেজস্ক্রিয় বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব হওয়াতে বিজ্ঞান-জগতে নবযুগের সূচনা হল। এখন কত দিকে কত রকম অনুসন্ধান চলতে পারে তার একটু আভাস দেওয়া যাক্।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যের পরমাণুকেন্দ্রে আঘাত করে তাকে তেজস্ক্রিয় করে নিলে, তার অতি ক্ষুদ্রতম অংশকে অর্থাৎ প্রায় ১০-১৬ গ্রামকেও যন্ত্রবিশেষ দিয়ে ধরা যায় ও সঠিক ভাবে মাপাও যায়। ঐ রকম খাদ্য কোন প্রাণীকে আহার করালে, কিছুক্ষণ পরে তার শরীরের কোথায় কোথায় ঐ খাদ্য কত পরিমাণ সঞ্চালিত হয়েছে তার মাপ নেওয়া যায়। এই রকম পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে সর্বদাই আমাদের দেহের অস্থিগুলি ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং নতুন ক্যাল্‌সিয়ম ফস্‌ফরাস এসে সে ক্ষয় পূরণও করছে। তেজস্ক্রিয় সোডিয়ম ফস্‌ফেট খাইয়ে দেখা গিয়েছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাণীরও পর্যন্ত মস্তিষ্কের অণুকোষগুলি ক্রমাগতই নবজীবন লাভ করছে। তেজস্ক্রিয় লবণ খাইয়ে দেখা গিয়েছে দশ মিনিটের মধ্যে রক্ত-চলাচলের পথে সেই লবণ হাতের অণুকোষগুলিতে এসে পড়ে। খরগোসের উপর পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, হৃৎপিণ্ডের অনুকোষে সোডিয়ম লবণ অন্য যন্ত্রের অণুকোষগুলির চেয়ে তিন গুণ বেশী সঞ্চিত থাকে। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর আকুঞ্চনের ওপর সোডিয়মের প্রভাব আগেই জানা ছিল, এখন এর পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে নিউট্রনের যে সতেজ রশ্মির উদ্ভব হয় তার জৈবিক প্রভাব 'এক্স-রে'র চেয়েও বেশী। জীবাণুদুষ্ট তন্তু বা অণুকোষগুলির উপরে এই রশ্মির প্রভাব খুব বেশী দেখা গিয়েছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে—ইঁদুরের গায়ে ক্যান্‌সার হলে যদি অধিবিষহীন (non-toxic) বোরিক এসিড দিয়ে ক্ষতস্থানটি বেশ নিষিক্ত করে তার ওপর ধীরগামী নিউট্রন-রশ্মিপাত করা হয় তাহলে রোগটিকে নষ্ট করে ফেলা যায়। বোরণের সংস্পর্শে যে অণুকোষগুলি আসে না, নিউট্রনরশ্মি তাদের কোন ক্ষতি করে না। বোরিক এসিডের ওপর ঐ রশ্মিপাতের ফল হয় এই যে দুই বিপরীতগামী কণিকার সৃষ্টি হয়—একটি আল্‌ফা-কণা, অন্যটি লিথিয়ম অতি-পরমাণু—এরাই ক্যান্‌সার-দুষ্ট অণুকোষের ধ্বংসের কারণ। এ সম্পর্কে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নি। জীববিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত ও আরোগ্যশাস্ত্রের কত পুরাতন তথ্য ভবিষ্যতের অভিনব আবিষ্কারের ফলে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হবে এবং কত নূতন তথ্যের সৃষ্টি হবে তার আভাসটুকু মাত্র বর্তমানে দেওয়া যেতে পারে। আমরা সাগ্রহে সে সুদিনের প্রতীক্ষা করছি।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি-ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়—জটিল পরমাণুপুঞ্জ ভেঙে ক্রমে সরল হয়ে যাচ্ছে, ভাঙাও চলছে, গড়াও চলছে। এ সব আবিষ্কারের আলোয় রবীন্দ্রনাথের একটি অমর-বাণী যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি—ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'।

এই জড় জগতের দুটি মূল সত্তা—বস্তু ও শক্তি। বস্তুর উপাদান নিয়ে আলোচনা শেষ হ'ল। শক্তি সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। শক্তি কি ? শক্তি হ'ল বস্তুর অতি-পরমাণুর প্রকাশ। অতি-পরমাণুর শক্তি জগতের কোন্ বড় কাজে লাগতে পারে সেটাই হল ভবিষ্যতের সমস্যা। এ প্রসঙ্গে বস্তু-পরিমাণ (mass) ও শক্তি (energy) সম্পর্কীয় একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার উত্থাপিত করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে—যখন একটি লিথিয়ম পরমাণুকে একটি প্রোটন আঘাত করে তখন দুটি আল্‌ফা-কণা তৈরি হয়। আরও দেখা গেল যে আঘাতকারী প্রোটনের গতিশক্তি ৩ লক্ষ ইলেক্‌ট্রন্ ভোল্ট। এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট আল্‌ফা-কণার গতিশক্তি ৮৭ লক্ষ ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট। অর্থাৎ, দুটি আল্‌ফা-কণার গতিশক্তি প্রোটনের গতিশক্তির চেয়ে ১৭১ লক্ষ ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট বেশী হচ্ছে। এ বেশী শক্তি কোথা থেকে এল ? তখন প্রতি পরমাণুর বস্তু-পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখা হ'ল।

আঘাতের আগে বস্তু-পরিমাণ ছিল—

লিথিয়ম পরমাণুর　৭·০১৮২ × ১·৬৬ × $১০^{-২৪}$ গ্রাম্

প্রোটনের　+　১·০০৮১ × ১·৬৬ × $১০^{-২৪}$ ”

= ৮·০২৬৩ × ১·৬৬ × $১০^{-২৪}$ ”

আঘাতের পরে বস্তু-পরিমাণ হ'ল—

দুটি আল্‌ফা-কণার　২ (৪·০০৪০ × ১·৬৬ × $১০^{-২৪}$ ”)

= ৮·০০৮০ × ১·৬৬ × $১০^{-২৪}$ ”

দেখা গেল, (৮·০২৬৩ − ৮·০০৮০) ১·৬৬ × $১০^{-২৪}$ গ্রাম্ অর্থাৎ ০·০১৮৩ × ১·৬৬ × $১০^{-২৪}$ গ্রাম্ বস্তু-পরিমাণ নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আইন্‌স্টাইনের মত এই যে, বস্তু-পরিমাণ নষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অঙ্ক কষে তিনি অবশেষে একটি সূত্র নির্ণয় করলেন—

শক্তি = বস্তু-পরিমাণ × ৯ × $১০^{-২৪}$

এই হিসাবে দেখা গেল, ০·০১৮৩ × ১·৬৬ × $১০^{-২৪}$ গ্রাম্ বস্তু-পরিমাণ ১৮০ লক্ষ ইলেক্‌ট্রন ভোল্টের সমান। বস্তু-পরিমাণ ও শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ এ ব্যাপার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল।

বস্তু থেকে যে অপরিমিত শক্তি পাওয়া যায় তার ধারণা করা সহজ হয়। একটি উদাহরণ দিলে ভাল হয়। ধরা যাক্, এক ছটাক বস্তু উত্তাপ-শক্তিতে পরিণত হয়েছে—এই উত্তাপ-শক্তি এত বেশী যে প্রায় ৩৪ কোটি মণ বরফকে ফুটন্ত জলে পরিণত করতে পারে।

বস্তু ও শক্তি বিশ্বের মূলীভূত একটি সত্তার দুটি বিভিন্ন রূপ। সেই 'একে'র স্বরূপ কি কে জানে। ভারতীয় দর্শনের শেষ লক্ষ্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা ব্রহ্ম। বিজ্ঞানও সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে কি না সুধীজনের বিচার্য।

আবার কি ডাকিবে আমারে?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আবার কি ডাকিবে আমারে?
তোমার গৃহের দ্বারে
তেমনি সহাস্য মুখে অভ্যর্থনা করিবে আবার?
—খুলিবে হৃদয়-দ্বার
বহুদিন পরে সংগোপনে
নিরালায় বসিব দু'জনে?

তোমার সকল কর্ম্মে সব প্রত্যাশায়
সকল মহৎ প্রচেষ্টায়
বিপদে সম্পদে আর বিঘ্ন-সমাকুল যাত্রাপথে
আপন অন্তর হ'তে
একদিন, বহুদিন যখনি ডেকেছ বন্ধু ব'লে
তখনি এসেছি চ'লে;—
ভয় নাই দ্বিধা নাই হৃদয়ের সকল সম্বল
তোমারে দিয়েছি ঢালি, চিত্ত অচঞ্চল
তোমা 'পরে;—আমার নয়নে দীপশিখা
সে কি দেখেছিল তব ভালে জয়টীকা?

তোমারে দেখেছি বন্ধু, উগ্রতপা কঠোর সন্ন্যাসী
ভোগের প্রাচুর্য্য মাঝে বৈরাগী উদাসী;
তোমার সে ত্যাগের মহিমা
আপনার সৌন্দর্য্যের সীমা
আপনি সে জানে নাকো;
ধরণীর বিনীত প্রার্থনা মানে নাকো;
স্থির দৃষ্টি বহু ঊর্দ্ধে তার
পশ্চাতে পড়িয়া থাকে রক্তমাংসে গড়া এ সংসার।

তোমারে দেখেছি বন্ধু, অকিঞ্চন বন্ধুত্ব-ভিখারী,
আপনার অন্তর বিথারি'
আলিঙ্গন দিয়েছ বন্ধুরে;
আজি তুমি আছ বহু দূরে
তবু উষ্ণ স্পর্শখানি তার
নিত্য অনুভব করি,—এ বিরহ-বেদনার
শেষ নাই, সীমা নাই, তাই সর্ব্বক্ষণ
নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে ধেয়ে চলে অশান্ত এ মন।
স্মৃতির মঞ্জুষা খুলে দেখি একে একে
বিদায়-বেলায় তুমি কত ধন গিয়েছ যে রেখে!

বাহিরে কঠোর তুমি, সে তোমার আত্মার নির্ম্মোক
সেই পরিচয়ে তোমা জানে সর্ব্বলোক,
তারা ত জানে না পুষ্প পরাভব মেনেছে গোপনে
হাসিমুখে অতি সন্তর্পণে
হৃদয়ের কাছে তব; আমি জানি কত সুকোমল
পেলব পল্লব সম সে হৃদয় বেদনা-চঞ্চল।
তোমার নয়নে
যে বিদ্যুৎ খেলে ক্ষণে ক্ষণে
কুঞ্চিত ললাটে তব ঘনাইয়া ওঠে কালো মেঘ
স্ফুরিত অধরে স্তব্ধ যে দুর্ম্মদ বেগ
তাহারি পশ্চাতে আছে কি গৈরিক জ্বালা
সে কথা ত জানি আমি; একান্ত নিরালা
তোমারে পাব কি কাছে? সেই দিন সে নীরব ক্ষণে
ডাকিতে ভুলো না বন্ধু, অকিঞ্চন এই বন্ধুজনে।

কত দূরে আছ বন্ধু, কত কাল রহিবে সুদূরে?
সেথাকার বাঁশী বুঝি হেথাকার সুরে
মূর্চ্ছনায় বাজে সুমধুর
তোমার অন্তর তলে! বেদনাবিধুর
হেথাকার গান বুঝি তরঙ্গিত আকাশে বাতাসে?
নব অভ্যুদয়ের আশ্বাসে
দিন যায়, রাত্রি যায়, শেষ হয়ে আসে পরমায়ু,
হেথাকার ভূমি জল বায়ু
আর্ত্তনাদে জানায় মিনতি।
সূর্য্যালোক, দীপ্ত দেবজ্যোতি
তাদেরে ফিরায়ে দাও, কত কাল রাখিবে বঞ্চিত?
যুগ হতে যুগান্তে সঞ্চিত
অপরাধ—মহা অপরাধ
জানি জানি, পদে পদে ঘটিয়াছে নিত্য পরমাদ
তার শাস্তি এখনো কি বাকি?
ন্যায়ের এ ফাঁকি
এখনো সত্যের কাছে আপনারে দিবে নাক ধরা?
দয়াময়ী সর্ব্বদুঃখহরা
মুক্তি-উষা দিবে নাক দেখা?
বালার্ক কিরণ-রেখা
কত দূরে—কত দিনে নয়নের আগে
ফুটিয়া উঠিবে বল? নব অনুরাগে
তোমার যাত্রার পথে অগ্রসরি দেখিব সম্মুখে
তুমি আছ দাঁড়াইয়া—নব-সূর্য্য-উদ্ভাসিত মুখে।

শনিবার

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের বয়স যতই বাড়িতেছে—পৃথিবীর পুরাতন চিহ্নগুলিকে ততই সে নির্ব্বিচারে মুছিয়া লইতেছে। প্রকৃতির মত মানুষও এই নির্ম্মম পরিমার্জ্জনার দ্বারা মাঝে মাঝে জগৎ-সৃষ্টির ধারাটিকে অব্যাহত রাখিতেছে কি না—সে প্রশ্ন এখানে করিয়া লাভ নাই। শুধু নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে পুরাতন মানুষকে কি শক্তিক্ষয় করিয়া একাত্মতা লাভ করিতে হইতেছে—তাহাই মাঝে মাঝে ভাবিয়া থাকি। গুরুতর বিষয় বা সমস্যাগুলি গুরুতর জনেরা আলোচনা করুন। যুদ্ধোত্তর কালের কত না পরিকল্পনা সংবাদপত্রে নিত্য প্রকাশিত হইতেছে—যুদ্ধজীর্ণ আমরা সেগুলির প্রতি অনুকম্পা বা তাচ্ছিল্যমিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকি, সুতরাং মন অনেকখানি পিছাইয়া থাকাটাই স্বাভাবিক। কণ্ট্রোলের চাপে অশন বসন অঙ্গরাগের সর্ব্ববিধ বিভাগে যে সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন আমরা হইয়াছি—তাহাতে যুদ্ধোত্তর কোন মঙ্গল-পরিকল্পনাই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছে না। আমরা বায়ুভূত নিরালম্বের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছি মাত্র। কিন্তু বড় বড় সমস্যা আমাদের স্পর্শ করিতে না পারিলেও ছোট ছোট ঘটনাগুলি জল-গণ্ডূষলোলুপ সূক্ষ্মদেহে মাঝে মাঝে অশান্তি জাগাইয়া তোলে। শনিবারের কথাটিই এ ক্ষেত্রে ধরা যাক্।

যুদ্ধের সংঘাতে কায়াহীন এই বারটি কোন কালে যে মহার্ঘ্য ও প্রাপ্তি-দুর্লভ হইবে ইহা কি কোনদিন ভাবিতে পারিয়াছি! অথচ এই বারটি এতকাল সোম হইতে শুক্র পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত কল্পনায় যে ভরসা ও আনন্দ বহন করিয়া মসীজীবীকে প্রলুব্ধ করিত—বর্ত্তমানের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে। সে স্মৃতিকে ভুক্তভোগীরা কতদিন পোষণ করিতে পারিবেন—জানি না। যুদ্ধের চাপে গাড়ির সংখ্যা যে ভাবে দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে—তাহাতে শনিবার বলিয়া বিশেষ একটি সুখকল্পনাময় বারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু যত দিন কলিকাতা ও আপিস থাকিবে—তত দিন পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্নবঞ্চিত মৃত্যু-প্রতীক্ষু কঙ্কালসার মানবের মত শনিবারও থাকিবে। রসকষহীন আকের ছিবড়ার মত শনিবার—কিন্তু ইহাতেও প্রতিবাদ হইতে পারে। অনেক ভঙ্গেও বঙ্গদেশ যদি একদা রঙ্গভরা থাকিতে পারে—এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত শনিবারও কৌতুকের খোরাক জোগাইবে না কেন?

আড়াইটার ট্রেনে যাইব বলিয়া দেড়টায় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। শনিবার পালনকারীরা প্রত্যেকেই স্ববুদ্ধির উপর আস্থাবান। তবে অনিবার্য্য কারণবশতঃ বিলম্বে-পৌঁছানোর দল আছেন বলিয়াই গাড়িতে আসন লাভের সৌভাগ্য অগ্রগামীদের ঘটিয়া থাকে। ইতিমধ্যেই মানুষে ও মালপত্রাদিতে বেশ মাথামাখি ভাব অনুভূত হইতেছে। কেহ ঈষৎ বাঁকিয়া—কেহ বা পদ্মাসন করিয়া যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছিলেন তাহাও লুপ্তপ্রায়। তবে দণ্ডায়মান মানুষের চাপ তখনও দানা বাঁধে নাই।

দুয়ারের ধারে এক বিপুলদেহ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহার জিনিসপত্রে ব্যাঙ্ক আকণ্ঠ বোঝাই। নিজেও জনদেড়েকের জায়গা দখল করিয়া পরম নিশ্চিন্তে পান চিবাইতেছেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নূতন কোন যাত্রীসমাগম না হওয়ায় উৎফুল্লকণ্ঠে মন্তব্য করিলেন, আজ গাড়িতে বেশি ভিড় হবে না।

তাঁহার পাশে স্থান-সমতা রক্ষা করিয়া যে শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন তিনি প্রশ্ন করিলেন, কেন মশাই?

ভদ্রলোক হাসিলেন, আরে জানেন না, আজ যে মোহন-বাগানের খেলা আছে।

সে আর ক'টা লোক—

ক'টা লোক! চক্ষু উপরে তুলিয়া তিনি এমন উচ্চহাস্য করিলেন—যাহার ফুৎকারে পাশের শীর্ণ লোকটি নিবিয়া গেলেন।

খেলার কথায় সেই আলোচনাই জমিয়া উঠিল।

এ-পাশের বেঞ্চ হইতে এক জন বলিলেন, এবার মোহন-বাগানের কেয়ার চান্স।

আর ইষ্টবেঙ্গল বুঝি ফেল্‌না টীম? আপ্পারাও নামছে—জানেন তো।

যত রাপ্পই নামুন—চার এগারোং কত হয়?

মানে? ভদ্রলোক ভ্রূকুটি করিলেন।

মানে অঙ্ক-শাস্ত্রের নির্ভুল হিসাব। যে হিসাবে সৌরজগৎ চলে।

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি উচ্চহাস্য করিলেন, তা বটে। ওই হিসেবে গ্রহণও লাগে। বলয়গ্রাস গ্রহণ!

কি বললেন?

মাঝখানের ভদ্রলোক হাত তুলিয়া বলিলেন, আহা—করেন কি? প্লেয়াররা এখনও মাঠে নামেন নি—আপনারা আরম্ভ করে দিলেন!

আর একজন মন্তব্য করিলেন, যেই নিন্ শীল্ড—বাঙালী তো। একে মরছি প্রভিন্সের ঠেলায়—তার ওপর জেলার সমস্যা আর বাড়ান কেন মশায়!

যা বলেছেন। ঘটিই হোক আর বাঙ্গালই হোক—আমরাই তো। সেই স্থূলকায় ভদ্রলোক মন্তব্য করিলেন। কথ্য ভাষাতে তিনি সমন্বয় সাধন করিয়াছেন বলিয়াই আপোষের কথা শেষে মোলায়েম ভাবে হাসিলেন।

প্ল্যাটফরমে চীনাবাদাম ভাজা ও খবরের কাগজের হকাররা অভ্যস্ত বুলি আওড়াইতেছিল। শীর্ণকায় লোকটি জানালায় ঝুঁকিয়া দুই পয়সার চীনা বাদাম কিনিলেন, স্থূলকায় ভদ্রলোক কাগজওয়ালাকে ডাকিলেন।

কিন্তু সে কাগজওয়ালা নহে। কতকগুলি চোখ-ধাঁধানো মলাট-সর্ব্বস্ব নভেল লইয়া উচ্চকণ্ঠে তাহাদের গুণকীর্ত্তন করিতেছিল।

কাগজ আছে ? মানে মাসিক পত্র ?

আজ্ঞে না। ভাল ভাল নভেল আছে ? যমে মানুষে লড়াই, হিটলার সকাশে যতীন—

বলেন কি, যতীনের সাহস ত খুব !

আজ্ঞে হাঁ—দেখুন না পড়ে। দম বন্ধ হয়ে আসবে।

না বাপু, একেই ভিড়ের ঠেলায় ওটি যথেষ্ট অনুভব কচ্ছি, পয়সা খরচ করে আর—

তবে—যমে মানুষে লড়াই—

দূর মশায়, এই বাজারে যমে মানুষে লড়াই থাকে কখনও! গলায় গলায় ভাব।

তবে যা খুসী তাই একখানা নিন্।

মাসিক থাকে তো দাও, নইলে কেটে পড়।

সে চলিয়া যাইতেই আসল হকারকে পাওয়া গেল। দুই হাতে ও বুকে আগলাইয়া নানান রকমের ছোট-বড়-মাঝারি-লম্বা-চওড়া সাইজের পত্র ও পত্রিকা লইয়া সে দেখা দিল।

কি আছে মাসিক পত্র ?

তাহার অনর্গল নাম-প্রবাহে বাধা দিয়া ভদ্রলোক দুইখানি মাসিক পত্র বাছিয়া লইলেন। একখানি অর্দ্ধ-উলঙ্গ নারীচিত্রিত, অন্যখানি মোরগচিহ্নিত। যুদ্ধের বাজারে যাহারা পালাক্রমে সুলভ ও দুষ্প্রাপ্য হইতেছে।

দাম ?

আজ্ঞে—সাত আর চার এগারো আনা।

ভদ্রলোক একখানি এক টাকার জরাজীর্ণ ও মসীমলিন নোট বাহির করিলেন।

আজ্ঞে—ওটা বদলে দিন।

কেন ?

আজ্ঞে—আমরা গরীব মানুষ।

এটা ভাঙ্গিয়ে চৌষট্টি পয়সাই পাবে বাপু, যদিও পয়সা আজ-কাল পাওয়া যাচ্ছে না।

বদলে দিন বাবু।

বাবু প্রসন্ন হইয়া একখানি ফরসা নোট দিলেন।

হকার নামিয়া যাওয়ার পর পাশের ভদ্রলোক ভাল করিয়া পত্রিকার মলাট দেখিয়া বলিলেন, দাম বেশি নিয়েছে।

কিসে ?

এই দেখুন—ছ'আনা আর তিন আনা লেখা রয়েছে।

বটে! এই হকার—হকার। হন্তদন্ত হইয়া ভদ্রলোক আসন ত্যাগ করতঃ জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

হকার আসিলে হুঙ্কার দিলেন, কত দাম নিয়েছ হে ?

সাত আনা আর—

বটে—এ কি মগের মুলুক! মোরগচিহ্নিত কাগজখানি তুলিয়া বলিলেন, এটায় লেখা আছে কত ?

আজ্ঞে—ছ' আনা। তা ছাড়া আপিসের দু' পয়সা আর আমাদের দু' পয়সা। মোট সাত আনা।

আব্দার! তাহ'লে মুদ্রাকরের দু' পয়সা, প্রুফ রীডারের দু' পয়সা, কম্পোজিটারের—

নিরুপায় হকার একটি আনি ফিরাইয়া দিয়া কহিল, আপিসের লাভটা ছেড়ে দিলাম না হয়।

সে নামিয়া গেলে ভদ্রলোক কহিলেন, তবুও ঠকালে এক আনা। কাগজের ব্ল্যাক মার্কেট নেই—তবুও—

পাশের শীর্ণকায় ভদ্রলোক কহিলেন, কে বললে মশাই, কালো বাজার সকলকারই আছে—শুধু পত্রিকার নেই।

এদিকে জনসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও চাপিয়া আসিল। মোহনবাগান-হিতৈষীরা নানারূপ উদ্বিগ্ন মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ছোট কামরা। বসিবার স্থান নাই, তবু লোক উঠিতে লাগিল। এক ছোকরা মুটের মাথায় সুটকেস চাপাইয়া আধভেজা অবস্থায় কামরায় উঠিতেই স্থূলকায় ভদ্রলোক প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, অন্য গাড়ি দেখুন—অন্য গাড়ি দেখুন।

ছোকরা মোট যথাস্থানে রাখিবার নির্দেশ না দিয়াই তাঁহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মোলায়েম বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, কি করে জানলেন ?

কি জানলাম ?

যে অন্য গাড়ি দেখি নি ? গাড়ির আগা পাশতলা দেখে তবে আসছি। এই দেখুন জামা কাপড়ের অবস্থা।

ভদ্রলোক নির্ব্বাক হইয়া পত্রিকায় মনোনিবেশ করিলেন।

অতঃপর দুয়ারে ঠেলাঠেলি সুরু হইল। নানা কথা—নরম, গরম, সরস, তিক্ত বহু কথায় গাড়ি কল কল করিয়া উঠিল। বহু কণ্ঠোত্থিত কোলাহলকে মনে হইল গাড়িরই ভাষা। শনিবারে আকণ্ঠ বোঝাই গাড়ির ভাষা আছে বই কি। নানান ঠিকানার নানান মানুষে বোঝাই—বিচিত্র পণ্য-সম্ভারে ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় সমৃদ্ধ গাড়ি—দু'টা পঁচিশের টাইম টেবলের নম্বর দেওয়া কতক-গুলি বগি-সমন্বিত প্রাণহীন গাড়ি সে নহে।

ভিড়ের চাপে একটি মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে হইতেই কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সরুন—সরুন মশাই, মেয়েছেলেকে জায়গা দিন।

যুদ্ধ অনেক কিছুই মুছিয়া লইতেছে। কে জায়গা দিবে ? উহারই মধ্যে কিন্তু একজন সহৃদয় কষ্ট স্বীকার করিয়া মহিলাটিকে বসিবার জায়গা দিলেন। তারপর কতকগুলি ভেণ্ডার উঠিল। আরও লোক এবং ট্রাঙ্ক পুঁটুলি উঠিল। হাত পা আড়ষ্ট করিয়া কত ক্ষণে গন্তব্যস্থানে আসিব সেই ক্ষণই বুঝি গণিতে লাগিলাম।

কিন্তু প্রাথমিক দুঃখে অভিভূত হওয়াটাই মানুষের স্বভাব। দুঃখের মধ্যযামে সে ভাবটা কাটিয়া খানিকটা স্বচ্ছন্দ হওয়া যায়। ওই মাখামাখি ভাবের মধ্যেই কখন শরীরের চারি পাশ ঈষৎ আলগা বোধ হইতেছে ও কাহারও কাঁধের পাশ দিয়া—কাহারও পায়ের ফাঁক দিয়া হাত ও পা-কেও দিব্য চালনা করিতেছি। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, তবু পত্রিকার রস গ্রহণে বা সংবাদপত্রের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। এই ফাঁকে পার্শ্ববর্ত্তীর সঙ্গে কেহ বা সাংসারিক আলাপে জমিয়া গিয়াছেন—কেহ বা বর্ত্তমান বাজার-দরের কথা সখেদে পরিতৃপ্তি সহকারে বিবৃত করিতেছেন। যতই শক্ত বাঁধনে দুঃখ আমাদের বাঁধিতেছে—ততই শ্লথ হইবার

মন্ত্র যেন আমাদের আয়ত্তে আসিতেছে। কষ্টকেও আজ কষ্ট করিয়া আমাদের সঙ্গে দৌড় করাইতেছি। পাঁচ বছর আগে এমন জাঁক করিয়া চার টাকা সেরের মাছ—পাঁচ টাকা সেরের ঘি—দশ টাকা জোড়ার কাপড় এবং কণ্ট্রোলের কাঁকরমণি চাউলের কথা গল্প করিবার কল্পনা আমাদের ছিল কি? সেকালের কোন নবাবজাদা এখানে আবির্ভূত হইয়া—নবাবী আমলের ঐশ্বর্য্য লইয়া আজ আমাদের লুব্ধ ও ক্ষুব্ধ করিতে পারিবে না নিশ্চয়।

অবশেষে গাড়ি ছাড়িল। ও-পাশের স্থূলকায় ভদ্রলোককে আর দেখা যায় না, ভিড়ে তিনি প্রোথিত হইয়া গিয়াছেন।

এ-পার্ হইতে একজন রহস্য করিলেন, কি দাদা, ভিড় হবে কি আজ?

উত্তর আসিল না।

এদিকে মহিলাটির স্বামী কখন অল্প জায়গায় বসিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছেন এবং একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রবল বেগে টান মারিতেছেন।

একে এই গরম—তার ওপর—

সেইজন্যেই ত টানছি মশায়। খালি চোখে এই ভিড় সহ্য করা যায়?

টানুন ক্ষতি নেই, কিন্তু ডবল প্রমোশন নেবার চেষ্টা করবেন না যেন!

সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়া ছাড়িয়া ভদ্রলোক কহিলেন, আমাদের প্রমোশন দেয় হেন লোক ত ভূভারতে দেখি না। অষ্টসিদ্ধিতে অল-রাউণ্ড প্লেয়ার, হুঁ বাবা!

বটে জল পথ—না—

সব পথে সুপিরিয়রিটি না থাকলে মন্বন্তর যুগকে কলা দেখাতে পারতাম কি! কি যুগ গেল তেরশো পঞ্চাশ!

মশায়ের নিবাস?

বাংলার সেরা গ্রাম। জানেন উলোর নাম? বীরনগর।

ভূতের হেড কোয়ার্টার।

কি বললেন?

মহামারিতে উলো ত উজোড় হয়ে গিয়েছিল। যত ভূতের গল্পের প্লট ত ওরই পড়োবাড়ি আর মাঠজঙ্গল নিয়ে।

সে উলো আর নেই। এখন নাম হয়েছে বীরনগর। নগেন-বাবুকে জানেন? তিনি মারা না গেলে কলকাতার সমান দাঁড় করাতেন একে।

তাঁর প্ল্যান ছিল ভাল।

শুধু নগেনবাবু কেন—বাংলার যত সুসন্তান সবারই বাস উলোয়। মুস্তৌফীরা, বসুরা—রাজশেখর বসু,

জানি।

তবে বললেন যে ভূতের হেড কোয়ার্টার?

ভুল করেছি।

অমন গ্রাম আর নেই মশায়। পাকা রাস্তা, আমবাগান, শাকসব্জী, মাছ। এক একটি জাতির বসতি এক একটি পাড়ায়। কেবল যা দুঃখ ম্যালেরিয়া। তা সে আর ক'টা মাস!

ওপারের বেঞ্চে ততক্ষণে সাহিত্য-আলোচনা চলিতেছে।

ও মুর্গীমার্কা বইখানা কি মশায়?

শনিবারের চিঠি।

অন্নদাশঙ্কর যার এডিটর ছিলেন?

হবে। এখন ত দেখছি—সজনীকান্ত দাস।

আগে অন্নদাশঙ্কর ওর এডিটর ছিলেন।

কোন্ অন্নদাশঙ্কর?

যিনি বর্দ্ধমানের জজ।

ওঃ, যিনি আমেরিকান লেডী বিয়ে করেছেন?

যাঁর বাড়ি কালিয়ায়?

সুতরাং—বেশ লেখেন।

পড়ছেন নাকি?

নাঃ, যে গরম।

বড় কষ্ট মশাই—শনিবারের বাড়ি যাওয়া। কষ্টদায়ক।

বলেন কি শুধু কষ্টদায়ক? কত আনন্দ ও আশাদায়ক—বলুন ত।

একটা উচ্চহাস্যধ্বনি গাড়িখানাকে খান্ খান্ করিয়া দিল।

লিখতে আর হবে না মশাই, পেপার কণ্ট্রোল হয়ে গেল।

ছেলেদের লেখাপড়ার দফা গয়া!

এখন ত চাকরির অভাব নেই। হাজার হাজার আপিসে লাখ লাখ কেরাণীর চাহিদা। কি হবে লেখাপড়ায়।

তা বটে। ঢুকতেই মাইনে—এ্যালাউন্সে—রেশনে একশোর কম ত নয়।

পেটের ভাবনা ত ঘুচেছে।

হাঁ—কয়েক পুরুষ বেশ কাটবে। উর্দ্ধগতি আর নিম্নগতির মাঝখানে সেই অমৃতলোক।

যাই বল ভাই, বিজ্ঞান-জগৎকে করলে উন্নত, আমাদের দিলে পিছিয়ে।

দূর এ যুগে পিছোবার যো কি? আগে যেতেই হবে।

এ যুগে মানুষের সব গুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না কি?

গুণ কখনো নষ্ট হয়! চাপা জিনিস শুধু প্রকাশ পেয়েছে।

কোথায়?

কেন, গেল সনের দুর্ভিক্ষে, ব্ল্যাক মার্কেটে, রেশনের জিনিসপত্রে—

গেল—গেল—গেল—

গাড়িটা ষ্টেশনে ঢুকিবার মুখে ঈষৎ কাত হওয়াতে ব্যাঙ্ক হইতে একটি সুটকেস গড়াইয়া সেই স্থূলকায় ভদ্রলোকের মাথায় পড়িল। চোখের চশমা সেই আঘাতে ঠিকরাইয়া ভিড়ের মধ্যে পড়িল এবং নিমিষে গুঁড়া হইয়া গেল।

মশাই—মোট রাখবার আর জায়গা পান নি। তিনি আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, ভিড় তাঁহাকে বসাইয়া রাখিল। নানা কণ্ঠের মন্তব্য কোলাহলকে বাড়াইল শুধু।

যাক, চোখটা খুব বেঁচে গেছে—মশাই।

চোখ ত বাঁচলো—চশমার দাম জানেন?

ইনফ্লেশনের বাজার—কুচ্ পরোয়া নেই।

ষ্টেশনে গাড়ি থামিলে কিছু আশার সঞ্চার হয়—কিছু লোক

নামিলে খানিকটা নিশ্বাস লইবার অবসর বুঝি মিলিবে। কিন্তু যে হারে লোক নামিতেছে—তাহার দ্বিগুণ হারে উঠিতেছে। গাড়িখানা সুপুষ্ট মেষশাবকের মত ষ্টেশনে ঢুকিতেই ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত যাত্রীদল তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। ঠেলাঠেলি, মারামারি, চীৎকার, জিনিসপত্র তছনছ—সে এক বীভৎস কাণ্ড। গাড়ির জঠরে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া নিরুপায় যাত্রীরা ফুটবোর্ডে ঝুলিতে ঝুলিতেই চলিয়াছে।

সেই অবস্থাতেই গল্প চলিতেছে :

এখন প্র্যাক্‌টিস হ'য়ে গেছে ভাই, পঁচিশ-ত্রিশ মাইল এমনি করে গেলেও কিছু হয় না।

আরে ট্রামেও এই অবস্থা। একটু কষ্ট হয়, কিন্তু পয়সা বাঁচে।

কন্‌ডক্‌টর ধরে না ?

দূর শা—, টিকিস কাটবে কোত্থেকে। যেমন ষ্টপেজে আসে—সুরুৎ করে গলে প'ড়।

খুব বাহাদুর ছোকরা তো তুমি। পা দানিতে ভাল করে পা দাও—নইলে বিনা টিকিটে অনেক দূর চলে যাবে।

আমাদের প্র্যাক্‌টিস আছে মশায়। বলিয়া এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া অন্য হাতে পকেট হইতে চীনা বাদাম বাহির করিয়া খাইতে লাগিল।

তার পর আসিল রাণাঘাট। বড় জংশন। বাঁধকাটা জলের স্রোত বহিল। তীব্র স্রোত। কত অর্দ্ধ পরিচিত ভাসিয়া গেল—সম্পূর্ণ অপরিচিত উঠিয়া আসিল। বেলুনধর্ম্মী গাড়ির এতটুকু ফাঁক রহিল না।

মোটা ভদ্রলোক বিপন্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় নামবেন মশায় ?

কেষ্টনগর।

আপনি।

ডিটো।

দুই-তৃতীয়াংশ যাত্রীর গন্তব্য স্থান কৃষ্ণনগর শুনিয়া ভদ্রলোকের মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আপনি দিব্যি হাত পা মেলে শুয়ে বসে যাবেন।

ভদ্রলোক সহসা শুষ্ক মুখে কহিলেন, আবার উঠবে তো ?

সম্ভব।

তবে ! একটু থামিয়া বলিলেন, নামবার সময় কাইগুলি ওই কোণে সরে যাবার অপর্‌চুনিটি দেবেন স্যার ?

আসবেন এখন ?

না না, বাদকুল্লো ছাড়িয়ে। থ্যাঙ্কস্।

অগ্রিম ধন্যবাদটা আর দেবেন না, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।

সে কথা সত্য। রাণাঘাট জংশন ছাড়াইয়া খানিকটা দূর আসিতেই—ফট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। কে যেন লোহার উপর লাঠি দিয়া সজোর আঘাত করিল।

গেল—গেল—গার্ড-গার্ড—চেন টানুন—চেন—

বিপৎকালের চেন খুঁজিয়া মিলিল না। যেখানে সেখানে চেন-টানার উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া কোম্পানী চেনের অবস্থান ফাঁকটিতে কাঠ দিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। এতগুলি লোকের পরিত্রাহি চীৎকার—গার্ডের কানে পৌঁছিল না। চীৎকারের কিই-বা মূল্য আছে আজকালকার দিনে। ট্রেনের ভাষাটাই তো পরিত্রাহি চীৎকার।

উত্তেজিত যাত্রীদলে কোলাহল আরম্ভ হইল।

কি হলো মশাই ?

ওই যে ছেলেটা ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল, পড়ে গেল।

পড়ে গেল ! কি করে ?

হাত ফস্‌কে।

আজ্ঞে না। কেবিনের গায়ে গাড়িটা যেখানে বাঁক নিলে—ওইখানের লোহার পোষ্টটা খুব কাছে। ছেলেটি মাথা বাড়িয়েই ছিল, যেমন ধাক্কা লাগা—

আহা-হা—

মাথাটা আর নেই। কি দারুণ শব্দ মশাই, খুলি ফাটার শব্দ কিনা।

মুহূর্ত্তে সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। দুর্ঘটনার থমথমে মেঘখানা সমস্ত আলো হাওয়াকে আড়াল করিয়া মাথার উপর ঘন কালো হইয়া উঠিল।

কোম্পানীর নামে নালিশ করা উচিত। গাড়িতে চেন তুলে দিয়েছে।

শা— গার্ড কেন গাড়ি থামালে না। বীরনগরে গাড়ি থামলে চাঁদা করে মার দাও।

ওকে মারলে ছেলেটার গতি হবে ?

আপনি তো বেশ—মশাই।

দুই দলে বিভক্ত হইল জনতা। এক দল যুক্তি দিয়া বুঝাইতে লাগিল, অন্য দল আবেগ বশতঃ তাহাদের গালি দিল। তার পর—সে সুবিধা ছিল না বলিয়াই—রক্তারক্তি কাণ্ডটা বেশি দূর অগ্রসর হইল না।

আরো গেজের সঙ্কীর্ণ গাড়িতে ভিড় কম। আড়ষ্ট হাত পা মেলিয়া আরাম করিয়া বসিয়াছি। প্রায় ছ'টা বাজে। রৌদ্রের তেজ কমিয়া গিয়াছে ; দু'ধারে প্রসারিত মাঠ হেমন্তের সোনা রঙের ধান্য-সম্পদে মৃদু হাওয়ায় দুলিতেছে, তার মাথায় কৌতুক-লোভী নীল আকাশ আলস্যে ভাসিতেছে। মাঠ দুলিতেছে না—আকাশও ভাসিতেছে না—ক্লান্ত মন এমনই নির্বিঘ্ন প্রশান্তিতে মগ্ন হইবার আশায় এতক্ষণ অধীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। অবকাশ পাইয়াই সে কল্পনার পাখায় ভর করিয়াছে। শনিবারের অপরাহ্ণ হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সবুজে-নীলে-বাতাসে স্বচ্ছন্দ বসিবার ভঙ্গিতে এবং ঐ হতভাগ্য ছেলেটির অপঘাত মৃত্যুর দুঃখে ঘরে ফিরিবার ইসারাই পাওয়া যায়।

যুদ্ধোত্তর যুগের শান্তি-পরিকল্পনার মধ্যে এই ক্ষণজীবী শনিবারকে—দুঃখ-বেদনা-আশা-আশ্বাস-ভরা শনিবারকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না, জানি। যে খরস্রোতের সে বুদ্‌বুদ্ মাত্র সেই মহাকালকে শুধু প্রণাম জানাইয়া রাখিলাম।

খেজুর গাছ ও খেজুরের গুড়

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

ভূমিকা

বাংলা দেশের প্রায় সব জেলাতেই খেজুর গাছ জন্মে, তবে যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলাতেই এই গাছের সংখ্যা বেশী।

আমাদের দেশের খেজুর তেমন বড়ও হয় না, মিষ্টিও হয় না; ইহার আঁটিও খুব বড়; সেই জন্য ফল হিসাবে ইহার তত আদর নাই; রসের জন্যই আমাদের দেশে খেজুর গাছের বেশী আদর; এই রস হইতে অতি উপাদেয় গুড় প্রস্তুত হয়। যশোর, খুলনা, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলার খেজুরের গুড় অতি প্রসিদ্ধ এবং উহার চাহিদাও বেশী।

প্রধানতঃ যশোর ও অন্যান্য কয়েক স্থানে পূর্ব্বে খেজুরের গুড় হইতে দেশী প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইত, ইহাকে "দলুয়া" চিনি বলিত, কিন্তু বর্ত্তমানে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত আর হয় না বলিলেই চলে।

দুঃখের বিষয় পূর্ব্বে যেমন খেজুরের গুড়ের জন্য খেজুরের গাছের যত্ন করা হইত, এখন আর সেইরূপ যত্ন করা হয় না; এমন কি অনেক স্থানে খেজুর গাছ হইতে রসও সংগ্রহ করা হয় না; ইহার ফলে অনেক স্থানেই খেজুর গাছ নষ্ট হইয়া যাইতেছে; আবার যে সকল গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে গুড় প্রস্তুত করা হয়, সেই সকল গাছের উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না বলিয়া সেই সকল গাছ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ রসও পাওয়া যায় না।

কিন্তু খেজুর গাছ হইতে বেশ আয় করা যায়; বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে গুড় ও চিনির অভাব দূর করিবার জন্য খেজুরের গুড় প্রস্তুতের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

খেজুর গাছ কাটিয়া উহা হইতে রস সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার, যাহারা এই কাজ করে তাহাদিগকে 'সিউলি' বা 'গাছি' বলে। দুঃখের বিষয় আজকাল অনেক স্থানেই সিউলির অভাবশতঃ খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

উপযুক্ত জমি

উঁচু দো-আঁশ জমি খেজুর গাছের পক্ষে উপযুক্ত। অল্প নীচু জমিতেও খেজুর গাছ জন্মে; এইরূপ জমিতে বর্ষার যে অল্প পরিমাণ জল জমে তাহা খেজুর গাছের পক্ষে উপকারী; কিন্তু জমি খুব নীচু হইলে এবং উহাতে অধিক পরিমাণ বর্ষার জল দাঁড়াইলে খেজুর গাছের অনিষ্ট হয়।

বীজক্ষেত্র ও চারা উৎপাদন

খেজুর গাছের বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া ঐ চারা নাড়িয়া আসল জমিতে পুঁতিতে হয়।

বীজ ক্ষেত্র ভাল ভাবে প্রস্তুত করা দরকার অর্থাৎ বীজ ক্ষেত্রের মাটি বেশ গুঁড়া করা আবশ্যক; উহার সঙ্গে ইট, পাটকেল, ঝামা ইত্যাদির টুকরা যেন মিশিয়া না থাকে; ঘাস জঙ্গলের শিকড়, কাটি ইত্যাদি বাছিয়া ফেলা দরকার; বীজ-ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ পচা গোবর সার কিম্বা ঘাস, জঙ্গল, কচুরিপানা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি পচানো সার (কম্পোষ্ট) প্রয়োগ করা উচিত; বীজক্ষেত্র সাধারণ জমি অপেক্ষা এমন উঁচু হওয়া দরকার যেন উহা বর্ষার জলে ডুবিয়া না যায়; উহার মাঝখান এমন উঁচু এবং দুই পাশ এমন ঢালু হওয়াও দরকার যেন উহার উপর বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারে।

বীজ বোনার সময়

বর্ষার সময়েই বীজক্ষেত্রে বীজ বুনিতে হয়; অন্ততঃ দুই হাত অন্তর বীজ বোনা উচিত।

চারার যত্ন ও চারা নাড়িয়া পোঁতা

বীজ হইতে চারা বাহির হইলে উহার যত্নেরও দরকার, অর্থাৎ বীজক্ষেত্রের জমির ঘাস, জঙ্গল বাছিয়া উহা পরিষ্কার রাখিতে হইবে; পোকা-মাকড় লাগিলে উহাদের মারিয়া ফেলিতে হইবে; জমিতে রসের অভাব হইলে জলসেচন করিতে হইবে ইত্যাদি। চারার বয়স দুই বৎসর হইলে উহা নাড়িয়া পুঁতিতে হয়। ৬ হইতে ৮ হাত অন্তর চারা পোঁতা উচিত। ৮ হাত অন্তর চারা পোঁতাই প্রশস্ত।

আসল জমি প্রস্তুত

চারা পুঁতিবার অন্ততঃ এক মাস আগে জমি ভাল ভাবে চাষ করিতে হয়; এবং উহাদের পুঁতিবার জন্য গর্ত্ত করিতে হয়; প্রত্যেক গর্ত্ত অন্ততঃ দুই হাত গভীর ও দুই হাত চওড়া হওয়া দরকার; মাটির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ গোবর-সার কিম্বা ঘাস, জঙ্গল, কচুরিপানা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি পচানো সার ভাল ভাবে মিশাইয়া গর্ত্ত ভরাট করিয়া দিতে হয়; ইহার সঙ্গে অল্প পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া দিতে পারিলে গাছের খুবই উপকার হয়। প্রত্যেক গর্ত্তের মাঝখানে একটি চারা পুঁতিতে হয়।

গাছের যত্ন

চারা পুঁতিবার পর জমিতে রসের অভাব হইলে জল সেচনের দরকার; প্রত্যেক ঋতুর পর গাছের গোড়ায় গোবর-সার কিম্বা ঘাস, জঙ্গল, কচুরিপানা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি পচানো সার প্রয়োগ করা উচিত, গাছ বেশ বড় না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ষার আগে এবং বর্ষার পরে জমিতে লাঙ্গল দিয়া জমি আল্‌গা করিয়া দেওয়া দরকার।

পুরুষ গাছ ও স্ত্রী গাছ

খেজুর গাছের মধ্যে পুরুষ গাছ ও স্ত্রী গাছ আছে; পুরুষ গাছে ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না; আবার স্ত্রী গাছের কাছাকাছি পুরুষ গাছ না থাকিলে স্ত্রী গাছে ফল ধরে না। এক শত স্ত্রী গাছের জন্য অন্ততঃ একটি পুরুষ গাছ থাকা দরকার।

রসের জন্য কোন বাছবিচার না করিয়া অবাধে পুরুষ ও স্ত্রী গাছ রোপণ করা যায়।

ফুল ও ফলের সময়

গাছে ফল ধরিতে ছয়-সাত বৎসর লাগে, মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে।



রস সংগ্রহ

রসের জন্য গাছের বিশেষ তদ্বিরের দরকার—যে কয় মাস রস সংগ্রহ করা হইবে সে কয় মাস জমি বেশ পরিষ্কার রাখা দরকার; জমিতে আর কোন গাছ-গাছালি লাগানো উচিত নয়। খেজুর গাছে দুই থাক পাতা বাহির হয়—এক থাক গাছের মাথার সোজা—আর এক থাক মাথার চারি পাশে; বর্ষা যখন একেবারে শেষ হইয়া যায় তখন মাথার পাশ হইতে যে-সব পাতা বাহির হয় তাহার এক-অর্দ্ধাংশের পাতা কাটিয়া ফেলিতে হয়; সেই অংশ হইতেই রস সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণতঃ গাছের এই কাটা অংশ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া হয়; প্রত্যেক বৎসর গাছের একই অংশ হইতে রস সংগ্রহ করা হয় না; পর্য্যায়ক্রমে বিপরীত দিক হইতে রস সংগ্রহ করা হয়।

একটি গাছ হইতে সপ্তাহে উপরি-উপরি তিন দিন রস সংগ্রহ করা যায়; আর তিন দিন গাছকে বিশ্রাম দিতে হয়; প্রথম দিনের রসই উৎকৃষ্ট এবং উহা পরিমাণেও বেশী হয়। এই রসকে 'জিরান' বলে, দ্বিতীয় দিনের রসকে 'দোকাট' ও তৃতীয় দিনের রসকে 'ঝরণা' বলে। যে সকল গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করিতে হয়, সেই সকল গাছকে ছয় ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের গাছ হইতে প্রত্যেক দিন পর পর রস সংগ্রহ করিলে প্রত্যেক দিনই জিরান, দোকাট ও ঝরণা রস পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ গড়ে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক গাছ হইতে তিন হইতে সাড়ে-তিন সের রস পাওয়া যায়; শীত যদি বেশী হয় এবং জলবায়ু যদি পরিষ্কার থাকে রসের পরিমাণ বেশী হয় এবং উহা ভালও হয়। এমন গাছও আছে যাহা হইতে আট-দশ সের পর্য্যন্ত রস পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সাধারণ নয়; সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে রস সংগ্রহ আরম্ভ হয় এবং ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই কাজ চলে। অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি হইতে মাঘ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রসের পরিমাণ বেশী হয়; ক্রমশঃ গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রসের পরিমাণ কমিয়া যায়; অনেকে লাভের আশায় ইহার পূর্ব্বেই রস সংগ্রহ আরম্ভ করে এবং গরম পড়া পর্য্যন্ত এই কাজ চালায়, কিন্তু ইহাতে রসের বা গুড়ের মোট পরিমাণ বাড়ে না।

গুড় প্রস্তুত

রস সংগ্রহ করিবার পরই উহা জ্বাল দিতে হয়, তাহা না করিলে রস নষ্ট হইয়া যায়, চওড়া মুখওয়ালা বড় বড় মাটির হাঁড়িতে রস জ্বাল দিতে হয়; এই হাঁড়ি বেশ শক্ত ও মজবুত হওয়া দরকার; রস জ্বাল দিবার জন্য উনুনও বড় ও শক্ত হওয়া উচিত—ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য উনুনের দুই পাশে কয়েকটি ছিদ্র থাকা দরকার। খেজুর গাছের যে সকল পাতা কাটিয়া ফেলা হয় তাহাই প্রধানতঃ জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হয়; তবে অন্য কাঠও চাই। রস জ্বাল দিয়া গুড় করিতে প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা লাগে। গুড় প্রস্তুত হইলে উহা মাটির কলসীতে রাখিতে হয়।

গুড়ের পরিমাণ

উপরেই বলা হইয়াছে যে চার মাস খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা যায় অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত। বৃষ্টি-বাদলের দিন ছাড়া এই চার মাসের মধ্যে প্রত্যেক গাছ হইতে ষাট দিন রস সংগ্রহ করা যায়; গড়ে এক ঋতুতে প্রত্যেক গাছ হইতে ২০০ সের অর্থাৎ পাঁচ মণ রস পাওয়া যায়; ৮ সের রসে এক সের গুড় হয়; সুতরাং প্রত্যেক ঋতুতে একটি গাছ হইতে মোটামুটি পঁচিশ সের গুড় পাওয়া যায়।

যদি কেহ প্রত্যেক বৎসর চৌষট্টিটি গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে পঞ্চাশ মণ গুড় পাইবেন; বর্ত্তমান সময়ে পঞ্চাশ মণ গুড়ের মূল্য অন্ততঃ এক হাজার টাকা। তবে গাছের বিশেষ যত্ন করিতে হইবে এবং রস সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত "গাছি" নিযুক্ত করিতে হইবে। গাছির নিকটে গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিবার কৌশল শিক্ষা করিতে খুব বেশী সময় লাগে না।

দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত

গুড়ের কলসী ভাঙ্গিয়া উহা হইতে গুড় বাহির করিয়া একটি ঝোড়ায় ঢালিতে হয়; প্রত্যেক ঝোড়ায় যেন এক মণ পরিমাণ গুড় ধরে এবং উহা পনের ইঞ্চি গভীর হয়; ঝোড়ায় গুড়

গালিয়া উহার উপরিভাগ চাপিয়া সমান করিয়া দিতে হয় ; পরে ঝোড়াগুলিকে চওড়া কড়াইয়ের উপর অন্ততঃ আট দিন বসাইয়া রাখিতে হয় ; এই সময়ের মধ্যে তরল গুড় ঝোড়া চুঁয়াইয়া কড়াইয়ে পড়িয়া যাইবে এবং ঝোড়ায় কেবল গুড়ের শক্ত অংশ অর্থাৎ চিনির দানা থাকিয়া যাইবে ; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তরল গুড় সম্পূর্ণ রূপে ঝোড়া হইয়া চুঁয়াইয়া কড়াইয়ে পড়ে না ; উহার কতক অংশ ঝোড়ায় থাকিয়া যায় ; সেই জন্য এক প্রকারের জলজ উদ্ভিদ 'শেওলা' ঝোড়ার চিনির উপর রাখিতে হয় ; এই শেওলার সাহায্যে ঝোড়ার চিনি সব সময়েই রসালো থাকে এবং সেই রস ঝোড়া চুঁয়াইয়া কড়াইয়ে পড়িবার সময় তাহার সঙ্গে তরল গুড়ও কড়াইয়ে আসে ; এইরূপে চিনির উপর আট দিন শেওলা রাখিলে তরল গুড় চিনির সঙ্গে মিশিয়া থাকে না এবং চিনিও অপেক্ষাকৃত সাদা হয় ; আট দিনের পর দেখা যায় যে ঝোড়ায় যে গুড়মিশ্রিত চিনি ছিল তাহার উচ্চতা চারি ইঞ্চি পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে ; এইরূপে চিনির উপর আর একবার শেওলা চাপাইয়া রাখিলে তরল গুড়ের সম্পূর্ণ অংশ বাহির হইয়া আসিবে এবং চিনিও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

চিনি ভিজা থাকে ; সেই জন্য রৌদ্রে উহা শুকাইয়া লইতে হয় ; শুষ্ক হইলে বেশ দানা দানা চিনি হয়, এক মণ গুড়ে প্রায় বার-তের সের চিনি পাওয়া যায়। এই চিনিকে 'দলুয়া' চিনি বলে। ইহা নরম ও কতকটা হলদে রঙের হয়, এই চিনি একেবারে খাঁটি হয় না, কারণ ইহার সহিত ময়লা, ধুলা, বালি প্রভৃতি মিশিয়া থাকিবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। ইহাকে বেশী দিন রাখাও যায় না।

ঝোড়া হইতে প্রথম যে গুড় ঝরিয়া পড়ে তাহাতেও চিনির দানা থাকে ; এই গুড় জ্বাল দিয়া মাটির হাঁড়িতে ঠাণ্ডা করিলে পুনরায় উহা গুড়ের মত হইয়া যায় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথায় উহা হইতে চিনি বাহির করা যায়। ইহাতে শতকরা দশ ভাগ চিনির পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু এই চিনির দানা মোটা হয়, রঙও কালচে হয়। ইহার পর যে গুড় অবশিষ্ট থাকে তাহাকে চিটা গুড় বলে।

বাঙ্গলা ব্যাকরণের কথা

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম্-এ

ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের আলোচনার ফলে বাঙ্গলা ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ বহুদূর হইলেও বাঙ্গলা বৈয়াকরণিকেরা ইহার জন্য যে ব্যাকরণ রচনা করিতেছেন, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের হোমিওপ্যাথিক মাত্রা বা ডোজ মাত্র। এই প্রচলিত ধারা সঙ্গত কিনা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, বাঙ্গলা ভাষার সন্ধির কথা আলোচনা করা যাক্। সংস্কৃতের মত বাঙ্গলায় সন্ধির প্রভাব সুদূর প্রসারী না হইলেও শুধু যে তৎসম শব্দ গঠনে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় তাহা নহে, বহু তদ্ভব শব্দ অপিনিহিতি (Epinthesis) এবং অভিশ্রুতি (Ablant)র পর সন্ধি-নিয়ম মানিয়াই গঠিত হয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় সন্ধি যে কত বিচিত্র কাণ্ড ঘটাইতে পারে তাহা লক্ষ্য না করিলে বিশ্বাস করা যায় না। "পাইল" "খাইত" প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ, সাধুরূপ। পদান্ত সন্ধি-নিয়ম মানিয়া ইহাদের সন্ধি করিলে যে রূপ পাই তাহাতে অর্থের কোনও পার্থক্য না ঘটিলেও সাধুরূপ আর পাই না—বাঙ্গলার অন্যতম স্বীকৃত রূপ চলিত ভাষা মিলে। "বসিয়া আছে, পড়িয়া আছে" প্রভৃতি শব্দে সন্ধি ঘটাইলে চলিত রূপ আর পাই না বটে, কিন্তু যাহা পাই তাহাতে অর্থের পার্থক্য আসিয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলায় সংস্কৃতের মত সন্ধি থাকিলেও তাহা একেবারে নিজস্ব নিয়ম মানিয়াই চলে।

এইবার বাঙ্গলার বিভক্তির কথা আলোচনা করি। সংস্কৃতে শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলেই তাহা পদ হয়—অর্থাৎ বাক্যে বিভক্তিযুক্ত শব্দগুলিকে যে কোনও প্রকারে সাজানো যাউক না কেন তাহারা পদ হইয়াছে বলিয়া বাক্যের অর্থ ঠিক থাকে। কিন্তু বাঙ্গলায় "মানুষ বাঘ মারে" বাক্যটি ধরা যাক্। ইহাকে বাঘ মানুষ মারে রূপে সাজাইলে যে অর্থ পাই তাহা প্রথমোক্ত বাক্যের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাজেই "মানুষ" এবং "বাঘ" শব্দে ১মা বা ২য়া বিভক্তি আছে বলিয়া বর্তমান বৈয়াকরণিকেরা যে নির্দেশ দিতেছেন, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ-নিয়মের লক্ষণাভাব হেতু একেবারে অসমীচীন।

বাঙ্গলা কারকের সম্বন্ধেও ঐরূপ অবস্থা। বাঙ্গলা বিভক্তির সংখ্যা মোটে ছয়টি ; তাহাও আবার বহুবচন বিভক্তি ধরিয়া। এই হিসাবে বাঙ্গলায় চারিটির বেশি কারক হয় না। অথচ সংস্কৃত ভাষার নিয়ম মানিয়া বাঙ্গলায়ও সাতটি কারক করা হইতেছে। এই সপ্তকারকের কল্পনা যে বাঙ্গলায় একেবারে অচল তাহা করণ-কারকের আলোচনায় বুঝা যায়। বাঙ্গলায় "দ্বারা, দিয়া ও কর্তৃক" শব্দ তিনটিকে করণ কারকের বিভক্তি হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু ইহারাই শব্দের সহিত যুক্ত হইবার সময় আবার "কে" বা "এর" প্রভৃতি দাবি করিয়া বসে। কাজেই ইহারা যে বিভক্তি নয় এবং স্বতন্ত্র পদ তাহা তাহাদের আচরণে বুঝা যায়। ইহা ছাড়া ইহাদের অর্থ এবং শক্তি যে এক নয় তাহা অন্য রূপেও ধরা পড়ে। "রামকে দিয়া এই কায করাইবে" বাক্যকে "রামের দ্বারা এই কায করাইবে" বাক্যরূপে লেখা চলে বটে, কিন্তু "রাম কর্তৃক এই কায করাইবে" রূপে লেখা চলে না। "হইতে" প্রভৃতি পদেরও ঐরূপ অর্থ এবং শক্তি পার্থক্য আছে। কাজেই অনর্থক ইহাদিগকে বিভক্তি কল্পনা করিয়া বাংলায় কারকের সংখ্যা বাড়ানো সঙ্গত নয়।

বাঙ্গলার ধাতুরূপও সংস্কৃতের মত নয়। এখানে দশ ল-কারের কোন অস্তিত্বই নাই বরং যাহা আছে তাহা অনেকটা ইংরেজীর মত। ইংরেজী হইতেও পৃথক যাহা বাঙ্গলা ধাতুরূপে মিলে তাহাও আবার অদ্ভুত রকমের, "আপনি ইহা করিয়াছেন

কি" প্রশ্নের উত্তরে যখন রাগভরে উত্তর করি—"হাঁ করে থাকব" তখন ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ দিয়াই অতীত অর্থ প্রকাশ করি। এই প্রকার রূপ একমাত্র আরবি ভাষার "মাযি এহেতে্ম্ আদি" রূপেই মিলে। ইহা ছাড়া বাঙ্গলায় ইংরেজীর মত প্রায় সব Mood (মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয়ের সংজ্ঞানুসারে—ধরণ) পাই, কিন্তু ইংরেজী সংযুক্ত ধরণ (Subjunctive Mood) বাক্যের প্রধান ও অপ্রধান অংশের যেরূপ উল্‌ট-পাল্‌ট চলে, বাঙ্গলায় ঐরূপ—যথা: "তবে ক্ষমা করি যদি পরিচয় দাও"—চলে না। কাজেই বাঙ্গলা ভাষার যে ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষার নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র নিয়ম আছে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

বাঙ্গলা কৃৎ তদ্ধিতেও সংস্কৃত হইতে পৃথক নিয়ম দেখিতে পাই। সংস্কৃত কৃৎ প্রকরণেই স্বরের গুণ বৃদ্ধি উভয়ই চলে; তদ্ধিতে কেবলমাত্র বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। বাঙ্গলায় সংস্কৃতের নিয়ম ছাড়া তদ্ধিতেও স্বরের গুণ দেখা যায়। "নুন" শব্দের উত্তর "তা" প্রত্যয়ে "নোন্‌তা" পদ অনাদ্য স্বরের গুণ হইয়াই ঘটে। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত মিলে। আবার বাঙ্গলা "আইৎ" প্রভৃতি প্রত্যয় ধাতু বা প্রাতিপদিক উভয়ের উপরই প্রযুক্ত হয়, যথা:—ডাকাইৎ, খণ্ডাইৎ ঢালাইৎ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া "তুল, পলা" প্রভৃতি শব্দে ধাতু এবং প্রাতিপদিক উভয় অর্থই মিলে। অতএব বাঙ্গলায় কৃৎ এবং তদ্ধিত এই বিভাগ না রাখিলেও চলে। তবে সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন আর্য ভাষাগুলির এই অভিনব শব্দগঠন-প্রণালী, ভাষা-বিজ্ঞানে অভিনব দান বলিয়া এই শব্দগঠন নিয়মশৃঙ্খলে সম্পূর্ণ বদ্ধ সংস্কৃতের প্রতি সম্মান রক্ষার জন্য ইহা স্বীকার করা চলিতে পারে।

বাঙ্গলা সমাসেও সংস্কৃত সমাস-নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। সংস্কৃতে একই শব্দদ্বয়ের—তৎপুরুষ বা অলুক সমাসে, অর্থের বৈষম্য আসিতে পারে না। বাঙ্গলায় যে সেরূপ আসে তাহা "মামাবাড়ী" এবং "মামার বাড়ী" পদ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়। মায়ের কোন ভাই কস্মিনকালে না জন্মিলেও "মামাবাড়ী" থাকিতে পারে কিন্তু কাহারও "মামার বাড়ী" থাকিতে হইলে মামার অস্তিত্ব আবশ্যক করে।

সবদিক লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা ব্যাকরণকে স্বীয় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো উচিত কিনা সুধীগণের বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার এই সৌভাগ্য হইবে কিনা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

যুদ্ধ ও আধুনিক কাব্যের গতি

শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল

যুদ্ধকালীন চতুর্দ্দিকের বিপর্য্যয়ের মধ্যে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাবে যে, পুস্তকের চাহিদা খুব বেড়ে চলেছে। কাগজের সঙ্কটের জন্য অনেক প্রকাশক ভাল পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়েও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য প্রকাশ করতে পারছেন না। তবুও সাম্প্রতিক কালে বিস্ময়কর ভাবে অনেক বই বেরুচ্ছে এবং তাদের প্রচারেরও আজ বিরাম নেই। এর একমাত্র কারণ এ নয় যে মন্বন্তরেব চাপে মানুষের মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বলেই তারা সাহিত্যের মধ্যে শান্তি ও জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষের মন সত্যই আজ জ্ঞানপিপাসু হয়েছে। যুদ্ধপূর্ব মানুষের চেয়ে যুদ্ধকালীন মানুষ রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক সংবাদ, তার গতি ও সম্ভাব্য পরিণতির ইতিহাস জানবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছে। উপরন্তু সুদীর্ঘ কালস্থায়ী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে সমাজ-জীবনে এসেছে এক নৈরাশ্যজনক প্রতিক্রিয়ার ভাব। আমাদের দেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে দেখেছি যে, পুরনো ফিউডাল যুগের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গঠিত সমাজ এক প্রচণ্ড সংঘাতে ভেঙে পড়েছে। "মূক য়ারা দুঃখে সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে"—তাদের নিপীড়ন এই মন্বন্তরে ভয়াবহ সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী (প্রালীরিয়াট বুর্জোয়া) যারা বাঙালী-সমাজ ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে তারা আজ নিঃশেষপ্রায়। এই মন্বন্তরের ফলে সমাজের উচ্চস্তরের সঙ্গে এদের বিচ্ছেদ আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই আজ পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতের পটভূমিকায় যখন জীবনকে উপস্থাপিত করি তখন সংশয় ও অনিশ্চয়তা বেড়ে ওঠে। কবে ও কোথায় যাত্রা শেষ? মাতার অশ্রুধারা ও বীরের রক্তস্রোতে স্বর্গ কি জয় করা যাবে না? নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলতে বিলম্ব কত আর? শোণিতস্নাত ধরিত্রী যুদ্ধোত্তর যুগে কোন্ রূপ পরিগ্রহ করে দেখা দেবে? পারিপার্শ্বিকের অভিজ্ঞতা কোন সম্ভাব্য মঙ্গলজনক অবস্থার সঙ্গে মনকে মেলাতে পারে না। পুনর্ব্বার নৈরাশ্য নেমে আসে।

Between the idea
And the reality
Between the motion
And the Act
Falls the shadow.

সুগভীর জীবন-মরণের প্রশ্ন বারংবার মনকে আন্দোলিত করে বলেই স্বভাবত মন সাহিত্যের মধ্যে সংশয়ের সমাধান খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সেখানেও দেখি অনুরূপ জীবন-জিজ্ঞাসা। ইতিহাসের অনিবার্য্য প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকরা অনেকেই আজ অভিভূত হয়ে পড়েছেন। পুরনো পৃথিবী, তার বিশ্বাস ও নীতি, প্রচণ্ড বিপর্য্যয়ে ভেঙে পড়েছে—সম্মুখে বেয়ে চলেছে ইতিহাসের সম্মুখগামী খরস্রোত। হয় তার দুর্ব্বার গতির সঙ্গে চলতে হয়, না হয় সরে দাঁড়াতে হয়; তাকে রোধ করবার শক্তি কারও নেই। এই শক্তিকে উপলব্ধি করে ডব্‌লু. এইচ. অডেন বলেছেন—

All away forward on the dangerous
Flood of history, that never sleeps or dies.
And held one moment burns the hand.
(To a writer on the birthday)

ইতিহাসের চলমান গতির প্রতিক্রিয়ায় যাঁরা আদর্শবাদী অর্থাৎ যাঁরা পুরাতন পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সৃষ্ট সমাজ,

তার নীতি ও ঐতিহ্যকে পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁরা সাহিত্যে নেতিবাচক আদর্শকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। নেতিবাচক আদর্শ এই জন্য আমরা বলছি যে, এই আদর্শ নূতন জীবনবাদকে পরিহার করে বিলুপ্তপ্রায় যুগের অবসন্ন আদর্শ-বাদকে পুনর্জ্জীবিত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। নেতিবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে টি. এস. এলিয়টের নাম উল্লেখযোগ্য। য়ুরোপীয় সমাজের ধ্বংসোন্মুখ রূপ দেখে কবি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েছেন। এই সমাজ যাতে করে পুনর্ব্বার সজীব হয়ে উঠতে পারে এবং পরিশেষে সাহিত্য সেই সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের সৌন্দর্য্যময় ও প্রাণময় চিত্ররূপ হতে পারে তার জন্য তিনি বলেছেন যে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্য তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। সাহিত্যের পক্ষে অতীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন অপরিহার্য্য। অতীতের প্রাণ-প্রাচুর্য্যই একমাত্র বর্ত্তমানের সাহিত্যকে প্রাণময় করে তুলতে পারে। *After Strange Gods* নামক গ্রন্থে এলিয়ট আরো বিশদরূপে বলেছেন যে অতীতের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সাহিত্যে বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়। প্রথমত উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং দ্বিতীয়ত সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন সীমা মেনে না চলার দুঃসাহসিকতা দেখা দেয়। তারই ফলে যাঁরা দুর্ব্বার ও অগ্রগামী তাঁরা প্রত্যেকেই জীবন সম্বন্ধে স্ব-স্ব মতবাদ সৃষ্টি করে চলেন। আর যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাঁরা উগ্রভাবে পূর্ব্ব জীবনবাদকে পরিহার করে শিষ্যদের মানসিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি ডি. এইচ. লরেন্স ও জেম্‌স জয়েসের কথা বলেছেন। লরেন্স স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী; তিনি কোন প্রতিষ্ঠিত নীতিবোধ স্বীকার করেন না, আধ্যাত্মিক সংঘাত বা অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁর মধ্যে নেই। এক কথায় তিনি ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অভি-জ্ঞতার মধ্যে নূতন জীবনবাদকে উপলব্ধি করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। জেম্‌স জয়েসের মধ্যে খ্রীষ্টিয় নীতিবোধ থাকলেও তিনি দুঃসাহসিকতায় সাহিত্যের প্রচলিত সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। জর্জ্জ এলিয়টের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রশংসা করলেও, টি. এস্‌. এলিয়ট তাঁর স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মী মনকে নিন্দা করেছেন। সুতরাং এলিয়টের মত এই যে, স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মী হলে সাহিত্য আদর্শবিচ্যুত হয়ে অকল্যাণের হেতু হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কোন সাহিত্যিকের পক্ষে পুরাতন পথকে পরিহার করে নূতন পথের সন্ধান করা সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অশুভজনক। তাই তাঁর মত এই যে, ঐতিহ্য ও সনাতন রীতিনীতি মানতে পারলেই আমরা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ-জীবনকে অটুট রাখতে পারব এবং তাকে রাখবার উপায় চার্চের পরিচালনা গ্রহণ করা। মানুষকে বাঁচাতে হলে একমাত্র 'ট্রাডিশনাল লাইফ' গ্রহণ করা ছাড়া আর পথ নেই। আধুনিকদের সঙ্গে এলিয়টের বিরোধ এইখানে যে, তিনি ইতিহাসের ও অর্থনৈতিক প্রবাহকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে এক যুগের আদর্শ অন্য যুগে সৃষ্টিমূলক থাকে না; নূতন যুগ নূতনতর সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে। চার্চকে আশ্রয় করে গোষ্ঠী-জীবনের পরিকল্পনা আজ ব্যর্থ হবে, কারণ চার্চের নৈতিক তথা কার্য্যকরী শক্তিকে ধনতান্ত্রিক সমাজ বিনষ্ট করেছে। যে ব্যক্তিধর্ম্মী মন বা প্রবাহকে এলিয়ট নিন্দা করেছেন তা

ধনতন্ত্রের Laissez Faire নীতি থেকে উদ্ভূত। ধনতান্ত্রিক এই অর্থনীতি ফ্যাসিজমের 'সমগ্র রাষ্ট্রে'র (Totalitarian State) আইডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজ ও চার্চের ভিত্তিকে শিথিল করে দিয়েছে। সুতরাং ইতিহাসের ইঙ্গিত আজ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে বলিষ্ঠতর সমাজ-জীবন গঠন করা। এখানে গোষ্ঠীজীবনকে ব্যক্তিমন পরিপুষ্ট করে তুলবে।

সাম্প্রতিক কালে সাহিত্য-জগতে হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুর বদল হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থ-সঙ্কটের সময় থেকে ইংরেজ কবিরা সচেতন হয়ে উঠলেন তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে। হিউ ম্যাকাডিয়ারমিড ও পরে সিসিল ডে ল্যুইস প্রধানত এই দিকে লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে মার্কসীয় পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যে জীবন ও জগৎকে বিচার করবার সময় এসেছে। বিলীয়মান সমাজের ধ্বংসোন্মুখ কাহিনী কাব্যে যেমন স্থান লাভ করবে তেমনি বলিষ্ঠতর সমাজ-ব্যবস্থারও কল্পনা কবির কাব্যে স্পন্দিত হয়ে উঠবে। 'কাব্যের আশা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ল্যুইস আরও বলেছেন যে শুধু মাত্র ভাবের বাহক রাজনীতিক কিংবা অর্থনীতিক কাব্য হবে না। কল্পনা ও আবেগের দ্বারা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে তুলতে হবে ভাবকে। 'রচনার বিপ্লব' গ্রন্থে এ কথাটি আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণীয়,—'কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর ভাষায় রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।' ষ্টিফেন স্পেণ্ডার 'দি পোয়েট এ্যাণ্ড লাইফ'এ বলেছেন যে জীবন চাইছে বিচিত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করতে। এই প্রকাশই বড় কথা। কবিতায় যে একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের কথা থাকবে তার অর্থ নেই; জীবনের কোন বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তা রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে। উপরে উদ্ধৃত মতগুলিকে অবলম্বন করে যদি সাম্প্রতিক কালের বাংলা কাব্য বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে নূতন স্বাক্ষরকারীর দল শুধু সমাজ বা রাষ্ট্র-জীবনের বিকৃতিকে উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন বা তাকে বিদ্রূপ করেছেন কিন্তু এই নেগেটিভ দিক ছাড়া আগতপ্রায় যুগের বলিষ্ঠতর জীবনযাত্রার কোন রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। আধুনিক যুগের কাব্য দাঁড়াতে চাইছে আপন সুনিশ্চিত স্বকীয়তা নিয়ে, ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্যারেক্টার।' আর্টের কাজ যদিও এ যুগে লালিত্য নয়, যথার্থ—তবুও বাংলা কাব্যে সেটা রূপায়িত হয়ে ওঠে নি। স্পেণ্ডার প্রকাশের উপরে জোর দিয়েছেন। তিনি একথা বলতে চেয়েছেন যে এ যুগের কাব্য স্বীকার করবে সমগ্রতার আত্ম-ঘোষণাকে অর্থাৎ কোন বস্তুর সত্তার সমগ্র রূপসৃষ্টিকে। এই রূপকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন নিরাসক্ত দৃষ্টি, বিশ্বকে তদ্গত করে দেখবার চেষ্টা, সাধনা। বাংলা কাব্যে যেটা দৃষ্টিগোচর হয়, সেটা এলিয়টের মত বিশ্বকে বিদ্রূপ করবার চেষ্টা, যেটা নির্বিকার মনের পরিচয় নয় এবং সেজন্য কবিতায়, পৃথিবীকে দেখবার ভঙ্গী তির্য্যক।

I am moved by fancies that are cured
Around these images and cling.

এই যে ভঙ্গী একে জীবন-সাধনা না বলে মৃত্যু-আরাধনা বলা চলতে পারে। স্পেণ্ডার বা ডে ল্যুইসের মত আধুনিক

বাংলা কাব্যে বর্ত্তমান জীবন-ব্যবস্থার জন্ম কোন বেদনা নেই বা ভবিষ্যতের যৌথ জীবনের কোন আবেগমূলক স্বীকৃতি নেই। বিতৃষ্ণা বা বিদ্রূপের ফলে জীবনের প্রতি বলিষ্ঠ অনুরাগ কোথাও প্রকাশ পায় নি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের কবিরা, এমন কি সাম্যবাদীরাও অতিমাত্রায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী। এরই ফলে যৌথ জীবনপ্রবাহের সুসম্বদ্ধ রূপ কোথাও সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয় নি। জীবনের কাছে এ পরাজয় শোকাবহ। এ প্রসঙ্গে অডেনের কাব্যও লক্ষণীয়। তিনি স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে গোষ্ঠীজীবনকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা, সেখানে তিনি পশ্চাৎপদ হয়েছেন। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েও তিনি বারংবার প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছেন। মনের এই সংঘাত তাঁর কাব্যে এক সূক্ষ্ম বেদনার জাল বুনে দিয়েছে। অডেন বর্ত্তমান জীবনযাত্রার ক্ষয়িষ্ণু রূপকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন :

Fear builds ranges casting shadows
Heavy bird—silencing, upon the outer world,
Hills that our grief sighs over like a Shelley parting
All that we feel from all that we perceive
Desire from Data. (*Journey to a war*)

বর্ত্তমান সভ্যতা আজ দেউলে হয়ে গিয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আজ সমাজে অপ্রতিহত রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে 'terror like a frost shall halt the flow of thinking' কিন্তু জীবন, সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সঙ্ঘশক্তির।

Now in the clutch of crisis and the bloody hour
You must defeat enemies or perish but remember
Only by those who reverence it can life be mastered.

জীবনকে যারা শ্রদ্ধা করতে পারবে তাদেরকে নিয়ে গড়তে হবে প্রতিরোধের সঙ্ঘ। শেষ পর্য্যন্ত কবি নিজেই পশ্চাৎপদ হলেন। 'নিউ ইয়ার লেটার' নামক সাম্প্রতিক কাব্যে লিখেছেন :

The ego is bewildered and does not want
A shining novelty this morning
And does not like the noise of the people
(*New Year letter*)

শেষ ছত্রের এই স্বীকৃতি বিস্ময়কর। জীবনের কাছে কবির পরাজয়ও খুব শোকাবহ। শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমেরিকায় গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা যাবে স্পেণ্ডার বা ডে ল্যুইসের আদর্শ স্থির, কবি-মানস সুস্পষ্ট।

The red advance of life
Contracts pride, calls out the common blood
Beats song into a single blade
Makes a depth-charge of grief.
More then with new desires
For where we used to build and love
Is no man's land and only ghosts can live
Between two fires (*The Conflict*)

স্পেণ্ডার বা ডে ল্যুইসকে প্রকৃত উপলব্ধি করতে হলে আমাদের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে শহরে স্থাপিত হল বড় বড় কারখানা। ধনবাদ জীবনে প্রধান হয়ে উঠল। এর আভাস আমরা ওয়ার্ডস্-

ওয়ার্দের কাব্যে পেয়েছি। কিন্তু Laissez faire নীতির ফলে ধনতন্ত্র সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইতিমধ্যে শহরে লোক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল; নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল মানুষের সঙ্গে বাজারের।

গত মহাযুদ্ধে সমাজের শেষ প্রীতির চিহ্নটুকু ছিন্ন করল। সাম্প্রতিক কালের কবির দায়িত্ব হ'ল ঐ মানব-গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা ও অপরিহার্য্য শেষ শ্রেণী-সংগ্রামকে সাহায্য করা যাতে নূতন পৃথিবী স্থাপিত হতে পারে। নূতন যুগের এই ট্রাডিশনকে গ্রহণ করা ছাড়া আর পথ নেই। ডে ল্যুইস পূর্ব্বোদ্ধৃত এলিয়টের কথার উত্তর দিয়ে বলেছেন যে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে নিজেকে অঙ্গীভূত করা আধুনিক মানুষের একমাত্র পথ। কবিরও পথ-নির্দ্দেশ এইখানেই মিলবে।

এই যুদ্ধে ইংরেজী কবিতায় নূতন কবিদের সন্ধান মেলে। এই কবিরা সকলেই যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁদের কবিতা সমৃদ্ধ। পূর্ব্ব যুগের যুদ্ধকালীন সৈনিক কবিদের মত যথা উইলফ্রেড ওয়েন, স্যাসুন বা রুকের মত এঁদের কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জ্বল না হলেও তাঁদের কবিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর মনকে স্পর্শ করে। এঁদের মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে এ্যালুন লুইসের বিমান-দুর্ঘটনায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে। জন পাডনি আজও জীবিত আছেন। পশ্চিম আফ্রিকা, মাল্টা, আলজিয়ার্সে তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি সুন্দর প্রকাশ করেছেন। '৪৮ ঘণ্টা ছুটি' নামক কবিতায় সুন্দর ভাবে তিনি গৃহের ও বাইরের শান্ত আবেষ্টনীকে এঁকেছেন:

With sudden ease.
And mozart played at night,
Lamplight leaflost in the trees
I am aware
How man must pay with love.

'Dead Airmen' নামক কবিতায় তিনি বিদ্রূপ করেছেন যে, মূঢ় দেশবাসী—যারা তাদের জন্য প্রাণ দিলে, তাদের সম্মান করতে পারে না। বিপর্য্যয়ের মধ্যে থেকে তারা চিন্তা করে জিনিষপত্রের দাম ও ইনসুর‍্যান্স করবার প্রয়োজনীয়তার কথা। দুঃখ করে তাই বলেছেন:

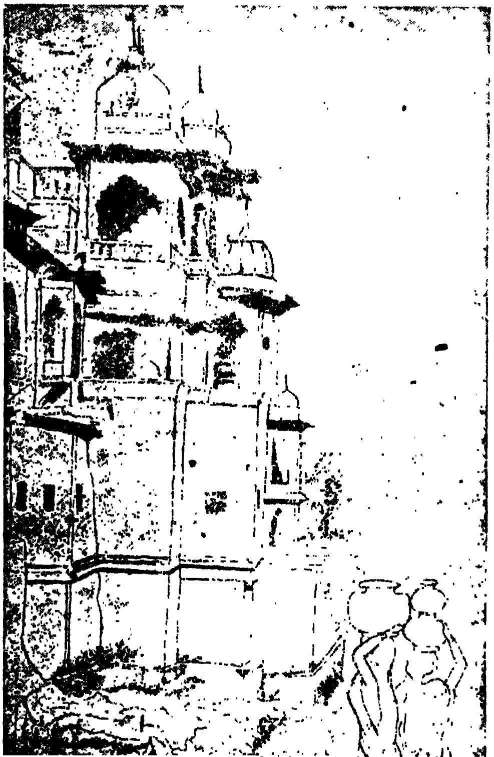
So Honour may be said
To be the decent shroud to serve the dead!

যুদ্ধশেষে আশা করা যায় যে যুদ্ধকালীন যুগের কবিরা সৌন্দর্য্যময় কাব্য সৃষ্টি করবেন। বাংলা কবিতা সম্বন্ধে স্থির করে কিছু বলা মুশকিল। তবে আশা করা যায় যে পঞ্চাশের মন্বন্তরে যখন মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবন ভেঙে পড়েছে, জমিহীন কৃষকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, চতুর্দ্দিকে মৃত্যু, হাহাকার ও রোগের প্রাবল্য, মজুতদারের প্রচণ্ড লোভ, আর সাম্যবাদের আইডিয়াও ছড়িয়ে পড়েছে, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে আশার কথা নিরর্থক নয়।

একজন অন্তরীণের চিত্র-চর্চ্চা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক সময় দেখা যায় যে গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের কোলেও রূপালী রেখার ঝিলিক্ কালো ছায়ার বুকে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। কারাবাস সব সময়েই নিছক প্রাণান্তকারী বা আত্মঘাতী দুর্ঘটনা নহে। মানুষের সাধারণ জীবনের



সরোবরের তীরে

শারীরিক যাতায়াতের স্বাধীনতা রুদ্ধ করলে আত্মার স্বাধীনতা অনেক সময়ে সচেতন হয়ে ওঠে। অনেক সময়ে সাধারণ মানুষকে অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য যে প্রাণান্তকর ছুটোছুটি করতে হয় তার ফলে অনেকের মনুষ্যত্ব-চর্চ্চার সময় ও সুযোগ মেলে না। হাঁড়ি চড়িয়ে গৃহস্থালীর আগুন জ্বালাবার কয়লার জন্য ছুটোছুটি করতে গিয়ে অনেক 'কর্ত্তা'র প্রতিভার আগুন নিভে যায়। অনেকে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে যদি ন'টার মধ্যে খেয়ে আপিসের দিকে ছুটতে হ'ত, তাহলে তাঁর কবি-প্রতিভা কখনও ফুটে উঠত কিনা সন্দেহ। এই ছুটো-ছুটির পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়ে দেহের স্বাধীনতা হরণ করলে অনেক সময় অনেক মানুষের মনের মুক্তিলাভ হয়। এক দিকের ক্ষতি অন্য দিকে পূর্ণ হয়ে ওঠে। জবাহরলাল নেহ্রুর কারাবাস তাঁহার সাহিত্য-জীবনকে কারামুক্ত করেছিল। ইংরেজী গদ্য-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা "দি প্রফান্দিস্" কারাবাসের রুদ্ধ গৃহের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প-প্রতিভা অন্তরীণের



ঝড়ের পাখী



প্রতিহিংসা



একটি গাছ

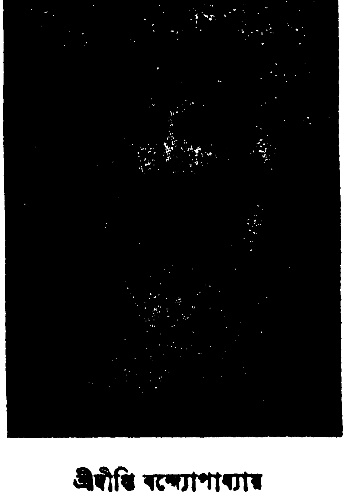
অবরোধ-শালার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। একথা বলবার উদ্দেশ্য এ নয় যে, প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক বা শিল্পীকেই তাঁদের প্রতিভার প্রসারের সুযোগের জন্য কারাবরণ করতেই হবে। কারাবাসের দুঃখ যতই অসহনীয় হউক, অনেকটা অফুরন্ত ও কৃত্রিম অবসরের সৃষ্টি করে কারাবাস অনেকের মানসিক বিচরণের পথ মুক্ত করে দেয়। এই অবসর ও মুক্তি সকল সময়ে শিল্প-সৃষ্টির ভাণ্ডার ভরপুর করে তোলে কিনা জানি না। কখনও কখনও এই অন্তরীণের অবসর সুফল প্রসব করে তার প্রমাণ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।

যে অন্তরীণের "ভ্রমণকারী" মন আছে—"ভ্রমণ করার তীর্থ তার আপন ঘরের কোণ"। এই আপন ঘরের কোণে বসে একজন অন্তরীণ তার খাতার পাতা অনেকগুলি চিত্র লিখে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। এই চিত্রমালার কয়েকটি চয়নিকা, অন্তরীণের অন্তরের কথা, অনেক পাঠকের অন্তরে, অনেকের কারাবিহীন অবরুদ্ধ অন্তরে মুক্তির স্বাদ এনে দেবে। ছবিগুলির প্রায় সবগুলিই সাদা কাগজের উপর কালো রেখার আঁচড়ে লেখা। "অসীম সাদায় কালো যবে পড়ে সৃষ্টি-সীমায় বাঁধা, তখন তো সেই কালোর রূপেই আপনাকে পায় সাদা"।

দেশ-বিদেশের কথা

গীতশ্রী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গীতশ্রী উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন। হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্ ও অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্রের জনপ্রিয় শিল্পী হিসাবে ইতিপূর্ব্বেই শ্রীমতী দীপ্তি আধুনিক বাউল ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেও শিক্ষা ও সাফল্যলাভ করিয়া তিনি গীতশ্রী হইলেন। ইনি এখন সঙ্গীতাচার্য্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিক্ষাধীনে আছেন। শ্রীমতী দীপ্তি ভবানীপুরের অজিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা এবং কলিকাতা পুলিসের শ্রীযুক্ত শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী।



শ্রীদীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ (পূর্ব্ব নাম দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল সরকারী চিকিৎসা-বিভাগে কর্ম্ম করিবার পর তিনি চিকিৎসাব্যবসায়ী রূপে কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। গরীবদের তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী। তিনি বেলেঘাটায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং দরিদ্রদের শিক্ষাদান কল্পে হরনাথ ফ্রি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত তৎকর্তৃক বাংলা এবং উড়িষ্যায় কয়েকটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হরিদ্বারের স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের বন্যার সময় দুর্গতদের দুঃখমোচন কল্পে তিনি প্রভূত চেষ্টা করেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা কল্পে যে আয়োজন হইতেছে তাহার জন্য অন্ততঃ এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। টাকা-পয়সা সচ্চিদানন্দ স্মৃতি-সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ৭৭, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড—ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

পুস্তক-পরিচয়

কালিদাসের মেঘদূত—মূল, অনুবাদ, অন্বয় সহ ব্যাখ্যা ও টীকা—শ্রীরাজশেখর বসু। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কালিদাস জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। শ্রেষ্ঠ কাব্য চিরদিন আনন্দ বিধান করে। যুগে যুগে তাহা মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। কবে কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে কবি মেঘদূত লিখিয়াছিলেন, সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া সে সুরের রেশ ভারতবর্ষের অন্তরে নব নব রূপে ধ্বনিত হইতেছে। একদা সংস্কৃত ছিল সাহিত্যের সর্ব্বভারতীয় ভাষা। লোকের পক্ষে প্রদেশের বিভেদে সাহিত্যরসোপলব্ধির বাধা জন্মিত না। এখন অনুবাদের সাহায্যে কাব্য উপভোগ করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের অনেক কবিই মেঘদূত অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা ও আলোচনা ছাড়িয়া দিলে সবগুলিই কাব্যানুবাদ। সুকবির কাব্যের সহিত তাহার ব্যক্তিত্ব জড়াইয়া থাকে। দেশ-কালের ব্যবধানের কথা না-ই ধরিলাম, ভাষান্তরে ভিন্ন-কলেবর ধারণ করিয়া কাব্যানুবাদ মূলের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। অনুবাদের মধ্য দিয়া ভাবের পরিচয় দেওয়া যায়, রূপের নয়। অথচ সকলেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের রস ও রূপ উপভোগ করিতে চায়। মূল কাব্য উপভোগ করিতেও টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন হইত। কালিদাসকে বুঝিতে মল্লিনাথের সাহায্য ছিল অপরিহার্য্য। মল্লিনাথ সংস্কৃতে লিখিয়াছেন। সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা 'পরশুরাম' শ্রীরাজশেখর বসু রসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বাংলায় মল্লিনাথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদ পাঠে মূল কাব্যের পরিচয় গ্রহণ করিবার যে ইচ্ছা পাঠকের মনে উদ্রিক্ত হয় তাহা পূর্ণ করিতে রাজশেখর বাবু উদ্যোগী। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, "কালিদাস ঠিক কি লিখেছেন জানতে হ'লে তাঁর নিজের রচনাই পড়তে হয়। যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না অথচ মূল রচনার রস গ্রহণের জন্য একটু পরিশ্রম করতে প্রস্তুত আছেন তাঁদের জন্যই এই পুস্তক লিখিত হ'ল। এতে প্রথমে মূল শ্লোক তার পর যথাসম্ভব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এরূপ অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেজন্য পুনর্ব্বার অন্বয়ের সঙ্গে যথাযথ অনুবাদ এবং প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হয়েছে। আশা করি এই দুই প্রকার অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও মূল শ্লোক বুঝতে পারবেন।" আমরাও সেই আশা করিতেছি। রাজশেখর বাবুর পরিচয় রস-রচনার মধ্যেই নিহিত নয়, তিনি শব্দার্থবিৎ। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃতে রচিত জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত বাঙালী পাঠকের সুষ্ঠু পরিচয় সাধন করিবার ভার গ্রহণ তাঁহারই উপযুক্ত কার্য্য। টীকায় পাঠকের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে এবং স্বচ্ছন্দ, প্রাঞ্জল ও যথাসম্ভব মূলানুযায়ী অনুবাদ তাহার তৃপ্তি বিধান করিবে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : (৪৬) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪৭) নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য প্রত্যেকখানি ছয় আনা।

সাহিত্য-পরিষৎ পূর্ব্বে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি কাব্য-সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন, এখানি চরিতগ্রন্থ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, মৃত্যু ১ ৭ খ্রীষ্টাব্দে। অগ্রজের খ্যাতি লাভ না করিলেও হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাত   নচন্দ্রের কবিত্বশক্তি অপ্রচুর ছিল না। তখনকার শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্রসমূহে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। 'চিত্তমুকুর,' 'বাসন্তী," 'যোগেশ', 'চিন্তা' প্রভৃতি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। 'অনন্ত,'

'দেবী তীর্থ,' 'কবিতাবলী' প্রভৃতি অপ্রকাশিত রচনারও সন্ধান পাওয়া যায়। ১৩০০ সালে হুগলি বাঁশবেড়িয়া হইতে ঈশানচন্দ্র 'পূর্ণিমা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন। 'পূর্ণিমা'র ঈশানচন্দ্রের অনেকগুলি গদ্য-পদ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। ঈশানচন্দ্রের সকল কাব্যের মধ্যে একটি বেদনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই বেদনার প্রকাশই তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

নবীনচন্দ্র দাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত আলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিব্বত-প্রত্যাগত শরচ্চন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, ১৯১৪ সালে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। 'রঘুবংশ,' 'কিরাতার্জ্জুন', 'চারুচর্য্যাশতক' প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্যের তিনি অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে 'রঘুবংশে'র পদ্যানুবাদ যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মৌলিক কবিতা রচনার শক্তিও তাঁহার অল্প ছিল না। 'আকাশকুসুম কাব্য' তাহার প্রমাণ। কুপার, গ্রে, বায়রণ প্রভৃতি ইংরেজ কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ তাঁহার 'শোকগীতি' নামক কাব্যে প্রকাশিত হয়। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গের নিকট তিনি কবিগুণাকর উপাধি লাভ করেন। তিনি মাসিক 'বিভাকর' ও ত্রৈমাসিক 'প্রভাত' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করেন। কাব্যানুবাদে তাঁহার কৃতিত্ব নিতান্ত সাধারণ ছিল না।

"তব রক্তাধরনিভ প্রবাল উপরে
পড়িছে তরঙ্গাঘাতে শ্বেত শঙ্খকুল,
প্রবাল-কণ্টক মুখে ফুটিয়া আকুল,
ক্লেশে মুক্ত হয়ে শঙ্খ পলাইছে ধীরে।"

সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্যের অনুবাদ করিয়া নবীনচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

যুক্তধারা—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য। ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৪৷৷০ টাকা, পৃ. ৩৪৮।

উপন্যাসটির মূল উপজীব্য প্রেম-কাহিনী। সমাজবন্ধন—লৌকিক প্রথা প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া নিকষিত হেম-জাতীয় এই ভালবাসা দু'টি অন্তরে অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং দেহ-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সার্থকতার সন্ধান করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের পরকীয়া প্রেমের সঙ্গে ইহার তুলনা অবশ্য চলে না। তবু—রোমান্স-প্রবণতা সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর দাঁড় করাইয়া লেখক ইহার মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। লিপিকুশলতার গুণে অমরনাথ ও মীরার আনন্দ ও বেদনা মনকে স্পর্শ করে। বর্ম্মা সীমান্তের অভিযান-কাহিনীতে বাস্তব-স্পর্শ আছে। ছোটখাটো পার্শ্বচরিত্র সব কয়টিই মূল কাহিনীর সঙ্গে সজীবতা লাভ করিয়াছে। উপন্যাসখানি সুদীর্ঘ হইলেও সুখপাঠ্য।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমিকের অবস্থা—য়ুর্গেন কুক্‌জিন্‌স্কি। অনুবাদক,—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার গুহ, ইণ্টার ন্যাশনাল পাবলিসিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৬। মূল্য ১৷০।

বেতন, কাজের সময়, উৎপাদন ও কাজের চাপ, দুর্ঘটনা, মজুরের গতিবিধি, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য, সামাজিক বীমা, আপেক্ষিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, স্বত্ব স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা দিক দিয়া তিন দেশের শ্রমিকের অবস্থা আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের সরকারী বিবরণী হইতে তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে ও সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পরিসংখ্যান নির্ভুল শাস্ত্র নহে, এবং ইহার সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় তাহাও বড়জোর মোটামুটি ঠিক অর্থাৎ পরিসংখ্যান যতটা নির্ভুল ততটা নির্ভুল। তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে জার্ম্মান-শ্রমিকের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ, ইংলণ্ডের শ্রমিক কিছু ভাল। সোভিয়েট শ্রমিক ইহাদের উভয়ের অপেক্ষাই অল্পদিনের মধ্যে অনেক উন্নত হইয়াছে। শ্রমিক রাষ্ট্রে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ পরিসংখ্যান তথ্য-বহুল অনুবাদ-পুস্তক বাঙ্গালী শ্রমিক কর্ম্মী মহলে আদৃত হইবে আশা করা যায়। অনুবাদের ভাষা সরল ও পুস্তকের ছাপা ভাল।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

নিঃসঙ্গ—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। কমলা পাবলিশিং হাউস, ৮।১ এ, হরিপাল লেন, কলিকাতা। পৃ. ৩০৯। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকের এই উপন্যাসখানি গতানুগতিক উপন্যাস হইতে ভিন্নধর্ম্মী,—স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল। পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া কাহিনী বর্ণনা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে,—নিঃসঙ্গ মানবাত্মার চিরন্তন বেদনাই ইহার মূল প্রতিপাদ্য। উপন্যাসের সুরু হইতেই দেখি, বাহিরের দিক দিয়া নায়ক সলিলের কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, একক। পত্নী শুভ্রা অপূর্ব্ব সুন্দরী, সেবা-পরায়ণা আদর্শ গৃহিণী, কিন্তু সে যেন প্রাণহীন পাষাণ-প্রতিমা। সলিলের আবেগোচ্ছ্বসিত উদ্দাম ভালবাসা সেই পাষাণে প্রতিহত হইয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে। জীবনের চলার পথে সত্যপ্রকাশ-সুচারু, সুকোমল-মণিকা এমন কি পয়োধি-আভা পর্য্যন্ত, এই কয়টি দম্পতির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া তাহার মনে হইল যে, ইহারা সকলেই পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া পরিতৃপ্ত। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যেও একাকিত্বের সেই তীব্র বেদনাময় অনুভূতি স্বপ্নে ও জাগরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল সলিলের সমস্ত সত্তাকে। ঐশ্বর্য্যের জঞ্জাল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উপন্যাসের উপসংহারটি অপূর্ব্ব। এই নিঃসঙ্গতাবোধসঞ্জাত নিরাসক্তি যে মানুষকে কত বড় আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তাহাই পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে সলিলের বস্তুপুঞ্জের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আন্তরিক আগ্রহে আর সত্যপ্রকাশের সর্ব্বস্বত্যাগে। গান শেষ হইলে পরও যেমন তাহার রেশ থামে না, তেমনি উপন্যাসখানা শেষ করিবার পরও যেন মনের ভিতর বৈরাগ্যের উদাস-করুণ রাগিণী বাজিতে থাকে।

এই ভাবৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধ উপন্যাস রচনায় রামপদ বাবুর নিপুণ লেখনী সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

পঞ্চ প্রদীপ—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

পুস্তকখানিতে অশোক, হজরৎ ওমর, কালিদাস, হারুন-অর-রশীদ, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান; বিভিন্ন দেশ এবং জাতির এই পাঁচ জন মহাপুরুষের পুণ্যচরিতকথা বালকবালিকাদের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শিশু-পাঠ্য জীবন-কাহিনী রচনায় লেখকের সুনাম আছে। সরস ভঙ্গীতে লেখা এই পুস্তকখানিও তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

এ যুগের বিস্ময়— শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১০৬। মূল্য এক টাকা চার আনা।

নৃপেন্দ্র বাবু শিশু-সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও তিনি তাঁহার প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতা এবং সাবলীলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পুস্তকখানিতে বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নতির মূল কারণ বৈদ্যুতিক ও বাষ্পশক্তি, মুদ্রাযন্ত্র, আকাশযান, বেতার প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বর্ম্মার মামা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ১৫২। মূল্য ১।০।

শিশির ও তাহার বোন লিলি বর্ম্মার মামার বাড়ী গিয়া যে-সকল দুঃসাহসিক কীর্ত্তিকলাপ করিয়াছিল তাহারই কাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। বর্ম্মার মামা এক বিচিত্র সৃষ্টি, তস্য মামা প্রাও মামাও কম যান না। বইখানি এমনই কৌতুকপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর, গ্রন্থকারের বর্ণনাভঙ্গী আগাগোড়া এমনই humorous অর্থাৎ হাস্যরসযুক্ত যে ইহাকে শিশু সাহিত্যের একটি অভিনব সৃষ্টি বলা যায়।

নতুন গল্প—সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৯০ পৃ. মূল্য ২।০।

ইহা একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ। দেশের নামজাদা বহু লেখকের গল্প এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ গল্পই উপভোগ্য ও উপাদেয় হইয়াছে। বইখানি দেশী কাগজে ছাপা হইলেও এই দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে সম্পাদক মহাশয় ছেলেদের মনোরঞ্জনের জন্য যে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অদম্য সাহিত্যানুরাগই সূচিত হইয়াছে। প্রত্যেক গল্পই সচিত্র, একখানি রঙীন ও দুইখানি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবিও আছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

তুরস্ক উপন্যাসের গল্প— শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আরব্য-উপন্যাসের গল্পের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত। কিন্তু তুরস্ক-উপন্যাসের কথা এতদিন খুব কমই জানা ছিল। কার্ত্তিকবাবু ইহার গল্পগুলি উদ্ধার করিয়া ছাত্র-মনের উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল, সহজবোধ্য এবং সুরুচিসঙ্গত। কিশোরগণ ইহা পাঠে আনন্দিত ও উপকৃত হইবে। পুস্তকখানিতে বহু সুন্দর সুন্দর ছবি সংযোজিত হইয়াছে। প্রচ্ছদপটটিও চিত্তহারী।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল



দোল পূর্ণিমা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]



সমররত ব্রিটেনের "করোনেশন স্কট" নামক ট্রেণ লণ্ডন হইতে স্কটলণ্ডে চলিয়াছে



পার্লামেণ্ট ভবনের উল্টাদিকে টেমস নদীর তীরে, দিন-শেষে শ্রমিকদিগকে লইয়া
যাইবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ 'বাস'-সমূহ

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৫১

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বড়দিনে রাজার বাণী

বড়দিন উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বর এক বাণী দিয়াছেন। উহাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই : "আমরা সমগ্র জগতে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার নবজন্ম কামনা করিতেছি। আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হউক এবং যুদ্ধের বিভীষিকা নির্বাসিত হউক। আমরা লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছি ; আমি বিশ্বাস করি যে এই কয় বৎসরের ত্যাগ ও দুঃখ আমাদিগকে এই লক্ষ্যের নিকটতর করিয়াছে। সমগ্র সাম্রাজ্যবাসী নারী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই কঠোর শ্রম ও প্রভূত আত্মত্যাগ দ্বারা বিজয় নিকটতর করিতে সাহায্য করিয়াছে। আমরা একে অন্যের বহু বিপদের অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং সকলের একই লক্ষ্য-প্রণোদিত চেষ্টা আমাদিগকে একত্রে মিলিত করিয়াছে। তথাপি, বিভিন্ন জাতিরূপে সকলে এক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারে কিনা, তাহার পরীক্ষার জন্য শ্রম ও নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আরও পরিচয় দিতে হইবে। জার্মেনী ও জাপানকে পরাজিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্যের অর্দ্ধেক মাত্র, বাকী অর্দ্ধেক অত্যাচারমুক্ত স্বাধীন মানবের একটি জগৎ সৃষ্টি করা। মানুষের অজেয় মন ও স্বাধীনতার পবিত্র শিখা মানবতার সম্পদ। এই মানবতা প্রতিষ্ঠার কঠিন কার্য্যে আমাদিগের শক্তিশালী মিত্ররা আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। আমি একান্তভাবেই বিশ্বাস করি আমরা ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব।"

ইংলণ্ডেশ্বরের এই বাণীতে ভারতবাসী আশান্বিত হইবার কোন কারণ পায় নাই। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার কার্য্যকলাপে বুঝা গিয়াছে সমগ্র জগৎ বলিতে তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত স্থানগুলিকেই শুধু বুঝেন, অন্য সকল জাতির বাসস্থানগুলি এই জগতের বাহিরে। ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে যে ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে তাহার পুরস্কার প্রাপ্তি ত দূরে থাকুক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতে তাঁহাদের এজেণ্টদের সুশাসনে প্রায় অর্দ্ধকোটি নরনারী শিশুবৃদ্ধ অনাহারে মরিয়াছে, ব্রিটেনের নিকট তাহার পাওনা হাজার কোটি টাকাও আটকা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতবর্ষের আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক যে নেতৃবৃন্দ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রিটেনেরই পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ কারারুদ্ধ, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রোগক্লিষ্ট। ইঁহাদের একমাত্র অপরাধ ইঁহারা ব্রিটেনের নিকট হইতে তাহার এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার প্রকৃত লক্ষ্য জানিতে চাহিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের অধীনতা পাশ একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সে মোচন করিবে এই দাবী তুলিয়াছিলেন। "সমগ্র জগতের স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার নবজন্ম" কামনা যদি আন্তরিক হয় তাহা হইলে উহার সহিত কংগ্রেসের এই দাবীর কোথাও অমিল থাকে না। কিন্তু কংগ্রেস তাহার প্রশ্নের উত্তর আজিও পায় নাই। "স্বাধীন মানবের জগৎ সৃষ্টি" ব্রিটেনের প্রকৃত কামনা হইলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কি হইবে অবিলম্বে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তাহা ঘোষণা করা দরকার। ভারতবর্ষ সৈন্য ও অর্থ দিয়া ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যের যে-কোন দেশ অপেক্ষা কম সাহায্য করে নাই। গত যুদ্ধে এবং এই যুদ্ধেও ভারতীয় সৈন্য দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে এবং প্রতিদান পাইয়াছে অপমান, লাঞ্ছনা ও বিতাড়ন। "বিভিন্ন জাতির মৈত্রী বন্ধন" যাঁহাদের কাম্য, এই ঘোর অন্যায় ও অবিচার বন্ধ করিবার শক্তি যাঁহাদের ছিল তাঁহারা ইহার প্রতিবাদটুকুও করেন নাই।

আটলাণ্টিক সনদ

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে আটলাণ্টিক সনদ তিনি এবং মিঃ চার্চিল কোন দিনই স্বাক্ষর করেন নাই, এরূপ কোন দলিলের অস্তিত্বই ছিল না। ইহার পূর্বে প্রায় দুই বৎসর যাবৎ মিঃ রুজভেল্ট এবং মিঃ চার্চিল উভয়েই অনেক বার আটলাণ্টিক সনদের উল্লেখ করিয়াছেন। রুজভেল্ট বলিয়াছেন উহা সমগ্র পৃথিবীতে প্রযোজ্য, চার্চিল ঘোষণা করিয়াছেন ভারতবর্ষ উহার সুবিধা পাইবে না। আটলাণ্টিকের উভয় কূলে ছলনার এই প্রতিযোগিতা বিশ্ববাসীকে সচকিত করিয়াছে।

আটলাণ্টিক সনদের অস্তিত্ব অস্বীকারের সংবাদ প্রকাশের পর লণ্ডনে ভারতবাসী, সিংহলবাসী ও আফ্রিকাবাসী অনেক লোক উহার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যে প্রতারণা করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করিবার জন্য সমবেত হন। তাঁহারা এক বাক্যে এই মত প্রকাশ করেন যে পরাধীন জাতিসমূহকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে চরম ছলনামূলক আটলাণ্টিক সনদের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অধীনস্থ জাতিসমূহকে স্বাধীনতা দানের ইচ্ছা ব্রিটেনের নাই। পরাধীন ও নির্যাতিত জাতিসমূহের ন্যায্য অধিকারে

"গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার" আমেরিকা সমর্থন করিবে এ আশা যাঁহারা পোষণ করিতেন, আমেরিকাকে এই প্রতারণার সহিত সংসৃষ্ট দেখিয়া তাঁহারাও মর্মাহত হইয়াছেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অভিভাষণ

বিলাসপুরে হিন্দুমহাসভার ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তেজোদৃপ্ত অভিভাষণে স্বাদেশিকতার উন্মাদনাপূর্ণ আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে। স্বদেশীর এই আহ্বানের সহিত বাঙালীর পূর্ণ পরিচয় আছে, স্বদেশীমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালীর নেতৃত্বে ভারতবাসী তাহার হারানো সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অভিভাষণ পাঠে এই কথাই সকলের আগে মনে পড়িবে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে আবার নূতন চেতনা জাগাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, এই দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় বাঙালীকেই পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষায় জ্ঞানে সেবায় ও ত্যাগে যে বাঙালী সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল, সেই লুপ্ত সম্মান তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অভিভাষণ বাঙালীর প্রাণে সেই প্রেরণা সঞ্চার করিলে সমগ্র দেশের কল্যাণ হইবে।

বিলাতী শোষণের ফলে তিলে তিলে কেমন করিয়া ভারত-বাসী দারিদ্র্যের মহাপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দাস্য তাহার রাজনৈতিক পরবশ্যতার ফল এবং ভারতের দারিদ্র্য-মোচনের একমাত্র উপায় স্বরাজলাভ। কিছু দিন যাবৎ ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মুখপাত্রেরা আমাদিগকে শুনাইতে-ছেন যে ভারতবর্ষে আগে অর্থনৈতিক উন্নতি আবশ্যক, রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা পরে আসিবে। লর্ড ওয়াভেল প্রভৃতির এই বুলির প্রতিধ্বনি বহু উচ্চপদস্থ বশংবদ ভারতবাসীর কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ইঁহাদিগকেই জানাইয়া দিয়াছেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে—এই অতি সহজ সত্য কথাটি বুঝিবার মত বুদ্ধি ভারতবাসীর আছে। ইহার প্রয়োজন ছিল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বলেন: "শান্তি সম্মিলনে যখন বিশ্বের সমস্ত জাতির ভাগ্য স্থিরীকৃত হইবে, তখন ভারত যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে দালালের মারফৎ ভারতের কথা না বলিয়া নিজ প্রতিনিধির মারফৎ আপন অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান হইয়াছে। এই কারণেই ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বর্তমান সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটান বিশেষ জরুরী বলিয়া আমি মনে করি। ভারতের স্বাধীনতা ও পুনর্গঠন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রাথমিক সমস্যা আছে সেইগুলিকে ভিত্তি করিয়া আমাদিগের মিলিত হওয়া এবং সম্মিলিত দাবী পেশ করা কর্তব্য। জাতীয় পুনর্গঠনের ভিত্তিতে সর্বজনস্বীকৃত পন্থায় ভারতের জনসাধারণকে শিক্ষিত করার পথেই আমা-দিগের অগ্রগতি হইবে। হয়ত এইরূপ দাবীতে মোসলেম লীগ যোগদান করিবে না; কিন্তু অন্যান্য এমন অনেক মুসলমান আছেন যাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত হইলে, আমরা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাহি, তাহা ব্রিটেনের প্রতি ঘৃণার উপর বা ভারতবর্ষের অধিবাসী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। যদি স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, তবে হিন্দুকে অন্য যে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ জাতির স্বার্থ হইতে অভিন্ন সেই সকল সম্প্রদায়ের সহিত একসঙ্গে তাহা সম্ভোগ করিতে হইবে।"

স্বদেশীর এই আহ্বানে সাম্প্রদায়িকতা, দলাদলি ও সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই; ইহা মাতৃভূমির সেবায় আত্মবলিদানের আহ্বান। সমানাধিকার, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবসেবায় আত্মনিয়োগই আমাদের কাম্য। স্বদেশীর আহ্বান ভারতবাসী ও বাঙালীর প্রাণে নবপ্রেরণা সঞ্চার করিয়া তাহাকে নব আদর্শে সঞ্জীবিত করিলে দেশের দুঃখ ঘুচিবে, স্বাধীনতালাভের দিনও ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইবে।

ভারতে সর্ আজিজুল হক বিলাতে সর্ চার্লস টেগার্ট

মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাহার ইহা লইয়া এ দেশে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট বার বার বলিয়াছেন মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রধানতঃ দেশের লোকের, তাহারা ন্যায্যমূল্য ভিন্ন বর্ধিত মূল্যে জিনিস না কিনিলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। গবর্মেণ্ট একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে চাউল, কাপড়, কয়লা, ঔষধ প্রভৃতি যে-সব দ্রব্য ভিন্ন মানুষ বাঁচিতে পারে না, গবর্মেণ্ট পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সহজ পন্থায় সেগুলি সরবরাহ করিতে না পারিলে লোকে যেন-তেন-প্রকারেণ উহা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইবে। আপনার প্রাণ বাঁচিলে তবে অন্য কথা ভাবিবার সময় হইবে মনুষ্যসমাজেও ইহা চিরন্তন নিয়ম, কোন গবর্মেণ্টই ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইয়াও অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যপ্রাপ্তি যেখানে অনিশ্চিত, মানুষ সেখানে চোরা পথে উহা সংগ্রহ করিবেই। কোন মানুষ কোন গবর্মেণ্ট ইহাতে বাধা দিতে পারে না।

সম্প্রতি রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় ভারত-সরকারের বাণিজ্য সচিব সর্ মহম্মদ আজিজুল হক সাম্রাজ্যবাদীদের এই পুরাতন কথায় নিজের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণের বহুল বর্ণনা করিয়া অবশেষে তিনি বলিয়াছেন, "মূল্য নিয়ন্ত্রণ-সমস্যার সমাধান একমাত্র দেশবাসীর উপর নির্ভর করে। যে স্বার্থ সকলকে ত্যাগ করিতে হইবে জনমতের মারফতে তাহা প্রকাশিত হওয়া উচিত। উহা ভিন্ন আইন করিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। কোন জিনিষের অভাব ঘটিলেই লোকে উহা ক্রয় করিতে ছোটে। অর্থনৈতিক সুশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে এই মনোভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। স্বাধীনতার সর্বাপেক্ষা বড় কথা স্বার্থত্যাগ। আপনারা কি অপেক্ষা করিতে পারেন না? অপচয় কি আপনারা নিবারণ করিতে পারেন না? যদি পারেন, তবেই এই নিয়ন্ত্রণ-সমস্যার সমাধান হইতে পারে।" উৎসাহের আতিশয্যে সর্ আজিজুল যাহা বলিয়াছেন তাহার ভিত্তিতেই বিষম ভুল রহিয়াছে। ভারতবর্ষে অভাব ঘটিয়াছে—অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, কয়লা প্রভৃতি

পরিমাণে পাইত না, এই সব ক্ষেত্রে ব্যয়-সঙ্কোচের কোন অবকাশই তাহাদের নাই। গবর্মেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া এগুলির জন্য হাত গুটাইয়া অপেক্ষা করার একমাত্র অর্থ —তাহাদের নিশ্চিত মৃত্যু। সুতরাং অপেক্ষাও এখানে চলে না। যে সর্ আজিজুল হক ১৯৪৩ সালের মে মাসে খাদ্য-সচিবরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন আর সাত দিনের মধ্যে চাউলের দর কমিবে তাঁহার কথার বুনিয়াদই যে মারাত্মকরূপে প্রমাদপূর্ণ তাহা গত দুর্ভিক্ষেই প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্রিটেন স্বাধীন দেশ। সেখানেও আবশ্যক সমস্ত দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে যে দ্রব্যের যে দর ছিল সেই দরেই সব দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এখানকার মত চতুর্গুণ মূল্য নির্দ্ধারিত হয় নাই। স্বাধীন দেশের জনসাধারণের সহযোগিতা স্বাধীন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট চাহিয়াছে এবং পাইয়াছে; ঘুষ, চুরি, চোরাবাজার প্রভৃতি এখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে যাহা নৈমিত্তিক ব্যাপার সেই সব পাপ নাম ব্রিটেনে নাই ইহাই আমরা অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে কলিকাতার ভূতপূর্ব পুলিস কমিশনর সর্ চার্লস টেগার্টের উপর বিলাতের চোরাবাজার দমনের ভার অর্পিত হইয়াছে। এদেশে সাহেবেরা গবর্মেণ্টের চোখে সততার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাদের বেলায় শুধু ব্যালান্স শীট দেখিয়াই ইনকাম-ট্যাক্স ধার্য্য হয়; আর ভারতীয়দের বেলায় হিসাবের প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা হয়। যুদ্ধের বাজারের মরশুমে এ দেশে কোন কোন সাহেব কোম্পানীর নাম উঠিতে দেখিয়া যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন ইহা এদেশেরই জল হাওয়ার দোষ, খাস বিলাতের চোরাবাজার দমনে সর্ চার্লস টেগার্টের নিয়োগে তাঁহারা হয়ত একটু ক্ষুণ্ণই হইবেন।

বিষয়টি কিন্তু উপেক্ষার যোগ্য নহে। যে শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ফলপ্রদ, স্বাধীন দেশের বুদ্ধিমান গবর্মেণ্ট লোকলজ্জার ভয়েও তাহাতে কুণ্ঠিত হন না। সুতরাং বিলাতের চোরাবাজার দমনে টেগার্ট সাহেবের নিয়োগে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু এদেশে চোরাবাজারের সহিত গবর্মেণ্টের উচ্চ কর্মচারীদিগের যোগাযোগের কথা প্রকাশ্যে ব্যবস্থা-পরিষদের মধ্যেও অনেকে বলিয়াছেন, কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। চোরাবাজার দমনের জন্য বিশেষ পুলিস বিভাগের সৃষ্টি যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পর মাত্র মাস কয়েক পূর্বে কলিকাতার জন্য হইয়াছে, বাংলা দেশের বা সমগ্র ভারতের জন্য এখনও হয় নাই। ভারত-সরকারের মুখপাত্রেরা প্রথমাবধিই মূল্যবৃদ্ধির দায়িত্ব তাঁহাদেরই কণ্ট্রোলের ফলে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে কাল কাটাইয়াছেন। এখনও কাটাইতেছেন।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব

রোটারী ক্লাবের ঐ বক্তৃতাতেই সর্ আজিজুল হক বলিয়াছেন, "১৯৪৩-এর দুঃখজনক করুণ ঘটনার কথা আমরা সকলেই জানি। খাদ্য, বস্ত্র, কয়লা, জ্বালানী কাঠ, কেরোসিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব অকস্মাৎ একসঙ্গে দেখা দেয়।"

"We are all aware of the painful and tragic events of 1943. All at once we were confronted with acute scarcity of food, clothing coal, fuel, kerosene and consumer goods"

ভারতবাসী জানে একথা গ্রাহ্য নহে। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী গবর্মেণ্টকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব সম্বন্ধে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাঁহারা উহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। খাদ্যাভাবের সম্ভাবনার কথা দেশবাসী বারবার বলিয়াছিল, উহা জানিবার সুযোগ গবর্মেণ্টের যথেষ্টই ছিল। কোন কোন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীও এ বিষয়ে গবর্মেণ্টকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার পূর্ব পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের চৈতন্য হয় নাই। অভাবের কথা তাঁহারা জানিতেন না ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সতর্ক করা সত্ত্বেও তাঁহারা জানিবার চেষ্টা করেন নাই ইহাই প্রকৃত সত্য।

ভারতীয় কৃষির উন্নতি

ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতির ভারতীয় সমিতির পঞ্চম সম্মেলনের সভাপতিরূপে সর্ মণিলাল নানাবতী ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য যে-সব পরিকল্পনা হইয়াছে সেগুলির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, গ্রামবাসীদের জন্য পরিকল্পনা রচনার সময় সর্বাগ্রে ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে অজ্ঞ কৃষক হইতে সুনিপুণ কৃষক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোক আছে। কৃষির সর্বতোমুখী উন্নতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্বনিম্ন ও সর্বাপেক্ষা অনুন্নত লোকদিগকে উন্নত স্তরে তুলিবার চেষ্টা করা দরকার। ভারতবর্ষে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিতে হইলে সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠা-করিতে হইবে। সমগ্র মানুষটিকে এবং তাহার জীবনের সকল দিক বিবেচনা করিতে হইবে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভেদের প্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার। কোন কোন অঞ্চলের স্থানাভাবের জন্য উন্নতি বিধানের বিশেষ সুযোগ নাই। কোথাও বা প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে কাজ হয় না। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ইউরোপ ও আমেরিকার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, জীবন সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ ধারণা লইয়া পরিকল্পনা রচনা না করিলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি করা যায় না। ভারতে এক প্রাচীন সভ্যতা বর্তমান; বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ভারতবাসী অগ্রসর হইয়াছে। এরূপ দেশের লোককে উন্নতির নূতন পথে লইয়া যাইতে হইলে অবিরত প্রবল চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন সেগুলির সমালোচনা করিয়া সর্ মণিলাল বলেন, ভারত-সরকার যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহা দ্বারা গ্রাম্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনায় ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হয় নাই। গ্রাম্য জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিও ঐ পরিকল্পনায় উত্তমরূপে বিবেচিত হয় নাই। বোম্বাই পরিকল্পনায়ও ভূমি সংক্রান্ত অধিকাংশ সমস্যাই বাদ গিয়াছে। ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনাতেও শুধু জমি ক্রয়, পুরাতন ঋণ

পরিশোধ ও সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। মিঃ এম. এন. রায়ের পরিকল্পনায় যদিও জমি সংস্কারের কিছু ব্যাপক তালিকা দেওয়া হইয়াছে—তথাপি উহাও যথেষ্ট নহে।

ভারতীয় কৃষির সমস্যা

সর্ মণিলাল ঐ বক্তৃতাতেই কৃষি-সমস্যার আলোচনা করিয়া বলেন, কৃষি-সমস্যা যেরূপ তাহাতে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর তিনি দেশের ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও জমির উপর কৃষকের মালিকানা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় কৃষি সংক্রান্ত একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সহিত সম্পর্কিত সকল সমস্যা বিবেচনা করাই ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য্য হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করাও এই সম্পর্কে প্রয়োজন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সংক্রান্ত অর্থনীতির অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তিনি সকল প্রদেশ ও সামন্ত রাজ্যে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব করেন :—১। জমির মালিক কে? ২। জমি চাষ করে কে ও কি সর্ত্তে? ৩। চাষের জন্য কৃষক কি যন্ত্র ব্যবহার করে? ৪। সে কি ফসল পায়? ৫। উৎপন্ন দ্রব্যের আনুমানিক মূল্য কত? তিনি বলেন, কৃষির উন্নতি সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা করিতে হইলে এই বিবরণগুলি একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের এরূপ একটি সুসম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রয়োজন যাহাতে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠাম বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হইবে এবং সকল ত্রুটির মূল কারণগুলি নির্দেশ করিয়া সেগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

ভারতবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার আছে। উহার সহিত কৃষক সাধারণের বিন্দুমাত্র যোগ নাই, সুতরাং কৃষির উন্নতির সহিত উহার কোন সম্পর্কও নাই। এই গবেষণাগারের গবেষণা ইংরেজী ভাষায় মূল্যবান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে দেশের শতকরা মাত্র ১১ জন লোক অতিকষ্টে মাতৃভাষায় নাম সহি করিতে সক্ষম, সেই দেশের কৃষক ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত দুর্মূল্য পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিবে এই কল্পনা অমূলক।

ভারতীয় কৃষককে বাঁচাইতে হইলে সর্বাগ্রে তাহার কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির উপায় করিয়া দিতে হইবে। এ দেশের কৃষকের অর্থ উপার্জনের উপায় পাট, তুলা ও তৈলবীজের চাষ এবং কাঁচা চামড়া বিক্রয়। ইহাদের কোনটাতেই সে তাহার ন্যায্য মূল্য পায় না, কারণ সস্তায় এগুলি ক্রয় করিতে না পাইলে বিলাতী বণিকের স্বার্থ বজায় থাকে না। অর্থকরী ফসল ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা এবং অল্প সুদে সহজে কৃষককে ঋণদানের উপায় করিয়া দেওয়াও অত্যাবশ্যক। গবর্মেণ্ট এই দুইটি দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই। বোম্বাই, পঞ্জাব প্রভৃতি কোন কোন প্রদেশ কৃষকের এই সমস্যাগুলি সমাধান করিয়া দেওয়ায় তাহাদের আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে ধ্বংসোন্মুখ সমাজ

মহিলাদের কয়েকটি সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় এক সভায় বাংলা দেশে পাপের ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উহাতে সভানেতৃত্ব করেন। বাংলার গণিকালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব দিয়া ডাঃ সৌরেন ঘোষ বলেন : "১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় গণিকালয়ের সংখ্যা ভয়াবহরূপ বর্ধিত হইয়াছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় গণিকালয়ের সংখ্যা ১০ হাজার ২ শত ১৩টি ছিল; সমগ্র বাংলায় ঐরূপ গৃহের সংখ্যা ৪৩ হাজার ৩ শত ৩৩টি ছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় গণিকালয়ের সংখ্যা ২২ হাজারের অধিক হয়। তাহার পরে দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষের পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ, কলিকাতায় উহার সংখ্যা ৪৫ হাজার দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ এক-একটি গৃহে বহু নারী বাস করিয়া পুরুষের পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় হয়। তাহাদিগের মোট সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।"

দৈনিক বসুমতী ঐ সঙ্গে বাংলার অন্যান্য শহরের নিম্নলিখিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন :

"১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল, তখন কলিকাতার গণিকালয়ের সংখ্যা ১০ হাজার আর সমগ্র বাংলায় ৪৩ হাজার। বর্তমানে কলিকাতায় উহার সংখ্যা ৪৫ হাজার দাঁড়াইয়াছে; সমগ্র বাংলায় সংখ্যা কিরূপ তাহার কোন হিসাব লওয়া হইয়াছে কি? ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে যাহা দেখা গিয়াছে তাহার তুলনায় দুর্ভিক্ষের পরেই পাপকেন্দ্রগুলির সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা পূর্বের তুলনায় সচিবদিগের সংখ্যাকেও যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।"

দুর্ভিক্ষের ফলে এই পাপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই অভিযোগ সভায় অনেকেই করিয়াছেন এবং উহা সম্পূর্ণ সত্য। দুর্ভিক্ষে বহু গৃহ ভাঙিয়া বহু বালিকা ও যুবতী নিরাশ্রয়া হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত উদরান্নের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পাপের পথে পদক্ষেপ করিতে হইয়াছে। দুর্ভিক্ষোত্তর পুনর্গঠনে বাংলা-সরকারের অক্ষমতা ও উদাসীনতা ইহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই সঙ্গে বাংলা দেশে বহু বিদেশীর আগমন ও তাহাদের কুপ্রবৃত্তির কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন :

"যাহারা দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়া জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়াছে, তাহারা কি বিদেশীর পাপ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নিজদিগকে বিলাইয়া দিবে এবং এই জঘন্য কাজ এ দেশের লোক সমর্থন করিবে?—না। দেশবাসী কখনই ইহা সহ্য করিবে না। মানুষ নারীকে ক্রয় করিবে এবং তাহার লালসা চরিতার্থ করিবে ইহা কি কেহ চায়? জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য অন্ততঃ এই জঘন্য ব্যাপার বন্ধ করিতে হইবে।"

শুধু বিদেশী নহে, ভিন্ন প্রদেশাগত ব্যক্তিরা এই পাপের প্রশ্রয় দান করিতেছেন এরূপ অভিযোগ আমরা শুনিয়াছি। জীবনযাত্রার ভয়াবহ ব্যয়বৃদ্ধিতে বাঙালী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ এত পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে যে অভাবের তীব্র তাড়নায় নৈতিক শক্তি বজায় রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গে বিদেশী এবং ভিন্ন প্রদেশবাসী

ব্যক্তিদের প্রলোভন বাঙালী তরুণীকে সহজেই পাপের পথে টানিয়া নামাইতেছে। গণিকালয়ের গণিকার সংখ্যাই আজ বাংলার প্রবহমান দুর্নীতির পূর্ণ পরিচয় নহে।

বাংলার সমাজপতি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই গুরুতর সমস্যার প্রতি অবিলম্বে যথাযোগ্য মনোযোগী না হইলে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের যে সর্বনাশ হইবে তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কিছু করেন নাই, করিবেন বলিয়া ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিলে দুর্নীতি আরও বাড়িয়াই চলিবে।

মিঃ কেসির বক্তৃতা

কলিকাতা রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় মিঃ কেসি বাংলা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। অদ্ভুত উর্বরাশক্তি সত্ত্বেও বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখিয়া মিঃ কেসি বিস্মিত হইয়াছেন। এরূপ বিস্ময় আরও অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বিস্ময়ের কারণ ইহাতে নাই। বাংলা দেশ ইংরেজের সুশাসনে আসিবার পর তাহার শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হইয়াছে এবং কৃষি হইয়াছে বাঙালীর জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন। এই কৃষিও আবার সম্পূর্ণরূপে বরুণদেবের কৃপার উপর নির্ভরশীল। ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাংলার সে ব্যবস্থা যাহা ছিল এখন তাহাও গিয়াছে। বাঙালীরা কোন দিনই একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল না, শিল্প ও বাণিজ্য হিন্দু এবং মুসলমান রাজত্বকালেও তাহার আয়ের দ্বিতীয় পন্থা ছিল। বর্তমান কালের ন্যায় এত দরিদ্রও বাঙালী কখনও ছিল না। দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, বামনদাস বসু, উইলিয়াম ডিগবি, সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের রচিত পুস্তকাবলীতে ছত্রে ছত্রে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

মিঃ কেসি বাংলার সমস্যাগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন : (১) বাংলার ৫ কোটি একর জমিতে আরও ফসল উৎপাদন, (২) জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং (৩) নিরক্ষরতা হ্রাস। আরও ফসল বাড়াইলেই বাঙালীর অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর হইবে, কিছু দিন যাবৎ এরূপ একটা প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে। যুদ্ধের মধ্যে ইহার কতকটা সার্থকতা থাকিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থায় বেপরোয়া ফসলবৃদ্ধির পরিণাম কৃষকের পক্ষে অতিশয় মারাত্মক হইবে। বেপরোয়া প্রচারের ফলে অত্যাবশ্যক ফসলের উৎপাদন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়া পড়িলে উহার মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যাইবে এবং ইহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কৃষক নিজে। কৃষিজীবীর আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার উপায় তাহার ফসলের ন্যায্য মূল্য দান। গবর্মেণ্ট এদিক দিয়া তাহার সাহায্য ত করেনই নাই, বরং বাঙালী কৃষকের সর্বনাশ করিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের খাতিরে বেশী করিয়া পাট চাষ করিয়া এবং পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া মিঃ কেসির গবর্মেণ্ট কৃষককুলের যে ক্ষতি করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাহার পর কৃষকের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রদর্শন বিশেষ কিছু ফলপ্রদ হইবে না বলা বাহুল্য। কৃষকের উন্নতির অন্যতম উপায় কুটীর-শিল্পের উন্নতি, যানবাহনের সুবন্দোবস্ত, সমবায় সমিতির সাহায্যে ফসল বিক্রয়, ঋণ-দান প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং জমির সার প্রাপ্তির সুব্যবস্থা। গবর্মেণ্টের সাহায্য ভিন্ন ইহার কোনটিই সম্ভব নয় এবং মিঃ কেসির গবর্মেণ্ট এই সব সমস্যা লইয়া ছেলেখেলা করা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের আন্তরিকতার পরিচয় কুইনাইন এবং অন্যান্য ঔষধ সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জনমত তীব্র না হওয়া পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য রোগে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু নিবারণের কোন ব্যবস্থা তাঁহারা করেন নাই। তাঁহাদেরই প্রদত্ত অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে দেখিয়া তাঁহারা তাহার প্রতিকার করেন নাই, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল বন্ধের জন্য কর্পোরেশন অগ্রণী হইলে গবর্মেণ্ট জোর করিয়া ভেজাল খাদ্য বিক্রয় বজায় রাখিয়াছেন। মিঃ কেসির চক্ষের উপর তাঁহারই গবর্মেণ্ট ইহা করিয়াছেন এবং ইহা এখনও বন্ধ হয় নাই। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দানেও গবর্মেণ্ট কোন দিনই বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই। জনমতের চাপ অস্বীকার করা যখন সম্ভব হয় নাই কেবলমাত্র তখনই তাঁহারা একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন অথবা জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে বাংলা দেশে বর্তমানে মাত্র ১২৮৫০ জন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার আছেন অর্থাৎ প্রতি ৪৬৯০ জনে একজন করিয়া চিকিৎসক। সমগ্র ভারতের অবস্থা আরও সঙ্গীন। ভারতবর্ষের ৭০ লক্ষ গ্রামের প্রতি ১৫টি গ্রামে একজন করিয়া চিকিৎসক আছেন অর্থাৎ প্রতি ৯ হাজার লোকে একজন মাত্র ডাক্তার। শহর ও গ্রামের চিকিৎসক ধরিয়া তাহার গড়পড়তা এই হিসাব। শুধু গ্রামের অবস্থা আরও সঙ্গীন। নিখিল-ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জীবরাজ মেটা নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন : ভারতবর্ষে ৪৫ হাজার চিকিৎসকের মধ্যে ৩৫ হাজারেরও অধিক চিকিৎসক শহরে বাস করিয়া চিকিৎসা করেন। ভারতবর্ষের জনসমষ্টির শতকরা ১২ হইতে ১৫ জন লোক শহরগুলিতে বাস করেন। অবশিষ্ট লোকের শতকরা ৮৫ জন অর্থাৎ ৩২ কোটি নরনারী, শিশু, কৃষক ও শ্রমিকের চিকিৎসার ভার মাত্র ১০ হাজার চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত। প্রতি ৩০ হাজার লোকের মধ্যে একজন করিয়া চিকিৎসক।

ইহার সঙ্গে ব্রিটেনের অবস্থা তুলনীয়। সেখানে গড়ে প্রতি ১৫০০ জনে একজন করিয়া ডাক্তার আছেন। অথচ ভারতবর্ষে যেখানে ৪ লক্ষ চিকিৎসক দরকার সেখানে আছেন মাত্র ৪৫ হাজার। চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার অবস্থাও সমান। যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালসমূহে এই বাবদে ব্যয় হইত প্রায় ১০ কোটি টাকা, আমেরিকায় প্রায় ১০০ কোটি টাকা এবং ভারতবর্ষের ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড এসোসিয়েশন সাহায্য পাইত মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্বন্ধেও একই অবস্থা। এদেশে শিক্ষা বিস্তারের যেটুকু ব্যবস্থা পূর্বে ছিল ইংরেজ আগমনের পর তাহা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়াছে। স্কুলের সংখ্যা কমিয়াছে, এখনও

আইন করিয়া উহা আরও কমাইবার আয়োজন মিঃ কেসির গবর্মেণ্টই করিতেছেন। শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি যে ভাবে হইতেছে তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও দরিদ্রের পক্ষে ইহার সুযোগ গ্রহণের উপায় নাই। বাঙালী ও ভারতবাসী মর্মে মর্মে জানে যত দিন এদেশের পরাধীনতা দূর না হইবে তত দিন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে সামান্য উন্নতি আজ হইয়াছে তাহা গবর্মেণ্টের সাহায্যে হয় নাই, গবর্মেণ্টের বিরোধিতা এবং অসন্তোষ অতিক্রম করিয়াই তাহা সাধিত হইয়াছে।

কলিকাতার বস্তির উন্নতি সাধন

বাংলার লাট মিঃ কেসি কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের অধিবাসীদের দুরবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছেন। ছয় মাসের মধ্যে বস্তির উন্নতি করিবার জন্য গবর্মেণ্ট, কর্পোরেশন ও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের মধ্যে পরামর্শ চলিতেছে, কমিটিও যথারীতি গঠিত হইয়াছে।

বাংলার সহস্র সহস্র গ্রামের কোটি কোটি অধিবাসীর চূড়ান্ত দুর্দশার কথা বাদ দিয়া শুধু শহরের বস্তির কয়েক লক্ষ লোকের জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন একদেশদর্শিতা হইতেছে ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বস্তির উন্নতির জন্য যে-সব প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় এই বিষয়টিও কর্তৃপক্ষ ভাল ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই। লাটসাহেব বস্তির লোকের দুরবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বস্তির রাস্তাঘাট এবং জলসরবরাহ প্রভৃতির উন্নতি করিয়া উহার বাহির সাজাইবার বন্দোবস্ত মাত্র হইবে, প্রস্তাবগুলি দেখিয়া আমাদের ইহাই মনে হইতেছে।

বস্তির অধিবাসীদের দুরবস্থার সহিত শহরের ও শহরতলীর নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিদের অসুবিধার প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে। কলিকাতার লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধির ফলেই প্রধানতঃ বস্তির লোক বাড়িয়াছে। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ আছে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের জন্য লোক বাড়িয়াছে, বহু সৈন্যও আসিয়াছে। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে শহরে লোক বাড়িতে আরম্ভ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী তৈয়ারি আরম্ভ হয় এবং গবর্মেণ্ট উহার সর্ববিধ সুযোগ দান করেন। লণ্ডন শহরে এই প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে যে-সব বাড়ী ভাঙিতেছে প্রতিদিন তাহা মেরামত হইতেছে, নূতন বাড়ীও তৈরি হইতেছে। নূতন বাড়ী বোমায় চূর্ণ হইবার পর আবার উহা নির্মিত হইতেছে। এই ভাঙা-গড়া সেখানে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে, বাড়ী তৈরির সরঞ্জামের অভাবের অজুহাতে পুনর্গঠন বন্ধ থাকে নাই। কলিকাতায় নূতন বাড়ী তৈরি গবর্মেণ্ট ত বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেনই, অধিকন্তু বহুসংখ্যক বসতবাড়ীও তাঁহারা কাড়িয়া লইয়াছেন। এই সব লোককে বাধ্য হইয়া খারাপ বাড়ীতে আসিতে হইয়াছে, মধ্যবিত্ত আরও নীচে নামিয়াছে, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং বিত্তহীনের পক্ষে বস্তিতে আসিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন উপায় থাকে নাই। দ্বিতীয়তঃ, শহরতলীর যানবাহন সমস্যা। শহরতলীর সহিত রেল ও বাসের যোগ ছিন্ন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শহরতলীর বহু স্থান হইতে লোকে দৈনিক কাজে কলিকাতায় আসিত, এবং কর্মশেষে সন্ধ্যায় বাড়ী চলিয়া যাইত। এখন উহা অসম্ভব। প্রথম কারণ, যাতায়াতের অসহ্য ক্লেশ, অসুবিধা এবং ট্রেন ও বাসের অনিয়ম। দ্বিতীয় কারণ, নানা কারণে শহরের বাহিরে এবং শহরতলীতে লোকের নিরাপত্তার হ্রাস, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্তির অসুবিধা ও চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি। স্ত্রীপুত্র কন্যাকে অসহায় ভাবে গ্রামে ফেলিয়া লোকে কলিকাতায় সারাদিন থাকিতে স্বভাবতঃই ভীত হয়। তৃতীয় কারণ, সন্ধ্যার পর বাস বন্ধ এবং ট্রেনের সংখ্যা অত্যধিক হ্রাস। আপিসের বা কাজের পর কাহারও ঔষধ বা কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের আবশ্যকতা থাকিলে কণ্ট্রোলের কল্যাণে তাহাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরিতে অথবা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, ট্রেনের অভাবে হয়ত মধ্যরাত্রির পূর্বে বাড়ী পৌঁছান সম্ভব হয় না। এই সব কারণে শহরতলীর লোকে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়াছে। নিজের বাড়ী ছাড়িয়া শহরতলীর বহু লোকে কলিকাতায় আসিয়া ভাড়াবাড়ীতে সপরিবারে মাথা গুঁজিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর মিলিবে। বোমাবিধ্বস্ত লণ্ডনের শহরতলীর সহিত যোগাযোগ এরূপ ভীষণ ভাবে ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

বস্তির উন্নতি সাধনের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে মিঃ কেসিকে আমরা এই কারণগুলি ভাবিয়া দেখিতে বলি। শহরতলীতে গৃহনির্মাণ এবং যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিলে অনেক লোক শহরের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে। কলিকাতার অতিরিক্ত লোক স্বাভাবিক উপায়ে কমাইবার এবং সকলের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলে বস্তির প্রকৃত উন্নতি সহজ হইবে। লণ্ডনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে করি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রামওয়ে ক্রয়

কলিকাতার ট্রামওয়ে ক্রয় করিবার জন্য কর্পোরেশন অকস্মাৎ যে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী অতিক্রান্ত হইয়াছে, ট্রাম কোম্পানী কর্পোরেশনের আয়ত্তাধীনে ত আসেই নাই, উপরন্তু বাংলা-সরকারের সহিত এ সম্বন্ধে রফা-নিষ্পত্তির কথাও প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা-সরকার কর্পোরেশনের সহযোগে একটি ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন করিবেন এবং এই বোর্ডের হাতে নাকি ট্রামওয়ে পরিচালনার ভার অর্পিত হইবে। শুধু তাই নয়, সমস্ত যানবাহন অর্থাৎ বাস প্রভৃতির পরিচালনার দায়িত্বও এই বোর্ডের হাতে দেওয়ার কথা উঠিয়াছে।

কয়েকটি কারণে বিষয়টি আলোচনার যোগ্য। প্রথমতঃ, এই ট্রামওয়ে ক্রয় ব্যাপারের মূলে ক্রয়ের ইচ্ছা গোড়া হইতেই ছিল না, এই প্রকার ধুয়া তুলিয়া শেয়ার-মার্কেটে ট্রামের শেয়ার বেচাকেনায় ইহার উদ্যোক্তারা বিলক্ষণ দু'পয়সা লাভ করিয়াছেন এরূপ একটা কথা প্রচারিত হইয়াছে। ইহা আমরা অনুসন্ধানের যোগ্য বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার এবং শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি যাঁহারা ট্রামওয়ে ক্রয় ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়া শেষ পর্য্যন্ত গবর্মেণ্টের সহিত হাত মিলাইয়াছেন শেয়ার মার্কেটের সহিত

তাঁহাদের এরূপ কোন সম্পর্ক ছিল না প্রকাশ্যে ইহা জানান দরকার। নতুবা লোকের সন্দেহ দৃঢ়তর হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-সরকারের হাতে ট্রামওয়ের ভার অর্পিত হওয়া রীতিমত ভয়ের কথা। ইঁহাদের কৃতিত্বের কথা আজ আর কাহারও অজানা নাই। এই গবর্মেন্টের অযোগ্যতা এবং অকর্মণ্যতার ফলে অর্দ্ধ কোটি লোক গত দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে, এখনও যে কয় কোটি দুর্ভিক্ষান্তে ব্যাধিতে ভুগিতেছে তাহার সংখ্যা আজও নির্ণীত হয় নাই। অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থান, কয়লা, কেরোসিন, যানবাহন প্রভৃতি মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার কোন সমস্যা ইঁহারা আজ পর্য্যন্ত সমাধান করিতে পারেন নাই। কণ্ট্রোলের পর কণ্ট্রোলের ফলে চোরাবাজার ইহাদের শাসনাধীনে যে ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে, ঘুষ ও চুরির মাত্রা যেরূপ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য গবর্মেন্টকে কায়েম রাখিবার জন্য যাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে, তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধির আয়োজন হইতেছে, কণ্ট্রোলের দোকান প্রভৃতি দিয়া তাহাদিগকে দুপয়সা পাওয়াইয়া দিবার আয়োজন তো ইতিমধ্যে হইয়াছেই। সিভিল সাপ্লাই ও রেশনিং বিভাগ জনসাধারণের সেবায় প্রবৃত্ত নহে, দেশবাসীর আতঙ্কের বস্তু। ইহাদের অযোগ্যতায় লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যদ্রব্য পচিয়াছে, পচিতেছে এবং আরও পচিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই লোকলজ্জাভয়শূন্য এবং অযোগ্য গবর্মেন্টের হাতে যানবাহনের দায়িত্ব অর্পিত হইলে লোকের পক্ষে ভবিষ্যতে পায়ে হাঁটা অথবা গরুর গাড়ী চড়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন নয়।

তৃতীয়তঃ, ট্রাম ও বাস একই পরিচালাধীনে আনিয়া উহাদের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যাত্রীদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। কলিকাতা ট্রামওয়ে যত দিন একচেটিয়া ব্যবসা ছিল তত দিন উহার কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। ১৯২৯-৩০-এর বাস প্রতিযোগিতায় ট্রামের উন্নতির সূত্রপাত, উহার গদি, পাখা, ভাল গাড়ী এবং ভাড়া হ্রাস সবই বাস-প্রতিযোগিতার ফল। যুদ্ধে বাসের সংখ্যা এবং পেট্রল গবর্মেন্ট জোর করিয়া কমাইয়া দেওয়ায় ট্রাম পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মধ্যাহ্নের সস্তা ভাড়া তুলিয়া দিয়াছে, ট্রান্সফার টিকিট দুই বৎসর পূর্ব্বে বোমা পড়িবার পর সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করিয়া আজ পর্য্যন্ত উহা বন্ধ রাখিয়াছে, মাসিক টিকিট কমাইয়াছে, উহার ভাড়া বাড়াইয়াছে এবং ট্রাম চলিবার সময় কমাইয়া যাত্রীদের প্রচুর অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। বাসের পক্ষেও অবশ্য ইহা প্রযোজ্য। উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকিলে এই সব অসুবিধা বর্ত্তমান অবস্থাতেও অনেকটা দূর হইতে পারিত। এ. আর. পি.র নামে যে কয়েক শত বাস অযথা আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার একটা অংশ ছাড়িয়া তাহার স্থলে লিজ-লেণ্ড লরী দিলে শহরের নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিত ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। গবর্মেন্ট কিছুতেই তাহা করেন নাই, কাহার স্বার্থে বাস-প্রতিযোগিতা হইতে ট্রামকে রক্ষা করা হইয়াছে ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রীদলের ভারকেন্দ্রের দিকে তাকাইলে তাহা [illegible]

প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের প্রতিবাদে লেডী এন. এন. সরকার

গত ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে হিন্দু কোড আলোচনার জন্য এক বিরাট জনসভা হয়। সভা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই বিরাট হল শ্রোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া যায়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভাটি আহূত হয় হিন্দু কোডের সমর্থকদের দ্বারা, কিন্তু উহাতে বিরোধী দলকে তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। বিরোধীদের মধ্যে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী সৌদামিনী মেটা, শ্রীমতী সরলাবালা সরকার, শ্রীমতী রেণুকা রায়, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেকে কোডের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। কোডের বিরোধী হিন্দু উইমেন্স এসোসিয়েশনের সভানেত্রী লেডী এন. এন. সরকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে এক পত্র লেখেন। পত্রখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। লেডী সরকার উহাতে লিখিয়াছেন, "আমি আপনাকে বলিতে পারি যে, বাংলা দেশ প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের সম্পূর্ণ বিরোধী। অবশ্য এই প্রদেশের বাহির হইতে কেহ আসিয়া উহা সহজে বুঝিতে পারিবে না। কারণ যাহারা এই কোডের পক্ষপাতী তাহারা অনেক পূর্ব হইতেই প্রচারের সুবিধা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে বিরোধীরা তদনুরূপ মোটেই সুবিধা পায় নাই।

"বিদগ্ধমণ্ডলীর এক বিরাট অংশ ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যেও অনেকেই এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতায় কয়েকজন মহিলা যাঁহারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত তাঁহারা প্রচার করিতেছেন যে, হিন্দু নারীরা সকলেই এই কোডের যতগুলি ধারা আছে সবই সমর্থন করিতেছেন। হিন্দু নারীসমাজের সম্পর্কে আসিয়া ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে হিন্দু নারীসমাজের মধ্যে খুব কমসংখ্যক নারী এই বিল সমর্থন করিতেছেন।"

লেডী সরকার প্রথমেই বলিয়াছেন, "বাংলা দেশ প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের সম্পূর্ণ বিরোধী।" পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন, "বিদগ্ধমণ্ডলীর এক বিরাট অংশ" ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিরোধীরা স্বীয় অভিমত প্রচারের সুবিধা পান নাই লেডী সরকার ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কোডের সমর্থকেরা প্রধানতঃ ব্রাহ্ম-সমাজের লোক, লেডী সরকার এই অভিযোগও করিয়াছেন এবং দাবী করিয়াছেন যে "বাংলার নারীসমাজ এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী।"

লেডী সরকারের উক্তিগুলি আপাত দৃষ্টিতেই পরস্পর বিরোধী বলিয়া ধরা পড়ে। ইহাতে ভুল কথাও আছে। ব্রাহ্ম-সমাজের মহিলাগণই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন নাই। কোডের সমর্থক মহিলাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীমতী রেণুকা রায় ব্রাহ্ম; শ্রীমতী সৌদামিনী মেটা, শ্রীমতী সরলাবালা সরকার প্রভৃতি কেহই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নহেন। কিছুদিন পূর্বে সর্ব্ব- [illegible]

বিলের বিরোধীদের উদ্যোগে নারীদের যে বিরাট সভা হয় তাহাতে হিন্দু কোড সমর্থিত হইয়াছিল, সভার উদ্যোক্তা বিরোধীদলের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভিন্ন উপস্থিত মহিলাবৃন্দ এক বাক্যে বিলের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এই মহিলা সভায় কোন ব্রাহ্মমহিলা বক্তৃতা দেন নাই। হিন্দু উইমেন্স এসোসিয়েশনের সভানেত্রী লেডী সরকার তাঁহাদেরই সম-অভিমত-সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা আহূত এই মহিলা সভায় বক্তৃতা করিতে আসেন নাই।

তারপর বিরোধীদলের প্রচারের অসুবিধার কথা। কলিকাতায় অনেকগুলি ইংরেজী বাংলা দৈনিকপত্র রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটিকেও যদি তাঁহারা সমর্থক রূপে পাইয়া না থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের দুর্বলতা এবং যুক্তির সারবত্তার অভাবই প্রকাশ পায়। প্রয়োজন হইলে বাংলা দেশে প্রতিক্রিয়াশীল দলের পক্ষসমর্থনের জন্ম দৈনিক পত্র পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতে পারে ইহার প্রমাণ আছে। বর্তমান পত্রিকাগুলিতে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের অভাব সম্বন্ধে লেডী সরকার যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা আন্তরিক হইলে আমরা দৈনিক না হউক অন্ততঃ এই কোডের বিরোধিতার জন্ম একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে দেখিতাম। বিলের যাঁহারা বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একটি নূতন দৈনিক পত্রও প্রকাশ করিতে পারেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

প্রস্তাবিত হিন্দু কোড সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনকে গত বৎসর গবর্মেণ্টের প্রভাবাধীনে প্রবাসী সরকারী কর্মচারী সম্মেলনে পরিণত হইতে দেখিয়া আমাদের ন্যায় যাঁহারা দুঃখিত হইয়াছিলেন এবার বাঙালীর এই প্রিয় সম্মেলনটিকে রাহুমুক্ত হইতে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছেন। এবারকার সম্মেলনে বিশেষ ভাবে বাঙালীর ও ভারতবাসীর জীবনের প্রধান সমস্যাগুলি আলোচিত হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ। বাস্তব জীবনকে বাদ দিয়া সাহিত্য হয় না, বস্তুই সাহিত্যের প্রাণ। বর্তমান যুগের সমস্যা জনসাধারণের সম্মুখে খুলিয়া ধরিবার প্রধান দায়িত্ব সাহিত্যিকের, সর্ববিধ সমস্যার আলোচনাও তাই সাহিত্যিককেই করিতে হইবে। এ দিক দিয়া এবারকার সম্মেলন সার্থক হইয়াছে। সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ-ত্রয় বাঙালী ও ভারতবাসীকে নূতন চিন্তার খোরাক জোগাইবে।

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বাংলার একটি অতি বাস্তব সমস্যার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন :

"সামাজিক আদান-প্রদানে হিন্দু ও মুসলমানের উচ্চ বা অবনত জাতির মধ্যে কোনও ব্যবধান, সমবেত ভোজনে কোন বাচবিচার বা স্পৃশ্য অস্পৃশ্য প্রভেদ না থাকে, তাহাতে সকলের সতর্ক দৃষ্টি চাই। উদারতর পারিবারিক নীতি ও অভিনব সামাজিক আচার-ব্যবহার ঘরে ঘরে অবিলম্বে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাংলার এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ অবনত ও পতিত জাতি বাংলার কৃষ্টিকে নীচের দিকে টানিয়া অতলে ডুবাইয়া দিবে। অপর দিকে উচ্চ জাতির যে ক্ষয়ের সূচনা হইয়াছে, তাহা রোধ করিবার একমাত্র উপায় শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের অন্তর্বিবাহ নয়, সকল প্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনের গণ্ডীর প্রসারণ। উচ্চ ও অবনত জাতিদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও পণপ্রথার নিষেধ, যাহা অনেক জাতির মধ্যে বিলম্বে বিবাহ ও পাপাচারের প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহা নিরোধ করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পল্লী-সমাজে হিন্দু ও ও মুসলমানদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাহ যদি ধর্মান্তরসাপেক্ষ না হয়, তাহা হইলে সামাজিক শান্তি ও সদ্ভাবের পোষক হয়। অনেক অবনত হিন্দু জাতিও মুসলমান পল্লী অঞ্চলে কৃষ্টি ও সংস্কার হিসাবে একই স্তরের—উভয়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহও প্রচলিত। এই সব স্তরে ইহাদের মধ্যে বিবাহ অসম্ভব হইয়াছে কেবল মাত্র সামাজিক অনুশাসনের জন্ম। যদি ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্র-নির্বাচনের যোগ না থাকে এবং বিবাহের জন্ম ধর্মপরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার অন্তর্বিবাহে এক দিকে যেমন বাংলার ঘোর কলঙ্ক নারী-হরণের প্রতিরোধ হয়, অপর দিকে সামাজিক শীলতা ও সদ্ভাবও রক্ষা পায়।"

সমাধান সম্বন্ধে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য না হইলেও উহা উপেক্ষণীয় নয়। ১৮৭২-এর সেন্সাস রিপোর্টে মিঃ বিভার্লি বাংলার অনুন্নত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতি ও আচার-ব্যবহারগত সাম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ শুধু ধর্মের। অনুন্নত হিন্দুকে হিন্দুসমাজ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, স্বাধীন ভাবেও ইহারা টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না, ক্রমেই ইহারা মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অনুন্নত সমাজের প্রতিনিধিগণ সাধারণতঃ মুসলমানদের সঙ্গেই সর্ব বিষয়ে যোগদান করিয়া থাকেন, বর্ণহিন্দুরা ইহাদের সমর্থন কমই পান—ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অস্পৃশ্যতা ও সামাজিক বৈষম্যের ফলে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুর মধ্যে যে প্রভেদ গড়িয়া উঠিতেছিল ইংরেজ তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে, মুসলমান রাজনীতিবিদেরাও তাহাই করিতেছেন। বাংলার এই দেড় কোটি লোককে হিন্দুসমাজের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা আজও হয় নাই ইহা দুঃখের বিষয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে হিন্দু সমাজ গত কয়েক বৎসরে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ চিন্তা বা আলোচনা আজও আরম্ভ হয় নাই। ডাঃ রাধাকমল ইহার প্রতি বাঙালী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভালই করিয়াছেন, নিম্নশ্রেণীর এই হিন্দুদের উন্নতি ও সামাজিক অধিকার প্রবর্তনের পরিকল্পনায় শিক্ষিত হিন্দুর অবিলম্বে ব্রতী হওয়া দরকার। ভারতের অন্যান্য স্থানের কোল ভীল মুণ্ডা প্রভৃতি অধিবাসীদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদেরা বহু অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু বাংলার অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের সম্বন্ধে কোন ব্যাপক অনুসন্ধান আজও হয় নাই।

বাঙালী সমাজে হিন্দু মুসলমান সমস্যা

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বাঙালী সমাজে হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন :

"যত দিন বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, তত দিন বাঙালী জাতি বলিয়া একটি কিছুর কল্পনা করা যায় না। বাঙালী জনগণের পূর্বপুরুষগণ যখন অন্য ভাষা বলিত তখন তাহাদিগকে ঠিক বাঙালী বলা চলে না। ইংরেজের বিশ্বগ্রাহী নাগরিক সভ্যতা আসিয়া বাঙালীর গ্রামীণ সভ্যতার দ্বারে হানা দিল। এই সভ্যতার সহিত বোঝাপড়া করিবার ভার বাঙালী হিন্দুর উপরই পড়িল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব দেখা দিলেন, ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে যাহা শাশ্বত এবং সর্বজনীন, তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলি আত্মসাৎ করিবার উপদেশ দিলেন, নিজ লেখনী দ্বারা বাংলার ও ভারতের জনগণকে এইরূপে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিলেন। আধুনিক কালে ভারতীয় সংস্কৃতি এই ভাবে এই যুগোপযোগী নূতন পন্থা গ্রহণ করিল। কিন্তু বাংলার ও ভারতের জনসমূহের মধ্যে একটা প্রধান অংশ এই সমন্বয়ে এবং এই সংস্কৃতি মিলনের প্রচেষ্টার সম্বন্ধে উদাসীন ছিল—সেটি হইতেছে মুসলমান সমাজ। পরে ইংরেজদিগের প্রসাদপুষ্ট হিন্দু যখন তাহার দেশের দিকে তাকাইল, তাহার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল এবং ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, তখন ইংরেজ মুসলমানের দিকে কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। ভারতের ইতিহাসে ইহার ফলে আধুনিক কালের জটিলতর সমস্যা রূপ গ্রহণ করিল, হিন্দু মুসলমানের সমস্যা।"

হিন্দু মুসলমান সমস্যার ভবিষ্যৎ

অতঃপর অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বাঙালীর সমাজে এই সমস্যা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙালী জাতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে সংস্কৃতি—ইহা মুখ্যতঃ হিন্দু ভাবে অনুপ্রাণিত—হিন্দু বাঙালীর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সমূহ সঙ্কোচন বা হানির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বাঙালী মুসলমান এখন বাংলা দেশে হিন্দুর চেয়ে সংখ্যায় অধিক; বাঙালী মুসলমান নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এখন অখণ্ড ইসলামী জাতির স্বপ্ন দেখিতেছেন, হিন্দু সংস্কৃতির তল্পীদার বা অনুচররূপে তাঁহারা মুসলমানকে আর দেখিতে চাহেন না। এইরূপে বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এক যুগসন্ধি দেখা দিয়াছে। মুসলমান বাঙালী সংস্কৃতি কি ভাবে দেখা দিবে তাহা কেহই জানে না, অনুমানও কেহ করিতে পারিতেছে না। সে জিনিস আসিলে তাহার সহিত বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতির একটা আপোষ অবশ্যম্ভাবী হইবে; কারণ, একই দেশের মধ্যে রক্তে ও ভাষায় ও ইতিহাসে এক জাতির দুই ধর্ম সম্প্রদায় দুইটি প্রতিস্পর্ধি রাষ্ট্ররূপে থাকিতে পারে না। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে লিপি এক রাখিয়া, যথেষ্ট পরিমাণে রুচি অনুসারে চল এই নীতি পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ মুসলমান লেখক আবশ্যক মনে করিলে আরবী ফারসী শব্দ বাংলায় ব্যবহার করিবেন এবং বিশেষ করিয়া ইসলামীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই প্রকার শব্দ হিন্দুদিগেরও শিখিয়া লইতে হইবে। কিন্তু আরবী ফারসী শব্দ যদি এই ভাবে ভাষায় আসিয়া যায়, তাহার জন্য চিন্তিত হইবার বিশেষ কিছু নাই।

"জাতি শিক্ষায় যত উন্নত হয়, তত তাহার মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য কমিয়া যায়, ভাষা তত এক হইয়া যায়। বাংলা দেশে যদি সেই প্রার্থনীয় অবস্থা না আসে, যদি এই মানব ধর্মকে আশ্রয় করিয়া দুইটি বিভিন্ন রচনা শৈলী পাশাপাশি অবস্থান করে, যত দিন না সুবুদ্ধির উদয় হয়, যত দিন বিরোধের দিক উপেক্ষা করিয়া মিলনের দিকেরই সাধনার দ্বারা এক সংস্কৃতি ও এক রাষ্ট্রীয় আদর্শের পাশে মিলাইয়া না লইতে পারি, তত দিন এই অবস্থাকে পরাধীনতার আর একটা কুফল বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। বর্তমানে কোন কোন বাঙালী মুসলমানের অনাবশ্যক আরবী ফারসী শব্দের দিকে যে ঝোঁক দেখা দিয়াছে তাহার কিছু পরিবর্তন হইবেই।"

ভারতবাসীর একজাতীয়তা

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা তাঁহার অভিভাষণে বলেন :—"দেশ বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদিগের দেশ কি বঙ্গভাষা-ভাষীর দেশ? আমাদিগের দেশ কি ভারতের অংশবিশেষ, অথবা আমাদিগের দেশ সমগ্র ভারতভূমিকে লইয়া গঠিত? আমার মনে হয়, বাঙালী ভাবে যাহারা ভারতের একাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করে, তাহারা দেশাত্মবোধে চেতনাহীন, পরন্তু তাহাদিগের কাহাকেও বা আমরা দেশদ্রোহী বলিতেও কুণ্ঠিত হই না। এক শ্রেণীর লোক এই অখণ্ড ভারতকে ক্ষুদ্র প্রদেশের গণ্ডী দ্বারা ভাগ করিতে চাহে এবং প্রাদেশিকতা অতি প্রচণ্ডভাবে তাহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও আচারে, ব্যবহারে, কর্মে ও চিন্তায় প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহারা বাংলা দেশে অন্য প্রদেশের লোকের প্রতিষ্ঠাতেও দুঃখ বোধ করে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, কোনও কোনও স্থানে উগ্র প্রাদেশিকতা বাঙালীর প্রবাস-জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। অখণ্ড ভারতে প্রাদেশিকতার এই অত্যাচার জাতীয়তার পরিপন্থী। বহুকালব্যাপী অস্পৃশ্যতার ফলে আজ যেমন হিন্দু ও মুসলমান সমাজ এক দেশে বাস করিয়াও পরস্পরের সম্বন্ধে অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনোভাব পোষণ করিতেছে, যেমন সমগ্র হিন্দু সমাজ ঐ একই অস্পৃশ্যতার ফলে 'শেডিউল্‌ড কাস্ট' নামে একটি নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনই প্রাদেশিকতা অদূর ভবিষ্যতে অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইবে। আজ সেই জন্যই বৈজ্ঞানিক ভাবে আমাদিগের মানসিক পটভূমি গঠনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া এ কথাও স্পষ্টভাবে মনে উঠিতেছে যে, এই সর্ববিধ দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া ফেলিয়া আমরা সমগ্র ভারতকে সমবেতভাবে এক সমাজ, এক জাতি বলিয়া জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করি—ইহা একান্ত

বাঞ্ছনীয়। যাহারা প্রাদেশিকতার প্রচার করে অথবা অন্তরূপে সমাজে বিভেদ ঘটাইবার ব্যবস্থা দেয়, তাহারা সকলেই দেশ-দ্রোহী। আমি আপনাদিগের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পুষ্টি-কল্পে, বৈজ্ঞানিক প্রেরণার প্রয়োগসূত্ররূপে তাই এই মানসিক পটভূমির প্রতি আপনাদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।"

চীনের লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্থান দাবী করে নাই। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রুশ রাষ্ট্রসমূহ আত্মনিয়ন্ত্রণের ও মূল ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছেদের অনুমতি লাভ করিবার পরও রুশ মুসলমান আত্মহত্যার এই সর্বনাশা পথে পা বাড়ান নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই ভারতবর্ষে মুসলমান জনসাধারণের অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতার সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর নেতা পাকিস্থানের ধুয়া তুলিয়া সমগ্র দেশের ক্ষতি সাধনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ ও নেতৃত্ব কায়েম রাখিবার জন্য দেশের স্বার্থ বলিদানের এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বন্দেমাতরম্ ও মুসলিম সমাজ

'প্রত্যহ' পত্রে বন্দেমাতরম্ ও মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে যুগ্ম-সম্পাদক মৌলবী আফতাব-উল-ইসলামের স্বাক্ষরে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন হইল কলিকাতায় আনন্দমঠের নাট্যরূপ 'সন্তান' অভিনয়ের মধ্যে বন্দেমাতরম্ গানটি লইয়া গোলযোগ বাধে এবং অভিনয় স্থগিত রাখিতে হয়। উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি এই উপলক্ষে রচিত। মৌলবী সাহেব লিখিতেছেন :

"এই ব্যাপারে বিভিন্ন মহল হইতে নানাবিধ খেদপ্রতিবাদ নূতন করিয়া উত্থাপিত হইয়াছে। সখেদে লক্ষ্য করিতেছি যে, কেহ কেহ ইহাতে মুসলমান ধর্মবিরোধী ও পৌত্তলিকতার গন্ধও পাইতেছেন। ইহা বিশেষ ক্ষোভের হইলেও উত্থাপিত যুক্তি-তর্ক পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি এবং সাম্প্রদায়িকতার হীন মনোবৃত্তি-সঞ্জাত।

"জাতীয় জীবনে 'বন্দেমাতরমে'র অত্যুচ্চ স্থান অনস্বীকার্য্য। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস ইহাকে সরকারী ভাবে জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকার করিয়া লইবার প্রাক্কালে মুসলমানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত উলেমাদের মতামত বিবেচনা করেন। বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া কংগ্রেস ইহার প্রথম দুইটি কলি জাতীয় সঙ্গীত রূপে বরণ করিয়া লন এবং তদবধি এই সম্পর্কে আর কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই ; কিন্তু ইদানীং ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া যে জটলার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অনভিপ্রেত ত বটেই, বরং ইহা গূঢ় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া আমাদের ধারণা।

"'বন্দেমাতরম্' ভারতের জাতীয় সঙ্গীতই শুধু নহে, ইহা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয়-চিহ্নও বটে। কংগ্রেস তথা ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ইহা যে উদ্দীপনা ও প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অন্য কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। সম্মিলিত ভাবে ভারতের পরাধীনতার পাষাণ-বেদীতে হৃদয়শোণিত বিসর্জন দিয়া শহীদ হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে। 'বন্দেমাতরমে'র পিছনে রহিয়াছে তিতিক্ষা ও লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও আত্মদানের অমর ইতিহাস। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় তাই 'বন্দেমাতরমে'র দান সর্বাধিক।"

বন্দেমাতরম্ গানের মাত্র প্রথম দুই কলিকে জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণের প্রস্তাব যখন হয়, তখনই বহু জনে আশঙ্কা করিয়াছিলেন এই আপোষের শেষ হয়ত এখানেই হইবে না। সেই আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। মৌলবী আফতাব-উল-ইসলামের ন্যায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন বন্দেমাতরম্ গান হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জাতীয় সংগ্রামকে উদ্দীপিত করিয়াছে। সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলায় গানটি রচিত হইলেও উহা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি নহে, সমগ্র ভারতবাসীর সম্মুখে "অমলিন শুভ্রতা ও মহত্তম আদর্শবাদ লইয়া বন্দেমাতরম্ শুচিশুভ্র ও সমুন্নত শীর্ষ হইয়া রহিয়াছে।" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে ও পরে বন্দেমাতরম্ গানের উদ্দীপনা ও সার্থকতা অব্যাহতই থাকিবে।

ভারতবর্ষে বিদেশী চিকিৎসক আমদানী

নিখিল-ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের ২১তম অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ জীবরাজ মেটা বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনয়ন করার নীতির বিরোধিতা করিয়া বলেন, এই নীতি গ্রহণ করা ও বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবসায়কে অবহেলা করা একই কথা। এই সকল চিকিৎসক অল্পকাল ভারতে বসবাস করিয়া ভারতবাসীর জীবনধারণ-প্রণালী ব্যক্তিগতভাবে জানিতে পারেন না। তাই আমাদিগের সমস্যায় ইঁহারা যে প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাত করিতে পারিবেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। বৈদেশিক চিকিৎসকগণ আমাদিগের অবস্থার সহিত পরিচিত নহেন।

জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য বিদেশ হইতে চিকিৎসক আমদানী না করিয়া ভারত-সরকার অনায়াসে ভারতীয় চিকিৎসকগণকে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য বিদেশে পাঠাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা উহা না করিয়া বিলাতী 'এক্সপার্ট' আমদানীর প্রতিই বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। ভারতবর্ষ যত দিন পরাধীন থাকিবে তত দিন বিশেষজ্ঞের নামে বিদেশী চিকিৎসক আমদানী চলিতে থাকিবে এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের বড় বড় পদগুলিও সাহেবদের জন্য রিজার্ভ থাকিবে।

পরলোকে রমঁ্যা রোলঁ্যা

জঁ ক্রিস্তফে'র রচয়িতা রমঁ্যা রোলাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী একজন মানবপ্রেমিক, সুপণ্ডিত ও সুলেখক হারাইল। রোলঁ্যার মৌলিক চিন্তাধারা দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সমাজের একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। তিনি নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছিলেন। প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। নানা বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পত্রালাপও হইত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পৃক্ত রচনাবলী প্রকাশের জন্য তিনি সর্বপ্রথম তাঁহাকেই প্রেরণ করেন। রোলঁ্যার মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ অনুভব করিতেছি।

বৰ্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম-ইউরোপে যুদ্ধের পরিস্থিতি কিছু বদলাইয়াছে, যদিও এখনও তাহার অনিশ্চিত ভাব সম্পূর্ণ রূপে যায় নাই। লুক্সেমবুর্গ ও বেলজিয়ামের সীমান্ত অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষ সম্প্রতি জার্মান সেনার অগ্রগতি রোধ করিয়াছে, যদিও এখনও যুদ্ধের গতিমুখ সর্ব্বতোভাবে ফিরে নাই। আরও দক্ষিণে, আলসাস্-লোরেন অঞ্চলে জার্মান সেনা এখনও প্রতিহত হয় নাই, তবে সেখানে দুর্বিপাকের ভয় কিছু অংশে গিয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে লিখিবার সময় পর্য্যন্ত (২৬শে পৌষ) যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডষ্টেট এখনও অগ্রসর হইবার চেষ্টায় ব্যস্ত এবং জার্ম্মান-বাহিনীগুলি ব্যাপক ভাবে পিছু হটিবার কোনও নিদর্শন দেখায় নাই। অন্য দিকে আমেরিকান বাহিনীগুলি প্রবল যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধের অবস্থা ফিরাইবার অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছে এবং সম্প্রতি উত্তর দিক হইতে ব্রিটিশ সেনা এই যুদ্ধে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৰ্ত্তমানেও যুদ্ধের মধ্যে একটা দ্রব ভাব রহিয়াছে এবং সাধারণভাবে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের একটি সংযুক্ত চিত্র এখনও দেখা যাইতেছে না। তবে সমস্ত যুদ্ধপ্রান্তে মিত্রপক্ষের পাল্টা আক্রমণ পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক ঘনীভূত ভাবে দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ যে অংশে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমেরী মিত্রসেনার অধিনায়ক, সেখানে জার্ম্মান দলগুলি চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া এক অংশে পিছু হটিয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর যে অতর্কিত আক্রমণ আরম্ভ হয়, তাহার ফলে মিত্রপক্ষের পশ্চিম প্রান্তের অভিযানের সমস্ত রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই পরিবর্ত্তন কত কাল স্থায়ী হইবে এবং ইহার প্রভাব কতটা হইবে তাহা নির্ভর করে পশ্চিম সীমান্তের এই নূতন জার্ম্মান অভিযানের স্থিতিকাল এবং শেষ ফলাফলের উপর। এই অভিযানের ফলে ইতিমধ্যেই যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে শেষ নিষ্পত্তির দিন কতটা পিছাইয়া যাইবে তাহাও নির্ভর করে কত দিনে জার্ম্মান অভিযান সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিহত হয় তাহার উপর এবং সেই সঙ্গে দুই পক্ষের আপেক্ষিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণের উপর। যুদ্ধ এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে কাহারও পক্ষে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ অসম্ভব, সুতরাং এতাবৎ দুই পক্ষের আপেক্ষিক পরিস্থিতির বিচার অসম্ভব।

ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডষ্টেটের সেনাবাহিনীগুলি যে পরিমাণ সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছে তাহার পিছনে যে কেবলমাত্র রণ-কুশলী রণনায়কের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা বা জার্ম্মান সেনার যুদ্ধশক্তি বা অস্ত্রবল রহিয়াছে তাহা নহে, ইহার কতকটা কারণ মিত্র-পক্ষের উচ্চতম অধিকারিবর্গের অকারণ আশু জয়-প্রত্যাশা এবং বিপক্ষদলের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে ভুল বিচারও বটে। মিঃ চার্চ্চিলের অনুমানে জার্ম্মানদলের সর্ব্বশুদ্ধ ছয় লক্ষ সৈন্য মাত্র (৪০ ডিভিসন) পশ্চিম রণপ্রান্ত রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। মিত্র-পক্ষের অন্যান্য যুদ্ধবিশারদদিগের অনুমানও ঐরূপ ছিল এবং সকলেই মোটামুটি জার্ম্মানীর বর্ত্তমান সৈন্যশক্তির পরিমাণ আঠার লক্ষ হইতে বিশ লক্ষে (১২০-১৪০ ডিভিসন) নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে আনুমানিক ১০ লক্ষ পূর্ব্ব সীমান্তে, ছয় লক্ষ পশ্চিম সীমান্তে, তিন লক্ষ ইটালীতে এবং বাকী ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদিতে ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন জার্ম্মানীতে কনস্ক্রপ্শন হইতে প্রতি বৎসর যে নূতন সৈন্য আসে তাহার পরিমান যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পুরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং জার্ম্মান ক্রমেই ক্ষীণ-বল হইয়া পড়িবে ইহাই অবশ্যম্ভাবী। অস্ত্রবলের দিকে মিত্র-পক্ষের বিমানবিশারদগণ বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মানীর উপর যেরূপ অবিশ্রাম বোমা বর্ষণ আজ আড়াই বৎসর কাল চলিয়াছে তাহাতে যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করা অসম্ভব। মিঃ চার্চ্চিল একবার এ কথাও বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মানীর অস্ত্রনির্ম্মাণ শক্তি শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ কমিয়াছে এই বোমা বর্ষণের ফলে। উপরন্তু মিত্রপক্ষের সামরিক



ষ্টলবার্গে যুদ্ধের তাণ্ডব-লীলার মধ্যে মার্কিন সৈনিক। তাহার পায়ের কাছে মৃত নাৎসী সেনা

বিভাগ ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে পশ্চিম যুদ্ধপ্রান্তের এবং তাহার অব্যবহিত পিছনে জার্ম্মানীর উপরের আকাশে মিত্র-পক্ষের বিমানশক্তি সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করার ফলে জার্ম্মানীর পক্ষে বড় অনুপাতে সৈন্য বা রসদের চলাচল অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, কেননা, ঐ সমস্ত অঞ্চলের সকল পথঘাট মিত্রপক্ষের বিমান সেনা প্রতিনিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে এবং কোনরূপ চলাফেরা দৃষ্টিগোচর হইলেই সকল যানবাহন, রেল ও ষ্টীমার ইত্যাদি সমূহ ভাবে আক্রান্ত হইতেছে। সুতরাং জার্ম্মানীর শক্তি মিত্রপক্ষের তুলনায় প্রায় এক-পঞ্চমাংশে দাঁড়াইয়াছে এবং সে অনুপাতও ক্রমেই নীচের দিকে চলিয়াছে। এক দিকে এই বিশ্বাস এবং অন্য দিকে নূতন অভিযান প্রবর্ত্তন করার ক্ষমতা ("ইনিশিয়েটিভ") চিরদিনের মত হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে জার্ম্মান রক্ষীসেনা স্থাণুভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত, এই দুইয়ের ফলে মিত্রপক্ষের উচ্চতম অধিকারিবর্গ নিশ্চিন্তপ্রায় হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

ডিসেম্বরে ইটালী এবং হাঙ্গেরীতে প্রায় এক সঙ্গেই জার্ম্মান দল পশ্চিম প্রান্ত পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে। পশ্চিমে মিত্র-পক্ষের ব্যুহচ্ছেদ করিয়া জার্ম্মান শক্তিপ্রবাহ প্রায় ২৫০০ বর্গমাইল স্থান পুনর্ব্বার দখল করে। ইটালীতে পো নদীর অববাহিকা ও উপত্যকার প্রবেশ-পথ প্রায় মিত্রপক্ষের হস্তগত হইতেছিল এমন অবস্থায় বিপরীত আক্রমণে মিত্রপক্ষের বাহিনীগুলি গতিরু-

এবং বহুস্থলে স্থানচ্যুত হইয়া অচল হইয়া পড়ে। হাঙ্গেরীতে জার্মানদল বুডাপেষ্টের রক্ষায় অতি প্রচণ্ড যুদ্ধে সোভিয়েট সেনার গতিরোধ করে—সেখানে গত দেড় মাসে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—এবং অন্য দিকে নূতন জার্মানবাহিনী সোভিয়েটের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও অবরুদ্ধ অক্ষসেনার সাহায্যার্থে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। রুশ রণপ্রান্তের উত্তর ভাগে সোভিয়েট সেনা প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। এইরূপে জার্মান সমর-পরিষদ সকল প্রান্তেই একই সময়ে নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ করায় এক যুদ্ধ-প্রান্ত হইতে শক্তি সরাইয়া অন্য প্রান্তে যোজনার কথা উঠিবারই অবকাশ পায় না। জার্মানীর পক্ষে এরূপ লড়িবার ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল সে প্রশ্ন লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। কেহ বলে ইহা জার্মানীর শেষ যুদ্ধচেষ্টা, সুতরাং ইহাতে তাহার গচ্ছিত শক্তির অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল সে সব কিছুই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি তাহা সত্য হয় তবে এই নূতন চেষ্টাগুলি ব্যর্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সমর শক্তি দ্রুতবেগে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অন্যদের মতে জার্মানীর শক্তির অবশিষ্ট পরিমাণ সম্বন্ধে ভুল অনুমান করা হইয়াছে, বোমাবর্ষণের ফল আশানুরূপ হয় নাই এবং জার্মানীর শক্তিক্ষয়ও যতটা অনুমান করা হইয়াছে ততটা হয় নাই। যদি এই শেষ কথাই ঠিক হয় তবে যুদ্ধ এখন কিছুদিন চলিবে। কোন্ অনুমান সত্য সেটা বলা এখন অসম্ভব।

জার্মানীর এই শীত অভিযানগুলির ফলে শুধু যে ইউরোপে মিত্রপক্ষের সমর-পরিকল্পনায় অনেক অদলবদল অবশ্যম্ভাবী তাহাই নহে, বরঞ্চ ইহার গভীর ছায়া এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরেও পড়িতে পারে। এক দল যুদ্ধ-সমালোচক বলেন এই শীত অভিযান জার্মানীর পক্ষে শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা। আমরা বলিতে বাধ্য যে তাঁহাদের যুক্তির সপক্ষে বিশেষ কোনও প্রমাণ আমরা এখনও দেখিতে পাই নাই। আমরা যতটুকু সংবাদ যুদ্ধপ্রান্ত হইতে পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় এই অভিযানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য সম্মিলিত জাতিবর্গের মূল অভিযান পরিকল্পনাগুলি সাময়িকভাবে ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে নূতন রূপে পরিকল্পনা গঠনে বাধ্য করিয়া যুদ্ধের কালবিস্তৃতির বৃদ্ধি এবং সেই অবকাশে নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা। যেভাবে জার্মানী ১৯৪৪ সালের ঝড়বাদল কাটাইয়াছে, তাহার পর অবকাশ পাইলে সে যে ১৯৪৫ সালও সংরক্ষণের চেষ্টায় কাটাইতে পারে ইহা অসম্ভব নহে। সময় এখন কাহারও অনুকূল নহে, বরঞ্চ আমেরিকার উচ্চতম অধিকারিবর্গের কথায় বুঝা যায় যে বেশী সময় পাইলে জাপানের সামরিক ব্যবস্থা অতি প্রবল হইয়া উঠিতে পারে।

ইটালীর যুদ্ধে গত মাসে অনেক ফেরফার ঘটিবার পর সম্প্রতি সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘটিয়াছে। সেখানে এই দীর্ঘ ১৬ মাস ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলেও অক্ষশক্তির প্রতিরোধ-চেষ্টায় কিছুমাত্র ভাটা পড়ে নাই। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব হইতে পারে যদি মিত্রপক্ষ পো নদীর অববাহিকা ও উপত্যকার উপর অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। সুতরাং এইখানে আরও ঘোর যুদ্ধের সম্ভাবনা রহিয়াছে। গ্রীস ও বল্কানের যুদ্ধ এখন কূট রাষ্ট্রনীতির পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। গ্রীসের যুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণ ভাবে সম্মিলিত জাতিবর্গেরই শক্তি ক্ষয়ের অনুকূল। যুগোশ্লাভিয়াতেও যুদ্ধ স্থাণুভাব ধারণ করিয়াছে পরস্পরের উপর সন্দেহ এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে। এই সকল পরিস্থিতির ফলে বল্কানে অক্ষশক্তির উপর যুদ্ধের চাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। হাঙ্গেরীতে অতি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। রাজধানী বুডাপেষ্টের দুই-তৃতীয়াংশ সোভিয়েটের দখলে আসা সত্ত্বেও জার্মান ও হাঙ্গেরীয় সেনা প্রচণ্ড প্রতিরোধ করিতেছে এবং দূরে নূতন জার্মানবাহিনী বর্ম্ম ও শকটবাহী গোলন্দাজ সেনাদলের সাহায্যে সোভিয়েটের বেড়াজাল কাটিয়া রাজধানী-রক্ষীদলের সহায়তায় বিষম যুদ্ধ করিতে করিতে আগে চলিতেছে। হাঙ্গেরীর বিস্তীর্ণ যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে যুদ্ধের এক অংশের নিষ্পত্তির যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার উপর অষ্ট্রিয়ায় ও চেকোশ্লোভাকিয়ায়—এবং সেই সঙ্গে পোলাণ্ডে—অক্ষ-শক্তির নিকট ভবিষ্যতের অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে।

সুদূর প্রাচ্যে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের শক্তি-পরীক্ষা প্রবলতর ভাবে হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বে এবং সম্প্রতি সেখানে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার সকল উদ্যোগ ও ব্যবস্থাই পশ্চিম-ইউরোপের রণাঙ্গনের অবস্থা পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই হইয়াছিল সুতরাং সেখানকার ছায়া এখনও ওখানে স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় নাই। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে ঐরূপ বিরূপ অবস্থা আরও কিছুকাল স্থায়ী হইলে প্রশান্ত মহাসাগরে, চীনে ও ব্রহ্মদেশে তাহার প্রভাব পড়িবেই। সম্প্রতি ফিলিপিনে আমেরিকার অভিযানের শক্তি ও গতি যেভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিল তাহাতে চীন দেশে অনেক কিছু অবস্থা-পরিবর্ত্তন আশা করা যাইতেছিল। অবিলম্বে ইউরোপে জার্মান শীত অভিযান স্থানবদ্ধ হইয়া গেলে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না ঘটিতেও পারে। লেইটে দ্বীপ সম্পূর্ণভাবে মার্কিন সেনার আয়ত্তে আসিবার ফলে আমেরিকান যুদ্ধ পরিষদের হাতে একটি অতি সুন্দর অভিযান-ভিত্তিস্থল আসিয়া পড়িল। ফিলিপিন দ্বীপমালায়—বিশেষ লুজন এবং মিণ্ডানাও—দখল করিবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের অভিযানে ঘোরতর যুদ্ধ লড়িতে হইবে, কেননা সেখানে জাপানীদল এত দিনে অনেক কিছু আয়োজন করিয়াছে এবং তাহারা যে "মরিয়া" হইয়া লড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

চীন-ইন্দোচীন সীমান্তে পুনরায় জাপানী অভিযান চলিবে মনে হয়। জাপান স্থলপথে শ্যাম, মালয়, ব্রহ্ম ও সেখান হইতে ওলন্দাজ দ্বীপময় ভারতে সৈন্য ও মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত এবং সে কার্য্যের অনেক অংশ শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং চীন-ইন্দোচীন সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার চেষ্টায় সে কোনও ত্রুটি করিবে না ইহা নিশ্চিত। চীন-ব্রহ্ম সীমান্তে যুদ্ধ আগেকার মতই চলিয়াছে। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের আরাকান অঞ্চলে জাপানীরা যুদ্ধ ব্যবস্থা গুটাইয়া সরিয়া যাইতেছে, যাহার ফলে আকিয়াব বন্দর বিনাযুদ্ধেই হস্তগত হইয়াছে। এখানে জাপানীরা "সময়ের বদলে স্থান দান" নীতি অবলম্বন করিল, না অন্য কোনও কারণ আছে তাহা এখনও বুঝা যায় নাই।

প্যারা-সৈনিক চিম্‌নি

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। কে যেন একটা ঘনকৃষ্ণ পোঁচড়া টানিয়া আকাশের বক্ষ হইতে আলোকের শেষ কণিকাটুকুও মুছিয়া তুলিয়া লইয়াছে। দূরে বহু দূরে আকাশের সুদূর প্রাকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকার ঝিকিমিকি সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করিলেও সে স্পন্দিত আলোকমালা অন্ধকারের গভীরতাকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। দীপালির শেষে সকল প্রদীপ নিভিয়া যখন মাত্র দুটা-একটা এখানে-ওখানে টিম্‌টিম্ করিতে থাকে; অমাবস্যা যখন তার করালকৃষ্ণ মুখ ব্যাদান করিয়া চরাচরকে গ্রাস করিয়া ফেলে; তখন যেমন দুই-একটা মরণোন্মুখ প্রদীপের শিখা সে বিভীষিকা দূর করিতে কিছুমাত্রই পারে না, শুধু আরও প্রকট করিয়া তোলে; এই তীব্র গভীর ঘোরকৃষ্ণ রজনীর বক্ষে তারকার দ্যুতিও তেমনি নিস্তেজ প্রতীয়মান হইতেছে। উপরের আকাশ এই রকম। নীচের আকাশ আরও ভয়ঙ্কর কালোর পাথার। ধরণীর বক্ষ হইতে ত্রিশ হাজার ফুট উপরে ভাসমান দ্রুতগতি বিমানবক্ষে বহু শত সৈনিক চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে তাহা দুই-এক জন উপরওয়ালা ব্যতীত কেহই জানে না। প্রত্যেক সৈনিকের পৃষ্ঠে সুপটু হস্তে ভাঁজ-করা রেশমের প্যারাশুট বাঁধা। সকলে শুধু জানে যে সময় হইলে তাহাদের ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া ঐ অনন্ত অন্ধকারের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে এবং তার পর সম্পূর্ণরূপে নিজ অদৃষ্ট ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া অজানার সহিত যুঝিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে। এই অসাধ্য সাধন ব্রতে যাহারা নামিয়াছে তাহারা সকলেই বিশেষ করিয়া বাছাই করা সৈনিক এবং এই কার্য্যের জন্য তাহারা বহুকাল ধরিয়া বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছে। বহু শত বার হাজার হাজার ফুট উপর হইতে প্যারাশুট লইয়া লাফাইয়া এবং একাকী বহু অস্ত্র-সরঞ্জাম বহন করিয়া দিনের পর দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া ও নকল যুদ্ধ সাধনান্তে আজ তাহারা প্রথম সাক্ষাৎ যুদ্ধের কার্য্যে এই কষ্টলব্ধ বিদ্যা প্রয়োগ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। সকলে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে—কখন হুকুম আসিবে "এইবার প্রস্তুত।" বিমানের এঞ্জিনের ঘোর কলরোলের মধ্যে কথা বলা কঠিন; কিন্তু তাহার মধ্যেই কিছু কিছু কথোপকথনের চেষ্টা চলিতেছে।

চিম্‌নি তাহার সঙ্গী অজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা যখন নীচে পৌঁছুব তখন যদি একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে নামি তা হলে?" অজয় বলিল, "তোর ছিপটা সঙ্গে নিয়েছিস ত? পুকুরে পড়লে মাছ ধরবি। আবার কি?" চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ! মাছ কি করে ধরব? জলে পড়লে সাঁতার দিতে হবে না?" অজয় বলিল, "সাঁতার দিবি আর মাছ ধরবি। এই কাজে শুনেছিস ত একসঙ্গে সব কিছু করতে হতে পারে। গা ঢাকা দিয়ে চলা, গুলি চালান, রান্না, খাওয়া, ঘুমান, শত্রুর মাল-মশলা নষ্ট করা, কেল্লা, সাঁকো প্রভৃতি উড়িয়ে দেওয়া; সব একসঙ্গে। এ ত খালি সাঁতার দিতে দিতে মাছ ধরা। আমাদের কাছে এ ত জল-ভাত।" চিম্‌নি বলিল, "দূর, সাঁতার দিতে দিতে আবার কেউ মাছ ধরতে পারে?"

হঠাৎ চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ করিয়া বিমানের এঞ্জিনগুলি থামিয়া গেল। বহু উর্দ্ধে আকাশ বাহিয়া বিমানবাহিনী বায়ুবক্ষে ভাসিয়া নিঃশব্দে ক্রমশঃ নীচের দিকে চলিতে লাগিল। বহু নিম্নে কাহারা যেন আলোক-সঙ্কেতে কি জানাইতে লাগিল। অনলচক্ষু যেন কোন মহাদানব নিমীলিত নয়ন ক্ষণে ক্ষণে উন্মোচিত করিয়া উপর প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। হুকুম আসিল, "এইবার প্রস্তুত! এখন হইতে পাঁচ মিনিট পরে সকলে নিয়ম মত প্যারাশুট ঝম্পন করিবে। মাটিতে পৌঁছাইতে পনর-কুড়ি মিনিট সময় লাগিবে। প্রথম কর্ত্তব্য মাটিতে নামিয়া প্যারাশুট গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া ফেলিবে। তৎপরে সকলে ভোর হওয়া অবধি গা ঢাকা দিয়া থাকিবে। আলো হইলে পর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি ছোট পাহাড় দেখিবে এবং যথাসম্ভব নিঃশব্দে সকলে সেই দিকে গিয়া মিলিত হইবার চেষ্টা করিবে। একান্ত প্রয়োজনেও কেহ গুলি চালাইবে না। শত্রুকে নিঃশব্দে নিঃশেষ করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে। সকলে প্রস্তুত!"

চিম্‌নি ও অজয় যথাস্থানে গিয়া দাঁড়াইল। বিমানের লেজের দিকে একপাশে একটা দরজা। সেই পথে ক্রমান্বয়ে এক এক করিয়া প্যারা-সৈনিক দল ঝাঁপ দিয়া সেই অতল অন্ধকারের মধ্যে পড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ অজয় ও চিম্‌নির পালা আসিল। অজয় চিম্‌নির পিঠে একটা চড় দিয়া বলিল, "ছাতা খোলবার দড়িটা ঠিক টানিস, নয়ত মিনিট কয়েক পরেই স্বর্গের ময়দানে ডাণ্ডাগুলি খেলতে সুরু করবি।" বলিয়া সে চট্ করিয়া উন্মুক্ত পথে শূন্যে লাফাইয়া পড়িয়া অন্তর্হিত হইল। চিম্‌নি "ডাণ্ডাগুলি না ছাই"...বলিতে বলিতে পিছনের লোকটি তাহাকে এক ধাক্কায় আগাইয়া দিল। চিম্‌নি দীর্ঘ দেহটাকে ঈষৎ আয়ত্তে আনিবার জন্য ঘাড় নীচু করিয়া হাঁটু বাঁকাইয়া এক লম্ফে শূন্যমার্গে উপস্থিত হইল। তার পর এক, দুই করিয়া পাঁচ অবধি গুনিয়া নিয়মমত ছাতা খুলিবার দড়িটাতে টান দিল। প্রথমে কিছু হইল না। শূন্যপথে ডিগ্‌বাজি খাইতে খাইতে চিম্‌নি হাজারখানেক ফুট নীচে চলিয়া আসিল। একবার মনে হইল, যদি প্যারাশুট না খোলে তাহা হইলে কি হইবে; কিন্তু সে সম্ভাবনা তাহার মনে কোন ভয়ের সঞ্চার করিল না। মায়ের মৃত্যুর পর হইতেই মরণ চিম্‌নির নিকট নিজ ভয়ঙ্কর ভাব হারাইয়াছিল। মৃত্যু যেন একান্ত আকাঙ্ক্ষিত কিছু একটা যাহার সহিত তাহার মাতৃমূর্ত্তি ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। সে যেন একটা দেশ যাহা অতি সুন্দর, চির আনন্দের ও শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় অবস্থিত। সেখানে পৌঁছান কঠিন ও কষ্টকর কিন্তু একবার পৌঁছাইলে নিদারুণ গ্রীষ্মে শীতল সায়রে অবগাহনের মতই শান্তি ও তৃপ্তিদায়ক। হঠাৎ প্যারাশুটটা খুলিয়া গেল ও চিম্‌নি এক ঝটকায় সোজা হইয়া মন্দগতিতে দোদুল্যমান অবস্থায় নামিয়া চলিতে লাগিল। নীচে, আরও নীচে সেই চির অন্ধকারের সীমাহীন কূপ-

পথে শেষহারা গতিতে। হাত চালাইয়া দেখিয়া লইল যন্ত্রবন্দুক, পিস্তল, বোমার থলিটি, জলের বোতল, ঔষধের বাক্স প্রভৃতি ঠিক আছে কিনা। উপরে তাকাইয়া দেখিল অন্ধকারের স্রোতে ভাসমান বুদ্বুদের মত প্যারাশুট দুলিতেছে। অন্ধকারে আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু সমস্ত আকাশ ছাইয়া তাহারই মত আরও অনেকে এইরূপে নামিয়া আসিতেছে মনে করিয়া তাহার মনটা খুশী হইয়া উঠিল। কিছুকাল গত হইলে নিচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল চতুর্দ্দিকের কালোর মধ্যে আরও ঘন কালো কি একটা দ্রুত তাহার দিকে উঠিয়া আসিতেছে। বুঝিল ধরণীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে অবতরণের ধাক্কা সামলাইবার জন্য সমস্ত শরীরটাকে সজাগ করিয়া লইল। কোথায় গিয়া পড়িবে কে জানে? বৃক্ষের ডালে, কিম্বা কাহারও গৃহের ছাদে, অথবা পঙ্কে কিম্বা কাঁটার ঝোপে। তাহার গতি অকস্মাৎ চক্ষের পলকে শেষ হইল। সে একটা তীব্র ধাক্কা খাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াইয়া গিয়া মাটির উপর দিয়া স্কন্ধের রজ্জুর আকর্ষণে ঘর্ষিত হইয়া চলিতে লাগিল। অল্প চেষ্টাতেই এই আকর্ষণ প্রতিরোধ করিয়া চিম্‌নি দাঁড়াইয়া উঠিল। তৎপরে রজ্জুর বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে প্যারাশুটটা যেখানে প্রকাণ্ড একটা প্রাণহীন জন্তুর দেহাবশিষ্টের মত পড়িয়া ছিল সেইখানে উপস্থিত হইল। সকল রজ্জু ও কাপড় একত্র করিয়া সে স্থান খুঁজিতে লাগিল সেগুলিকে পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য। জায়গাটা কিছু ঝোপঝাড়ে পূর্ণ হইলেও সে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দুইটি ঝোপের মধ্যে একটা স্থান আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তৎপরে ছোট একটা ধারাল খোন্তা দিয়া একটা ঈষৎ গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। নিঃশব্দে ঠেলিয়া ঠেলিয়া সকল রজ্জু ও রেশমের পুঁটুলি সে ঐ গর্ত্তে ভরিয়া ফেলিয়া মাটি চাপা দিয়া দিল এবং তৎপরে উদ্বৃত্ত মাটিটুকু ইতস্তত: ছড়াইয়া দিয়া কর্ম্ম সমাধান করিল। দু-চারটা শুষ্ক পাতা ও কাঠি কুড়াইয়া সেই "কবর"-স্থলটিকে অল্প-বিস্তর ঢাকিয়া দিয়া একটা স্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিল।

তখনও ভোর হইতে কিছু বিলম্ব ছিল। চিম্‌নি এই পরিশ্রমের পরে বোতল হইতে এক চুমুক মাত্র জল খাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে কখন কখন নানা প্রকার খুসখাস আওয়াজ আসিতে লাগিল। একবার মনে হইল মানুষের পায়ের আওয়াজ। চিম্‌নি একটা ছোট রবারের লাঠি খুলিয়া হাতে লইয়া বসিল। নিঃশব্দে কাহাকেও কাবু করিয়া ফেলিবার জন্য ইহার তুল্য অস্ত্র নাই। ইহার এক আঘাতে অতি বড় নিরেট মস্তকও ঘুরিয়া যায় ও আহত ব্যক্তি বহুক্ষণের জন্য স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। পায়ের আওয়াজ কিন্তু নিকটে না আসিয়া ক্রমশ: দূরে সরিয়া গেল। চিম্‌নিও দেহ এলাইয়া দিয়া অবসাদের মুদ্রায় ঝোপের আড়ালে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। বোধ হয় ক্ষণিকের জন্য সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ একটা অজানা কারণে সে তীব্র গতিতে সটান সজাগ হইয়া বসিল। ভোরের আলো তখনও আকাশপথে দেখা দেয় নাই; শুধু তার আগমনের আবছা একটা রেশমাত্র অন্ধকারের গভীরতাকে কতকটা দাবাইয়া আনিয়াছে। সেই ঈষৎ হাল্কা অন্ধকারের গহ্বর হইতে একটা লোক হঠাৎ একান্ত নিঃশব্দে চিম্‌নির পায়ের দিকে মাথা তুলিয়া উঠিয়া কর্কশ বিজাতীয় কণ্ঠে ও ভাষায় তাহাকে শাসাইয়া কি যেন বলিয়া উঠিল। চিম্‌নি অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, এটা আবার কে? কোথা থেকে এল। এই, আরে···" লোকটা ক্ষিপ্ত কুকুরের মত খ্যাঁক করিয়া উঠিয়া দুই হস্তে দুইটা রিভলভার উচাইয়া তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল। চিম্‌নি এবার বুঝিল এ শত্রুপক্ষ। "তবে রে, দাঁড়া! তোকে দেখাচ্ছি।" বলিয়া চিম্‌নি অর্দ্ধশায়িত অবস্থা হইতেই নিজ দেহ উৎক্ষিপ্ত করিয়া লোকটার মধ্যপ্রদেশে জোড়া পায়ে পদাঘাত করিল। লোকটার কোন অসাবধানতা দোষ ছিল না। সাধারণ মানুষ শায়িত অবস্থায় থাকিলে, তাহা হইতে যতটা দূরে থাকিলে নিজেকে নিরাপদ বিবেচনা করা যায় সে তাহা অপেক্ষা আরও এক ফুট আন্দাজ অধিক দূরেই ছিল। অন্ধকারে সে বুঝিতে পারে নাই যে মানবদেহ কখন এতটা লম্বা হয় বা হইতে পারে। হাঁটু গুটাইয়া চিম্‌নি শুইয়া ছিল। তাহার পক্ষে চার-পাঁচ ফুট দূরের লোককে পদাঘাত করা সহজসাধ্যই ছিল। লোকটা চিম্‌নির প্রচণ্ড পদাঘাতে একটা জান্তব আওয়াজমাত্র করিয়া ধরাশায়ী হইল। চিম্‌নিও দ্রুত উঠিয়া তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেননা ধর্ষিত ব্যক্তি তখন স্বপ্নলোকে। চিম্‌নি "ব্যাটা, মরল না কি?" বলিয়া তাহাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া, তাহার অস্ত্রশস্ত্র নিজের ঝোলার মধ্যে ভরিয়া লইল। তারপর অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিল লোকটা ওঠে কি না।

তখন আকাশ ধূসর হইতে ক্রমশ: পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। লোকটা একবার নড়িল চড়িল বলিয়া মনে হইল। চিম্‌নি তাহার সামরিক শিক্ষা অনুযায়ী তাহার হাত পা বাঁধিয়া দিল। লোকটা চোখ খুলিয়া ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চিম্‌নি বলিল, "এই তুম্ কোন্ হায়?" লোকটা নির্ব্বাক। "ব্যাটা তুই কে রে? দেখতে ত চিনের মত, আবার কেমন কেমন যেন; তুই কে রে? কোন্ হায়?" লোকটা উত্তর দিল "জাতা খাশ!" চিম্‌নি বলিল, "যাতা খাস আবার কি? আমি কেন যা তা খেতে যাব। তোর ইচ্ছে হয়, তুই খাস।" লোকটা বলিল, "এশ্‌তা।" চিম্‌নি বলিল, "তোমার মাথা আর মুণ্ডু।" তার পর লোকটাকে তুলিয়া লইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। লোকটা তাহাকে দুই-এক বার লাথি মারিতে ও কামড়াইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু চিম্‌নি তাহার গলাটা ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দেওয়ার পরে সে শান্ত ও সুবোধ বালকের মত চুপ করিয়া রহিল। একটা ডাঙা জমি পার হইয়া চিম্‌নি দেখিল একটা শস্যক্ষেত্র। ক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে একটা ছোট বাড়ী।

বন্দী ব্যক্তিকে বাড়ীটার সম্মুখে একটা গাছের সহিত বাঁধিয়া ও তাহার মুখে একটা কাপড় গুঁজিয়া দিয়া চিম্‌নি বাড়ীর মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। বাড়ীর বারান্দাটা বেশ পরিষ্কার ও বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য একটা দরজা। চিম্‌নি অতি সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া দেখিল, ভিতরে আধ-অন্ধকার কিন্তু কেহ নাই। দরজাটা অল্প অল্প করিয়া আরও ফাঁক করিয়া চিম্‌নি ঘরের ভিতরে

মাথা ঢুকাইয়া দেখিল একটা নেয়ারের খাট ও দেয়ালে হেলান-দেওয়া একটা সঙ্গীন-চড়ান বন্দুক। তা ছাড়া একটা ছোট টেবিলের উপরে দুটা কার্তুজের বেল্ট ও একটা খাকি রঙের সামরিক থলি ও জলের বোতল। বুঝিল কোন সৈনিক ঐ ঘরে থাকে। চিম্‌নি দ্রুতগতি ঘরে ঢুকিয়া বন্দুকটি করায়ত্ত করিল ও তৎপরে ঘরের অপর দিকের দরজা খুলিয়া বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় উপস্থিত হইল। দেখিল দুই পার্শ্বে দুইটি ঘর তালা বন্ধ ও উঠানের অপর দিকে বোধ হয় ভৃত্যদের থাকিবার একটি কাঁচা-পাকা ঘর—গাছের ডাল দিয়া ছাউনি করা। চিম্‌নি ধীরে ধীরে উঠানটা পার হইয়া নিঃশব্দে সেই ঘরটার নিকট উপস্থিত হইল। তারপর নিজের রবারের গদাটা ডান হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া এক ধাক্কায় দরজাটা খুলিয়া দিল। দরজাটা এক ঝট্‌কায় খুলিয়া দেয়ালে দড়াম করিয়া লাগিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে কে যেন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার করিল ত আর থামিতে চাহে না। সে তীব্র আর্তনাদ অক্লান্ত আবেগে পাগলের মুখে ক্লারিওনেটের মত কর্ণ বধির করিয়া মুখর হইয়া উঠিল। চিম্‌নি চীৎকার করিয়া বলিল, "আরে, আরে, থাম্ না কে রে বাবা ; সাপে কামড়াল নাকি ?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঘরের ভিতরের স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ স্থগিত রাখিয়া বাহিরের দিকে আগাইয়া আসিল। চিম্‌নি দেখিল একটি অল্পবয়স্কা রমণী, তাহার পরিধানে রঙিন লুঙ্গি ও খাটো ঝুলের কোট ; কেশপাশ জড়াইয়া জড়াইয়া মাথার উপরে পরিপাটি জটার মত করিয়া বাঁধা। চিম্‌নিকে দেখিয়া রমণী হাত-মুখ নাড়িয়া দুর্বোধ্য ভাষায় অনেক কিছু প্রশ্ন করিয়া ফেলিল। চিম্‌নি কিছু না বুঝিয়া বলিল, "আরে, হাম, তুম—আপকা বাত নাহি বুঝতা।"

রমণী প্রত্যুত্তরে হাতের ভঙ্গীতে বুঝাইল যে চিম্‌নি দীর্ঘকায় কিন্তু অল্পায়তন ব্যক্তি কোথায় ? খর্ব্বকায় ব্যক্তির বর্ণনা করিতেও তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। চিম্‌নি এক গাল হাসিয়া বলিল "ও সে ব্যাটাকে গাছে বেঁধে রেখে এসেছি।" তৎপরে জিজ্ঞাসা করিল "কিছু খাবার আছে ?" রমণী বুঝিতে না পারায় হাত তুলিয়া মুখে লাগাইয়া বুঝাইতে রমণী কি বলিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল ও অনতিবিলম্বেই একটা বড় বাটিতে কি সব খাদ্যদ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। চিম্‌নি বন্দুক, গদা, থলি প্রভৃতি একপার্শ্বে রাখিয়া খাদ্যবস্তু সন্তর্পণে চাখিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। দুই-এক গ্রাস খাইয়া মন্দ লাগিল না। সে বেশ গুছাইয়া মাটিতে বসিয়া খাইতে সুরু করিল। রমণী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কি সব বলিয়া আরও অপর খাদ্য-সম্ভার আনিয়া বাটিতে ঢালিয়া দিতে লাগিল। চিম্‌নি দন্তবিকাশ করা ব্যতীত অপর কোন উপায়ে তাহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অক্ষম হইয়া খাইয়া চলিতে লাগিল, প্রায় খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় রমণী চিম্‌নির পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে হাঁই-মাই করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চিম্‌নি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্ব্বেই কে আসিয়া তাহার উপরে সবলে পতিত হইল ও তাহাকে কুস্তির প্যাঁচের মত করিয়া ধরিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া তাহার বুকে চড়িয়া বসিল। চিম্‌নি দেখিল তাহার ইতিপূর্ব্বের বন্দী কোন উপায়ে বন্ধন মুক্ত করিয়া আসিয়া তাহার উপর আক্রমণ করিয়াছে। লোকটা চট্ করিয়া নিজের জামার ভিতর হইতে একটা ছুরি বাহির করিয়া চিম্‌নির বুকে বসাইবার জন্য উদ্যত হইল। চিম্‌নি কোন উপায়ে একটা হাত ছাড়াইয়া লইয়া উহার ছুরির হাতলটা ধরিয়া ফেলিল। লোকটা খর্ব্বাকৃতি হইলেও বেশ জোরাল ছিল এবং চিম্‌নির সে যাত্রায় কি হইত বলা যায় না কিন্তু এমন সময় ঐ রমণীটি দ্রুতগতি সেই খাবারের বড় বাটিটা তুলিয়া সবলে খর্ব্বকায় লোকটার মাথায় আঘাত করিল। লোকটা এই অতর্কিত আক্রমণে ক্ষণিকের জন্য ঘাবড়াইয়া গেল ও চিম্‌নি সেই সুযোগে তাহার হাত হইতে ছুরিটা ঝাঁকড়ানি দিয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে এক হাতেই তাহার মাথার চুল ধরিয়া তাহাকে নিজের বুকের উপর হইতে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিল। "তবে রে পেছন থেকে মারিস ! তবে আমিও মারি, দেখ !" বলিয়া তাহাকে সবেগে এক চপেটাঘাত করিল। চড়ের আওয়াজটা পিস্তল ছোড়ার মত সশব্দে বাজিয়া উঠিল ও লোকটা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চিম্‌নি বলিল, "ব্যাটা এক চড়েই অজ্ঞান, আবার ছুরি বের করে।" বলিয়া তাহাকে আপাদ-মস্তক দড়ি জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তৎপরে নিজের অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জাম উঠাইয়া লইয়া লোকটাকে কাঁধে তুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তখন বেশ আলো হইয়া গিয়াছে। এদিক-ওদিক দেখিতেই প্রায় মাইল দুই দূরে দেখিল একটা ছোট পাহাড়। বুঝিল ঐ-খানেই যাইবার কথা। ঝোপঝাড় গাছপালা দেখিয়া দেখিয়া গা ঢাকা দিয়া চিম্‌নি সেই দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর চলিবার পর পশ্চাতে পদধ্বনি শুনিয়া চট্ করিয়া ঘুরিয়া দেখিল সেই রমণী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে। চিম্‌নি বলিল, "আরে তুমি, আপনি কাঁহা যাতা হায় ?"

রমণী হাসিয়া কি যেন বলিল, চিম্‌নি বুঝিল না। পরে পাহাড়টা দেখাইয়া তাহাকে বুঝাইল সে সেইখানে যাইতেছে ও তাহাকে ইঙ্গিতে বলিল ফিরিয়া যাইতে। রমণী মাথা নাড়িয়া বলিল সে যাইবে না, চিম্‌নিরই সহিত যাইবে।

চিম্‌নি বলিল, "দ্যুৎ, কোথায় যাবে ? লড়াই হবে যে।"

নারী হাসিল, কিছু বলিল না। চিম্‌নি বুঝিল বাক্যালাপে কোন ফল হইবে না। সে তখন বন্দী ব্যক্তির পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া সঙ্কেতে বলিল "আগে, আগে চল" ও তৎপরে তাহার কোমরের দড়ি হস্তে ধরিয়া পুনরায় চলিতে লাগিল।

লোকটা চিম্‌নির অলক্ষিতে ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া সোজা পথ ছাড়িয়া ডান দিকে যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক বৃক্ষ-শোভিত উচ্চভূমির নিকটে আসিয়া স্ত্রীলোকটি দৌড়াইয়া চিম্‌নির হাত চাপিয়া ধরিয়া চিম্‌নিকে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও এক ঝটকায় দড়ি ছাড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। চিম্‌নি তাহাকে হেঁচকা টানে নিজ কবলে আনিয়া পুনর্ব্বার পা বাঁধিয়া শোয়াইয়া দিল। রমণী ইসারাতে বুঝাইল ঐ বৃক্ষরাজির অপর পার্শ্বে বিপদ। চিম্‌নি বুঝিল বন্দী তাহাকে নিজের দলের লোক আছে এমন জায়গায় লইয়া যাইতেছিল। তখন তাহারা বন্দীকে পুনরায় উঠাইয়া লইয়া অতি সন্তর্পণে

লুকাইয়া লুকাইয়া সেই স্থল ত্যাগ করিল। প্রায় সিকি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা একটা উচ্চ ডাঙাজাতীয় স্থানে পৌঁছাইয়া ঝোপের আড়াল হইতে দেখিল যে পূর্ব্বপরিত্যক্ত বৃক্ষমালার অপর দিকে একটা সামরিক ঘাঁটির মত কিছু রহিয়াছে। সেখানে চার-পাঁচ জন সৈনিক ঘোরাফেরা করিতেছে। তাহারা পুনর্ব্বার সেই পাহাড়ের দিকে চলিতে লাগিল।

কিছুকাল চলিবার পরে চিম্‌নির সহযাত্রিণী হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল ও সঙ্কেতে চিম্‌নিকে থামিতে বলিল। তৎপরে সে বেশ জোরে জোরে শিষ দিতে আরম্ভ করিল। চিম্‌নি, "আরে, আরে শুনতে পাবে যে!" বলিয়া বাধা দিতে নারী তাহাকে আশ্বস্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা নালার ভিতর হইতে একজন মধ্যবয়স্ক লোক বাহির হইয়া আসিল। সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিম্‌নিরা যে-স্থলে ছিল সেখানে চলিয়া আসিল। এ ব্যক্তি সাধারণ রকম বস্ত্র পরিহিত ও তাহাকে দেখিলে মনে হয় যে দীর্ঘকাল কষ্ট সহ্য করিয়া দিন কাটাইয়াছে। সে আসিয়াই রমণীকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল ও রমণী তাহাকে উত্তরে যাহা বলিল তাহা শুনিয়া খুশী হইয়া উঠিল। তৎপরে সে বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দী সৈনিককে এক পদাঘাত করিয়া তীব্র ভাষায় দুর্ব্বোধ্য গালিগালাজ করিয়া নিজ ভূমিকার শেষ করিল। চিম্‌নি বলিল, "আরে, এ আবার কে? মারিস কেন ওকে?" তৎপরে তাহাদিগকে কোন কথা বুঝান অসম্ভব জানিয়া বন্দীকে পুনরায় কাঁধে তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

দুই-তিন ঘণ্টাকাল হাঁটিয়া, হামাগুড়ি দিয়া তাহারা অবশেষে সে পাহাড়টার সানুদেশে উপস্থিত হইল। চিম্‌নি অতঃপর কি করিবে চিন্তা করিতেছে এমন সময় পরিচিত প্রথামত কে হাঁকিয়া উঠিল, "হল্ট! হু কামস দেয়ার।" চিম্‌নি চিৎকার করিয়া উঠিল, "আরে আমি, হাম হায়—মানে ফ্রেণ্ড!" উত্তরে কে বলিল, "ব্যাটা সপরিবারে হাজির। আবার কাঁধে খোকাও রয়েছে। এই চিম্‌নি, বলি এগুলোকে জোটালি কোথা থেকে?" বলিতে বলিতে অজয় ও আরও তিন চার জন সৈনিক হঠাৎ আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চিম্‌নি বলিল, "আমি এইটাকে ধরে এনেছি আর ওরা নিজেরাই চলে এল ত আমি কি করব।"

অজয় বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, তুই আর কি করবি? ওরা চলে এল।"

পাঞ্জাবী নায়ক বলিল, "আরে শুমনি, তুম একঠো আদমি পকড় ল্যায়া ত উসকো বাপ বহিন কো ভি সাথ মে লে লিয়া?" চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ! আমি···হাম উস্‌কো ইস্‌কো কিসিকো নাহি ল্যায়া। তুম জিগাস করো।" ইতিমধ্যে একজন সেনানায়ক সে স্থলে আসিয়া পড়ায় এই আলোচনা স্থগিত রহিল। একজন দোভাষী আসিল ও তাহার সাহায্যে জানা গেল যে এই রমণী ঐ ব্যক্তির কন্যা এবং উভয়ের বাসস্থান দখল করিয়া বন্দী ব্যক্তি একটি স্থানীয় ঘাঁটি বানাইয়া বাস করিত। এই এলাকায় অধিক শত্রুসৈন্য নাই। এইরূপ ছোট ছোট ঘাঁটি মাত্র চারিদিকে আছে। শত্রুপক্ষ এই উপায়ে এই স্থলের অধিবাসীদিগের ঘরে ঘরে বাস করিয়া একাধারে বেশ দখল, পাহারা ও নিখরচায় বাস তিন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে। কোথায় কোথায় কি প্রকার ঘাঁটি আছে তাহার খবরও পাওয়া গেল।

আকাশবাহিনীর প্রধান সেনানায়কের নিকট এই সকল খবর পৌঁছাইলে তিনি চিম্‌নিকে তলব করিলেন ও তাহার নিকট তাহার সকল কার্য্যকলাপ মনোযোগ সহকারে শুনিলেন। তৎপরে বলিলেন যে চিম্‌নি এই অভিযানের কার্য্য সকল করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে; কেননা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত খবর পাওয়াতে তাহারা অতঃপর বিলম্ব না করিয়াই শত্রু নিপাত কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবে। চিম্‌নি এই জন্য বিশেষ পুরস্কার ও সম্মান লাভ করিবে। তিনি তৎপরে বলিলেন যে উক্ত রমণী ও তাহার পিতাও পুরস্কৃত হইবে ও তাহাদের যথাশীঘ্র কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। রমণী ও তাহার পিতা পুরস্কার পাইয়া খুব খুশী হইল এবং দোভাষীর দ্বারা জানাইল যে তাহারা শত্রুহস্তমুক্ত হইয়া চিম্‌নির নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। চিম্‌নি বলিল, "আরে আমি ওদের কোথায় বাঁচালাম? ওরা ত নিজে নিজেই চলে এল। তা ছাড়া ঐ মেয়েটা বাটি দিয়ে ওকে এক ঘা না লাগালে ত ও ব্যাটাই আমায় ছুরি মেরে দিত।"

অজয় বলিল, "দূর গাধা! তুই ও মেয়েটাকে উদ্ধার করেছিস। ওর উচিত তোর গলায় মালা দেওয়া আর তোর উচিত এর পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে চিরদিন বেঁচে থাকা। কি বল নায়কসাহেব?"

নায়ক হেঁ হেঁ করিয়া হাসিয়া বলিল, "জরুর, বেশখ, বিলকুল ঠিক বাত!"

দোভাষী তাহাদের কথাবার্ত্তা বরাবর তর্জ্জমা করিতেছিল। রমণীর পিতা তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিল যে, সকল পুরস্কার অপেক্ষা বড় পুরস্কার হইবে চিম্‌নির মত জামাতা লাভ করিলে। মেয়েটিকেও খুব নারাজ বলিয়া মনে হইল না। চিম্‌নি লজ্জায় লাল হইয়া ঘামিয়া উঠিয়া বলিল, "ধ্যেৎ, আমার বাবা নেই এখানে আমি বিয়ে করব কি করে? তা ছাড়া ও ত আমার কথাই বুঝবে না।"

অতঃপর সকল সৈনিকরা নানাবিধ উপহার প্রভৃতি দিয়া উক্ত রমণী ও তাহার পিতাকে বিদায় দিল। তৎপরে আসন্ন সংগ্রামের আয়োজন চলিতে লাগিল। ভোর হইতেই অনেক লোকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাওয়াই জাহাজ হইতে প্যারাশুট নিক্ষিপ্ত অপরাপর অস্ত্র সরঞ্জাম খুঁজিয়া জোগাড় করিয়া আনিয়া একত্র করিতেছিল। এখন সকলে মিলিয়া এই পাহাড়টার চারিদিকে সেই সকল ছোট-বড় কামান, যন্ত্রবন্দুক, বোমানিক্ষেপ-যন্ত্র, কাঁটা তার প্রভৃতির সাহায্যে ও মাটি কাটিয়া প্রাকার পরিখা ইত্যাদি বানাইয়া নিজেদের একটা দুর্গের মত আস্তানা গড়িয়া ফেলিল। এইখান হইতে নানাদিকে যোদ্ধাবাহিনী পাঠাইয়া শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করা হইবে স্থির হইল। আর একদল সৈন্য পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গাছ কাটিয়া, জমি সমতল করিয়া হাওয়াই জাহাজ নামিবার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। সকলেই দ্রুতগতিতে কাজ করিয়া চলিল; কেননা অনতিবিলম্বেই শত্রুপক্ষ তাহাদের আক্রমণ করিবে একথা স্থির-নিশ্চয়।

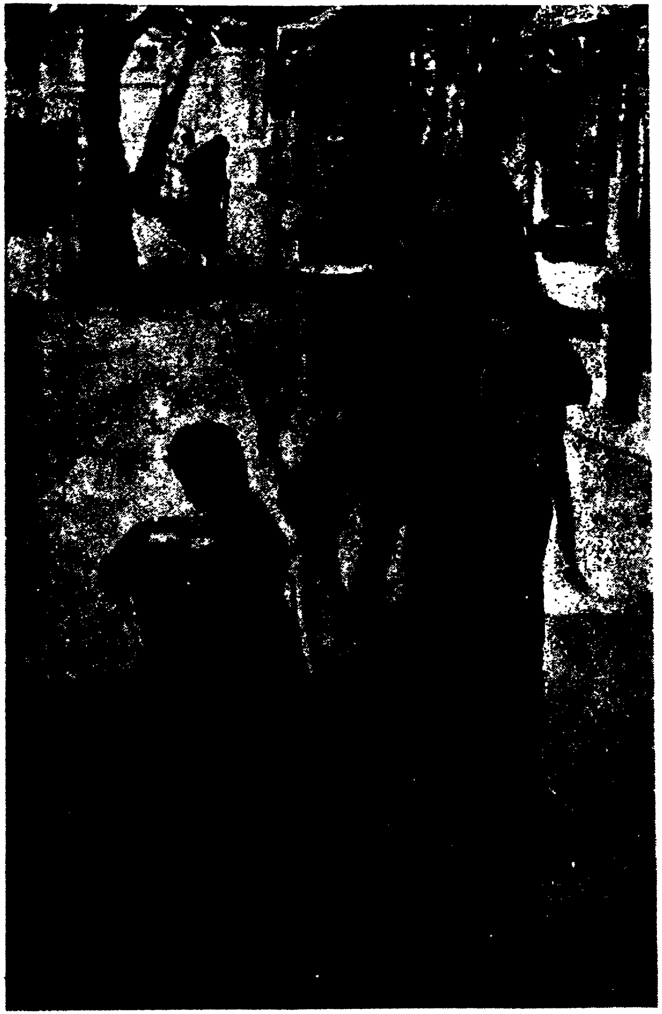
(ক্রমশঃ)



জাপানীদের অবস্থান-স্থল পর্য্যবেক্ষণে রত চীনা মেশিন-গান চালক সৈন্য



বর্ম্মা-রোডের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের সকল শ্রেণীর স্বেচ্ছাসেবক খাদ্য ও সমরোপকরণ রণাঙ্গনে লইয়া যাইতেছে



দুর্গত



খিদিরপুরের বাজার

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজে বৌদ্ধ-প্রভাব

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

অনেকেরই ধারণা যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা হয়ত জানেন না যে, ভারতে প্রচলিত বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম কি ভাবে কিরূপ প্রভাব লইয়া মিশিয়া রহিয়াছে। দেখিবার মত দৃষ্টি দিয়া দেখিলেই সব দেখা যাইবে। এখানে আমরা একে একে সেই বিষয়গুলিরই কিছু কিছু দেখাইবার চেষ্টা করিব।

হিন্দুদের জগন্নাথক্ষেত্র ভারতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। কিন্তু এই তীর্থের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই ইতিহাস বাহির হইয়া আসে। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুরও প্রায় তিন শতাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাস বলিতে-ছেন :—

"পুনঃ তা তেজিয়া বৌদ্ধ অবতার
হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর
সুভদ্রা তাহাতে চিন॥"

বুদ্ধ অবতার তিন মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন, যথা—জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে আমরা হিন্দুগণ এই তিন দেবতারই পূজা করিয়া থাকি। অথচ চণ্ডীদাস বলিতেছেন, বুদ্ধ অবতারই এই তিন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই তিন মূর্ত্তির উপাসনায় প্রকারান্তরে আমরা বুদ্ধদেবেরই পূজা করি-তেছি। বৌদ্ধগণের নিকট বুদ্ধদেব জগন্নাথ নামেও পরিচিত। নেপালে প্রচলিত বৌদ্ধ 'স্বয়ম্ভু পুরাণে'র ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"তদ্‌যথাসৌ জগন্নাথঃ শাক্যমুনিস্তথাগতঃ।
সর্ব্বজ্ঞো ধর্ম্মরাজোঽর্হম্মুনীশ্বর বিনায়কঃ॥"

ইলোরার বৌদ্ধ দেবালয় জগন্নাথদেবের মন্দির বলিয়া কথিত হয়। মাগুনিয়া দাস তাঁহার গ্রন্থে জগন্নাথকে দশাবতা-রের নবম অবতার বুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জগন্নাথ-দেব বলিতেছেন :—"মুঁই বউদ্ধ রূপ হই।" (মাগুনিয়া দাস) উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে দশাবতারের যে প্রাচীন মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাতে বুদ্ধস্থানে জগন্নাথমূর্ত্তি অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম-পূজা বিধান গ্রন্থোক্ত দশাবতার প্রসঙ্গে বুদ্ধ স্থানে জগন্নাথের কথা বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগণের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের বর্ত্তমান রূপ যথাক্রমে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। বৌদ্ধদের তিন ধর্ম্ম-যন্ত্রের সহিত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের বর্ত্তমান মূর্ত্তি সাদৃশ্যসম্পন্ন। জগন্নাথের পূজায় হিন্দুগণ প্রকারান্তরে বৌদ্ধ ত্রিরত্নেরই পূজা করিতেছেন। জগন্নাথের রথোৎসবকে কেহ কেহ বৌদ্ধরথোৎসবের রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।

গয়া পূর্ব্বে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধগয়ায় একটি দেবালয়ে একখানি গোলা-কৃতি প্রস্তরে দুইটি পদচিহ্ন আছে। ঐ দেবালয়ের নাম বুদ্ধপদ ছিল, পরে তাহা বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। গয়া-মাহাত্ম্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, তীর্থযাত্রীরা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধগয়া গমনপূর্ব্বক ধর্ম্ম[১] ও ধর্ম্মেশ্বর বুদ্ধদেবকে প্রণাম করতঃ বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। যথা—

"ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধি তরুং নমেৎ।"

পিতৃপুরুষগণের সদ্গতির জন্ত গয়াকৃত্য প্রত্যেক হিন্দুরই অবশ্যকর্ত্তব্য। আর হিন্দুগণের এই গয়াকৃত্যের মধ্যে ধর্ম্মেশ্বর বুদ্ধের পূজা ও মহাবোধি তরুর পূজা অবশ্যকরণীয়।

হিন্দুশাস্ত্রে বুদ্ধদ্বাদশী-ব্রতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[২] ভারতে 'পঞ্চল' নামে যে জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে এখনও বুদ্ধ পূজা প্রচলিত। ('পঞ্চল' শব্দ—বিশ্বকোষ)। পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শালগ্রাম শিলায় বুদ্ধপূজার উল্লেখ আছে। যে শালগ্রামে বুদ্ধ পূজার বিধি আছে, তাহার লক্ষণ, যথা—

"অনুগহ্বরসংযুক্তং চক্রহীনং যদা ভবেৎ।
নিবীতবুদ্ধসঞ্জ্ঞস্থাৎ দদাতি পরমং পদম্॥"

ঐতিহাসিকগণ বলেন, উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা উৎসব ও পশ্চিম-বঙ্গের গাজন উৎসব বৌদ্ধ উৎসবের হিন্দু রূপান্তর। গম্ভীরা ও গাজন উৎসবের ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ কালক্রমে শিবে রূপান্তরিত হইয়া-ছেন।[৩] শূন্তপুরাণোক্ত ধর্ম্মপূজা উৎসবে মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিব পূজা করিতেন।

কোন কোন গ্রন্থে বুদ্ধ ও শিবের সম্মিলিত ধ্যানও দেখা যায়। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মকে বিষ্ণুনারায়ণের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। মাণিক গাঙ্গুলী ধর্ম্মকে—'গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ গদাধর'—বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মের বাসস্থান বৈকুণ্ঠ ও তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী। পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম্মঠাকুরের পূজা বুদ্ধপূজা ব্যতীত অন্ত আর কিছু নহে। উত্তরবঙ্গেও স্থানে স্থানে ধর্ম্মরাজের পূজা প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্মরাজও বুদ্ধ ব্যতীত অন্ত কেহ নহেন। বাংলার স্থানে স্থানে প্রতি বৎসর যে ধর্ম্মসন্ন্যাসের মেলা হয় তাহা এই বৌদ্ধধর্ম্মের অতি ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। চৈত্রমাসের গাজনের সময় এখনও বঙ্গের নানা স্থানে হিন্দুমহিলারা নীলাবতীর উদ্দেশ্যে উপবাস করেন ও তাঁহার পূজা পাঠাইয়া থাকেন। এই নীলাবতী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবী। প্রসূতির আশুগর্ভমোচনের জন্ত বৌদ্ধদেবী জগুলার দোহাই দিতে এখনও পঞ্জিকাকার বলেন। বাংলাদেশের ধর্ম্মঘরিয়া যোগীরা বৌদ্ধদেবী হারিতীকে শীতলারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া পূজা করে। এখন এই শীতলা দেবী হিন্দুদের ঘরে

১। এখানে ধর্ম্ম শব্দে ধর্ম্মের স্ত্রীমূর্ত্তি সূচিত করিতেছে। বৌদ্ধেরা সচরাচর ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়াছেন; প্রস্তরেও ধর্ম্মের স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। নেপালে এই ধর্ম্ম 'পারমিতাপ্রজ্ঞা' নাম্নী দেবী, ধর্ম্ম দেবী, উগ্রতারা দেবী নামে কথিতা হন। আর ইনিই সম্ভবতঃ জগন্নাথের সুভদ্রা।

২। বরাহপুরাণ ৪৭ অধ্যায় ও হেমাদ্রির 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি ব্রতখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩। "আদ্যের গম্ভীরা"—শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত, ১১৯ পৃ.। চণ্ডী-মঙ্গল বোধিনী, ১ম ভাগ, ৬০ পৃ.।

ঘরে পূজা পাইতেছেন। চণ্ডীদাস-পূজিতা নান্নুরের বাসুলী দেবী বৌদ্ধদেবতা বজ্রেশ্বরী। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই ধর্ম্মগুরু। তিব্বতে ও নেপালে প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে ও বাংলায় প্রচলিত ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত, কিন্তু 'হঠযোগ প্রদীপিকা' নামক নাথপন্থের হিন্দু যোগগ্রন্থে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মগুরু বলিয়া বিবেচিত। আবার গোবিন্দদাস কৃত 'কালিকামঙ্গলে' তাঁহারা কালিকাভক্তরূপে উল্লিখিত রহিয়াছেন। অথচ বৌদ্ধগ্রন্থ শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপূজাবিধানে তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মগুরু। ঐতিহাসিকগণ বলেন, বৌদ্ধ ও শৈব মতের সম্মিলনে নাথধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। নাথগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছেন। নাথপন্থী যোগীরা শিব ও ধর্ম্মনিরঞ্জন উভয়েরই পূজা করেন। তাহাদের নিরঞ্জন 'অলেখ' (অলক্ষ্য) বা শূন্যস্বরূপ। এই অলেখ নিরঞ্জনের প্রসঙ্গ নানক, কবীর, দাদু, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধকগণের পদাদিতেও পাওয়া যায়, হিন্দু গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়; আবার রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। বাংলার চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধ-প্রভাবের বিষয় জানা যায়। বাংলার চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও বৌদ্ধসমাজ বিদ্যমান। সেখানে নীলকমল দাসকৃত 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে বুদ্ধদেবের একটি জীবনীগ্রন্থ প্রচারিত দৃষ্ট হয়।

হিন্দুশাস্ত্রের আদ্যাশক্তি ও বৌদ্ধশাস্ত্রের আদ্যা অভিন্না। মাণিকদত্তের চণ্ডীতে এই আদ্যাকে মঙ্গলচণ্ডী নামে অভিহিত দেখা যায়। মঙ্গলচণ্ডী এখন হিন্দুর ঘরে ঘরে হিন্দুনারীগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন। মহাযান বৌদ্ধের মহাশূন্য, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের নির্গুণ ব্রহ্ম বাংলার 'ধর্ম্মমঙ্গল'কারদিগের গ্রন্থে 'ধর্ম্মনিরঞ্জন' নামে অভিহিত। প্রাচীন মহাযান-সম্প্রদায় শূন্যবাদের সমর্থক হইলেও প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি হইতে সৃষ্টিকথা প্রকাশ করেন নাই। রামাই পণ্ডিত শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্ম হইতে আদ্যা বা মূল প্রকৃতির সৃষ্টিকথা বলিয়া কালচক্রযান বা অনুত্তর মহাযানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রভাব সমস্ত বৌদ্ধতন্ত্রে ও বহু হিন্দুতন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শূন্য নিরঞ্জন বা ব্যোমাতীত নিরঞ্জনের প্রসঙ্গ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাস্ত্রেরই বহুস্থানে পাওয়া যায়। হিন্দুদার্শনিকগণ বৌদ্ধ শূন্যবাদকে নাস্তিক্যবাদ মনে করিয়া তাঁহাদের দর্শনগ্রন্থাদিতে 'শূন্যবাদ' বহু যুক্তিবিচারসহ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করেন নাই যে, বহু হিন্দুশাস্ত্রেই হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্মকে শূন্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[৪]

বাংলার ধর্ম্মসমাজে বৌদ্ধ শূন্যবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাদিতে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন দৃষ্ট হয়। সৃষ্টিপত্তন নামক এক প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে জগৎ সৃষ্টি প্রসঙ্গে আছে :—

"প্রথমে আছিলা প্রভু শূন্য অন্ধকার।
সৃষ্টিস্থিতি না আছিল সভাল সংসার।"

মণিমাধব রচিত সদ্গোপকুলাচার গ্রন্থে আছে :—

"আদ্যাশক্তি মহামায়া তাঁর প্রতি আজ্ঞা দিয়া
শূন্যাসনে বসিলা নিরঞ্জন।"
"ব্রহ্মাকে সৃষ্টি দিয়া আদ্যাশক্তি সঙ্গে লইয়া
শূন্যাসনে বসিলা নিরঞ্জন॥"

হিন্দুতন্ত্রে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন যে, বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৌদ্ধ সহজযানেরই একটি বিভিন্ন রূপ। কিন্তু এ সম্বন্ধে সুধীগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। তবে ইহা সত্য যে, বৌদ্ধ সহজযানের সাধনা, সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনা, তন্ত্রের সাধনা, নাথপন্থীর সাধনা, বাউল ও কবীরপন্থীর সাধনা—এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতিতে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। এতৎসম্পর্কে ১৩৫০, অগ্রহায়ণ সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত "সহজিয়া সাধন" শীর্ষক প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন রাজমালা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"বৌদ্ধভিত্তির উপরই বঙ্গদেশের হিন্দুয়ানী গঠিত হইয়াছে।" বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত অনেক পূজাপার্ব্বণ ও দেবদেবীর মধ্যে ইহার নিদর্শন আমরা পাইয়া থাকি। বৌদ্ধ সভ্যতা দেশবাসী সাধারণের হৃদয়ে এমনই ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী হিন্দু নেতৃগণকে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সময়ে বৌদ্ধভিত্তির উপরই হিন্দুয়ানীর প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই কারণে কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'অমিতাভ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধমতে অনুপ্রাণিত। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট ও নিবিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুধর্ম্মের বহু শাখার একটি শাখাবিশেষ।

৪। "স্বপ্রকাশানন্দঘনং শূন্যমবভদেবংবিৎ স্বপ্রকাশং পরমেব ব্রহ্ম ভবতি।"

"প্রণমেব পরং ব্রহ্মাত্মপ্রকাশম্ শূন্যম্" (নৃসিংহোত্তর তাপনী উপনিষদ্)
"স এব বা এষ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ" (মৈত্রায়নী উপনিষদ্)
"আত্মন্যেব স্থিতোঽসি ত্বং সর্ব্বশূন্যোঽসি নির্গুণঃ।"
(তেজোবিন্দু উপনিষদ্)

"সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং।" (উত্তর গীতা)
"পঞ্চমং বিন্দুসঙ্কাশং প্রণবঃ শূন্যরূপকঃ।" (পদ্মপুরাণ, ৫ম অধ্যায়)
"তিষ্ঠন্তি খেচরীমুদ্রা তস্মিন্ শূন্যে নিরঞ্জনে।" (হঠযোগ প্রদীপিকা)
"তিষ্ঠান্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছূন্যং অহর্নিশম্।
তদাকাশময়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে।" (শিবসংহিতা)
"উর্দ্ধং ধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মনঃ উচ্যতে।
শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।" (জীবন্মুক্তি গীতা)
"ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতং।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং শূন্যমহং চিন্তয়েদবিরোধতঃ।" (শিবগীতা)
"অহং রুদ্রোঽপ্যহং শূন্যমহং ব্যাপী নিরঞ্জনং।" (জ্ঞান সঙ্কলিনীতন্ত্র)
"ইন্দ্রিয়ৈরহিতো দেব শূন্যরূপঃ শিবঃ সদা।" (লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র)
"তস্মাত্তু পরমং শূন্যং তস্মাৎ তত্ত্ব নিরঞ্জনং।"
(প্রাণতোষণী, বসুমতী সংস্করণ, ৪৩৮ পৃ.)

রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক এস. এন. কিউ. জুলফিকর আলী

রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে গেলেই দুটি দিনের দুটি ঘটনা আমার স্মরণ-পথে উদিত হয়। প্রথমটি, ছাত্র-জীবনে প্রথম যে-দিন দার্জ্জিলিঙে সূর্য্যোদয়ের সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখি, সেই দিগন্ত-ব্যাপী তুহিনের বুকে অমানিশা অন্তে সূর্য্যের প্রথম চরণ-পাত যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছিল তা চিরদিনের জন্যে আমার মনে দাগ কেটে গেছে। ভারতীয় জাতীয় জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদের পরে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ও সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা-শিরে সূর্য্যোদয়ের মতই বিস্ময়কর ও মহিমময় বলেই চিরদিন আমার মনে হয়েছে। দ্বিতীয় স্মৃতি, কয়েক বছর পূর্ব্বে বম্বেতে ফিরোজশাহ্ মেহ্‌টা উদ্যানে দাঁড়িয়ে দিন-শেষে আরব সাগরে আমার রবির অস্তগমন দর্শনের স্মৃতি। সে অস্তগমন যেমন করুণ, অথচ সব দিক দিয়েই ঐশ্বর্য্যময় —রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের অবসানও তেমনি করুণ ও ঐশ্বর্য্যময়। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে কি না দিয়ে গেছেন দেশকে? গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে—এক কথায়, সাহিত্যের এমন বিভাগ নেই যাতে তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন নি, শুধু তাঁরই দানের ফলে প্রাদেশিক গণ্ডী ভেঙে আজ বাংলা-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সগৌরবে আসন গ্রহণ করেছে। অন্য দিকে, তাঁর বিশ্ব-ভারতী ও শ্রীনিকেতন এই ভাবুক কবির কর্ম্মজীবনের অপূর্ব্ব সাক্ষী-স্বরূপ সমস্ত জগতের শ্রদ্ধা বহন করে আনছে।



ঋষি-কবি বিশ্বভারতীর কতিপয় ছাত্রছাত্রীকে একটি পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন

বিশেষ কোনো স্কুল-কলেজে রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি। তথাপি তাঁর পাণ্ডিত্যের তুলনা এ যুগে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর ভিতর তিনটি কৃষ্টির ধারা অপূর্ব্ব সমন্বয় লাভ করেছে—ভারতীয়, ইসলামিক (বা পারসিক) ও য়ুরোপীয়।

ইংরেজী দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য থেকে তিনি অনেক ভাব গ্রহণ করেছেন; হাফেজ, রুমীর প্রভাবও তাঁর উপর যথেষ্ট। পারসিক সাহিত্যের ধারা তাঁতে পৌঁছেছে তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে, বিশেষ করে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তিনি পুরোপুরি ভাবে ভারতেরই সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতীক। দাদু, দেধরাজ, কবীর, নানক, রামমোহন প্রভৃতি যে-সব মহাপুরুষকে তিনি "ভারত-পথিক" নামে অভিহিত করেছেন তিনি তাঁদেরই অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে সর্ব্বতোভাবে eclectic (সার-গ্রাহী) প্রতিভা বলা যেতে পারে। বৃক্ষ যেমন তার শিকড়ের দ্বারা সজীব মৃত্তিকা থেকে নানাভাবে রস সংগ্রহ করে থাকে—রবীন্দ্রনাথও নানাদেশের কৃষ্টি থেকে তাঁর মনের খোরাক জুটিয়েছেন এবং এই ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁকে eclectic genius বলায় মনে করবেন না যে আমি তাঁকে কোনো রকমে ছোট করে দেখছি। রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলেই আমার সেক্সপীয়ার সম্পর্কে এমার্সনের কথা কয়টি মনে হয়—The greatest mind is the most indebted man। সেক্সপীয়ার গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি সাহিত্য থেকে গল্পোপকরণ সংগ্রহ করেও যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথও নানা সাহিত্য থেকে নানা ভাব ও রচনাপদ্ধতি গ্রহণ করেও মৌলিক প্রতিভার গভীর ছাপ বাংলা-সাহিত্যের ওপর রেখে গেছেন। অন্যপক্ষে, নানা ভাষা নানা জাতির ভাব-সম্পদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় থাকা হেতুই তাঁর মন এত উদার। বহু শতাব্দী যাবৎ পৃথিবী এমন একটি universal mind-এর সাক্ষাৎ পায় নি। রবীন্দ্রনাথ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তাই সকলের এত প্রিয়। আমাকে অনেকে অনেক সময় প্রশ্ন করেছেন যে আমি মুসলমান হয়েও রবীন্দ্রনাথের এত ভক্ত কেন? এর উত্তর যা তাঁদের দিয়েছি সে এই যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইসলামিক দর্শনের যে প্রকাশ আমি দেখছি, তা কোনো বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকের লেখায় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। প্রমাণ-স্বরূপ, "গীতাঞ্জলি", "নৈবেদ্য" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বা "শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করে থাকি।

ভাবজগতে যেমন তিনি ছিলেন সমন্বয়ের অপূর্ব্ব নিদর্শন—ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনেও ছিলেন তিনি তেমনি।

তাঁর পোষাকে পরিচ্ছদে আদবকায়দায় তিনি স্মরণ করিয়ে দিতেন সেই মধ্যযুগীয় ইসলাম কৃষ্টিকে। আহারে, বিহারে ছিলেন তিনি খাঁটি বাঙালী; নিরলস কর্ম্মের দিক দিয়ে ছিলেন একান্তভাবে স্পার্টান বা য়ুরোপীয়।

আজীবন তিনি সত্য ও সুন্দরের উপাসনা করে গেছেন। তাই তাঁর সামান্য কথাবার্ত্তায়, চাল-চলনেও যেন ঝরে পড়ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। একটি দিনের কথা আজ মনে পড়ছে, শেষবার যখন তাঁকে দেখি—তাঁর প্রথম গুরুতর অসুখের কিছু পরে তাঁর নাতনী নন্দিনী দেবীর বিয়ের সময়ে। কোনো বন্ধুর সাহায্যে তাঁর ঘরে "শ্যামলী"তে গিয়ে উপস্থিত হলুম। একটি ইজিচেয়ারে তিনি শুয়ে আছেন; একটি মোড়ায় উপরে কম্বলে ঢাকা তাঁর পা; পাশে আর একটি ছোট মোড়ার উপরে কয়েকখানি বই। হাতে সদ্য-প্রকাশিত *You and Your Heredity* বইখানি। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি হাত তুলে, একটু মাথা নেড়ে অভ্যর্থনা করলেন, সেই হাত তোলাটুকুরই কি চমৎকার ভঙ্গী; সেই মাথা হেলানোতেই কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য; সেই হাসিটুকুতেই বা ছিল কি সুষমা! চিরদিনের তরে তা মনে গাঁথা থাকবে। বাস্তবিকই, জীবনকে নানা দিক দিয়ে এমন সুন্দর সুষমাময় করে আর কোনোদিন কোনো কবি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন কিনা জানা নেই।

টেনিসনের কাব্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ দেখতে পাই ভিক্টোরিয়া যুগের বিজ্ঞানের জ্ঞানের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ধারা রয়েছে অব্যাহত। কি সুন্দর ভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন Racial Mneme-এর ভাবটি—

তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখেছ মজ্জায় মিশাইয়া।

কিন্তু আজ অন্য দিকের কথা বাদ দিয়ে সাধক, ঋষি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই দু-একটি কথা বলব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে-দিন প্রকৃতির আহ্বান পেলেন নিজেকে ব্যক্ত করবার—মানব-প্রেমের অগ্রদূত হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবার, সে এক স্মরণীয় দিন। সে-দিন তিনি লিখলেন—

আজিকে প্রভাতে রবির কর,
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে···ইত্যাদি,

বিশেষ করে,—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

তারপর থেকেই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের নানাভাবে নিজেকে বিকাশের চেষ্টা। তাঁর মন যেন কমলের মত বয়স-সূর্য্যের চুম্বনে ক্রমেই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। তিনি 'গীতাঞ্জলি'তে গেয়ে উঠলেন—

আকাশ জল বাতাস আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো—
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।

এ মাত্র সেণ্ট ফ্রান্সিস অব এসিসির 'Brother Sun, Sister Wind'-এর সঙ্গে তুলনীয়।

প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম পদার্থের ভিতরও তিনি বিশ্বনাথের স্পর্শ অনুভব করতে লাগলেন। যেমন—

প্রেমে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে,
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

অথবা,

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধে বরণে, এস গানে। (গীতাঞ্জলি)

অথবা,

সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী। (গীতাঞ্জলি)

এই পঙক্তিগুলি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় কোরাণের উদাত্ত বাণী—আল্লাহো নুরোস্ সামাওয়াতিল্ অল্ আর্দ্ধ অর্থাৎ, আল্লাহ্ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আলোক স্বরূপ। প্রকৃতি এত জীবন্ত—ঈশ্বরের সত্তায় ভরপুর—আর কোন কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের Pantheism-এর তুলনায় অতীব স্থূল বলে মনে হয়।

আরও কত রূপে তিনি ঈশ্বরকে পেয়েছেন! এত দরদ দিয়ে তাই তিনি বিশ্বজগতের সকলকে ভালবাসতে পেরে-ছিলেন। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে দুঃখের আবির্ভাব হত, তাঁর প্রাণে সাড়া জেগে উঠত। রাশিয়া জার্ম্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে শুনে মৃত্যুশয্যায়ও তিনি কিরূপ বিচলিত হয়ে-ছিলেন তা এই সম্পর্কে স্মরণীয়।

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
(গীতাঞ্জলি)

অথবা,

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে,
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে ?···
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাট্‌ছে যেথায় পথ
খাট্‌ছে বারো মাস।

তিনি সর্ব্ব অবস্থায় সকলের মাঝে, নূতন-পুরাতন সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করছেন। তাই তিনি গাইতে পারছেন—

নতুনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই!

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখায় জীবন-দেবতা পরিকল্পনার আভাস পাই—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ

আসি অন্তরে মম ?
দুঃখ সুখের লক্ষ-ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম। (চিত্রা)

চন্‌দি হাজারা সাল বুদ
ই কালেবদ রা সাখ্‌তন্‌ দ
জুজ্‌ বি কলব মবিঁ
মন্‌ আশেকে দিরিনা আম।…

'জীবন-দেবতা'র দার্শনিক ব্যাখ্যা আজ আমরা করতে চাইনে। এ 'দেবতা' পরব্রহ্মরূপে কোন সময়ে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে ফেলে; আবার কোন সময়ে ওয়েল্‌সের Theo-psyche-এর মত নানা উজ্জ্বল কল্পনায় আমাদিগকে উদ্বেলিত করে তোলে। 'জীবন-দেবতা' আমাদের জীবনের দোসর।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে কোনদিন খণ্ডভাবে দেখতে পারেন নি। জীবনকে তিনি কল্পনা করেছেন স্রোত-ধারা রূপে; এ স্রোত প্রবাহিত হয়ে এসেছে অনাদিকালের উৎস থেকে। নিজেকে তিনি দেখেছেন পৃথিবীর সকলের সঙ্গে এক করে। তাঁর বসুন্ধরা কবিতাটি এই সম্পর্কে খুব মূল্যবান্।—



বিশ্বভারতীর শিল্প-কলা বিভাগের ছাত্রীগণ চিত্রাঙ্কনরত

জাগে মহা ব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা,
মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে। ইত্যাদি।

অন্যত্র বলেছেন—জীবনের লক্ষধারা হ'তে ইত্যাদি

অথবা, এই সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারি উৎসর্গের এই কবিতাটি—

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী;
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমারই স্মৃতি
কোন্‌ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।

তিনি নিজেকে আদিকালের বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাচ্ছেন—অর্থাৎ, বিশ্বের মত তিনিও চির-পুরাতন্‌। এই সম্পর্কে শাম্‌স ডেব্‌রেজের কবিতাটি মনে পড়ে—

আয় আশে কাঁ আয় আশে কাঁ
মন্‌ আশেকে দিরিনা আম—
আয় সাদেকাঁ আয় সাদেকাঁ
মন্‌ আশেকে দিরিনা আম।

এ দম ন বুদ ও মন্‌ বুদম্‌
এ তন্‌ ন বুদ্‌ ও মন বুদম্‌—
* * *
মন্‌ আশেকে দিরিনা আম।

অর্থাৎ, হে প্রেমিক, আমি অতি পুরাতন প্রেমিক; হে বিশ্বাসী, তুমি বিশ্বাস কর, আমি অতি পুরাতন প্রেমিক। কত হাজার হাজার বছর হয়ে গেছে আমার দেহের সৃষ্টি হয়, এই ক্ষীণ দেহটি দেখেই তুমি তা অবিশ্বাস করো না। এ 'দম' ছিল না আমি ছিলাম; এ 'দেহ' ছিল না আমি ছিলাম—আমি অতিশয় পুরনো প্রেমিক, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে সত্তার একত্ব অনুভব করে চিরদিনই নিজের ভিতরে এক অপূর্ব্ব আকুলতা অনুভব করেছেন—

আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী…

এখানেও পারস্যের সুফী কবিদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা দেখতে পাই। মওলানা রুমীর বিখ্যাত লাইন ক'টি মনে আসে—

বেশ্‌নো আজ নায় চু হেকায়েৎ
মি কুনাদ—
আজ জুদাই হা শেকায়েৎ মী কুনাদ।
(শোন গো বাঁশরী ঐ কি গাহিছে গান
বিরহ সঙ্গীতে তার কাটিছে বিমান।
অনুবাদক—হবিবর রহমান)

বাঁশের বাঁশিকে ঝাড় থেকে কেটে আনা হয়েছে, তাই নিজের বুকের শত ছিদ্রপথে সে পাঠাচ্ছে বিরহের গান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতাবলীও বিশ্বসত্তার উদ্দেশে বিরহ-গান।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বিশ্বপাতার সত্তারই অণুকণা মাত্র বলে নিজেকে মনে করছেন, তবুও তিনি তাঁর নিজের সত্তাকে অবহেলার বস্তু বলে মনে করেন নি। তাঁর নিজের সৃজনী শক্তিতে তাঁর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। 'বলাকা'য় এই সুন্দর কবিতাটিতে এই ভাবটি কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

পাখীরে দিয়েছ গান,
তার বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।
বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধন-বিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
এক দিন রিক্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

* * *

মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

এদিকে বিশ্বসত্তাকে যদিও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্তা বলে জেনেছেন, এ বিশ্বকে তিনি মিথ্যা বা মায়া বলে মনে করেন নি। বরং বিশ্বপাতার প্রকাশ এই সুন্দরী ধরণীর ভিতর দিয়ে হয়েছে বলে তিনি এ ধরণীকে নিবিড় প্রেমের চক্ষে দেখেছেন। কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ধরণীর প্রতি তাঁর এই গভীর প্রেম প্রকাশ করেছেন!

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই!

তিনি শঙ্করের মায়াবাদ—'মায়াময়মিদং অখিলং হিত্বা' ইত্যাদিতে আদৌ বিশ্বাস করেন নি। বরং মায়াবাদকে তিনি অনেক লেখাতে উপহাস করেছেন। সমস্ত বিশ্বই যদি বিশ্বভূপের প্রকাশ, তাহলে মায়ার স্থান কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ তাই সামাজিক কর্ত্তব্য পালন বা সামাজিক জীবনযাপনকেই আরাধনার অন্তর্গত বলে মনে করতেন,—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।···
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

এ জীবনদর্শন কি মুসলমানের জীবনদর্শন নয়?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে এত ভালবাসতেন বলে কেউ যেন না মনে করেন যে মৃত্যুকে তিনি বিভীষিকা বলে ভাবতেন। জীবনকে তিনি যেমন সত্য বা সুন্দর মনে করতেন, মৃত্যুকেও তিনি তেমনি সত্য ও সুন্দর মনে করতেন।

আমি বেসেছি ভালো এই জগতেরে;

* * *

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।

ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত জানতেন বলেই মৃত্যু তাঁর নিকট ক্রূর বলে মনে হয় নি। তিনি মৃত্যুকে জীবনের সমাপ্তি বলে মনে করতেন।

মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মতো, জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হ'য়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে। (নৈবেদ্য)

কি অপূর্ব্ব বিশ্বাস! কি চমৎকার কল্পনা! মায়ের এক স্তন থেকে শিশুকে ছাড়িয়ে নিলেই সে কেঁদে ওঠে, কিন্তু অন্য স্তন পেলেই সে আশ্বস্ত হয়। এই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা হ'লেই আমরা ভীত হই। কিন্তু কবি বলছেন, না, ভয়ের কারণ নেই, অন্য আশ্রয় আমাদের জন্য ঠিকই রয়েছে।

মৃত্যুকে তিনি এই চোখে দেখতে পেরেছিলেন বলেই, এমন নিঃসঙ্কোচে তিনি তাকে আহ্বান করতে পেরেছিলেন:—

ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যা'বি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়॥

মৃত্যুকে তিনি পরপারের খেয়া মাত্র মনে করেছেন এখানে। পরপারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহই নেই।

কয়েক বছর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে তাঁর একখানি চিঠি পড়েছিলাম, বিশ্বসৃষ্টির অবিনশ্বরতার বার্ত্তা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে কি করে তাঁর প্রাণের দ্বারে পৌঁছেছিল একবার রেল-ভ্রমণের সময়, তা-ই তিনি সেখানে বলেছিলেন। বলার সে সহজ ভঙ্গিমা—যুক্তির ঋজুতা মনকে মুগ্ধ করেছিল, কোরাণে এমনি মনোমুগ্ধকর সহজ উপায়ে, অথচ অতুলনীয় ভাষায় এক জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতির নিজ নিজ কক্ষে বিচরণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশ্বপাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব-মনকে সজাগ করে দেওয়া হয়েছে।

জীবনের প্রতি এই গভীর প্রত্যয় এবং জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে এই গভীর বিশ্বাস থাকা হেতুই বার বার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও রবীন্দ্রনাথ ভীত হন নি, একান্ত নির্ভয়ে মৃত্যুর হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছেন। এই সম্পর্কে মনে পড়ে টেনিসনের Sunset and Evening Star গীতি-কবিতাটি এবং ইক্‌বালের শেষ কবিতা—

নেশানে মর্দ্ দে মোমেন মন্ বতু গোয়েম
চুঁ মোর্গ আয়েদ তবসসুম বর্ লব এ উস্ত।

অর্থাৎ,

ধার্মিক জন মোমিন মানুষ তাঁহার কাহিনী শোন,
বলিতেছি শোন তাঁর পরিচয় লিপি :
মরণ যেদিন তাঁহার দুয়ারে বাজাবে রুদ্র বাঁশী,
মোমিন তাহারে হাসি মুখে নিবে বরি।

(অনুবাদক—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-দেবতা'র যাত্রা-পথে মৃত্যুকে জড়িয়ে দিয়ে তার ধ্বংস এবং প্রলয়কেও এমন এক সুষমা দান করেছেন যা' অন্য কোন কবির লেখায় দেখবার সৌভাগ্য হয় নি—

হে মহা পথিক
আরতির তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে ;
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্ব্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্ব্বে পর্ব্বে প্রলয়ের পলকে পলকে।*

(পরিশেষ)

* ৭ই আগষ্ট (১৯৪৪) তারিখে ঢাকা পূর্ব্ব বাংলা ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-স্মৃতিবার্ষিকী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

ফলের চাষ

রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
ও
শ্রীকমলাকান্ত দত্ত

আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ফল আহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলের মধ্যে মূল্যবান প্রোটিন (ছানা জাতীয় খাদ্য) আছে। নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি কতকগুলি ফলে প্রোটিন ও চর্ব্বি উভয়ই পাওয়া যায় এবং এই প্রোটিন জৈব প্রোটিনের সমান মূল্যবান। কমলালেবু, পেঁপে, আনারস, আম, পেয়ারা, কলা প্রভৃতি ফল "সুসম খাদ্যের" (balanced diet) সহিত ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হয়। এই সকল ফল আহার করিলে শরীরের সমতা রক্ষা হয়, কারণ ইহারা খাদ্যপ্রাণ "খ" (Vitamin "B")এর আধার। সেইজন্য নিয়মিতরূপে ফল আহার করিলে রক্তবৃদ্ধি হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্যের মধ্যে ফল আহারের যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে তাহা নিম্নলিখিত প্রচলিত প্রবাদবাক্য দ্বারা বিশেষ ভাবে বুঝা যাইবে—

দৈনিক একটি আপেল খাও,
গাঁয়ের বাইরে বৈদ্য তাড়াও।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের প্রায় সকলেই বার মাস কোন না কোন ফল খাইতে পাইতেন। তাঁহারা ফল আহারের উপকারিতাও বুঝিতেন এবং সেইজন্য সকলেই ফল উৎপাদনে মনযোগ দিতেন। গৃহস্থ ঘরের মহিলাদেরও ফল উৎপাদন সম্বন্ধে সাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। প্রত্যেকের ভিটাবাড়ীতেই বার মাসে নানা প্রকার ফল ফলিত। বাগানে ঘুরিয়া ফল কুড়ানো ছেলেমেয়েদের একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। আম, জাম, নারিকেল, কলা, কাঁঠাল, জামরুল প্রভৃতি ফলের গাছ উৎপাদন সম্বন্ধে তৎকালীন বালক-বালিকাগণের যে স্বাভাবিক জ্ঞান ছিল তাহা এখনকার বালক-বালিকাগণের নাই।

কিন্তু, আমাদের অবহেলা ও অমনোযোগিতার জন্য আমরা সকল বিষয়েই যেমন পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি, তেমন এ বিষয়েও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বহু বৎসর হইতেই বিদেশীয়েরাই আমাদের দেশের ফলের চাহিদা পূরণ করিয়া আসিতেছেন। বৎসরে গড়পড়তা প্রায় তিন লক্ষ টাকার ফল বিদেশ হইতে বাংলা দেশে আমদানী হয়। বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার কৌটায় রক্ষিত ফল আমদানী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাৎসরিক প্রায় এক কোটী পঁচিশ লক্ষ টাকার ফল বাংলা দেশে আমদানী হইয়া থাকে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের জন্য গত তিন চারি বৎসর বিদেশ হইতে ফল আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য বর্ত্তমানে এই দেশে বিস্তৃত ভাবে ফলের চাষ হওয়া প্রয়োজন। ফল আহারের উপকারিতা সম্বন্ধেও দেশবাসীকে সচেতন করিয়া দিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

ফলের উপযুক্ত জমি

ফলের চাষ খুব কঠিন নহে। উঁচু জমিতে ফলের বাগান করা উচিত। জমি এমন উঁচু হওয়া দরকার যেন উহা জলে ডুবিয়া না যায় বা উহার উপর বর্ষার জল না দাঁড়ায়। ফলের বাগানে বার মাস জল সেচনের সুবিধা থাকা চাই। সুতরাং ফলের বাগান পুকুর কিম্বা নদী-নালার ধারে হইলে খুবই সুবিধা হইবে। নিম্ন জমি ফলচাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

দোআঁশ মাটিই প্রায় সকল প্রকার ফল-চাষের পক্ষে উপযোগী। কোনও জমির মাটি ফল-চাষের উপযুক্ত না হইলে অন্য স্থান হইতে উপযুক্ত মাটি আনিয়া এবং উহা উক্ত জমির মাটির সহিত মিশাইয়া কিম্বা গভীর কর্ষণ ও সার প্রয়োগদ্বারা উক্ত জমির মাটির উন্নতি সাধন করা যায়। ছোট ছোট গাছের জন্য নীচে অন্ততঃ চারি ফুট এবং বড় বড় গাছের জন্য ছয় হইতে আট ফুট গভীর ভাল মাটি থাকা দরকার। নীচের মাটি বেশী আল্‌গা বা ঢালু হওয়া ভাল নয়, কারণ তাহাতে জল চুয়াইয়া নীচে চলিয়া যায়। কাদা মাটিও ফলবৃক্ষের পক্ষে উপযোগী নহে; কারণ উহাতে শিকড় জলে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।

বাগানে ছায়া না পড়ে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। ছায়াযুক্ত স্থানে চারা গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে না।

ফলের গাছ রোপণ করিবার জন্য গর্ত্ত খনন

ফলের গাছ রোপণের জন্য সাধারণতঃ তিন-চারি ফুট পরিধি-বিশিষ্ট তিন-চারি ফুট গভীর গর্ত্ত করিতে হয়। গর্ত্তের মাটির সঙ্গে এক ঝুড়ি করিয়া পচা সার, গোবরসার এবং উপযুক্ত পরিমাণ বালি মিশ্রিত করিয়া গর্ত্তটিকে ভরাট করিয়া দিতে হয়। ইহাতে মাটির মধ্যের এঁটেল বা শক্ত ভাব নষ্ট হইয়া যায় এবং মাটি বেশ ঝুরা হইয়া যায়। সম্ভব হইলে এক ঝুড়ি হাড়ের গুঁড়া গর্ত্তের মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে আরও ভাল হয়। সম্ভব-মত মাঝে মাঝে মাটি ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে সারের সহিত মাটি মিশ্রিত হইয়া আরও উর্ব্বর হইবে। গর্ত্তের মাটি এঁটেল হইলে উহাতে এক ঝুড়ি কঙ্করযুক্ত মাটি মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

ফলের চারা রোপণ

গর্ত্তের মাটি শুকাইলে উপরের এক ফুট মাটি খুঁড়িয়া ফেলিতে হয়। পরে গর্ত্তের ঠিক মাঝখানে এমন ভাবে চারা পুঁতিতে হয় যাহাতে চারার গায়ে যে মাটি থাকে সেই মাটি জমির মাটির এক বা দুই ইঞ্চি নিম্নে থাকে এবং চারার গোড়ার নার্শারীর মাটির দাগ জমির মাটির উপরে না উঠে। চারা পুঁতিবার পূর্ব্বে এক ঝুড়ি পাতা-পচা সার এমন ভাবে গর্ত্তের ভিতর দিতে হইবে যাহাতে উহা শিকড়গুলির চারি ধারে ছড়াইয়া থাকে। গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুর উপদ্রব হইতে চারা রক্ষা করিবার জন্য উহার চতুর্দ্দিকে চটার বেড়া দেওয়া আবশ্যক।

কি রোপণ করা উচিত—কলমের চারা না বীজ হইতে উৎপন্ন চারা

কলমের চারা ও বীজের চারার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কলমের চারা হইতে যে গাছ হয় সেই গাছ অধিক লম্বা হয় না, এবং উহাতে শীঘ্র ফল ধরে। এতদ্ব্যতীত কলমের গাছের ফল সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়তা থাকে। বীজের গাছ রোপণে অসুবিধা এই যে, ইহার ফলন খুব দেরিতে হয় এবং সকল সময়ে খাঁটি ফল আশা করা যায় না। বীজের গাছ ফলদানে সকল সময় ও সকল স্থানে জাতিগত গুণ ও প্রকৃতি রক্ষা করিতে পারে না বলিয়াই বর্ত্তমানে প্রায় সকলেই কলমের গাছের অধিকতর পক্ষপাতী। ফল গাছের চারা বা কলম সর্ব্বদাই বিশ্বস্ত নার্শারী হইতে ক্রয় করা উচিত। দুই বৎসরের অধিক পুরাতন কলম রোপণ করা উচিত নয়। ইহার অধিক পুরাতন হইলে কলমের শিকড় এমন ভাবে বাহির হইয়া পড়ে যে গাছ জোরালো হইতে অনেক সময় লাগে।

চারা রোপণের উপযুক্ত সময়

বর্ষার প্রারম্ভই চারা রোপণ করিবার উপযুক্ত সময়। কোন কোন চারা শীতের প্রারম্ভে রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাতে অধিক পরিমাণে জলসেচনের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত বর্ষার সময় চারা রোপণ করা উচিত নয়। ঐ সময় চারা রোপণ করিলে উহার গোড়ায় মাটি আঁটিয়া যায় এবং চারা শিকড় মেলিতে পারে না। সময় সময় শিকড়ও পচিয়া যাইতে পারে। জ্যৈষ্ঠের মধ্য ভাগ হইতে আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। এই সময় চারা রোপণ করিলে উহার শিকড় অতিবৃষ্টি বা অতিশীতের পূর্ব্বেই উত্তমরূপে মাটিতে বসিয়া যাইতে পারে। বিদেশ হইতে আনীত কলম শুষ্ক অবস্থাতেও অধিক শীতের মধ্যে রোপণ করিলে গ্রীষ্মের সময় প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে হয়।

চারা রোপণের দূরত্ব

মানুষের ন্যায় উদ্ভিদেরাও ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে থাকিতে পছন্দ করে না। পরস্পরের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক ফুট দূরত্ব না থাকিলে উহাদের শাখা-প্রশাখা অবাধে প্রসার লাভ করিতে পারে না। ফলে, গাছ শীর্ণ হইয়া যায় এবং উপরের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ছোট গাছগুলি সাধারণতঃ নয় হইতে বার, বেঁটে গাছ পনর হইতে আঠার এবং বড় গাছ বিশ হইতে ত্রিশ ফুট অন্তর রোপণ করা উচিত। গাছের বৃদ্ধি ও মাটির গুণা-গুণের উপর গাছের দূরত্ব নির্ভর করে। জমির উর্ব্বরতা অনুসারে গাছের দূরত্ব স্থির করিতে হয়, কারণ উর্ব্বর জমিতে গাছের বৃদ্ধি অনুর্ব্বর জমি অপেক্ষা অনেক অধিক ও তাড়াতাড়ি হয়।

চারার পরিচর্য্যা

ফল গাছের চারা রোপণের পর, গাছের অবস্থানুসারে বিভিন্ন প্রকার যত্ন ও পরিচর্য্যার আবশ্যক হয়। কলমের চারার মূল কাণ্ডে প্রথম দুই-এক বৎসরের মধ্যে যখনই কলের কুঁড়ি দেখা দিবে তখনই তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। এইগুলি সময়মত ভাঙিয়া না দিলে কলমের গাছকে ইহারা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। এই সকল গাছের শাখা-প্রশাখার প্রতিও বিশেষ যত্ন লওয়া দরকার। ফলের গাছের গোড়ায় চারি ফুটের মধ্যে কোন প্রকার ঘাস বা আগাছা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়। গাছের গোড়ার জমি যত পরিষ্কার থাকিবে ততই গাছের পক্ষে ভাল। প্রতি গাছে বৎসরে এক ঝুড়ি করিয়া পচা গোবর সারের সহিত কয়েক মুঠা হাড়ের গুঁড়া, কাঠের ছাই ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক। ফলের গাছের পক্ষে মাছের আঁশ, খোলস, পেটি প্রভৃতি পরিত্যক্ত অংশগুলি খুব ভাল সারের কাজ করে। গৃহের পরিত্যক্ত অন্যান্য আবর্জ্জনার সহিত ইহাদিগকে একত্রিত করিয়া চারার গোড়ায় প্রয়োগ করিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়।

গ্রীষ্মকালে চারাগাছগুলিকে কোন রকমেই নীরস হইতে দেওয়া উচিত নয়। শাখা-প্রশাখা জন্মিবার উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত ইহাদিগকে সতেজ ভাবে বাড়িবার সুবিধা দেওয়া দরকার। জলের সহিত গোবর ও খইল পচাইয়া উক্ত তরল সার প্রয়োগ করিলে চারা গাছ খুব শীঘ্রই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চারা অবস্থায় জল সেচন, গোড়া নিড়াইয়া দেওয়া ও আগাছা তুলিয়া ফেলা ব্যতিরেকে উহার আর অন্য কোন তত্ত্বাবধানের আবশ্যক হয় না। জল সেচনের জন্য কাণ্ড হইতে অন্ততঃ এক ফুট দূরে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত একটি অগভীর নালা খনন করা উচিত। বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে ঐ নালার মধ্যে জল সেচন করিলে জল যেন কাণ্ডকে স্পর্শ করিতে না পারে। গাছ যত বড় হইতে থাকিবে কাণ্ড হইতে নালার দূরত্ব ও পরিধি সেই

অনুপাতে বাড়িতে থাকিবে। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্য ভাগেই জলসেচন একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সময় হইতে মুকুলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত গাছগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে শীত ভোগ করিতে দিতে হইবে। ফুলের পাঁপড়ি যখন ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং উহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় তখন পুনরায় গাছের গোড়ায় জলসেচনের ব্যবস্থা করা দরকার। এই সময় অল্প অল্প করিয়া তরল সারও প্রয়োগ করিতে হয়। ছোট ও মাঝারি গাছের বেলায় এই নিয়ম যত্ন সহকারে পালন করা উচিত। সাধারণতঃ বড় গাছগুলি লম্বা শিকড়ের সাহায্যে মাটির নিম্নস্তর হইতে জলগ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় শিকড় সহজে উপযুক্ত পরিমাণে বাড়িতে পারে না বলিয়া ফলধারণের সঙ্গে সঙ্গে গাছের গোড়ায় নিয়মিত জলসেচনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

গাছবিশেষে প্রত্যেক গাছ কমবেশী প্রতি বৎসর ছাঁটাই করা আবশ্যক। ফলের গাছ ছাঁটাই যত সহজ মনে হয় উহা তত সহজ নয়। হাতে-কলমে এই কার্য্য করিলে শীঘ্রই এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। গাছের যেখানে সেখানে ছাঁটাই করা আদৌ উচিত নয়। উহার যে-কোন মৃত ও রুগ্ন অংশ অবশ্যই ছাঁটিয়া ফেলা দরকার এবং কাটা স্থানে একটা কিছু প্রলেপ দেওয়া উচিত। কোন কোন গাছে অধিকাংশ ফল শাখা হইতে প্রসারিত ডাঁটায় জন্মে বলিয়া অঙ্কুর বাহির হইবামাত্র তাহা ছাঁটিয়া ফেলা আবশ্যক। আবার কোন কোন গাছে নূতন শাখায় বেশীর ভাগ ফল ধরে। সুতরাং এই সকল গাছের পুরাতন ডালপালা এমন ভাবে ছাঁটিয়া দেওয়া দরকার যাহাতে নূতন নূতন শাখা জন্মিতে পারে। আপেল, ন্যাসপাতি, চেরি, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি প্রসারিত শাখায় জন্মে। এই সকল ফল এই প্রদেশে জন্মে না।

গ্রীষ্মকালে ফলের গাছ ছাঁটাই করা একান্ত আবশ্যক। উহাতে কাণ্ডের ভিতরে রস সঞ্চারিত হয়, অন্যথায় এই রস নষ্ট হইয়া যায়। দুর্ব্বল এবং মৃত শাখাগুলিকে সমূলে ছাঁটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। আষাঢ়ের শেষ হইতে ভাদ্রের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত পুনরায় গাছের শাখা ছাঁটাই করিতে হয়। ইহাতে ফলপ্রসূ শাখাগুলিতে রস সঞ্চারিত হয়।

যে-সকল গাছ খুব সতেজ হয়, অথচ উহাতে ফল ধরে না, শীতকালে উহাদের কতকগুলি শিকড় ছাঁটিয়া দিতে হয়; কিন্তু মূল শিকড় যাহাতে কাটিয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কলমের গাছে প্রথম বৎসরে ফুল ও ফল ধরিতে পারে, কিন্তু উহা ভাঙিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ঐ সময় ফল ধরিতে দিলে গাছ ভালরূপ বাড়িতে পারে না এবং ফলও ভাল হয় না। দ্বিতীয় বৎসরে ভাল ফল আশা করা যাইতে পারে।

ফল পাকান ও তাহার সংরক্ষণ

কৃত্রিম উপায়ে পাকান ফল কখনও গাছ-পাকা ফলের ন্যায় সুস্বাদু হয় না। ফল "বাতি" না হইলেও "জাগ" দিয়া উহার রং ধরান যায়, কিন্তু উহা খাইতে তেমন সুস্বাদু হয় না। কীটের এবং অন্যান্য উপদ্রবের জন্য অনেক সময় অর্দ্ধপক্ক ফল গাছ হইতে পাড়িয়া লইতে হয়। নচেৎ অনেক ক্ষেত্রেই বাগানের ফল ভোগ করা চলে না। কলার গাছ সবুজ রং বদলাইয়া একটু পাণ্ডুর আভা দেখা দিলেই উহা কাঁদিসমেত কাটিয়া আনিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে পাকিতে থাকে। অন্যান্য যে-সকল ফল বোঁটাসমেত পাড়া যায় তাহাদের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। রং না বদ্‌লাইলে ফল পাড়িয়া রাখিলে উহা কখনও পাকে না। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

ফলের বাগানে অন্যান্য ফসলের চাষ

ফলের গাছ বড় না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদের ফাঁকে ফাঁকে নানা প্রকার ঘন আবাদী এবং আশু ফল ধরে এই প্রকার শস্যের চাষ করা উচিত। জমির উৎকর্ষতার নিমিত্ত সবুজ শস্যের আবাদ করাও খুব ভাল। পেঁপে, চুকারি, আনারস, আদা, হলুদ প্রভৃতিও উৎপাদন করা চলে।

সাধারণ উপদেশ

নিজ পরিবারের ফলের চাহিদা মিটাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রত্যেকের ভিটা বাড়ীতেই স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী ভাল ভাল ফলের গাছ উৎপাদন করা কর্ত্তব্য। যত্ন করিয়া জন্মাইতে পারিলে আম, লিচু, পেয়ারা, আনারস, কুল, নারিকেল, প্রভৃতি ফলের বাগিচা গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ লাভজনক। আধা-জঙ্গলা অবস্থায় নানা জাতীয় গাছের সহিত কতিপয় ফলের গাছ জন্মাইয়া কোন লাভ নাই।

নানা প্রকার কীটের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ফলের বাগান নিয়ত পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। আগাছাগুলিকে এমনি পরিষ্কারভাবে নির্ম্মূল করা দরকার যাহাতে কীটের আশ্রয়স্থল ভাঙ্গিয়া যায়। বাগানের নিকটবর্ত্তী স্থানে আবর্জ্জনার স্তূপ রাখা উচিত নয়, কারণ উহার ভিতর নানা প্রকার কীট লুকাইয়া থাকে এবং বাসা বাঁধে। কীট দেখা দিলে উহার বিস্তৃতি নিবারণের জন্য প্রথম অবস্থাতেই যত্ন লওয়া উচিত।

নানা প্রকার কীটনাশক ঔষধ যন্ত্রের সাহায্যে ছিটাইয়া এবং অন্যান্য উপায়ে কীট দমন করা আবশ্যক। বাগানের ফল ভোগ করিতে হইলে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকা দরকার। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভাল-মন্দ চাষের উপরে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব কমবেশী নির্ভর করে।

ফলের বাগানের আয়তন অনুযায়ী উহার সমুদয় অংশকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রতি অংশে নির্দ্দিষ্ট জাতীয় গাছ রোপণ করিতে হয়। বাগানের আয়তন বড় হইলে উহার মধ্যে পুষ্করিণী খনন করিয়া উহার ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে নারিকেল সুপারি প্রভৃতি গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। জমির পরিমাণ বেশী না হইলে উহা করা চলে না। ব্যবসা হিসাবে ফলচাষ করিতে হইলে বড় জমিতে ফলের চাষ করাই যুক্তিযুক্ত। এই ক্ষেত্রে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার আম বাগান, বরিশাল, নোয়াখালী, খুলনা, চব্বিশ-পরগণা ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলার নারিকেল ও সুপারি বাগানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল বাগানের মালিকেরাও তাঁহাদের বাগানের বিশেষ যত্ন করেন না।

ফলের গাছ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নপ্রদত্ত "ফলোৎপাদন পঞ্জিকায়" সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

ফলোৎপাদন পঞ্জিকা

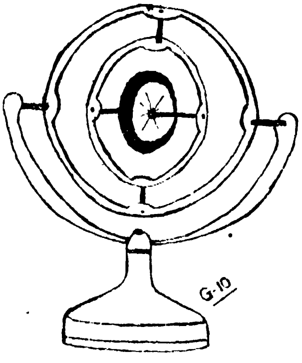
ফলের নাম	উপযুক্ত জমি	কি রোপণ করিতে হয়	রোপণের সময়	এক গাছ হইতে অন্য গাছের দূরত্ব	ফসল পাইবার সময়	মন্তব্য
১। আম	উঁচু দোয়াঁশ	কলম	বৈশাখ—আষাঢ়	ফুট ৩০	৩।৪ বৎসর পর— বৈশাখ—আষাঢ়	
২। লিচু	”	গুটি কলম	”	৩০	৪।৬ বৎসর পর— বৈশাখ—আষাঢ়	মজঃফরপুরের লিচু উৎকৃষ্ট।
৩। পেয়ারা	হালকা দোয়াঁশ বা এঁটেল	”	”	১৮	২।৩ বৎসর পর— প্রায় সারা বৎসর	
৪। কাঁঠাল	বেলে এবং দোয়াঁশ	বীজ	”	৩০	৪।৬ বৎসর পর— বৈশাখ—আষাঢ়	চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে হয়।
৫। জামরুল	দোয়াঁশ	দাবা কলম	”	৩০	৩।৪ বৎসর পর— চৈত্র—আষাঢ়	
৬। কালো জাম	”	বীজ এবং কলম	”	৩০	৪।৬ বৎসর পর— বৈশাখ—আষাঢ়	বীজের গাছই সাধারণতঃ রোপণ করা হয়।
৭। কুল	”	বীজ এবং চোখ কলম নারিকেল কুল (গুটি কলম)	বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	১৫	২।৩ বৎসর পর— পৌষ—ফাল্গুন	বীজের গাছ ৪।৬ বৎসরে ফলে।
৮। গোলাপ জাম	”	দাবা কলম	বৈশাখ—আষাঢ়	২০	৩।৪ বসৎর পর— মাঘ—চৈত্র	
৯। লকেট	”	বীজ এবং দাবা কলম	অগ্রহায়ণ—মাঘ	২০	২।৩ বৎসর পর— ফাল্গুন—বৈশাখ	বীজের গাছ ৮।১০ বৎসরে ফলে।
১০। সপেটা	উঁচু দোয়াঁশ	কলম	পৌষ—বৈশাখ	৩০	৩।৪ বৎসর পর— সারা বৎসর	
১১। বাতাবী লেবু	”	দাবা কলম এবং কলম	জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ	২০	২।৩ বৎসর পর— ভাদ্র—পৌষ	
১২। লেবু (কাগজী, পাতি)	কাঁকরযুক্ত মাটি	গুটি কলম	”	১০	২।৩ বৎসর পর— সারা বৎসর	
১৩। তুত	দোয়াঁশ	বীজ এবং ডাল কলম	”	২০	২।৩ বৎসর পর— বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ	বীজের গাছ ৪।৬ বৎসরে ফলে।

১৪। বেল	বেলে দোয়াঁশ	বীজ এবং কলম	বৈশাখ—আষাঢ়	৩০	৪।৫ বৎসর পর—বৈশাখ—শ্রাবণ	বীজের গাছ ৭।৮ বৎসর ফলে।
১৫। আতা	উঁচু দোয়াঁশ	বীজ	"	১৫	৫।৬ বৎসর পর—অগ্রহায়ণ—মাঘ	চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে হয়।
১৬। নোনা	"	বীজ এবং ডাল কলম	"	২০	৫।৬ বৎসর পর—মাঘ—চৈত্র	বীজের গাছ ৬।৭ বৎসরে ফলে।
১৭। আঁশ ফল	"	বীজ এবং কলম	"	২৫	৪।৫ বৎসর পর—জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ	বীজের গাছ ৭।৮ বৎসর পর ফলে।
১৮। করমচা	"	"	"	২৫	২।৩ বৎসর পর—জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ	বীজের গাছ ৩।৪ বৎসর পর ফলে।
১৯। কামরাঙ্গা	"	"	ফাল্গুন—জ্যৈষ্ঠ	১৫	৪।৫ বৎসর পর— ভাদ্র—কার্ত্তিক, পৌষ—ফাল্গুন	
২০। কলসা	"	বীজ	"	১৫	৩।৪ বৎসর পর—বৈশাখ—আষাঢ়	চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে হয়।
২১। আনারস	উঁচু বেলে দোয়াঁশ	তেউড়	শ্রাবণ—আশ্বিন	২॥০	১৮ মাস পর—আষাঢ়—আশ্বিন	
২২। পেঁপে	উঁচু দোয়াঁশ	বীজ	বৈশাখ—আষাঢ়	১০	৮।১০ মাস পর	চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে হয়।
২৩। কলা	"	তেউড়	"	৯	১০।১২ মাস পর	
২৪। নারিকেল	বেলে দোয়াঁশ	নারিকেল	"	৩০	৬।৮ বৎসর পর	
২৫। বাদাম	বেলে দোয়াঁশ	বীজ	"	৩০	৪।৫ বৎসর পর—বৈশাখ—আষাঢ়, শ্রাবণ—আশ্বিন	চারা নাড়িয়া রোপণ করিতে হয়।
২৬। হিজলী বাদাম	বেলে	"	"	২০	৪।৫ বৎসর পর—আষাঢ়—ভাদ্র	ঐ
২৭। বিলাতী আমড়া	দোঁয়াশ	"	"	২০	৫।৬ বৎসর পর—শ্রাবণ—আশ্বিন	ঐ
২৮। চালতা	"	"	"	২০	৩।৪ বৎসর পর—অগ্রহায়ণ—মাঘ	ঐ
২৯। ডালিম	"	"	"	২৫	৫।৬ বৎসর পর—বর্ষা কাল	ঐ

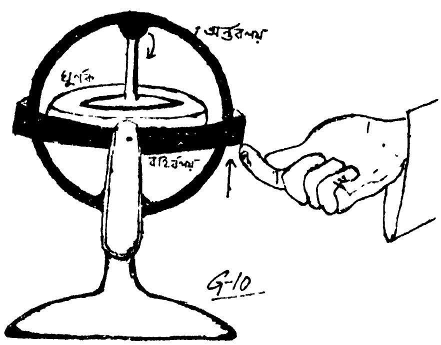
যন্ত্রনাবিক জাইরস্কোপ

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জাইরস্কোপ ছিল একটা খেলনা মাত্র, কতকগুলি চমকপ্রদ গুণবিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক লাটিম। অধুনা জাইরস্কোপকে যন্ত্রদানবের বোধেন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। জলস্থল অন্তরীক্ষবিহারী যানবাহনে জাইরস্কোপ নানাপ্রকারে কার্যকরী হইয়াছে। এই যন্ত্র চুম্বক কম্পাসের স্থলবর্তী হইয়া দিক্‌-নির্ণয় করে, জাহাজ, বিমান ও টর্পেডোকে অভীপ্সিত দিকে চালনা করে, সমুদ্রতর-ঙ্গাঘাতে দোলায়মান জাহাজের দোল কমাইয়া দেয়, মাত্র একখানা রেলের উপর দিয়া চলমান একপ্রস্ত চাকাওয়ালা গাড়ীকে স্থির রাখে।

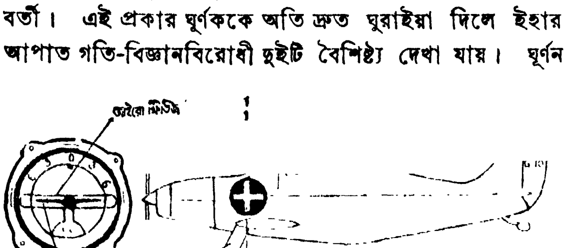


জাইরস্কোপ



জাইরস্কোপের পুরঃসরণ

সহজ ভাবে দেখিতে গেলে জাইরস্কোপ একটি ভারী ঘূর্ণনক্ষম চাকা—ইহার ত্রৈমাত্রিক ঘূর্ণন স্বাধীনতা আছে। চাকাটি যে অক্ষের উপর আবর্তিত হয় উহা একটি বলয়ের ভিতর আটকানো। এই বলয়টিও আবার আবর্তনক্ষম—ইহার মেরুদণ্ড বা অক্ষ পূর্বোক্ত চাকা বা ঘূর্ণকের (rotor) অক্ষের সঙ্গে সমকোণে নত এবং স্বয়ং দ্বিতীয় আর একটি বলয়ের অক্ষের সমকৌণিক অক্ষে ঘুরিতে পারে। জাইরস্কোপের কার্যত তিনটি অক্ষ—ঘূর্ণকের অক্ষ এবং বলয়দ্বয়ের অক্ষ। ঘূর্ণকের অক্ষকে যে-কোন দিকে স্থাপন করা যায়, কারণ তিন দিকে তিনটি অক্ষ থাকায় ইহার লম্বমান (vertical) ভাবে এবং ক্ষিতিজ সমান্তরাল (horizontal) দুই দিকে, এই তিন প্রকার ঘুরিবার স্বাধীনতা আছে। এইজন্য সামান্য স্পর্শ দ্বারা ঘূর্ণককে যে-কোন অবস্থানে লওয়া যায়। ঘূর্ণকটি খুব ভারী এবং অধিকাংশ ভর প্রান্তদেশ-বর্তী। এই প্রকার ঘূর্ণককে অতি দ্রুত ঘুরাইয়া দিলে ইহার আপাত গতি-বিজ্ঞানবিরোধী দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ঘূর্ণন



কালে ঘূর্ণকের অক্ষটি সর্বদাই নির্দিষ্ট দিকে অবস্থিত হয়। জাইর-স্কোপের ফ্রেম বা কাঠামোকে ইচ্ছামত উল্টাইয়া দিলেও ঘূর্ণকের অক্ষ প্রারম্ভে যে দিকে থাকে অথবা ঘূর্ণক যে সমতলে ঘূর্ণন আরম্ভ করে তাহার পরিবর্তন করা যায় না। এই ধর্মের নাম 'দেশাভ্যন্তরীণ ঋজুস্থিতি' (rigidity in space)—ঘূর্ণ্যমান জাইরস্কোপে ঘূর্ণকের অক্ষটি যেন শূন্যদেশের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে আটকানো থাকে। নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণ্যমান একটি জাইরস্কোপের অক্ষকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সূর্যাভিমুখী করিয়া রাখিয়া দিলে দেখা যায় অক্ষটি সর্বদা সূর্যের দিকেই থাকে—সূর্য যত উপরে উঠে অক্ষও তত খাড়া হয়। ইহাতে মনে হইতে পারে যে জাইর-স্কোপের অক্ষটি নিরন্তর ঘুরিয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে অক্ষ শূন্যদেশে স্থির রহিয়াছে—নিম্নে পৃথিবী আবর্তিত হইতেছে বলিয়া যেমন সূর্যকে আপাত ঘূর্ণায়মান মনে হয় তেমনি এই ক্ষেত্রেও পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যই জাইরস্কোপের অক্ষকে আবর্তিত হইতে দেখা যায়—অক্ষটিকে প্রারম্ভে সূর্যাভিমুখী না করিয়া ধ্রুবতারার দিকে নিশানা করিলে দেখা যাইবে অক্ষের অবস্থান সারাদিনই অপরিবর্তিত থাকে। এই স্থলে পৃথিবী ও জাইরস্কোপ উভয়ের অক্ষ সমান্তরাল বলিয়া পৃথিবীর আবর্তন জাইরস্কোপের অক্ষের অবস্থানের উপর কোন আপাত ক্রিয়া করে না।

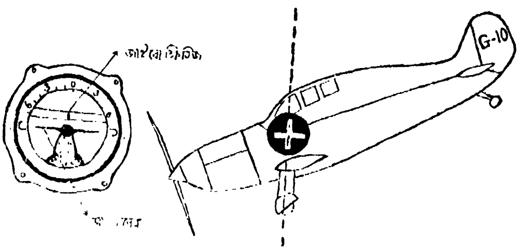
জাইরস্কোপের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা 'প্রিসিশন' (Precession)। ঘূর্ণককে আবর্তিত করিয়া দিবার পর উহার যে-কোন বলয়ে বাহ্যিক বলপ্রয়োগ দ্বারা ঘূর্ণকের অক্ষকে ঘুরাইতে চাহিলে জাইরস্কোপ উহাকে প্রতিরোধ করে। জাইরস্কোপের বহির্বলয়ে বল প্রয়োগ করিয়া উহাকে ক্ষিতিজ-অক্ষতে (horizontal axis) আবর্তিত করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে জাইরস্কোপ এই দিকে না ঘুরিয়া অন্তর্বলয় স্বকীয় লম্বমান অক্ষের (vertical axis) উপর ঘুরিয়া যাইতেছে। যে দিকে ঘুরাইবার জন্য বল প্রয়োগ করা হইবে জাইরস্কোপ স্বয়ং তাহার সমকোণে ঘুরিতে আরম্ভ করিবে যাহাতে প্রযুক্ত শক্তি নিষ্ক্রিয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণকটি আপনাকে নিয়োজিত শক্তির সঙ্গে একই সমতলে অবস্থিতি করাইতে পারে।

জাইরস্কোপের এই দুইটি গুণের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ঘূর্ণ্যমান জাইরস্কোপের অক্ষের অবস্থান অপরিবর্তনীয়। বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগে উহার পরিবর্তন ঘটাইতে চাহিলে জাইরস্কোপ উহাতে সাড়া দেয় না—পক্ষান্তরে বিরোধিতা করে।

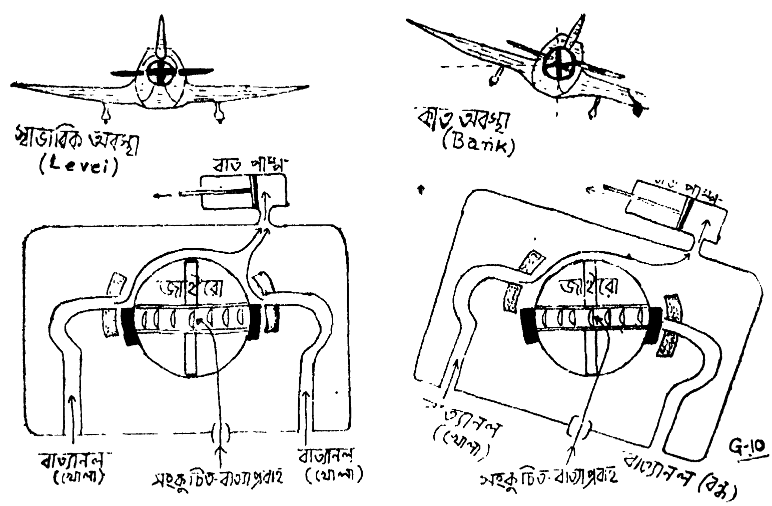
ঘূর্ণায়মান চক্রের অক্ষ দিক্‌ পরিবর্তন করে না—জাইর-স্কোপের এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া ইহাকে চুম্বক-কম্পাসের

পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জাহাজে সাধারণত চুম্বক দ্বারা দিক্ নির্ণয়ের কার্য করা হয় কিন্তু চুম্বক-কম্পাসের ব্যবহারে কতকগুলি অসুবিধা আছে। চুম্বক-কম্পাস ঠিক ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিতি করে না, স্থানবিভেদে সামান্য সরিয়া থাকে। জাহাজের আভ্যন্তরীণ লোহাদির আকর্ষণে চুম্বক-কম্পাস প্রায়শ সঠিক দিক্ নির্দেশ করে না। যুদ্ধ-জাহাজে এই অসুবিধা খুব বেশী করিয়া প্রকটিত হয়, সেখানে কামানগুলি ভারী লৌহ-নির্মিত বলিয়া চুম্বক-কম্পাসকে বিভ্রান্ত করে। অধুনা অনেক জাহাজে জাইরো-কম্পাস ব্যবহৃত হয়। জাহাজের জাইরো-কম্পাসে সাধারণতঃ পঞ্চাশ-ষাট পাউণ্ড ওজনের ঘূর্ণক থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তিতে ইহাকে প্রতি মিনিটে পাঁচ-ছয় হাজার বার ঘুরানো হয়। লম্বমান একটি বলয়াভ্যন্তরে ঘূর্ণক ক্ষিতিজ অক্ষতে আটকানো থাকে। বলয়টি কম্পাস-কার্ডের মধ্যস্থল হইতে বিলম্বিত হয়। কম্পাস-কার্ডের উত্তর-দক্ষিণ রেখা প্রথমে ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে সন্নিবিষ্ট করাইয়া জাইরস্কোপ চালাইয়া দিলে কম্পাসের উত্তর-দক্ষিণ রেখা সর্বদা অবিচলিত ভাবে উত্তর-দক্ষিণ নির্দেশ করিবে,—কারণ জাহাজ যে দিকেই ঘুরিয়া যাক না কেন জাইরস্কোপের অক্ষ নির্দিষ্ট দিকেই থাকিবে। 'প্রিসিশন'-জনিত বিচলন দূরীকরণার্থ এখানে আবশ্যক ব্যবস্থা থাকে।

জাইরস্কোপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'প্রিসিশন' অবলম্বনে সমুদ্র-গামী জাহাজের দোল কমান হয়। সমুদ্রে চলিবার সময় জাহাজ তরঙ্গাঘাতে দোল খায়। জাহাজের এই দোল কমাইতে পারিলে সমুদ্র-পীড়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়,

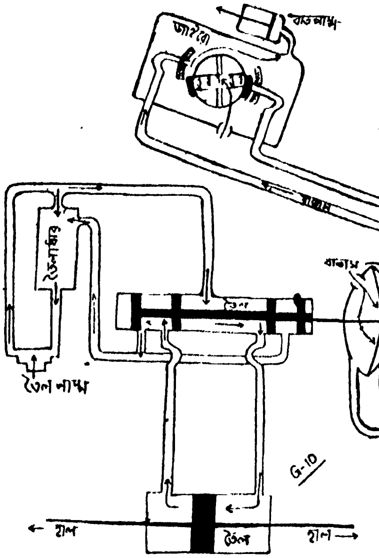


জাহাজের কাঠামোর উপর চাপ পড়ে কম এবং জাহাজ চালা-ইতেও অপেক্ষাকৃত কম শক্তির প্রয়োজন হয়। বহুকাল পূর্ব হইতেই নানা কৌশলে এই দোল কমাইবার প্রচেষ্টা হইতে-ছিল। ডাঃ এলমার স্পেরী এতদুদ্দেশ্যে জাইরস্কোপ ব্যবহার করিয়া সাফল্যলাভ করেন। এই ক্ষেত্রে জাইরস্কোপের ক্রিয়া বুঝিতে হইলে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে—জাইরস্কোপের 'প্রিসিশন'-ধর্ম এবং জাহাজের দোলের কারণ ও স্বরূপ। একটির পর একটি তরঙ্গের আঘাতে জাহাজের দোল ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়। এক-একটি তরঙ্গ জাহাজের নীচে আসিয়া এক পার্শ্বে উপস্থিত হইলে জাহাজের সেই দিকটা খানিকটা উঁচু হইয়া উঠে এবং জাহাজ সামান্য কাত হয়। তারপর তরঙ্গ অপর পার্শ্বে গিয়া আবার সেই পার্শ্বকে উঁচু করে—এইরূপে তরঙ্গাঘাত



জাহাজকে মৃদু দোলা দেয়। পরবর্তী তরঙ্গ এই দোলাকে আরও বর্ধিত করে। তাই প্রথমে হয়ত যে দোল তিন-চার ডিগ্রী থাকে ক্রমে তাহা পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ ডিগ্রীতে পরিণত হইতে পারে—কিন্তু কোন একটি তরঙ্গ জাহাজকে চল্লিশ ডিগ্রী কাত করিয়া ফেলিতে পারে না। যদি প্রত্যেকটি তরঙ্গের ক্রিয়াকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করা যায় তবে পর পর তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ বেশী দোল খাইবার হেতু পায় না। জাইরস্কোপ প্রতিটি তরঙ্গের আঘাতকে বাধা দেয়। জাহাজের মধ্যরেখায় ডেকের নীচে একবারে তলায় জাইরস্কোপ বসান থাকে। ঘূর্ণকের অক্ষ জাহাজের ডেকের সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় খাড়া ভাবে থাকে। ঘূর্ণক আটকানো থাকে একটা আধারে এবং আধারটি জাহাজের গায়ে আড়াআড়ি অক্ষে সংলগ্ন। জাহাজটি নিজে এখানে পূর্ববর্ণিত জাইরস্কোপের বহির্বলয়ের স্থলবর্তী। জাহাজের গায়ে জাইরস্কোপের আধারটি কেবল সামনে ও পেছনের দিকে হেলিতে দুলিতে পারে। তরঙ্গাঘাতে যখনই জাহাজটি দোল খায় তখন ঘূর্ণকের অক্ষটি জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বদিকে হেলিয়া আসিতে চায় কিন্তু পূর্বোক্ত 'প্রিসিশন' নিয়ম অনুযায়ী জাইরস্কোপ এই গতিকে প্রতিরোধ করে এবং আধারসহ জাইরো-যন্ত্র ক্ষিতিজ অক্ষে জাহাজের সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই ঝুঁকি তরঙ্গাঘাতের বিচলনকে প্রতিরোধ করে যাহার ফলে জাহাজ আর বেশী কাত হইতে পারে না (ঠিক যেমনটি ঘটিত যদি যে পার্শ্বে জাহাজ কাত হইয়াছে সেই পার্শ্ব হইতে ভারী জিনিস সরাইয়া অপর পার্শ্বে আনা হইত)। এমনি করিয়া জাইরো-যন্ত্রের সাহায্যে তরঙ্গাঘাতের ক্রিয়াকে নষ্ট করিয়া জাহাজকে স্থির রাখা হয়। কোন কোন জাহাজে একাধিক 'জাইরো-স্টেবিলাইজার' স্থাপন করা হইয়া থাকে

এবং প্রত্যেকটির ওজন পঞ্চাশ হইতে দুই শত টন পর্যন্ত হইতে পারে।

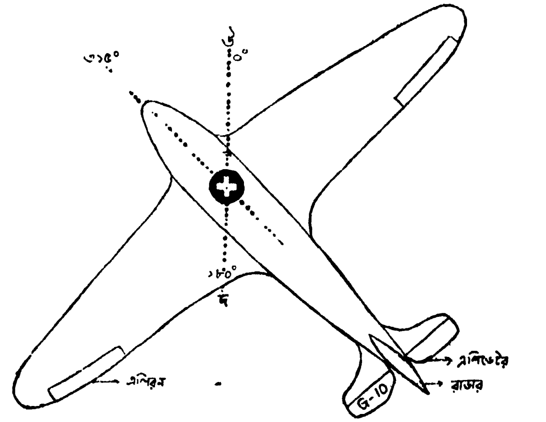


জাইরো-নাবিক

জাইরো-কম্পাসের সঙ্গে যথোপযুক্ত যন্ত্রাদি সংযুক্ত করিয়া ইহা দ্বারা নাবিকের সাহায্য ব্যতিরেকেই জাহাজকে সোজা এক দিকে চালনা করা হইয়া থাকে। যে-দিকে যাওয়া দরকার সে-দিকে এক বার চালাইয়া দেওয়ার পর জাহাজ যদি অন্য দিকে চলিতে আরম্ভ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে জাইরো-কম্পাসে উহা ধরা পড়ে, কারণ জাহাজ ঘুরিয়া গেলেও জাইরো ঘুরে না। জাইরো-কম্পাসের সঙ্গে হাল ঘুরাইবার যন্ত্রের সংযোগ রাখিয়া দেওয়া হয়। জাহাজ সামান্য ঘুরিয়া গেলেই জাইরো-কম্পাস-সংলগ্ন যন্ত্র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কার্য করিতে আরম্ভ করে ও হাল ঘুরাইয়া জাহাজকে সোজাপথে লইয়া আসে। এই ব্যবস্থার নাম জাইরো-পাইলট। মানুষ নাবিকের চেয়ে যন্ত্রনাবিক অনেকাংশে বেশী কার্যক্ষম। মানুষের ভুল হইতে পারে, জড়তা আসিতে পারে কিন্তু যন্ত্র নির্ভুল ও নিরলস। একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাল ধরিয়া জাহাজ চালান নিতান্ত বিরক্তিকর কার্য। যন্ত্রনাবিক মানুষকে এই বিরক্তির দায় হইতে অনেকাংশে মুক্তি দিয়াছে।

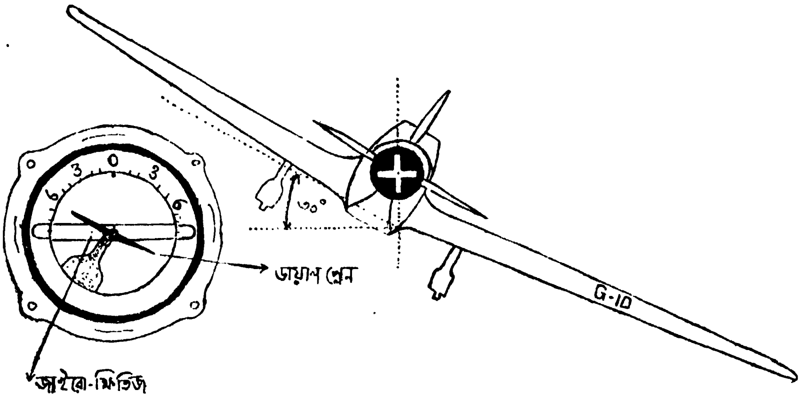
জাইরো-পাইলটের সাহায্যেই টর্পেডো চালিত হয়। টর্পেডো যে দিকে লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হয়, অভীষ্ট ফললাভের জন্য টর্পেডোর ঠিক সেই দিকে যাওয়া প্রয়োজন। জলের স্রোতে বা প্রতিরোধের জন্য এদিক ওদিকে সামান্য সরিয়া গেলেই টর্পেডো লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে টর্পেডো চালাইবার ভার যন্ত্রনাবিক 'জাইরো'র উপর অর্পিত হয়। ঈপ্সিত দিক্ হইতে টর্পেডো সামান্য বিচলিত হইলে জাইরো-পাইলট উহাকে ঠিক পথে ফিরাইয়া আনে।

জাইরস্কোপ ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এরোপ্লেনে। এরোপ্লেনের তিনটি বিভিন্ন সমতলে গতি থাকে। এরোপ্লেন মাথা উঁচুনীচু করিয়া উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে পারে (climb), দক্ষিণে বা বাম পার্শ্বে কাত বা বাঁকা হইয়া যাইতে পারে (Bank) বা সোজা মাটির সঙ্গে লেভেল বা সমান্তরাল থাকিয়া ডাইনে-বাঁয়ে মোড় ফিরিতে পারে (Turn)। শূন্যপ্রদেশে বৈমানিক চক্ষু ও স্নায়ুর সাহায্যে স্বীয় অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হয়। এরোপ্লেনের অবস্থান বিষয়ে চক্ষু বিশেষ কার্যকরী। এরোপ্লেন পার্শ্ব দিকে কাত হইয়া বা সম্মুখে বা পেছনে ঝুঁকিয়া চলিতে থাকিলে নিম্নস্থ ক্ষিতিজ সমতলের সঙ্গে তুলনা করিয়া বৈমানিক তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়াদি সর্বদা নির্ভুল খবর দিতে সমর্থ হয় না। কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে, অস্পষ্ট দিবালোকে, বা রাত্রিকালে বৈমানিকের দৃষ্টি তাহাকে সাহায্য করিতে অক্ষম। সেখানে বিমান কোন্ দিকে কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে, এই সকল অবস্থা বুঝিবার জন্য আধুনিক এরোপ্লেনে কয়েকটি বিভিন্ন জাইরস্কোপের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দিগ্‌নির্ণয়ের জন্য কাজ করে দিগ্‌দর্শী জাইরো। ইহার কার্যপ্রণালী জাহাজের জাইরো-কম্পাসের অনুরূপ। এরোপ্লেনের উত্থান-পতন বা পার্শ্ববর্তন উপলব্ধি করিবার জন্য 'ক্লাইম্ব এণ্ড ব্যাংক' জাইরোর সাহায্য লওয়া হয়। ইহার ঘূর্ণকের অক্ষকে সকল অবস্থাতে খাড়াভাবে রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এরোপ্লেন পুরোভাগ নিম্নমুখী করিয়া নীচে নামিতে থাকিলেও জাইরোর অক্ষ ঠিক খাড়াই থাকে। এই অক্ষের সঙ্গে সমকোণে সংযুক্ত রহিয়াছে একটি কাঁটা। এই কাঁটাটি লম্বমান ও এরো-



প্লেনের গাত্রে সংলগ্ন একটি ডায়ালের সম্মুখে নড়াচড়া করিয়া থাকে। কাঁটাটি জাইরোর লম্বমান অক্ষের সঙ্গে সমকোণে সংলগ্ন বলিয়া সর্বদা ক্ষিতিজ সমতলের সঙ্গে সমান্তরাল থাকে —এরোপ্লেন যে ভাবেই থাকুক না কেন। এই কাঁটা ক্ষিতিজের অবস্থান নির্দেশ করে বলিয়া ইহার নাম জাইরো-ক্ষিতিজ (Gyro-horizon) অথবা কৃত্রিম ক্ষিতিজ (artificial horizon।) ডায়ালের উপরে ঠিক মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র এরোপ্লেন আঁকা থাকে। যখন এরোপ্লেন ঠিক সোজা ও সমভাবে চলে তখন এই ডায়াল-প্লেন জাইরো-ক্ষিতিজের সমসূত্রে থাকে। এরোপ্লেন নিম্নমুখী হইলে ডায়াল-প্লেন জাইরো-ক্ষিতিজের নীচে

নামিয়া আসে—তদ্দৃষ্টে চালক বুঝিতে পারে যে বিমান কতটা নিম্নমুখী হইয়াছে। বিমান উর্ধমুখী হইলে ডায়াল-প্লেন জাইরো-ক্ষিতিজের উপরে উঠিয়া আসে। এরোপ্লেন কাত হইয়া চলিলে ডায়াল-প্লেন জাইরো-ক্ষিতিজের সঙ্গে কাত হইয়া অবস্থান করে। বিভিন্ন জাইরোর ডায়ালগুলি চালকের সামনে থাকে, উহাতে দৃষ্টি দেওয়া মাত্র চালক এরোপ্লেনের অবস্থান বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইতে পারে।



জাইরোর সাহায্যে প্লেনকে বাঞ্ছিত পথে চালিত করিবার ব্যবস্থাটি স্বয়ংক্রিয় উপায়েও করা সম্ভব। দিগ্‌দর্শীজাইরো এবং 'ক্লাইম্ব ও ব্যাংক' জাইরো উভয়ের সঙ্গে প্লেনকে ঘুরাইবার যন্ত্রাদির সংযোগ রাখা হয়। এরোপ্লেনে গতিনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত ত্রিবিধ ব্যবস্থা আছে। পেছনের খাড়া লেজটুকু 'রাডার' বা হাল, ইহাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরাইয়া প্লেনের মোড় ফেরানো যায়। খাড়া হালের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে থাকে ঐ উঁচুরকম আরও একটি জিনিস ইহার নাম 'এলিভেটর'। ইহাকে নীচু করিলে প্লেন উঠা-নামা করে। এতদ্ব্যতীত পার্শ্বস্থিত পক্ষ-দ্বয়ের দুই প্রান্তের দুইটি অংশকে ইচ্ছামত তুলিয়া ধরা যায়—ইহাদের নাম 'এলিরন'। এলিরনের একটিকে উঠাইয়া প্লেনকে এক দিকে কাত করিয়া দেওয়া চলে। দিগ্‌দর্শী জাইরোর সঙ্গে সংযোগ থাকে 'রাডার'-এর এবং উত্থান-পার্শ্ববর্তন (climb and Bank) জাইরোর সঙ্গে সংযোগ থাকে পৃথক ভাবে এলিভেটর ও এলিরন উভয়েরই। এই সংযোগ-ব্যবস্থার প্রত্যেকটির তিনটি বিভিন্ন অংশ আছে। জাইরো ইহার মুখ্য অংশ, ইহাকে 'মস্তিষ্ক' বলিয়া অভিহিত করা যায়, কারণ ইহাই প্লেনের অবস্থা অনুভব করে।

এই জাইরো-যন্ত্রগুলির ঘূর্ণক চাপযুক্ত বাত্যাপ্রভাবে ঘোরে। ঘূর্ণক একটি কক্ষে আবদ্ধ থাকে—এই কক্ষের ভিতর দিয়া পাম্পের সাহায্যে বায়ু টানিয়া লইবার ফলে জাইরো ঘুরিতে থাকে। এই কক্ষকেই জাইরো-পাইলটের 'মস্তিষ্ক' বলা হইয়া থাকে। জাইরো-ঘূর্ণকের পার্শ্বে দুই দিকে থাকে দুইটি বায়ু-সরবরাহকারী (air pick-off) নলের প্রান্ত—যাহাদের অপর প্রান্তদ্বয় অপর একটি কক্ষের দুই দিকে প্রবেশ করিয়াছে। শেষোক্ত কক্ষের মধ্যভাগে থাকে একটি ডায়ফ্রাম বা পর্দা যাহার দুই দিকে চাপ অসমান হইলে উহা এক দিকে ফুলিয়া উঠিতে পারে। যখন প্লেন সমভাবে চলে তখন জাইরো-ঘূর্ণকের উভয়পার্শ্বস্থিত নল দুইটির মুখ খোলা থাকে। জাইরো চালাইবার জন্ত যখন বাতাস পাম্প করিয়া টানিয়া লওয়া হয় তখন নল দুইটি তথা নলের শেষ প্রান্তস্থিত কক্ষ হইতেও বাতাস বাহির হইয়া আসে এবং ডায়ফ্রামের দুই দিকের চাপ সমান থাকে। কিন্তু প্লেন কোন প্রকারে ঘুরিয়া গেলে বা কাত হইলে কক্ষমধ্যে জাইরোর আপেক্ষিক অবস্থান বদলাইয়া গিয়া জাইরো-সংলগ্ন ব্যবস্থানুসারে একটি নলের মুখ সম্পূর্ণ বা অংশত বন্ধ হইয়া যায়। ইহারই ফলে একটি নল হইতে বায়ু টানিয়া লওয়ার কাজ অল্পাধিক বা পূর্ণরূপে স্থগিত থাকে। ডায়ফ্রামের এক পার্শ্বে বায়ুর চাপ বাড়ে এবং উহা একদিকে ফুলিয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে এতৎ-সংলগ্ন একটি দণ্ডে টান পড়ে বা চাপ লাগে। এই দণ্ডটি কার্য করে একটি নলের অভ্যন্তরে ভাল্‌ভ হিসাবে এবং ইহার ঈষৎ চলাচলের ফলে ভাল্‌ভ কমবেশী খুলিয়া গেলে নলের ভিতরকার ছিদ্র দিয়া স্বতন্ত্র একটি তৈলাধার হইতে তৈল নীচে নামিয়া আসিতে পারে। এইরূপে আগত তৈল হাল, এলিভেটর বা এলিনরের সংলগ্ন পিস্টনকে ঠেলিয়া দেয়, যাহার ফলে ঐগুলি যথাযথরূপে চলিয়া প্লেনকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া আসে।

যে-সব স্থলে প্লেন সোজা চালাইতে হইবে সেই সব ক্ষেত্রে বৈমানিক জাইরো-পাইলটকে চালু করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারে। অবিরাম উড্ডয়নকালে জাইরো-পাইলট বৈমানিকের বিশেষ সাহায্যকারী বন্ধু।

জাহাজ ও বিমান ব্যতীত রেলগাড়ীর চলনেও জাইরোর সাহায্যে অভিনবত্ব প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। জাইরোর গুণে এক প্রস্থ চাকার গাড়ী মাত্র একখানা লাইনের উপর দিয়া চালান সম্ভব হইয়াছে। এক-লাইনে-চলা গাড়ী এক দিকে কাত হইতে চাহিলে জাইরো তাহাকে সোজা রাখে।

যুদ্ধকালে এক-লাইনে-চলা গাড়ী সুবিধাজনক হওয়ার হেতু আছে। তাড়াতাড়ি ও কম খরচে রেল-লাইন পাতার প্রয়োজনে একটি লাইন বসাইয়া কাজ চালাইলে অবশ্য সময় ও ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে। অদ্যাপি এক-চাকার রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইহা কার্যকরী হইবে।

যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয়তায় জাইরোর আরও দুই একটি কার্যকারিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উড়ন্ত বোমা চলে রকেট বিস্ফোরণের জোরে—হাউইবাজির মত। জাইরো-পাইলট ইহাকে ঈপ্সিত দিকে চালনা করে।

ট্যাঙ্কযুদ্ধে ট্যাঙ্কস্থিত কামানগুলির সঙ্গে জাইরো সংলগ্ন থাকে। কামানগুলিকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিশানা করিয়া দিবার

পর ট্যাঙ্ক আঁকাবাঁকা পথে আনাগোনা করিলেও কামানের নিশানা ঠিকই থাকে। শত্রুর কামানের লক্ষ্য বিভ্রান্ত হয় ট্যাঙ্কের ইতস্তত গমনে, কিন্তু ট্যাঙ্ক নিক্ষিপ্ত গোলা ঠিকই পড়ে লক্ষ্যবস্তুর উপরে জাইরোর গুণে।

এতাবৎকাল পর্যন্ত যন্ত্র ছিল মানুষের হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থলবর্তী—জাইরো স্থান লইয়াছে মস্তিষ্কের। জাইরোর প্রসাদে জড় যন্ত্রদানব পাইয়াছে বিচারবুদ্ধি। মানুষ তাই ইচ্ছামত যন্ত্রের উপর আপন কর্তব্যভার চাপাইয়া দিয়া আপন মস্তিষ্ককে সাময়িকভাবে অবসর প্রদান করিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছে।

আসর

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

সরোজিনী বরণডালা হাতে যখন নববধূকে বরণ করিতে গেলেন, অবাধ্য অশ্রুধারা তাঁহার সংযম শক্তিকে হার মানাইয়া সকলের সম্মুখে ঝরিয়া পড়িল। প্রতিবেশিনী রমণীদল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও কি করছ অরুণের মা, মা হয়ে আজকের দিনে অমঙ্গল ডেকে আনছ? চোখ মুছে হাসিমুখে কর্ত্তব্য করে যাও, কচি বাছাদের আনন্দের উৎসব আজ তোমার চোখের জলে ম্লান ক'রো না যেন।"

অরুণের আজ বৌ-ভাত, অরুণের পিতা উপস্থিত নাই। যিনি আজ গৃহকর্ত্তারূপে সকল কর্ত্তব্য মাথায় লইয়া সকলকে আদর-আপ্যায়ন করিবেন তিনি কোথায়? সুদূর ব্রহ্মে, জাপান-অধিকৃত দেশে কি অবস্থায় কোথায় আছেন, আছেন কি না, কে জানে! স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বিপদের সময়ে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, নিজে বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর, কারবার রক্ষণাবেক্ষণের আশায় সেখানে রহিয়া গেলেন।

জাহাজের পর জাহাজ পলাতক বর্ম্মা-বাসিন্দা বোঝাই হইয়া ঘাটে ভিড়িল, কেহ স্বামীবিহীন, কেহ পুত্রবিহীন, কেহ নিঃসম্বল কপর্দ্দকহীন, কেহ বুকের শিশুকে স্বামীর হাতে রাখিয়া জাহাজে উঠিয়াছেন, শিশুকে তুলিয়া লইবার অবসর পান নাই, জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, কাহারও সন্তান ভিড়ের ঠেলায় জলে পড়িয়া গিয়াছে, সন্তান-হারা জননী পাগলিনী-প্রায় হইয়া সারা জাহাজ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, নির্ম্মম সত্য আর কেহ তাঁহাকে বলিতে পারিতেছে না। হাজার হাজার লোক পায়ে হাঁটিয়া দুর্গম পর্ব্বত, নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় স্বদেশে ফিরিল, অরুণের পিতার সন্ধান কিন্তু কেহ দিতে পারিল না।

সরোজিনীকে বন্ধুবান্ধব আশ্বাস দিলেন—"তোমার একার কি এ দশা আজ? কত ঘরে ঘরে এই রকম বিরহ-বিচ্ছেদের মর্ম্মন্তুদ বেদনার দীর্ঘশ্বাস উঠছে, নিয়তির এ কঠোর পরিহাস! খণ্ডাবে কে বল?"

আজকের উৎসব-গৃহে নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বর্ম্মাপ্রবাসী হতভাগ্য বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। পরস্পরকে দেখিয়া যেন নূতন করিয়া সকলের শোক উথলিয়া উঠিয়াছে।

কিরণশশী আসর জমাইয়া বসিয়া নিজের হারান ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করিতেছেন।—"সে কি আজকের কথা ভাই? পনের বছর বয়সে বিয়ে হয়ে স্বামীর হাত ধরে সমুদ্র পার হয়ে সে-দেশে গিয়েছিলাম, তখন দেশ, আত্মীয়-স্বজন সকলের জন্যে কত চোখের জলই ফেলেছিলাম, আজ আবার দেশের মাটিতে এসে সে দেশের জন্যে মন কি হাহাকারই না করে উঠছে! ৩০।৩৫ বছর ধরে স্বামী বেচারী প্রত্যেক রক্তবিন্দু জল ক'রে বছরের পর বছর ধরে যে বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী ঘর, জমিজমা, গরু, বাছুর দিয়ে সংসারটা গড়ে তুললেন, নিজে হাতে করে মাটি খুঁড়ে যে বাগানের প্রত্যেকটি ফল-ফুলের গাছ ফলিয়ে তুললাম, মুহূর্ত্তের নোটিশে 'এক কাপড়ে বেরিয়ে এস' হুকুম পেয়ে সে-সব ফেলে উড়ো-জাহাজে উঠে প্রাণ ক'টি হাতে নিয়ে দেশে ফিরে এলুম। কে কি খাব, কোথায় বাস করব, এই চিন্তাই রইল সম্বল—দেশে এসে আর আনন্দ কি বলত?"

বিমলা বলে উঠলেন, "আহা! তোমার দুঃখটাই বুঝি বড় হ'ল? তোমাদের ত নগদ টাকার অভাব নেই, ব্যাঙ্কের থেকে তুলছ আর আবার ঘর সাজাচ্ছ। আমাদের মত দুর্দ্দশায় যদি পড়তে ত বুঝতে। চাকরে মানুষ আমার স্বামী, দিন আনা দিন খাওয়া, আজ দু'টি বছর হেঁটে হেঁটে পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল তবু একটা চাকরি জুটল না এ পোড়া দেশে! যেখানেই যান সেখানেই বলে—'এই বয়সে আর কি করবেন বলুন, আপনাদের মতন বুড়োদের চাকরি দিলে দেশের ইয়ংম্যানেরা খাবে কি?' সরকার দয়া করে সাহায্য দিচ্ছেন মাত্র পঞ্চাশটি টাকা—পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করে চলে বুঝুন আজকালকার দিনে। গরিবের সংসার ছিল বটে আমাদের, তবু পঁচিশ বছর ধরে ধীরে ধীরে সংসারটি গুছিয়েছিলুম ত? বাছারা আমার খাওয়া পরার কষ্ট কোনদিন পায় নি সেখানে। এখানে পনের টাকায় একখানি অন্ধকার কুঠরি ভাড়া করে কোন রকমে মাথা গুঁজে ভিখিরীর মতন আছি, কলাপাতায় খাই, ছেলেপিলের বিছানা নেই, কাপড় নেই, দুর্দ্দশার আর শেষ নেই। বাধ্য হয়ে আমি এ, আর, পির চাকরি নিয়েছি, কোনকালে যা করি নি, আজ তাই করতে হচ্ছে, অপরিচিত লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে বক্তৃতা করা, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, ছেলেমেয়েগুলোকে একা ঘরে ফেলে—পেটের দায় এমনিই!"

মনোরমা বলিলেন, "তবু ভাই তোমরা স্বামী পুত্র সকলে একত্রে আছ, সুখে-দুঃখে সংসার গড়ে উঠবে আবার। আমি বড় মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছিলুম, বাপের বাড়ী উঠেছিলুম। স্বামী রেঙ্গুনের বাইরে একটা ছোট শহরে ডাক্তারি করতেন, তাঁর কাছে দুটি ছেলে, একটি মেয়েকে রেখে এসেছিলুম, তাদের স্কুল কামাই করাতে চাই নি, আর যাওয়া-আসার খরচটিও ত কম নয়, পারি

কি করে ? বড় ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়ছিল, রেঙ্গুনে হোষ্টেলে থাকত। সে যে কোথায়, তাও জানি না। দেশে নিশ্চয়ই আসে নি, এলে এতদিনে দেখা হ'তই। সেই থেকে পড়ে আছি এখানে, স্বামী ছেলেমেয়ে কোথায়, বেঁচে আছে কি নেই কোন খবরই জানি না। রেড্ ক্রসের সাহায্যে কত বার খোঁজ পাবার চেষ্টা করেছি, সবই ব্যর্থ হয়েছে। কত কেঁদেছি, রেডিও খুলে বসে থেকেছি এই আশায়, যদি কেউ তাদের খবর কিছু বলে। মানুষের মন এমনই পাথর হয়ে যায় অবস্থায় পড়লে—দেখ না, কেমন স্ফূর্তি আমোদে দিন কাটাচ্ছি, নেমন্তন্ন খাচ্ছি। কিন্তু ভাই রাতের অন্ধকারে মনটা হু-হু করে, মনে হয় বুঝি পাগল হয়েই যাব। ছোট মেয়েটার মোটে চার বছর বয়স, কি করছে সে কে জানে !"

অরুণের বড় বোন্ রমা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া সকলের দুঃখের কাহিনী মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল, বাঁ হাতে আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমার বাবা আসেন নি বটে, দাদারা দুজনে এসেছিলেন ভাগ্যি, তাই আজ আমাদের সরকারের দরজায় চারটি অন্নের জন্ম মাথা খুঁড়তে হয় নি। দাদারা চাকরি পেয়েছেন, সংসারটা কোনরকমে আবার দাঁড়িয়েছে, কেবল মায়ের শরীরটা ভেঙে পড়েছে দেখে আমাদের ভাবনা। কিন্তু ঐ যে বউটিকে দেখছেন, ওর আর কত বয়স হবে, বড় জোর কুড়ি-একুশ —রেঙ্গুনে আমরা এক স্কুলে পড়তাম, এক পাড়ায় ছিলাম, ওর কি দশা জানেন ? ওর স্বামী ম্যাণ্ডেলে রেলওয়েতে চাকরি করেন, সেখানে রেলের কোয়ার্টারে ওরা থাকত। সেখানকার একদল বাঙালী হাঁটাপথে মণিপুরের দিকে রওনা হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ওর স্বামী ওকে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁকে আপিস থেকে ছাড়ল না, এ দিকে ম্যাণ্ডেলে শহরে তখন ঘন ঘন বোমা পড়ছে। শহর ক্রমশঃ জনমানবশূন্য হয়ে গেল, থাকবেই বা কি করে তারা ? দু বছরের ছেলে কোলে নিয়ে ঐ তরঙ্গিণী কাঁদতে কাঁদতে পথে চলতে আরম্ভ করল। সে কি কষ্ট ! পায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। দু-একটি গরুর গাড়ী সঙ্গে ছিল, তাতে খাবার জিনিসপত্র, জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, শিশু ছেলেমেয়ে কোলে যাদের, তারা পালা করে মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীতে একটু জিরোবার স্থান পেয়েছিল। সঙ্গে চাল, ডাল, বাসনকোসন সবই ছিল কিন্তু রাঁধবে কোথায়, মাইলের পর মাইল পথ চলে গেছে, এক ফোঁটা জল নেই কোথাও। এ ত আর বাংলা দেশ নয় যে পচা পানাপুকুরও দু-চারটে থাকবে ? কোথাও যদি-বা জলের সন্ধান পাওয়া গেল, গরুর গাড়ী থামিয়ে সবাই রান্নার যোগাড় করবে ভাবছে, দেখা গেল বিলের ধারে রাশি রাশি মৃতদেহ পড়ে আছে, কেউ-বা মরে নি, তখনও ধুঁকছে। সারা পথ একটু জল পায় নি, খেতে পায় নি, জলের ধারে এসেই সকল শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বোধ হয়, প্রায় এক-শ ফুট নীচে জল দেখা যাচ্ছে, নেমে গিয়ে জল খাবার ক্ষমতাই কি তাদের আর ছিল ? সে কি বীভৎস দৃশ্য, কি করুণ ! সেখানে কি আর আগুন জ্বালিয়ে রান্না চড়াতে কারও প্রবৃত্তি হয় ? পেটের খিদে পেটেই মরে গেল ! পুরুষরা বাঁশ দিয়ে মড়াগুলোকে এক ধারে ঠেলে রেখে অনেক পরিশ্রম করে দু-চার বালতি জল তুলে এনে সকলকে হাত-মুখ ধুতে ও খেতে দিলেন, পথের সম্বলও দু-এক টিন ভরে নেওয়া হ'ল। মনটা সবারই এমন উদাস হয়ে গেল যে ক্ষুধা-বোধও যেন আর রইল না। জানি না সেই জলে কি বিষ ছিল—রাস্তায় অনেকেই কলেরায় আক্রান্ত হল, কেউ বাঁচল, কেউ মরল, কেউ-বা চলৎ-শক্তি হারিয়ে রাস্তায়ই পড়ে রইল। তরঙ্গিণীর ছেলেটি দু-চার ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেল, মৃত শিশুকে বুকে করে সে পথে বসে পড়ল, আর তার চলবার শক্তি নেই। সহযাত্রীরা তাকে অনেক বোঝালেন, যাঁরা তখনও সুস্থ তাঁরা আর দেরি করতে চান না, অন্ধকার হবার আগে কোন তাঁবু বা গ্রামে আশ্রয় নিতেই হবে, নইলে সমূহ বিপদ, হিংস্র জন্তুর অভাব ছিল না নাকি সে জঙ্গলের পথে। হিংস্র মানুষের অত্যাচারের ভয়ও কম ছিল না। একটি যুবক তরঙ্গিণীর নিরাশ্রয় ভাব বুঝতে পেরে ব্যথিত হ'ল, সে এগিয়ে এসে বলল, "দিদি, আপনি মেয়েছেলে, আপনার নানা বিপদ, আপনি সঙ্গীদের ছাড়বেন না, চলে যান। আমি আপনার সন্তানের যথাযোগ্য সৎকারের ভার নিলাম, আমি পরে যাব। আমাকে বিশ্বাস করুন—বলেই শিশুটিকে সবলে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল।

যাত্রীদল তরঙ্গিণীকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করল। এখন তরঙ্গিণী একেবারে নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, দূরসম্পর্কিত এক আত্মীয়ের বাড়ী রান্নার কাজ করে জীবিকা উপার্জ্জন করছে। স্বামীর কোন সন্ধানই পায় নি—ভাবুন ত ওর দশা ! আজ আমি জোর করে ওকে এখানে এনেছি। পরের দুঃখের কথা শুনতে শুনতে নিজের দুঃখের বোঝাটা মানুষের একটু হালকা হয় বোধ হয়।

রমার কাকীমা হঠাৎ সে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হাঁ রে রমা, তোর কি একটু আক্কেল নেই ? নতুন বউটার সামনে যত রাজ্যের দুঃখের কাহিনীর বর্ণনা চলেছে। আজকে যে তোর দাদার বউভাত, আনন্দ-উৎসব, সে কথা বুঝি সবাই ভুলে বসে আছিস্ ? বিয়ে-বাড়ী ত নয়—যেন বর্মা ইভ্যাক্যুই এসোসিয়েসন ! এ সব গল্প থামাও বলছি। চলুন সকলে খাবার আয়োজন হয়েছে, বউমাকেও নিয়ে আয় রমা, একটু পায়েস পরিবেশন করবে।"

ছাদের উপর সামিয়ানা খাটাইয়া খাবার জায়গা হইয়াছে। এক প্রান্তে তরুণ ছেলের দল অরুণকে সঙ্গে লইয়া আহারে বসিয়াছে। শৈলেন বলিতেছে, "অরুণ, তোর ভাগ্যি ভাল। পোর্টের চাকরিতে রিজাইন দিয়ে সময়মত যে পালিয়ে এসেছিলি, তাই আজ দিব্যি বউটি নিয়ে ঘর আলো করে বসেছিস। অমলকেও নাকি বি, ও, সির স্পেশাল বোটে সাহেবেরা নিয়ে গিয়েছিল রেঙ্গুন থেকে। তার পর সে 'সোয়েবো' থেকে প্লেনে এসেছে। আর আমার কি দশা জানিস না ত। আমরা ত মৌলমিনে ছিলাম বরাবর, সেখানেই জন্ম, সেখানেই সব। সেখানে যখন বোমা পড়তে সুরু হ'ল, বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে একখানা বড় কান্ট্রি বোটে করে জঙ্গলের দিকে রওনা হলেন। আমাদের ত কাঠের ব্যবসা ছিল জানিস, জঙ্গলে যাতায়াত ছিল। একটা

কাঠের বড় ভেলা বানিয়ে, পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর বেঁধে নদীর উপরেই বাস করলাম কিছুদিন। বাবা মাঝে মাঝে শহরের দিকে গিয়ে খবর আনতেন। একদিন এসে বললেন, "সব বাঙালীরা পালিয়েছে, তোমরা কি করবে এখন বল।" মা ত কান্না জুড়ে দিলেন, "না না, দেশে চল, এখানে বর্ম্মীরা আমাদের কচু-কাটা করবে, কেউ আর বাঁচব না।" বাবা বললেন, "পঞ্চাশ বছর এ দেশে রয়েছি, দেশে কোথায় যাব, কি আছে সেখানে আমার? কোথায় মাথা রাখব, কে খেতে দেবে? মা, কাকীমা, দিদি, বোনেরা সবাই একমত—দেশে যাবে। বাবা বললেন আমায়, "শৈলেন, তুই এদের নিয়ে যাবি। রেঙ্গুন থেকে নাকি এখনও ত্থ' একখানা জাহাজ ছাড়ছে, আমি যাব না, আমি এ বয়সে মরলেও ক্ষতি নেই, বাঁচি যদি, সব রক্ষা করব। তোদের একটা ভবিষ্যৎ আছে, দেশে গিয়ে সংগ্রাম করে জীবনযাত্রা আরম্ভ করবি।" আমি বললাম, "আমি যাব না বাবা, দেশকে আমি মোটেই চিনি না, কোনও টান নেই তার জন্যে, এই ত আমার জন্মভূমি—এই ত আমার দেশ। দুর্দ্দিন এসেছে বলে কি বর্ম্মীরা কোথাও পালাচ্ছে? আমরাও এ দেশের লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থাক্‌ব, পালাব কেন কাপুরুষের মত, অকৃতজ্ঞের মত?" মা, কাকীমা, দিদি মুখ খিঁচিয়ে গালাগালি করলেন। কাকার কোন সন্ধানই নেই তখনও, তিনি ছিলেন বহুদূরে নিবিড় জঙ্গলে টিম্বারের সন্ধানে। বাবা বললেন মাকে, "যতখানি কষ্ট করে দেশে যেতে হবে, সে কষ্ট আমার সইবে না, তোমাদের অনিচ্ছায় আমি তোমাদের এখানে রাখতে চাই না, মেয়েগুলোর রক্ষার ভার তোমাকেই নিতে হবে। সুতরাং তোমরা যাও, শৈলেন বড় হয়েছে, তোমাদের ভার নেবে সে—আমি আর ক'দিন? শৈলেন, তুই আর আপত্তি করিস্ নে—ওদের নিয়ে রওনা হ' আজই—সুদিন যদি ফেরে তখন আবার এখানে ফিরে আসিস—তোর কত কষ্ট হচ্ছে তা' বুঝছি।" বাবার চোখে জল দেখে আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না। একবার মা-সয়িনের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। বিপিন বলে উঠল—"সে আবার কে রে?" অরুণ উত্তর দিল, "ওরে তা জানিস না তোরা? শৈলেন হাই স্কুলে যখন পড়ছে, তখন থেকেই বর্ম্মী-সুন্দরীদের প্রেমে পড়েছে। শৈলেন চটে উঠে বলল—"আহা! তোরাই যেন সব সাধু। রেঙ্গুন কলেজের করিডোরে (Corridor) তোদের সকলের কিছু কম উচ্ছ্বাস দেখি নি। তোর না একটি অ্যাংলো মেয়ে-বান্ধবী ছিল, কি গভীর বন্ধুত্ব, খবর রাখি না বুঝি? অরুণ মুখে আঙুল দিয়া বলিল, "চুপ চুপ, কেউ আবার বউয়ের কানে তুলে দেবে। পাঠ্যাবস্থায় ওরকম দু-চারটে রোমান্স সকলের জীবনেই ঘটে থাকে। সত্যি ভাই, রেঙ্গুন-য়ুনিভার্সিটির জীবনটা ভুলব না, কি lively ছিল বল ত। এদেশে সে রকমটি কোথাও দেখি না। একটা কস্মোপোলিটন্ লাইফ—এ রকম আবহাওয়ায় মানুষ না হলে মনটা উদার হয় না। দেশের লোকের জীবনযাত্রা বড় সংকীর্ণ, বড় একঘেয়ে মনে হয়, না? বিপিন বলিল, "থামাও তোমার বক্তৃতা অরুণ, শৈলেন বল্ তোর গল্পটা।"

শৈলেন গলার স্বর একটু নামাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "সত্যি ভাই, আজও যখন নির্জ্জনে বসে সে দেশের কথা ভাবি, মনটা যেন হাওয়ার আগে ছুটে চলে। সেই দিন মা-সয়িনের কান্না, সে কি মর্ম্মান্তিক, কলেজ থেকে বেরিয়ে যখন ব্যবসা আরম্ভ করি তখন থেকেই বাবার এক বর্ম্মী কেরানীর মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়। তারা জঙ্গলে আমাদের আপিসের ঘরে থাকত। কি মিষ্টি স্বভাব যে মেয়েটি, না দেখলে বুঝবি না তোরা। কি সুন্দর ছিল তার মনটিও, এমন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি আর চোখে পড়ে নি। কি ভালবাসাই হয়েছিল আমাদের। এক দিন তাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। সারাদিনের কাজকর্ম্মের শেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রতিদিন তাদের বাড়ীর ছোট্ট বাগানটির ভিতরে কুয়োর সান-বাঁধান সিঁড়ির ধাপে বসে দুজনে দুজনের হাতে হাত রেখে ভবিষ্যৎ জীবনের কত কল্পনাই করতাম। যে-দিন বিদায়ের মুহূর্ত্তে তার হাত দুটো ধরে বললাম, "মা-সয়িন, আমি দেশে যাচ্ছি, আর হয়ত এ জীবনে দেখা হবে না, আমাকে মনে রাখবে ত? সে তার বাবার কাছে সবই শুনেছিল, পাথরের মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল, একটি কথাও বলল না। বললাম—কিছু বলবে না আমায়? তখন অঝোরে তার কোমল, কালো চোখ দুটি থেকে ধারা নেমে এল, মাথা থেকে ফুলের গুচ্ছটি খুলে নিয়ে আমার পায়ে রেখে বলল, "আমার এত ভালবাসা তুমি উপেক্ষা করে গেলে? এতদিনের মায়া কাটাতে চাও কিসের আশায়—কি পাবে এমন, যা পেয়ে আমাকে ভুলতে পারবে ভাবছ? তোমার বাবা তাঁর সারা জীবনের অর্জ্জিত সম্পত্তি আঁকড়ে ধরে পড়ে রইলেন বুড়ো বয়সে এই দেশে, আর বন্ধু, তোমার কি কিছুই নেই এখানে, যার জন্য তোমার একটুও মমতা হয়? প্রাণটাই কি সব মানুষের? হৃদয়ের কি কোন দাম নেই?"

তার প্রত্যেকটি কথায় মন তখন সায় দিয়েছিল, আজও দিচ্ছে। ব্যবসা করছি, যথেষ্ট রোজগার করছি, দুঃখ করবার মতন কিছুই নেই এখন, তবুও আমি সুখী নই। এখনও মনের গোপন-কুঠুরির দরজার ফাঁক দিয়ে সেই স্নিগ্ধ জলভরা চোখ দুটির দৃষ্টি উঁকি মারে, আমার মনকে ক্ষণকালের জন্যেও উতলা করে দেয়। কিন্তু পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, বাবার আদেশ তখন আমার সামনে সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আজ যখন মা, কাকীমা সেখানকার বাড়ীঘরের কথা মনে করে হাহাকার করেন, বলেন—কি ধনই ফেলে এলাম রে, আর হবে না এ জীবনে, আজ দুটি অন্নের জন্য কি সংগ্রামই না তোর করতে হচ্ছে?

তখন আমি মনে মনে বলি, তোমাদের সম্পত্তি ত তুচ্ছ—অর্থের বিনিময়ে সবই পাওয়া যায় আবার, আমি যে কি অমূল্য নিধি হারিয়ে এলাম তা যে আর ফিরে পাবার নয়, কেউ জানল না সে কথা। থাক—সে আমার বুকে লুকোন চিরদিনের জন্য।

নবীন দেশের ছেলে, এতক্ষণ এসব কাহিনী নীরবে শুনিতেছিল, এখন হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আর তোর বাবার কি হ'ল? তিনি এসেছেন?" "ওঃ সে বড় মর্ম্মান্তিক রে! বাবা আমাদের পাঠিয়ে পরদিনই শহরে এসেছিলেন ব্যাঙ্কের টাকা তুলতে—সেদিন

বোমাবর্ষণ চলছিল। একটা স্প্লিন্টার মাথায় লেগে তখুনি রাস্তায় পড়ে মারা যান।

"জাহাজ ছাড়বার পর আমি মৌলমিনের একটি বন্ধুর কাছে খবর পাই। মাকে অনেক দিন বলি নি—এখন মাও চলে গেছেন, যাবার আগে জেনে গেছেন বাবার সংবাদ।"

এমন সময় একটি ছেলে পায়েসের বালতি হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ওকি তোমরা কিছু খাও নি দেখছি—নতুন বৌদি যে পায়েস দিতে আসছেন এদিকে।"

সত্যিই সেদিনকার মিলন-উৎসব বর্মা ইভ্যাকুয়ীদের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে বড়ই ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রাণিজগতের খাদ্য-সংগ্রাম

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে খাওয়া এবং বংশ বৃদ্ধি করাটাই প্রাণিজগতের মুখ্য উদ্দেশ্য। খাদ্য না হইলে জীবন বাঁচে না;



লাল-লেজওয়ালা এক জাতীয় বাজ-পাখী একটা হাঁস শিকার করিয়া খাইবার আয়োজন করিতেছে

অথচ খাদ্যের সাহায্যে শরীর পুষ্ট করিলেও প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে প্রত্যেক জীবকেই একদিন-না-একদিন পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এই পরাজয়ই জীবের মৃত্যু। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে জীবমাত্রেই জীবন-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। অথচ মৃত্যু চায় এই জীবন প্রবাহকে মুছিয়া ফেলিতে। মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াই যেন জীবন-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্ত জীবমাত্রেরই বংশবৃদ্ধির অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। জীবোৎপত্তির কাল হইতে পৃথিবীতে অবিরাম জীবন-মৃত্যুর এই দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম চলিতেছে। খাদ্য দেহযন্ত্রকে পরিপুষ্ট করিয়া এই সংগ্রাম পরিচালনের শক্তি যোগাইয়া থাকে। খাদ্যের প্রয়োজন হইবামাত্রই জীবের ক্ষুধার উদ্রেক হয়। স্বাদ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় খাদ্যের উপাদেয়ত্ব-বোধে সাহায্য করে। এইগুলি না থাকিলে প্রাণিজগতের কেহই খাদ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিত না। রুচির বৈচিত্র্য অনুযায়ী প্রকৃতির ভাণ্ডারে অসংখ্য রকমারি খাদ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। বিভিন্ন রকমের খাদ্যের উপযোগী হইয়াই বিভিন্ন জীবের আকৃতি, প্রকৃতি ও অঙ্গ-সংস্থান প্রভৃতি বিবর্ত্তিত হইয়াছে। খাদ্য হিসাবে প্রাণিজগৎকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি প্রাণী নিরামিষাশী, কতকগুলি আমিষাশী আবার কেহ কেহ আমিষ, নিরামিষ উভয় রকমের খাদ্যই গ্রহণ করিয়া থাকে। এস্থলে কেবলমাত্র আমিষাশী প্রাণীদের বিষয়ই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। খাদ্যভাণ্ডার অফুরন্ত হইলেও মাংসাশী প্রাণীদের জন্ত প্রকৃতি এমনই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে, এক জীব অন্ত জীবকে উদরস্থ করিয়াই জীবন ধারণ করিবে। এইরূপ সুবিধা এবং প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-সংগ্রহের জন্ত প্রত্যেকটি প্রাণীকে গুরুতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। আমাদের চতুর্দ্দিকে খাদ্যের জন্ত এই সংগ্রাম অহরহ দেখিতে পাই। প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় এক জীব যেখানে অন্ত জীবের ভক্ষ্য সেখানে এই সংগ্রামের বীভৎসতা অতি স্পষ্টরূপেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ পশুপক্ষী, সরীসৃপ ও মৎস্যাদি প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রকায় কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হত্যালীলার এই উগ্রতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জাতীয় হিংস্র প্রাণীরা



গোসহক নামক বাজ-পাখী একটি প্রাণীকে শিকার করিয়া খাইবার উপক্রম করিতেছে

বিভিন্ন রকমের প্রাণী হত্যা করে এবং তাহাদের শিকারের রীতিও বিভিন্ন ধরণের। মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বিড়াল জাতীয় অন্যান্য জানোয়ারদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিকার করিবার সুবিধার জন্যই পরিকল্পিত। ইহারা তীক্ষ্ণ নখ, দন্ত এবং অপরিমিত শক্তির অধিকারী হইয়াও গরুবাছুর, হরিণ প্রভৃতি নিরীহ প্রাণীদিগকে শিকার করিবার জন্য গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সিংহের ধূসর বা বাদামী রং, বাঘের গায়ের লম্বা ডোরা, চিতাবাঘের কালো ছাপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত এমন ভাবে মিলিয়া যায় যে, সহজে ইহাদের অস্তিত্ব বুঝিতেই পারা যায় না। এই বর্ণ-সামঞ্জস্যের সুযোগ লইয়া



বাজ-পাখীর শাবক একটা খরগোস হত্যা করিয়াছে

তাহারা চুপিচুপি শিকারের দিকে অগ্রসর হয় এবং একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে উপনীত হইয়া শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে। হরিণ প্রভৃতি প্রাণীরা দুর্ব্বল হইলেও প্রাণ বাঁচাইবা জন্য ছুটিয়া পলাইতে পারে। ছুটিয়া ধরিতে না পারিলে কেবল শারীরিক শক্তিতেই শিকার আয়ত্ত করা চলে না। দুর্ব্বল হইলেও প্রাণভয়ে ছুটিবার সময় হিংস্র পশুরা দৌড়ের পাল্লায় ইহাদের সহিত পারিয়া উঠে না। কাজেই সিংহ, ব্যাঘ্রের মত বলশালী পশুকেও গোপনীয়তার আশ্রয়ে নিঃশব্দে গুড়ি মারিয়া শিকারের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষা আকারে ছোট হইলেও হায়েনা, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতির হিংস্রতার তুলনা মিলে না। কিন্তু কেবল উগ্রতা বা হিংস্রতার সাহায্যেই খাদ্য সংগ্রহ হয় না। কাজেই ইহারা নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিয়া দলবদ্ধভাবে শিকার আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহাতেও অনেক সাবধানতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। নচেৎ সামান্য ত্রুটির জন্যও অনেক সময় শিকার হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। কেবল হিংস্র পশুই নহে, বিভিন্ন জাতীয় জলচর প্রাণী ও পাখী এমন কি পিপীলিকা, কয়েক জাতীয় মাকড়সা প্রভৃতি কীটপতঙ্গেরাও দলবদ্ধভাবে শিকার আক্রমণ করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার প্রাণীদের পক্ষে ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকা শিকার করা কঠিন ব্যাপার নহে। অথচ পিপীলিকাভুক্ বৃহদাকার প্রাণীদের পিপীলিকা শিকারের জন্য যথেষ্ট শ্রমস্বীকার এবং কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। পিপীলিকা অপেক্ষা ব্যাঙ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বৃহৎ আকারের প্রাণী। তথাপি ব্যাঙ গোপনীয়তার আশ্রয় লইয়া যথেষ্ট সতর্কতার সহিত লম্বা জিভের সাহায্যে একটি একটি করিয়া পিপীলিকা শিকার করিয়া থাকে। মোটের উপর দেখা যায়, কেবলমাত্র দৈহিক বলে বলীয়ান হইলেই খাদ্য-সংগ্রামে সফলতা অর্জ্জন করা যায় না; কৌশল, দক্ষতা এবং সতর্কতা অপরিহার্য্য।

দক্ষতা, কৌশল প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিলে ঈগল, মেছেল, চিল, বাজ, শিকরে, মাছরাঙা, বক, কেরাণী পাখী প্রভৃতির শিকার-কাহিনী অতীব কৌতুহলোদ্দীপক মনে হইবে। পাখীদের মধ্যে ঈগল সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। মেষশাবক, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীকে অনায়াসে ইহারা ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই নিরীহ প্রাণীগুলিও আততায়ীর আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই সতর্কভাবে অবস্থান করে। কাজেই ঈগলের মত পাখীকেও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়। মেছেল পাখীরাও দৈহিক শক্তিতে কম যায় না। মাছ, কচ্ছপ, সাপ প্রভৃতি ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। জলাশয়ের ধারে খুব উঁচু গাছের উপর মেছেল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মাঝারিগোছের রুই, কাতলা, কচ্ছপ বা অন্যান্য মাছ ভাসিতে দেখিলেই গাছের ডাল হইতে ভারী প্রস্তরখণ্ডের মত মেছেল তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে



পেলিকানের খাদ্য-সংগ্রহের অপূর্ব্ব ভঙ্গী

এবং নখ বিঁধাইয়া শিকার তুলিয়া লইয়া যায়। সময় সময় ভুলক্রমে বৃহদাকৃতির মাছকে নখে গাঁথিয়া বিপদে পড়িয়া থাকে এবং জলের মধ্যে অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শিকার ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হয়।

একবার মেছেল পাখীর শিকার ধরার সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। দুপুরবেলায় একদিন একটা মেছেলকে হঠাৎ জলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিলাম। পাখীটা জলে পড়িবার কিছুক্ষণ পরেই প্রবল ঝাপটা-ঝাপটি সুরু করিয়া দিল, মনে হইল শিকার টানিয়া তুলিতে পারিতেছে না। আট-দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তথাপি পাখীটা যেন জলের উপর অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসিয়া রহিল। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক, কারণ ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা শিকার লইয়া উড়িয়া যায়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে শিকার বৃহদাকারের হওয়ার ফলে কিছু বেশী সময় ধ্বস্তাধ্বস্তি হওয়া সম্ভব হইলেও এত বেশী সময় লাগিতে পারে না। আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর দেখিলাম পাখীটা যেন ক্রমশঃই ডুবিয়া যাইতেছে। তখন সে কেবল উপরে ভাসিয়া থাকিবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। এ অবস্থায় কৌতুকপ্রিয় ছেলের দল জাল নিক্ষেপ করিয়া শিকার সমেত পাখীটাকে ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিল। দেখা গেল, এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে। পাখীটা ভুলক্রমে একটা বড় কচ্ছপকে শরীরের একপাশে নখ বিঁধাইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কিন্তু অত বড় কচ্ছপটাকে তাহার পক্ষে টানিয়া তোলা অসম্ভব। তথাপি সে কচ্ছপটাকে ছাড়িয়া দেয় নাই। সুযোগ বুঝিয়া কচ্ছপটাও গলা বাড়াইয়া মেছেলটার পায়ে মরণ-কামড় দিয়া আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। আর কিছু সময় অপেক্ষা করিলেই কচ্ছপ পাখীটাকে জলের নীচে লইয়া যাইত। কচ্ছপটা তেমন কিছু গুরুতর আঘাত পায় নাই; কিন্তু পাখীটা সে ধাক্কা আর সামলাইয়া উঠিতে পারিল না।



বাচ্চাগুলিকে খাওয়াইবার জন্য পাখী আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে

মাছরাঙার মৎস্য শিকার সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গাছের ডালে মাছরাঙা চুপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে। মাছকে জলের উপর ভাসিতে দেখিলেই অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সুতীক্ষ্ণ চিমটার মত ঠোঁট দিয়া ধরিয়া লইয়া আসে। তারপর ডালের উপর আছাড় মারিতে মারিতে মাছটাকে নির্জীব করিয়া গিলিয়া ফেলে। সাদা-কালোয় বিচিত্রিত মাছরাঙার শিকার-প্রণালী আরও অদ্ভুত। ইহারা উড়িতে উড়িতে জলাশয়ের উপরে খুব উঁচুতে উঠিয়া অতিদ্রুত ডানা কাঁপাইয়া একস্থানে স্থির ভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর হঠাৎ ঝুপ করিয়া জলে পড়ে এবং ধারালো ঠোঁটের সাহায্যে মাছটিকে ধরিয়া লইয়া গাছের ডালে বসিয়া খায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সারাদিন এই ভাবে ধৈর্য্য সহকারে তাহাদিগকে খাদ্যান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পাখীদের মধ্যে বকের মত ধৈর্য্যশীল শিকারী খুব কমই দেখা যায়। ইহাদের সুতীক্ষ্ণ ঠোঁট, তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শিকারের সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেরূপ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। হাঁড়িচাচা পাখীরা সাপের শত্রু। কিন্তু সাপকে কাবু করিতে ইহাদিগকে ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। আমাদের দেশের ছাতারে পাখীগুলিকে আহারান্বেষণে সারাদিন বনে জঙ্গলে ভূমির উপর বিচরণ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহারা পোকামাকড় সংগ্রহ করিয়াই জীবন ধারণ করে। কিন্তু বড়ই হউক কি ছোটই হউক, কোন রকমের সাপ ইহাদের নজরে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তাহারা তাহাকে দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করিয়া ঠোক্রাইয়া মারিয়া ফেলে।



সিংহ-শাবক আহারার্থ একটা প্রাণীকে আক্রমণ করিয়াছে



একটা মাছ আর একটা মাছকে গিলিতেছে

তাহাদের সর্প শিকারের দৃশ্য অপূর্ব্ব। এ দৃশ্য একবার আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। একসঙ্গে অনেকগুলি পাখীর চীৎকারে তাহাদের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দেখিলাম প্রায় চার-পাঁচ ফুট লম্বা একটা বিষধর সাপকে ইহারা সকলে মিলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে। ক্রুদ্ধ সাপটা ফণা উদ্যত করিয়া একদিকে যেই ছোবল মারিতে চেষ্টা করে অমনি সেদিকের পাখীগুলি লাফাইয়া সরিয়া যায় এবং ইতিমধ্যে লেজের দিকে অপর পাখীগুলি তাহাকে আক্রমণ করে। নিরুপায় হইয়া সাপটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার জন্য যত বারই চেষ্টা করে তত বারই তাহারা তাহার লেজ ধরিয়া পরিষ্কার স্থানে টানিয়া আনে এইরূপ দলবদ্ধ আক্রমণের ফলে সাপকে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব-আফ্রিকার সর্পভুক্ কেরাণী পাখীদেরও সাপের সহিত গুরুতর লড়াই করিয়া উদর পূরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। কয়েক জাতীয় পাখী যেমন সাপের মাংসে উদর পূরণ করে সাপও তেমনই আবার অন্যান্য প্রাণীদিগকে উদরসাৎ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই খাদ্য-সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকেও গুরুতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। বোরা, চিতি ও অন্যান্য বৃহদাকৃতির অজগর, হরিণ, ছাগল প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার শিকার করিয়া থাকে। শিকার ধরিবার জন্য ইহারা বেমালুম আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে এবং কাছে আসিবামাত্রই তাহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া সহজেই কাবু করিয়া ফেলে। কোন কোন সাপ আবার অপর সাপকে উদরস্থ করিয়া থাকে। তাছাড়া অন্যান্য সাপ সাধারণতঃ ইঁদুর, ব্যাঙ, মাছ ও অন্যান্য পোকা-মাকড় খাইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইঁদুর, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও সাপের পক্ষে ইহারা অনায়াসলভ্য নহে। ঘাস-পাতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া অতি সন্তর্পণে ইহারা শিকারের প্রতি অগ্রসর হয়। ইহাতেও যে সর্ব্বদাই সফলতা অর্জ্জন করিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। একটুখানি অসতর্কতার জন্য সাপের কবল হইতে শিকারকে পলায়ন করিতে দেখা যায়। সাপ যেভাবে ধীরে ধীরে শিকার উদরস্থ করে তাহা প্রাকৃতিক ব্যাপারের চরম নির্ম্মমতার পরিচায়ক। বর্ত্তমান যুগে 'লিঞ্চিং' করিয়া মানুষ যেমন জীবন্ত মানুষকে ধীরে ধীরে পোড়াইয়া মারে, সাপের ব্যাঙ উদরস্থ করাও অনেকটা সে-রকমের ব্যাপার। ধীরে ধীরে সাপের উদরস্থ হইবার সময় ব্যাঙের করুণ আর্ত্তনাদ সকলেই শুনিয়াছেন। মানুষ যে-সকল নির্যাতন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়াছে তাহার তুলনা নাই বটে; কিন্তু প্রকৃতিতেও খাদ্য-সংগ্রামের ব্যাপারে এরূপ বহুবিধ নির্যাতনের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন জাতীয় মাকড়সা, পাখী, ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীদিগকে শিকার করিয়া থাকে। এরূপ কোন শিকার জালে পড়িলে মাকড়সা তাহাকে ফিতার মত চওড়া সুতার সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ফেলে। সুতার পুঁটুলি মধ্যে বন্দী হইয়া শিকার কিন্তু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। অনেকক্ষণ পরে সুবিধামত মাকড়সা সুতার পুঁটুলির উপর দাঁত ফুটাইয়া শিকারকে হত্যা করিয়া থাকে। কুমোরে-পোকা তাহার ভবিষ্যৎ সন্তানদের খোরাকের জন্য ক্যাটারপিলার, শুঁয়া-পোকা, মাকড়সা প্রভৃতি শিকার করে, কিন্তু সেগুলিকে প্রাণে মারে না—অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রাখিয়া তাহাদের গায়ে ডিম পাড়িয়া রাখে। ডিম হইতে বাচ্চা ফুটিয়া তাহারা শিকারের দেহ উদরস্থ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কয়েক জাতীয় কুমোরে-পোকা এবং নেউলে-পোকা ক্যাটারপিলার বা শুঁয়া-পোকাকে হত্যা বা অসাড় না করিয়া তাহাদের শরীরে হুল বিঁধিয়া ডিম পাড়িয়া যায়। শুঁয়া-পোকার শরীরের মধ্যে কিছুকাল বাদে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলি শরীরের চামড়া ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় শুঁয়া-পোকা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে এবং



শূকরের বাচ্চাগুলি মায়ের দুধ খাইতেছে। অপেক্ষাকৃত প্রবল বাচ্চাগুলিই অধিকতর দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে

অবশেষে নির্জীব ভাবে একস্থানে অবস্থান করে। সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং পোকাগুলি বাহির হইয়া তাহার শরীরের চতুর্দ্দিকে গুটি বাঁধিয়া অবস্থান করে। কালক্রমে গুটি কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ নেউলে-পোকার রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া যায়।



কোলিঅপটার বিটল নামক একজাতীয় পোকা একটা মাছিকে মারিয়া ফেলিতেছে

সাধারণ ফড়িং, গঙ্গা-ফড়িং, জল-কাঠি, জল-বিছু প্রভৃতি প্রাণীরা অন্যান্য কীট-পতঙ্গ শিকার করিয়া প্রাণধারণ করে। শিকার সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদিগকে অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। ফড়িং খাদ্য-সংগ্রহের আশায় একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। শিকার করিবার উপযোগী অপর কোন ফড়িং দেখিলেই অকস্মাৎ ছুটিয়া গিয়া ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া আসে। গঙ্গা-ফড়িং ফুলফল লতাপাতার মধ্যে বেমালুম গায়ের রং মিলাইয়া শিকার ধরিবার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া যদি কোন কীট-পতঙ্গ নিকটে আসিয়া পড়ে তবে তৎক্ষণাৎ সে তাহাকে ধারালো সাঁড়াশীর সাহায্যে চাপিয়া ধরে। জল-কাঠি, জল-বিছু প্রভৃতি প্রাণীরাও জলজ ঘাস-পাতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। কোন রকমের শিকার নিকটে আসিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ফড়িং আকাশে বিচরণ করে বটে ; কিন্তু শৈশবাবস্থায় তাহারা জলের নীচে বাস করে। এ অবস্থায় তাহারা জলজ পোকা-মাকড় ছোট ছোট মাছ প্রভৃতি শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। শিকার দেখিতে পাইলেই অতি সন্তর্পণে এক পা দুই পা করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং সুযোগ বুঝিয়া অকস্মাৎ তাহার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

বহুরূপী জাতীয় প্রাণীরা অদ্ভুত উপায়ে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় বহুরূপী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রত্যেকেই ইচ্ছামত যখন-তখন গায়ের রং বদলাইয়া ফেলিতে পারে। যখন যেখানে থাকে সেই পারিপার্শ্বিকের সহিত গায়ের রং মিলাইয়া ঠিক নির্জীব প্রাণীর মত চুপ করিয়া থাকে। একটু দূরে কোন পোকা-মাকড় আসিয়া বসিলেই তৎক্ষণাৎ জিভটাকে অসম্ভব রকম বাড়াইয়া দেয়। জিভটা সরু লিকলিকে ; কিন্তু মাথাটা মোটা। জিভের মোটা প্রান্তভাগ আঠালো পদার্থে আবৃত। অব্যর্থ লক্ষ্যে আঠালো অংশ স্পর্শ করাইবামাত্রই পোকাটা আঠায় জড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বহুরূপীর মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। মোটের উপর পোকাটা উড়িয়া আসিয়া বসিবামাত্র চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। বহুরূপীর এরূপ শিকার-দক্ষতা এবং সর্ব্বত্র পোকা-মাকড়ের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বদাই যে ইহারা প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে এমন কথা বলা যায় না। সময় সময় ইহাদিগকে অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়ও দিন কাটাইতে হয়। টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি প্রাণীরাও পোকা-মাকড় খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু পোকামাকড়ের প্রাচুর্য্য থাকিতেও ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া খাদ্যসংগ্রহ করিতে হয়। প্রখর আলোর নিকট প্রায় সর্ব্বদাই পোকা-মাকড়েরা ভীড় জমাইয়া থাকে। টিকটিকিরা এই খবরটা খুব ভালরকমই জানে। কাজেই তাহারা শিকার ধরিবার আশায় আলোর আশেপাশেই অনবরত ঘোরাফেরা করিয়া থাকে এবং শিকার দেখিলেই পা টিপিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয় এবং ছোঁ মারিয়া শিকারকে মুখে পুরিয়া লয়। গোসাপেরা জীবিত অথবা মৃত উভয় রকমের প্রাণীর দেহই উদরসাৎ করিয়া থাকে। কয়েক জাতীয় গোসাপ আবার প্রধানতঃ মাছ খাইয়াই উদর পূরণ করে এবং মাছ ধরিবার জন্য ইহারা প্রায় সারাদিন জলের মধ্যেই বিচরণ করে। সাপ, গোসাপের উপাদেয় খাদ্য। অনেক সময় সাপের সহিত তাহাদের লড়াই বাধিয়া যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ লড়াই চলিবার পর সাপকে পরাজয় মানিতেই হয়। ইহারা পাখী, কচ্ছপ ও সাপের



রোড-রানার নামক দুই পাখী টিকটিকি উদরস্থ করিতেছে

ডিম খাইয়া উজাড় করিয়া দেয়। সরীসৃপের মধ্যে কুমীর বিরাট্ আকারের প্রাণী। শিকার-দক্ষতাও ইহাদের অসাধারণ। শরীরের অনুপাতে ইহাদের প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু রোজ রোজ প্রয়োজনানুরূপ খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য অনেক সময় ইহাদিগকে মাছ বা অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় প্রাণী শিকার করিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। সময় সময় খাদ্যান্বেষণে ইহাদিগকে জল ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিয়া আসিতে দেখা যায়।



সাপ ব্যাঙটাকে গিলিতে সুরু করিয়াছে

মাছের মধ্যে অনেকেই শিকারীর পর্য্যায়ে পড়ে। ন্যাদস, ভেট্‌কি প্রভৃতি মাছের শিকারের প্রবৃত্তি অতিশয় উগ্র। এই উগ্রতার ফলে সময় সময় হিসাবে ভুল করিয়া নিজের শরীর অপেক্ষা বৃহত্তর মাছকে গিলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে; কিন্তু অর্দ্ধপথ গিয়াই শিকার মুখের কাছে আটকাইয়া যায়। তখন আর উগরাইয়া ফেলিবারও উপায় থাকে না। ফলে শিকার ও শিকারী উভয়কেই মৃত্যু বরণ করিতে হয়। বোয়াল মাছ স্বজাতীয়, বিজাতীয় সকল রকমের মাছ—এমন কি সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি যাহাকে ধরিতে পারে—তাহাকেই উদরস্থ করিয়া থাকে। ইহারা শিকারের সন্ধানে ওৎ পাতিয়া থাকে এবং সুযোগমত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শিকারকে সঙ্গে সঙ্গে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। ইহারা রাক্ষুসে প্রকৃতির মাছ। ইহাদের পেটের থলিও অসম্ভব বড়; কাজেই প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণেও ইহাদের কোনই অসুবিধা হয় না। সময় সময় ইহাদের পেটের থলিতে প্রকাণ্ড সাপ বা প্রায় সমপরিমাণ বোয়াল মাছকে অর্দ্ধগলিত বা অবিকৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ শিকার হজম করিতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিয়া থাকে। অনেক রকমের মাছ আছে যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বর্ণসাম্যের সুযোগে আত্মগোপন করিয়া শিকার ধরিয়া থাকে। টারবট্, সোল, প্লেইস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পাতামাছ শিকার ধরিবার জন্য এরূপ গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েক জাতীয় মাছ আবার শিকারকে প্রলোভিত করিয়া কাছে আনিবার জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ বড়শী মাছ নামে অভিহিত করা যায়। ইহাদের গোঁফগুলি একটু অদ্ভুত ধরণের—মনে হয় যেন বড়শীর সহিত টোপ গাঁথা রহিয়াছে। শিকারকে কাছে আনিবার জন্য এই মাছগুলি একস্থানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া শুঁড় বা গোঁফগুলিকে ছিপের মত বাড়াইয়া দিয়া ঈষৎ আন্দোলিত করিতে থাকে। অন্য মাছেরা ইহাতে প্রলোভিত হইয়া কাছে আসিলেই শিকারীর উদরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। থ্রেসার-সার্ক নামক একজাতীয় হাঙ্গরের শিকার-কৌশলও কম বিস্ময়কর নহে। ইহারা বেশীর ভাগ সময় হেরিং মাছ শিকার করিয়া বেড়ায়। হেরিং মাছ ঝাঁক বাঁধিয়া চলে। থ্রেসার-সার্ক ইহাদের ঝাঁকের সামনে আসিয়া লেজের ঘায়ে জলকে এমন ভাবে আন্দোলিত করিয়া তোলে যে, মাছগুলি ভয়ে একস্থানে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। তখন ইহাদের কয়েকটাকে এক এক গ্রাসে উদরস্থ করিতে হাঙ্গরের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি মাছ আরও অদ্ভুত উপায়ে শিকার ধরিয়া থাকে। ইহাদিগকে বৈদ্যুতিক মাছ বলে। বৈদ্যুতিক শঙ্কর মাছ, বৈদ্যুতিক বান মাছ গায়ে বৈদ্যুতিক 'শক' লাগাইয়া শিকারকে অসাড় করিয়া ফেলে। ইহাদের শরীরে এরূপ প্রবল বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয় যে, একবার মাত্র স্পর্শ করিলেও মানুষ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি বৃহদাকারের প্রাণীরা পর্য্যন্ত অচৈতন্য হইয়া পড়ে। এই মাছেরা আত্মরক্ষা এবং শিকার সংগ্রহ উভয় কার্য্যেই বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

গল্পে সাপের মাথায় মণির কথা শোনা যায়। অনেকে বলেন, সাপ কোনগতিকে উজ্জ্বল মণি সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা মুখে লুকাইয়া রাখে। শিকার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্ধকারে কোন নির্জ্জন স্থানে উহা ভূমির উপর রাখিয়া সাপ তাহার নিকটেই অবস্থান করে। মণির ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হইয়া পোকা-মাকড় উড়িয়া আসিলেই সাপ তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। ইহার সত্যতা থাকুক না থাকুক কথাটার যৌক্তিকতা আছে। কয়েক জাতীয় মাছ কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে এইরূপেই শিকার ধরিবার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। এই মাছেরা গভীর সমুদ্রে বিচরণ করে। ইহাদের কাহারও দাঁত, কাহারও চোখ, কাহারও বা শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে আলোক নির্গত হয়। এই আলোয় আকৃষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছেরা নিকটবর্ত্তী হইলেই অনায়াসে তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। প্রাণিজগতে খাদ্য-সংগ্রহের জন্য এইরূপ আরও কত যে কৌশল অবলম্বিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।



সাপ ব্যাঙকে ধরিয়াছে

রাজনারায়ণ বসু ও বাংলা ভাষা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে (পৃ. ৯৩) লিখিয়াছেন :

"রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহে শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

অসাধারণ মমত্বের সঙ্গে রাজনারায়ণ আজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন এবং স্বদেশের উন্নতি সাধনের পক্ষে ইহা যে অত্যাবশ্যক এ কথা তিনি গত শতাব্দীর চতুর্থ দশক হইতে বক্তৃতা ও লেখনী পরিচালনা দ্বারা স্বদেশবাসীর মনে বদ্ধমূল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ ১৮৪৮, ১লা জুন হেয়ার স্মৃতি-সভায় স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বক্তৃতাটি ঐ সনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৭৭০ শক) প্রকাশিত হয়। ইহার পর রাজনারায়ণ ১৭৭৮ শকের (১৮৫৬ খ্রী:) জ্যৈষ্ঠ এবং ১৭৯৮ (১৮৭৬ খ্রী:) শকের কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় এ বিষয়ে আরও দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

"জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন আবার জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। স্বদেশীয় ভাষানুশীলন সম্বন্ধে আমরা অনেক দিন হইল এই পত্রিকায় উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের লেখা দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকারও সাধিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার প্রতি যাঁহাদিগের অনাদর ছিল, ঐ প্রস্তাব প্রকাশ করিবার পর তাহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছিল। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতি অনেক পরিমাণে সেই অনুরাগেরই ফল।"

১৭৭৮ শকে লিখিত প্রবন্ধেও রাজনারায়ণ এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক *Captive Ladie*'র এক খণ্ড ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধু গৌরদাস বসাক মারফত কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি জে. ই. ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে (বেথুন) উপহার প্রদান করেন। বীটন সাহেব ১৮৪৯, ২০শে জুলাই গৌরদাসকে একখানি পত্রে লিখেন যে, ইংরেজীর পরিবর্ত্তে মাতৃভাষাতেই প্রত্যেকের কাব্যাদি রচনা নিবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। রাজনারায়ণ ইহার এক বৎসর পূর্ব্বেই এই কথা বলিয়াছিলেন। এই অত্যাবশ্যক রচনাটি শতবর্ষ যাবৎ সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে, তাঁহার কোন পুস্তকে ইহা প্রকাশিত হয় নাই। মাতৃভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন দিক হইতে তিনি যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন আজিও তাহার গুরুত্ব সমধিক অনুভূত হইবে। এই জন্য বক্তৃতাটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল। বঙ্গভাষার অনুশীলনে সরকারী ঔদাসীন্য এবং প্রতিবন্ধকতার কথাও বলিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই :

"কোন দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যালাভ সে দেশের সকল মঙ্গলের মূলীভূত হইয়াছে। প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোভার ভূয়োভূয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়, বায়ুহিল্লোলে কম্পিত সুচারু শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্রের সুরঙ্গ তরঙ্গাবলি সন্দর্শনে যে অপূর্ব্ব আহ্লাদ সঞ্চার হয়, বা নিশানাথ পূর্ণচন্দ্রের অজস্র সুধা বর্ষণে জগৎ সুধাময় দেখিয়া চিত্ত যে অপার পুলকে পরিপূর্ণ হয়, সূর্য্য সেই সমস্ত দৃষ্টিসুখের এক মাত্র মূল কারণ ; তদ্রূপ দেশস্থ লোকের কায়িক সুস্থতা, মানসিক ক্ষমতা, লোকাচারের সুশৃঙ্খলা, ধনের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের উন্নতি প্রভৃতি যত প্রকার মঙ্গল কল্পনা আছে, বিদ্যারূপ দীপ্যমান সূর্য্যজ্যোতি সে সমুদয়ের একমাত্র মূল কারণ হইয়াছে। অতএব এদেশের দুরবস্থা মোচন বা সুখোন্নতির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে দেশস্থ লোকের অজ্ঞান তিমির নিরাকরণ করা অতি গুরুতর উপায় হইয়াছে। হা! যৎপরিমাণে এই মহা কার্য্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার প্রতি তৎপরিমাণে রাজা কি প্রজা সকলেরই অবহেলা। আমারদিগের দেশ অজ্ঞান তিমির দ্বারা যেরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। চতুর্দ্দিকে কি মহাশূন্য দেখিতেছি। অসীম সমবিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে! কুত্রাপি কোন ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়স্বরূপ ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রকাশে পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধকার আরও প্রগাঢ় বোধ হইতেছে! বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আমারদিগের দেশীয় ভাষার পাঠশালা, তাহাও সেই অন্ধকারের আলয়। বিষয় কর্ম্মোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক শিক্ষা যে বিদ্যালয়ের প্রধান বা সমস্ত বিদ্যাই হইয়াছে, কতিপয় অশুদ্ধ চিরনিয়োজিত পত্র লেখার অভ্যাস যাহার সম্যক্ লিপি বিদ্যা হইয়াছে, এবং অল্পজ্ঞ অঙ্ক গুরু শুভঙ্করের আর্য্যা এবং সরস্বতী বন্দনা ; গুরু বন্দনা, গঙ্গাবন্দনা ও দাতাকর্ণাদি যাহার সমুদয় পাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে, সে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের যে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইবে তাহার কি সম্ভাবনা? কিন্তু কেবল বুদ্ধি বৃত্তির প্রাখর্য্য করাও বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নহে। আমারদিগের মানসিক তাবৎবৃত্তির উন্নতি ও সুনিয়ম করা, দুষ্ট রিপু সকল শাসন করিয়া ধর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রবল করা, সুসাধু বিশুদ্ধ চরিত্র ভূষণে আপনাকে ভূষিত করা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্বদেশের প্রতি প্রীতি, পরোপকারে অনুরাগ সঞ্চার করা, এবং জগদীশ্বরের প্রেমামৃত রসে চিত্ত আর্দ্র রাখা, বিদ্যাভ্যাসের সম্যক্ প্রয়োজন হইয়াছে। এ সমস্ত প্রয়োজন এদেশের ইংলণ্ডীয় কি দেশী ভাষার কোন বিদ্যালয়েই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গুরু মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহারদিগের চিত্ত ভূমিকে সুরম্য সুসৌরভ পুষ্পে আমোদিত না করিয়া ঘন রোপিত কণ্টকি বন দ্বারা ভয়ঙ্কর করেন। যদ্রূপ সন্তানকে স্নেহের সহিত পালন করা উচিত, তদ্রূপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্ত্তব্য, কিন্তু গুরু মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি নিয়ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রেরা ভয়েতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তাঁহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দ্দয় দণ্ড ভয়ে তাহারা কম্পিতকলেবর থাকে। তাহারা শিক্ষাগুরুকে যম স্বরূপ দেখে, এবং

বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে ; সুতরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি শক্রতাভাব ও দ্বেষানল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহারা তাঁহার আসন তলে কণ্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত রজনীতে মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টক খণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে ত্রুটি করে না, দেব দেবীর সন্নিধানে একান্ত চিত্তে তাঁহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হয় না। এস্থলেও তাহারদিগের দুর্গতির নিরাশ নাই। পিতামাতা তাহারদিগকে এমত যন্ত্রণার স্থানে প্রেরণ করেন, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতামাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা করে। এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, দ্বেষ, গুরু নিন্দা ও অকৃতজ্ঞাদি মনের কুপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হয়। যাহারা গুরু মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত সচেষ্ট, তাহারা চৌর্য্য বৃত্তি ও মিথ্যাচরণের অভ্যাসে আশু নিপুণ হয় ; কারণ যে বালক অপহরণ করিয়াও গুরু মহাশয়কে তাঁহার প্রয়োজনীয় যত বস্তু প্রদান করিতে পারে, ততই তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন। অতএব আমারদিগের যে সকল দেশীয় পাঠশালা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা স্থান, তাহা যখন এ প্রকার অচিন্ত্য বিষম দুর্দ্দশা গ্রস্ত, তখন দেশ মধ্যে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ হইবার কি সম্ভাবনা? কিন্তু এই সকল পাঠশালাতেও কত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়? ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয় যে বাঙ্গলা ও বেহারের প্রত্যেক শত বালকের মধ্যে কেবল আট জন মাত্র বালক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয় জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়—প্রত্যেক শত ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ অতি সামান্য প্রকার বিদ্যার্জ্জনেও বঞ্চিত রহিয়াছে। বাঙ্গলা ও বেহারের ষষ্টি লক্ষ ৬০,০০,০০০ শিক্ষণীয় বালক এবং ২১০,০০,০০০ দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণশূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।*

দেশীয় লোকের এবম্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দুঃখানলে দগ্ধ না হয়? নিরাশায় ম্লান ও অবসন্ন না হয়? তাহারা স্বীয় পার্শ্ববর্ত্তী ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি যৎ কিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয় কার্য সম্পন্ন করাই জীবনের সমুদয় কার্য্য বোধ করে। পশুর সহিত মনুষ্যের কি প্রভেদ? মনুষ্যের উৎকৃষ্ট সুখের কারণ কোন্ পদার্থ, ও মনুষ্যের স্বভাবের উৎকর্ষই বা কি? কিরূপ শক্তির বীজ সকল আমারদিগের মনে স্থাপিত আছে, এবং তাহার প্রকাশ ও উন্নতি হইয়া কি প্রকার মহৎ মঙ্গলের উদয় হইতে পারে? এই সংসারেরও সুখস্বচ্ছন্দতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, এবং রাজপদের সৃষ্টি ও রাজাপ্রজার প্রভেদই বা কি নিমিত্ত হইয়াছে? এ সকলের কিছুই তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারদিগের চিন্তা স্রোত এ পথে স্বপ্নেও কখন প্রবাহিত হয় নাই। তাহারা অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে।

দেশহিতৈষি পুরুষ এবং দয়াশীল রাজা ইহারদিগের জ্ঞানোদয়ের উপায় ধার্য্য না করিয়া কি প্রকারে মনঃস্থির রাখিতে পারেন? এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এদেশের মঙ্গলোন্নতির জন্য অন্য কোন চেষ্টা সফল হইবে না। কিন্তু ইহার উপায় করা কি বিস্তীর্ণ কার্য্য! ক্রোশ বা দ্বিক্রোশান্তে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত সাধারণ রূপে বিদ্যা-জ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গলা পাঠশালা সকলের বর্ত্তমান অবস্থা যত কাল থাকিবে, তত কাল এ আশা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করা, বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা-বিষয়ক উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করা, এবং ছাত্রদিগকে তাহার উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত সুযোগ্য কৃতবিদ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা ইহার আবশ্যক উপায় হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষক সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধারণ রূপে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত। অনেক ইংলণ্ডীয় পুরুষ এবং আমারদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর অলীক মতও আর নাই। এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্ত এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্ম ভাষায় কি পর ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন সুলভ হয়? এ বিষয় আমারদিগের কোন সংশয় স্থলই বোধ হয় না —ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে। শিশুর রসনা মাতৃ দুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্ব কালেই যে ভাষার অর্দ্ধ ভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃক ভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়? পর দেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে। যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহারা যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে, কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ, বা যে সকল মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থ হইয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে কাল যাপন করে, যাহারদিগের পিতামাতা কেবল আপন ছাত্রদিগের ভাবী উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় প্রাণধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যালাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিবার উপায়ও নাই। সকল দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তিদিগের নানা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত গ্রামমধ্যে দেশ ভাষায় পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এ দেশের বিষয়েও রাজপুরুষদিগের সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্ম ভাষা অপেক্ষা পর ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে যে ব্যয় হয়, স্ব ভাষায় বালকেরা তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ ব্যয়ে তুল্য জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ স্বদেশের বিদ্যা যত কাল স্বদেশের ভাষা স্বরূপ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সজ্জীভূত

* William Adam's Report on the State of Education in Bengal and Behar etc. reviewed in the Calcutta Review N. 4.

না হয়, ততকাল সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গত কখনই হইতে পারে না। এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যাশূন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়াও সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছে যে পৃথিবী বাসুকীর মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে, সূর্য্য এক লক্ষ ও চন্দ্র দ্বিলক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, রাহু দৈত্যের গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহারদিগের গ্রহণ হইতেছে, এবং অদিন ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হয়; তদ্রূপ আমারদিগের দেশীয় ভাষায় বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইলে তাহারা পরম্পরা শ্রুতি দ্বারাও অনায়াসেই জানিবে যে ভূমণ্ডল শূন্যেতে স্থিতি করিয়া সূর্য্যকে সম্বৎসরে পরিবেষ্টন করে, সূর্য্য-মণ্ডল চন্দ্র অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে স্থিতি করে, ভূচ্ছায়া প্রবেশ দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের ও চন্দ্রবিম্ব আবরণ দ্বারা সূর্য্য গ্রহণের সংঘটন হয়, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ ও অপরিমিত ভোগাদি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করা রোগের এক মাত্র কারণ, ও শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু, ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয় ঘটিত অমঙ্গল হইবে, এবং যে বিষয়ক নিয়ম পালন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয়ের সুখ প্রাপ্তি হইবে। স্বদেশোৎপন্ন শস্য যেরূপে সকলের সুলভ হইয়া সর্ব্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞানতৃপ্ত হইয়া তৎ ফল সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনা যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে? ইহা সত্য যে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছে, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত? বর্ত্তমান কোন পত্র সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এ দেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পর ভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা এ কথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আত্ম ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? সেই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কত দূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারি জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে। মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপটিক তাহা এইক্ষণকার দুই শত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধিকার কালে যে সকল নগর গ্রীকনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার দেশ ভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু সংখ্যাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরবাসিদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংস্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসীক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এই রূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান্ জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্যরূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতীভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিসিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশভাষা সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না—নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এ মনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।

আমারদিগের দেশ ভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্ব্ব পক্ষ করেন, তাঁহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকল প্রযোগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে 'সেই বাঞ্ছিতকাল কোন দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।' হা! ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অল্প অল্প বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদরযোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু নাম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চিত্তপ্রমোদকারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেন, আর আমারদিগের ইংরাজী ভাষার বহু ছাত্র তাহা

পাঠ্য বোধ করেন না।—সে যে কি দুর্লভ অমূল্য রত্নাকর, তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ ইঁহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার। ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যকও বোধ করেন না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি কোন্ দেশের কোন্ স্থানে কি নগর ? কোন্ বৎসর তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে ? তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে ? তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে ; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্মভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন ? এই কলিকাতা নগরীর বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ জ্ঞাত নহেন। পূর্ব্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল ? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল ? তাঁহারদিগের কোন্ বংশের কোন্ রাজা কোন্ দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্ দিন কি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর কয় মাস পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছেন ? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা করেন ; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল ? পূর্ব্বে কোন্ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল ? কিরূপ ধর্ম্ম ছিল ? কি কি বিদ্যা প্রচার ছিল ? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে, কি আক্ষেপের বিষয় ! ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন কোন্ গ্রন্থ কর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী ! নেবোরের রোমান্ ইতিহাস ও থরল্ ওয়ালের গ্রীক ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে ? এসিয়াটিক রিসর্চ্চ ও এসিয়াটিক সমাজের জর্নেল গ্রন্থ কে পাঠ করে ? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকা খণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে ?

যাহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্ম ভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা ? ইহা কি তাঁহারদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য বেদনা বোধ হইবে ? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্‌ঘাটন করেন ? বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী ও ইংরাজী বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন ? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়—প্রেমামৃত রস সাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশব কালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধি সহিত সুহৃদ্ মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ, যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে ? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগেব প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই—যে নাম চিন্তা মাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ্ বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে ! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে ! 'কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন' কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমি বাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য ? পূর্ব্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয় যে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'? বীর্য্যবান্ গ্রীক জাতি ও জয়পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, কিন্তু অমরকীর্ত্তি পাণ্ডুপুত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে ! সেক্‌স্‌পিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন অতিবরণীয় বটে, কিন্তু আমারদিগের কালিদাস ও আমারদিগের আর্য্যভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে ! হোমর ও বর্জ্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমারদের ! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন, এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা ইংরাজী ও জর্ম্মাণ, অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে ? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে ?

যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক উদ্দেশ্য, তথাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতি পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য

স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে। এই প্রকরণ লেখকের কোন মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পর ভাষার অলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং আত্ম ভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্ত্তী পারসীক দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্ট রূপে প্রচার ছিল, সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফেরদৌষী আত্ম ভাষাতে শাহ-নামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃত রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধু-রসস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনারদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহার-দিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি সুযশস্বী গ্রন্থ-কর্ত্তা রূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জ্জিল ও হোরেস, এবং লিবি ও সিসিরো ইঁহারা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণি দেশেতে কীর্ত্তিমান্ ফ্রেডরিক রাজার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান্ লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতাদ্বারা আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থকর্ত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোদ্ভব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেশে যত দিন নর্ম্মান ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, তত দিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতা সকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইউরোপ খণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম গ্রন্থসকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎ খণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধ কাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টুগেল, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপ খণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্ম ভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্ম সন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত বেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমারদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পর-জাতীয় লোকেরা আমারদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাব সকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমার-দিগের দেশ ভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক্ সম্ভব, কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।

More perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either.

Sir W. Jones' Work.

অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবকগণ! আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের সঙ্গী হইয়া তোমারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহারদিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতেই তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে সর্ব্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন ও লাক, নিউটন ও লাপ্‌লাস, কুবিয়র ও হম্বোল্‌ট প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্ব-শাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্ম ভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ব্ব বিবেচনাতে দেশ ভাষায় বিদ্যা-ভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জ্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্ত্তমান কালে ইউরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যক্ রূপে উপার্জ্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকল বিদ্যার আধার ও বর্ত্তমান দেশ ভাষা সকলেরও আকর স্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশ ভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থিরা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ও জার্ম্মান এবং সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক ভাষা সুন্দর রূপে অভ্যাস করিতে পারে। এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপন করা আরও প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজ কার্য্যের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা বিতরণে কি-রূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে—জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি সংস্কারে তাঁহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক আজ্ঞাতে যাহা হইবে, সহস্র সহস্র প্রজার যুগপৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজকার্য্য দেশ

ভাষাতে সম্পন্ন হইবে, আপনা হইতেই কত লোক আত্ম ভাষা শিক্ষাতে সযত্ন হয়েন। যদি বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এ উপায় অগ্রেই করিয়াছেন—অগ্রেই তাঁহারা শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্য্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বঙ্গ দেশের স্থানে স্থানে এক শত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে। এই উভয় বিষয়েই তাঁহারদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে করিতে পারেন, যে তাঁহারা কেবল এ বিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গ দেশীয় বিচারালয় সকলে বঙ্গ ভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সে ভাষা বাঙ্গলা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি এপর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারালয়ের লিপি কর্ম্মচারী! জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্য্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যোগ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত এক শত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় যে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের লেশ মাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ এক শত বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই, শিক্ষা নাই, এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য্য সফল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? এক জন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা যখন গবর্ণমেণ্টের আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্ম সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এ দেশে দেশ ভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র।* ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন—আমারদিগের সর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যাদান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। গুরু কার্য্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশ ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন, এবং সম্যক্ যত্ন পূর্ব্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক, এবং দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিরোধ আছে, তখন তাহা কার্য্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দ্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।"

বাংলা তথা দেশভাষার অনুশীলনে সরকারী ঔদাসীন্য ইহার পরেও বলবৎ ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্প্যাচকে অভিনন্দন করিয়া "*L*" স্বাক্ষরিত এক ভদ্রলোক "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া"য় (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪) একখানি পত্র লেখেন। তিনি এই প্রসঙ্গে দেশভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা রাজনারায়ণের কথাই সপ্রমাণ করে। পত্রখানি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে প্রদত্ত হইল:

"While English Education is offered to all who have *time* and *opportunity,* the claims of the *masses* to Education, through their own language, are recognized and the Calcutta Council of Education will not be entrusted any longer with the power of throwing *obstacles* in the way of popular enlightenment—during its twenty years of action it has had money for every sort of scheme connected with the Education of a few Baboos.—but it refused to carry out the magnificent plans of Mr. Adam, it misrepresented past experiments in Vernacular Education when it asserted that Government Vernacular Education had failed in Ajmer, because the people did not flock to the schools, whereas the Agent sent there by Government was *unprovided for 10 years with any Vernacular books,* it stated the Chinsurah Vernacular system failed because Vernacular was not wanted,—but the Agent who had carried on the system most *successfully* died, and his place was not suitably supplied. I need not refer to the Council's appointing a gentleman to draw up a list of Vernacular School books who did not know one word of the language. I am happy to say, however, that the Council has *of late* attended more to the Vernacular in their English Schools, but it is to be said more in sorrow than anger that what obstructions the defunct Military Board threw to the roads and bridges of the country, similar ones have been thrown on popular Education by the Council of Education which will soon be a thing of the next—and I am sure the present members will be glad to be relieved for attending to questions on Vernacular Education to decide on which they possess neither leisure nor precious qualifications."

* বাঙ্গলা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্ত তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যদ্রূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।

নীলালক্তক

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার।

তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়—তবে আমার মনটা একটু কবি-কবি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা না-বুঝে পড়ার জন্ম স্বপ্নালু তাই দু-চার লাইন কবিতা লিখিও। কাউকে দেখাই না—লজ্জা করে বড্ড—কিন্তু এর মূলে যে পারিবারিক ঘটনাটুকু রয়েছে, সেটা না শুনলে আপনারা আমার উপর অবিচার ক'রে বসবেন। পারিবারিক হলেও তাই বলতে হচ্ছে।

আমাদের পুরোনো পরিবার—একান্নবর্ত্তী। বাবারা আছেন তিন ভাই, আর এক জন ছিলেন তাঁদের সবার ছোট—নাম ছিল মহেন্দ্র। আমার সেই ছোট কাকাকে নিয়েই এই ছোট ঘটনাটি। তাঁকে আমার মনেই পড়ে না ভালোরকম। আমার সাত বছর বয়সেই তিনি স্বর্গে গেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি খুবই ঝাপ্‌সা—শুধু মনে পড়ে—খুব ফর্সা রং, বাব্‌রি-কাটা চুল আর বড় বড় চোখওয়ালা একটি লোক মাঝে মাঝে আসতেন কোত্থেকে, আর এসেই আমাকে সর্ব্বপ্রথম বুকে তুলে চুমা খেয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিতেন। আমি তাঁর ঘাড়ে-পিঠে-কোলে দিনকতক খুব বেড়িয়ে নিতাম। অনেক রকম খেলনা—যেমন বাঁশী, রবারের বল, পেন্‌সিল-কাটা কল—এইসব এনেও দিয়েছিলেন কয়েক বার। ইনিই আমার মহেন্দ্র-কাকা।

মহেন্দ্রকাকা বাড়ীর ছোট ছেলে, আর আমি বাড়ীর বড় খোকা—কাজেই বাড়ীর আদর আমাদের দুজনের উপরই অগাধ ছিল। কাকা আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন, একসঙ্গে খেতে বসাতেন, একবিছানায় শোয়াতেন অর্থাৎ কাকা যে ক'টা দিন বাড়ীতে থাকতেন, সেই ক'দিন আমি তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী ছিলাম। কিন্তু সে এত কম দিনের জন্ম, আর আমি তখন এতই ছোট যে বেশ কষ্ট করেই সে কথা আমায় মনে করতে হয়।

এমনি একবার এক ছুটিতে এসে আমাকে খুব ক'রে আদর ক'রে চুমা খেয়ে কাঁধে তুলে নামিয়ে কাকা আমার মাকে বললেন—'খোকাটা বেশ বড় হয়ে উঠল বউঠান।' মা একটু হাসলেন। কিন্তু আমি সেই দিন কাকার মুখে আমার বড় হবার খবরটা পেয়ে গেলাম। কি রকম যে খুসী হয়েছিলাম, এখনো তা মনে পড়ে। বড় হয়েছি, এবার কাকার সঙ্গে কলকাতা যাব পড়তে—কাকার কাছে থাকব—ইত্যাদি হরেকরকম ছেলেমানুষী ভাবনা ভেবেছিলাম—শেষটায় বলেই ফেললাম কাকাকে,—আমি যাব কাকা কলকাতা তোমার সঙ্গে।

—যাবি। এবার থাক, পূজার সময় নিয়ে যাব তোকে।

কাকার সেই কথাটি আজো মনে আছে। মনে আছে—কারণ আমার সেই শৈশব-আকাঙ্ক্ষা কাকা আর পূরণ করবার সুযোগ পেলেন না। তখন অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম, আমার কাকা খুবই ভাল ছেলে, কলকাতার নাম করা ছাত্র—তাঁর কলেজে তিনিই ফার্ষ্ট হন। কিন্তু এত সব কথা আরো পরে আরো ভাল করে বুঝেছি।

কাকা সেবার যেন একটু বেশি বেশি আদর করে বাড়ী থেকে রওনা হলেন। বেশি আদর হয়ত তিনি করেন নি, —কিন্তু আমার যেন মনে হয়, সেবারের আদরটি আমি বেশিই পেয়েছিলাম। ক'দিন বেশ মনমরা হয়ে ঘুরলাম। কাকার শেখানো "আবোলতাবোলে"র কবিতা আবৃত্তি করে বেড়ালাম। কাকার পড়ার ঘরে বই নিয়ে পড়তে লাগলাম, মা-ঠাকুমা-কাকিমারা সব বলতে লাগলেন—"কাকার লেগে খোকা হেদিয়ে গেল।"

তারপর কাকার কথা কখন ভুলে গেছি, কে জানে—হঠাৎ একদিন বাড়ীতে মহা ব্যস্ততা। ঠাকুমা তুলসীতলায় মাথা খুঁড়ছেন—মা'র চোখ বেয়ে ক্রমাগত জল পড়ছে—আঁচলে মুছ-ছেন—কাকী দু'জনও তাই। হ'ল কি? আমায় কেউ-ই বলছে না—সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে।

শেষটায় মেজকাকার কাছেই যেতে হ'ল, গিয়ে ভয়ে ভয়ে শুধুলাম—

—কি হয়েছে মেজকা'?

আমায় দু'হাত দিয়ে টেনে বুকে তুলে মেজ কাকা বললেন, —আয় বাপ্ আমার—তোর ছোট কাকার অসুখ—ভাল হবে কিনা বল্ দেখি? ভাল হবে কি না, বলা আর আমার হয়ে উঠল না—মেজকাকার কোল থেকে পিছলে নেমে পড়ে মা'র কাছে এসে বললাম,—আমি যাব মা ছোটকাকার কাছে। চোখে হয়ত জল ছিল আমার।

মা আঁচল দিয়ে মুছে দিতে দিতে বললেন—আসছে যে তোর ছোটকাকা—আজই এসে যাবে।

মহা আনন্দ হয়ে গেল। ছোটকাকা আসছে, তাহলে এত ভাবনার কি আছে? অসুখ হয়েছে তো কি বয়ে গেছে। এই তো আষাঢ় মাসে আমারও জ্বর হয়েছিল। ও তো সবারই হয়। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয় ভেবে, বাড়ীর পিছনে খিড়কীর পুকুরপাড়ে কয়েকটা ভাল ভাল পেয়ারা সংগ্রহ করলাম। ছোটকাকা এসে খাবে। জ্বর হলে সব্বাই খায়। তেত ওষুদ খেয়ে কাঁচা পেয়ারা চিবোয়।

বিকেল বেলা ছোটকাকা এল ষ্টেশন থেকে পাল্কীতে। চেনা যায় না—দেহটা যেন বিছানায় মিশিয়ে গেছে। আবার উপদ্রব তো কম নয়—আমাকে ওর কাছে কেউ যেতেই দিচ্ছে না—অনেকটা তফাৎ থেকে একবার দেখতে পেলাম মাত্র। কান্নায় সর্ব্বাঙ্গ ভেঙে পড়তে লাগল। আমার ছোটকাকা—কেন এরা তার কাছে আমায় যেতে দিচ্ছে না? আর ছোট-কাকাও তো বেশ—আমায় ডাকছে না কেন। অভিমানে ঠোঁট আমার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—পিসিমা বললেন চাকর-টাকে—খোকাকে বাইরে নিয়ে যা রে—কাঁদচে।

আমি তো কাঁদি নাই। আমার অভিমানটা কেউ বুঝলেই না এরা। আরো বেশি অভিমান হ'ল আমার—বাইরেই চলে গেলাম। মনে মনে ঠিক করলাম—কাকা নিজে না ডাকলে আর যাব না কাকার কাছে।

বাড়ীটা যেন থমথম্ করতে লাগল কয়েক দিন ধরে।

আমার অভিমান জল হয়ে গেছে। মা'কে বললাম—আমাকে কাকার কাছে নিয়ে চল মা! মার চোখ উপচে জল গড়িয়ে গেল—কিন্তু মার প্রাণ আর সব্বার থেকে আলাদা—আমার মনের আকুতি অন্য কেউ বোঝে নি—মা বুঝলেন।

—আয়—বলে নিয়ে যাচ্ছেন আমায়—পিসিমা দেখেই ধমক দিলেন।

—ওকি বৌঠান—না না, খোকাকে ওখানে নিয়ে যেতে পাবে না!

—দাও বৌঠান—খোকাকে আমার কাছে দাও—কাঁদতে কাঁদতে বললেন সেজকাকা।

—আমি যাব মা—নিয়ে চল আমায়—আমি আবার মা'কে জড়িয়ে বললাম।

—সরো সব—বলে মা সব্বাইকে ধমক দিয়ে আমায় নিয়ে এগিয়ে এলেন। মা বাড়ীর বড় বৌ—আজকালকার বড় বৌ নয়—তখনকার দিনের—কাজেই সব্বাই চুপ হয়ে গেল। মা'র কথার উপর কথা চলে না কারুরই।

আমি গেলাম কাকার কাছে। গিয়ে যা দেখলাম, সেটা আজো ভুলতে পারি নে। আমার কাকা—আমার সেই কার্ত্তিকের মতন সুন্দর কাকা যেন গল্পের বইয়ে আঁকা ভূতের কঙ্কালের মত হয়ে গেছে! উঃ!

—খোকন!—কাকা ডাকলেন অতি কষ্টে।

কিন্তু আমাকে তাঁর বিছানার কাছে কিছুতেই যেতে দিল না এরা—বাইরে নিয়ে এল! কতক্ষণ ধরে যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম, মনে পড়ে না। তারপর কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। সেই দিন রাত্রেই কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে জানতে পারলাম, কাকা আমার মারা গেলেন।

* * *

অত ছোট বয়সে কাকা মারা গেলে কারই বা মনে থাকে! আমারও মনে থাকত না, কিন্তু যে ছোট ঘটনাটির জন্য কাকাকে আমি ভুলতে পারলাম না সেইটিই বলছি: সেটা একটি চিঠি। ভাদ্র মাসে কাকা মারা গেলেন—আর আশ্বিন মাসে—ঠিক বিজয়াদশমীর দিন এল একটি চিঠি! নীল রঙের খাম—তাতে লাল কালিতে কাকার নাম লেখা—শ্রীমহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। চিঠিটা মা খুললেন—কয়েক ফোঁটা জল পড়ল তাঁর চোখ দিয়ে—মা সেটি আবার খামে ভরে কাকার শোবার ঘরে একটা কুলুঙ্গীতে রেখে দিলেন! চিঠিটার সম্বন্ধে অন্য কি আলোচনা মা'র সঙ্গে বাড়ীর লোকের হয়েছিল, আমার জানা নেই!

সুখে দুঃখে পর বৎসর এল—ঠিক বিজয়াদশমীর দিন আবার এল সেই চিঠি—সেই নীল খাম, লাল কালিতে লেখা ঠিকানা! এবারও মা-ই খুললেন—পড়লেন, রেখে দিলেন সেই কুলুঙ্গীতে! কাকার যক্ষ্মা হয়েছিল—তাই তাঁর শেষ শয়নের ঘরটা কেউ ব্যবহার করে না—তালা দেওয়াই থাকে! তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বৎসরের চিঠিও ঠিক বিজয়াদশমীর দিনই এল—মাও ঠিক তেমনি করে সাবধানে খুলে পড়ে রেখে দিলেন। আমি এর মধ্যে অনেকটা বড় হয়েছি—কাকার শেখানো কবিতা ছাড়িয়ে আরো উঁচু ধরণের কবিতা পড়তে শিখেছি। ষষ্ঠ বৎসরের বিজয়াদশমীর দিন মা'কে শুধুলাম আমি—চিঠিগুলোতে কি লেখা থাকে মা?

—আরো বড় হয়ে দেখিস—বলে মা সে চিঠিও রেখে দিলেন কুলুঙ্গীতে।

তারপরও প্রতি বৎসর চিঠি আসতে লাগল—সেই নীল খাম আর লাল কালির ঠিকানা। কাকার কথা আমরা সব্বাই সারা বছর ভুলে থাকতাম, কিন্তু বিজয়াদশমীর "ডাক" আমাদের বাড়ীর সকলকে চিঠির চাবুক মেরে যেন মনে করিয়ে দিত আমার সেই কাকার কথাটি। প্রথম প্রথম ভাবতাম—চিঠিখানা যমরাজার বাড়ী থেকেই আসে বুঝি—লেখে হয়ত, "কাকা আমার ভাল আছে।" তারপর ভাবতাম, কাকার কোনো বন্ধু হয়ত লেখে চিঠিখানা—তারপর আরো বড় হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়তে পড়তে ভাবতে আরম্ভ করলাম—চিঠিটা কাকার কোনো বান্ধবীর—হয়ত বা প্রিয়ার। শেষের এই অনুমানটা আমাকে এমন পেয়ে বসল যে আগ্রহ আর দমন করতে পারলাম না। একদিন মা'র বাক্স থেকে পুরানো মরচেধরা চাবিটা বের করে কাকার ঘর খুলে চিঠিগুলো লুকিয়ে ফেললাম আমার নিজের ঘরে।

গভীর রাত্রে গোপনে পড়লাম আট বছরের সেই আটখানি চিঠি। প্রেমপত্র কি না ঠিক বোঝা গেল না—তবে হাতের লেখা মেয়েলি—আর সম্বোধন প্রথম চিঠিতে "প্রিয়তম"—তার পরে শুধু "প্রিয়"—তার পরেরটায় "প্রিয় বন্ধু"—চতুর্থ বৎসরের থেকে বরাবর এ পর্য্যন্ত শুধু "বন্ধু" সম্বোধন চলে এসেছে। নীচে নাম সহি—"ইতি তোমার মধু"—তোমার "মাধু"—"তোমার মাধুরী"—তার পর শুধু "মাধুরী"!

প্রেমপত্রই নিশ্চয়—কিন্তু একখানা চিঠিতে লেখা রয়েছে:

—"আমার বিয়ে হয়ে গেছে—ফাঁসী হয়েছে বলাও চলে।"

আমার সেদিনের কৈশোর-কল্পনা এই হবো-কাকিমার একটি মূর্ত্তি খাড়া করে নিল মনের মধ্যে! তখন "বিষবৃক্ষ" পড়া শেষ করেছি—কাজেই "কুন্দনন্দিনী"র কথাই মনে হ'ল! কাকার সেই প্রিয়তমার কোনো ঠিকানা কিন্তু নাই চিঠিতে। তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব—কাকা আমার স্বর্গে—সে উপায় রাখেন নি তিনি! নবম বৎসরও চিঠি যথারীতি এল—এবার আমিই খুলে ফেললাম চিঠিখানা।

"বন্ধু—কত দীর্ঘ দিন তোমাকে দেখি নি। একবার কি আসতে পার না! এত কি কাজে তুমি ব্যস্ত, জানি না—প্রতি বিজয়াদশমী তোমাকে দেখবার প্রত্যাশায় রাত জেগে বসে থাকি আমি। তুমি এলে না—আর হয়ত আসবে না—তবু আমি বসে আছি তোমার পথ চেয়ে। ইতি—"মাধুরী"!

এর পর আমি ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়তে এসেছি। ছুটিতে বাড়ী গিয়ে সেবারও বিজয়াদশমীর দিন চিঠি পেলাম কাকার নামে! সে চিঠি আর খুললাম না। কি হবে খুলে? এক জন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিবেদিত প্রেমের নৈবেদ্য আমার দেখবার কি অধিকার আছে! রেখে দিলাম সে চিঠি অমনি। তার পর আরো চার বছর কাটল। আমি চাকরি নিলাম একটা সওদাগরী আপিসে।

সওদাগরী আপিসের চাকরি—পুজোর সময় ছুটি পাওয়া

গেল না। নিরুপায় হয়ে আপিস বেরুচ্ছি—বৌবাজারের কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেলাম! একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে, বয়স বছর চৌদ্দ—হাতে একখানা খাম নিয়ে ডাক বাক্সে ফেলতে আসছে। সেই রকম খাম, সেই নীল রঙের। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখলাম—আমারই কাকার নাম লেখা। কিন্তু আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই চিঠিখানা সে ডাকবাক্সে ফেলে দিল। তার হাত ধরে বললাম—তোমার বাড়ী কোথায় খোকা?

—সতের নম্বর জেহেলপাড়া লেন। কেন?

—না, কিছু না—ভুল হয়েছিল—বলে ছেড়ে দিলাম ওকে।

ও বোকার মত আমার দিকে খানিক চেয়ে চলে গেল। আপিসে গিয়ে ঠিক করলাম—সতের নম্বর জেহেলপাড়ায় যেতে হবে বিজয়াদশমীর দিন!

গেলাম ঠিক দিনেই। সকাল বেলা। মনে মনে মাধুরী দেবীর একটি মূর্ত্তি বহুদিন থেকেই গড়া ছিল—সেইটিই ভাবছিলাম। দরজায় গিয়েই দেখতে পেলাম—ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। একজনকে বললাম—মাধুরী দেবী আছেন?

—কে? কাকে চাইছেন? বলেই একজন মহিলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একচোখ দেখে নিয়ে বললাম, —মাধুরী দেবী নামে কেউ থাকেন এখানে?

—হ্যাঁ—আমার নাম। কোত্থেকে আসছেন আপনি? আগ্রহ তাঁর যেন অতিরিক্ত রকম বেড়ে গেছে। যেন এমন করে নাম ধরে বহু দিন কেউ তাঁর খোঁজ করে নি। কি এক প্রত্যাশায় ওঁর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। দেরি না করে বলে ফেললাম—

—মহেন্দ্র মুখুজ্যের ভাইপো আমি···আসছি তাঁর···

আর কিছু বলবার অবসর হ'ল না। আমার হাতটা দু'হাতে ধরে বললেন—তুমিই সেই খোকন? এস বাবা! এস—আজ বিজয়াদশমী! মহিন কেমন আছে, খোকন? তোমাকে পাঠিয়েছে তো? তাও ভাল! মনে আছে তাহলে?

কি বলব, খুঁজে পাচ্ছি না—আমাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন—তোমার মুখ দেখেই ধরে ফেলেছি খোকন—মহিনের মুখের মত গড়ন কিনা—তুমি মহিনের ভাইপো—মহিনের ক'টি ছেলেমেয়ে খোকন?

—ছেলেমেয়ে নেই! বিয়ে করেন নি কাকা।

—অ্যাঁ—বলে একবার তিনি যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলেন—তারপর সুন্দর হাসিতে মুখ তাঁর স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে উঠল। সে মুখ এত সুন্দর আর ছেলেমানুষের মত দেখাচ্ছিল—যেন বিয়ের কনে। বললেন—পুরুষরা পারে—কিন্তু···থাক্! বস বাবা, জল খাও একটু। আজ আর যেতে দেব না তোমায়।

আমি ঢোক গিলে বললাম—আমার আপিস আছে; ওবেলা না-হয় আসব একবার।

—বেশ! এস তাই, কিন্তু এখন কিছু খেয়ে যাও। বলে উনি পরম যত্নে আমাকে নানান রকম খাবার দিতে আরম্ভ করলেন—যেন নিজের ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন। অন্য ছেলেমেয়ে দরজায় ভিড় করছিল—তাদের ধমক দিয়ে বললেন, —যা সব—বিরক্ত করিস নে। তারপর আমার খাওয়া শেষ হলে দরজার কাছ অবধি এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—মহিনকে একটি বার আসতে বল বাবা! বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে।

কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল আমার; গট গট করে অনেকখানি হেঁটে এসে মোড়ের মাথা থেকে চেয়ে দেখলাম, উনি তখনো দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছেন আমায়।

কাকার মৃত্যু-সংবাদটা ওঁকে আজো দিই নি; চিঠি যথারীতি যায়।

হিন্দু নারীর দায়াধিকার ও পণপ্রথা

শ্রীবেলা দত্তচৌধুরী

হিন্দু নারীর দায়াধিকার বিলটির সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। প্রত্যেক প্রগতিশীল, উদারমতাবলম্বী ব্যক্তি ইহার স্বপক্ষে আছেন, তবে দুঃখের বিষয় কয়েকজন নারী কতকগুলি কুযুক্তির অবতারণা করিয়া ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদের কথা মনে হয়। ক্রীতদাসগণ প্রথমে এই প্রথার উচ্ছেদ চায় নাই, তাহারাই তাহাদের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝে নাই। আমাদের দেশের নারীগণ এতদিনের অবরোধ এবং সামাজিক নিষ্পেষণের ফলে চেতনাশক্তি এবং আত্মসম্মানজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন এবং সম্মানজনক আইন পাশ হইবার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

এই আইনটির দ্বারা অনেকেই হয়ত আর্থিক দিক দিয়া লাভ করিতে পারিবেন না। কারণ অর্থবান্ পিতার সংখ্যা আমাদের দেশে খুব কম। কিন্তু আর্থিক লাভটাই সর্ব্বদা বড় কথা নয়। এই আইন দ্বারা নারীগণ যে তাঁহাদের হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয়। ইহার দ্বারা নারীদের সামাজিক মর্য্যাদা অনেক বাড়িবে এবং তাঁহাদের মনে আত্মপ্রত্যয় আসিবে যাহা দ্বারা তাঁহারা নানারকম অপমানকর প্রথা দূর করিতে পারিবেন।

মেয়েদের মর্য্যাদাবোধ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে 'মেয়ে-দেখা', 'পণপ্রথা' প্রভৃতি অপমানকর প্রথা দূর হইয়া যাইবেই। যাহারা পিতামাতার অবহেলার দরুন লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায় নাই ও নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রতিবাদ আশা করা সমীচীন নয়। কিন্তু যাঁহারা যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতেও প্রতিবাদ শুনা যায় না। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। মেয়েদের আত্মসম্মানবোধ যে যথেষ্ট জাগ্রত নয় তাহার প্রমাণ পণপ্রথার অস্তিত্ব। শুধু কথা দ্বারা এই অপমানকর প্রথা রোধ করা যাইবে না। যদি তাহাই হইত তবে

রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির চেষ্টায় এই প্রথা উঠিয়া যাইত। এখানে ইঁহাদের উক্তি উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা—এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে সে সমাজের কল্যাণ নাই।" রামানন্দের মতে যাহারা শ্বশুরকে নিষ্পেষণ করিয়া পণ লইয়া বিবাহ করেন তাঁহারা কাপুরুষ, ভণ্ড। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "পয়সা দিয়ে বিবাহ হ'ল—আসুর, এখন তো সমাজে আসুর বিবাহই চলেছে। তার মধ্যেই অগ্নিসাক্ষী করে দেবারাধনায় বৈদিক মন্ত্রও উচ্চারিত হচ্ছে। অপূর্ব্ব সমন্বয়! এতে যে মন্ত্র অগ্নি ও দেবতার অপমান হচ্ছে সে কথা ভাববার অবসর কই?"

আমাদের দেশে যুবকেরা নির্লজ্জভাবে পণ লইয়া বিবাহ করিতেছে তাহাতে কি ইহাই প্রকাশ পায় না যে তাহারা মনে করে মেয়েরা তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট? বিবাহ-বিজ্ঞাপনের বহর দেখিলেই বুঝা যায় ইহাদের চাহিবার স্পর্দ্ধা কতদূর সীমা অতিক্রম করিয়াছে। পাত্রের গুণের মধ্যে একটি চাকুরী করেন এবং তাহারই জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, উচ্চবংশীয়া, নৃত্যগীত-কুশলা, গৃহকর্ম্মনিপুণা একটি সর্ব্বগুণসমন্বিতা পাত্রী চাই। ইহাদের জন্য একমাত্র উত্তর হইতেছে 'যে যাহার নিজের দিকে তাকাও।' পণপ্রথা না থাকিলে রূপহীনা মেয়েদের বিবাহ হইবে না এই ভাবনায় অনেকে অস্থির। বিবাহ না হইলে ভাবনার কি আছে? আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া যে বিবাহ করিতে হয় তাহার সার্থকতা কি? এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর বাণী প্রত্যেক মেয়ের স্মরণ রাখা উচিত—"The girls have to dare to remain spinsters if need be, *i. e.* if they do not get a suitable match"

সাগর-সৈকতে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিশাখপত্তন।
সাগর-সৈকতে বসি' শুনিতেছি অশান্ত গর্জন।
ধূসর তিমির সন্ধ্যা, জলে দীপ ক্ষুদ্র শৈল 'পরে
তরঙ্গ-প্রাচীর ভাঙে, বেলাভূমে সিন্ধু লুটে পড়ে,
ক্ষণিক আশ্লেষচিহ্ন ফেনলেখা মুছে মুছে যায়
পাণ্ডু বালুকায়।

রাত্রি বেড়ে চলে।
শ্বসিছে অধীর বায়ু, কলোচ্ছ্বাস সমুদ্রের জলে।
অশান্ত অন্তরে শুনি দিবারাত্র ঢেউয়ের ভাঙন
মুহুর্মুহু মুছে যায় ফেনশুভ্র অসংখ্য স্বপন।
সেথাও নামিছে ধীরে ঘনকালো নৈশ অন্ধকার,
ঘেরে ছায়া তার।

আত্মকথা

সেদিনের কথা আজও ভুলি নাই—কখনও ভুলিব কি না জানি না! কিন্তু এই বিশ্বচরাচরে, মানুষের ইতিহাসে এমন কত কি নিত্য ঘটিতেছে—কে তাহার হিসাব রাখে! সৃষ্টির দুর্নিবার স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছি, তাহাতে কত আলো-ছায়ার খেলা, কত হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন, আশা-নিরাশার রহস্য রসিকতা—কে তাহার হিসাব রাখে? আমারই ঘরে জীবনের নিত্য কত কোলাহল, জীবনের কত মধু-সঞ্চয়ন, গরল-পান; আমার কনিষ্ঠা কন্যাটি হাসিমুখে কতদিন দুই চোখে অশ্রু ভরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে—আজ তাহা মনেও নাই। বহু দূরে পল্লীপ্রান্তের ছায়া-ঘেরা ছোট্ট গৃহ-কোণের কী সে ইতিহাস,—তাহার কত উৎসব-রাত্রি ধূসর মলিন হইয়াছে, সন্ধ্যাদীপ না জ্বালাইতে নিভিয়া গিয়াছে, পরম প্রিয়জনের আলিঙ্গন মুহূর্ত্তে শিথিল হইয়াছে—আমি তাহার কি জানি—জানিব কেমন করিয়া? আমারই জীবনের ঘাটে ঘাটে কত বিচিত্র বেচাকেনা, কত আনাগোনা! আমি আপনাতে আপনি বিভোর; স্বপ্ন-জাগরণে জীবনের এক একটি অধ্যায় বিবর্ত্তিত হইতেছে।

তবুও আমি একবার জাগিয়াছিলাম—বোধহয় সকলেই জাগে। একদা জীবনের বিচিত্র অধ্যায়ের কোন পরিচ্ছেদে যাহা ঘটিয়াছিল, বহু-বিস্মৃত কাহিনীর অনুগত তাহা হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম—সেদিনের কথা আজও ভুলি নাই। সেদিন জগৎ সংসারের নিভৃত নিরালায় দুইটি নরনারী জীবনের যে কাহিনী রচনা করিয়াছিল সেই কাহিনী নূতন নয়—কোন কালে পুরাতনও হইবার নয়! কিন্তু এই আত্ম-সর্ব্বস্ব মানুষ ক্ষণিকের জন্য কেমন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল সেই কাহিনীতে কাহার কি লাভ জানি না—তাহা আমার আত্মকথা।

সুনন্দাকে চিনিতাম—হয়তো ভালও লাগিত। তাহার ডাগর আঁখি দুইটির ভাষা বুঝিতাম না—কিন্তু এক অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করিতাম; তাহার হাসিতে মুগ্ধ হইতাম, তাহার আকুল কুন্তল চোখে স্বপ্নের অঞ্জন পরাইয়া দিত। কতকাল সেই কৈশোর কাটিয়া গেছে; অতীত বহুকাল নিদ্রিত, বর্ত্তমান অতি জাগ্রত; যৌবনের পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কৈশোরের কত স্বপ্ন অর্থহীন মনে হয়; সেদিনের কত নিভৃত কূজন আজ প্রলাপ বলিয়া ভুল করি; বহু পুরাতনকে ভুলিয়াছি—সুনন্দাও অতীত, বুঝি স্মৃতিতেও তাহার স্থান নাই।

* * *

বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহর—বাহিরে আলোর খেলা আর হাওয়ার মাতামাতি। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলাম সম্মুখে আলোবাতাসহীন প্রেতপুরী—নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মানুষের দৃষ্টি প্রতিহত—যেন এখানেই পৃথিবীর সীমা শেষ হইয়াছে!···শরীর আবক্ষ আবৃত, চক্ষু দুইটি মুদ্রিত, শয়ন-শিয়রে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সম্মুখে দাঁড়াইলাম। হঠাৎ পায়ের শব্দে চক্ষু খুলিতেই চমকিয়া উঠিলাম—নিদ্রিত অতীত মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল। পাণ্ডুর অধরের কোণে রক্তের রেখা। সকলই বুঝিলাম। তার পর কয়েকটি কথা—'আমি চলিলাম, তাঁহাকে দেখিও।' বলিতে ভুলিয়াছি আমি ডাক্তার!

দুই মাস পরে। সেদিন অন্ধকারের গহ্বর হইতে যাহাকে কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম—কঙ্কাল-জীর্ণ দেহ, চোখে মৃত্যুর ছায়া, হাসিতে রক্তের ঝলক—আজ ওই দেহ কি অপরূপ, আঁখি দুইটিতে কি গভীর মায়ানীলাঞ্জন। জয় পরাজয়ের কি বিচিত্র ইতিহাস!

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নিরঞ্জন অদূরে টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে—যেন গভীর ধ্যানস্থ! পিঠে হাত রাখিতেই বলিয়া উঠিল "ভাবছি আমার জীবনদাতা তুমি, না ওই **পেট্রোমালসন**।"

আলোচনা

"বাঙালীর ইতিহাস"

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী

'প্রবাসী'র শ্রাবণ-সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির সত্য পরিচয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানের ধারণায় অতীতকে বিচার করিলে কিছু ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যাপক মহাশয়ের প্রথম সিদ্ধান্ত—সমতট ও ডবাক দিগ্বিজয়ী গুপ্ত সম্রাটগণ কর্তৃক 'প্রত্যন্ত' রাজ্যরূপে অবজ্ঞাত হইয়াছিল। এসব রাজ্য কাঞ্চী অপেক্ষা পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী। সুতরাং সম্রাটগণ অনায়াসে এ অঞ্চল জয় করিতে পারিতেন, শুধু তুচ্ছ মনে করিয়া এ কাজটা করেন নাই। তিনি সেকালের ভৌগোলিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে দেখিতেন যে বিশাল করতোয়া, পদ্মা ও লৌহিত্য অতিক্রম করিয়া এ সব রাজ্য আক্রমণ মোটেই সহজ ছিল না।

মহারাজ শশাঙ্কের বাংলাদেশে তিনি শিবাজীর মহারাষ্ট্র বা গুরুগোবিন্দ সিংহের পঞ্জাবের ন্যায় জাতীয়তা-বোধ আশা করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় চেতনা থাকা অসম্ভব। সেকালে ভারতবর্ষের অন্য কোন অংশেও জাতীয়তা-বোধের প্রমাণ নাই। জনযুদ্ধ, জাতীয় জাগরণ, প্রভৃতি অনেক আধুনিক। অষ্টম শতাব্দীতে গোপালদেবের নির্বাচনের কথা জানা যায় বটে; কিন্তু খালিমপুর লিপির এই উক্তি সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। এ দাবী অমূলক এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটা মিথ্যা প্রচারও হইতে পারে। আর 'প্রকৃতি' বলিতে প্রজাসাধারণ বুঝায় না।

দেবপালের রাজ্য-বিস্তার সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়ের সংশয় অমূলক। প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট লিপিসমূহে বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে সত্য, কিন্তু সব কয়টি শাসনই ত আর এক বৎসরে দেওয়া হয় নাই। প্রতিহার বংশের দৌলতপুর ও ঘাটিয়ালা লিপি এবং রাষ্ট্রকূটগণের সীরুর লিপির মধ্যে প্রায় তেইশ বৎসরের ব্যবধান। প্রতিহারদের গোয়ালিয়র প্রশস্তি ভোজের রাজত্বের প্রথম ভাগের। তাহার সহিত দৌলতপুর ও ঘাটিয়ালা লিপির সময়ের ব্যবধান আছে। এই সব ব্যবধানের মধ্যে পাল সম্রাট কর্তৃক পশ্চিম দিকে অভিযান অসম্ভব নহে। এই ত্রিশক্তির প্রতিযোগিতায় কাহারও ভাগ্যে একবার জয়, পরে পরাজয় ও পুনরায় জয়লাভ ঘটিয়া থাকিতে পারে।

রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পূর্ববঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়াছিল—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তের কোন কারণ নাই। চোল আক্রমণ ঘটে ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে। গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যকালের বেতকা (পাইকপাড়া) লিপি ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নহে। সুতরাং চোলরাজ কর্তৃক পরাজয়ের পরেও তিনি পূর্ববঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন দেখা যায়। পূর্ববঙ্গ বলিতে আজকাল আরাকান সীমান্ত পর্যন্ত বুঝায়। সেকালে প্রাগ্‌লৌহিত্য ভূভাগে কোন বৈদেশিক আক্রমণের প্রমাণাভাব। বঙ্গাল নরপতি পরাজিত হইয়াছিলেন

সত্য, কিন্তু চোল-সৈন্য পূর্ববঙ্গে আসিয়াছিল কি না বিশেষ সন্দেহ।

লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার বংশধরগণ নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধাচরণের বা বিতাড়নের চেষ্টা করেন নাই—এ ধারণা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কেন হইল বুঝা কঠিন। মাধাইনগর তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমি উত্তর বঙ্গে। কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের বিশেষণ 'গর্গ যবনান্বয় প্রলয় কালরুদ্র'। এ সবের একটা অর্থ আছে। তাহা লক্ষ্য না করিলে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির অভাব প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি ঘটনাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর ও ভাওয়াল তাম্রশাসন ধার্য্যনগর হইতে প্রদত্ত তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রায় সমস্ত সেন তাম্রশাসন শ্রীবিক্রমপুর সমবাসিত জয়স্কন্ধাবারাৎ প্রদত্ত। মুসলমান আক্রমণের সমসাময়িক কালে রাজধানী বিক্রমপুরও বোধ হয় সেনদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ইহা অবিবাজ দনুজমাধবের পূর্ববর্তী কাহারও আক্রমণে ঘটিয়াছিল সম্ভব। সেনরাজগণ রাজধানী পুনরুদ্ধার করেন এবং উত্তরবঙ্গেরও কিয়দংশ পুনরধিকার করেন।

পাঠানযুগে বিজেতা মুসলমান ও বিজিত হিন্দুর মধ্যে কোন মিলন সম্ভবতঃ ঘটে নাই। কিন্তু মুঘল যুগে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান একযোগে দিল্লীর বাদশাহী সৈন্যকে প্রতিরোধ করিয়াছে। চাঁদ-কেদারের পাশে দাঁড়াইয়াছে ঈশাখাঁ। ভারতের বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর ন্যায় মারাঠীরও স্থান নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে আজ যে ভারতবাসীর স্থান নাই তাহার কারণ বোধ হয় আমাদের অযোগ্যতা নয়, অবাঞ্ছনীয়তা। এখানে ফরিদপুরের সংগ্রাম শাহের নাম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বাঙালী সেনাপতি রাজপুতানায় আমাদের বীরত্ব খ্যাতি প্রকট করিয়াছিলেন। আজ কয়জন তাঁহার নাম জানে? বাঙালী সত্যই আত্মবিস্মৃত জাতি।

আলিবর্দি প্রমুখ বাংলার নবাবগণ অবাঙালী হইলেও বাংলার বাহিরের সহিত তাঁহাদের রাজনৈতিক সংযোগ বা স্বার্থসংশ্লেষ ছিল না। তাই তাঁহাদিগকে বাঙালী আপন মনে করে। সিরাজের পতন সাম্প্রদায়িকতার ফল নহে। মীরমদন ও মোহনলালের মিলিত রক্তধারায় পলাশী-প্রান্তর রঞ্জিত হইয়াছে। রাজবল্লভের বিরুদ্ধাচরণ হিন্দু-বিদ্রোহ নহে, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আলিবর্দি পরের মসনদ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। রাজবল্লভও তাহাই করিতে চেষ্টা করেন। ইংরেজের সহায়তা গ্রহণ শুধু 'কণ্টকে কণ্টক দিব্য হতেছে উদ্ধার' নীতি। সেকালে ইহাকে দেশদ্রোহ বলিত না, তাই গণজাগরণও হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজবল্লভের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অদূরদর্শিতার জন্য তাঁহাকে ধিক্কার দেওয়া যায়, কিন্তু দেশদ্রোহী বলা যায় না। সিরাজের রাজত্বকাল অতি অল্প, তাহাও যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। সুতরাং তিনি 'প্রজার হিতাহিত সম্বন্ধে অন্ধ' ছিলেন একথা বলা অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের রচনায় Inferiority Complex অতিমাত্রায় প্রকট। ইহা বর্তমান ব্যর্থতা ও নিরুদ্যমের ফলমাত্র।

উত্তর

আমার উক্ত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ন্যায় ইতিহাস-রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্থানের অল্পতাবশতঃ আমি সংক্ষেপে দুই-একটি বিষয়ে আমার কৈফিয়ৎ দাখিল করিব।

গুপ্ত সম্রাটগণ "অনায়াসে" সমতট-ডবাক অঞ্চল জয় করিতে পারিতেন, "শুধু তুচ্ছ মনে করিয়াই এ কাজটা করেন নাই"—এমন উক্তি আমার প্রবন্ধে নাই। আমি বলিয়াছি, "সম্ভবত বঙ্গদেশ সেকালে শিক্ষায়, সভ্যতায়, ঐশ্বর্য্যে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের সমকক্ষ ছিল না...এইজন্যই গুপ্ত সম্রাটগণের দৃষ্টি দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছিল, 'প্রত্যন্ত' প্রদেশ জয়ের জন্য শক্তির অপব্যয় করা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই।" সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে সমতট-ডবাক অঞ্চল কামরূপ ও নেপালের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত এবং 'প্রত্যন্ত' রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শশাঙ্কের আমলের বাংলা দেশে "শিবাজীর মহারাষ্ট্র বা গুরুগোবিন্দ সিংহের পঞ্জাবের ন্যায় জাতীয়তা-বোধ" আমি আশা করি নাই—আশা করা যে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি তাহাই বলিয়াছি। আমি বলিয়াছি, শশাঙ্কের "গৌরব ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ফল মাত্র, জাতীয় শক্তির পরিচায়ক নহে।"

গোপালের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে খালিমপুর লিপির উক্তি "অমূলক এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটা মিথ্যা প্রচারও" হইতে পারে—চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই মতের স্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে তাহা আমার জানা নাই। 'প্রকৃতি' বলিতে প্রজাসাধারণ না বুঝাইলেও প্রজাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে পারে। পালবংশের রাজ্যলাভের সহিত মোটের উপর জন-সমর্থনের কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল—এই সিদ্ধান্ত অমূলকরূপে গণ্য করিবার কোন কারণ অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে দেবপালের "পশ্চিম দিকে অভিযান অসম্ভব নহে"—কিন্তু যাহা অসম্ভব নহে তাহাও না ঘটিয়া থাকিতে পারে। বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যা-আসামের বাহিরে দেবপালের রাজ্যবিস্তারের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি বোধ হয় দিতে পারিবেন না।

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই শিলালিপিতে বঙ্গাল-নরপতি গোবিন্দচন্দ্রের পলায়নের উল্লেখ আছে এবং বঙ্গাল দেশের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—যেখানে বৃষ্টি ও বাতাসের নিবৃত্তি হয় না। চোল-বাহিনী কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়াছিল—আমার এই উক্তির সমর্থন উক্ত শিলালিপিতে পাওয়া যাইবে। চোল আক্রমণের পরেও গোবিন্দচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ আক্রমণের কাহিনী অমূলক রূপে গণ্য করিতে হইবে—চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ রাজেন্দ্র চোল বাংলায় স্থায়ীভাবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন নাই।

লক্ষ্মণ সেনের পরবর্ত্তী সেনরাজগণ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া উত্তর বঙ্গের কিয়দংশ পুনরধিকার করেন—ইহা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুমানমাত্র। তাম্রশাসনে ও শিলালিপিতে রাজগণকে যে-সকল বিশেষণে বিশেষিত করা হয় তাহার প্রত্যেকটিই গভীর অর্থপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশক—'এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই অন্তর্দৃষ্টির অভাব প্রকাশ" করে। "গর্গযবনান্বয় প্রলয়কাল রুদ্র" বিশ্বরূপ সেনের বীরত্বের কোন কাহিনী তাম্রশাসনে বা ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই।

"ভারতের বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর ন্যায় মারাঠীরও স্থান নাই"—মুঘল যুগ সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই উক্তি আমার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। মারাঠা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হইলে তিনি কখনই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। যখন মানসিংহ, তোডরমল, জয়সিংহ প্রভৃতি মুঘল দরবারে উচ্চপদ

অধিকার করিয়াছিলেন তখন মারাঠাগণ মুঘল বাদশাহের প্রজা ছিল না, সুতরাং "ভারতের বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে" তাহাদের স্থান ছিল না। তাহারা তখন আহম্মদনগর ও বিজাপুরের প্রজা এবং ঐ দুই দরবারে উচ্চপদের অধিকারী। আহম্মদনগরের পতনের পর শিবাজীর পিতা শাহজীর ন্যায় উচ্চপদস্থ মারাঠা সর্দারগণ মুঘলের অধীনতা স্বীকার না করিয়া বিজাপুরে গমন করেন এবং তথায় মর্য্যাদা লাভ করেন। তাঁহারা জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করিলে অবশ্যই মুঘল দরবারে উচ্চপদ পাইতেন—শিবাজী ঔরংজীবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মনসবদারী পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, বিজাপুরের পতনের পূর্ব্বেই শিবাজী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া মারাঠা-মুঘলের দীর্ঘকালস্থায়ী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। বাঙালী বাদশাহের প্রজা হইয়াও উচ্চ পদ পাইল না, আর মারাঠা বাদশাহের প্রজা না হওয়ায় উচ্চ পদ পাইল না—উভয়ের অবস্থা কি একরূপ? অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাগণ বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; বাঙালী তখন কোথায়?

বাংলার বাহিরের সহিত যাঁহার "রাজনৈতিক সংযোগ বা স্বার্থসংশ্লেষ" নাই তাঁহাকেই কি বাঙালী "আপন মনে করে?" মহম্মদ তোগলকের সহিত ভারতের বাহিরের কোন দেশের "রাজনৈতিক সংযোগ বা স্বার্থসংশ্লেষ" ছিল না—তাহাকে কি ভারতবাসী "আপন" মনে করিত?

সিরাজের পতন এবং রাজবল্লভ প্রভৃতি ইংরেজদের সহায়তা গ্রহণ সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। সিরাজের মিত্র ফরাসীরাও তাঁহাকে অত্যাচারী শাসক রূপে বর্ণনা করিয়াছে, সুতরাং আমি এই হতভাগ্য নবাবের প্রতি "অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা" প্রদর্শন করি নাই।

আমার "রচনায় Inferiority Complex অতিমাত্রায় প্রকট" কিনা তাহার বিচারক আমি নই। কিন্তু আমার বদ্ধমূল ধারণা এই যে ইতিহাসের ভিত্তিতে জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে ইতিহাসের যথার্থ মর্ম্ম নির্ব্বিকার ভাবে উদ্ঘাটন করিতে হইবে—ধর্ম্মপাল ও দেবপালের শিলালিপিতে কল্পনার প্রলেপ লাগাইয়া, লক্ষ্মণ সেনের কাহিনীর অসত্যতা প্রচার করিয়া এবং সিরাজের পতনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারমুক্ত করা অসম্ভব।

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে চিত্র-প্রদর্শনী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সাম্প্রতিক চিত্র-প্রদর্শনীটি নানা দিক দিয়েই শিল্পকলানুরাগীদের আনন্দবিধান করেছে। এর প্রধান



একজন লামার মুখাবয়ব

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্য। এরূপ বিভিন্ন এবং বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে আঁকা ছবির সমাবেশ বহুদিন উক্ত স্কুলের প্রদর্শনীতে হয় নি। আগে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী, দেবদেবীর লীলা-মাহাত্ম্য প্রভৃতিই বিশেষ ভাবে আমাদের শিল্পীদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করত; কিন্তু সম্প্রতি হাওয়া ফিরেছে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বের অতি সাধারণ দৃশ্যাবলী এবং প্রবহমান জীবনধারার মধ্যেও যে শিল্পরচনার কত উপাদান নিহিত রয়েছে, অতি তুচ্ছ বিষয়বস্তুও যে রূপদক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলিকাস্পর্শে কি অপরূপ শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে এই প্রদর্শনীর 'স্কুল-সংলগ্ন পুষ্করিণী', 'সাঁওতাল বাজার' প্রভৃতি বিভিন্ন ছবিতে তা সুপরিস্ফুট।

লিথোগ্রাফ আর উড্-এন্‌গ্রেভিং এই দুটি বিভাগেই শিল্পীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই বিভাগের কতকগুলো ছবিতে এমন শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় যে মনে হয় সেগুলো যে-কোনো কলা-প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ স্থান পেতে পারত। লিথোগ্রাফ আর উড-এন্‌গ্রেভিং এ দুটো পদ্ধতিই বিদেশ থেকে আমদানী-করা এবং আমাদের দেশে এর প্রবর্ত্তন খুব বেশী দিন হয় নি। কিন্তু এই স্বল্পকাল মধ্যেই আমাদের শিল্পীরা এই পদ্ধতিকে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মী বিদেশীয় শিল্প-রীতিকে এরূপ ভাবে নিজস্ব করে নেওয়া ক্ষমতার পরিচায়ক। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষাদান যে সার্থক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এজন্য উক্ত স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্র সকলেই প্রশংসার যোগ্য।



লক্ষ্মণ

কিন্তু, এক দিকে শিল্পীদের এই অভিনব এবং সার্থক প্রচেষ্টা যেমন দর্শকের মনে আনন্দের সঞ্চার করে তেমনি অন্য দিকে প্রায় সমস্ত ছবিতেই বিদেশী টেক্‌নিকের প্রতি অত্যাসক্তির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। ছবিগুলি দেখে মনে হয়, বিদেশী শিল্প আমাদের শিল্পীদের কল্পনাকে আবার প্রভাবিত করতে আরম্ভ করায় ভারতীয় টেক্‌নিকের ওপর তাঁরা বিরূপ হয়ে উঠ্‌ছেন। জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত শিল্প-পদ্ধতির প্রতি এ উপেক্ষা-মূলক মনোভাব আশাপ্রদ নয়। কি ভাবে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্র-নাথের একাগ্র সাধনায় বর্ত্তমান যুগে ভারত-শিল্পের পুনরুজ্জীবন



জগন্নাথ-মন্দির-তোরণ

হয়, বৈদেশিক শিল্পের মোহ কাটিয়ে ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শিল্প-রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং নন্দলাল, অসিতকুমার প্রভৃতি তাঁর শিষ্যগণ তৎপ্রবর্ত্তিত ধারার অনুবর্ত্তন করে নব্যবাংলার চিত্রকলায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন, সে-কাহিনী দেশের শিল্পরসিকদের অজানা নেই। কিন্তু আজ এদেশের ও বিদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন অরসিক এবং অনধিকারী তথাকথিত শিল্প-সমালোচকের বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের শিল্পীরা যদি ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির প্রতি বিমুখ হন, তাহলে দেশের শিল্পকলার পক্ষে তা অপূরণীয় ক্ষতি বলে গণ্য হবে। এ উন্মার্গগামিতা থেকে আশু প্রতিনিবৃত্ত হওয়া তাঁদের একান্ত কর্ত্তব্য।

অবশ্য বিদেশী টেক্‌নিক যে সম্পূর্ণ ভাবেই বর্জ্জনীয় তা নয়, বিদেশী পদ্ধতির মধ্যে ভাল যা আছে নিশ্চয়ই তা আমাদের গ্রহণযোগ্য এবং সে চেষ্টা একেবারে যে হয় নি তাও নয়। নন্দলাল এদিক দিয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষণ করেছেন, তাঁর কোন কোন ছবি চৈনিক চিত্রকলার আঙ্গিকের দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে শিল্প-রচনায় মূলতঃ ভারতীয় আদর্শই তাঁকে এবং তাঁর অনুগামীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান প্রদর্শনীতে বহুসংখ্যক ছবির মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা মাত্র চার-পাঁচটি ছবির সন্ধান মেলে। আজকের দিনে এদেশের শিল্পীরা যে বিদেশী শিল্পের কতটা অনুরাগী হয়ে উঠেছেন এতে তাই প্রমাণিত হয়।

পুস্তক-পরিচয়

দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য বাঁধাই দুই খণ্ডে আঠার টাকা। অ-বাঁধা প্রত্যেকখানি পুস্তকের মূল্য স্বতন্ত্র।

যাঁহাদের প্রতিভার স্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য সহসা জীবন্ত ও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল দীনবন্ধু মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা নাটক ও নাট্যকলার উদ্বোধয়িতাদের মধ্যে মধুসূদনের পরেই দীনবন্ধুর নাম করিতে হয়। তাঁহার নাটক লইয়াই সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও গুপ্ত-কবির শিষ্য ছিলেন। এই দুই সাহিত্যরথীর বন্ধুত্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। ছাত্রাবস্থায় উভয়েই কবিতা লিখিয়া 'প্রভাকরে'র 'কালেজীয় যুদ্ধে' যোগ দিয়াছিলেন। প্রথম নাটক "নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। কিন্তু "নীলদর্পণ" প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই জানিয়াছিল যে দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।" নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বঙ্গসমাজে যে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হয় "নীলদর্পণ" নাটকে তাহা সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করে। মধুসূদন ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং তাহা প্রকাশ করিয়া পাদ্রী লঙকে শুধু আদালতে জরিমানা দিতে নয়, কারাবাস করিতেও হয়। "সধবার একাদশী" দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। সেকালে অনেকে মনে করিত মধুসূদনকে লক্ষ্য করিয়া নিমে দত্ত'র চরিত্র অঙ্কিত হয়। দীনবন্ধু উত্তরে বলিয়াছিলেন, "মধু কি কখনও নিম হয়?" পরিষদের দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী সুসম্পাদিত; "নীলদর্পণ", "সধবার একাদশী", "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো", "জামাই বারিক", "লীলাবতী", "নবীন তপস্বিনী", "সুরধুনী কাব্য", "দ্বাদশ কবিতা", "কমলে কামিনী নাটক" এবং গল্প ও কবিতার সমষ্টি "বিবিধ"—এই কয়খানি গ্রন্থে ইহা সুসম্পূর্ণ। দীনবন্ধুর জীবিতকালে প্রকাশিত সর্ব্বশেষ সংস্করণের সহিত পাঠ মিলাইয়া এই গ্রন্থাবলী সম্পাদিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর গ্রন্থসমূহের এরূপ এক সুষ্ঠু, সুমুদ্রিত, নির্ভুল এবং প্রামাণিক সংস্করণের প্রয়োজন ছিল। ইহা প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্যামোদী পাঠকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থাবলীতে দীনবন্ধু মিত্রের একখানি ছবি আছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

যথাপূর্ব্বং—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং লিঃ। ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় বাংলা কথা-সাহিত্যে সুপরিচিত। ছোট একটু ঘটনাকে হাল্‌কা তুলির সাহায্যে অতি অনায়াসে তিনি গল্পের রূপ দিতে পারেন। এই সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর অন্তরালে কখনও থাকে স্নিগ্ধ কৌতুক—কখনও বা চিন্তার ঐশ্বর্য্য এবং তাহা গল্প বলিবার দক্ষতাকে ও গল্প পড়িবার আগ্রহকে শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখে। এই সংগ্রহের গল্পগুলি সুনির্ব্বাচিত। বিশেষ করিয়া যথাপূর্ব্বং গল্পটি বাংলা কথা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ভারতের বনজ—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৮ পৃঃ; মূল্য আট আনা।

বিশেষজ্ঞ ছাড়া ভারতের বন-সম্পদ এবং বিশাল অরণ্যানী সম্পর্কে সাধারণের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা খুবই কম। বইখানি ছোট হইলেও ভারতের বিভিন্ন স্থানের অরণ্য-সংস্থান এবং অরণ্যজাত বহুবিধ সম্পদ সম্পর্কে ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তাছাড়া কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক ও প্রাদেশিক নাম, স্বাভাবিক উৎপত্তিস্থল এবং তাহাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি তালিকা সন্নিবেশিত হওয়ায় এই বইখানির গুরুত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্যান্ মিন্ চুই—ডক্টর সান্ ইয়াট্ সেন। অনুবাদক—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সেন চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান—বুক কোম্পানী, ৪।৩ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।০।

নবীন চীনের জন্মদাতা ডক্টর সান্ ইয়াট্ সেনের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ পিপিঙে দেহত্যাগ করেন। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী হইতে আগষ্টের মধ্যে ডক্টর সান্ ক্যাণ্টনে কোয়াংটাঙ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জনসাধারণের অধিকার' সম্বন্ধে মোট ষোলটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার ছয়টি 'জাতীয়তার নীতি' (মিন্ টু স্থ চুই), ছয়টি 'গণতন্ত্র' (মিয়াল্-চু-ই) এবং চারিটি 'জনসাধারণের জীবিকা' (মিন্-সেঙ-চুই) বিষয়ে। বর্ত্তমান পুস্তকে এই বক্তৃতাগুলির অনুবাদ স্থান পাইয়াছে। ডক্টর সান দূরদৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জাতীয় আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর না হইলে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের কোন অর্থ হয় না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাচুর্য্যের সহিত দারিদ্র্যের অদ্ভুত সমাবেশ তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। তিনি সত্যই বুঝিয়াছিলেন প্রাচ্য কি কারণে পাশ্চাত্ত্য হইতে বিভিন্ন। এই জন্যই উভয়ের উন্নতির পথ ডক্টর সানের মতে পরস্পর হইতে পৃথক্। উচ্চ শিক্ষিত, নিতান্ত আধুনিক, স্বাধীনতাকামী ও প্রকৃতই পাশ্চাত্ত্যের একজন অনুরাগী হইয়াও তিনি অন্ধ অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার অমূল্য উপদেশের সহিত পরিচিত হইলে বাঙালী তথা ভারতবাসী মাত্রেই উপকৃত হইবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আবৃত্তি-মঞ্জুষা—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্স, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ২০৫ পৃ. মূল্য ২।০।

বিদ্যালয় ও বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সভাসমিতি উপলক্ষে সঙ্গীতাদির ন্যায় বালকবালিকাগণের কণ্ঠে আবৃত্তি ও অভিনয় একটি চমৎকার উপভোগ্য বস্তু। ইহা সভার গুরুতর কার্য্যসূচীকে সরস ও উপভোগ্য করিয়া অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক করিয়া তোলে। দুঃখের বিষয়, অনেকে হাতের কাছে আবৃত্তির উপযোগী কোন সঙ্কলনগ্রন্থ না পাইয়া সভার কার্য্য নীরস ভাবেই সম্পন্ন করিতে বাধ্য হন। এই গ্রন্থখানি সেই অভাব কতক পরিমাণে দূর করিবে। ইহা যে সুসম্পূর্ণ ও আশানুরূপ সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশ কবিতা, গদ্য ও অভিনয়-অংশগুলিই সুনির্ব্বাচিত ও আবৃত্তির উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

ভ্রম-সংশোধন

২০৭ পৃষ্ঠায় "উত্তর" শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত।

১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



বাগ্‌দী-বউ
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



শ্লোভাক বালিকারা নৃত্যগীত করিয়া বসন্ত ঋতুকে আবাহন করিতেছে



শ্লোভাকিয়ার মধ্যবর্ত্তী হেল্‌পা পার্ব্বত্য গ্রাম। এখানকার গৃহ-নির্ম্মাণে পুরাতন স্থাপত্য রীতি অনুসৃত হয়

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫১

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার শাসন-সন্ধান

কিছুদিন পূর্বে বাংলার শাসন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটি 'রোলাণ্ড এডমিনিস্ট্রেশন এনকোয়ারি কমিটি' নামে অভিহিত। অনুসন্ধানের বিষয় নিম্নোক্ত রূপ ঃ

(১) বাংলায় বর্তমানে ও নিকট ভবিষ্যতে আধুনিক ও উন্নতিশীলভাবে সরকারের যোগ্যতা রক্ষার জন্য বাংলা-সরকারের কর্তব্য নির্ণয়।

(২) বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা গঠনে, পরিমাণে ও গুণে কিরূপ উপযুক্ত সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা এবং যোগ্যতা সহকারে কাজ চালাইবার জন্য কিরূপ উন্নতি সাধন প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ।

(৩) (ক) বর্তমানে বাংলায় ডিভিশন, জেলা, মহকুমা, থানা ও সার্কেল যে ভাবে আছে তাহাই রাখা সঙ্গত কি না।

(খ) সাধারণ শাসন-কার্যের, বিশেষতঃ স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন কোন দিকে কতদূর ব্যবহার করা যায়।

(গ) বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং জেলার বর্তমান শাসন-কর্তাদের সহিত তাঁহাদের কার্যের সমন্বয় সাধন।

(ঘ) নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোথা হইতে কি ভাবে এবং কি সর্তে সরকারী কর্মচারী সংগ্রহ করা উচিত তাহা নির্ধারণ: (১) সরকারী চাকুরীতে যে সাম্প্রদায়িক অনুপাত রাখিয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া লোক সংগ্রহ এবং (২) অসন্তোষ, দায়িত্বহীনতা ও অনাচারের প্রলোভন নিবারণ।

(৪) সাধারণ ভাবে শাসনকার্যের উন্নতির জন্য সুপারিশ।

বাংলা ভিন্ন ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এরূপ কোন কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। প্রথম দফায় যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে স্বীকার করা হইয়াছে যে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা আধুনিক ও উন্নতিশীল নহে। শুধু স্বীকার নহে, বর্তমান যুদ্ধের চাপে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে গবর্মেণ্টের কোন বিভাগই সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে সমর্থ নহেন। অন্ন বস্ত্র ঔষধ বাসস্থান প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রার অপরিহার্য বস্তুগুলি সম্বন্ধে যুদ্ধের সময় সর্বত্র বিপর্যয় ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকে, প্রত্যেক আধুনিক ও প্রগতিশীল দেশ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিবামাত্র ঐসব বিষয়ে মনোযোগ দিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে যুদ্ধ বাধিবার কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে সরকারের চৈতন্যোদয় হয় নাই; গত বিরাট্ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য বণ্টন সম্বন্ধে তাঁহারা সক্রিয় হন নাই। বস্ত্র ঔষধ ও বাসস্থান সমস্যা যুদ্ধের পাঁচ বৎসর কাটিয়া যাওয়ার পর আজ পর্যন্তও মিটে নাই অথচ বিভাগের পর বিভাগ বাড়িয়াছে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিলাতী বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হইয়াছে এবং করদাতাদের কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হইয়াছে। যে ডাক বিভাগ কর্মকুশলতায় ভারত-সরকারের শ্রেষ্ঠ বিভাগ বলিয়া পরিচিত ছিল, এই যুদ্ধে তাহারও সুনাম গিয়াছে; দেখা গিয়াছে ভারতীয় ডাক বিভাগের বর্তমান ব্যবস্থা আধুনিক যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম। শুধু বাংলায় নহে ভারতবর্ষের সর্বত্র সকল প্রদেশের সরকারী বিভাগ সম্বন্ধে এই একই কথা প্রযোজ্য। এই অবস্থায় হঠাৎ বাংলাকে এরূপ অনুসন্ধানের জন্য বাছিয়া লইবার পিছনে সরকারের কোন গূঢ় কারণ আছে কি না তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার।

যুদ্ধের পর সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে পুন-বিবেচনা করিতে হইবে এবং বর্তমান ভারত-শাসন আইনও পরিবর্তিত হইবে ইহা নিশ্চিত। সুতরাং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা কি হইবে তাহা স্থির হইবার পূর্বে অকস্মাৎ বাঙালীর ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থার অনুসন্ধানের সার্থকতা কোথায়? সমগ্র ভারতের শাসন-ব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলার শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার বা উন্নতি হইতে পারে না। গত দুর্ভিক্ষে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারত-সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত বিভাগের মধ্যে পরস্পর সমন্বয় না থাকিলে বিপদের সময় কাজ চলে না; রেলওয়ে, কৃষি-সমবায়, স্বাস্থ্য, সেচ, কুটির-শিল্প প্রভৃতি বহু বিভাগ একযোগে কাজ না করিলে দুর্ভিক্ষ এবং উহার পরবর্তী মড়ক ও কুফল নিবারণ অসম্ভব হইয়া উঠে।

বাংলার শাসন-ব্যবস্থা

রোলাণ্ড কমিটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া 'দৈনিক বসুমতী' লিখিয়াছেন :—

"এ দেশে তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কতকগুলি কারণে ভাঙিয়া পড়ে না—

(১) ইহা সাম্প্রদায়িকতার জন্ম জাতীয়তার বিরোধী হয়।

(২) ইহা আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহে রক্ষা পায়।

(৩) ইহা (বাংলায়) ইউরোপীয় দলের অনুগ্রহ ব্যতীত আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

যে ভাবে সচিবসঙ্ঘ গঠিত ও রক্ষিত তাহাতে যে তাহা লোকমত অবজ্ঞা করিতেও পারে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নহে, বর্তমান শাসন-পদ্ধতিতে গবর্নরের যে ক্ষমতা আছে, তাহার ব্যবহার কিরূপে হইতে পারে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সময় সার জন হার্বার্ট ব্যবস্থা-পরিষদের আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া তাঁহার মনের মত সচিবসঙ্ঘ কায়েম করেন, তখন তিনি যেমন নূতন সচিবসঙ্ঘকে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব হইতে রক্ষা করিবার জন্ম সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, মিষ্টার কেসী তেমনই সচিবদিগের সম্বন্ধে যখন পরিষদে অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব ছিল, তখন অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিব—দোষ শাসন-যন্ত্রের নহে; দোষ পবিচালকদিগের। যদি শাসন-যন্ত্র প্রকৃত যোগ্যতা-সম্পন্ন ও প্রয়োজনানুরূপ করিতে হয় তবে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে:—

(১) শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রানুগ করিতে হইবে।

(২) সে ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব থাকিবে না এবং যোগ্যতাই বিচার্য বিষয় হইবে।

(৩) লোকমতের মর্যাদা রক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ত্রুটি—ইহা লোকমতের মর্যাদা রক্ষা করে না, জনমত স্বীকার করিয়া লওয়াকে দুর্বলতা বলিয়া মনে করে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এই মনোবৃত্তি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে বহুক্ষণ প্রকাশ্য আপিসে বসিতেন এবং স্থানীয় লোক এমন কি গ্রামের লোকেরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ভয়ে বহু অভিযোগ জানাইতে পারিত। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন বাংলা ভাল করিয়া শিখিতেন এবং গ্রামবাসীদের সহিত বাংলায় কথা বলিয়া তাহাদের অভিযোগ জানিবার চেষ্টা করিতেন। এখনকার মত কোন-রূপে বাংলা পরীক্ষা পাস করিয়া চাকুরী বজায় রাখা ও ভাতা বৃদ্ধিই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। তখন সিভিল সার্ভিসে ব্রিটেনের বহু শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের যুবক আসিতেন। তাঁহাদের মনোবৃত্তিও বর্তমান শ্বেতাঙ্গবৃন্দ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল। দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় ইহাদের মধ্যে যেরূপ পাওয়া যাইত বর্তমান সিভিলিয়ানদের মধ্যে তাহার এক ভগ্নাংশও পাওয়া যায় না। আজকাল সিভিল সার্ভিসে মনোনয়ন-প্রথা প্রবর্তনের পর হইতে উপযুক্ত লোকের প্রবেশ কমিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির অধিকাংশই আজকাল হয় বাংলোয় নয় সাধারণের প্রবেশ-নিষিদ্ধ খাস কামরায় আপিস করেন। সাধারণ লোক ত দূরের কথা শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ করা দুষ্কর। প্রাচীন ও নবীন সিভিলিয়ানদের ব্যবহারের তারতম্যও অতি সহজেই ধরা পড়ে। জজেদের মনোভাবও যেন বদলাইয়াছে। ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষার জন্ম উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণে যে অসামান্য ধৈর্যের পরিচয় পূর্বে পাওয়া যাইত তাহা আজকাল আর দেখা যায় না। সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় নিয়োগেও কোন উন্নতি হয় নাই। ইহাদের অধিকাংশই নিম্নস্তরের সাহেব-দের অনুকরণে তাঁহাদের দোষগুলিকেই আয়ত্ত করিয়াছেন; এক গগনভেদী দাম্ভিকতা তাঁহাদের সহিত দেশবাসীর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা যেরূপ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে চলিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে সিভিল সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা থাকিবে কিনা অথবা থাকা বাঞ্ছনীয় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। অন্ততঃ ভারত-সচিবের বজ্রমুষ্টি হইতে সিভিল সার্ভিস ছিনাইয়া আনা একান্ত প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। বর্তমানে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে সিভিল সার্ভিস ও ইম্পিরিয়াল পুলিস-মেডিকেল প্রভৃতি সার্ভিসের উপর মন্ত্রীদের কোন হাত নাই। ইঁহাদের অপ-কার্যের জন্য মন্ত্রীরা ব্যবস্থা-পরিষদে জবাবদিহি করিতে বাধ্য। কিন্তু প্রতিকারের কোন পন্থা তাঁহাদের হাতে নাই। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, বদলি প্রভৃতি কোন ব্যাপারেই মন্ত্রিদের কোন হাত নাই। মেদিনী-পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন. এম. খাঁর ঘটনায় দেখা গিয়াছে সমগ্র ব্যবস্থা-পরিষদ এবং মন্ত্রীসভা একমত হইয়াও এই অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন তদন্ত কমিটি বসাইতে পারেন নাই। গবর্ণর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

শাসনকার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা

সরকারী কর্মচারী নিয়োগে সাম্প্রদায়িকতার ফল কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে, সমগ্র বিভাগের কর্মদক্ষতা ইহাতে কি ভাবে কমিয়া যাইতে পারে, বর্তমান বাংলা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সরকারী কর্মচারী নিয়োগে শুধু চাকুরীর দিক হইতে দেখিলে চলে না; সম্প্রদায়-নির্বিশেষে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা ইঁহাদের প্রধান কর্তব্য। সম্প্রদায়-বিশেষের স্বার্থ সাধনে সরকারী কর্মচারী ব্রতী হইলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের অসন্তোষ অনিবার্য এবং ইহার পরিণাম সমগ্র গবর্মেণ্টের পক্ষে মারাত্মক। অসন্তুষ্ট লোকেরা কর্মচারীদের দায়ী করে না, করে গবর্মেণ্টকে। ফলে সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা তো কমেই, গবর্মেণ্টের প্রতিও লোকের আস্থা ক্রমাগত কমিতে থাকে। গতানুগতিক ভাবে সাধারণ সময়ে সে গবর্মেণ্ট কোনরূপে চলিতে পারিলেও বিপদের দিনে সর্বসাধারণের সাহায্য সে পায় না; রাজনৈতিক উৎকোচের সাহায্যে তাহাকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হয়। ইহার কুফলও সুদূর-প্রসারী হইতে থাকে। তোষণ ও আত্মসমর্পণের পথে পদার্পণ করিয়া পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠান বা গবর্মেণ্ট পরিণামে লাভবান হইতে পারে নাই।

বাংলায় উচ্চপদে অনভিজ্ঞ অথবা যোগ্যতাবিহীন মুসলমান কর্মচারী নিয়োগের ফল সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায় নিজেও ইহাতে লাভবান হয় নাই। বাংলার সমবায় বিভাগের উচ্চতম কর্মচারী বহু বৎসর যাবৎ মুসলমান;

ইঁহাদেরই হাতে কৃষকের স্বার্থরক্ষার উপযোগী এই অতি প্রয়োজনীয় বিভাগটির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। কৃষি-ঋণ-দানের, কৃষকের ফসল-বিক্রয়ের কোন সুবন্দোবস্ত বাংলায় মুসলমান পরিচালিত সমবায় বিভাগ করিতে পারে নাই। অথচ শ্বেতাঙ্গ রেজিষ্ট্রারের অধীনে পঞ্জাবের সমবায় বিভাগ তথাকার মুসলমান কৃষকের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। বাংলাতেও এক হিন্দু রেজিষ্ট্রারের অধীনে মুসলমান পাটচাষীকে বাঁচাইবার জন্ম পাট-বিক্রয় সমবায় সমিতি গঠনের প্রথম ও শেষ উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ পাট-ব্যবসায়ী ও চটকলের স্বার্থে আঘাত করিবার এই চেষ্টা অবশ্য সফল হয় নাই, কিন্তু তাহার পর হইতে সমবায় বিভাগ মুসলমান রেজিষ্ট্রারের একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী এখনও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই কারণে উচ্চতম পদে মুসলমান নিয়োগের বন্দোবস্ত সাধারণতঃ একটু ঘোরানো পথেই করা হয়। কোন বর্ষীয়ান হিন্দুকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পরেই একজন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পবয়স্ক মুসলমানকে নিযুক্ত করা হয়। হিন্দু কর্মচারীর অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানটি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। বাংলার নবগঠিত কৃষি-আয়কর বিভাগেও এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।

বাংলায় সরকারী বিভাগের সমস্ত উচ্চতম পদেও মুসলমান নিযুক্ত হইলে আমরা বিন্দুমাত্র আপত্তি করিতাম না যদি হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রতিযোগিতায় আপন যোগ্যতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তাঁহারা নিযুক্ত হইতেন। দৈবচক্রে সম্প্রদায়-বিশেষে জন্মগ্রহণ করাটাকেই সরকারীকর্মে নিযুক্ত হওয়ার একমাত্র দাবী বলিয়া আমরা মনে করি না। রোলাণ্ড কমিটি এই গুরুতর প্রস্তাবটি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার চেষ্টা মাত্রও করেন নাই; সরকারী কর্মে সাম্প্রদায়িক অনুপাত বজায় রাখিয়া কি ভাবে লোকসংগ্রহ করা যায় তাহার উপায় অনুসন্ধানই তাঁহাদের লক্ষ্য।

বাংলার ডিভিসন জেলা প্রভৃতির সীমা পরিবর্তনের কথা

রোলাণ্ড কমিটির অনুসন্ধানের তৃতীয় দফাটিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার সমালোচনা করিয়া বসুমতী লিখিয়াছেন:

"বাংলার ডিভিসন, জেলা প্রভৃতির পরিবর্তন যদি করা হয়, তবে কি সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতে সে কাজ করা হইবে? অর্থাৎ পাকিস্থানের বনিয়াদে সার্কল হইতে বিভাগ পর্য্যন্ত রচনা করা হইবে? স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ শাসন-কার্য্যে ব্যবহার করা বর্তমান নীতির বিরোধী। ভারত-সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে যে রেজলিউশন প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে—

'সে সকলে বাহির হইতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে।'

এমন কি ইহাও বলা হইয়াছে যে স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠান-সমূহ যদি সাধারণ ভুল করে, তবে তাহাও উপেক্ষা করা হইবে; কারণ, তাহারা ভুল করিয়া—ভুলের ফলভোগ করিয়া অর্থাৎ ঠেকিয়া শিখিবে—সেও ভাল, তথাপি বাহিরের হস্তক্ষেপ সমর্থিত হইতে পারে না।

বাংলা-সরকার কি এখন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া সে সকল তাঁহাদিগের—অর্থাৎ সরকারের শাসন বিভাগের—তাঁবেদার করিতেই চাহিতেছেন? জনস্বাস্থ্য বিভাগ সরকারের। যদি কোথাও প্রয়োজন হয়, তবে সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগ করিতে—তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্যের জন্মই দায়ী নহে সে সকলকেও সরকারের অধীনে আনিবার কোন সমর্থনীয় কারণ থাকিতে পারে কি?"

কয়েক বৎসর পূর্বে মৈমনসিংহ জেলাটিকে ভাঙিয়া দুইটি জেলায় পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু জনমতের চাপে শেষ পর্য্যন্ত জেলাটি অক্ষত থাকিয়া যায়। এবার আবার ব্যাপক ভাবে সেরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পাকিস্থানী দাবীতে জেলা ও ডিভিসন বিভাগ হইলেও এবার আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকিবে না। পাকিস্থানী মন্ত্রীদল বহাল থাকিতে থাকিতে এই কাজটি সারিয়া লইবার একটা অশোভন ব্যগ্রতাও রোলাণ্ড কমিটির গঠন ও অনুসন্ধানের বিষয়ের মধ্যে দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের সঙ্গে কমিটিতে দুইজন বাঙালী গৃহীত হইয়াছেন। একজন লীগের অন্যতম নেতা খাঁ বাহাদুর মোমিন এবং অপর জন বর্তমান লীগ মন্ত্রীদের বশম্বদ জনৈক হিন্দু রায় বাহাদুর। কমিটির কার্য্যও যথেষ্ট সন্তর্পণেই চলিতেছে।

বাঙালীর ভাত মাছ ও দুধ

বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত মাছ ও দুধ। বাংলার সোনার ক্ষেত্র, অবারিত মাঠ ও নদ নদী খাল বিল বাঙালীকে চিরকালই ভাত মাছ ও দুধ প্রাচুর্য্যের সহিত যোগাইয়া আসিয়াছে। বাঙালীর এই প্রধান তিনটি খাদ্য সংগ্রহ তাহার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে বাংলার ইতিহাসে সম্ভবতঃ এই প্রথম—বর্তমান যুদ্ধের কল্যাণে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সুরু হইবার পর হইতে বাংলার দুর্দশা বাড়িয়া চলিয়াছে। যে যুদ্ধে তাহার কোন স্বার্থ নাই সেই যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়া তাহার লাঞ্ছনা চরমে উঠিয়াছে। অর্দ্ধ-কোটি বাঙালী অন্নাভাবে মরিয়াছে, আরও কোটি কোটি লোক, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি, মাছ ও দুধের অভাবে চিররুগ্ন হইয়া থাকিতেছে।

যুদ্ধের পূর্বে যেটুকু দুধ পাওয়া যাইত তাহার আকস্মিক অন্তর্ধান এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় সৈন্যবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত গোহত্যা, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে গবাদি পশুক্ষয়, যান-বাহনের অভাবের জন্ম দুগ্ধ-প্রধান স্থান হইতে দুগ্ধ আমদানী বন্ধ প্রভৃতি দুধের বর্তমান অভাবের কারণ। গবর্মেণ্ট আজ পর্য্যন্ত কোন অভাবেরই মূল অনুসন্ধান করিয়া তাহার স্থায়ী প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই, এ ক্ষেত্রেও ছানা ও সন্দেশ তৈয়ারি বন্ধ করিয়া তাঁহারা দুধের অভাব মিটাইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত এক সুলিখিত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মৎস্যাভাবের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্যের চাষ সম্পর্কিত

গবেষণায় লিপ্ত থাকিয়া লেখক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহারই উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। মৎস্যের চাষ-বৃদ্ধি সম্বন্ধে বাংলা-সরকার যাহা করিতেছেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার বহু ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিয়া যে-সব নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। তিনি লিখিতেছেন: "এই অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির মূলে বাংলার মাছের সংখ্যাহীনতা কারণ নয়, বাংলার মাছ রাতারাতি লোপ পায় নাই বরং এমন জায়গাও আছে যেখানে এখনও প্রচুর মাছ অত্যন্ত কম দরে পাওয়া যায়। তাহা হইলে মাছের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য কারণ অন্য স্থলে। উপযুক্ত অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায়, বিগত পঞ্চাশের মন্বন্তরে মৎস্যজীবীদিগের সংখ্যালোপ, সরকার কর্তৃক নৌকাপসারণ, অন্নাভাবে মৎস্য ধরিবার সরঞ্জাম বিক্রি, পয়সাভাবে পোনা কিনিতে না পারা এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক-বৃদ্ধি, যানবাহনের অভাব, মাছ তাজা অবস্থায় চালান দিবার বন্দোবস্তের অর্থাৎ নুন, বরফ প্রভৃতির দুষ্প্রাপ্যতাই বাংলার মৎস্য সঙ্কটের মূল কারণ। এই দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে দায়ী। সম্প্রতি বাংলা-সরকার মৎস্য চাষ সম্পর্কে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়াছেন এবং মৎস্য চাষ বিভাগের অত্যন্ত দ্রুত প্রসারণ করিতেছেন। এই জন্য সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত আছেন। বাংলার মৎস্য বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অধীনে অনেকগুলি উচ্চপদ সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহাতে ঐ সকল পদস্থ ব্যক্তি বাংলায় মাছের অভাব দ্রুতগতিতে নিবারণ করিতে পারেন।"

ধানের ক্ষেতে মাছের চাষ

ধানের ক্ষেতে মাছের চাষ সম্বন্ধে মৎস্য বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টর অনেক প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন, প্রচুর অর্থও ইহাতে ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রকার চাষের সুযোগ কি পরিমাণ আছে তাহা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা হয় নাই। ভিন্ন প্রদেশের লোকের পক্ষে তাহা করাও বোধ হয় কঠিন। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় লিখিতেছেন:

"অধ্যক্ষ মহাশয় মাছ বাড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন নূতন নূতন উপায় পরীক্ষার দ্বারা। তাঁহার একটি প্রধান কীর্তি বাঙালীকে ধানক্ষেতে মাছ চাষ করিতে শিক্ষা দেওয়া যাহাতে একসঙ্গে ভাত ও মাছ দুয়েরই ব্যবস্থা হয়। এই মিশ্র চাষের সাফল্য চীন প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে—বহু ভাগে বিভক্ত জমির দেশে কত দূর সফল হইবে তাহা জানা যায় নাই। এই চাষের জন্য প্রয়োজন বিশেষভাবে নালাকাটা ও আল দেওয়া জমি—সেটা সকল স্থলে সম্ভব নয়। আবার যেখানে জমিতে চাষকালীন তুচ্ছ জল ঢুকান ও বাহির করান এবং ধানকাটা লইয়া খুন, জখম, মামলা নিত্যই লাগিয়া আছে, সেখানে ধানের সঙ্গে মাছ এই দুই লইয়া আরও কত বিপদের সম্ভাবনা তাহা স্থির করা সম্ভব নয়। আর একটি বাধা জমিতে আল-বাঁধা লইয়া—আমাদের জমি খুব কমই একলপ্তে দেখিতে পাওয়া যায়, বেশির ভাগই খণ্ড খণ্ড ইতস্তত: বিক্ষিপ্তাবস্থায় থাকে অর্থাৎ রামের জমির পাশে রহিমের এবং তার পাশে শ্যামের, তারপর আবার রামের এইভাবে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে এক জমি হইতে আর এক জমিতে যাইবার একমাত্র পথ মাঝের আলগুলি। এই আলগুলি এজমালি সম্পত্তি এবং এই আল হঠাৎ উঁচু করিয়া নিজের জমিকে মাছচাষের উপযুক্ত করা কত দূর আইনসঙ্গত তাহা আমার জানা নাই, তবে এইরূপ স্থলে আল উঁচু করিতে গেলে বিবাদ ও মামলা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি। এইরূপ মিশ্র চাষ অবশ্য স্থান বিশেষে অর্থাৎ যেখানে নিজের একলপ্তে জমি আছে, নালা কাটিবার ও উঁচু আল দিবার সঙ্গতি আছে, সর্বোপরি নিজের প্রতিপত্তি যেখানে অখণ্ড সেরূপ স্থলে ইহা খুবই উপযোগী। উদাহরণ-স্বরূপ হ্যামিল্টন সাহেবের গোসাবা আবাদ, কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সুন্দরবন আবাদ প্রভৃতি স্থলে ইহা সম্ভব; কিন্তু হাওড়া জেলা, বসিরহাট, বারাসত মহকুমা, খুলনার স্থান বিশেষ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে বে-সরকারী উদ্যোগী ব্যক্তিরা বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। অধ্যক্ষ মহাশয়ের চেষ্টা প্রশংসনীয় নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁহার বাংলা দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান কয়েকটি শহরেই সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ।"

বাংলা-সরকার যে সকল উচ্চ পদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কয়েক জন বাংলা দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ হইয়াছে, তাঁহাদের মৎস্য চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান কত দূর তাহা আমার আলোচ্য নয়, তবে এক প্রদেশের ভাষা, রীতি, ভৌগোলিক জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোক অপেক্ষা প্রদেশবাসী অন্ততঃপক্ষে সমশিক্ষিত ও তুল্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই কি অধিক কার্য্যক্ষম ও উপযোগী হইত না?"

বাংলাদেশে বিদেশী নৌকা-নির্মাণ-বিশারদ

বাংলার শিল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানে নৌকা-নির্মাণ সম্বন্ধে যে অনাচার চলিতেছে তাহার কথা আমরা ইতিপূর্বে লিখিয়াছি। কোভাকস নামক জনৈক হাঙ্গেরিয়ান ইহুদী ইহার অনুগ্রহে কি কারণে নৌকা-নির্মাণ-বিশারদ হইয়া মোটা বেতন ভোগ করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া কোন ফল হয় নাই। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে হারম্যান নামক আর একজন ইহুদীকে চীফ ইন্‌স্পেক্টর অফ বোটস এই পদে দুই হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত করিবার আয়োজন হইতেছে। এই সংবাদ দিয়া ১৮ই মাঘ তারিখে দৈনিক বসুমতী লিখিয়াছেন:—

"কোভাকসের বন্ধু হারম্যান নামক একজন ইহুদীকে (জার্মাণ?) চীফ ইন্‌স্পেক্টর অব বোটস করিয়া মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে চাকরী দেওয়া হইতেছে।

সংবাদটি যদি সত্য হয়, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব:—

(১) হারম্যান কবে—কোথা হইতে এ দেশে আসিয়াছে?

(২) হারম্যান পূর্বে ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে—"প্লাই উড" বিভাগে চাকরী করিত কি না এবং সেই চাকরীতে তাহার মাসিক বেতন তিন শত টাকার অধিক ছিল কি না?

(৩) কি কারণে হারম্যান সে চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল?

(৪) সে চাকরী ছাড়িবার পর হারম্যান রুংটা এণ্ড সন্সে চাকরী করিত কি না এবং তথায় তাহার বেতন মাসিক ৮ শত টাকার অধিক ছিল কি না ?

(৫) কি কারণে তাহার বেতন মাসিক ২ হাজার টাকা হইবে ?”

২৮শে মাঘ তারিখ পর্য্যন্ত বাংলা-সরকার ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বজেট অধিবেশন আগত-প্রায়। কোন সদস্য প্রশ্ন করিলে সংবাদটির সত্যাসত্য জানিয়া অগ্রে উহা প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

বিকৃত ডাইল বিক্রয়

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ঢাকাস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

“মানুষের অখাদ্য বলিয়া বর্জ্জিত হওয়ায় সরকারী গুদাম হইতে হাজার হাজার মণ বিকৃত ছোলার ডাইল আড়াই টাকা মণ দরে বিক্রীত হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা উহা কিনিয়া আবার খাবারের দোকানে ও রাস্তায় মিষ্টান্ন ফিরিওয়ালাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে। সেই পচা ডাইল দিয়া এখন লাড়ু ও চানা-চুর প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। অর্থাৎ যে ডাইল সে দিন অখাদ্য বলিয়া ত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই আবার খাদ্যদ্রব্যে পরিণত করা হইতেছে। লাড়ু ও চানাচুর মানুষের খাদ্য বলিয়া প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হইতেছে এবং তাহাতে লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে।”

বাংলা-সরকার পূর্ব্বে বহুবার শ্বেতসার রূপে ব্যবহারের জন্য বিকৃত আটা ময়দা বিক্রয় করিয়াছেন। এই সব বস্তুই পরে ঘুরিয়া মানুষের খাদ্যরূপে বাজারে আসিয়াছে এরূপ অভিযোগ বহুবার হইয়াছে। বোটানিকাল গার্ডেনের বিকৃত চাউল যেভাবে রেশনিঙের কল্যাণে লোককে খাইতে বাধ্য করা হইয়াছে কলিকাতাবাসী আজও তাহা ভুলিতে পারে নাই। কিছুদিন যাবৎ এবার স্থানে স্থানে বিকৃত ডাইল বিক্রয় সুরু হইয়াছে। উহার ব্যবহারের নমুনাও ঢাকার সংবাদে পাওয়া গেল। খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত বাঙালীর স্বাস্থ্য একে ভাঙিয়া পড়িতেছে তদুপরি গবর্মেণ্ট স্বয়ং বিকৃত খাদ্য বাজারে ছাড়িলে ভেজাল জিনিষের ব্যবসায়ীরা আরও উৎসাহিত হইবে। ভেজাল নিবারণ আইনটির প্রয়োগ ভারতরক্ষা-বিধান বলে গবর্মেণ্ট বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সরকারী দোকানের দ্রব্য পরীক্ষার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য কলি-কাতা কর্পোরেশনকে কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা করিতে হইয়াছে। রেশনিঙের মারফতে দেশবাসীকে সমানভাবে পুষ্টি-কর খাদ্য সরবরাহ করা প্রচণ্ডতম যুদ্ধের মধ্যেও যে সম্পূর্ণ সম্ভব ইংলণ্ডে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধকালীন রেশনিঙের ফলে বিলাতের অধিবাসিবৃন্দ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল খাইয়াছে এবং তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল হইয়াছে। অথচ খাস ব্রিটিশ সিভিলি-য়ানের পরিচালনায় কলিকাতা রেশনিঙের কল্যাণে লোকের স্বাস্থ্য কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। ভারতবাসীর মঙ্গল সাধনের ভার ভগবানের হাত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা সতত প্রচার করেন সেই ব্রিটিশ ট্রাষ্টিদের কর্ত্তব্য পালনের ইহাও একটি নিদর্শন।

কয়লার অভাব

কলিকাতায় কয়লার অভাব পুনরায় অত্যন্ত তীব্র ভাবে দেখা দিয়াছে। শুধু কলিকাতায় নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কয়লা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় দিল্লীর অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। দিল্লীর শীতে ঘর গরম করিবার জন্য কয়লা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। কয়লার অভাবে সেখানে ঘর গরম করা তো দূরের কথা, লোকের রন্ধন বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের অবশ্য এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। দিল্লীতে যত কয়লা আমদানী হইতেছে তাহার এক-পঞ্চমাংশ সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়। জনসংখ্যার অনুপাতে ইহাদের তদপেক্ষা অনেক কম পাওয়ার কথা। ইঁহাদের বরাদ্দও বেশ রাজসিক। হাজার টাকা বেতনের একজন অবিবাহিত কর্ম্মচারী যেখানে মাসিক ৮ মণ কয়লা পান, চারি-পাঁচটি ঘরে যে সাধারণ নাগরিক পরিজনসহ বাস করেন তিনি তাহার অর্দ্ধেক পান না। এই প্রসঙ্গে যে পত্রটি ষ্টেটসম্যানে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর জনৈক ব্যক্তি লিখিতেছেন :

“দিল্লীর জন্য যত কয়লা দরকার জনৈক কর্ম্মচারী বলিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেক মাত্র পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার এক-পঞ্চমাংশ সরকারী কর্ম্মচারীরা পাইতেছেন। ইহা সত্য হইলে ঘোর কলঙ্কের কথা, সমগ্র জনসাধারণের ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত। হাজার টাকা বেতনের একজন সরকারী কর্ম্মচারী সাধারণ নাগরিক পরিবারের দ্বিগুণ কয়লা পাইবে ইহা একান্ত বিস্ময়কর। যে বিভাগ এরূপ নিয়ম তৈয়ারি করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা উচিত। সরকারী কর্ম্মচারি-গণ কোন্ যুক্তিতে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করিবে ? তাহারা কি এতই কাজের লোক যে অপরের ক্ষতি করিয়া তাহাদিগকে অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হইবে ? ব্রিটেনে সরকারী কর্ম্মচারীরা কোন অতিরিক্ত সুবিধা পায় না ; দেওয়ার চেষ্টা করিলে রাস্তার লোকেই তাহা বন্ধ করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু ভারতবর্ষে দেখা যায় ইহারা যেন দেশের একটা বিশেষ অংশ, সাধারণ লোকে যাহা পায় না ইহারা তাহার অধিকারী। কর্ত্তৃপক্ষের ভুলা উচিত নয় যে ইহাদের বেতন করদাতাদের ট্যাক্স হইতে দেওয়া হয়, অন্য কোন স্থান হইতে আসে না। মোটা বেতনের এবং উচ্চপদের সরকারী কর্ম্মচারী যতখানি কয়লা পান, করদাতা হিসাবে ঠিক ততখানি কয়লা পাওয়ার অধিকার আমারও আছে। আমি দিল্লীর একজন ব্যবসায়ীর কথা জানি, যিনি আয়কর ও অতিরিক্ত আয়কর বাবদ বহু টাকা গবর্মেণ্টকে দিয়া থাকেন, তিনিও নিউমোনিয়ায় গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়িলে ডাক্তারের সুপারিশে পর্য্যন্ত কয়লা পান নাই। রেশনিং বিভাগের বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের অপসারিত করিয়া তৎস্থলে বিবেচনাবুদ্ধি এবং কাণ্ডজ্ঞান আছে এরূপ লোক নিযুক্ত করা উচিত।”

ষ্টেটসম্যান অবশ্য দিল্লীর জন্য তীব্র ভাষায় ওকালতি করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কলিকাতার কথা বিশেষ কিছু লেখেন নাই। কারণ সম্ভবতঃ এই যে তাহা করিলে তাঁহাদেরই পোষ্য মন্ত্রীদলের কীর্তিকলাপ প্রকাশ করিতে হয়।

কলিকাতায় কয়লার অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ সরকারী বণ্টন-ব্যবস্থার ত্রুটি ইহাতে সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে ভোট ক্রয় ও বজায় রাখিবার জন্য বহু আনাড়ীকে কয়লার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, অনেক পাকা ব্যবসায়ী তাহা পান নাই, বর্তমান বিশৃঙ্খলা তাহারই প্রধান ফল।

কয়লার ব্যবসায়ে কি ভাবে লুট চলিয়াছে, বেঙ্গল কোল কোম্পানীর গত ব্যালান্স-শীটে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কোম্পানীটি এণ্ড্রু ইয়ুল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সির পরিচালনার অধীন। গত ১৯৪৩-এর ৩১শে অক্টোবর ছয় মাসে কোম্পানী ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার মণ কয়লা তুলিয়াছিল এবং ৭৮ লক্ষ টাকার কয়লা বিক্রয় করিয়াছিল। ১৯৪৪-এর ৩১শে অক্টোবর ছয় মাসে কোম্পানী ৭ লক্ষ ২৩ হাজার মণ কয়লা তুলিয়াছে এবং ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার কয়লা বিক্রয় করিয়াছে। অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা কম কয়লা তুলিয়া দ্বিগুণেরও অধিক দাম পাইয়াছে। পূর্বে মোট লাভ হইয়াছে ১৮ লক্ষ টাকা, এবার হইয়াছে ৫৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ তিন গুণ। কয়লা তোলার ব্যয় পূর্বে হইয়াছে ৪৪ লক্ষ টাকা, এবার হইয়াছে ৫২ লক্ষ, অর্থাৎ বড় জোর এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় বাড়িয়াছে। বাংলা দেশের কয়লার খনির অধিকাংশই সাহেবদের। কম কয়লা তুলিয়া তিন গুণ লাভ হইলে ইহারা বেশী কয়লা তুলিতে চাহিবে কেন, আমরাই বা কয়লা পাইব কোথায়?

আসামে চাউল ক্রয় ব্যবস্থা

শ্রীহট্টের অগ্রগতি নামক একটি পত্রিকা আসামের লীগ মন্ত্রীদের চাউল ক্রয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সমালোচনা করিয়াছেন:

"সম্প্রতি খাস সরকারী তত্ত্বাবধানে শ্রীহট্ট জেলায় চাউল সংগৃহীত হইতেছে। তজ্জন্য পৃথক্ চাউল ক্রয় বিভাগ খোলা হইয়াছে। শুনিলাম যে, বস্তা ছাড়া প্রতি মণ ১৩৷৷০ আনা দরে চাউল ক্রয় করার কথা ছিল। ইতিমধ্যে টেণ্ডার চাওয়া হয় এবং বস্তাসহ ১২।০ আনা মণ দরে চাউল ক্রয় করা হইতেছে। এইজন্য কয়েকজন মারোয়াড়ীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, গবর্মেণ্ট চাউলের সর্বনিম্ন দর এখনও নাকি নির্দিষ্ট করেন নাই। এই মারোয়াড়ী সরকারী এজেণ্টগণ বাজার হইতে কৃষকদিগকে কত মূল্য দিয়া চাউল কিনিতেছেন তাহার প্রকৃত তথ্য জানিবার উপায় কি? চাউলের সর্বনিম্ন দর অর্থাৎ বিক্রেতার দর নির্দিষ্ট না করায় কৃষকগণের কি উপকার হইতেছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এজেন্সী মারফতেই যদি চাউল সংগ্রহ করিতে হয়, তবে আগেকার এজেন্সীগুলি কি অপরাধ করিল? মারোয়াড়ী ছাড়া এ জেলায় কি কোন লোক নাই যে, শ্রীহট্টের হিন্দু-মুসলমান কেহই এই সুযোগ পাইতে পারে না? সরকারী কর্মচারিগণ সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে চাউল ক্রয় করেন না কেন? এই মধ্যবর্তী ব্যবস্থা কৃষকদের উপকার করিবে কি না তৎসম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কৃষি অঞ্চলে সরকারী গুদাম খুলিয়া সরকারী নির্দিষ্ট দরে কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি ধান চাউল সংগ্রহ না করিয়া এইরূপ এজেণ্টদের মারফতে চাউল সংগ্রহ বোধ হয় তেমন উদ্দেশ্যও ছিল না। আশা করি গবর্মেণ্ট অগৌণে চাউলের সর্বনিম্ন দর অর্থাৎ বিক্রেতার দর ঘোষণা করিয়া গ্রামে গ্রামে তাহা প্রচার করিবেন এবং খোদ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা এই চাউল সংগ্রহ করিবেন। পক্ষান্তরে মারোয়াড়ীদের হাতে আমাদের দেশ তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা আদৌ সমর্থন করি না। কাছাড়ে মিঃ গাজুমিয়াকে ৫০০০০/ মণ চাউলের এজেন্সী দেওয়া হইল কেন? আর কেহ কি সেখানে নাই?"

শ্রীহট্ট মুসলমান প্রধান জেলা, উহার অধিকাংশ কৃষক মুসলমান। সেখানেও বাংলার ন্যায় খাস লীগের তত্ত্বাবধানে মুসলিম স্বার্থ কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে 'অগ্রগতি'র মন্তব্য তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বাংলায় লীগ মন্ত্রীরা ভোটের জন্য শ্বেতাঙ্গ বণিকদের তুষ্ট করিয়া মুসলমান পাটচাষীর সর্বনাশ করিয়াছেন। আসামেও দেখা যাইতেছে লীগ নায়কেরা কোন অজ্ঞাত কারণে মারোয়াড়ী-তোষণে প্রবৃত্ত হইয়া মুসলমান চাষীর ক্ষতি সাধনে কুণ্ঠিত হন নাই।

হিন্দু আইন সংস্কার

বোম্বাই প্রাদেশিক সমাজ-সংস্কার সমিতির পক্ষ হইতে হিন্দু আইন কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে সর হর্ষিদ্‌ভাই দিভাতিয়া নামক বোম্বাই হাইকোর্টের জনৈক জজ এই মন্তব্য করেন যে, শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া যে সকল পৌরাণিক কাহিনী রচিত হইয়াছে, সেগুলির বিলোপ সাধন করিয়া হিন্দু সংহিতাকে যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য। উক্ত সমিতির অভিমত, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত বিভিন্ন প্রগতিশীল শাস্ত্রীয় মতবাদের সমন্বয়ে এক সার্বজনীন সংহিতা প্রণয়ন করা উচিত। সমিতি বিধবাদিগের "গোত্রজ সপিণ্ডের" অধিকার দাবী করেন। ৭০ বৎসরেরও পূর্বে বোম্বাই হাইকোর্ট ঐ অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। সমিতি উত্তরাধিকারের দাবীতে উপপত্নীর ভরণপোষণের বিরোধিতা করেন; উপপত্নীত্ব কোন বিধানেই স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা প্রস্তাবিত সংহিতায় অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেন এবং গোত্র ও প্রবর সংক্রান্ত বিধিনিষেধের তীব্র বিরোধিতা করেন।

৫ জন সনাতনী কৃষ্ণ পতাকা লইয়া কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন ও তাঁহাদিগের মুখপাত্র সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া প্রস্তাবিত সংস্কারের বিরোধিতা করেন।

বোম্বাইয়ের প্রগতিশীল লোকেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু আইনের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ বন্ধ করিয়া সমগ্র দেশে এক অখণ্ড সংহিতা প্রণয়ণের চেষ্টা সমর্থন করিয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয়।

প্রাণদণ্ডের আদেশ

অষ্টি ও চীমুর মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ১৫ জনের মধ্যে ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করিয়া মধ্যপ্রদেশের গবর্নর তাহার স্থানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন। অষ্টি ও চীমুরে যাহা ঘটিয়াছিল প্রবল উত্তেজনা ছিল তাহার মূল কারণ। হাঙ্গামার সময় উত্তেজনার ফলে যাহারা নরহত্যা করিয়া বসে তাহাদিগকে সাধারণ নরঘাতকের পর্য্যায়ে ফেলা সকল ক্ষেত্রে চলে না।

বিশেষতঃ এই মামলায় জনৈক বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কয় ব্যক্তির প্রাণদণ্ড মকুব করিবার জন্য রাজপ্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করিয়াছেন। হাঙ্গামায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের বিধবা পত্নীও এই আবেদনে যোগ দিয়াছেন ইহাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশের গবর্নর ১৫ জনের মধ্যে ৮ জনের প্রাণদণ্ড মকুব করিয়াছেন, অবশিষ্ট ৭ জন বাদ পড়িল কেন তাহা বলেন নাই। আমরা আশা করি তিনি পুনর্বিবেচনা করিয়া ইহাদিগেরও প্রাণদানে কৃপণতা করিবেন না। দণ্ড প্রতিহিংসাদ্যোতক হইলে দণ্ডের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না।

শোভাযাত্রায় গান্ধীজীর ছবি

গবর্ণর-শাসিত প্রদেশে কংগ্রেস-ভীতির এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত মান্দ্রাজে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর মান্দ্রাজের বিবেকানন্দ লাইব্রেরি স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে এক শোভাযাত্রা বাহির করে। শোভাযাত্রায় স্বামীজির ছবির পাশে গান্ধীজীরও একখানি ছবি ছিল। শোভা-যাত্রায় গান্ধীজীর ছবি থাকিতে পারিবে না বলিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু শোভাযাত্রার উদ্যোক্তৃবৃন্দ সে আদেশ মানেন নাই। এই উপলক্ষে পুলিস তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সহকারী মহকুমা হাকিমের নিকট আপীলে উক্ত দণ্ডাদেশ হ্রাস হইয়া তাহাদিগকে এক বৎসর সদ্ভাবে বাস করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। অভিযুক্ত-দের মধ্যে দুই জন এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন এবং সরকার পক্ষ হইতেও তাঁহাদের পূর্ব্ব দণ্ড বহাল রাখিবার জন্য আবেদন জানাইয়া হাইকোর্টে আপীল করা হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি হামীল অভিযুক্ত ব্যক্তিত্রয়কে মুক্তি দিয়া মন্তব্য করেন যে শোভাযাত্রার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির পার্শ্বে গান্ধীজীর ছবি কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি বা তাহার কার্য্যকলাপ বৰ্দ্ধিত করিবে এই ধারণা অমূলক।

প্রাদেশিক সমবায় প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের প্রস্তাব

দিল্লীতে খাদ্য-সম্মেলনে টাটকা খাদ্য এবং জ্বালানী কাঠ ও কয়লা বণ্টনের কথা আলোচিত হইয়াছে। সম্মিলনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগামী ৩১শে মে'র মধ্যে সমস্ত সরকারগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় ডিম্ব, মৎস্য, তৈলবীজ ইত্যাদি বণ্টনের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সমস্ত সরকারই উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীদিগের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনের কার্য্য পরীক্ষামূলক ভাবে আরম্ভ করিবেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাংলা-সরকার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মজুদ মালের হিসাব না পাইলে ইহাকে কার্য্যকরী করা দুষ্কর—কেননা, তাঁহারা এখনও উহা পাইতে সমর্থ হন নাই। বিহার, মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশের সরকারসমূহও ঐ সম্পর্কে তাঁহাদিগের নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন।

বাংলার সমবায় সমিতিগুলি বাংলা-সরকারের দোষে নষ্ট হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিও ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী। গ্রামের সমবায় সমিতিগুলির জমা টাকার অধিকাংশ ছিল মধ্যবিত্ত হিন্দুর এবং খাতকের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত নিরক্ষর কৃষক সমিতির ঋণের টাকা পরিশোধ করা কর্তব্য বোধ করে নাই এইজন্য যে উহাতে হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সুতরাং তাহার কোন দায়িত্ব নাই। ভেদনীতির এই প্রচারকর্তা ও প্রশ্রয়দাতারা তখন ভাবিয়া দেখেন নাই যে ইহাতে একবার মাত্র কতকগুলি হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিন্তু স্থায়ী ক্ষতি হইবে কৃষকের নিজের। ভবিষ্যতে সমবায় সমিতিতে টাকা রাখিতে হিন্দু স্বভাবতঃই ভয় পাইবে। মধ্যবিত্ত হিন্দুর সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করিয়া স্বীয় আর্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ লাভে মুসলমান কৃষক চিরতরে বঞ্চিত হইবে। শুধু মুসলমানের টাকায় সমবায় সমিতি কোথাও চলে নাই, চলা সম্ভব কি না বা কত দিনে সম্ভব বলা কঠিন। বাংলার সমবায় সমিতিগুলি পুনর্জীবিত না হইলে মুসলমান কৃষকের ঋণ প্রাপ্তির অন্তরায় যেমন কিছুতেই দূর হইবে না তেমনই শ্বেতাঙ্গ ও মারোয়াড়ী বণিকদের কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া পাটের ন্যায্য মূল্য পাওয়াইয়া দিবার ব্যবস্থাও কোন কালে হইবে না।

ভারত-সরকারের ফসল সংগ্রহের ব্যবস্থা

নয়া দিল্লীতে সরকারী খাদ্য-সম্মেলনের অধিবেশনে সর এডোয়ার্ড বেন্থল ও ভারত-সরকারের অন্যান্য পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের সহিত খাদ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মালগাড়ী সরবরাহ ও খাদ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান বৃদ্ধি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ঃ

"সমস্ত বৎসর যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে খাদ্যদ্রব্য চলাচল হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বৎসর যাহাতে অবিশ্রান্তভাবে খাদ্য (মৌলিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত) চলাচল হইতে পারে ও যান-বাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ যাহাতে নিয়মিতভাবে মালগাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহার জন্য একটি পরিকল্পনা গঠন করিবেন। যেরূপ সংখ্যক মালগাড়ী পাওয়া যাইবে, প্রাদেশিক সরকার ও সামন্ত রাজ্য-সমূহের সরকারগণ তাহার অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবেন ও অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য মজুত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।"

ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকারের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ সর-বরাহ ও মজুত রাখিবার ব্যবস্থা এখনও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। বিলাত হইতে মোটা বেতনে বিশেষজ্ঞ আমদানীর পরও এইসব দোষ দূর হয় নাই। গত বৎসরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষেও গবর্মেন্টের শিক্ষা হয় নাই, সারা বৎসর অবিশ্রান্ত ভাবে খাদ্য চলাচলের উপযুক্ত বন্দোবস্ত তাঁহারা আজও করিয়া উঠিতে পারেন নাই, এখনও উহার জল্পনাকল্পনাই চলিতেছে। খাদ্য মজুত রাখিবার যে বন্দোবস্ত গবর্মেণ্ট করিয়াছেন তাহার নমুনা বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। চাউল ডাইল গম আটা ময়দা কোনটিই সরকারী গুদামে বেশীদিন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে নাই। সম্প্রতি বাংলা-সরকার কর্তৃক সংগৃহীত চাউল বাংলার বাহিরে প্রেরণের যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল গুদামের অব্যবস্থাই তাহারও মূল কারণ ইহা মনে

করা অসঙ্গত নহে। বাংলা-সরকার এবার চাউল ক্রয়ের সময় চাউলের কলগুলির কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই ; উহাদের গুদামের সুযোগও তাঁহারা লইতে পারেন নাই। ঢেঁকি-ছাটা চাউলই তাঁহারা বেশী ক্রয় করিয়াছেন। কলে ছাঁটা চাউল অপেক্ষা ঢেঁকি ছাঁটা চাউল গুদামে রাখাও কঠিন, উহা সহজে খারাপও হইয়া যায়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বাংলা-সরকার যে ভাবে চাউল ক্রয় করিয়া বসিয়াছেন, এখন সেগুলি কাজে লাগানো এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর জোয়ালা-প্রসাদ শ্রীবাস্তব কেন্দ্রীয় পরিষদে বলিয়াছেন যে তিনি কলিকাতায় চাউল প্রেরণ রদ করিবার কথা বলিবার পরেও বাংলা-সরকার তাহাতে আপত্তি করে নাই। ভারত-সরকার কলিকাতাকে খাওয়াইবার দায়িত্ব অস্বীকার করিলে এই সুযোগে বাংলা-সরকার গুদামজাত পচা চাউল কাটাইতে পারিতেন, বাহবা ত মিলিতই।

খাদ্য সরবরাহে প্রাদেশিকতা

এই খাদ্য সম্মেলনেই সর জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলেন :

"খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সকল অবস্থায় একক-ভাবে গ্রহণ করা হইবে। দেশের কোন অংশ অপর অংশ সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিবে না। এই নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে যদি সদিচ্ছার ভাব থাকে, তাহা হইলে স্বতঃই বহু জটিল সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমি মনে করি।"

ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত করিবার পর প্রাদেশিকতা আমদানী ইংরেজ সরকারের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য কীর্তি। গত দুর্ভিক্ষে প্রাদেশিকতার কুফল দেশবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সকল অবস্থায় একক ভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। ভারত-শাসন আইনের বিধান পদদলিত করিয়া বিভিন্ন প্রদেশকে বাড়্তি ফসল রপ্তানীর উপর বাধানিষেধ আরোপ করিতে দেখিয়াও ভারত-সরকার নীরব রহিয়াছেন। ইহাদের এই কাজ বে-আইনী এবং নিয়মতন্ত্রবিরোধী বহু পত্রিকায় ইহা উল্লেখ করা সত্ত্বেও তাঁহারা ইহা বন্ধ করেন নাই। ভারত-শাসন আইনে আরও একটি বিধান আছে যে প্রাদেশিক বিরোধের সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইলেই আন্তঃপ্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হইবে। ভারত-সরকার তাহাও করেন নাই। প্রদেশগুলিকে একত্রিত হইয়া নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের সুযোগ দানেও যেন ভারত-সরকার কুণ্ঠিত। উহাদিগকে যত দূর সম্ভব পৃথক্ রাখিয়া পরস্পর বিরোধী করিয়া প্রাদেশিক মনোভাব বিস্তারই যেন তাঁহাদের মূল অভিপ্রায়। সর জোয়ালাপ্রসাদের উক্তি তাঁহার নিজস্ব সদিচ্ছার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু উহাকে সরকারী নীতি বলিয়া মনে করা ভুল হইবে।

লর্ড লিনলিথগোর নূতন চাকুরী

সাত বৎসর ভারতবর্ষের বড়লাটগিরি করিয়া দেশে ফিরিবার পর লর্ড লিনলিথগো ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ দেশে তাঁহার শাসনাধীনে ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল যে সব অতিরিক্ত ও অপ্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়াছিল, এই চাকুরী তাহারই প্রতিদান বলিয়া প্রকাশ্যে কথাও উঠিয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, লর্ড লিনলিথগো ঐ চাকুরী ছাড়িয়া বিলাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ার-ম্যানের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে লণ্ডনের 'সাণ্ডে পিকটোরিয়াল' যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি লিখিয়াছে : সাত বৎসর ভারতবর্ষে বড়লাটগিরি করিবার পর ১৯৪৩ সালে লর্ড লিনলিথগো ব্রিটেনে ফিরিয়াছেন। ভারতবর্ষকে যে অবস্থায় তিনি রাখিয়া আসিয়াছেন তাহাই তাঁহার কৃতিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। ভারতবাসীর বন্ধুত্ব তিনি অর্জন করিতে ত পারেনই নাই, উপরন্তু রাজনৈতিক নেতাদের বন্দী করিয়া জেলগুলিকে ভর্তি করিয়াছেন। ভারত ত্যাগের পূর্বে শেষ পর্য্যন্তও তিনি এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে তাঁহার পরবর্তী বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে ভারত-বাসীর অবস্থা একটুখানি ফিরাইয়া আনিবার শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টায় প্রাণপাত করিতে হইতেছে।

ভারতযাত্রার পূর্বে লর্ড লিনলিথগো বহু প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়াছেন কিন্তু একটিতেও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন জ্ঞান আছে, তাঁহার কর্মজীবনের সমগ্র ইতিহাস খুঁজিলেও এরূপ পরিচয় মিলিবে না। ব্যাঙ্ক অব স্কটল্যাণ্ডের ডিরেক্টর রূপে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন আশা করি ইহা তিনি নিজেও বলিবেন না।

ভারতবাসী এবং ব্রিটেনের সাধারণ লোকে লর্ড লিন-লিথগো সম্বন্ধে যাহাই কেন ভাবুক না, উচ্চপদ ও সম্মান লাভে বাধা তাঁহার কখনই হয় নাই। বিলাতের একজন লোকের পক্ষে নাইট অব দি থিস্‌ল এবং নাইট অব দি গার্টার এই উভয় সম্মান লাভ বিরল ; লর্ড লিনলিথগোর ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়াছে। শাসনকার্য্যে, বৃহৎ বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক পরিচালনে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এবং গবর্মেণ্টের কর্ণধার সাম্রাজ্যবাদী ধনিককুল এখনও তাঁহাকেই সর্বোচ্চ দায়িত্ব প্রদান করিতে চাহে।

চোরা-ব্যবসায়ীদের দণ্ড

ভারতবর্ষে চোরা-বাজারের ব্যবসায়ীরা ধরা পড়িলে তাহা-দিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবার প্রথা এখনও চলিতেছে। অর্থদণ্ড প্রথমটা লঘু হইতেছিল, কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা হাই-কোর্টের এক রায়ের পর হইতে উহার পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়াছে। কিন্তু অর্থদণ্ডের দ্বারা চোরা-বাজারের কারবার মন্দী-ভূত হইয়াছে, সরকারী প্রচার বিভাগও এ দাবী করিতে পারেন নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা যাহারা লাভ করিতেছে, দুই একবার ধরা পড়িয়া কয়েক শত বা কয়েক সহস্র টাকা দণ্ড দিয়া অব্যাহতি প্রাপ্তি তাহারা পুরস্কার বলিয়াই মনে করে। সম্প্রতি প্যারিসের এক সংবাদে জানা গিয়াছে, সেখানে তিন জন আমে-রিকান সামরিক বিভাগের সিগারেট চুরি করিয়া বিক্রয় করিবার অপরাধে ৪০, ৩০ ও ২০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। সামরিক সামগ্রী চুরি করিয়াই হউক আর অসামরিক দ্রব্যের বেলাতেই হউক, চোরা কারবার উভয়তঃই সমান নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয়। আমরা পূর্বেও লিখিয়াছি, চোরা কারবার যাহারা করে তাহারা সমাজের ঘোর শত্রু, কোন দয়া, কোন দাক্ষিণ্য তাহারা প্রত্যাশা করিতে পারে না। লঘু দণ্ড দানে ইহা-

দিগকে প্রকারান্তরে উৎসাহিতই করা হয়। কঠোরতম দণ্ডের বিধানই ইহাদিগকে সংযত করিবার একমাত্র উপায়। কোন নিরপরাধ ব্যক্তি যাহাতে দণ্ডিত না হয় এরূপ সুবিচারের বন্দোবস্ত করিয়া গবর্মেণ্ট চোরা কারবারিদিগের জন্য আমেরিকার আদর্শে দণ্ডবিধান করিলে অথবা আরব দেশের ন্যায় প্রকাশ্যে ইহাদিগকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিলে এই পাপ দূর হইতে পারে ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

সরকারী সঞ্চয়-অভিযানের নমুনা

ভারত-সরকার সম্প্রতি এক পক্ষ কালব্যাপী এক "সঞ্চয় অভিযানে"র আয়োজন করিয়াছিলেন। সরকারী সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের হাতের অতিরিক্ত অর্থ সরকারী ভাণ্ডারে টানিয়া আনিয়া ইনফ্লেশনের কুফল দূর করাই ছিল তাঁহাদের মূল লক্ষ্য। স্বাভাবিক অবস্থায় দেশে দুই বা আড়াই শত কোটি টাকার নোট বাজারে চলিলেই যথেষ্ট হইত, বর্তমানে উহার পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে হাজার কোটি টাকা। ফলে একদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের লাঞ্ছনা ও দুর্দশার চূড়ান্ত হইয়াছে, অপর পক্ষে অল্প কতকগুলি লোকের হাতে এত টাকা জমিয়া গিয়াছে যে ইহারা আজ চাউল, ডাইল, লবণ, কয়লা, সরিষার তৈল, কাপড় প্রভৃতি জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলি কোণঠাসা করিয়া দশ গুণ দরে উহা বেচিয়া কোটি কোটি টাকা লাভ করিতে সক্ষম। সরকারের এই সঞ্চয়-অভিযানে এই শ্রেণীর কোটিপতি লক্ষপতিদের নিকট হইতে কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই, কিন্তু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত যে-সব লোক অর্থাভাবে অর্ধাশনে কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে কি ভাবে "অতিরিক্ত" অর্থ আদায় হইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত যুক্তপ্রদেশের ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু প্রকাশ করিয়াছেন।

ঘটনাটি সংক্ষেপে এই : ১৬ই জানুয়ারী এলাহাবাদ জেলার এক গ্রামে সরযূপ্রসাদ নামক জনৈক ব্যক্তিকে স্থানীয় নায়েব তহশীলদার ডাকিয়া আনিয়া বলে যে তাহাকে ৫৫৲ টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট কিনিতে হইবে। সরযূপ্রসাদ আপত্তি করিয়া জানায় যে পূর্বে সে কিছু টাকার সার্টিফিকেট কিনিয়াছে আর বেশী টাকা দিতে সে অক্ষম। নায়েব তহশীলদার ইহাতে ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহার আদেশে নায়েব নাজির এবং দুই জন পিয়ন সরযূকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আটক করিয়া রাখে। শেষ পর্য্যন্ত লোকটি ১৫৲ দিতে স্বীকৃত হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ডাঃ কাটজু যুক্তপ্রাদেশিক গবর্মেণ্টের মারফতে উক্ত তহশীলদারকে জানাইয়াছেন যে অবিলম্বে সরযূপ্রসাদ নির্দ্দেশানুযায়ী কোন সাহায্য-ভাণ্ডারে দুই শত টাকা না দিলে তাহার নামে মামলা করা হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও ঘটনা জানান হইয়াছে।

ভাবী যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক

ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রদানকালে অধ্যাপক এ. ভি. হিল বলেন যে, অপর একটি যুদ্ধের হাত এড়াইবার প্রথম সোপান হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত বৈজ্ঞানিকদিগের সহযোগিতা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধ্বংস, নরহত্যা প্রভৃতিই হইবে ভবিষ্যতের উৎসব। এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা দরকার। সম্ভবতঃ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটি লণ্ডনে একটি সাম্রাজিক বৈজ্ঞানিক সম্মিলন আহ্বান করিবেন। ভারতের ও উপনিবেশসমূহের প্রায় ৬০ জন বৈজ্ঞানিক এই সম্মিলনে যোগদান করিবেন। এক্ষণে এই সম্মিলন সম্পর্কিত উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

অধ্যাপক হিল বলেন যে, "ভারত-সরকার খুব সম্ভবতঃ লণ্ডনে একটি ভারতীয় বিজ্ঞান-দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং দিল্লীতে প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ও অন্যান্য দেশে শাখা স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক কার্য্যাবলীর সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা করিবেন। বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও চিকিৎসা সম্পর্কিত সহযোগিতার ফলেই ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন সম্ভবপর বলিয়া আমার মনে হয়।"

অধ্যাপক হিলের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ কোন সঙ্ঘ গঠিত হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারী আওতার বাহিরে থাকা উচিত, নতুবা তাহার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে। এইজন্য ভারত-সরকার কর্তৃক লণ্ডনে ও দিল্লীতে বিজ্ঞান-দপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে আমরা উৎসাহ বোধ করিতে পারিতেছি না।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উপযোগিতা

নিখিল-ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত জীবরাজ মেটা ভারতবর্ষে ভেষজ দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ, অস্ত্রোপচারের জন্য যন্ত্রাদি নির্মাণ, চিকিৎসার জন্য নানাবিধ সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই সকল ব্যাপারে ভারতবর্ষ আদৌ দরিদ্র নহে। ভারতবর্ষে এমন সুযোগ আছে যে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিদেশে অনায়াসে রপ্তানি করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুতের বিরাট্ সম্ভাবনা রহিয়াছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে আমাদের দেশ যে যথেষ্ট লাভবান হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তাহার পূর্বে আয়ুর্বেদকে পুনর্বার জীবন্ত ও প্রগতিশীল করিতে হইবে।

কর্পোরেশনের টিকাবীজ

কলিকাতা কর্পোরেশনের বসন্তবীজ টিকার জন্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া বাংলা-সরকার এক সাবধানবাণী ঘোষণা করিয়া জানাইয়াছেন যে ১লা নবেম্বরের পর যাঁহারা কর্পোরেশনের বসন্তবীজের সাহায্যে টিকা লইয়াছেন তাঁহারা যেন অবিলম্বে পুনরায় সরকারী বীজের টিকা গ্রহণ করেন। এই সরকারী বিবৃতিতে কলিকাতার জনসাধারণ ও চিকিৎসকগণ সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। সরকারী ঘোষণার পরদিনই ভারতবর্ষের সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "১লা নবেম্বরের বিশেষ তারিখটি কেন বাছিয়া লওয়া হইয়াছে আমাদিগকে জানানও হয় নাই। আমার কেবল এইটুকু জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, যাহাদিগকে প্রাথমিক টিকা কি প্রাথমিক টিকার পর টিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সক-

লের উদ্দেশ্যেই এই সরকারী সতর্কবাণী ঘোষিত হইয়াছে কি না এবং টিকা উঠুক কি না উঠুক সকলেরই পুনরায় টিকা লইতে হইবে কি না? ১লা নবেম্বরের পর কর্পোরেশনের বসন্তবীজ সাহায্যে আমি অনেককে পুনরায় টিকা দিয়াছি এবং আমি নিজেও লইয়াছি। আমি জোর দিয়াই বলিতে পারি যে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার পুনরায় টিকা দান সফল হইয়াছে অনেক বেশী। আজ আমার কয়েকজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হইল; তাঁহারাও এই কথাই বলিলেন। ১লা নবেম্বরের পর কর্পোরেশনের বসন্তবীজে টিকা দেওয়া হইয়াছে এমন কতজনকে গবর্মেণ্ট পরীক্ষা করাইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কতজনেরই বা টিকা ব্যর্থ হইয়াছে বা কোন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে? তিন জন বিশেষজ্ঞের নাম দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে কর্পোরেশনের ল্যাবরেটরীতে টিকার জন্য বসন্তের বীজ গ্রহণের প্রণালীতে ত্রুটি আছে। তাঁহারা কর্পোরেশনের টিকার বীজ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা আমি কি ইহা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি? যদি তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তবে কি তাঁহারা উহা দুষিত দেখিয়াছেন, না ক্রিয়া হওয়ার অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন?"

ডাঃ বিধান রায়ের এই বিবৃতির কোন উত্তর বাংলা-সরকার দেন নাই। কয়েক দিন পরে কর্পোরেশনের সভায় কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল সরকারী বিবৃতি সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"লিম্ফ প্রস্তুত সম্পর্কে আইনগত যে পদ্ধতি আছে কর্পোরেশন বহু বৎসর ধরিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সেই পদ্ধতি পালন করিয়া আসিতেছেন এবং ফলে কর্পোরেশনের লিম্ফ সারা ভারতের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য লিম্ফ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কর্নেল প্যাসরিচার নিকট পরীক্ষার জন্য নমুনাস্বরূপ যে ১০০টি লিম্ফ পাঠানো হইয়াছিল কর্নেল প্যাসরিচা তাহা পরীক্ষা করিয়া গত ৩১শে জানুয়ারী যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে ঘোষণা করিয়াছেন যে আইন অনুসারে লিম্ফের গুণাগুণ বিচারের যে নির্দেশ দেওয়া আছে কর্পোরেশনের লিম্ফগুলি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কর্নেল প্যাসরিচার নিকট পরীক্ষার জন্য যে লিম্ফ পাঠান হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্বেই ১৯৪৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ডিরেক্টর মহাশয় কর্পোরেশনের সমস্ত 'পুরান লিম্ফ' ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করিয়া এক ফতোয়া জারি করিলেন। কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ও প্রধান কর্মকর্তা এই বেয়াড়া আদেশের প্রতিবাদ করিলে অকস্মাৎ গত ২৬শে জানুয়ারি ডিরেক্টর মহাশয় স্বয়ং কলিকাতার লেবরেটরীতে হাজির হইলেন এবং দায়িত্বশীল অফিসারদের অনুপস্থিতিতে যেমন তেমন ভাবে ৪টি লিম্ফ তুলিয়া লইয়া পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন—একবার জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজনও বোধ করিলেন না যে, উক্ত লিম্ফগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে কি না। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, লিম্ফগুলি অনুমোদিত মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। লিম্পগুলির গুণাগুণ ও বিশুদ্ধতার বিচারের যে কি ফল হইবে কর্পোরেশনের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বলিয়া প্রধান কর্মকর্তা লিম্পের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক এবং কমিটি যথারীতি পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন। কমিটি গঠিত হইল এবং গত ২রা ফেব্রুয়ারী কমিটি তদন্ত করিতে আসিলেন। কিন্তু কমিটির কার্য্যপ্রণালী দেখিলে মনে হয় যে কমিটির সদস্যগণ তদন্ত করিতে আসেন নাই, দোষ বাহির করিতে আসিয়াছিলেন। যে প্রকোষ্ঠে লিম্প রাখা হয় তাহার তাপ সর্বনিম্ন তাপ অপেক্ষাও কম কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া ডিরেক্টর মহাশয় তাপপরিমাপক যন্ত্রটি প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া লইলেন; সুতরাং তাপ-নির্দেশক যন্ত্রটি বাহির করিয়া লইলেই সর্বনিম্ন তাপের অপেক্ষা অনেক উপরে যে তাপ রেকর্ড হইয়া যাইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। তারপর যাঁহার একটুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তাপনির্দেশক যন্ত্র প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিলে তাহাতে যে তাপ নির্দেশ করিবে সেই তাপ কখনই প্রকোষ্ঠের ভিতরকার তাপ হইতে পারে না। এই বিষয়ে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং প্রস্তাব করা হয় যে, তাপ-নির্দেশক যন্ত্রটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে রাখিয়া টর্চ্চের আলোর সাহায্যে তাপের পরিমাণ করা হউক। অতঃপর তাহাই করা হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাপ-নির্দেশক যন্ত্রে পারা ২৮ ডিগ্রিতে থাকিলেও অর্থাৎ সর্বনিম্ন তাপের ৪ ডিগ্রি নীচে থাকিলেও তাপ ৩৮ ডিগ্রি অর্থাৎ সর্বনিম্ন তাপ অপেক্ষা ছয় ডিগ্রি বেশী হইল। অতঃপর রাতারাতি বিবৃতি প্রচারিত হইল যে, কর্পোরেশনের লিম্প ব্যবহার করা বিপজ্জনক এবং তাহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

আমি বলিতেছি এবং আমার উক্তি যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে কমিটির সদস্যগণ প্রতিবাদ করিতে পারেন যে কমিটির সদস্যগণ এই সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যে কর্পোরেশনের লিম্ফের পরীক্ষা অসন্তোষজনক বলিয়া প্রমাণিত না হইলে উক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইবে না। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য্য ডিরেক্টর মহোদয়ের সহিল না। কমিটির সদস্যদের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি ছাড়িয়া দিলেন। আমি এ কথা ঘোষণা করিতে সাহসী হইতেছি; কারণ, ডাঃ গ্রাণ্ট স্বয়ং পর পর দুই দিন—৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লেবরেটরি পরীক্ষা করিয়া স্বীকার করেন যে, যে প্রকোষ্ঠগুলিতে লিম্ফ রাখা হয় তাহা ঠিকই আছে এবং সমস্ত প্রকোষ্ঠই সর্বনিম্ন তাপেরও কম তাপ থাকে।"

শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পালের বক্তৃতার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা সাধারণতঃ স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোচনা করি না, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু বলা আবশ্যক। মাসখানেক পূর্বে কর্পোরেশনের বসন্তবীজের দ্বারা সম্পাদকের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব সহ মোট ২৩ জন টিকা লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৩ জনের ইহা প্রাথমিক টিকা। প্রায় সকলেরই টিকা বেশ ভাল ভাবে উঠিয়াছিল। যে ডাক্তার টিকা দিয়াছেন তিনি বসু বিজ্ঞান-মন্দির এবং অন্যান্য স্থানে প্রায় ৮০।৯০ জনকে টিকা দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৮০ জনের অধিক লোকের টিকা উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে, যখন ইউরোপের পূর্ব্বভাগ নিদারুণ শীতের প্রকোপে আড়ষ্ট, রুশ সমর-পরিষদ জার্ম্মানীর সহিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তির যুদ্ধের আরম্ভ করেন। সময়টা তাঁহারা এইরূপ ভাবে স্থির করেন যখন পূর্ব্ব-ইউরোপের জার্ম্মান, পোল এবং শ্লোভাকিয় সীমান্ত অঞ্চলের সকল নদনদী, জলাভূমি, ক্ষেত সব-কিছুই প্রচণ্ড শীতে জমিয়া পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সময়ে যুদ্ধশকট এবং সাঁজোয়া বহর বিনা সেতুতে বরফের উপর দিয়া নদী পার হইতে এবং পথঘাট ছাড়িয়া ক্ষেত-আবাদ, জঙ্গল-জলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে। আক্রমণ অতি দ্রুত ব্যাপক হইয়া পড়িল, সোভিয়েট প্রচণ্ডবেগে তাহার অতি বিরাট্ সেনাসমষ্টি এবং সাঁজোয়া-বহর দিগন্তব্যাপী কামান-শ্রেণীর অগ্ন্যুৎপাতের নীচ দিয়া চালিত করিল। পাঁচটি বিশাল বাহিনীতে প্রায় ৩০ লক্ষ সৈন্য, কয়েক অযুত কামান এবং প্রায় ১০ হাজার প্যান্‌জার শত্রুব্যূহ ছেদ করিয়া আগে চলিল। এই পাঁচটি বাহিনীর মধ্যে জেনারেল জুকভের প্যান্‌জার ডিভিশন-গুলি জার্ম্মান রক্ষাব্যূহ ছেদ করিয়া, দুর্গরক্ষিত অঞ্চলের পাশ কাটাইয়া সতেজে শত্রুর অন্তস্তল লক্ষ্য করিয়া আগে চলিল। যখন এই বাহিনী প্রায় দুই শত মাইল অতিক্রম করিয়া বার্লিন হইতে মাত্র ৪০ মাইল তফাতে পৌঁছায় সে সময় শীতের প্রকোপ কমিয়া হঠাৎ বরফ গলিতে আরম্ভ করে, যাহার ফলে সাঁজোয়া-বাহিনী ও প্যান্‌জার ব্রিগেডগুলির চলাচলের বিশেষ বাধা উৎপন্ন হয়। ইতিমধ্যে সোভিয়েটের পদাতিক ও বৃহৎ কামানের গোলন্দাজ দলগুলি অনেক পিছনে পড়িয়া যায় যাহার ফলে যে-সকল জার্ম্মান দলকে পাশে ফেলিয়া জুকভের প্যান্‌জার ব্রিগেডগুলি আগে চলে তাহাদের অনেকগুলিও যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্গ ও সুরক্ষিত ঘাঁটিতে আসিয়া একত্রিত হইতে পারে। সাধারণ হিসাবে ভিষ্টুলা নদের অল্প অংশ এবং ওডর নদীর দীর্ঘ আঁকাবাঁকা রেখা দুই পক্ষের সীমানা হইয়া দাঁড়ায়। উত্তরে বল্টিক অঞ্চলে সোভিয়েট দল বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং হাঙ্গেরীতেও কার্পেথিয় অঞ্চল দু'টিতেও জার্ম্মান দলের রক্ষাব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয় নাই। পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রুশিয়ার সন্ধিস্থলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে আরম্ভ হয় কিন্তু সকল বাধা ঠেলিয়া রুশ-সেনা ক্যনিগসবের্গ ও ফ্রাঙ্কফোর্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময়ে তুষার গলিতে আরম্ভ হওয়ায় রুশ দলের গতিবেগ হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং জার্ম্মান দল অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর পাওয়ায় জার্ম্মানীর ভিতর হইতে সৈন্য ও সাঁজোয়া-বাহিনী আনিয়া দেশ রক্ষার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয়।

এখন পূর্ব্বাঞ্চলের প্রায় ৪০০ শত মাইল জুড়িয়া সোভিয়েট সেনা আক্রমণ চালাইতেছে কিম্বা চালাইবার উদ্যোগ করিতেছে। জার্ম্মান দল এখন অধিকাংশ অঞ্চলেই দুর্গমালা বা রক্ষী-বেষ্টনের বাহিরে উন্মুক্ত সমরাঙ্গনে দাঁড়াইয়া লড়িতেছে। এই হিসাবে সোভিয়েটের চালের প্রথম অংশ সম্পূর্ণ ভাবে সফল হইয়াছে, কেমনা, এইরূপ অবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ—যথা জার্ম্মান দল—অতিশয় হীন পরিস্থিতিতে থাকে। এই অবস্থা আরও নিদারুণ সঙ্কটজনক হইতে পারে যদি বিপক্ষের প্যান্‌জার ও সাঁজোয়া-বাহিনীগুলি রক্ষীদলের বহু পিছন পর্য্যন্ত বর্শার মত ভেদ করিয়া হঠাৎ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে (fanning out)। ঐরূপ চালে রক্ষীদিগের মালরসদ ও সাহায্যকারী সেনা আনিবার পথঘাট আক্রান্ত ও কর্ত্তিত হয় এবং নূতন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের অভাবে তাহারা দ্রুত নিস্তেজ ও নির্ম্মূল হইয়া যায়। জার্ম্মানীতে জুকভের বাহিনী শত্রুর মর্ম্মস্থল ভেদ করার চেষ্টায় সৈন্যধ্বংসের পর্ব্ব আরম্ভ করে নাই, সুতরাং ঐ অবস্থা এখনও সেখানে আসে নাই।

এখন পূর্ব্ব ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা প্রধানতঃ দ্রুত সমরসজ্জার ব্যাপার। সচল গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া-বাহিনীর তীব্রবেগে আক্রমণ স্থগিত হইয়াছে এবং তাহার বদলে প্রকৃত শক্তি-পরীক্ষার আয়োজন চলিতেছে এবং তাহা আরম্ভ হইবার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। এই শীত অভিযানের ফলে এখন পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর লোকবল এবং অস্ত্রবল কতটা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সঠিক জানা যায় নাই, সুতরাং তাহার বর্ত্তমান ক্ষমতার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। যাহাই হউক অনেক ক্ষতির ফলে এখন জার্ম্মানীর শক্তি-সামর্থ্য পরিমাণে কম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরন্তু সোভিয়েট এই দ্রুত এবং অতি প্রবল আক্রমণের ফলে জার্ম্মান রক্ষা-ব্যবস্থায় অশেষ গোলযোগ বাধাইতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং আসন্ন শক্তি-পরীক্ষায় রুশ দলের পরিস্থিতি গরিষ্ঠ। জার্ম্মানীর দিকে দুইটি জিনিষ এখনও আছে, তাঁহা জার্ম্মান সমর-পরিষদের যুদ্ধ-ব্যবস্থায় সংযুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব এবং দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মান জনসাধারণের যুদ্ধ চালাইবার ইচ্ছা। এই দুইটি পরস্পর সংযুক্ত ব্যাপারে ভাঙ্গন না ধরিলে ইউরোপের যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত বেশী দিন চলিতে পারে। বর্ত্তমানে 'তিন মাতব্বরের পরামর্শ' যাহা চলিতেছে তাহার উপর এ বিষয় অনেকটা নির্ভর করিতেছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বুঝা যাইবে যে সোভিয়েট কেবলমাত্র অস্ত্রবলে জার্ম্মান যুদ্ধশক্তিকে ধ্বংস করিতে পারিবে কিনা। যদি সে ভাবে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব হয় তবে তাহা বসন্ত কালের মধ্যেই ঘটিবে, নহিলে আরও অনেক দিন লাগিবে। এই পূর্ব্ব ইউ-রোপের বর্ত্তমান রুশ অভিযান শেষ নিষ্পত্তির অভিযান, ইহাতে কোন পক্ষেরই কোন শক্তি গচ্ছিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। জার্ম্মানী ভাঙ্গিলে একেবারেই ভাঙ্গিবে, আবার জার্ম্মানী যদি শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত লড়িবার মতলবে বদ্ধপরিকর থাকে তবে আসন্ন পরীক্ষায় তাহাকে না পাড়িয়া ফেলিতে পারিলে রুশের পক্ষেও দ্বিতীয় অভিযান গঠন সহজ হইবে না, কেমনা, এই অভিযানেই সোভিয়েট সমর-পরিষদ তাহার সকল শক্তি প্রায় শেষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতেছেন মনে হইতেছে।

ইউরোপে আরও দুইটি প্রান্তে ইটালী ও ফ্রান্সে যুদ্ধ যে ভাবে চলিতেছে তাহাতে সে দিকে দ্রুত নিষ্পত্তির কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। অবশ্য এই দুই প্রান্তে অনেক জার্ম্মান সৈন্য এবং জার্ম্মান সেনানায়কের মধ্যে অতি বিচক্ষণ দুই

ব্যস্তি ব্যস্ত রহিয়াছে। তবে আমেরিকান সৈন্ত এখনও কোথায়ও সেরূপ ব্যাপক আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হয় নাই, ব্রিটিশ সৈন্তও প্রায় ঐরূপ স্থানবদ্ধ। এই জন্ত দুই প্রান্তে যুদ্ধের ভার বিশেষ ভাবে বাড়িলে রুশ সেনার কাজ অনেকটা সরল হইয়া যায় কিন্তু রুণ্ডষ্টেডের তিন সপ্তাহ ব্যাপী "সীমাবদ্ধ অভিযান" আইসেন-হাওয়ারের সমর-ব্যবস্থায় অনেক বাধার উৎপত্তি করিতে সমর্থ হয়—এবং বেশ কিছু ক্ষতিও করিয়াছে—যাহার ফলে ফ্রান্সের সীমান্তে যুদ্ধের গতি দ্রুততর বা প্রবলতর হইতে সময় লাগিবে। উপরন্তু ঐ অঞ্চলের দুর্গমালা এখনও জার্মান রক্ষী দলকে আশ্রয় দিতে সমর্থ। সুতরাং জার্মানীতে দ্রুত ভাঙ্গন ধরিতে পারে পূর্ব্বদিক হইতেই এবং তাহা নির্ভর করিতেছে সোভিয়েট সমর-পরিষদের যুদ্ধ চালনার পটুতার উপর এবং ক্ষমতার উপর। সময় এখন অতি মূল্যবান, কেননা, বরফ আরও গলিলে জার্মান সমর পরিষয় আরও অবসর পাইবে এবং জার্মানীতে লোক-বলের বা অস্ত্রবলের অভাব হইতে পারে কিন্তু যুদ্ধকৌশলের অভাব নাই। তাহার শেষ পরিচয় আমরা পাইয়াছি বিগত ডিসেম্বরের উত্তরার্দ্ধের "সীমাবদ্ধ অভিযানে"। এখন ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে জার্মানী এরূপ অবস্থায় সৈন্তক্ষয় ও বলক্ষয় স্বীকার করিয়াও ঐরূপ আক্রমণ কেন চালাইয়াছিল।

ইউরোপে মিত্রপক্ষ এখন জয়লাভের অতি নিকটে পৌঁছি-য়াছে। এমত অবস্থায় প্রতিপদে অতি বিচক্ষণ ভাবে যুদ্ধের প্রত্যেকটি চাল চালনা প্রয়োজন। জার্মানী এখনও হতাশ হয় নাই তাহার কারণ ইতিপূর্ব্বে সম্মিলিত জাতীয় দলের যুদ্ধ চালনায় অনেক ভুল হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট এখন বিষম মূল্যে অভিজ্ঞতা ক্রয় করিয়া বিচক্ষণ হইয়াছে এবং সেই অভিজ্ঞ-তার বলেই সে জার্মানীরই উপর জার্মান "ঝটিকাযুদ্ধ" চালাই-য়াছে। সোভিয়েট ঝটিকাযুদ্ধ রোধ করিয়াছিল নিদারুণ ক্ষতি স্বীকারে এবং দেশের অসীম ভূমির বিনিময়ে। জার্মানীর পক্ষে ঐ দুই ব্যাপারই অসম্ভব, সুতরাং এখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহাতে শেষ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা খুবই রহি-য়াছে এবং সে কথা জার্মানী যথেষ্টই জানে। এইসব দিক বিচার করিয়া মনে হয় এই যুদ্ধে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ভীষণতম ধ্বংসপর্ব্ব দেখা যাইবে। যদি তাহা না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে যুদ্ধ এখন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চলিয়া যাইতেছে।

লিখিবার সময় পর্য্যন্ত (২৮শে মাঘ) যে সকল খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় বার্লিনের যুদ্ধ আসন্ন। পশ্চিমে হলাণ্ড ও আলসাস অঞ্চলে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সেনাবাহিনী আক্রমণের পরিমাণ ও গতি বাড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা করি-তেছে। হলাণ্ডে ব্রিটিশ সৈন্ত বহুদিন প্রায় স্থির হইয়া থাকিবার পর ক্ষুদ্র সীমার ভিতর তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, যদিও সময় হিসাবে এখন ঐরূপ আক্রমণের সুবিধার কিছুই নাই এবং আমেরিকান সেনাও তাহাদের সংঘর্ষগুলিকে ব্যাপক সংগ্রামে দাঁড় করাইবার যেভাবে চেষ্টা করিতেছে তাহাতে মনে হয় এখন যুদ্ধটাই মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ এখন যত বেশী জার্মান সেনাকে ব্যস্ত ও বিব্রত রাখা যায় ততই ভাল, সঙ্গে সঙ্গে জমি হিসাবে লাভ হয়ত ভালই না হইলেও যুদ্ধটাই লাভ। ওদিকে পূর্ব্বাঞ্চলে কোনিয়েভ ও জুকোভ তাঁহাদের বাহিনীগুলির গতিযুদ্ধের বাধা সরাইবার জন্ত যুগপৎ প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ এবং প্যান্জার চালন আরম্ভ করিয়াছেন। জার্মানী ইতিমধ্যে যেটুকু অবসর পাইয়াছে তাহার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়াছে, সুতরাং বার্লিনের যুদ্ধের মুখ যে দিকেই ফিরিবে সেদিকেই ঘোর রণ চলিবে। ছিদ্রপথে রন্ধ্রপথে আগাইবার সুবিধা আর নাই এবং সেইজন্তই ব্রিটিশ ও আমেরিকান সেনার পশ্চিমে যত দূর সম্ভব চাপ দেওয়া প্রয়ো-জন। জার্মানীর এখন শিয়রে সংক্রান্তি, তবে হারজিতের শেষ নিষ্পত্তি এখনও ভবিষ্যতে—যদিও সেটা এখন নিকট।

সুদূর পূর্ব্বে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে। লুজন দ্বীপের আমেরিকান অভিযান এখন ক্রমেই পরিমাণ ও পরিসরে বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল সংঘর্ষ—কোথাও বা খণ্ডযুদ্ধ—চলিতেছিল, সেগুলিকে অভিযান আখ্যা দেওয়া চলিত কেবলমাত্র তাহাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া। প্রথমে লেইট দ্বীপে আধুনিক সমররীতিতে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং এখন ফিলিপিন দ্বীপমালায় জাপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের প্রথম অংশ চলিতেছে। ইহাও গঠনমূলক পর্ব্ব অর্থাৎ মূল অভিযানের অপরিহার্য্য এবং অত্যাবশ্যক কয়েকটি অঙ্গ এখানে গঠিত হইতেছে। ঠিক যেমন "বর্ম্মা-রোড" স্বাধীন চীনের যুদ্ধচালনার প্রতি অংশের সহিত সাংঘাতিক ভাবে জড়িত সেইরূপই ফিলিপিন দ্বীপমালার সহিত চীনের মহাদেশ অঞ্চলের জাপান-বিরোধী অভিযানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকট। ফিলিপিন প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিন "সেতুবন্ধ" পর্ব্বের প্রধান স্তম্ভ, এইখানেই জাপান-বিরোধী মূল অভিযানের উদ্যোগ-পর্ব্বের শেষ এবং মহাসমরের এশিয়াখণ্ডের আরম্ভ।

লুজনের যুদ্ধ ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। জাপানী উচ্চতম রণনায়কের উদ্দেশ্য এখনও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাই-তেছে না, তবে এখনও যে লুজনের অধিকার লইয়া চরম সংঘর্ষের আরম্ভ হয় নাই তাহা দেখাই যাইতেছে। এতাবৎ জাপান কেবলমাত্র মার্কিন সেনাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সংবদ্ধ ভাবে বাধা দানের কোনও চিহ্ন দেখা যায় নাই। এমন কি মানিলা অধিকারেও জাপানের প্রতিরোধ-চেষ্টা স্থানীয় রক্ষী-সৈন্তের ক্ষমতার সীমায় আবদ্ধ আছে। জাপান অভিযানের অন্ত প্রান্তেও প্রায় এই প্রকার ব্যবস্থাই রহিয়াছে। জাপান কোথাও সবলে সেনা চালনা করিয়া মুক্ত সমরাঙ্গনে নিষ্পত্তির উদ্যোগ করে নাই। সকল ক্ষেত্রেই স্থানীয় রক্ষী-সেনা মরণ-পণ প্রতিরোধ-চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, তাহাদের সাহায্যে নূতন সৈন্ত প্রেরণের কোনও ব্যবস্থা দেখা যায় না। জাপান এখনও আরও সময় চায়—তাহার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে সে যে বসিয়া কালক্ষয় করিতেছে সে কথা ভাবিবারও কারণ নাই। দক্ষিণ-চীনে যে নূতন আক্রমণ চলিতেছে, তাহা সফল হইলে "বর্ম্মা-রোড" মুক্ত হওয়ার লাভ আরও অনেক কমিয়া যাইবে। জাপানের এই আক্রমণের ফলে দক্ষিণ-চীন রেলপথের সহিত ইন্দোচীনের রেলপথগুলির সংযোগ স্থাপিত হইলে এশিয়ার মহাদেশ অঞ্চলে যুদ্ধ চালনার এক নূতন ব্যবস্থা জাপানের আয়ত্তে আসিবে। সুতরাং এশিয়ায় এখন সময় কাহারও পক্ষে নাই।

প্যারা-সৈনিক চিম্‌নি

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়ের উপরে একস্থলে কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড পরস্পরের গাত্রে অল্পবিস্তর সংলগ্ন ভাবে অবস্থিত। মনে হয় যেন উন্মাদ কল্পনার আবেগে কোন এক দানব-শিল্পী কিছু একটা গড়িয়া তুলিতে গিয়া নির্মাণ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে। এই দানবীয় কক্ষের তিন পার্শ্বের দেওয়াল দৈর্ঘ্যে একে অপরের সহিত অসমান হইলেও তাহাদের ভিতর দিয়া যাতায়াতের কোন সহজ অতিক্রম্য পথ নাই। দেওয়ালের গাত্রে শিলাখণ্ডগুলির আকার-বৈষম্যের ফলে বহুসংখ্যক ছোট-বড় গুহার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার কোন কোনটি মানুষের বাসের উপযুক্ত। চতুর্থ পার্শ্বের দেওয়ালটি নাই বলিলেই চলে। চিম্‌নির দলের সেনানীরা এই স্থানটি অধিকার করিয়া নিজেদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কোথাও অস্ত্র-সরঞ্জামের ভাণ্ডার, কোথাও খাদ্য অথবা ঔষধাদি রক্ষিত, কোথাও বা কয়েকটি গুহার মধ্যে সেনানীরা শয্যা বিস্তার করিয়া শয়ন-কক্ষ রচনা করিয়াছে। এইরূপ একটি গুহার অভ্যন্তরে চিম্‌নি অজয় ও অপর তিন-চার জন প্যারা-সৈনিক নিদ্রা যাইতেছিল।

চিম্‌নি স্বপ্ন দেখিতেছিল যে কলিকাতার ময়দানে ফুটবল খেলা হইতেছে। ভীষণ ভীড় ও হট্টগোল। এক জন খেলোয়াড় বলটাতে পদাঘাত করিতেই বলটা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমশঃ আকারে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে হইতে শোঁ শোঁ আওয়াজ করিয়া দ্রুতগতিতে সুদূর আকাশে মিশাইয়া গেল। কে যেন চিৎকার করিয়া উঠিল "গোল, গোল"। অমনি সহস্র কণ্ঠে বিকট নিনাদে "গোল, গোল" শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। চিম্‌নি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল অজয় নিদ্রা হইতে উঠিয়া গান ধরিয়াছে, "আহা জাগি পোহাল বিভাবরী; অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী"। আর একজন বলিল, "থাম্ না বাবা; এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর শুয়ে ক্লান্ত নয়ন, না ক্লান্ত তবিয়ত।"

"ক্লান্ত 'তবিয়ত' মানে ?"

"তবিয়ত মানে জানিস না ? হিন্দুস্থানী কথা। সর্ব্বার্থ বাচক শব্দ। 'এথি'র মত। জিনিস কিনতে চাস; 'এথি' নেই, মানে পয়সা নেই। লোক ঠেঙ্গাতে চাস, 'এথি' নেই, মানে লাঠি নেই, বিবাহ সভায় গিয়ে টোপর পরে বসেছিস, 'এথি' নেই, মানে বউ নেই। তেমনি পেট খারাপ হলে 'তবিয়ত' মানে পেট। মাথা ধরলে 'তবিয়ত' মানে মাথা। পায়ে ফোস্কা পড়লে 'তবিয়ত' মানে ঠ্যাং। এ ক্ষেত্রে শক্ত পাথরের উপর 'গ্রাউণ্ড শীট' পেতে শুয়ে 'তবিয়তে' ব্যথা হয়ে গেছে, মানে…"

"থাক্ আর মানে শুনে দরকার নেই। তার থেকে যাও, ঘুম থেকে উঠে অবধি পেটে কিছু পড়ে নি। 'এথি' নিয়ে এস গিয়ে।"

চিম্‌নি জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, বলটা আকাশে উড়ে গেল, ত 'গোল, গোল' করে চেঁচিয়ে উঠল কেন ? আকাশে কি করে গোল হ'ল ?

অজয় বলিয়া উঠিল, "এই রে ক্ষেপে গেছে। নির্ঘাত ক্ষেপে গেছে। এই চিম্‌নি, কি আবোল-তাবোল বকছিস ? আকাশে গোল কি রে ? আকাশ ত তিন কোণা আর তেবড়া। জিয়োগ্রাফিতে পড়িস নি ? গোল কি রে ?"

চিম্‌নি বলিল, ধ্যেৎ। "আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।"

"ওঃ স্বপ্ন দেখছিলে ? ব্যাটা আমার সোনার 'এথি'। যাও ত বাবা ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানি হাঁটি হাঁটি করে ঐ দিক থেকে ছোট্ট হাতের দুমুঠো বিস্কুট তুলে আন ত। 'তবিয়ত' চোঁ চোঁ করছে।"

চিম্‌নি বলিল, "আমায় যদি না দেয় ?" "দেবে না আবার, আলবাৎ দেবে। যা না বল্ গিয়ে 'এথি' সাহেবের অর্ডার।" চিম্‌নি উঠিয়া চলিল।

কয়েক মিনিট পরে চিম্‌নি একটা বস্তা কাঁধে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অজয় চিৎকার করিয়া উঠিল, "এই থলের মধ্যে কি রে ? বললাম বিস্কুট নিয়ে আয়; না গিয়ে এক বস্তা আটা না চাল নিয়ে এল। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।"

"বা রে! বিস্কুটই ত নিয়ে এলাম। তুই ত বললি বিস্কুট। আমি গিয়ে জিগ্যেস করলাম বিস্কুট কোথায়। বললে ঐ থলেতে আছে। আমি উঠিয়ে আনলাম। জিগ্যেস করলে 'এই কাঁহা লে যাতা।' বললাম এথি সাহেবের অর্ডার, ত ছেড়ে দিলে। হাঁ রে, এথি সাহেব কে। নতুন কোনো অফিসার বুঝি। তোদের এত বিস্কুট দিয়ে দিলে। খুব ভাল সাহেব ত।"

সকলে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠাতে চিম্‌নি অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "য্যাঃ তামাশা করছিস বুঝি।"

অজয় বলিল, "না না, তামাশা করব কেন ? তামাশা সুরু হবে এক থলে বিস্কুট সমেত ধরা পড়লে। এরোপ্লেন ছাড়া মাল আসবে না তাই হুকুম খুব কম কম খাওয়ার আর তুই গিয়ে দশ দিনের খোরাক তুলে আনলি।"

চিম্‌নি বলিল, "তুই ত বললি, এথি সাহেব অর্ডার দিয়েছে।

সকলে চিম্‌নির কথার উত্তর না দিয়া বিস্কুটগুলি পৃথক পৃথক পুঁটুলি বাঁধিয়া নানান খাঁজে খোঁজে লুকাইয়া ফেলিতে লাগিল। চিম্‌নি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল।

অতঃপর সকলে বসিয়া কোকো ও বিস্কুট খাইয়া একটু আরাম করিবে বলিয়া বসিয়াছে এমন সময় কোঁ কোঁ করিয়া একটা বাঁশী বাজিয়া উঠিল। হাওয়াই আক্রমণের সঙ্কেত বুঝিয়া সকলে তীব্র গতিতে ব্যবস্থা মত ছদ্মবেশের জাল প্রভৃতি এ দিক ওদিক টানিয়া মাল-মশলা ঢাকা দিয়া নানান দিকে লুকাইয়া পড়িল। হুকুম ছিল শত্রুপক্ষ বোমা বর্ষণ করিলেও কোন প্রকার প্রত্যাক্রমণের চেষ্টা করা হইবে না। শত্রুকে যথাসম্ভব নিজেদের আশ্রয়স্থল জানিতে না দেওয়াই উদ্দেশ্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনতিঊর্দ্ধে কয়েকটি শত্রু-বিমান দেখা গেল। তাহারা বোমা না ফেলিয়া শুধু ইতস্ততঃ যন্ত্র-বন্দুকের গুলি বর্ষণ করিয়া ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল। যে স্থলে ভারতীয় প্যারা-সৈনিক দল আস্তানা করিয়া ছিল সে দিকে

কোন গুলিগোলা সৌভাগ্যক্রমে বর্ষিত হইল না। "অল ক্লীয়ার" সঙ্কেত পাইলে পর সকলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে আসিয়া জটলা আরম্ভ করিল। শীঘ্রই কিন্তু আদেশ আসিল যে শত্রুপক্ষ এই আস্তানার কোন খবর পাইয়াছে কি না তাহা না জানা অবধি সকলে অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। তৎক্ষণাৎ পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে কামান ও যন্ত্র-বন্দুকের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ও পরিখাসমূহে অতিরিক্ত সৈনিক পাঠান আরম্ভ হইল। চিম্‌নি ও অজয় আরও তিন-চার জন সৈনিকের সহিত একটা যন্ত্র-বন্দুকের কেন্দ্রে প্রেরিত হইল। সেখানে তিনটি যন্ত্র-বন্দুক বসান হইয়াছিল। আশেপাশে ঘনপল্লব বৃক্ষমালা বর্ত্তমান থাকায় অতি নিকটে না আসিলে বুঝিবার উপায় ছিল না যে সে-স্থলে শত্রু নিপাতের অত সরঞ্জাম রক্ষিত আছে। সকলে চুপ করিয়া নিজ নিজ স্থানে বসিয়া। ধূমপান অথবা কোন্ প্রকার আওয়াজ করা বারণ। ফিসফাস করিয়া ও ইসারায় কথা বলা চলে কিন্তু প্রাণ খুলিয়া গল্পগুজব করা অসম্ভব।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সকলে এই প্রকার চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া কাটাইল। হঠাৎ প্রায় দুই তিন শত গজ দূরে কতকটা ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়া জন চার-পাঁচ লোক বাহির হইয়া আসিল। এই স্থলে যে সেনানায়ক ছিল সে সঙ্কেতে সকলকে গুলি চালাইতে প্রস্তুত হইতে বলিল; কিন্তু যখন ঐ লোকগুলির পশ্চাতে আর কেহ আসিল না তখন ইসারায় গুলি বর্ষণ স্থগিত রাখিতে বলিল। সাত-আট জন সৈনিককে বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া অনুসরণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া সে আস্তে আস্তে অতি নিঃশব্দে গুড়ি মারিয়া উক্ত লোকগুলির আগমন-পথের পাশ কাটাইয়া একটা ঘনবৃক্ষ কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল। সঙ্গীনধারী সৈনিকগণও তাহার পশ্চাতে তাহারই অনুকরণে আগাইয়া চলিল। অনতিবিলম্বেই তাহারা যন্ত্র-বন্দুক কেন্দ্র হইতে পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে গিয়া আত্মগোপন করিয়া ওৎ পাতিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শত্রুপক্ষের লোকগুলি তাহাদের প্রায় গায়ের উপর দিয়া অসন্দিগ্ধ চিত্তে যন্ত্র বন্দুকের আস্তানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা সঙ্গীনধারী সৈনিকদিগকে পার হইয়া যখন আরও দশ-বার গজ আগাইয়া আসিয়াছে তখন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে তীব্র গতিতে সঙ্গীনধারীরা তাহাদের আক্রমণ করিল। এক ব্যক্তি কিছু বুঝিবার পুর্ব্বেই সঙ্গীন বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল ও অপর তিন-চার জন দ্রুত পদে যন্ত্র-বন্দুক কেন্দ্রের উপরে আসিয়া পড়িল। সম্মুখে শত্রু ও পিছনে শত্রু দেখিয়া তাহারা হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া গেল। তৎপরে যুদ্ধচেষ্টা একান্ত বিফল হইবে জানিয়া হস্তের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে'এক জন চিম্‌নিকে বলিল, "সবকটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল।" চিম্‌নিও এক লম্ফে একখণ্ড রজ্জু লইয়া তাহাদের সকলকে একত্রে জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। মনে হইতে লাগিল যেন বহু মুণ্ড ও অবয়ব-সম্পন্ন এক অতিকায় রাক্ষসকে বন্দী করা হইয়াছে। সেনানায়ক চিম্‌নিকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল বন্দিগণকে পৃথক পৃথক করিয়া বাঁধিতে। চিম্‌নি পুনর্ব্বার "আগে বল্‌লেই হ'ত আলাদা আলাদা" বলিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বন্ধনে বন্দী করিল।

লোকগুলাকে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া সকলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় চুপ করিয়া অজানার প্রতীক্ষায় নিযুক্ত হইল। আরও দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সেনানায়ক চিম্‌নি ও আর দুই জন সৈন্যকে বলিল পর্ব্বত অভ্যন্তরস্থ ঘাঁটি হইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিতে। তাহারা নিশব্দে চলিয়া গেল ও আধ ঘণ্টা পরে টিনজাত খাদ্য-দ্রব্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। কোন প্রকার আগুন জ্বালা এখন বারণ, তাই গরম খাবার কিছু জুটিল না। সকলে পালা করিয়া খাওয়া ও পাহারায় আরও কিয়ৎকাল যাপন করিল। একজন সংবাদবাহক সৈন্য আসিয়া জানাইয়া গেল যে দুই এক স্থানে অল্প অল্প শত্রু দেখা গিয়াছে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই গুলি চালাইতে হয় নাই। নয় ত তাহারা কাহাকেও না দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে অথবা নিঃশব্দ আক্রমণে হতাহত বা বন্দী হইয়াছে। অতঃপর আদেশ এই যে বিভিন্ন কেন্দ্রের সেনানায়কগণ ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত কিছু কিছু লোক পাঠাইয়া এদিক ওদিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই সকল লোক কোন অবস্থাতেই অযথা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। যথাসম্ভব আড়ালে থাকিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া আসিবে। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে যত দূর সম্ভব অল্প গোলমালের সৃষ্টি করিয়া শত্রু নিপাত করিবে। পলায়ন করিতে হইলে নিজেদের আস্তানার দিকে পলাইয়া আসিবে না। শত্রু যাহাতে ভুল বুঝে সেই মত উল্টা দিকে গমন করিয়া দূরে পলাইয়া থাকিয়া রাত্রিকালে ছাউনিতে ফিরিয়া আসিবে।

অজয়, চিম্‌নি ও আরও তিন-চার জন সৈন্য এই অনুসারে যন্ত্র-বন্দুক-কেন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। মৃদু কণ্ঠে বাক্যালাপ চলিতে লাগিল এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া সকলে চলিতে লাগিল। পর্ব্বতের সানুদেশে একটা নালার মত ছিল। তাহারা সেই নালা বাহিয়া ক্রমশঃ পর্ব্বত হইতে দূরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাইল দুই চলিলে পর একটা বাঁক ঘুরিতেই দেখা গেল বিস্তৃত একটা সমতল ভূমি ও তাহাতে চার-পাঁচখানা বিমান অবস্থিত। সকলে নিমেষে গা-ঢাকা দিয়া দেখিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে আরও দুই-একখানা বিমান বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া সেইখানে অবতীর্ণ হইল এবং তাহা হইতে দুই-তিন জন করিয়া বৈমানিক অবতরণ করিয়া কিছু দূরে অপরাপর বৈমানিক-দিগের সহিত মিলিত হইল। আরও কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর দেখা গেল যে আর বিমান আসিল না। তখন এই সকল সৈনিক গোপনে নিজ আস্তানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেখানে পৌঁছিয়া বিমান-কেন্দ্রের খবর দিতেই এক ব্যক্তিকে অবিলম্বে সেনাপতির নিকটা পাঠাইয়া দেওয়া হইল যে শত্রুরা এইরূপ একটা বিমানের সমাবেশ করিয়াছে।

গভীর রাত্রে খবর আসিল এক বিশেষ সৈন্য দল পাঠাইয়া ঐ বিমানগুলিকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। জন ত্রিশ সৈনিক যন্ত্র-বন্দুক প্রভৃতি লইয়া দক্ষিণ দিক হইতে সশব্দে একটা আক্রমণ আরম্ভ করিবে এবং বিমানরক্ষী শত্রুদল যখন সেই আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকিবে সেই অবসরে আরও

জন কুড়ি সৈনিক বোমা ইত্যাদি সহকারে উত্তর দিকের নালা হইতে বহির্গত হইয়া তীব্র আক্রমণে বিমানগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। অজয় গেল দক্ষিণের বাহিনীর সহিত এবং চিম্‌নি রহিল উত্তর দিকের দলে।

ধীরে ধীরে সৈনিকবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। দক্ষিণ বাহিনীকে অধিকতর পথ অতিক্রমের সময় দিবার জন্য উত্তরের দল নালাটার নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আগাইয়া চলিল। প্রায় আধ-ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া উত্তর দিকের সৈনিকেরা নালা ছাড়িয়া সমতল ভূমির উপর উঠিয়া সরীসৃপের ন্যায় মাটির সহিত দেহ সংলগ্ন রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বিমানগুলির নিকটে আসিয়া যাওয়া যাহাতে আক্রমণ আরম্ভ হইলে বিমানগুলি লইয়া শত্রু পলাইতে না পারে। ক্রমশঃ তাহারা বিমানগুলির দুই-তিন শত গজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। আর অধিক নিকটে যাওয়া বুদ্ধির কার্য্য নহে কারণ নিশ্চয়ই শত্রু পাহারার লোক মজুদ রাখিয়াছে।

হঠাৎ একটা লোমহর্ষক রকম চিৎকার করিয়া সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে কাহারা বন্দুক চালাইয়া বিকট কোলা-হলের সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যারাসুট-সংলগ্ন তীব্র রশ্মিদায়ক আলোকসমূহ আকাশ-বক্ষে ঢুলিতে আরম্ভ করিল। শত্রুপক্ষের তরফ হইতে দ্রুতগামী মোটর সাইকেলের ন্যায় আওয়াজ করিয়া যন্ত্র-বন্দুকসমূহ জাগিয়া উঠিল। শত্রু বৈমানিকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজ নিজ বিমান লইয়া আকাশ মার্গে পলায়নের জন্য ছুটিল।

চিম্‌নি দুই হস্তে দুইটা বোমা লইয়া তীর বেগে তাহাদের বিমানের উপর ফেলিবার জন্য ছুটিল। সেই অলৌকিক আলোকে উদ্ভাসিত সমরক্ষেত্রে চিম্‌নির দীর্ঘ ও দ্রুতগতিশীল দেহটা আরও বিরাট্ ও ভীষণ দেখাইতে লাগিল। কেহ বলিল, "বাক আপ চিম্‌নি" কেহবা "সাবাস শুম্‌নি"। শত্রুদলও ক্ষণিকের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই চলচ্চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পরেই ধাবমান বৈমানিকেরা চিম্‌নির উপর পিস্তল চালাইয়া তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কপালগুণেই হউক বা উভয় পক্ষের গতিচাঞ্চল্যের জন্যই হউক চিম্‌নি অক্ষত শরীরে বিমানগুলির কুড়ি গজের মধ্যে আসিয়া এক, দুই করিয়া উভয় হস্তের বোমা দুইটি বিমানগুলির উপর নিক্ষেপ করিয়া মাটিতে টান হইয়া শুইয়া পড়িল। সহসা যেন চতুর্দ্দিক ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিল ও দুইটি বোমার প্রায় যুগপৎ বিস্ফোরণে বজ্রা-ঘাতের ন্যায় একটা আওয়াজ হইল। ইতিমধ্যে অপরাপর সৈনিকেরাও আসিয়া পড়িয়া নিজ নিজ বোমাগুলি সেই বিমান সমাবেশের উপর নিক্ষেপ করিয়া ভূমি আশ্রয় করিতে লাগিল। দুই-তিন মিনিট কাল এই প্রলয়লীলা চলিল ও তৎপরে একটা বিরাট্ অগ্নিকুণ্ড বিমানগুলিকে বক্ষে লইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বোমা-নিক্ষেপকারী ভারতীয় সৈনিকেরা সেই উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুর গুলি অবহেলা করিয়া মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া দৌড়াইয়া দূরে সরিয়া আসিল। দক্ষিণের বাহিনী তখন শত্রুর রক্ষী সেনাদলের সহিত তুমুল সংগ্রামে মাতিয়া উঠিয়াছে।

চিম্‌নি ও তাহার সঙ্গীদিগের কাহারও কোন অধিক আঘাত লাগে নাই। তাহারা জ্বলন্ত বিমানগুলি পশ্চাতে রাখিয়া নালাটার নিকটে আসিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিমানক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে তখন তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধটা ঠিক কি রকম দাঁড়াইত তাহা বলা যায় না। কখন শত্রুপক্ষ কখনও বা ভারতীয় সৈনিকেরা জয়লাভ করিবে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শত্রুদল বিমানগুলি ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় আরও ক্রুদ্ধ ও মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। ভারতীয় সেনানীরা তাহাদের উপর অবিরল গুলিবর্ষণ করিয়াও তাহাদের হার মানাইতে সমর্থ হইতেছিল না। তাহারা বিমানক্ষেত্রের এক কোণে একটা আস্তানার মতন গড়িয়াছিল। সেই স্থলে অজস্র দ্রব্য সরঞ্জাম ও নিজেদের হস্তে দ্রুত উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতির আড়ালে শায়িত অবস্থায় রহিয়া তাহারা মহাতেজে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ভারতীয়েরা দুই-এক বার বিপুল বিক্রমে তাহাদের আস্তানার উপর অগ্রসর হইয়া, দুই-চারি জন হতাহত হওয়াতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। উত্তর প্রান্তের সৈন্যদিগের নেতা তখন শত্রুদিগকে বিপরীত দিক হইতে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

হাবিলদার ধরম সিং চিম্‌নিকে বলিল, "আরে শুমনি তুম বহুত আচ্ছা বম্ মারা।"

চিম্‌নি বলিল, "ধ্যেৎ! ক্যা বহুত আচ্ছা? হাম কো আওর বড়া বম্ দেগা তো হাম ছুড়নে পারতা হায়। খালি হামার লোহাকা টুপিমে একঠো ছেঁদা হো গিয়া।" চিম্‌নির শিরস্ত্রাণ স্টীলের টুপিতে এক পাশে একটা গুলি লাগিয়া একটা নালা কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া ধরম সিং বলিল, "তুমহারা নসীব আচ্ছা হায়। আওর থোড়া ভিতর হোতা, তুমহারা জান চলা যাতা। তুম বহুত বচ গয়া।"

চিম্‌নি বলিল, "বহুত কৈসে বাঁচা? যেত্‌না বাঁচা থা ওতনাই তো বাঁচা হায়।"

হাবিলদার সাহেব চিম্‌নির মস্তিস্ক সম্বন্ধে একটা রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিজ কার্য্যে মনোযোগ দিল। ইতিমধ্যে সকলে নিজ নিজ অস্ত্র কায়দা মতন ঠিক করিয়া অগ্রসর হইবার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেনানায়ক অবিলম্বে আদেশ দিলেন সকলে ছড়াইয়া পড়িয়া একে অপর হইতে অন্তত বিশ ফুটের ব্যবধানে অর্দ্ধবৃত্তাকার গঠনে মাটিতে শুইয়া পড়িয়া শত্রুর ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে। যতক্ষণ শত্রুপক্ষ তাহাদের এ প্রচেষ্টা লক্ষ্য না করে ততক্ষণ কোন গুলিগোলা চালাইবার প্রয়োজন নাই। যদি এইরূপে অলক্ষিতে তাহাদের যথেষ্ট নিকটে আসা যায় তাহা হইলে বোমা ছুড়িয়া তাহাদের বিধ্বস্ত করিতে পারা যাইবে। তাহা না পারিলে গুলি চালাইয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অবশেষে সঙ্গীন চড়াইয়া আক্রমণ করিতে হইবে। সকলে একে অপর হইতে দূরে সরিয়া সরিয়া শীঘ্রই উক্তরূপ অর্দ্ধবৃত্তাকারে গঠিত হইয়া ধীরে ধীরে শত্রুকে ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইল। যখন শত্রুর আস্তানা হইতে তাহারা প্রায় এক শত গজ দূরে তখন শত্রুপক্ষের কেহ তাহাদের

আগমন লক্ষ্য করিয়া একটা যন্ত্র-বন্দুক ঘুরাইয়া তাহাদের দিকে চালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে ব্যক্তি একই স্থানে গুলি চালাইতে লাগিল। সেই স্থলে যে সৈনিকটি ছিল সে সেই ঘনবরষার জলবর্ষণের মত গুলিবৃষ্টিতে আগাইতে অক্ষম হইয়া অসাড়ের মত নিজ স্থলে শুইয়া রহিল। অপর সৈন্যেরা সেই অবসরে আরও আগাইয়া পড়িল। শত্রু হইতে প্রায় ৫০ গজ ব্যবধানে আসিলে পর হুকুম হইল বোমা নিক্ষেপ করিবার জন্য। এক প্রান্তের এক ব্যক্তি উঠিয়া দ্রুতবেগে কয়েক মুহূর্ত তীব্র গতিতে দৌড়াইয়া একটা বোমা নিক্ষেপ করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল। বোমাটা শত্রুদের নিকটে পড়িলেও তাহাদের কোন অনিষ্ট করিল না। শত্রুদের পক্ষ হইতে সেই দিকে দশ-বারটা বন্দুকের গুলি একাধারে বর্ষিত হইতে সুরু করিল। ইতিমধ্যে অপর প্রান্তের এক ব্যক্তি উঠিয়া সবেগে ছুটিয়া গিয়া তাহার বোমাটা শত্রুদের উপরে নিক্ষেপ করিয়া শুইয়া পড়িল। পুনরায় শত্রুপক্ষ সেইদিকে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তার পরে ক্রমান্বয়ে এক বার এদিক এক বার ওদিক হইতে এক জন এক জন করিয়া উঠিয়া ঐরূপে বোমা ফেলিতে লাগিল। শত্রুরা এতক্ষণে তিন-চারটা যন্ত্র-বন্দুক অপর দিক হইতে ঘুরাইয়া এই দিকের আক্রমণকারীদের উপর অনর্গল গুলি চালাইতে লাগিল। এ অবস্থায় শীঘ্রই আর কাহারও পক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোমা নিক্ষেপ করা সম্ভব হইল না। দুই-এক জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইল, অপর দুই-চার জনের উপর হুকুম হইল আহতদিগকে টানিয়া লইয়া পিছনে রাখিয়া আসিতে। চিম্নি এক জন আহতকে লইয়া ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া নালার দিকে ফিরিয়া চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল তাহাদের সঙ্গে যে 'মেশিন গান'টা আসিয়াছিল সেটা নালার ভিতরের পশ্চাৎরক্ষী সৈনিকদিগের নিকট রহিয়াছে। সে বলিল সেই যন্ত্রটিকে লইয়া গিয়া শত্রুদের উপর চালাইবে। কেহ আপত্তি করিল না। সকলে বলিল সে যদি একাকী চার মণ ওজনের জিনিসটাকে লইয়া যাইতে পারে ত লইয়া যাউক। চিম্নি সমস্ত যন্ত্রটা ও গুলির বাক্স প্রভৃতি একটা আহত বহন করিবার হাত-খাটের উপরে বাঁধিয়া লইয়া দড়ি দিয়া নিজের কোমরের সহিত বোঝাটা লট্‌কাইয়া লইল। তার পর হামা দিয়া সেই বিরাট্ বোঝা টানিয়া সে বিপুল শক্তিতে যুদ্ধস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরিশ্রমে ও কষ্টে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু সে ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত শরীরে টানিয়া টানিয়া সমস্ত আসবাব যথাস্থানে লইয়া আসিল। সেনানায়ক চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল সে কি টানিয়া আনিতেছে।

চিম্নি বলিল, "মেশিন গান।"

সেনানায়ক বলিল, "কি বল্লে? পুরা 'মেশিন গান' তুমি একলা এনেছ?"

চিম্নি বলিল, "হাঁ।"

সেনানায়ক তখন হাত-খোন্তা দিয়া মাটি কাটিয়া কাটিয়া একটা গাদা করিতে লাগিল এবং অশেষ পরিশ্রমে মিনিট দশ পনরর মধ্যে একটা উচ্চ মতন আড়ালের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। সেই আড়ালের আশ্রয়ে আরও তিন-চার জন আসিয়া শীঘ্রই সে স্থলে একটা ভাল রকম গুলিরোধক ঢিপি গড়িয়া ফেলিল। তৎপরে সেই 'মেশিন গান' খাড়া করিয়া শত্রুর উপর চালান আরম্ভ হইল। শত্রুপক্ষ হঠাৎ খোলা ময়দানের মধ্যে একটা 'মেশিন গান' গজাইয়া উঠিতে দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হইয়া গেল। সেই সুযোগে তিন-চার জন সৈনিক দ্রুতবেগে উঠিয়া তাহাদের আস্তানার ঠিক ভিতরে কয়েকটা বোমা ছুঁড়িয়া দিল। গভীর গর্জ্জনে সেই সকল বোমা ফাটিয়া যখন ধোঁয়া সরিয়া গেল তখন দেখা গেল শত্রুদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন জীবিত আছে। তাহাদের চিৎকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইল। কিন্তু তাহারা সে কথার উত্তর না দিয়া সমানে গুলি চালাইতে লাগিল। দক্ষিণ দিকের ভারতীয় সেনানীরা এতক্ষণ বিশেষ কিছু করিতেছিল না। তাহারা এইবার বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া হঠাৎ বিকট হুঙ্কারে শত্রুর দিকে ধাবমান হইল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শত্রু। তাহারা মরিয়া হইয়া উহার মধ্যেই কয়েকজন এদিকে ও কয়েকজন ওদিকে গুলি চালাইবার চেষ্টা করিল। উত্তরের সৈনিকেরাও এই সময়ে তীব্র গতিতে তাহাদের উপর সঙ্গীন আক্রমণ করিল। শত্রুরা এই যুগপৎ আক্রমণ আর প্রতিরোধ করিতে পারিল না। তাহারাও তলোয়ার ও সঙ্গীন লইয়া একটা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে একত্রে দাঁড়াইয়া লড়িতে লাগিল। তাহারা সকলেই মরিত; শুধু এক পার্শ্বে একটা দড়ির জাল পড়িয়াছিল, সেইটা চিম্নির চোখে পড়াতে সে জালটাকে দুই চার পাট করিয়া হঠাৎ নিজেদের দলের লোকদের মাথার উপর দিয়া ছুঁড়িয়া শত্রুদের শেষ কয়েকজনের উপর ফেলিয়া দিল। গায়ের উপর জাল আসিয়া পড়ায় শত্রুদের হাত চালান বন্ধ হইয়া গেল ও সেই সুযোগে সকলে একযোগে তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদের নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল।

এইরূপে বিমানক্ষেত্রটি দখল করিয়া ও চার-পাঁচখানা শত্রু বিমান ধ্বংস করিয়া সকলে নিজেদের পর্ব্বত অন্তরালস্থিত আস্তানায় ফিরিয়া চলিল। অজয় আহত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার আঘাত সাংঘাতিক নহে বলিয়া হাঁটিয়াই চলিতেছিল। সে বলিল "এই চিম্নি, আমি স্বপ্ন দেখলাম তিনটে বোয়াল মাছ সিগারেট ধরিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।" চিম্নি বলিল, "কি করে বেড়াতে বেরল? বোয়াল মাছের কি পা আছে?

অজয় বলিল, "পা নেই ত কি? চাকা ত আছে। চাকার উপর চলেছে, বোঁ বোঁ করে আর ধোঁয়া ছাড়ছে।

চিম্নি বলিল, "ধ্যেৎ!"



ফিলিপাইন্‌সের একটি পার্ব্বত্য পল্লী ও ধানের ক্ষেত





ব্রিটেনের গ্রন্থাগারে পাঠ-রত শিশু



লেডো রোড তত্ত্বাবধানে মার্কিন ইঞ্জিনীয়ার সেনা-বাহিনী

USOWI

শিক্ষা-সম্প্রসারণ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একের সহিত অন্তকে মিলায় ইহাই সাহিত্যের ধর্ম। যে অজ্ঞানের অন্ধকার মানুষের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করে, সাহিত্যের স্নিগ্ধ আলোকে সে অন্ধকার দুরীভূত হয়। মানুষের সহিত মানুষের মিলন সাধন করিয়াই সাহিত্য ক্ষান্ত হয় না। জাতির সহিত জাত্যন্তরের, দেশের সহিত দেশান্তরের, অতীতের সহিত বর্তমানের এবং বর্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সংযোগ স্থাপন করিয়া সাহিত্য বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মানবকে ঐক্যের সুনিবিড় বন্ধনে সংবদ্ধ করে। যে জাতির নিজস্ব সাহিত্যের অভাব, সে জাতি বিশ্বের কাছে অপরিচিত, এমন কি নিজের কাছেও। আমরা বাঙ্গালী অশেষবিধ ভাগ্য-বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হইয়াও যে একটি মাত্র ঐশ্বর্য লইয়া গর্ব করিতে পারি সে আমাদের সাহিত্য। একদিন তো আমাদের সবই ছিল। আমাদের অন্নপূর্ণার পূর্ণপাত্র কত বুভুক্ষুর রিক্তথালি পূর্ণ করিয়াছে, আমাদের মহালক্ষ্মীর রত্নপেটিকা কত ভিক্ষুকের ভিক্ষার ঝুলি মণিমাণিক্যে ভরিয়া দিয়াছে, আমাদের শিল্প-সম্ভার বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। অতীত গৌরবের পবিত্র পুরাতন দিনগুলি আজ যে বর্তমানের বাস্তব ক্ষেত্রে রূপান্তর লাভ না করিয়া স্মৃতিলোকের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে সেজন্য দুঃখ করিতে হয় করিব কিন্তু আর নির্লজ্জের মত বারংবার নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিব না। কেন গিয়াছে কাহার দোষে গিয়াছে সে কথা আজ আর আমাদের অবিদিত নাই, সুতরাং সে আলোচনা নিষ্ফল। কেমন করিয়া হারানো জিনিস আবার ফিরিয়া পাইব তাহার আলোচনাও আজিকার ক্ষেত্রে অবান্তর। কিন্তু এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয়, বহু শতাব্দীর বিবিধ ভাগ্যবিপর্যয়ের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়াও আমরা প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলি নাই কেন? রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য, সর্বোপরি দীর্ঘদিনের পরাধীনতার মনুষ্যত্বনাশী গ্লানিভার বহন করিয়াও প্রাত্যহিকের ঊর্ধ্বে মস্তক উত্তোলন করিবার সামর্থ্য পাই কোথা হইতে? পুঞ্জীভূত অপমানের বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন থাকিয়াও মোহধ্বংসী সূর্যালোকের আভাস দেখিতে পাই কাহার শক্তিতে?—তাহার একমাত্র উত্তর সাহিত্য। জাতির জীবনের মূলে রসধারা জোগাইয়া সাহিত্যই তাহার প্রাণশক্তি অব্যাহত রাখিয়াছে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। কত রাজবংশের উত্থান-পতন, কত ধর্মমতের উদয়-বিলয়, কত রীতি-নীতির আরম্ভ-পরিণতি, কত চিন্তাধারার আদি-অন্ত লক্ষ্য করিতে করিতে আমাদের এই সাহিত্য আজ প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া জাতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র পরিচয় বহন করিয়া আসিতেছে। এই সাহিত্যের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়া আমরা পিতৃপিতামহের সহিত সচেতন এবং সজীব মানসিক যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। নানা কারণে সে যোগ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ নাই। অর্থহীন প্রথা, যুক্তিহীন আচার, অমার্জনীয় মূঢ়তা শৈবালদামের মত দল বাঁধিয়া কখনো কখনো স্রোতপথ রুদ্ধ করিয়াছে। আমাদের চৈতন্য জাগরিত হইলে ঐ বাধা অপসারিত করা হয়তো কঠিন হইবে না। কিন্তু একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, যেটুকু যোগ আছে তাহা কেবল সাহিত্যের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে।

জাতীয় জীবনে জাতীয় সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছুকাল বড় উদাসীন ছিলাম। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ে সেই ঔদাসীন্যটা এক রকম বিরুদ্ধতার ভাবই ধারণ করিয়া বসিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্প্রদায়কে কশাঘাত করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিদ্রূপ অত্যন্ত রূঢ় হইলেও ইহার মধ্যে অত্যুক্তি ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বঙ্গদেশে ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম রূপে কি ভাবে গ্রহণ করা হইল তাহার বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে চাহি না, কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল এই প্রসঙ্গে তাহা স্বভাবতই মনে পড়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ মাতৃভাষার নানাভিমুখী অনুশীলন হইতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিতেছে। ইণ্টারমিডিয়েট এবং বি. এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণতর অনুশীলনের সুব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ সর্বোচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। মাতৃভাষার প্রতি এই মর্যাদা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে আদর্শ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা অল্পবিস্তর অনুসৃত হইতেছে। আশা করি এমন একদিন আসিবে যেদিন ভারতের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নতম পাঠ হইতে উচ্চতম গবেষণা পর্যন্ত মাতৃভাষার বাহকতায় সম্পন্ন হইতে পারিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার গুরুত্ব আমরা সব সময় অনুভব করিতে পারি না। কি প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া তবে এই সফলতার ফললাভ হইয়াছে তাহা আমরা বিস্মৃত হই। যাঁহারা প্রতিকূল আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিজদেহে অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াও বিমাতার অঙ্গনে মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন আজিকার এই সভায় সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকল্প পূর্বজগণের নাম স্মরণ করিতেছি।

রাজনৈতিক কারণে যদিও দেশের মধ্যে একটা দলাদলির বিষাক্ত আবহাওয়ার উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি অতি বড় নিন্দুকেও বাঙ্গালী জাতিকে অনৌদার্যের অপবাদ দিতে পারিবে না। আমরা সাহিত্যকে জাতিগঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া গণ্য করি। সাহিত্য যেমন জাতির অঙ্গে সঞ্জীবন-রসের সঞ্চার করিয়া জাতিকে সজ্ঞান সচেতন এবং সবল করিয়া তুলে, জাতির সমুদ্বোধিত চৈতন্য; সুগঠিত চিন্তাধারা এবং সুনিয়ত বিচারবুদ্ধি তেমনি মহত্তর সাহিত্য প্রণয়নে সহায়তা করে। বঙ্গ-

দেশের শিক্ষাচার্যগণ এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যতঃ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিধির সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারা সকলেই সে কথা জানেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা করাই যে কালে আপত্তির কারণ হইত অন্য ভাষার পঠন-পাঠনের আয়োজন করা সেকালে প্রায় অসম্ভবই ছিল। আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্যন্ত সকল শ্রেণীতেই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ আমরা লাভ করিতেছি। এই ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্যও পিতৃদেবকে কম প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হয় নাই কিন্তু দেশকে প্রদেশের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার মত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন নিজের ভাষা এবং নিজের সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া বাঙ্গালী যে কল্যাণ লাভ করিবে, অন্য জাতি সুযোগের অভাবে সে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইলে, ক্ষতি শুধু সেই বিশেষ জাতিরই নয়, সে ক্ষতি সমগ্র ভারতবর্ষের। তিনি বুঝিয়াছিলেন সর্ব অঙ্গের সুস্থতার উপর সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিধিতে হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, ওড়িয়া, আসামী, মৈথিলী ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ-ভারতের তামিল তেলুগু প্রভৃতিকেও স্থান দিয়াছিলেন। যে ভাষা আপন প্রদেশে অনাদৃত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকেও সমগ্র জাতির মুখ চাহিয়া অনাদর করেন নাই। বাঙ্গালা দেশ তাহার বাণীপীঠ হইতে যে আদর্শ প্রচার করিয়াছে যে দিন সমগ্র ভারতবর্ষ সেই মহাদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে, গভীর ঔৎসুক্যের সহিত সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

সাহিত্যের সহিত ভাষার যোগ অত্যন্ত নিবিড়। আত্মার সহিত দেহের যে সম্বন্ধ সাহিত্যের সহিত ভাষার সেই সম্বন্ধ। যাহাকে ভালবাসি তাহার দেহটাকে বাদ দিয়া শুধু আত্মাটির কথা তো আমরা কল্পনা করিতে পারি না। বস্তুতঃ দেহটাকে লইয়াই আমাদের যত কারবার। যে আপনার ভাষাকে ভালবাসে আপনার সাহিত্যের প্রতিও তাহার মমত্ববোধ সহজেই জাগ্রত হয়। আবার উচ্চতর সাহিত্যে রসের উপলব্ধি ঘটিলে তখন ভাষা ও সাহিত্যের প্রাদেশিক গণ্ডি হইতে মন সহজেই মুক্তি লাভ করে। তখন অন্যের ভাষা নিজে পড়িতে এবং নিজের ভাষা অন্যকে পড়াইতে ইচ্ছা হয়। যে কোনো দেশে যে কোনো কালে এই অবস্থা সকলেরই কাম্য। কিন্তু যদি কেহ শিক্ষাদানের মত পুণ্যকর্মকে রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনো কুটিল উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে তবে তাহা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। অনেক প্রদেশের প্রান্তসীমায় প্রায়ই এই ধরণের অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। একজন বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা শিখিয়া তদুপরি হিন্দী ওড়িয়া অথবা তামিল তেলুগু শিখে তাহা তো আনন্দের কথা। কিন্তু যদি এমন হয় যে, অন্য প্রদেশের কোনো একটা ভাষা হয়তো শিখিল, কিন্তু মাতৃ-ভাষাটাই শেখা হইল না, তবে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? দেশকে প্রদেশে বিভক্ত করিবার স্বাভাবিক উপায় হইল ভাষাবিচার,—ধর্মভেদে প্রদেশ ভেদের যে সাম্প্রতিক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কোনো সভ্য জাতির অনুমোদিত নহে—সুতরাং এক প্রদেশের অজ্ঞ নিরক্ষর দরিদ্র মানুষকে সামান্য কিছু প্রলোভন দেখাইয়া যদি তাহাকে অন্য ভাষায় দীক্ষিত করা হয় এবং বারংবার শুনাইয়া শুনাইয়া তাহার মনে যদি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া যায় যে ঐ অন্য ভাষাই তাহার মাতৃভাষা তবে এই প্রদেশের আপত্তি করিবার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে। শিক্ষাদানের মত মহৎ কর্তব্য আর কি আছে? যাঁহারা শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জাতির নমস্য। কিন্তু তাঁহারাও যদি এক প্রদেশীয়কে অন্য প্রদেশীয় বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্যই শিক্ষাদান করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যকে সাধু বলিব না। বাঙ্গালা দেশের তরফ হইতে আমরা কি করিতে পারি তাহা দেখিতে হইবে। অন্যে আসিয়া যদি আমার নিরক্ষর ভ্রাতা-ভগিনীকে তাহারই অক্ষর শিখাইতে থাকে তাহাকে বাধা দিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু আমার কর্তব্যটা তাহার পূর্বে পালন করিয়া লইতে হইবে। আমার ভাষা তাহাকে আগে শিখাইয়া দিতে হইবে। সে কে, তাহার পূর্বপুরুষের পরিচয় কি, আমার সহিত তাহার এবং তাহার সহিত সমগ্র দেশের সম্বন্ধ কিরূপ—ইহা যদি একবার তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে পৃথিবীর সকল ভাষার এক এক দল প্রতিনিধি আসিয়া গ্রামে গ্রামে ভাষা শিক্ষার পাঠশালা খুলিয়া দিলেও কোনো ক্ষতি হইবে না, বরং কিছু উপরি লাভ হইবে।

যে কর্তব্যের উল্লেখ করিলাম তাহা একজন দুইজনের কাজ নয়। দেশের শিক্ষিত সমাজকে এই কাজের ভার লইতে হইবে। দেশের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। যে দেশের লোক অধিকাংশই নিরক্ষর তাহাদের শিক্ষিত করিবার পণ গ্রহণ করিতে পারে তরুণ ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উৎসাহী কর্মীর অভাব হইবে না, সে ভরসা আমি দিতে পারি। কিছু কাল আগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা নিষ্ফল হয় নাই। আহ্বানমাত্র ছাত্রগণ দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিখিয়া লইয়া দীর্ঘ অবকাশে আপন আপন গ্রামে গিয়া বয়স্ক নিরক্ষরদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে এই শিক্ষাদান-কার্য চালাইতে হইলে একটি প্রতিষ্ঠানের শক্তিই যথেষ্ট হইতে পারে না। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য-সমিতি, গ্রন্থাগার-সমিতি প্রভৃতি এই কাজে সহ-যোগিতা করিলে আমাদেরই অশিক্ষিত ভ্রাতা-ভগিনীরা—যাহারা আজ সমাজের ভারস্বরূপ তাহারাই সমাজের সুযোগ্য সভ্য বলিয়া গণ্য হইবে। বাঙ্গালাদেশে দুই হাজারের কাছাকাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের সহায়তায় নিরক্ষর দেশবাসীকে মাতৃ-ভাষা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে যদি অবসর সময়ের কিয়দংশ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন তাহা হইলে দেশমাতার প্রকৃত সেবা করা হইবে। অর্থের প্রয়োজন সব কাজেই আছে তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস বর্তমানে দেশে জাতীয়তাবোধ যে ভাবে জাগ্রত হইতেছে তাহাতে কোনো মহৎকর্মই অর্থের অভাবে আটকাইয়া যাইবে না। কাজ

আরম্ভ করিলে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা দুর্লভ হইবে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান—যথা, বিশ্বভারতীর অন্তর্গত লোকশিক্ষা-সংসদ, শান্তিপুর পুরাণ-পরিষদ এবং প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অন্তর্গত পরীক্ষা-পরিষদ—ইতিপূর্বেই এ কাজে হাত দিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহারা আপন আপন কার্যে ব্রতী আছেন, কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হইয়াছে কি? বস্তুতঃ কি আশা লইয়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আশা কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। এ স্থলে আমি সবিনয়ে এই কথা বলিতে চাই যে, কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণ দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব নহে।

লোকশিক্ষা-সংসদ এবং পরীক্ষা-পরিষদের নিয়মাবলী আমি যত্নপূর্বক দেখিয়াছি। বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সুযোগ যাঁহাদের ঘটে না বাঙ্গালাদেশের সেই সব নরনারীর মধ্যে বাঙ্গালার মাধ্যমে জ্ঞানবিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের এক পত্র হইতে তাঁহার অভিপ্রায় কি ছিল জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছিলেন: "দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোটো বড়ো প্রাদেশিক সহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে ব'সে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিত ভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে।" শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য—"ক. প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচয়। খ. বঙ্গভাষার আভিজাত্য সংরক্ষণ।" এবং তাঁহাদের মতে এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা-পরিষদ দ্বারা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে আপাততঃ বৎসরে একবার মাত্র প্রবেশিকা এবং উপাধি পরীক্ষা গ্রহণ করা।"

উভয় প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রায় একরূপ অভিন্ন। উপায়ও প্রায় সমান। তবে পাঠ্যক্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। উভয় প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিত হইতে হইলে এই পার্থক্য দূর করিতে হইবে। তাহা না হইলে পাঠ্যতালিকার ভেদে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে উদ্দেশ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইলে সর্বতোভাবে জাতির পক্ষে কল্যাণজনক হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পরীক্ষা গ্রহণের সহিত নিরক্ষর দেশবাসীকে অ আ ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখাইবার কোনো সম্বন্ধ নাই। তাহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবশ্যক। সে ব্যবস্থা প্রণয়নে ইঁহাদের সাহায্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইবে।

মাতৃভূমিকে আমরা যদি দেবী বলিয়া—স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া জ্ঞান করি, মাতৃভাষাকেও পরমারাধ্যা বলিয়া জ্ঞান করিব। সৌভাগ্যের কথা, অন্ধভক্তির বশবর্তী হইয়া আমাদের ভাষাকে আরাধনা করিবার প্রয়োজন হইবে না। বাঙ্গালা ভাষা আজ নিজের ঐশ্বর্যবলে জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। হিন্দুস্থানীর ন্যায় তাহাকে যদি গণভাষারূপে ব্যবহার করিতে জনসাধারণ অসমর্থ হয় তবে তাহা লইয়া আক্ষেপ করিব কেন? ভাষার উন্নতি এবং প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য এবং সে কর্তব্য আমরা ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠার সহিত পালন করিব। আমাদের ভাষালক্ষ্মীর মর্যাদা তাহাতেই সমধিক রক্ষিত হইবে। কত লোকে এক একটা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে তাহার হিসাব করিয়া দেখিলেও পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালার স্থান সপ্তম এবং ভারতের মধ্যে প্রথম। ইহা বিশেষজ্ঞের মত। আর যদি আদমসুমারির হিসাবের উপর নির্ভর করা যায় তবে বাঙ্গালার পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম এবং ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান। তাহাও বড় কম গৌরবের কথা নহে। ১৯৪১-এর আদম-সুমারিতে ভাষার হিসাব বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা হয়তো আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ১৯৪১-এ বাঙ্গালার অধিবাসীর মোট সংখ্যা ছয় কোটি চৌদ্দ লক্ষ ষাট হাজার তিন শ সাতাত্ত..। ১৯৩১-এ মোট অধিবাসীর শতকরা ৯২ জনের ভাষা বাঙ্গালা ধরা হইয়াছিল। সেই হিসাবে এবারে বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালীর সংখ্যা হওয়া উচিত পাঁচ কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ সাতচল্লিশ (৫৬৫,৪৩,৫৪৭)। ইহা ছাড়া বাঙ্গালার বাহিরে আসাম উড়িষ্যা এবং বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী অনেক বাঙ্গালী আছেন যাঁহারা আজও মাতৃভাষারূপে বাঙ্গালার ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে বঙ্গভাষাভাষী ভারতীয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ছয় কোটি। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক ইহাই আমাদের কামনা। অন্ততঃ এটুকু আমাদের দেখিতে হইবে, বাঙ্গালীর মধ্যে—তিনি বর্তমানে যে প্রদেশেরই অধিবাসী হউন না কেন—একজনও যেন বাঙ্গালা ভাষায় অজ্ঞ না থাকেন।

পরম আনন্দের বিষয় যে জামসেদপুর শিক্ষাপ্রচার-সমিতির উদ্যোগে অশিক্ষিত জনসাধারণকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ধূম্রধূলির ঘূর্ণিবাত্যার ঊর্ধ্বেও যাঁহারা জ্ঞানের পবিত্র বহ্নিশিখাটি প্রজ্বলিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। সুবর্ণপ্রদীপের সংস্থান না হইয়া থাকে না হইল, তাহার জন্য আক্ষেপের কোন কারণ নাই। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সংস্পর্শে পিতলের প্রদীপই সোনা হইয়া উঠিবে। সমিতির শিক্ষাদান কার্য সম্ভবত বালকবালিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বয়স্কদিগের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত করা হইয়াছে। যদি এখনও না হইয়া থাকে তবে অবিলম্বেই তাহা করা প্রয়োজন। কেবল শিশু অথবা কেবল বয়স্কের মধ্যে শিক্ষাদান আবদ্ধ রাখিলে সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিবে না।

সময়ের মূল্য বর্তমান যুগে অত্যন্ত অধিক। দীর্ঘকাল ধরিয়া পঠনপাঠনের সময় কেহ পাইবে না। যে সম্প্রদায়ের পাঠার্থী লইয়া সমিতির কাজ তাহাদের অবসর

অতি অল্প। এই অল্প সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে কি না তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ছয় মাস বা এক বৎসর শিক্ষা পাইয়া একজন নিরক্ষর লোক সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবে এমন আশা করা সঙ্গত হইবে না, কিন্তু মাতৃ-ভাষায় অন্তত এতটা অধিকার অর্জন করা আবশ্যক যাহাতে সংবাদপত্রটা পড়িয়া মানে বুঝিতে পারে এবং নিজের চিঠিটা অন্যকে দিয়া লিখাইতে বাধ্য না হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সাধারণ জ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যে জগতে সে বাস করে তাহার সম্বন্ধে যেন একেবারে অন্ধ না থাকে। বয়স্ক এবং অল্পবয়স্ক পাঠার্থীর পাঠক্রম এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা একরূপ হইলে চলিবে না। কারণ উভয়ের গ্রহণশক্তি ও ধারণাশক্তি একরূপ নয়। তাহা ছাড়া একটি ছয় বৎসরের শিশুর কাছে যে পাঠ মনোজ্ঞ হইবে একজন মধ্যবয়সী শ্রমিকের পক্ষে সেই পাঠ হৃদয়গ্রাহী হইবার সম্ভাবনা অল্প। এদিকে চিন্তা করিয়া পাঠ্য নির্ণয় ও পাঠক্রম স্থির করিতে হইবে। বর্তমান আয়োজন অল্প বলিয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। ক্ষুদ্র অঙ্কুরের মধ্যেই বৃহতের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে।

ভারতবর্ষে শিক্ষা সভ্যতা এবং স্বাদেশিকতা প্রচারে বাঙ্গালীর দান অসামান্য। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীরা যে প্রদেশেই গিয়াছেন সেই প্রদেশকেই স্বদেশ বলিয়া তাহার উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মাদ্রাজ, মহীশূর, পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে তাহার সুপ্রচুর নিদর্শন আছে। নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার ক্ষুদ্রতর স্বার্থের মোহ কখনো তাঁহাদিগকে অখণ্ড ভারতের মহত্তর আদর্শের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই তাঁহারা সকলের বিশ্বাসভাজন এবং শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীরা চিরকাল ভারতের কথাই চিন্তা করিয়াছেন, প্রদেশের সুখ-সুবিধার উর্ধ্বে দেশের স্বাধীনতাকেই তাঁহারা স্থান দিয়াছেন। বিদ্যা বিতরণের ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদার সর্বজনীন নীতির উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি।

যে কোনো অবস্থাতেই হউক না কেন, ঐক্য ও অখণ্ডতার সেই মহৎ আদর্শ হইতে আমরা কখনোই বিচ্যুত হইব না। সাময়িক স্বার্থের প্রলোভনে চিরন্তন মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইতে দিব না। আমাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কুটিল রাজনীতি জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য সর্বত্রই একবার করিয়া ঘা মারিয়া যাইতেছে। দুর্বল স্থানে তাহা বেশ জোরেই লাগিতেছে। হিন্দীকে বিকৃত করিবার যে অপচেষ্টা চলিতেছে এবং অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে তাহা যে ক্রমশ ব্যাপক এবং বর্ধিত করা হইতেছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। এদিকে লেখ্য হিন্দী ভাষায় উর্দু হরফের ব্যবহার কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়ায় ঐ অপচেষ্টার ক্ষেত্র আরও উর্বর হইল। আমরা কি নিশ্চেষ্ট নিরুত্তরে এই অত্যাচার সহ্য করিয়া লইব? বাঙ্গালা ভাষা-লক্ষ্মীর অঙ্গনেও ভেদনীতির অঙ্কুর বপনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে তাহাকে উৎপাটন করিয়া না ফেলিলে বিষবৃক্ষ ডালপালা মেলিয়া সমগ্র দেশকে আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। বাঙ্গালার এই দুরবস্থা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ হিন্দু-মুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশ-ব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে, আত্মীয়কে তুলছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা, সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না।"

যে অশিক্ষিত অবুদ্ধি আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙ্গিবার চেষ্টায় রত তাহাকে দূরীভূত করিবার সর্বপ্রধান উপায় দেশ-ব্যাপী শিক্ষার প্রসার। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই দেশকে সহজে শিক্ষিত করা সম্ভব। আপন প্রাদেশিক ভাষায় আপন প্রদেশের জনগণকে শিক্ষিত করিয়া জাতীয় সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রত্নগুলি তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। স্ব-দেশকে, স্ব-জাতিকে, আপনার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জানিবার এবং শ্রদ্ধা করিবার শিক্ষা পাইয়া জনগণ ধন্য হইবে। জাতীয় উন্নতির ইহাই প্রথম ও প্রধান সোপান।

সাহিত্যের প্রচার শুধু প্রদেশের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক ভাষার গ্রন্থ অন্য-ভাষী পাঠকের পঠনযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। পরস্পরকে চিনিবার বুঝিবার জন্য, পরস্পরের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়া আপন আপন মত গঠন বর্জন অথবা সংশোধন করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর উপায়ের কথা তো আমি ভাবিয়া পাই না।

এইখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে, এক ভাষার গ্রন্থ অন্য-ভাষীর পঠনযোগ্য করা কি ভাবে সম্ভব হইবে? এক উপায় আছে অনুবাদ এবং সে উপায় বহু বৎসর পূর্ব হইতেই অবলম্বিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিকের রচনাসমূহ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও অন্যান্য ভাষার অনেক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে শুনিয়া কৌতূহল বোধ করিবেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিন্দী "বেতাল পচিসী"র অনুবাদ। প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় অন্য প্রদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি আলাওলের রচিত পদ্মাবতী নামক কাব্যখানির নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত। এই কাব্য-খানির মালিক মুহম্মদ জৈসীর হিন্দী কাব্য "পদ্মাবৎ" অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের ধারা—কখনও বা আক্ষরিক অনুবাদ কখনও বা ভাবানুবাদ—আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অনুবাদগ্রন্থ নানা কারণে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয় না। উপযুক্ত অনুবাদকের অভাব তাহার অন্য-তম। অনুবাদ করিতে গেলে উভয় ভাষায় সমান জ্ঞান

থাকা আবশ্যক। ভাষান্তর করিতে গেলে অনেক সময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পক্ষেও মূলের ভাব এবং রস অব্যাহত রাখা কঠিন হয়। এই সমস্ত অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও অনুবাদ গ্রন্থের আবশ্যক আছে। ইংরেজী এবং অন্যান্য বিদেশীয় সাহিত্যের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার অনুবাদের সাহায্যেই ভারতবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের জন্য আমি একটি অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করি। আমি বলি ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ ভাষা অটুট রাখিয়া শুধু বিভিন্ন লিপিতে মুদ্রিত করা হউক। আমার বিশ্বাস এইরূপ পুস্তক বিভিন্ন প্রদেশে পঠিত হইয়া আন্তঃ-প্রাদেশিক মিলনের পথ প্রস্তুত করিবে। আমার প্রস্তাবের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি :

১। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার বর্ণক্রমে কোনো ভেদ নাই বলিলেই চলে, কেবল লিপির আকৃতি স্বতন্ত্র। অর্থাৎ, 'অ আ ই ঈ' 'ক খ গ ঘ' রূপে যে ভাবে আমাদের বর্ণমালা সজ্জিত আছে, ভারতের সকল প্রদেশেই সেইরূপ। এমন কি দক্ষিণ-ভারতেও। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি হইতে সকল লিপিরই উৎপত্তি। সেইজন্য বর্ণবিন্যাসে এই অভিন্নতা। (উর্দু হরফের কথা স্বতন্ত্র। তাহার সহিত ভারতীয় অন্য কোনো লিপির মিল নাই।) এই অভিন্নতার ফলে এক ভাষাভাষী পাঠক অন্য ভাষার বই কেবলমাত্র লিপ্যন্তর করিলেই পড়িতে পারিবেন। এই কথা শুধু অক্ষর সম্বন্ধে নয়, ১ ২ ৩ ৪ প্রভৃতি অঙ্ক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

২। ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের—অর্থাৎ তামিল তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ী এবং কোল মুণ্ডা প্রভৃতি আর কয়েকটি অনার্য ভাষা ব্যতীত আর সকল ভাষার উৎপত্তি সেই বৈদিক সংস্কৃত হইতে। সব আর্যভাষারই ইতিহাস একরূপ। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ অবস্থা অতিক্রম করিয়া সকলেই বর্তমান রূপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং আধুনিক ভাষাসমূহের মধ্যে অনেক মিল আছে। শব্দাবলীতে এই মিল অত্যন্ত অধিক। এক ভাষা অন্য ভাষীর কাছে যতটা দুর্বোধ্য বলিয়া আমরা ধারণা করি কার্যত তাহা সত্য নয়। অপরিচিত লিপিই আমাদের ভয়ের কারণ হয়। বাঙ্গালা হরফে হিন্দী বই প্রকাশিত হইলে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে পড়া কঠিন হইবে না। ভারতের অনেক খানি জুড়িয়া নাগরী লিপির প্রচলন। হিন্দী ছাড়াও বহু ভাষার পুস্তক নাগরীতে মুদ্রিত হয়। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার বই নাগরী লিপিতে প্রকাশিত হইলে ভারতের বহু প্রদেশের সহিত আমাদের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক যোগ সাধিত হইবে। ভারতীয় সকল ভাষা এবং লিপি সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। তবে প্রথমে প্রধান প্রধান ভাষা এবং লিপি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করাই ভাল।

৩। আমার সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি আমার নিজের এবং অন্য-প্রদেশীয় কয়েকজন বন্ধুর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। বস্তুতঃ যে ভাষার সহিত পরিচয় অল্প, নিজের হরফে লিখিত সেই ভাষার রচনা পড়িয়া দেখিলেই আমার কথার তাৎপর্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালা হরফে এ ধরণের কাজ কিছু কিছু হইয়াছে। কাঁথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা হরফে মুদ্রিত ওড়িয়া পুস্তকসমূহের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নাগরী লিপিতে মুদ্রিত একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন ভাষার লোক-সঙ্গীত, কবিতা এবং ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে। উহার ভূমিকা, গ্রন্থ-পরিচয়, টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি হিন্দীতে লিখিত। কিন্তু কবিতাসমূহ যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে সেই-ভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাদের ভাষা কিছুমাত্র পরিবর্তন করা হয় নাই, কেবল নাগরী লিপিতে ছাপানো হইয়াছে এই মাত্র।

লিপির প্রসঙ্গে স্বভাবতই রোমান লিপির কথা উঠিতে পারে সেইজন্য এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা আগেই বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করি। এক রোমান লিপির দ্বারা ভারতের সকল ভাষা লেখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে সুবিধা অনেক হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখা গিয়াছে দেশ তাহা গ্রহণ করিবার জন্য এখনও প্রস্তুত হয় নাই। লিপি ভাষার বাহ্য চিহ্নমাত্র। এক চিহ্নের কাজ অন্য চিহ্নের দ্বারা যদি সহজে চলে তবে চিহ্ন পরিবর্তনে আপত্তি করিবার কোনো কারণ নাই। যুক্তির দ্বারা তাহা বুঝিতে পারি কিন্তু যুক্তির দ্বারা তাহা বুঝাইতে পারি না। কারণ, যুক্তি যতই শাণিত হউক না কেন, সংস্কারের গায়ে সে সহসা দাগ বসাইতে পারে না। ইহা লইয়া তর্ক করা বৃথা। সুতরাং ভারতীয় লিপি দিয়াই কার্যারম্ভ হউক।

আমরা যদি একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়া এই কার্যে আত্মনিয়োগ করি তাহা হইলে অভীষ্ট ফললাভে বিলম্ব হইবে না। আমি কল্পনা-নয়নে সেই শুভদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি যে দিন বিবিধ ভাষার বিচিত্র লিপির শতদলপদ্মে অধ্যাসীনা হইয়া ভারতের সমগ্ররূপিণী সরস্বতী ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়োচ্চারণ করিয়া বলিতেছেন :

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।"

জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান যুদ্ধে লোকক্ষয়ের পরিমাণ ভয়াবহ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময়ের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে-সকল অপূর্ব্ব আবিষ্কার হইয়াছে তাহার ফলে যে ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের প্রাণ রক্ষা পাইবে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। ব্যাপারটা এই—আমরা যেন এক যুদ্ধের মধ্যে আর একটা ভীষণতর যুদ্ধে জয়লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছি। এই দ্বিতীয় যুদ্ধটা কিন্তু মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধ নহে—মানুষের সহিত অভাবনীয় অগণিতসংখ্য

অদৃশ্য জীবাণুর যুদ্ধ। জীবাণুর বিরুদ্ধে এই অভিযানে প্রায় জীবাণুর অনুরূপ সৈন্যদলই প্রেরিত হয়। সংখ্যায় ইহারাও



সুপার ইলেকট্রণ-মাইক্রস্কোপ

অগণিত। এই মিত্র-সৈন্যদলের যুদ্ধাস্ত্রও রহস্যময়। এই রহস্য-ময় অস্ত্র-সাহায্যে কেমন করিয়া তাহারা শত্রুপক্ষকে পরাভূত করে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু বলিতে না পারিলেও ইহারা যে মনুষ্যদেহ আক্রমণকারী অনিষ্টকর জীবাণুগুলিকে অবলীলাক্রমে মারিয়া ফেলে ইহা প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব ঘটনা। যে-সকল অনিষ্টকারী অদৃশ্য জীবাণু এতকাল মনুষ্যদেহে অবাধে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিত, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে মানুষ আজ তাহাদিগকে অনায়াসে পদে পদে ব্যাহত করিয়া দিতেছে। জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনে যাহারা মিত্র-সেনারূপে কাজ করিতেছে তাহারা কয়েক রকমের 'য়্যান্টিবাইওটিক' ছাড়া আর কিছুই নহে। উদ্ভিদাণু বা জীবাণু-দেহ-নিঃসৃত রোগনাশক পদার্থসমূহকে 'য়্যান্টিবাইওটিক' বলা হয়। এতদ্ব্যতীত কয়েক রকমের ভেষজ এবং রাসায়নিক পদার্থ জীবাণু ধ্বংসে অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকে।

'প্রোণ্টোসিলে'র জীবাণুনাশক ক্ষমতার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। তাছাড়া একথাও সকলেই জানেন যে, 'সাল্‌ফানিলয়ামাইড' শ্রেণীর বীজাণুনাশক ঔষধ হাজার হাজার রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই শ্রেণীর 'সাল্‌ফাসাক্সিডিন্' বা 'সাক্সিনিল-সাল্‌ফাথিয়াজোল্' নামক এক প্রকার নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আন্ত্রিক বীজাণু ধ্বংস করিতে অদ্বিতীয় অথচ মনুষ্যদেহের কিছুমাত্র অনিষ্ট সাধন করে না। 'সাল্‌ফা' শ্রেণীর ঔষধসমূহ জীবাণুগুলিকে বিনষ্ট করে না; কিন্তু তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি ব্যাহত করিয়া দেয়। 'কাল্‌চার-প্লেটে' 'ককাস' জাতীয় জীবাণু জন্মাইয়া তাহাতে 'সাল্‌ফানিলয়ামাইড্' শ্রেণীর ঔষধ ঢালিয়া দিলে দেখা যাইবে 'ককাস'গুলি যেন জড়তা প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহাতে জীবাণুর দেহ-পুষ্টির ক্ষমতা রহিত করিয়া অনাহারজনিত দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। ইহার ফলেই বংশবৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ব্যাপক আক্রমণ হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যখন লেবরেটরীতে প্রস্তুত 'য়্যাটাব্রিণ' এবং 'প্লাসমোচিন'এর ব্যবহার চলিতেছিল তখন হইতেই ডাঃ উড্‌ওয়ার্ড এবং ডাঃ ডোয়েরিং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার জন্য গবেষণা করিতেছিলেন। বৎসরাধিক কালের চেষ্টায় এ বিষয়ে তাঁহারা আশ্চর্য্যরূপে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন। স্বাভাবিক কুইনাইন এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই কুইনাইনের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। স্বাভাবিক কুইনাইনের অণুর মধ্যে কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন, নাই-ট্রোজেন ও অক্সিজেন প্রভৃতির পরমাণুগুলি যত সংখ্যায়, যে ভাবে সংস্থিত আছে এই দুই জন বৈজ্ঞানিক ঠিক সেই ভাবে পরমাণু-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া কৃত্রিম কুইনাইন প্রস্তুত করিয়া-ছেন। ম্যালেরিয়া-বীজাণু ধ্বংস করিতে স্বভাবজাত কুই-নাইনের অভাব ঘটিলেও এখন হইতে লেবরেটরীতেই কুইনাইন প্রস্তুত করা চলিবে।



পায়ের ভিতর দিয়া জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এজন্য জুতাকে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগে জীবাণুমুক্ত করা হইতেছে

কালিফোর্ণিয়া কলেজের কৃষিতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা মৃত্তিকা হইতে এমন দুই রকমের জীবাণু বাহির করিয়াছেন যাহাদের শরীর হইতে রোগনাশক পদার্থ নিঃসৃত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, এই জীবাণু-দেহ-নিঃসৃত পদার্থের এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা যে, ইহারা টাইফয়েড এবং ডিপথেরিয়া রোগোৎপাদক জীবাণুগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলে। চিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকেরা সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি বন্ধ করিবার জন্য একপ্রকার সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। বিবিধ রোগ-বীজাণু বাতাসে ভাসিয়া সর্ব্বত্র রোগ ছড়াইয়া থাকে। 'প্রোপিলিন গ্লাইকল' বায়ু-বাহিত ব্যাক্টেরিয়া বা

অন্যান্য জীবাণু ধ্বংস করিতে অদ্বিতীয়। তাঁহারা 'হেল্‌থ-বম্' হইতে 'স্প্রে'র সাহায্যে বাতাসের মধ্যে কুয়াসার আকারে 'প্রোপিলিন গ্লাইকল' ছড়াইয়া সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বন্ধ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সাধারণ এক-একটি 'স্প্রে'র সাহায্যে দশ-বার মিনিটের মধ্যেই ১৫০,০০০ কিউবিক ফুট পরিমাণ উন্মুক্ত স্থানকে জীবাণুমুক্ত করিতে পারা যায়।

রক্ত-কণিকা সম্পর্কীয় রাসায়নিক গবেষণায়ও জীবাণু-ধ্বংসী অনেক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকান রেড-ক্রস সমিতির চেষ্টায় আজকাল রক্তসঞ্জাত এমন একটি পদার্থ সহজলভ্য হইয়াছে যাহা হামের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে। রক্ত হইতে 'য়্যালবুমিন সিরাম' নামক এক প্রকার ঘন উপাদান প্রস্তুত করিবার সময় 'গামা-গ্লোবিউলিন' নামক এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। মনুষ্যদেহে রক্ত-কণিকার সহিত ইহা ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়াছে। মাটির উপর জন্মগ্রহণ করে এরূপ বিভিন্ন জাতীয় আণুবীক্ষণিক ছত্রক হইতে জীবাণু-ধ্বংসী বিবিধ উপাদান



জীবাণুমুক্ত রক্ত-কণিকা রোগীর শরীরে প্রবেশ করান হইতেছে

সংগৃহীত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাছাড়া মাটি হইতেও এমন কয়েক জাতীয় জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহারা মনুষ্যদেহের অনিষ্টকারী অন্যান্য জীবাণুকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। রক্‌ফেলার মেডিক্যাল ইন-ষ্টিটিউটের ডাঃ ডুবস বিবিধ জীবাণু-অধ্যুষিত মৃত্তিকাপূর্ণ পাত্রে লেবরেটরীর জীবাণু-উৎপাদক কালচার-সলিউশন ঢালিয়া ফেলিতেন। নিউমোনিয়ার জীবাণু-পরিপূর্ণ একটি টেষ্ট-টিউবে এক দিন তিনি উহা হইতে একটু মাটি ফেলিয়া দিলেন। মাইক্রো-স্কোপের নীচে রাখিয়া দেখা গেল, মাটির ব্যাক্টেরিয়াগুলি নিউমোনিয়ার জীবাণু নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ইহারা চামড়ার উপরিস্থিত ও শরীরগহ্বর এবং বুকের অভ্যন্তরস্থ বীজাণু-ধ্বংসে অদ্বিতীয়। 'ক্লোরোফিল' নামক পদার্থের জন্য উদ্ভিদের পাতার রং সবুজ দেখায়। উদ্ভিদ সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত কোন কোন বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছেন—উদ্ভিদের এই সবুজ কণিকা জলে দ্রবীভূত করিয়া কাটা, থেঁৎলানো অথবা পোড়া-ঘায়ে অব্যর্থ জীবাণু-প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।



ম্যালেরিয়া জীবাণু আক্রান্ত দুইটি হাঁস। বাম দিকের হাঁসটিকে য়্যাটাব্রিণ প্রয়োগ করা হইয়াছে

কিন্তু ইহা ছাড়াও জীবাণুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে—অধুনা-প্রচলিত 'পেনিসিলিন'। 'সাল্‌ফানিলয়ামাইড' শ্রেণীর ঔষধ অপেক্ষা কার্য্যকারিতায় ইহা শ্রেষ্ঠতর। বিশেষ বিশেষ রোগে বর্ত্তমানে পেনিসিলিনের ব্যবহার যেরূপ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ইহার সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'পেনিসিলিন' এক রকমের 'য়্যান্টি-বাইওটিক'। 'পেনিসিলিয়াম নোটাটাম' নামক এক জাতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছত্রক হইতে ইহা উৎপাদিত হয়। ১৯২৯ সালে লণ্ডন সেণ্ট মেরীস হস্‌পিটালের প্রোফেসর আলেকজাণ্ডার



যুদ্ধ-জাহাজে রোগীর এক্স-রে ছবি তোলা ও তাহাকে আলট্রা-ভায়োলেট-রশ্মি প্রয়োগের ব্যবস্থা

ফ্লেমিং ইহার রোগনাশক ক্ষমতার বিষয় আবিষ্কার করেন। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি 'কালচার-প্লেটে' ষ্ট্যাফাইলোককাস ব্যাক্টেরিয়া উৎপাদন করিয়াছিলেন। একবার এরূপ একটা প্লেটে ছাতা ধরিয়া যায়। ফ্লেমিং লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে,



পেনিসিলিনের জ্বরোৎপাদক ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য খরগোসের উপর পরীক্ষা হইতেছে

সবুজাভ ছত্রকগুলির চতুর্দ্দিকস্থ ষ্ট্যাফাইলোককাস ব্যাক্টেরিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ফ্লেমিং ইহার কারণ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। 'কালচার মিডিয়ামে' প্রচুর পরিমাণে ছত্রক জন্মাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন তাহাদের সূত্রাণুগুলি মিডিয়ামের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থি হইতে বীজোৎপাদক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত পদার্থ বাহির হইয়া আসিয়াছে। ধূলিকণার মত স্পোর-



এই বোতলগুলির মধ্যে পেনিসিলিয়াম নোটাটাম নামক ছাতা জন্মান হইতেছে

গুলির রং নীলাভ সবুজ; এইজন্য সমস্ত জিনিসটাই নীলাভ-সবুজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই 'পেনিসিলিয়াম নোটাটামে'র সূত্রাণু হইতেই 'কালচার-মিডিয়ামে'র মধ্যে এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহাই 'পেনিসিলিন'। ছত্রক-দেহ-নিঃসৃত এই পেনিসিলিনের অদ্ভুত রোগনাশক ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। দূষিত ক্ষত উৎপাদক স্ট্রেপটো, স্ট্যাফাইলো এবং গ্যাস-গ্যাংগ্রিণ উৎপাদক জীবাণুর উপরই ইহার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া য়্যান্থ্রাক্স, নিউমোনিয়া, গণোরিয়া, সিফিলিস, ডিপথেরিয়া, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগ-বীজাণুকেও ইহারা সাফল্যের সহিত আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু টিউবারকিউলোসিস, টাইফয়েড, মাল্টা-ফিভার, প্লেগ এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, সর্দ্দি প্রভৃতি 'ভাইরাস' ঘটিত রোগ ও কয়েক রকমের খাদ্য-বিষের উপর ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় না।



আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নীচে কেমন করিয়া জীবাণুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা পরীক্ষা করা হইতেছে

জীবাণু-নাশক অন্যান্য পদার্থগুলিও ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করে বটে; কিন্তু পেশী-তন্তু আক্রমণের ফলে শরীরে নানাপ্রকার বিষ-ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। এ বিষয়ে পেনিসিলিন রোগনাশক অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা উন্নততর। কারণ ইহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রোগোৎপাদক ব্যাক্টেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করে অথচ পেশী-তন্তু বা অন্যান্য দেহ-কোষকে আক্রমণ করে না। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, অতিমাত্রায় প্রয়োগেও শরীরে কোন খারাপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রক্ত, পুঁজ বা প্রোটিন জাতীয় পদার্থের উপস্থিতিতেও ইহার কার্য্যকরী শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। ইহা হৃদযন্ত্র বা শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার উপরও কোন প্রভাব বিস্তার করে না। এই সকল কারণেই পেনিসিলিন এতকাল প্রচলিত 'সাল্‌ফানিলয়ামাইড' জাতীয় জীবাণু-নাশক পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর

কার্য্যকরী এবং সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। পেনিসিলিন একটি অস্থায়ী পদার্থ ; অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার জীবাণুনাশক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাছাড়া শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলেও পেনিসিলিন খুব তাড়াতাড়ি প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই কারণেই ইহা অবিরাম ভাবে অথবা কিছুক্ষণ পর পর প্রয়োগ করা দরকার। পেনিসিলিন আঠালো পদার্থের মত করিয়া চূর্ণ রূপে বাহ্যিক প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু খাওয়াইয়া দিলে উপকারের সম্ভাবনা কম ; কারণ অন্ত্র-মধ্যস্থিত এসিডের সংস্পর্শে ইহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বে শিরায় পেনি-সিলিন ইন্‌জেকশন করিয়া দেওয়া হইত ; এখন দেখা গিয়াছে যে, অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে মাংসপেশীতে প্রবেশ করাইয়া দিলে ইহা দ্বারা অধিকতর উপকার হইয়া থাকে।



অফিস-ঘরে প্রবহমান বায়ু-স্রোতের সহিত ভাসমান জীবাণু কেমন করিয়া আল্‌ট্রা-ভায়োলেট-রশ্মি সাহায্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তীর চিহ্ন দ্বারা তাহা দেখান হইয়াছে



পেনিসিলিন উৎপাদক কর্ম্মীরা বীজাণু-নিরোধক বহির্ব্বাস পরিধান করিয়াছে

মধ্যে ছয় দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে বাড়িতে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কাথের উপরিভাগে সাদা ঘন সরের মত ছাতা জন্মিয়া থাকে। ক্রমশঃ আরও ঘন হইতে হইতে সরের মধ্যে ভাঁজ পড়িয়া যায়। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই সবুজ রঙের বীজ বা স্পোর আত্মপ্রকাশ করিবার ফলে সমস্ত জিনিসটাকেই সবুজাভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সবুজাভ মোটা সরের উপর তখন হলুদ রঙের তৈল-বিন্দুর মত কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিন্দুগুলির মধ্যে যথেষ্ট পেনিসিলিন থাকে। কিন্তু সরের নিম্নস্থিত 'ব্রথ' বা কাথের মধ্যেই বেশীর ভাগ পেনিসিলিন পাওয়া যায়। সরের নীচ হইতে আস্তে আস্তে কাথ ঢালিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাহা

যাহা হউক, পেনিসিলিন এখনও অতি দুর্লভ পদার্থ। অনেক পরিশ্রমে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অতি সামান্য মাত্রায় পেনিসিলিন পাওয়া যায়। আজকাল সামরিক কারণে এবং বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য পেনিসিলিনের উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলি-তেছে। আমাদের দেশেও আমেরিকান এবং ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক-দের সহায়তায় বোম্বাইয়ের হপকিন্স ইন্‌ষ্টিটিউটে পেনিসিলিন উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। বিশেষভাবে প্রস্তুত 'ব্রথ' বা কাথে পরিপূর্ণ বিরাট পাত্রে পেনিসিলিয়াম নোটাটামের কিয়দংশ ফেলিয়া দিলেই তাহারা দ্রুত গতিতে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 'ব্রথে'র উপরে সরের মত পেনিসিলিন জন্মিবার পর তাহার কিছু কিছু অংশ তুলিয়া লইয়া কাথ পরিপূর্ণ বিভিন্ন বোতলে স্থানান্তরিত করা হয়। বোতলের



পেনিসিলিন উৎপাদন দ্রুততর করিবার জন্য ইলেক্‌ট্রন সম্ভূত উত্তাপ ব্যবহৃত হইতেছে

হইতে বিশুদ্ধ পেনিসিলিন সংগৃহীত হয়। এক ভাগ বিশুদ্ধ পেনিসিলিন ২,০০০,০০০ গুণ তরল করিলেও তাহার জীবাণু ধ্বংস করিবার ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা কাটিবার ফলে বড় বড় ইমারতের ইস্পাতের কাঠামো যেমন করিয়া তোবড়াইয়া যায় পেনিসিলিন প্রয়োগে জীবাণুর দৈহিক গঠনও তেমন ভাবেই এবড়ো-খেবড়ো হইয়া পড়ে প্রশ্ন

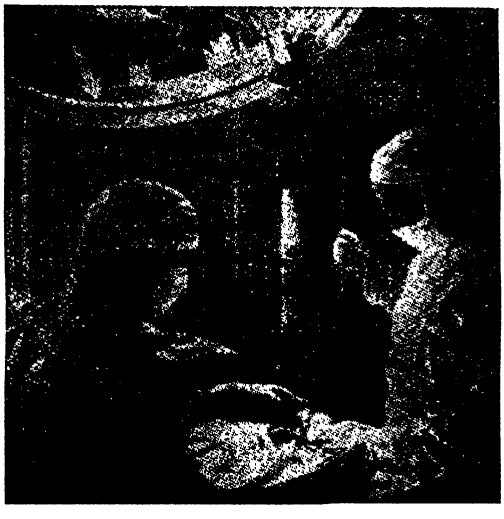


ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য আলট্রা-ভায়োলেট ষ্টেরিলাইজার

হইতে পারে, বৈজ্ঞানিকেরা পেনিসিলিন প্রয়োগের এরূপ ফলাফল প্রত্যক্ষ করিলেন কেমন করিয়া? বৈজ্ঞানিকেরা 'সুপার ইলেকট্রন-মাইক্রস্কোপ' নামক অদ্ভুত যন্ত্র সাহায্যে জীবাণুর উপর পেনিসিলিনের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'সুপার ইলেকট্রন-মাইক্রস্কোপ' বর্ত্তমান যুগের একটি অপূর্ব্ব আবিষ্কার। কোন অভিনব টেলিস্কোপের সাহায্যে নিউইয়র্ক হইতে বার্লিনের সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে যুদ্ধ-জয়ের পক্ষে তাহা যে কিরূপ সহায়ক হইত তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ে 'সুপার ইলেকট্রন-মাইক্রস্কোপ'ও সেরূপ সহায়তাই করিতেছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত শক্তিশালী মাইক্রস্কোপ অপেক্ষা এই 'সুপার ইলেকট্রন-মাইক্রস্কোপ' শতগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন। যে রকমের আলো ব্যবহৃত হয় তাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর মাইক্রস্কোপের শক্তি নির্ভর করে। আমাদের চোখে যে-সকল আলো প্রতিভাত হয়, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তাহা অপেক্ষা প্রায় লক্ষ গুণ ছোট। কাজেই এই অভিনব যন্ত্র-সাহায্যে জীবাণু বা অন্যান্য অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য পদার্থকে পঞ্চাশ হাজার হইতে প্রায় লক্ষ গুণ বর্দ্ধিত করিয়া দেখিবার পক্ষে কোনই অসুবিধা নাই। এই যন্ত্র-সাহায্যে একটি মাত্র 'মলেকিউল' বা অণুর ফটোগ্রাফ তোলাও সম্ভব হইয়াছে।

সম্প্রতি পেনিসিলিনের মত 'ক্লোরেলিন' নামে আর এক প্রকার জীবাণুনাশক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সবুজ পদার্থবিহীন ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদণু হইতে পেনিসিলিন উৎপন্ন হয়; কিন্তু 'ক্লোরেলিন' পাওয়া গিয়াছে 'ক্লোরেলা' নামে পরিচিত সাধারণ একপ্রকার জলজ সবুজ 'অ্যাল্‌গা' বা শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ হইতে। এই সবুজ 'অ্যাল্‌গা' জন্মাইতে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। সাধারণ জলের ট্যাঙ্কে কয়েকটি খনিজ লবণ জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কার্ব্বণ-ডাই অক্সাইডের বুদ্‌বুদ পরিচালন করিলেই ইহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এই ক্ষুদ্রকায় উদ্ভিদ্ হইতেই জলের মধ্যে জীবাণু-ধ্বংসী 'ক্লোরেলিন' নিঃসৃত হয়। যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন—'ক্লোরেলিন' একেবারেই জীবাণুগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। আমাদের আশেপাশে ক্লোরেলা এবং পেনিসিলিয়াম নোটাটমের মত আরও অনেক সবুজ উদ্ভিদ্ ও ছত্রকের অভাব নাই। হয়ত তাহা হইতেও রোগ-বীজাণু-ধ্বংসকারী অনেক রকম পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের অনুসন্ধানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

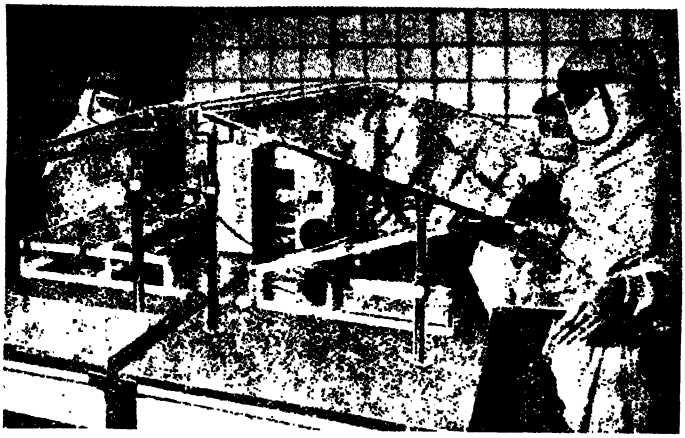
কেবলমাত্র রাসায়নিক অথবা উদ্ভিজ্জাত পদার্থের সাহায্যেই যে জীবাণু-ধ্বংসী সংগ্রাম চলিতেছে তাহা নহে, অন্যান্য প্রক্রিয়ায়ও জীবাণু নির্ম্মূল করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'আলট্রা-ভায়োলেট রে' এবং 'সুপার সনিক্স'এর নাম করা যাইতে পারে। অনেক দিন হইতেই আমরা 'ডেথ-



আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নীচে রোগীকে অস্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে

রে' বা মৃত্যু-রশ্মির কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধেও তাহা কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মৃত্যু-রশ্মির উৎপাদন সম্ভব না হইলেও বর্ত্তমানে জীবাণু-যুদ্ধে কিন্তু তাহাদের জন্য মৃত্যু-রশ্মির আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। 'আলট্রা-ভায়োলেট-রে'ই জীবাণুর পক্ষে মৃত্যু-রশ্মি রূপে কাজ করিতেছে। 'আলট্রা-ভায়োলেট-রে'র জীবাণু-ধ্বংসী ক্ষমতা এমন নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন গবর্ণমেণ্ট

যুদ্ধকালে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস, অপারেটিং রুম, বটোলিং ও প্যাকিং ফ্যাক্টরী এবং ঔষধপত্র তৈয়ারীর কারখানার মধ্যে বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন জীবাণু ধ্বংসের জন্য প্রচুর পরিমাণ আলট্রা-ভায়োলেট টিউব তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। আলট্রা-ভায়োলেট-রশ্মি জীবাণু ধ্বংস তো করেই, অধিকন্তু সংক্রামক ব্যাধি-উৎপাদক ভাইরাসও নষ্ট করিয়া থাকে। সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে সেজন্য অনেক ক্ষেত্রেই আজকাল আলট্রা-ভায়োলেট-রশ্মি ব্যবহৃত হইতেছে। 'ভ্যাক্সিন' তৈয়ারির কাজেও আলট্রা-ভায়োলেট-রশ্মির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 'ভ্যাক্সিন' তৈয়ারীর উপাদানগুলিকে পাতলা পর্দ্দার আকারে তীব্র আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নীচে প্রবাহিত করা হয়। ইহার ফলে দূষিত বীজাণু এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে মরিয়া যায়। নিউমোনিয়া, র‍্যাবিস, স্লিপিং সিক্‌নেস্ প্রভৃতি রোগের 'ভ্যাক্‌সিন' এই ভাবেই জীবাণু মুক্ত করা হইয়া থাকে।



বিশুদ্ধ পেনিসিলিন শিশিতে ভরা হইতেছে

তাছাড়া বহুবিধ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, শব্দ-তরঙ্গ সাহায্যেও ব্যাক্টেরিয়া বিনষ্ট হইতে পারে। আমেরিকান নৌ-বিভাগীয় একজন পদস্থ কর্ম্মচারী চুম্বকের সাহায্যে এমন এক প্রকার যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহার সাহায্যে বাতাসের মধ্যে সেকেণ্ডে ৯৩০০ বার কম্পন উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই কম্পন-উৎপাদক যন্ত্রের ছয় ইঞ্চি সীমানার মধ্যে যে কোন ব্যাক্টেরিয়া লইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমানে এই সকল জীবাণু-ধ্বংসী পদার্থসমূহ বহুলাংশে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলেও যুদ্ধোত্তরকালে জনসাধারণই ইহার ফলভোগী হইবে। অনিষ্টকারী জীবাণু-ধ্বংসের এই সকল অপূর্ব্ব আবিষ্কারসমূহ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিরূপ সাফল্যের সহিত প্রযুক্ত হইতেছে অন্ততঃ একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ফ্রান্সের রণক্ষেত্র হইতে গুরুতর ভাবে আহত ৫৬১ জন সৈন্যকে ইংলণ্ডে আনা হয়। বিভিন্ন রকমের ক্ষতের জন্য বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগের ফলে তাহাদের একজনও মৃত্যু-মুখে পতিত হয় নাই। অথচ গত যুদ্ধের সময় যখন এই সকল পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই তখন এই ধরণের দূষিত ক্ষতের ফলে শতকরা নব্বই জনই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন এই ধরণের অন্যান্য আবিষ্কারের ফলে শীঘ্রই এমন এক নূতন জগতের পত্তন হইবে যাহাতে মানুষ আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে এবং এই সকল আবিষ্কারের ফলভোগী মানুষেরা 'দীর্ঘজীবী' নামক এক অভিনব মনুষ্যজাতিরূপে পরিগণিত হইবে।

শেষ-সম্ভাষণ

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

পৃথিবী আমার চির জন্ম-নিকেতন,
তোমারে জানাই মোর শেষ নিবেদন
নূতন জগতে মোরে জন্ম যবে দিলে
আকাশে নূতন তারা ফুটাইয়াছিলে
সাথে সাথে তার, তুমি জান অন্তর্য্যামী,
অসংখ্য তারার মাঝে কোন্ তারা আমি।
আমারে লইয়া কোলে পৃথিবীর প্রাণ
কত সুখে দোলা দিল, দুঃখে দিল ত্রাণ,
যদিও আকাশে জন্ম, ধরণীর চোখ,
স্নিগ্ধ করে অন্ধকারে তারার আলোক,
ধরায় তারায় তাহে হয় মাখামাখি,
দুঁহু করে বাঁধে দোঁহে মিলনের রাখী।
ভোরের আকাশ, মোর ভোরের আকাশ,
তোমাতে বিলুপ্ত যত তারার প্রকাশ।
তুমি আদি জন্মস্থান, তুমি শেষ ঘর,
শুনাও শেষের বাণী মোরে অতঃপর,
আয়ুশেষে যাত্রাশেষে আত্মবিসর্জ্জন—
এ মোর সমাপ্তি গান, শেষ সম্ভাষণ॥

আরাকান

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরেজবাহিনী আকিয়াবে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র আরাকান অদ্যাপি শত্রুকবলমুক্ত হয় নাই। সহস্র সহস্র বাঙালী আরাকানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল; তাহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে জাপানীদের পশ্চাদপসরণের অপেক্ষা করিতেছে।

আরাকানের সহিত বাংলার ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ক্ষুদ্র নাফ নদী আরাকান এবং চট্টগ্রামের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। আরাকান হইতে চট্টগ্রামে যাতায়াত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত করা কঠিন। সুদীর্ঘ আরাকান-ইয়োমা পর্ব্বতমালা বিশাল প্রাচীরের ন্যায় ব্রহ্মদেশ হইতে আরাকানকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রাচীর অতিক্রম করিবার জন্য কয়েকটি সুপরিচিত গিরিপথ আছে, কিন্তু সেগুলি অতি দুর্গম। আরাকান পার্ব্বত্য প্রদেশ। ইহার উত্তরাংশ 'পার্ব্বত্য আরাকান' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের পর্ব্বতমালা সাধারণতঃ লুসাই পর্ব্বতমালা এবং চীন পর্ব্বতমালার অংশরূপে পরিগণিত। নাফ এবং মায়ু নদীর মধ্যবর্ত্তী অংশ মায়ু পর্ব্বতমালা কর্ত্তৃক আবৃত। আরাকানের নদীগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান—কালাদান, লেম্রো ও মায়ু। কালাদান নদী চীন পর্ব্বতমালায় উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। ইহার মোহানায় আকিয়াব বন্দর অবস্থিত—এখানে নদীর প্রস্থ প্রায় ছয় মাইল। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আরাকানের মগ রাজগণ এই নদীর তীরে বাঙালী বন্দীদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতেন, তাই ইহার নাম কালাদান (কালা = বিদেশী, দান = বাসস্থান)।

আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহং, বর্ত্তমান আকিয়াব জেলায় লেম্রো নদীর নিকটে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র শহর সাড়ে তিন শত বৎসর কাল (১৪৩৩-১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) আরাকানের স্বাধীন রাজগণের রাজধানী ছিল। আরাকান ব্রহ্ম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে ইহার গৌরব বিলুপ্ত হয়। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের (১৮২৪-১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ) সময়ে ইংরেজরা ইহাকে 'আরাকান নগর' (City of Arakan) বলিতেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ইংরেজবাহিনী ব্রহ্ম-সেনাপতিকে বিতাড়িত করিয়া এই শহর অধিকার করে। কিন্তু এই শহর অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া এখানে ব্রিটিশ-শাসনের কেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান আকিয়াব শহরে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তখন আকিয়াব মৎস্যজীবী-অধ্যুষিত ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। ইংরেজ-শাসনের ফলে ইহা ব্রহ্মদেশের অন্যতম প্রধান বন্দরে পরিণত হইয়াছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আরাকানে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। ম্রোহং শহরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে যে বিশাল মহামুনি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অতি প্রাচীন কীর্ত্তি। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান জয় করিয়া ব্রহ্মবাহিনী বৌদ্ধগণের পরমবাঞ্ছিত এই পবিত্র মূর্ত্তি ব্রহ্ম-রাজধানীতে লইয়া যায়। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরাকানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে-সকল রাজা আরাকানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের সহিত 'চন্দ্র' শব্দ সংযুক্ত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের 'চন্দ্র' রাজগণের (রাজ্যকাল আনুমানিক ৯৫০-১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ) সহিত ইঁহাদের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন। যাহা হউক, দশম শতাব্দী হইতে আরাকানে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরাকানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। আরাকানে 'বদরমোকান' নামক এক শ্রেণীর মসজিদ আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সমভাবে বদরমোকানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সম্ভবতঃ ইস্‌লামের প্রভাবেই আরাকানে পর্দ্দা-প্রথা আংশিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। আরাকানের নারী সর্ব্ববিষয়ে ব্রহ্মনারীর মত স্বাধীনা নহে।

আরাকানের সহিত ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ কখনও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। পাগানের ব্রহ্মরাজগণ (১০৪৪-১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) আরাকানের উত্তরাংশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ-আরাকান তাঁহাদের আধিপত্য স্বীকার করে নাই। ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পর আরাকান আর কখনও ব্রহ্মরাজের অধীনতা স্বীকার করে নাই। পাঁচ শত বৎসর স্বাধীনতা ভোগের পর ১৭৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান ব্রহ্মরাজের পদানত হয়। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশের রাজগণ সময় সময় আরাকানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরাকানরাজ নরমেখ্‌লা ব্রহ্মবাহিনীর উৎপাতে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৌড়ের সুলতানের সহায়তায় তিনি সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনিই ম্রোহং শহর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক মানরিকের গ্রন্থে দেখা যায় যে, ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১৬০,০০০; এই সংখ্যা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু ম্রোহং যে এককালে জনবহুল শহর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

নরমেখ্‌লার পরবর্ত্তী আরাকান-রাজগণের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও মুসলমান নাম ব্যবহার করিতেন (যথা, আলি খাঁ, কলিমা শাহ্, সলিম শাহ্, হুসেন শাহ্, ইত্যাদি) এবং মুদ্রায় ফারসী ভাষায় কল্‌মা উৎকীর্ণ করাইতেন। আলি খাঁ (১৪৩৪-১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ত্তমান চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রামু অধিকার করেন। ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিমা শাহ্ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। দুই শতাব্দীর অধিককাল চট্টগ্রাম আরাকানের অধিকারভুক্ত ছিল; ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম জয় করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আরাকানে পর্ত্তুগীজগণের উৎপাত আরম্ভ হয়। সেকালে চট্টগ্রাম পর্ত্তুগীজগণের বাণিজ্যের

ও দস্যুতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুতরাং আরাকানের সহিত তাহাদের সংঘাত অনিবার্য্য ছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই মগেরা পর্ত্তুগীজগণের সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। দুই দল দস্যুর মিত্রতা দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ সলিম শাহ্ ছয় শত পর্ত্তুগীজকে হত্যা করেন। পর্ত্তুগীজগণ সন্দীপ অধিকার করিয়া আরাকানে নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ্ সন্দীপ অধিকার করিয়া পর্ত্তুগীজগণের ক্ষমতা বিচূর্ণ করেন। অতঃপর মগ ও পর্ত্তুগীজ পুনরায় মিত্র-ভাবাপন্ন হইয়া অকথ্য অত্যাচারে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ শ্মশানে পরিণত করিল। বাংলার মুঘল সুবাদারগণ এই অত্যাচার দমন করিতে পারেন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালেও কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে মগদের আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। মগদের অত্যাচারের কাহিনী বাঙালী এখনও ভুলিতে পারে নাই ; 'মগের মুলুক' কথাটির মধ্যে সেকালের ভয়াবহ স্মৃতি অদ্যাপি জাগিয়া রহিয়াছে।

আরাকানের সহিত ভাগ্যবিড়ম্বিত সুজার করুণ স্মৃতি বিজড়িত। সিংহাসন লাভের প্রয়াস ব্যর্থ হইলে তিনি প্রাণ-রক্ষার্থ আরাকানে পলায়ন করেন। আরাকানরাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিলে সুজা নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঘটনাচক্রে গুপ্তকথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আরাকানরাজ সুজার প্রাণদণ্ড করিয়া তাঁহার কন্যাদিগকে নিজের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। কিছুদিন পরে আরাকানরাজ পুনরায় ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া সুজার পুত্রকন্যাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিলেন। কিন্তু আরাকানবাসীদিগকে এই নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। সুজার মৃত্যুর পর মুঘল-বাহিনী সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করিল। সুজার অনুচরগণ সামরিক শক্তি-বলে আরাকানের ভাগ্যবিধাতা হইয়া দাঁড়াইল। তাহা-দের সমর্থন ব্যতীত কাহারও আরাকানে রাজত্ব করিবার সাধ্য রহিল না। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত করিল ; আরাকানে সম্পূর্ণ অরাজকতা আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক রাজা কয়েক বৎসরের জন্য আরাকানে শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই অরাজকতার পুনরাবির্ভাব হইল।

এই অরাজকতার সদ্ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মরাজ বোদাপায়া আরাকান অধিকার করিলেন। তাঁহার পিতা আলংপায়া ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্ত্তক। আলংপায়া সমগ্র ব্রহ্মদেশ নিজের অধিকারভুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পশ্চিমে মণিপুর এবং দক্ষিণে শ্যামদেশ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মজাতির নবজাগ্রত পৌরুষের পরিচয় দিয়াছিলেন। বোদা-পায়া পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বারংবার শ্যামদেশ আক্রমণ করেন এবং আরাকান, মণিপুর ও আসাম অধি-কার করেন। কিন্তু আরাকান বিজয় তাঁহার সামরিক শক্তির পরিচায়ক নহে, কারণ তিনি একরূপ বিনাযুদ্ধেই আরা-কান অধিকার করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতায় উৎপীড়িত হইয়া আরাকানবাসিগণ রাজনৈতিক বুদ্ধি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা হারাইয়াছিল। তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-গণের অনুরোধেই বোদাপায়া আরাকানে সৈন্য প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। বোদাপায়াকে মুক্তিদাতারূপে কল্পনা করিয়াই আরাকানবাসিগণ তাঁহার সৈন্যদলকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু আরাকানবাসিগণের এই সুখস্বপ্ন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিজয়ী ব্রহ্মবাহিনী আরাকান পরিত্যাগ করিল ; সঙ্গে লইয়া গেল বন্দী আরাকান-রাজকে এবং বিশ সহস্র আরাকানবাসীকে। সমগ্র আরাকান-রাজ্য চারিভাগে (আরাকান, রামরী, চেদুবা, স্যাণ্ডোয়ে) বিভক্ত হইয়া চারিজন ব্রহ্মদেশীয় শাসনকর্ত্তার অধীনে স্থাপিত হইল। ব্রহ্মরাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে আরাকানবাসীরা অল্পদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ফলে আরাকানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ভৌগোলিক সান্নিধ্যবশতঃ চট্টগ্রাম এই বিদ্রোহের সহিত জড়িত হইয়া পড়িল। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সূত্রপাত হইল।*

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আরাকান-সীমান্তে ব্রহ্মবাহিনীর উপদ্রব যুদ্ধ ঘোষণার অন্যতম প্রধান কারণ, সুতরাং আরাকান হইতে ব্রহ্মবাহিনীর বহিষ্কার যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল। যুদ্ধারম্ভে আরাকানে ব্রহ্মবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খ্যাতনামা সেনাপতি মহাবন্দুলা। আত্ম-শক্তিতে তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল ; তিনি ব্রহ্মরাজকে বলিয়া-ছিলেন যে বঙ্গদেশ অধিকার তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ কার্য্য। কিন্তু আরাকান-রণক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা না করিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম ভাগে আরাকান প্রদেশের চারিজন শাসনকর্ত্তার অধীন প্রায় আট সহস্র ব্রহ্মসৈন্য নাফ নদী অতিক্রম করিয়া রামু অভিমুখে অগ্রসর হইল। ঐ অঞ্চলে ইংরেজ-বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন কাপ্তান নোটন। তিনি যথাসময়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে ব্রহ্মবাহিনীর পক্ষে রামুতে উপস্থিত হওয়া কঠিন হইত। ১৭ই মে তারিখে রামুতে দুই পক্ষে সম্মুখ-যুদ্ধ হইল। ইংরেজদের পরাজয় হইল ; কাপ্তান নোটন স্বয়ং নিহত হইলেন। প্রায় ২৫০ ইংরেজ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইল। কয়েকজন বন্দী বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ব্রহ্ম-রাজধানী আভাতে প্রেরিত হইল। সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ত্রাসের সঞ্চার হইল ; ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিবাসীরা শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত হইল। মহাবন্দুলা যদি এই সঙ্কটকালে সাহসের পরিচয় দিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন তবে ফলাফল কি হইত বলা কঠিন, কারণ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তখনও প্রবল আক্রমণ রোধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু রামুর যুদ্ধের কয়েকদিন পূর্ব্বে ইংরেজ-বাহিনী রেঙ্গুন অধিকার করিয়া-ছিল। ফলে মহাবন্দুলা আরাকান হইতে সৈন্যসামন্ত লইয়া ব্রহ্মদেশে চলিয়া গেলেন, পেগু প্রদেশ হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ডোনাবিউর যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন।

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য ১৩৫০ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে বর্ত্তমান লেখকের 'ইংরেজের ব্রহ্মবিজয়' প্রবন্ধ দেখুন।

রামুর যুদ্ধের সমকালেই ইংরেজরা মিগ্রাইস্ ও চেদুবা দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে যুদ্ধ প্রায় স্থগিত রহিল, কারণ বর্ষায় আরাকানে এত বেশী বৃষ্টিপাত হয় যে তখন যুদ্ধ পরিচালনা করা কঠিন হইয়া পড়ে। মহাবন্দুলার প্রস্থানের পর ব্রহ্মবাহিনী ম্রোহং শহরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ইংরেজদের আক্রমণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জেনারেল মরিসন আরাকান বিজয়ের ভার গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে চট্টগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। ১লা এপ্রিল প্রায় বিনা যুদ্ধে ম্রোহং অধিকৃত হইল। ব্রহ্মবাহিনী কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অতঃপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রামরী ও স্যাণ্ডোয়ে ইংরেজদের হস্তগত হইল। আরাকানে ব্রহ্মরাজের অধিকার বিলুপ্ত হইল।

দুই বৎসর যুদ্ধের পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইয়ান্দাবুর সন্ধি দ্বারা প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হয়। ব্রহ্মরাজ আসাম, মণিপুর, কাছাড়, জয়ন্তিয়া, আরাকান ও তেনাসেরিম প্রদেশ কোম্পানীকে প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের সূত্রপাত হইতে না হইতেই চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট রবার্টসন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পূর্ব্ববঙ্গের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আরাকানে ব্রহ্মরাজের অধিকার বিলোপ করা অত্যাবশ্যক। তিনি আরাকানে মগ-শাসন প্রতিষ্ঠারও বিরোধী ছিলেন, কারণ কোন মগ দলপতি আরাকানে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। আরাকানবাসীরা দুই দলে বিভক্ত ছিল—এক দলের নায়ককে আরাকানের আধিপত্য প্রদান করিলে অপর দল বিদ্রোহী হইবে। সুতরাং রবার্টসন সাহেব সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ব্রিটিশ শাসন প্রবর্ত্তনই আরাকানে শান্তি রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। আরাকানে প্রচুর চাউল উৎপন্ন হয় এবং আরাকান বাঙালীদের বাসের উপযুক্ত। রবার্টসন প্রস্তাব করিলেন যে আরাকানে বাঙালী কৃষক আনাইয়া পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষের ব্যবস্থা করা হউক।

আরাকান-বিজয়ের পর রবার্টসন আরাকানের বে-সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে ইয়ান্দাবুর সন্ধির শর্ত্ত আলোচনাতেও তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্ট প্রথমে আরাকানে ব্রিটিশ-শাসন প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। আরাকান ব্রহ্ম সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সম্ভবতঃ রবার্টসনের আগ্রহাতিশয্যেই তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রবার্টসন সন্ধির শর্ত্ত আলোচনার জন্য ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হইলে প্যাটন আরাকানে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আরাকানের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টে আরাকান সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সমগ্র আরাকান প্রদেশের লোকসংখ্যা তখন এক লক্ষের বেশী ছিল না (মগ—৬০,০০০; মুসলমান—৩০,০০০; ব্রহ্মদেশীয়—১০,০০০)। আরাকান হইতে ব্রহ্মরাজ বার্ষিক মাত্র ১৮,৬৬৩ টাকা কর পাইতেন। ধান্যের চাষ বাড়াইতে না পারিলে আরাকানের আর্থিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা ছিল না।

ইয়ান্দাবুর সন্ধির পর আরাকান একজন কমিশনারের শাসনাধীন হইল। তিনি সাক্ষাৎভাবে বড়লাটের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য করিতেন। শাসন-পদ্ধতি ও আইন-কানুন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সহিত যতটা সম্ভব সাদৃশ্য রক্ষা করা হইত। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান হইতে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মোট আয় হইয়াছিল কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের বার্ষিক আয় ও ব্যয় ছিল যথাসময়ে ১৪,৫০,০০০ টাকা এবং ৫,০০,৫০০ টাকা। ধানের চাষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ৬৬,০০০ একর জমিতে ধান উৎপন্ন হইত; ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ধানের জমির পরিমাণ ছিল ৩৫০,০০০ একর।

মগেরা সভ্যতায় উন্নত না হইলেও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় কোন সভ্য জাতি অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। কিংবেরিং কর্ত্তৃক পরিচালিত স্বাধীনতা-সমরের সংক্ষিপ্ত কাহিনী আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি।* ব্রহ্মযুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভে আরাকানবাসিগণের মনে নূতন আশার আলোক সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে যুদ্ধাবসানে তাহারা স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র বার্ষিক কর দাবী করিবে। ইয়ান্দাবুর সন্ধির পর তাহাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে তাহারা পাইল কঠোর শাসন। অতিরিক্ত কর-ভারে নিপীড়িত হইয়া মগেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। আরাকানে মগ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। এই জাতীয় আন্দোলনের নায়ক হইলেন কিংবেরিং-এর দুইজন আত্মীয়। তাঁহারা দুই জনেই ব্রহ্ম-শাসনের বিভীষিকা হইতে মুক্তিলাভের আশায় যুদ্ধকালে ইংরেজদের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং প্রতিদানে সামরিক পদ পাইয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে স্বাধীনতা লাভের আশা বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ফলে একজন ইংরেজের কারাগারে আবদ্ধ হইলেন, আর একজন পলায়ন করিয়া ব্রহ্ম-দরবারে আশ্রয় লাভ করিলেন। কিছুদিন পরে নূতন নেতার অধীনে প্রকাশ্য বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের বিদ্রোহের যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। বিদ্রোহীরা বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া ইংরেজের ইতিহাসে দস্যু নামে পরিচিত হইল—

"বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্য রবে—"

---

* ১৩৫০ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য।

দল্‌মা অভিযাত্রী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ঘরের নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে পদব্রজে সিংভূমের পাহাড়-জঙ্গল পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। বাদাম পাহাড়ের লৌহ খনি আর রাখা মাইন্সের তাম্রখনি দেখে নাদুপ গ্রামে "হো"-দের পল্লীতে একরাত্রি কাটিয়ে অবশেষে আশ্রয় নিলাম জামশেদপুরের পশ্চিম প্রান্ত-সীমায় এক নিভৃত স্থানে। জায়গাটি রমণীয়। পেছনে বিস্তীর্ণ বালুশয্যার প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত



দল্‌মা পাহাড়ের একটি দৃশ্য

ক্ষীণতোয়া নদীর ওপারে শালবনের সবুজ সমারোহ, সম্মুখে দিগন্তস্পর্শী দল্‌মা পাহাড়ের নীল মায়া। পাহাড়ের উপরকার ঘন বনের নিবিড়তার ভিতর দিয়ে পাহাড়ীদের পায়ে চলার আঁকাবাঁকা পথ যেন কোন সুদূর রহস্যলোকের অভিমুখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ঐ পথ-রেখার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরের মায়ার চেয়ে পথের আকর্ষণই প্রবল হয়ে ওঠে।

একদিন শেষরাত্রে অজানা পথেই বেরিয়ে পড়লাম দল্‌মা অভিযানে। পাহাড় দেশের কন্‌কনে শীত যেন হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে আবৃত বিরাট্‌ লৌহ নগরী যেন ঘুমন্ত দৈত্যপুরীর মত রহস্যময়। যন্ত্রপুরী অতিক্রম করে অবশেষে চলতে লাগলাম সুবর্ণরেখার পার ধরে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর চেয়ে পথ-চলার আনন্দই ছিল প্রবল। সেজন্য পথের খুঁটিনাটি সন্ধান নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি। সাঁকোর ওপর দিয়ে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে এসে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। কারখানার ধূমকলঙ্কিত আকাশে অরুণোদয়ের আরক্ত মহিমা।

পশ্চিমাভিমুখী একটা রাস্তা ধরে চলতে চলতে অবশেষে এসে প্রবেশ করলাম এক গভীর অরণ্যে। সর্পিল অরণ্য-পথ বেয়ে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখি রাস্তাটি ওপরে না উঠে ক্রমশঃ নীচে নামছে। উৎরাই পথে ক্রমাবরোহণ করতে করতে অবশেষে এসে পৌঁছলাম উন্মুক্ত প্রান্তরে এক আরণ্য জনপদে। দক্ষিণে দিগন্ত-প্রসারিত ধানের ক্ষেত, উত্তরে অনতি-উচ্চ মালভূমি, মাঝখানে ছবির মত আদিবাসীদের সুন্দর এই পল্লীটি। মেয়েরা মাটির কলসী কাঁকালে নিয়ে রওনা হয়েছে জল আনতে। পরনে তাদের চওড়া লালপাড় শাড়ি, হাতে কয়েক গাছি চওড়া শাদা শাঁখা, পায়ে রুপার খাড়ু, গলায় লাল ফিতে ঝোলানো। মাথায় এলো-খোঁপা। কুচকুচে কালো চুলে, টকটকে লাল ফুল গোঁজা। গতি তাদের ছন্দোময়, চোখে আদিম বিস্ময়। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মেয়েদের সহজ সরল চাহনি মেঘদূতের ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞা, প্রীতিস্নিগ্ধ-লোচনা জনপদবধূদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে পড়ে মেঘের প্রতি যক্ষের উক্তি—

"ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণ সুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ ব্রজলঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ॥"

দক্ষিণ-ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলের কোন্‌ জনপদবাসিনীদের ভ্রূ-লীলা-বিহীন স্নিগ্ধ দৃষ্টি মহাকবির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

পথের পাশেই আদিবাসীদের সারি সারি দোচালা ঘর। ঘর-দোর সযত্নে নিকানো-পুছানো—তৈজসপত্র মাজা-ঘষা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। সব কিছুতেই সুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্নতা, প্রতিটি



দল্‌মা পাহাড়ের পথে

গৃহ-সংলগ্ন সযত্ন-রচিত পুষ্পোদ্যানে সহজাত সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচয়, গেরিমাটি দিয়ে লেপা গৃহ-প্রাচীরে অঙ্কিত গাছপালা লতাপাতার ছবিতে আদিম শিল্প-কলার প্রতিরূপ। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই হাসিখুশী মুখ দেখে মনে হয়, এদের জীবনে দুঃখ-দৈন্যের লেশ নেই। প্রতি গৃহে নিটোল স্বাস্থ্য আর অনাবিল

আনন্দের প্রতিচ্ছবি। স্নিগ্ধ প্রভাতে আরণ্য প্রকৃতির পটভূমিকায় স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার এই আনন্দচ্ছবিটি মনকে মুগ্ধ করল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানস-পটে ভেসে উঠল দিনকতক আগে ডিমনার পথে দেখা আর একটি দৃশ্য। সেদিন দেখেছিলাম কারখানার ভোরের সিটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে পাহাড়ীরা রওনা হয়েছে লৌহনগরীর দিকে। সে যেন চলন্ত কাঙালের এক বিরাট্ মিছিল। কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনি তাদের জীবনী শক্তিকে তিল তিল করে নিঃশেষ করে ফেলছে। দল্‌মার পথের এই বন্যদের পল্লীতে যন্ত্রপুরীর সর্ব্বনাশা বাঁশীর সুর এখনো পৌঁছয় নি। তাই তারা নিটোল স্বাস্থ্য আর খুশী-ভরা মন



জনৈক হো

নিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করছে। কিন্তু মানুষ যে ভাবে নির্ম্মমহস্তে সিংভূমের অরণ্যকে নির্ম্মূল করতে সুরু করেছে, তাতে দল্‌মার পথের এই অরণ্যচারীরাও যন্ত্র-দানবের সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষার হাত থেকে রেহাই পাবে বলে মনে হয় না।

খানিক বিশ্রামান্তে আবার সুরু হ'ল পথ-চলা। কে যেন চোখে মায়া-অঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে যা-কিছু দেখছি তাই ভালো লাগছে। প্রকৃতিকে উপভোগ করবারও বিশেষ একটা 'মুড' আছে। অজানা পথে একলা বেরুলেই যেন সে মুডকে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। পাহাড়তলীতে গরু মোষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি চরে বেড়াচ্ছে, কুচকুচে কালো মোষের উপর মিশকালো পাহাড়ী ছেলে নিশ্চিন্ত আরামে বসে আছে, মেঠো পথের ওপর দিয়ে পরস্পরের গলা জড়াজড়ি করে মিঠে সুরে গান গাইতে গাইতে চলেছে পাহাড়ী তরুণীর দল। একটা তারের যন্ত্র বাজাতে বাজাতে চলেছে মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুলওয়ালা একটা লোক। এমনি কত বিচিত্র ছবির স্রোত যেন চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে। নতুন ছবির বই দেখে ছেলেদের মনে যে-রকম আনন্দ হয় তেমনি খুশীতে মন ভরে আছে।

বন-প্রান্তর অতিক্রম করে চাণ্ডিল নামক এক বস্তিতে পৌঁছে দল্‌মার পথ-নির্দ্দেশক একটি সাইন-বোর্ডের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। ডানদিকে অনতিদূরে জঙ্গলের ভিতর মরা ডাল আর শুকনো পাতায় ছাওয়া একটা কুটীরের দাওয়ায় বসে কয়েকজন পাহাড়ী 'হাড়িয়া' (ধেনো মদ) পান করছে। বখশিশ কবুল করায় এক ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করে দল্‌মায় নিয়ে যেতে রাজি হ'ল। লোকটি উলঙ্গপ্রায়, নাম তার চরণ। কাজ-চলা-গোছের বাংলা বলতে পারে। তার নিকট শুনলাম যে, দল্‌মা পাহাড়ের শিখরদেশে অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে এক শিবলিঙ্গ।

হাতে তীর ধনু, পিঠে একটা বোঁচকা—চরণ চলেছে আগে আগে, তার পিছনে পিছনে মুগ্ধবিস্ময়ে বন-পথের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করতে করতে চলেছি আমি। অজানা অচেনা দুর্গম পথে অভিযানের আনন্দে মন হয়ে আছে ভরপুর। রাস্তার দুধারে পিয়াল, কুসুম, শাল, মহুয়া, আমলকী, বুনো কুল ইত্যাদি আরো কত নাম-না-জানা বন্যবৃক্ষের নিবিড় অরণ্য। অরণ্যভূমি বন্যদের ধাত্রী দেবতা। অরণ্যের স্নেহক্রোড়ে প্রতিপালিত তারা। চরণও অরণ্যমাতৃক দেশের লোক। আরণ্য বৃক্ষের সঙ্গে তার আশৈশবের মিতালি। কোন্ গাছের শাখায় কখন ফুল ফোটে, ফল ধরে, কোন্ গাছ থেকে মদ তৈরি হয়, এ সমস্ত তার নখ-দর্পণে। গাছপালার প্রতি আমার প্রীতির পরিচয় পেয়ে আর তাদের নাম জানবার আগ্রহ দেখে চরণের ভারি আনন্দ। বনের ভিতর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলে —"ঐ যে দেখছিস মস্ত উঁচু গাছে বেগুনী ফুল ফুটে আছে সি কোড়ল ফুল বটেক।"

কোড়ল ফুলের গন্ধামোদিত চড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ের ওপর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চোখের সম্মুখ থেকে বনলক্ষ্মীর শ্যামাঞ্চলখানা অপসারিত হবামাত্রই উদ্ঘাটিত হ'ল এক বিরাট্ বিচিত্র দৃশ্যপট। বাঁ-দিকে খদের ওপারে অভ্রভেদী একটি পাহাড় অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গিরি-পাদমূলে হেমন্তের পক্ক ধান্যে পরিপূর্ণ স্বর্ণশীর্ষ শস্যক্ষেত্র। ধরিত্রী যেন মুঠো মুঠো স্বর্ণাঞ্জলি দ্বারা শৈল-পাদার্চ্চনে রত। দক্ষিণে অনতিদূরে এক উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের শিখরদেশ থেকে নিরবচ্ছিন্ন শ্যামল বনশ্রেণী ক্রমনিম্ন ভাবে একেবারে সমতল ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত। স্বর্গ থেকে সবুজের বন্যা যেন বিপুল স্রোতে নেমে এসেছে ধরণীর বুকে।

বেলা দশটা নাগাদ মেদিনীপুর জমিদারী কাছারির খাস জঙ্গলে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে দুধারে বহুদূর বিস্তৃত ছেদহীন ঘন বনের ভিতর দিয়ে বনলক্ষ্মীর সিঁদুর-মাখানো সিঁথি-রেখার মতো রাঙা মাটির পথ ক্রমোচ্চভাবে চলে গিয়েছে গিরি-চূড়ার অভিমুখে। এখানকার অনন্ত প্রসারিত অরণ্যের শুব্ধ গম্ভীর বিরাট্ রূপ হৃদয়কে যেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিলে। সমস্ত আরণ্য প্রকৃতিকে পরিব্যাপ্ত করে

আছে এক সুগভীর নিস্তব্ধতা। বনের ভিতরে মাঝে মাঝে দীর্ঘায়িত ঘণ্টাধ্বনির মত নাম না-জানা পাখীর ডাক, কচিৎ উড়ন্ত পাখীর পক্ষ-বিধুনন-শব্দ, মৃদু বাতাসে পত্রের মর্ম্মর এমনি বিচিত্র-মধুর ধ্বনি-সংঘাত অতলস্পর্শ নীরবতার সমুদ্রে



সিংভূমের আদিবাসী রমণী

ক্ষণিকের জন্য আলোড়ন তুলে আবার তাতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মনে জাগছে রূপরসবর্ণগন্ধময়ী প্রবৃত্তির অন্তরালস্থিত কোন্ এক চৈতন্যময় বিরাট্ সত্তার দিব্যানুভূতি। আমার সমস্ত চেতনা যেন নৈঃশব্দ্যের সমুদ্রে অবগাহন করে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসাস্বাদন করছে।

এগিয়ে চলেছি যেন এক রোমান্সে ভরা, রহস্যময় অজানা, অচেনা জগতের ভেতর দিয়ে। "অরণ্যের ভাষাহীন বাণী যেন রক্তে দোলা দেয়, চেতনায় জেগে ওঠে প্রকৃতির সঙ্গে যুগ-যুগান্তরের একাত্মতার অস্ফুট আভাস। রাস্তার দু'ধারে খদের গভীরতম তলদেশ থেকে সরল, সমুন্নত, ঘনসবুজ পত্রসমাচ্ছন্ন বনস্পতিসমূহ উঠেছে ঊর্দ্ধ পানে আলোর প্রত্যাশায় অনন্ত-যৌবনা ধরণীর উচ্ছ্বসিত প্রাণপ্রাচুর্য্যের পরিচয়পত্র বহন করে। সৃষ্টির আদিম রহস্য যেন ঐ তরুশ্রেণীর ঘনান্ধকারে পুঞ্জীভূত। অরণ্যানী অতিক্রম করে শৈলসানুদেশে এসে দেখি পাহাড়ের গায়ে যেন রঙের আগুন ধরে গেছে। সুদূরপ্রসারিত অধিত্যকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত হলদে রঙের পুষ্পসমাচ্ছন্ন একজাতীয় গুল্মবৃক্ষে পরিপূর্ণ। পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবক শাখা আর পত্রগুচ্ছকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঐ বন-কুসুমের বর্ণ-বৈভবের পানে তাকিয়ে চোখে যেন রঙের নেশা ধরে যায়। অধিত্যকা প্লাবিত করে গড়ানে গিরিগাত্রের উপর দিয়ে রঙের স্রোত যেন সমতলে গড়িয়ে পড়ছে।

মাথার ওপর পল্লবভারাবনত বনস্পতির শ্যাম উত্তরচ্ছদের নীচে আরণ্য কুসুমের গন্ধমাতাল মৌমাছিদের অবিরাম গুঞ্জনধ্বনি যেন নৈঃশব্দ্যের বুকে অতি সূক্ষ্ম সুকুমার শব্দের জাল বুনে চলেছে। ফুলবনের ওপর দিয়ে হলদে পাখাওয়ালা এক ধরণের ছোট ছোট প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে, ফুলগুলিই যেন পাপড়ি মেলে উড়নশীল। দলমার গহন গভীরে এ যেন এক অপরূপ রূপরাজ্য, রঙের উৎস এখানে সহস্র ধারায় উৎসারিত।

পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে শিবস্থান। মানুষ এখানে দেবতার জন্য মন্দির তৈরি করে দেয় নি। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে পাহাড়ের পাষাণ-গাত্রে রচিত হয়েছে এখানকার নিভৃত দেবনিকেতন। প্রস্তরময় পর্ব্বতশৃঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে অভ্রভেদ করে উন্নত শিরে। মাঝখানটা তার ফাঁপা। দু'ধারে প্রায় শ'খানেক ফুট ব্যবধানে অত্যুচ্চ দু'টি পাষাণ-প্রাচীর প্রকাণ্ড এক প্রস্তরাচ্ছাদনকে মস্তকে ধারণ করে অবস্থিত। সেই বিশাল প্রস্তরস্তরের ওপর বিরাট্‌কায় এক মহীরুহ ঊর্দ্ধমুখী অভীপ্সার মতন অনন্ত আকাশের পানে অগণিত শাখা-বাহু বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। সুদৃঢ়, সুদীর্ঘ শিকড়গুলো তার পর্ব্বতশিখরের পাষাণগাত্র বিদীর্ণ করে নিম্নাভিমুখে লম্বমান। দৃশ্যটির বিরাটত্ব অনন্তের আভাস জাগিয়ে হৃদয়কে যুগপৎ শ্রদ্ধামিশ্র ভীতি ও বিস্ময়ে অভিভূত করে।



বাদাম পাহাড়ের মজুরণী

শিলাময় গিরি-গাত্র কেটে মানুষ তৈরি করেছে ঊর্দ্ধে আরোহণের সোপান। প্রায় দুই শত সোপান অতিক্রম ক'রে সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত এক সঙ্কীর্ণ গুহামধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানে শিবলিঙ্গের সম্মুখে একটি ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত। সেই বায়ুলেশহীন নীরন্ধ্র অন্ধকারে নিষ্কম্প দীপশিখাটি যেন সমাধিস্থ যোগীর চিত্তের মত নির্ম্মল, প্রশান্ত, সর্ব্বচাঞ্চল্যমুক্ত। গীতার উপমা মনে পড়ে "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।" জগতের সকল কলকোলাহলের ঊর্দ্ধে এই নিভৃত

গুহামধ্যে বসে নিজের নিঃসঙ্গ আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি গভীর পরিচয় হয়, এক অপরিমেয় শূন্যতায় মন ভরে ওঠে। সেই একাকিত্বের অনুভূতি তীব্র বেদনাময়।

গুহামধ্যে কিছু সময় কাটিয়ে নীচে নেমে এসে প্রস্তরাকীর্ণ এক সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে পাহাড়ের একেবারে শীর্ষতম স্থানে এসে পৌঁছলাম। সে জায়গায় গাছপালা লতাগুল্মের চিহ্নমাত্র নাই। শান-বাঁধানো বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অভ্রভেদী বিরাট্ লৌহস্তম্ভ।

এই উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ থেকে দেখলাম অনন্ত আকাশের নীচে চক্রবাল প্রসারিত রিক্ত প্রান্তরের মুক্ত রূপ। দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত রৌদ্রদগ্ধ পীতবর্ণ তৃণ-বাজিতে সমাচ্ছাদিত, ভূপৃষ্ঠে কোথাও সবুজের লেশমাত্রও নাই, গৈরিকবসনা ভৈরবী প্রকৃতির এ যেন সর্ব্ব আভরণ-বর্জ্জিত তপঃক্লিষ্ট রুক্ষ মূর্ত্তি। প্রকৃতির এ নিরাভরণ প্রসারতা নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করে না কিন্তু মনকে সুদূরাভিমুখী ক'রে বিরাটের অনুধ্যানে সমাহিত করে। মহাশূন্যতাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ক'রে আকাশ আর পৃথিবীর মহামিলনের যে অনাহত সঙ্গীত অহর্নিশি ধ্বনিত হচ্ছে তার রেশ যেন অন্তরের একেবারে অন্তস্তলে এসে প্রবেশ করে।

বহুক্ষণ পর্ব্বতশৃঙ্গে কাটল, এবার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। ফিরবার পথে দেখি একটা গাছতলায় এক সাধুবাবা করাঙ্গুলি দ্বারা নাক আর কান এ দুটি ইন্দ্রিয়ের দ্বার অপূর্ব্ব কৌশলে রুদ্ধ করে যোগাসনে নম্র—গল্পিকাসনে উপবিষ্ট। গাঁজার কলকেটা পড়ে আছে মাটিতে। এতটুকু ধোঁয়ারও যাতে অপচয় না হয় সেজন্য সাধুবাবার এই কসরৎ।

এবার ভিন্নপথে প্রত্যাবর্ত্তনের পালা। পর্ব্বতাবতরণ ক'রে আবার এসে নামলাম প্রান্তরের বুকে। জনহীন মাঠের বুকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, একটি মাত্র তারা ফুটে উঠেছে নিঃসীম আকাশে। দলমা তীর্থ পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি সম্মুখ পানে। অনন্ত জীবনের তীর্থ-পরিক্রমা-পথে আকাশের সন্ধ্যা তারাটির মতই আমিও যেন নিঃসঙ্গ একক। রাত্রির ঘনান্ধকার ভেদ ক'রে এগিয়ে চলেছি উদয়াচলের অভিমুখে। অন্তরের অন্তরতম স্থলে ধ্বনিত হচ্ছে আশ্বাসভরা বাণী—

"প্রাণ তীর্থে চলো মৃত্যু করো জয় শ্রান্তি ক্লান্তি হীন।"

বনপ্রান্তর পেরিয়ে সুবর্ণরেখার তীরে এসে পৌঁছলাম। দূরে দিকচক্রবালের কাছে লৌহনগরীর সারি সারি আলোর মালা নজরে পড়ছে। গগনপ্রান্তে দিগ্বধূরা যেন জ্বালিয়ে রেখেছে অগণিত মায়া-প্রদীপ।

মৃত ও অমৃত

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

চারিদিকে বিরাট্ নিস্তব্ধতা, উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, জগতের সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা যেন ঐখানে গিয়া জমাট বাঁধিয়াছে। বিলের নিকষকালো জলে তারই প্রতিবিম্ব। দুইধারে ধূ ধূ করে ধানের ক্ষেত, মাঝখান দিয়া শালিকরাঙার খাল দক্ষিণে মধুমতীতে গিয়া মিশিয়াছে, উত্তরে ঘাঘরের গাঙে। ধানের স্নিগ্ধ রূপ দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি দেবী ঐ শস্যের বুকে যেন তাঁর সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছেন। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে, ধানের শীষগুলি একটু একটু নড়ে, কচুরীপানার বেগুনী ফুলের উপর ছোট ছোট পাখী আসিয়া বসে, বসে রং বেরঙের প্রজাপতি। জলের উপরে বুদ্বুদ ক্ষণিকের জন্য বৃত্তাকার রেখার সৃষ্টি করে, মাছের লোভে মাছরাঙা আসিয়া ছোঁ মারে, কাদাবোঁচা আপন মনে নিজের পালক ঠোকরায়। কখনও মেঘের নীচে একটা নারী-চিল সরল রেখায় উড়িয়া যায়, চিঁ চিঁ করিয়া পুরুষ-চিলকে জানায় তার যৌন-ক্ষুধা। চলে হংস-দম্পতীর প্রেমলীলা। বিলের হাঁস মানুষের শব্দ শুনিলেই উড়িয়া যায়। তবে পর পর কয়দিন দুর্য্যোগের জন্য নৌকা চলাচল খুবই কম। মধ্যে মধ্যে দু-একখানা ঘাস-বোঝাই নৌকা যায়, কখনওবা একখানা জেলে ডিঙী।

শরতের অপরাহ্ণ, বেলা আন্দাজ ৩টা। এই সময় পাশের খাল হইতে ছোট্ট একখানা ডিঙী আসিয়া শালিকরাঙার খালে পড়িল। ডিঙীখানা চলিল মধুমতীর দিকে। ষাট বছরের একটি বৃদ্ধ বৈঠা টানিতেছিল, তার সামনে বাঁশের চালির উপর একটা শব। একবার চলিতে আরম্ভ করিলে মানুষ যেমন নিজের অজ্ঞাতেই পা বাড়াইতে থাকে বৃদ্ধ বলাইও তেমনই অভ্যাসের বশে বৈঠা টানে, টানে আর ছেলের শবের দিকে চায়। এই ছেলেই সেদিন এই পথে তাকে নৌকা বাহিয়া লইয়া গিয়াছে। তার বুকের উঁচু ছাতি, বাহুর দৃঢ় মাংসপেশী দেখিয়া বলাইয়ের বুক গর্ব্বে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ছেলে রৌদ্রে ঘামিয়া গেলে বলাই বলিল, তুই বোস্ বাঁকা। অনেকক্ষণ টেনেছিস। এবার বৈঠা আমায় দে।

বাঁকা বলে, তুমি আর কেন? তার চেয়ে বরং কল্কেটায় একটু আগুন দেও।

কল্কের আগুন! বাপকে দিয়েই যদি তামাক সাজিয়ে খাবি তাহ'লে আর লেখাপড়া শিখ্‌লি কি করতে? ঐ যে গণ্ডা গণ্ডা বই পড়লি তা বৃথা হয়ে গেল!

বলাই কথাগুলি হাসিতে হাসিতেই বলিল। বাঁকা উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। বলাই তামাক সাজিয়া ছেলেকে প্রসাদ করিয়া দিলে সে ফুরুক ফুরুক টানিতে টানিতে বলিল, তুমি এখন বিশ্রেম দাও বাবা। বয়স হয়েছে। খাটা খাট্‌নী আমিই করব।

বলাই বলিল, তা হয়েছে। কিন্তু পাঞ্জা কসে কেউ পারিস আমার সঙ্গে? তুই, তোর বন্ধু রাণিয়া, হাবুল সব জোয়ানরা একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌না।

তাদের পিতাপুত্রের সম্পর্ক ছিল এমনই মধুর। সেই ছেলের মৃতদেহ সে আজ বহিয়া চলিয়াছে। শব একটু ফুলিয়াছে, গন্ধ

আসে, মাছি ভন্ ভন্ করে, নাক ও মুখের গর্ত্তে পিঁপড়ার দল লুকোচুরি খেলিয়া বেড়ায়।

খানিকক্ষণ যাবৎ নৌকার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বহু ঊর্দ্ধে ২টা শকুনি উড়িয়া আসিতেছিল। তাদের মধ্যে একটা হঠাৎ নীচে নামিয়া শবের উপর ছোঁ মারিবার চেষ্টা করিলে বলাই বৈঠা উঁচাইয়া পাখীটাকে তাড়া করিল। আবার আসিল অপরটা। পুত্রের মৃত্যুর পর বলাই এতক্ষণ কোন শব্দ করে নাই, তার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল পড়ে নাই—কিন্তু এবার সে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিল। চীৎকার করিয়া উঠিল, ভ্যালারে বরাত।

সত্যই বটে। বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন একমাত্র পুত্রকে আজ শকুনির হাত হইতে রক্ষা করিতে হইতেছে।

তার গ্রাম টিয়াঠুঁটি হইতে শালিকরাঙার বিল অনেক দূর, কমপক্ষে চার ক্রোশ পথ। টিয়াঠুঁটির প্রভাস খাঁ, সেখ ওয়াজেদ, খুদিরামের দেখাদেখি বলাইও শালিকরাঙার বিলে বাঁকার নামে জমি বন্দোবস্ত লইল। ভাল চাষীদের মধ্যে ঐ জমি নেওয়ার যেন একটা রেওয়াজ পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন ত সে হিসাব করিয়া দেখে নাই যে তাদের আর তার বরাত সমান নয়।

শুধু কি ঐ জমি—তার সমস্তই ত ঐ পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া। সে গ্রামের হলধরের মেয়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ করিল, কেননা, তার পাঁচ পাঁচটি ছেলে আছে, আপদে বিপদে তারা আসিয়া ভগ্নী-পতির পিছনে দাঁড়াইবে এই ভরসায়। বৌ আসিবে বলিয়া শাল-কাঠের খুঁটি দিয়া ঘর করিল, নগেন স্যাকরাকে বলিল, অঘ্রানে আমার বাঁকার বিয়ে, ২খানা গহনা গড়াতে হবে। আর বাঁকার মার একটা সাতনরী আছে, পালিশ ক'রে দিও। ছেলের বৌ আসবে তাই এই পঁচিশ বছর যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি।

বাঁকার তিন মাসের সময় তার মা মারা যায়। বলাইয়ের তখন বিবাহ করিবার বয়স ছিল। আত্মীয়-স্বজনরাও বিবাহ করিতে পরামর্শ দিল। সে বলিত, কৈকেয়ী রাণীর কথা কি মনে নেই? বৌ এসে যে ছেলেকে নির্ব্বাসন দেবে। আমার মন থেকে নির্ব্বাসন।

অতবড় জোয়ান মানুষ ছেলেকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়ায় বলিয়া লোকে হাসে। কিন্তু শুধু কি দুধ খাওয়ানো? বাঁকা বায়না ধরিলে বলাই সারা রাত তাকে কোলে করিয়া ঘুরিত। একটু বড় হইলে তাকে গল্প বলিয়া ভুলাইত। পিঠা বুড়ীর গল্প। নিজে ঠাকুরমার কাছে ঐ গল্প শুনিয়াছিল। এক বুড়ীর পিঠে-গাছ আছে। ভাল ছেলেদের পিঠা দেয়। ভাল হয়ে থাকলে তুইও পাবি বাঁকা।

সারা রাত চুপ করিয়া থাকিয়া বাঁকা সকালে উঠিয়া বাপকে ধরিল, পিঠে-বুড়ী ত এল না। এনে দাও তাকে। তারপর সুরু করিত কান্না। কি কষ্টই না তখন গিয়াছে!

সেই ছেলে বড় হইল, ভাল হইল, লেখাপড়া শিখিল।

এক দিনের কথা, পাঁঠা-বলি খেলিতে খেলিতে পাশের বাড়ীর জিতু তার ডান হাতের ১টা আঙুল কাটিয়া দেয়, লোকে জিতুকে ধমক দিলে বাঁকা বলিল, ওর দোষ নেই, আমি নিজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

পাঠশালার গুরুমহাশয় বলিলেন, তোমার বাঁকার কিছু হবে না। ছ' মাস গেল, অ, আ পর্য্যন্ত চিনতে পারল না। বাঁকা সেদিন খুব কাঁদিয়াছিল, কিন্তু তারপরেই হু হু করিয়া অনেক বই পড়িয়া ফেলিল। ছিঁড়িলও পাঁচ-ছয়খানা, গুরুমহাশয়ের মত বদলাইল। এবার তিনি প্রশংসা করিলেন, হ্যাঁ পড়ছে বটে তোমার বাঁকা। তা তোমার দা-কাটা তামাকটা বড় ভাল। দিও ত আর একটু বেশী করে পাঠিয়ে। ছেলে যে চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে তামাক দেয় বলাই তাহা জানিত না। সে মনে মনে একটু হাসিল।

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা আর সব কাজেও পাকাপোক্ত হইয়া উঠিল। চাষ-বাস, মাছ-ধরা, ঘরামীগিরি, চালচিত্তির—জানিত না এমন কাজ নাই। ভদ্রলোকরাও তার চালচিত্তিরের সুখ্যাতি করিতেন। এই কয়দিন আগে জমিদার মঙ্গল ঘোষ বলিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি ফিরো বলাই। পূজো ত এসে পড়ল, এবার চালচিত্তির করাব তোমার বাঁকাকে দিয়ে। টাকা পাবে, ভয় নেই।

বলাই বলিল, হ্যাঁ হুজুর, শীগগিরই ফিরব। শুনলাম বিলের জমিতে ফলনটা খুব ফলেছে। একবার নিজের চোখে দেখে আসি। মাত্তর দুদিনের চাল চিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছি।

শালিকরাঙায় পৌঁছিয়াই বাঁকার জ্বর হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভুল বকিতে সুরু করিল। চোখ দুইটা লাল হইয়া গেল। একটু পরেই অজ্ঞান। কিন্তু ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা, বারবার মুখ বাঁকিয়া যায়, গোঁ গোঁ শব্দ করে। শরীরটা ঘন ঘন ধনুকের মত নোয়াইতে থাকে, ধরিয়া রাখা অসম্ভব। বাঁকা হঠাৎ বাপের হাত কামড়াইয়া ধরিল। সে কি কামড়—যেন বাঘ দাঁত বসাইয়া দিয়াছে। বলাইকে শেষটায় ছেলের চোয়ালের উপর প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মারিতে হইল, সে জায়গাটা এখনও ফুলিয়া রহিয়াছে।

বিলের বাসা। কয়েক খণ্ড বাঁশের উপর খড়ের চালা। বেড়া নাই। ছেলেকে লইয়া দুই তিন রাত্রি সে এই ভাবে চালার তলায় বসিয়া রহিল। এদিক-ওদিক চায়, মধ্যে মধ্যে গলা ছাড়িয়া ডাকে। কিন্তু তিনটা দিনের মধ্যে নিকটে একখানা ডিঙী আসে না, দেখা যায় না একটা মানুষ যাকে ডাকিয়া বলিতে পারে, যে-করে হোক কোন ডাক্তার বদ্যি নিয়ে এস।

এমনই দুর্যোগ যে তিন-তিনটা দিন শালিকরাঙা যেন সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ছিল শুধু তিনটা প্রাণী—বলাই, বাঁকা আর বাঁকার পোষা কুকুর ভোলা। কয়টা দিন ভোলাও তার ভাষায় কত কাঁদিল, ঘেউ ঘেউ করিয়া হয়ত মানুষ ডাকিল। বিরক্ত হইয়া বলাই শেষটায় তাকে একটা বাঁশ ছুঁড়িয়া মারে। কিন্তু তাতেও ভোলার চীৎকার বন্ধ হয় নাই। হইল বাঁকার মৃত্যুর পর। সে সাঁতার কাটিয়া চলিয়া গেল, যাবার আগে মৃতদেহটাকে একবার শুঁকিল, খানিকটা সাঁতরাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল। তার পর অদৃশ্য হইয়া গেল। যখন চোখও ফোটে নাই তখন এই মা-হারা কুকুরছানাটিকে আনিয়া বাঁকা পলিতায় করিয়া দুধ

খাওয়াইয়াছে, সাজি-মাটি দিয়া তার গায়ের পোকা মাড়িয়াছে। ভোলা চলিয়া গেলে তার জন্ত বলাইয়ের ভারি কষ্ট হইল—নিজকে মনে হইল নিতান্তই অসহায়।

সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, মধুমতীতে আসিয়া দেখিল আকাশ একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। মেঘের উপর দিয়া কালো মেঘ ছুটিয়া যায়, ধূসর মেঘের উপর কালো, কালোর উপর আবার ধূসর, কোনটা দেখিতে হাতীর মত, কোনটা বা তুরুক সওয়ার, আবার কতকগুলি যেন ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড়েরই মত অসংখ্য তাদের চূড়া। এই দৃশ্যের সঙ্গে বলাইয়ের নিবিড় পরিচয় ছিল। সে জানিত ইহার অর্থ কি? তবুও আকাশের দিকে ভাল করিয়া না চাহিয়াই পাড়ি ধরিল।

বর্ষার মধুমতী এখানে মাইলখানেক চওড়া, ওপারে বাঁকের শেষে নিমাইপুর, পরের বাঁকে আবদুল্লার খাল। খাল বাহিয়া কিছু দূর গেলেই তাদের গ্রাম টিয়াঠুঁটি।

বলাই আর ওপারে পৌঁছিতে পারিল না। মাঝনদীতে যাবার আগেই ঝড় ছাড়িল। সোঁ সোঁ করিয়া একটা শব্দ ছুটিয়া আসে, সামনে চলে রাশি রাশি ধূলা। আকাশ ধূসর হইয়া যায়। অদূরে রাণীডাঙার বড় বড় গাছগুলি বারবার মাটির বুকে মাথা নোওয়ায়। নদীর বুকে সুরু হয় তুফানের তাণ্ডব নৃত্য। বলাইয়ের ডিঙা জলের উপর আছাড় খায়। কে যেন ডিঙীখানাকে আকাশে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার লুফিয়া নেয়। হাজার হাজার লাখ লাখ সাপ ফণা তুলিয়া দংশন করিতে আসে, প্রতিটি ফণার উপর সাদা বিষ চকচক্ করে। বলাই পাকা মাঝি, হালের মত করিয়া বৈঠা পায়ে চাপিয়া বাতাসের অনুকূলে ডিঙী ছাড়িয়া দেয়।

একটু পরেই কতকগুলি মেঘ জলের উপর শুঁড় বাড়াইয়া দিল। আরম্ভ হইল বৃষ্টি। ফোঁটাগুলি তীরের মত বলাইয়ের গায়ে বিঁধিতে লাগিল। অঝোরে-ঝরিয়া-পড়া জল তার চারি দিকে আবরণের সৃষ্টি করিল। তার ফাঁক দিয়া কিছুই আর দেখা যায় না, চোখ ঢাকিয়া যায়।

ডিঙী তীরের মত ছুটিয়া চলে, কোথায় লাগে ষ্টীমার। বৈঠা চাপিয়া ধরিবার জন্ত বলাইকে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়। হাত জ্বালা করে, শরীর দিয়া আগুন ছোটে। মনে হয় বুকের মধ্যেও যেন ঝড় সুরু হইয়াছে। সে ডাকে মা, মা-তারা।

হঠাৎ দেখা যায় একটা মানুষ। ঝুনা নারিকেলের মত তার মাথাটা এক-একবার ভাসিয়া ওঠে আবার ডোবে, কখনওবা জলের তলা হইতে শুধু একখানা হাত বাড়াইয়া দেয়। এ কি সৃষ্টি-কর্তার নিকট তার জীবন ভিক্ষা···না মানুষের কাছে সাহায্যের জন্ত আবেদন?

ছোট্ট ডিঙীতে তিন জনের স্থান হওয়া অসম্ভব। উপরের দাঁতের পাটি দিয়া নীচের ঠোঁট চাপিয়া বলাই কি যেন ভাবে। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

কিন্তু ভাবিবারও ত বেশী সময় নাই। জীবিত ও মৃতের মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে হইবে। মা তারা, মা—বলিয়া মৃতপুত্রকে নদীতে ফেলিয়া দিয়া অপরিচিত মানুষটাকে সে নৌকায় তুলিয়া লইল। তারপর একবার ফিরিয়া চাহিল। দেখা গেল না কিছুই। শুধু ঢেউ আর ঢেউ। বলাই নদীর উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল, রাক্কুসী, গিলে ফেললি?

কিন্তু এ কি? মানুষটাও মরিয়া গেল না কি? একটা মড়ার জন্ত নিজের ছেলেকে সে জলে ভাসাইয়া দিল! বলাই আবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, না বাঁচিয়াই আছে। ভুল সে করে নাই। সে এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

ঝড় বাড়িয়াই চলে। প্রকৃতির সেই প্রলয়ঙ্কর নৃত্যের শব্দ ছাপাইয়া ওঠে সহস্র কণ্ঠের আর্ত্তনাদ। অদূরে দেখা যায় একখানা ষ্টীমার। সেটাও কলার খোলার মতন জলের উপর আছাড় খায়। চোঙের ভিতর হইতে বাহির হয় যন্ত্রের কাতর শব্দ। বলাই ভাবে, ঐ বিপুল দেহ, অত সাজসরঞ্জাম, লোক লস্কর সবই কি বৃথা, বৈঠা মাত্র সম্বল ছোট্ট ডিঙীর সঙ্গে তবে এর তফাৎ কোথায়?

খানিকটা পরে জাহাজখানা আর দেখা গেল না।

ঝড় থামিয়াছে। বৃষ্টিও নাই বলিলেই চলে। দু-এক ফোঁটা পড়ে, সকালে যেমন পড়িয়াছিল বাঁকার শোকে। প্রকৃতি স্তব্ধ পুত্রশোকাতুরা সাশ্রুনয়না নারীরই মতন গম্ভীর। আকাশে দু-চারটা পাখীর কলরব ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। যারা অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছিল ঝড়ের পর তারা বাসায় ফিরিতেছে। কোনটা একা, কতকগুলি বা দলে দলে। সন্তানহারা মা হয়ত আর্ত্তনাদ করে, মা-হারা ছানা অজানা আকাশে মাকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

ক্লান্ত বলাই তীরে ডিঙী বাঁধিল। শরীর আর বয় না, চায় বিশ্রাম। হাতের তালুর উপর চোখ পড়িলে দেখিল দুইটা হাতই জায়গায় জায়গায় ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালা বাড়িল।

ঝড় তাকে আর-এক রাজ্যে উড়াইয়া আনিয়াছিল, নিমাইপুর ও আবদুল্লার খাল হইতে ঠিক বিপরীত দিকে। শালিকরাঙা হইতে অনেক দূর। যেখানে বাঁকাকে ফেলিয়াছিল তার চেয়েও দুই বাঁক নীচে, ছোট ছোট ঢেউগুলি সেই দিক হইতেই আসি-তেছে। তার প্রত্যেকটিতে বাঁকার স্পর্শ। ঢেউগুলি বলাইয়ের চোখে ভারি সুন্দর লাগিল। সে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে ঐ দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দুই হাত ভরিয়া জল তুলিয়া চোখ মুখ ধুইল। কয়েক গণ্ডূষ পান করিয়া বলিল, আঃ।

পিতা-পিতামহকে মাতাকে স্ত্রীকে যেখানে দাহ করিয়াছিল বাঁকাকেও আনিতেছিল নিজের সেই ভিটায়, তাদেরই পাশে তার চিতা সাজাইবে বলিয়া। কিন্তু বাঁকার শেষ শয্যা হইল মধুমতী।

বলাই অসহায়ের মতন নিজের হাত মোচড়াইতে মোচড়াইতে ভাবিতে লাগিল, মাছে তার বাঁকার চোখ ঠোকরাইবে, কুমীর হাঙ্গরে হাত-পা গিলিয়া ফেলিবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ব্যথা পাইবে যদি তার চোয়ালের ফুলা জায়গাটায় কামড় বসায়। বাপ হইয়া অসুস্থ ছেলের চোয়ালের উপর সে ঘুষি মারিল, জায়গাটা ফুলাইয়া দিল। ছিঃ—

নৌকার চালির উপর যুবকটি তখন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। বড় ক্ষীণ, বড় দুর্ব্বল কিন্তু জীবন্ত। আজ মরণের মর্মান্তিক অভিনয়ের মধ্যে জীবনের এই স্পন্দন বলাইয়ের দুঃখকে হাল্‌কা করিল। লোকটি তার বাঁকারই বয়সী, গড়নও তারই মতন দেখিয়া হয়ত খানিকটা সান্ত্বনাও পাইল।

তার মনে পড়ে অজ্ঞান হওয়ার আগে বাঁকার শেষ কথা, বড় পিঠে খেতে ইচ্ছে কচ্ছে। কিন্তু আমি আর খেতে পারব না। আমার হয়ে তুমি খেও বাবা, দুধ আর খেজুরী গুড়ের চুষী।

বলাই লোকটির পায়ের বুড়া আঙুল ধরিয়া একটু নাড়িতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। তার মনে পড়িল এই বৃদ্ধ আর এক জনকে ডিঙী হইতে ফেলিয়া দিয়া তাকে বাঁচাইয়াছে। কৃতজ্ঞতা ভরা দৃষ্টিতে সে বলাইর দিকে চাহিল।

বলাই বলিল, দুজনকেই দুধ আর চুষি পিঠে খেতে হবে। খেজুরী গুড় আর দুধের চুষি।

ওদিকে পশ্চিমের আকাশে তখন ফুটিয়া উঠিয়াছে এক অপরূপ রূপ। বর্ষণক্ষীণ কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ডুবন্ত সূর্য্যের রাঙা রশ্মি, লাল ও কালোর জীবন ও মৃত্যুর সে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। দুই জনেই সেই দিকে চাহিল। একটু পরে যুবকটি বলিল, তুমি ফেলে দিয়েছ কা'কে?

বলাই উত্তর করিল, আমারই বাঁকাকে। বুঝলে না, আমার ছেলে বাঁকা। সে মরে গিছল।

তারপরে আপন মনেই যেন আওড়াইতে লাগিল, ছোট্ট ডিঙী, তিন জনের এতে ঠাঁই হত না।

যুবকটি অবাক-বিস্ময়ে তার দিকে চাহিয়া রহিল।

পাঠান রাজত্বে চীন ও বঙ্গদেশের রাজনৈতিক আদান-প্রদান

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

[পাঠান আমলে এক সময় চীনের সহিত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার পাঠান সম্রাট গিয়াসুদ্দিন আজমশাহের সময় হইতে শামসুদ্দিন আহমদশাহের সময় পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আদান প্রদান চলিতে থাকে, আমরা ইহার বিবরণ পাই চীন ভাষায় রক্ষিত কয়েকটি নথি হইতে। এইরূপ দুইটি নথির (একটির সম্পূর্ণ ও অন্যটির কতক) অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হইল।

এই নথিগুলিতে আমরা সেকালের বাংলার বিবরণ পাই। এই বিবরণ অবশ্য সব সময় নির্ভুল নহে—কোথাও কোথাও অদ্ভুত ভুলও পাওয়া যায়। যাহা হউক, মোটের উপর ইহা হইতে সেকালের বাংলার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কতক পরিচয় এবং নূতন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য মিলিবে।

এইরূপ একটি নথি পঞ্চাশ বছর পূর্বে জর্জ ফিলিপস্ কর্তৃক অনূদিত হইয়া রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *Vide* Journal of the Royal Asiatic Society 1895, p. 529.]

বঙ্গদেশ নিকোবর দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় সাত হাজার লি (অর্থাৎ ২৩৩৩⅓ মাইল) দূরে অবস্থিত। ইহা পশ্চিম-ভারত বলিয়াও অভিহিত। ইহার পরিধি বৃহৎ।

সুমাত্রা হইতে রওনা হইলে প্রথমে Caphill বা Pulo weh ও নিকোবরের দিকে এবং তাহার পর তাহার উত্তর-পশ্চিম দিকে যাইতে হয়। বায়ু অনুকূল থাকিলে কুড়ি দিনের মধ্যে চিটাগাং পৌঁছানো যায়। চিটাগাং হইতে ছোট নৌকায় করিয়া ১৬৬⅔ মাইল যাওয়ার পর সোনারগাঁ পৌঁছান যায়।

সোনারগাঁ একটি বন্দর। ইহা প্রাচীর ও পরিখা-পরিবেষ্টিত একটি বৃহৎ শহর। ইহাতে অনেক সড়ক ও বাজার আছে। এই শহর হইতে কুড়িটি স্টেশন পার হইয়া বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়া (মালদহ জেলা) পৌঁছান যায়। এই নগর এবং ইহার পারিপার্শ্বিক স্থান অতি মনোরম। বাংলার রাজপ্রাসাদ সুধাধবলিত, আকারে চতুষ্কোণ ও অতি বৃহৎ। ইহার নয়টি মহল এবং সিংহদ্বার তিনটি, প্রাসাদের স্তম্ভসমূহ পিত্তল-বিমণ্ডিত এবং তাহা নানা প্রাণী ও পুষ্পে বিচিত্রিত।

রাজার মুকুট ও পরিচ্ছদ এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের শিরাবরণ ও পরিচ্ছদ মুসলমানী ধরণের। সকলেই মুসলমান। তাঁহাদের বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি মুসলমানী রীতিতেই অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলার অধিবাসিগণ ধনী, সচ্চরিত্র এবং উদার। তাঁহারা ব্যবসায়ে পটু। তাঁহারা মাথা কামাইয়া তাহার উপর পাগড়ী বাঁধেন, গোল গলাওয়ালা লম্বা জোব্বা ও রঙীন কাপড় (লুঙ্গী?) তাঁহারা পরিয়া থাকেন। পায়ে চামড়ার জুতা পরেন।

মেয়েরা মাথায় গোঁজখুঁটি বাঁধেন। তাঁহারা দেহের উপরিভাগে ছোট জামা ও নিম্নভাগে সুতা বা রেশমের তৈরি রঙীন কাপড় পরিয়া থাকেন। তাঁহারা কানে দামী পাথর দেওয়া সোনার গহনা, গলায় দামী হার, হাতে সোনার বালা এবং হাতের ও পায়ের আঙুলে আংটি পরিয়া থাকেন।

বাংলার আবহাওয়া গরম। পঞ্জিকায় বারটি মাস। মলমাস নাই। সেখানে অপরাধীর সর্বোচ্চ দণ্ড হইতেছে নির্বাসন। উচ্চকর্মচারিগণের নিকট সরকারী কার্য নির্বাহের জন্য নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা (সীল আংটি) থাকে। সেনাগণের অধিনায়ককে "সিপা সালার" বলা হয়।

বাংলায় চিকিৎসক, জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদ এবং নানা শিল্পী আছে। বাজারে সব জিনিসই পাওয়া যায়। বাংলার ভাষা বাংলা কিন্তু লোকে ফারসীও বেশ জানে। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিকে সেখানে "সুরনায়ক" (*Ken hsiao su lu nai*) বলা হয়। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে তাঁহারা অতি প্রত্যুষে সঙ্গীত আরম্ভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বাজান "বৃহৎ বাদ্য" (পাখোয়াজ), একজন বাজান "ক্ষুদ্র বাদ্য" (তবলা) এবং অন্য একজন বাজান বাঁশি। প্রথমে বিলম্বিত ভাবে বাদ্য সুরু হয়। তাহার পর তাহা দ্রুততর হইতে থাকে। সঙ্গীত

সমাপ্ত হইলে সঙ্গীতজ্ঞগণকে আহার্য ও পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করা হয় এবং 'টঙ্কা' দেওয়া হয়।

বাঙালীগণ সাধারণতঃ পান দিয়া অতিথিগণের অভ্যর্থনা করেন।

ভোজের সময় অতিথিগণকে গীত ও নৃত্যের দ্বারা আনন্দ-দানের জন্য তাঁহারা নৃত্যগীতকুশলা নটী নিযুক্ত করেন। এই নটীগণ, দেহের উপরিভাগে নানা কারুকার্যখচিত গোলাপী রঙের পোষাক, এবং নিম্নভাগে রেশমের তৈরি রঙীন ঘাগরা পরিয়া থাকে। তাহারা নানা বর্ণের প্রবাল, তৃণমণি, মুক্তা আদি মূল্যবান প্রস্তর খচিত হার পরিয়া থাকে। শ্যামল ও রক্তবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরখচিত মূল্যবান কঙ্কণ তাহারা হস্তে পরিধান করে।

বাঙালীরা বাঘের খেলা দেখিতে ভালবাসে। খেলোয়াড় বাঘকে লোহার শিকলে বাঁধিয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। খেলার সময় শিকল খুলিয়া দেওয়া হয়। বাঘ ওৎ পাতিয়া অপেক্ষা করে। খেলোয়াড়ও নিজের পোষাক খুলিয়া লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। বাঘ তখন গর্জন করিতে থাকে এবং উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইহার পর তাহাদের লড়াই আরম্ভ হয়। খেলোয়াড় কখনো কখনো নিজের হাত বাঘের মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দেয়। খেলা শেষ হইলে বাঘ মাটিতে শুইয়া পড়ে। যাঁহার বাড়ীতে খেলা দেখান হয়, তিনি বাঘকে মাংস খাওয়ান এবং খেলোয়াড়কে 'টঙ্কা' দেন।

বাংলায় আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে রৌপ্যমুদ্রা এবং শুক্তির ব্যবহার আছে। এই রৌপ্যমুদ্রাকে তাঁহারা 'টঙ্কা' বলেন এবং শুক্তিকে কড়ি বলেন। রৌপ্যমুদ্রার ওজন ৩ 'ফেন' এবং তাহার ব্যাস হইতেছে এক ইঞ্চি ২ 'ফেন'।

রৌপ্যমুদ্রার এক পিঠে ছবি থাকে।[১] কড়ির মূল্য ওজন অনুযায়ী।

বাংলার বাণিজ্য সম্পদ হইতেছে তুলা ও রেশম। বাংলার মাটিতে সব রকম শস্য হয়। বছরে দুই বার কৃষি-ফল পাওয়া যায়। সেখানকার জলবায়ু সকল রকমের গৃহপালিত পশু পালনের অনুকূল।

সেখানে চারি প্রকার মদ্য পাওয়া যায়। ইহার একটি নারিকেল হইতে, একটি চাল হইতে, একটি মহুয়া হইতে এবং একটি তাল গাছ হইতে উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশে ছয় প্রকার বস্ত্র পাওয়া যায়। ইহার একটিকে "পেইফ" (বাফ ?) বলা হয়। ইহা ২ ফুট চওড়া ও ৫৬ ফুট লম্বা। ইহা শুভ্র, সূক্ষ্ম এবং মসৃণ। দ্বিতীয়টি পীতবর্ণের (রক্তবর্ণের ?)। ইহাকে "মান্ ছোঠি" (মাঞ্জিষ্ঠ) বলা হয়। ইহা চার ফুট চওড়া এবং পঞ্চাশ ফুট লম্বা। ইহার বুনন খুব ঘন এবং ইহা বেশ শক্ত। তৃতীয়টি বিরলতন্তু অতি স্বচ্ছ বস্ত্র। ইহা "শা না পা ফু" (শাহান বাফ ?) নামে অভিহিত। ইহা ৫ ফুট চওড়া ও ত্রিশ ফুট লম্বা। ইহার আকার চীনে "শেঙ্ পু লো" (Raw plain gauze) এর আকারের ন্যায়। চতুর্থটি crape; ইহা "ছিন্ পাই ছিন্ তো লি" (ছিন্‌ট পাঁচতোলিয়া ?) নামে অভিহিত। ইহা তিন ফুট চওড়া এবং ষাট ফুট লম্বা। পাগড়ী বাঁধিবার কাপড়কে 'যুটার' বা 'ছুটার' বলা হয়। ইহা চীনে "শান সুয়ো" (three shuttles) এর মত। ইহা আড়াই ফুট চওড়া এবং চল্লিশ ফুট লম্বা। চীনে যাহাকে "তো লো মিন" বলা হয় বাংলায় তাহা "মল্ মল্" নামে পরিচিত। ইহা চার ফুট চওড়া এবং কুড়ি ফুট লম্বা। ইহার উল্টাদিকে আধ ইঞ্চি লম্বা লোম থাকে।

বাংলায় মুক্তা, প্রবাল, স্ফটিক, Cornelian (স্বচ্ছ প্রস্তর বিশেষ), মাছ রাঙার পালক, প্রচুর কলা, আনারস, ডালিম, তেঁতুল (?), আক, প্রচুর দই (বা মাখন), লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, শশা, খেঁড়ো, তরমুজ, পেঁয়াজ, আদা, সরিষা, বেগুন, রসুন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাংলায় উটও দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে তুঁত গাছের ছালের তৈরি কাগজ পাওয়া যায়। সেখানে শ্যামলপর্ণ ও শীর্ণ শাখাবিশিষ্ট একরূপ বৃক্ষ আছে। তাহার পর্ণসমূহ দিবসে প্রসারিত এবং রাত্রে সঙ্কুচিত হয়। ইহা চীনের "নিশা-সঙ্কোচী" বৃক্ষের ন্যায়। ইহার ফল কুলের মত। ইহাকে 'আমলা' বলে। ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যে-দিন বঙ্গবাসিগণ আমাদের সম্রাটের শাসনপত্র গ্রহণ করেন সেদিন সহস্রাধিক অশ্বারোহী সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। দ্বারমণ্ডপের উভয় পার্শ্বে তাহাদের মোতায়েন করা হইয়াছিল। উজ্জ্বল বর্ম পরিহিত, দ্বিধার তরবারি ও ধনুর্বাণধারী দীর্ঘ সমর্থ পুরুষগণ রাজাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ময়ূরপুচ্ছনির্মিত শত আতপত্র প্রাসাদচত্বরে নিবেশিত হইয়াছিল। দরবার কক্ষে এক শত হস্তী রক্ষিত হইয়াছিল। নানা মূল্যবান প্রস্তর খচিত সিংহাসনে বঙ্গের অধীশ্বর উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর তরবারি ছিল।

রৌপ্যদণ্ডধারী দুই ব্যক্তি আমাদিগকে রাজসমীপে লইয়া যাইতেছিল। প্রতি পঞ্চ পদক্ষেপে তাহারা চীৎকার করিতেছিল। যখন আমরা মধ্যস্থলে আসিলাম তখন তাহারা নিবৃত্ত হইল, এবং স্বর্ণদণ্ডধারী দুই ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্ববৎ লইয়া চলিল। রাজা গম্ভীর ও বিনীত ভাবে (কপালে হস্তস্থাপন পূর্বক) অভিবাদন করিলেন, এবং রাজশাসন পত্র গ্রহণ করিলেন।

চীনরাজদূত যখন চীনরাজ-প্রেরিত উপহারসমূহের তালিকা পাঠ সমাপ্ত করিলেন তখন একটি অলঙ্কৃত আস্তরণ সেই দরবার-গৃহে বিস্তৃত হইল, এবং তাহার উপর চীন রাজদূতের ভোজের আয়োজন হইল। ছাগমাংস ও গোমাংস হইতে প্রস্তুত নানা-রূপ খাদ্য পরিবেশন করা হইল। গোলাপ-নির্যাস-মিশ্রিত সুমিষ্ট

১। চীনদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের ওজন ও মাপ ছিল। এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইহা এইরূপ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

চিন্ (চীনে পাউণ্ড) ইংরেজী ১⅓ পাউণ্ডের সমান।
১৬ লিয়াং (চীনে আউন্স) এ এক চিন্ (চীনে পাউণ্ড)।
১০ ছিয়েন্ (mace) এ এক লিয়াং (চীনে আউন্স)
১০ ফেন্-এ এক ছিয়েন্ (mace)
চীনে ফুট ইংরেজী ১৪·১ ইঞ্চির সমান।
১০ ফেন্-এ এক ইঞ্চি (চীনে)।
১০ ইঞ্চি (চীনে) তে এক ফুট (চীনে)।

পানীয় এবং অন্য নানাবিধ সুগন্ধি মিশ্রিত উপাদেয় পেয় বিতরণ করা হইল।

বাংলার রাজা চীনদেশে নিয়মিত ভাবে দূত প্রেরণ করেন না। মিঙ্ রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট 'য়্যুঙ্ লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে, অর্থাৎ ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গিয়াসুদ্দিন (গিয়াসুদ্দিন আজমশাহ) এক রাজদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'য়্যুঙ লো' সম্রাটের নবম বর্ষে অর্থাৎ ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজদূত "থাই চঙ" (সাঙ্ঘাইয়ের নিকট) পৌঁছান। চীন সম্রাট বাংলার এই রাজদূতের অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার বৈদেশিক দপ্তরের উপযুক্ত কর্মচারী বিশেষকে প্রেরণ করেন।

এই চীন সম্রাটেরই রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (অর্থাৎ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা গিয়াসুদ্দিন তাঁহার মন্ত্রী "পা-ই-ছি" (বায়াজিদ ?)কে কয়েকজন অনুচরসহ, জিরাফ ("ছিফলিন্") ও অন্য নানা উপহার দ্রব্য দিয়া প্রেরণ করেন।[2] ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট "চেঙ থোঙ"এর রাজত্বের সময় (যখন শামসুদ্দিন আহমদশাহ বাংলার রাজা) বাংলাদেশ হইতে উপহার প্রেরিত হইয়াছিল। পাত্‌লা সোনার পাতে রাজকীয় পত্র ও উপহার তালিকা লেখা হইয়াছিল। উপহার সামগ্রী ছিল—অশ্ব, অশ্ব-সজ্জা, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত অলঙ্কার, অসংস্কৃত স্বর্ণ, বৈদূর্যপ্রস্তর-নির্মিত গৃহসামগ্রী, নীলপুষ্প-অঙ্কিত শ্বেতবর্ণ মৃৎপাত্র, (White porcelain), শাল, "*Chi fu*" (*K-pu ?*) *he ti l i* (?), অতি শুভ্র মস্‌লিন—মলমল, দানাদার, চিনি, বকের মস্তক, গণ্ডারের খড়্গ, ময়ূরপুচ্ছ, শুক পক্ষী, কুন্দুরু কস্তুরী, ধূপ, শণ, খয়ের, কোবিদার (ebony wood), রক্তচন্দন, মরীচ, gray-incense, violet glue, gamboge.

বঙ্গবাসিগণ যথার্থই ধনী ও উদারপ্রকৃতি। চীনরাজদূতগণকে তাঁহারা যে-সমস্ত উপহার দান করিয়াছিলেন তাহা এই :—

প্রধান রাজদূতকে—এক স্বর্ণনির্মিত শিরস্ত্রাণ, স্বর্ণনির্মিত কটিবন্ধ, তৎসংলগ্ন এক পাত্র ও এক বোতল। সমস্তই স্বর্ণনির্মিত।

সহকারী রাজদূতকে—এক রৌপ্যময় শিরস্ত্রাণ, রৌপ্যনির্মিত কটিবন্ধ—তৎসংলগ্ন এক পাত্র ও এক বোতল। সমস্তই রৌপ্যনির্মিত।

দ্বিভাষীকে একটি স্বর্ণনির্মিত ঘণ্টা ও সূক্ষ্ম রেশমের এক দীর্ঘ জোব্বা।

সৈন্যসমূহকে রৌপ্যমুদ্রা।

বঙ্গবাসিগণ ধনী এবং উদার না হইলে কি ইহা সম্ভব হইত ?*

২। এখানে একটা কিছু ভুল আছে। এই দুই দেশের রাজনৈতিক আদান-প্রদান সম্বন্ধে চীনের মিঙ রাজবংশের ইতিহাসে যে নথি পাওয়া যায় তাহা বিশেষ প্রামাণিক। আমরা এইরূপ একটি নথির অনুবাদ করিয়াছি। তাহা হইতে এখানে কিছু উদ্ধার করা হইল :

সম্রাট "য়্যুঙ্ লো"র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে অর্থাৎ ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজা গিয়াসুদ্দিন (আজমশাহ) চীন দেশে এক রাজদূত প্রেরণ করেন। তাঁহার সহিত বঙ্গদেশজাত বহু দ্রব্য উপহারস্বরূপ প্রেরিত হয়। সম্রাট তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা এবং ভোজাদি ও নানা উপহার দান করিয়া সংবর্ধনা করেন। এই সম্রাটের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে (১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে) বাংলার রাজদূত পুনরায় আগমন করেন। তাঁহার সহিত ২৩০ জন কর্মচারী আসেন। ঠিক সেই সময়ে সম্রাট "য়্যুঙ লো" বিদেশের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের বহু দ্রব্য উপহার দেন। এই সময় হইতে প্রতি বৎসর বাংলা হইতে রাজদূত উপহার-সহ আসিতে থাকেন।

এই সম্রাটের রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলার রাজদূত রাজধানী পৌঁছিবার পূর্বেই সম্রাট তাঁহাকে (ভোজাদির দ্বারা) অভ্যর্থনা করিবার জন্য 'চেঙ চিয়াং'এ (সাঙ্ঘাইয়ের নিকট) কর্মচারী প্রেরণ করেন। যখন অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত তখন রাজদূত রাজা গিয়াসুদ্দিনের পরলোকগমনের সংবাদ নিবেদন করিলেন।

সম্রাট "য়্যুঙ লো" পরলোকগতের উদ্দেশে অর্ঘ্যদানের জন্য এবং কুমার সৈফ্ উদ্দিনের অভিষেকের জন্য বাংলা দেশে কর্মচারী প্রেরণ করেন।

সম্রাট "য়্যুঙ লো"র রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (অর্থাৎ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে) বাংলার এই দ্বিতীয় রাজা (সৈফ্ উদ্দিন) চীনসম্রাটকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এক রাজকীয় পত্রসহ রাজদূত প্রেরণ করেন। এই সঙ্গে তিনি জিরাফ, অশ্ব ও দেশজাত অন্যান্য নানাদ্রব্য উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

ইহার পর বৎসর চীনসম্রাট Hou Hsiao.কে রাজদূত করিয়া রাজকীয় পত্র ও নানা উপহারসহ বাংলায় প্রেরণ করেন। বাংলার রাজা, রানী ও সমস্ত উচ্চ কর্মচারী উপহার প্রাপ্ত হন।

সম্রাট Cheng T'ongএর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ হইতে উপহারস্বরূপ পুনরায় জিরাফ প্রেরিত হয়। ইহার পর বৎসরও বাংলা হইতে উপহার আসে, তাহার পর আর আসে নাই।

* আমার সহকর্মী Mr Wu Hsiao Lingএর সহযোগিতায় ইহা চীনভাষা হইতে অনূদিত হইয়াছে।

শাব্দিক পুরুষোত্তম

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

পূর্ব্বভারতে রচিত মধ্যযুগের কতিপয় ব্যাকরণ গ্রন্থ হইতে পুরুষোত্তমদেব নামক জনৈক বৈয়াকরণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। তাঁহার ভাষাবৃত্তিসংজ্ঞক বিখ্যাত পুস্তকের বাঙালী টীকাকার সৃষ্টিধর (সপ্তদশ শতাব্দী) বলিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থখানি লক্ষ্মণ সেন নামক নরপতির নির্দ্দেশে রচিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এই রাজা বাংলার সেনবংশীয় বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ব্যতীত অপর কেহ নহেন। তাঁহারা বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমকেও বাঙালী মনে করেন। বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার টীকাসর্ব্বস্ব নামক অমরকোষটীকায় পুরুষোত্তম-কৃত ভাষাবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষাবৃত্তির রচনাকাল ঐ সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেন ঐ তারিখের অনেক পরে অর্থাৎ

আনুমানিক ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লক্ষ্মণ সেন যখন তাঁহার পিতামহ বিজয় সেনের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা মাত্র ছিলেন, ভাষাবৃত্তি সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল। যুক্তিটিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া না যাইতে পারে। কিন্তু ভাষাবৃত্তি রচয়িতার পৃষ্ঠপোষকের বৈদিক ব্যাকরণ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর প্রতি বিরাগ লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেনের সহিত অভিন্ন মনে করা সহজ নহে। যাহা হউক, বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অনেকে মনে করেন, প্রাকৃতানুশাসনসংজ্ঞক প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণখানিও তাঁহারই রচনা।

ত্রিকাণ্ডশেষ, হারাবলী, দ্বিরূপকোষ, একাক্ষরকোষ প্রভৃতি কতিপয় অভিধানগ্রন্থের রচয়িতাও পুরুষোত্তমদেব। এই গ্রন্থগুলিও পূর্ব্বভারতে রচিত বলিয়া বোধ হয়; ইহাদের রচনাকালও ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। পূর্ব্বোল্লিখিত বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ তদীয় গ্রন্থে এই অভিধানসমূহের মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম এবং কোষকার পুরুষোত্তমকে অভিন্ন মনে করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, শাব্দিক পুরুষোত্তম বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অনেকে আবার ভাষাবৃত্তি রচয়িতা এবং হারাবলী প্রভৃতি কোষগ্রন্থ-প্রণেতার অভিন্নত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,

"The only grounds of identity are that both bore the same, but not an uncommon name, and that both were Buddhists" (History of Bengal, Vol. I, Dacca University, pp. 359-60).

যাহা হউক, ইঁহারাও স্বীকার করেন যে, ত্রিকাণ্ডশেষ ও হারাবলী একই শাব্দিক কর্ত্তৃক রচিত এবং এই শাব্দিক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ত্রিকাণ্ডশেষের প্রারম্ভিক শ্লোকসমূহ হইতে গ্রন্থপ্রণেতা পুরুষোত্তমের বৌদ্ধত্ব সম্পর্কিত মতবাদ সমর্থিত হয়।

পুরুষোত্তমকৃত ত্রিকাণ্ডশেষের ভূমিকার শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

জয়ন্তি সন্তঃ কুশলং প্রজানাং
নমো মুনীন্দ্রায় সুরাঃ স্মৃতাঃ স্ব।
স্তুতাসি বাগ্‌দেবি দয়স্ব মাত-
র্ব্বিধেহি বিদ্যাধিপ মঙ্গলানি॥
অলৌকিকত্বাদমরঃ স্বকোষে
ন যানি নামানি সমুল্লিলেখ।
বিলোক্য তৈরপ্যধুনা প্রচার-
ময়ং প্রযত্নঃ পুরুষোত্তমস্য॥
বর্গক্রমস্তথা নামলিঙ্গয়োস্তূপদেশতা।
পরিভাষাদিকং সর্ব্বমত্রাপ্যমরকোষবৎ॥

গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, ত্রিকাণ্ডশেষ অমরকোষের পরিশিষ্ট মাত্র। এই অমরকোষ নামক অভিধানে "মুনীন্দ্র" শব্দটি ভগবান বুদ্ধ তথাগতের একটি নামরূপে উল্লিখিত দেখা যায়। ত্রিকাণ্ডশেষেও বুদ্ধ-নামমালায় "মহামুনি" শব্দ দেখিতে পাই। অবশ্য কোন কোন গ্রন্থে দেবাদিদেব মহাদেবকেও মুনীন্দ্র কিংবা অনুরূপ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু অমরকোষ এবং ত্রিকাণ্ডশেষে বুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন দেবতার অর্থে ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ত্রিকাণ্ডশেষ-রচয়িতা পুরুষোত্তম শৈব ছিলেন না। সুতরাং উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটিতে "নমো মুনীন্দ্রায়" বলিয়া তিনি অবশ্যই ভগবান্ তথাগতের বন্দনা করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না হইলে এরূপ করিতেন না। ত্রিকাণ্ডশেষে দেববর্গের আদিতে বুদ্ধ স্থান পাইয়াছেন। অবশ্য ইহা অমরকোষের অনুকরণ হইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, হারাবলীসংজ্ঞক অপর কোষগ্রন্থখানি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেয়। এই পুস্তকের প্রারম্ভিক শ্লোকসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ভুজগপতিবিমুক্তস্বচ্ছনির্ম্মোকবল্লী-
বিলসিতমনুকুর্ব্বন্ যস্য গঙ্গাপ্রবাহঃ।
শিরসি সরসভাস্বন্মালতীদামলক্ষ্মীং
লঘয়তি হিমগৌরঃ সোস্তু বঃ সাধ্যসিদ্ধ্যৈ॥
কল্পাবসানসময়ে স্থিতয়ে কবীনাং
দেহান্তরং কিমপি যা সৃজতি প্রসন্না।
যস্যাঃ প্রসাদ পরমাণুরপি প্রতিষ্ঠা-
মভ্যেতি কামপি নমামি সরস্বতীং তাম্॥
নির্ম্মৎসরাঃ সুকৃতিনঃ খলু যে বিবিচ্য
কর্ণে গুণস্য কণমপ্যবতংসয়ন্তি।
যেষাং মনো ন রমতে পরদোষবাদে
তে কেচিদেব বিরলা ভুবি সঞ্চরন্তি॥
মুক্তাময়াতিমধুরামসৃণাবদাত-
চ্ছায়াধিরাগতরলামলসদ্‌গুণশ্রীঃ।
সাধ্বী সতাং ভজতু কণ্ঠমসৌ প্রিয়েব
হারাবলী বিরচিতা পুরুষোত্তমেন॥
কিং নৈব সন্তি সুধিয়ামভিধানকোষাঃ
কিন্তু প্রসিদ্ধবিষয়ব্যবহারভাজঃ।
গোষ্ঠীষু বাদপরমোহফলাসু কেষাং
হারাবলী ন বিদধতি বিদগ্ধিমানম্॥
একং তমেব গণয়ন্তি পরং বিদগ্ধা
বাচাং বিদগ্ধিমনিমজ্জতি যস্য লোকঃ।
গোষ্ঠীষু যঃ পরমশাব্দিকদুর্গমাসু
দুর্ব্বোধশব্দগতসংশয়মুচ্ছিনত্তি॥
আব্যাধশব্দতঃ শ্লোকৈরর্দ্ধৈরাতলিনান্ততঃ।
শব্দাঃ পাদৈর্ব্বিবোদ্ধব্যাঃ প্রাগনেকার্থতস্ততঃ॥

উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর প্রথমটিতে গ্রন্থকার ভগবান্ মহাদেবের বন্দনা করিয়াছেন এবং উহার কোন শ্লোকেই শাক্যমুনি বুদ্ধের নামোল্লেখ করেন নাই। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হারাবলী অভিধান শিবের নামাবলী লইয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার দেববর্গ হইতে বুদ্ধকে একেবারেই নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হারাবলী-রচয়িতা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। তিনি শৈব ছিলেন।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে, ত্রিকাণ্ডশেষ-প্রণেতা বৌদ্ধ এবং হারাবলীকার শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এ

সম্পর্কে দুইটি অনুমানের অবসর আছে। প্রথমতঃ অনুমান করা যায় যে, ত্রিকাণ্ডশেষ-রচয়িতা বৌদ্ধ পুরুষোত্তম এবং হারাবলী-প্রণেতা শৈব পুরুষোত্তম বিভিন্ন ব্যক্তি। দ্বিতীয় অনুমান এই যে, উভয় গ্রন্থের রচয়িতা একই ব্যক্তি; তবে তিনি প্রথম জীবনে এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য শেষোক্ত অনুমান অবলম্বন করিলে, শাব্দিক পুরুষোত্তম প্রথমে শৈব পরে বৌদ্ধ, কিংবা প্রথমে বৌদ্ধ পরে শৈব ছিলেন, সে বিষয়ে মত-পার্থক্যের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। তবে একই শাব্দিক পুরুষোত্তম প্রথম জীবনে বৌদ্ধ এবং পরবর্ত্তী কালে শৈব ছিলেন, এই অনুমানের সমর্থক কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয়।

এই সম্পর্কে অপর একটি বিবেচনার বিষয় আছে। মধ্য যুগে ছন্দোমখান্তসংজ্ঞক একখানি ছন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থ পূর্ব্ব-ভারতের বাংলা অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতার নামও পুরুষোত্তম। এই গ্রন্থকারকে ছন্দোমঞ্জরী-রচয়িতা গঙ্গাদাসের গুরুর গুরু ভট্ট পুরুষোত্তম নামক ছন্দোবিদের সহিত অভিন্ন মনে করা হইয়াছে। ছন্দোমখান্তপ্রণেতা পুরুষোত্তম শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হারাবলী রচয়িতার সহিত অভিন্ন কিনা তাহা বিবেচ্য। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, শাব্দিক পুরুষোত্তম 'ভট্ট' বলিয়া আপনার পরিচয় দেন নাই।

হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অশান্ত,

গল্পটা ঐতিহাসিক কি না কে জানে, তবে যেমন অদ্ভুত তেমনি বিসদৃশ। অনার্য একলব্যের ধনুর্বিদ্যায় কুশলী হবার বাসনা হয়েছে। কিন্তু আর্য দ্রোণাচার্যকে তাঁর গুরুরূপে পাবার উপায় নেই। সুতরাং দ্রোণাচার্যের এক মূর্তি তৈরি ক'রে তাই সামনে রেখে তিনি লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করতে লাগলেন এবং ক্রমে এক জন অতীব কুশলী ধানুকী হয়ে উঠলেন। তখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল দ্রোণাচার্যের। তিনি দাবী করলেন তাঁর গুরুদক্ষিণা—হয় হস্তী, কাষায় কাঞ্চন, মণি-মাণিক্য নীল-কান্ত অয়স্কান্ত পদ্মরাগ মোতি মরকত কিছু নয়—কেবলমাত্র একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ এবং একলব্য তাই কেটে গুরুদক্ষিণা দিলেন।

এতে অনার্য একলব্যের হয়তো গৌরবই হয়েছে কিন্তু আর্য দ্রোণাচার্যের মুখ হয়েছে কালিমালিপ্ত। এটা সেকালের কথা।

আর একালে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ভক্তির আতিশয্যে কোনো কোনো বাঙালী হিন্দু আপনার মাতৃভূমিকে পরহস্তে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এতে এই বাঙালীদের গৌরব কি না জানি নে, তবে মহাত্মার মুখ যে এতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি এটা সুনিশ্চিত। অন্ততঃ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছিল তাঁর নিজের, কিন্তু বাংলাদেশ এই হিন্দুদের নিজস্ব নয়।

মহাত্মাজী যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বহু ভুল করেছেন সেটা মধ্যম রকমের বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁদের কাছেও স্পষ্ট। মহাত্মা তাঁর Himalayan blunder বা হিমাদ্রিসমান ভুলের কথা নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং এমন রাজনৈতিক নেতার প্রতি ভক্তির প্রাবল্যে যদি কেউ মানব-জীবনের একেবারে গোড়াকার প্রাথমিক তত্ত্বটা সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে ওঠে তবে সে ভক্তিকে কল্যাণের কোনোমতেই বলা চলে না। এমন ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে অবহিত হবার প্রচুরভাবে প্রয়োজন আছে।

কেননা মানুষের আত্মরক্ষা করাটা তার একেবারে গোড়া-কার একটা প্রাথমিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিকে বিসর্জন দিয়ে মানুষের কোনো সত্যই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না, কোনো ধর্মই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এই তত্ত্বটিকে সযত্নে রক্ষা করতে না পারলে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দাসের জীবন, পরমুখাপেক্ষীর জীবন, পরানুচিকীর্ষুর জীবন। আর দেশরক্ষা আত্মরক্ষারই নামান্তর। দেশরক্ষা না করতে পারলে সুষ্ঠুরূপে গৃহরক্ষা এবং প্রকৃষ্টরূপে আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই অতি সহজ ও স্পষ্ট সত্যটা যদি কোনো জাতি কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ভক্তির প্রাবল্যে ভুলে যায় তবে সে জাতি বাঁচতে পারে না। এই ভক্তি তখন বজ্ররূপে জাতির মাথার উপরে উদ্যত হয়ে থাকে। আসলে এ ভক্তি ভক্তিপদবাচ্য নয়, এ দাসের অসহায় আত্মবিলোপমাত্র। যে ভক্তি আত্মবিলোপ ঘটায়, যে ভক্তি মানুষের আত্মাকে শক্তির দিকে আকর্ষণ না করে, সত্যের প্রতি উন্মুখ না করে সে ভক্তি ভক্তি নয়, অন্য কিছু। অন্ততঃ সে ভক্তিতে মানুষের কল্যাণ নেই। সে ভক্তি জাতির সর্বতোভাবে পরিহার্য।

সভ্য মানুষের সমাজে—এবং সম্ভবতঃ অসভ্য মানুষের সমাজেও—নানা কালে নানা ছোট বড় মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে থাকে। এই সব মহাপুরুষ যত বড়ই হউন না কেন, সর্বকালের যে-সব নৈতিক সত্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মানুষের জীবনকে নিয়মিত করে নিয়ন্ত্রিত করে সে-সব সত্য ও তত্ত্ব-গুলি মহাপুরুষদের চাইতে সর্বকালেই বড়। যদি কোনো জাতি কোনো এক বিশেষ মহাপুরুষের প্রতি ঐকান্তিক মনো-যোগের দরুন এই সব সত্য ও তত্ত্বর প্রতি একান্ত অমনো-যোগী হয়ে ওঠে তবে সে জাতিকে আজ হোক্ কাল হোক্ অমঙ্গলকে বরণ করতেই হবে। এই সকল সত্য ও তত্ত্ব অমোঘ অপরিণামী ও নির্বিকার। কোনো মহাপুরুষের সম্মুখেই এসব নমিত হয় না, বিবর্ণ হয় না, পথ ছেড়ে দেয় না। কিন্তু এমন মহাপুরুষ কোথায় মিলবে যাঁর কোনো দিনই কোনো ভুল ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবে না? সুতরাং সত্য ও তত্ত্ব সর্বপ্রথমে ও সর্ব-প্রযত্নে রক্ষণীয়। তার পরে মহাপুরুষদের পূজার স্থান।

কিন্তু যে-কোনো রকমের খণ্ডিত স্থান যে ভারতবর্ষের পক্ষে কি রকম অমঙ্গলের এবং বিশেষ ক'রে পাকিস্থান যে বাঙালী

হিন্দুদের পক্ষে কি রকম মারাত্মক এই জ্ঞান যে সকল হিন্দু বাঙালীর এখনও অধিগম্য হয়েছে তা মনে হয় না। তাই ঐ সম্পর্কে গান্ধী-জিন্না কথাবার্তা ভেঙে যাবার পর বাংলায় কেউ মন্ত্রের মত জপ করছেন—

Try try again.
If at first you don't succeed,
Try try again.

অর্থাৎ "আজিকে বিফল হ'ল, হ'তে পারে কাল।" অর্থাৎ পাকিস্থানকেই ভিত্তি ক'রে একটা বোঝাপড়া হওয়া চাই-ই চাই। নইলে এই ক্ষুদে মহাত্মাদের নিশীথ-নিদ্রার ভীষণ ব্যাঘাত ঘটছে।

শুনতে পাই যারা কালা তারা বোবাও হয়ে থাকে। সেই রকম দৃষ্টি যাঁদের স্থূল, বুদ্ধি তাঁদের হয়ে ওঠে স্থূলতর। স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলতর বুদ্ধি লোকদের ভাবভঙ্গি সুতরাং কাণ্ডকারখানাই আলাদা। আজ যদি ষাট হাজার লোক বন্দুক বল্লম নিয়ে এই বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ক'রে দেশ অধিকার ক'রে নেয় তবে এঁরা "হায় হায়" করবেন। কিন্তু ঠিক ঐ একই ব্যাপার যখন নির্বিবাদে কাগজের উপর নাম স্বাক্ষর ক'রে ঘটে যাবার উপক্রম করেছে তখন এঁরা কোন্ আশু মোক্ষলাভের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। মানুষের বুঝবার ক্ষমতাটা যে কত নীচু পরদায় এসে ঠেকলে এরকমটা ঘট্‌তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বলা বাহুল্য, স্থূলবুদ্ধি এই সব ব্যক্তির চিন্তা-প্রকরণ সম্বন্ধে যে সমাজ সদা-জাগ্রত না থাকে সে সমাজের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বের সভায় জাতিমণ্ডলীর দরবারে গোটা ভারতবর্ষের একটা বিশেষ অনিবার্য স্থান আছে—যে ভারতবর্ষ সত্যে শক্তিতে উদারতায় সহানুভূতিতে মহীয়ান্। কিন্তু খণ্ডিত ভারত হবে অশক্ত অসত্য অনুদার। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জনে আমরা যতখানি প্রযত্ন করব ঠিক ততখানি প্রযত্ন করতে হবে যাতে ভারতবর্ষ খণ্ডিত না হয়—বরং এই দ্বিতীয় ব্যাপারেই আরও বেশি প্রযত্ন করতে হবে। কেননা অখণ্ড ভারতের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। ইংরেজ আর কিছু চিরকাল এদেশ অধিকার ক'রে থাকতে পারবে না। আর কোন কারণে যদি নাও হয়, শুধু এই কারণেই যে, পৃথিবীতে কোনো সাম্রাজ্যই চিরজীবী হয় নি। ঐতিহাসিক নিয়তিই এই যে, সকল সাম্রাজ্যেরই একটা যবনিকা-পতন ঘটে। ইংরেজের বেলাতেই যে সেটা অন্য রকম ঘটবে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমরা যদি খণ্ডিত হই তবে ইংরেজ চলে যাবে কিন্তু তবুও স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্ত না হতে পারে। সুতরাং ভারতের অখণ্ডতা ব্যাপারটা যেমন কেউ কেউ মনে করছেন, তেমন অপ্রধান নয়। ভারত-ব্যবচ্ছেদের আর একটা অর্থ হবে বিশ্বের দরবার থেকে ভারত-বর্ষের উচ্ছেদ। সুতরাং যেদিক থেকেই দেখ না কেন, ভারত-বর্ষকে যাঁরা খণ্ডিত করতে চান তাঁরা যে কল্যাণ সম্বন্ধেই অন্ধ তাই নয়, রাজনীতি সম্পর্কেও অপরিণত-বুদ্ধি। এই রেলওয়ে-রেডিওর যুগে যখন লণ্ডন ও নিউইয়র্ক এ-পাড়া ও-পাড়ার সামিল হয়ে উঠেছে, তখন যাঁরা ভারতবর্ষকে কথায় কথায় Sub-continent বলে উল্লেখ করেন তাঁদের সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল—কেননা বলতে গেলে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। অথচ প্যান্-ইস্‌লামিজমের সুমধুর দিবাস্বপ্নে যখন এঁদের অক্ষি-গোলক আবেশ-বিহ্বল হয়ে ওঠে তখন আরবের দুস্তর মরু-প্রান্তর পেরিয়ে সিরিয়া ও সিন্ধুদেশ এঁদের কাছে এ-বাড়ি ও-বাড়ি মনে হতে থাকে। বলা বাহুল্য, এঁদের রাজ-নীতি রাজনীতি নয়, এঁদের শুভ বুদ্ধি শুভও নয় বুদ্ধিও নয় এবং এঁদের কল্যাণ ইচ্ছায় কোনো কল্যাণ নেই।

আজ আমরা বিশ্বশান্তির, ছোট বড় সকল দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা শুনছি। কিন্তু একটা কথা মনে গেঁথে রেখে দিতে পার। পশ্চিমের রাজনীতি ও ভেদনীতি যত দিন পূর্বের ধর্মনীতি ও অধ্যাত্মনীতি দিয়ে দুর্নিবার ভাবে অনুরঞ্জিত হয়ে না উঠছে তত দিন পর্যন্ত ঐ সব ব্যাপার পূর্ণভাবে সত্য হয়ে উঠবার সম্ভাবনা নেই। ধর্মনীতি বলতে এখানে আমি রিলিজন (religion) বুঝছি না, বুঝছি নিজ দেশ নিজ ধর্ম নিজ বর্ণের মানুষকে অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর মানবতার জন্যে যে মমত্ববোধ তারই অনুভব। বর্তমান ক্ষেত্রে পশ্চিমের দিক থেকে ক্রমাগত চেষ্টা হতে থাকবে, কি ক'রে আপনার বস্তুবিশ্বের পরিধি ষোল আনা বজায় রেখে সাধু সাজা যায়, মানবতার পুরোহিতের আসনখানি দখল ক'রে রাখা যায়—এমন একটা ফরমূলা আবিষ্কার করবার। বলা বাহুল্য, এমন ফরমূলা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইউরোপের জীবন-ছন্দ বস্তুবিশ্বের ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাণশক্তির একটা তাণ্ডব নৃত্য যেন এর প্রতীক। মর্ত্য-কামনার একটা দুর্দমনীয় বুভুক্ষা এবং তার পরিতৃপ্তিতে একটা অবর্ণনীয় সার্থকতা যেন চোখে পড়ে। কিন্তু ইউরোপ সবার চাইতে ক্ষুদ্র মহাদেশ, সুতরাং তার বস্তুবিশ্বের পরিধিও ক্ষুদ্রতম। অথচ বস্তুবিশ্বের কামনা তার সবার চাইতে বড়। সুতরাং ইউরোপকে যে-কোনো উপায়ে, একেবারে অসম্ভব হয়ে না উঠলে বৃহত্তর মহা-দেশ থেকে তার এই ক্ষুধার ইন্ধন আহরণ করতেই হবে। নইলে সে ম্রিয়মাণ হয়ে উঠবে, নিজের অস্তিত্বকে সে অনুভবেই পাবে না। সে যে স্তরের সে যদি সেই স্তরের ভোগ না পায় তবে তার মনে হ'তে থাকে যে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং যত দিন ইউরোপ মর্ত্যভোগ-চেতনার মধ্যে বিধৃত থাকবে এবং পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করতে থাকবে তত দিন বিশ্বশান্তির ব্যাপারে ছোট বড় সকল জাতির প্রতি ন্যায়-আচরণ ব্যবস্থায় গলদ থেকেই যাবে। ফরাসীতে একটা কথা আছে—Plus cela change, plus c'est la meme chose—the more it changes, the more it is the same thing—অর্থাৎ যতই অদলবদল করা হোক না কেন, শেষাশেষি ঘুরে ফিরে যে-কে সেই। মর্ত্যভোগের অবতার ইউরোপের হাতে বিশ্বশান্তির ব্যবস্থায় ঠিক এইটে ঘটবে। সকল রকমের উচ্চ নীতিবাক্য মুখে আউড়িয়ে, সর্ব রকমের শুভ ইচ্ছা বুদ্ধি দ্বারা বুঝেও আসল কাজের সময় শেষাশেষি ইউরোপের অবস্থাটা হয়ে পড়বে কতকটা ক্লেপ্‌টোম্যানিয়াকের (kleptomaniac) মতো।

কিন্তু মানুষের চেতনাকে, তার আনন্দ আহরণের ক্ষমতাকে

মর্ত্যভোগের রাজ্য থেকে অমর্ত্যভোগের রাজ্যে উন্নীত করা যায়—কেবল উন্নীত করা যায় তাই নয়, মানুষের ঐ রাজ্যে উন্নীত হতেই হবে। কেননা ঐটেই মানুষের পক্ষে উচ্চতর বৃহত্তর গভীরতর এবং পূর্ণতর সত্য। অমর্ত্যভোগের এই রাজ্যে মানুষ সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, এমন কি এরই লোভে লোভী হয়ে উঠলে, বস্তুবিশ্বও ঠিক তার আপনার স্ব-স্থানটি খুঁজে পাবে—এবং তার আসল কল্যাণের রূপটি মানুষ বরণ করতে পারবে। বস্তু আর তখন বিশ্বরূপ পরিগ্রহণ ক'রে মানুষের বিশ্বকে অধিকার ক'রে থাকবে না, মানুষকে বঞ্চনা করবে না, তাকে লোভী করবে না—তার মৃত্যুর কারণ হবে না। আত্মার মৃত্যু ঘটে যখন বস্তু মানুষের মন বিশিষ্ট ভাবে অধিকার ক'রে বসে। তখন সত্য শিব সুন্দরের সমাধি ঘটে। ঠিক এইটেই ঘটেছে ইউরোপের ক্ষেত্রে। বস্তুবিশ্বের লোভ বস্তু ভোগের দুর্বার কামনা তাকে আসুর ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। বৃহৎ কল্যাণের ও-পথ বা ঐ পদ্ধতি নয়।

অমর্ত্যভোগের এই রহস্য ভারতবর্ষ সজ্ঞানে স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেয়েছিল। তাই ভারতীয় সভ্যতা কোনো দিন বস্তু নিয়ে যাঁদের কারবার, বস্তু-ঐশ্বর্য্যের যাঁরা অধিকারী তাঁদের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসায় নি। হিন্দু-সভ্যতার হিসাবে বৈশ্যের স্থান তৃতীয় পর্য্যায়ে মাত্র।

তৃতীয় পর্য্যায়ের এই বৈশ্য-আত্মা আজ ইউরোপে প্রভুত্ব করছে এবং সেখানকার সকল ক্ষাত্র শক্তি ও ব্রাহ্মণ্য বুদ্ধি এই বৈশ্য প্রভুর কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে। এবং এইটেই হচ্ছে মূল ব্যাধি যে ব্যাধিতে আজ বিশ্বমানব ভুগছে। এই ব্যাধি যত দিন প্রবল থাকবে—এই বৈশ্যরা যত দিন পৃথিবীতে প্রভুত্ব করতে থাকবে—তত দিন বিশ্বমানব পূর্ণস্বাস্থ্য পরিপূর্ণ কল্যাণ কদাপি লাভ করতে পারবে না। দু-এক জন রাষ্ট্রনেতার উচ্চ নীতিবাক্য কথার কথা মাত্রে পর্যবসিত হবে। এবং সাময়িক ভাবে যতই সোরগোল উঠুক না কেন, যতই সভা সমিতি কমিটি কনফারেন্স বসুক না কেন দেখা যাবে যে শেষাশেষি ফরাসীদের ঐ বচনটাই সত্য হয়ে উঠে পরিহাস করছে—Plus cela change, plus c'est la meme chose—the more it changes, the more it is the same thing. ভিতরে রইল সংকীর্ণ আত্মা কিন্তু বাইরে হবে দরাজ হাত, এমনটি ঘটে না।

বৈশ্য-ইউরোপের বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব ও বস্তুবিশ্বের জন্য দারুণ বুভুক্ষা খর্ব করতে হলে চাই বিশ্বের জাতিমণ্ডলীর সভায় প্রাচ্যের একটা প্রবল প্রভাব বিস্তার—ভাবের জগতে ও কর্মের জগতে। ভাবের জগতকে সে উদ্বুদ্ধ করবে অমর্ত্যভোগের সন্ধান দিয়ে, জীবনের অমৃতত্ব লাভের গোপন রহস্য-বারতায়; আর কর্মের জগতকে উদ্বুদ্ধ করবে বৃহত্তর মানবতার সহজ ঔদার্যে, বিশ্বব্যাপী একটা সহজ ন্যায়-দৃষ্টিতে। প্রাচ্যের রক্তে আছে সেই এক বীজ যা সহজে বস্তুভোগের বুভুক্ষাকে অতিক্রম করতে পারে। আজ সভ্য পৃথিবীতে প্রাচ্যের, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষ ও চীনের, লোকরাই পূর্ণবয়স্ক (adult) মানুষ। তারা জীবনের ভিতর-বাহির অলিগলি সব জানে। এরাই হতে পারে ভোগের ক্ষেত্রে স্থির ক্রোধের ক্ষেত্রে বীর। অপর পক্ষে ইউরোপের লোক অপরিণত আত্মা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভোগ-উল্লাসী তরুণ যুবক ছাড়া আর কিছু নয়। কেবল জীবনের বাইরের দিকটার স্বাদই সে পেয়েছে এবং তাই নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। জীবনে কিসের মূল্য কি তার তা আজ লক্ষ্য নয়, এমন কি তার কাছে তা স্পষ্টও নয়। দেহের শ্রমে ও প্রাণের ভোগে আজ ইউরোপের যে ঔজ্জ্বল্য, যে সৌন্দর্য তার বেশির ভাগটাই স্বাস্থ্যবান অশ্বের ঔজ্জ্বল্য, পুষ্টপেশী শার্দুলের সৌন্দর্য্য। প্রথম যৌবনের ঔদ্ধত্যে ইউরোপ যখন হাজার হাজার যুদ্ধজাহাজ সাজিয়ে লক্ষ বম্বারের গর্জন তুলে গর্বিত কণ্ঠে বলে—এই দেখ আমাদের বিরাট্ অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা, আমাদের সর্ব কালের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠতা, তখন পরিণত-বয়স্ক ভূয়োদর্শী ভারত ও চীনকে বিস্মিত লজ্জায় ও মানবতার আহত মর্যাদায় মাথা হেঁট করতে হয়।

সে যা হোক্, এখন এই ভারত ও চীনকে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে, বিশ্বের কর্মে ও চিন্তায় তাদের প্রভাব বিস্তার করতে হলে, চাই এক অখণ্ড ও স্বাধীন ভারত, এক স্বাধীন ও অখণ্ড চীন। এমন ভারত এমন চীনই স্বাস্থ্যবান শক্তিমান হতে পারবে। একেই তো "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী," তার উপর সে কাহিনী যদি অসহায় দুর্বলের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় তবে ভদ্র ব্যক্তিরাও তাকে সংশয়াকুল দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। সুতরাং ভারতের, তথা চীনের, অখণ্ডতা ব্যাপরটা কিছুমাত্র কম জরুরী নয় বরং আরও বেশি জরুরী। কেননা, পূর্বেই বলেছি, খণ্ডিত ভারত স্বাধীন হলেও তার সে স্বাধীনতা পদে পদে বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা এবং প্রায় ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে বিঘ্নিত হবে। সুতরাং পাকিস্থান যে শুধু বাঙালী হিন্দুর পক্ষেই মারাত্মক তাই নয়, খণ্ডিত ভারত হিন্দু-মুসলমান-শিখ-ক্রীশ্চান-নির্বিশেষের পক্ষে অকৌশলের এবং বিশ্বমানবের পক্ষে অকল্যাণের। এই কারণে ভারতব্যবচ্ছেদকে সর্বপ্রযত্নে ব্যাহত করা প্রয়োজন। যিনি অন্যবিধ বলেন তিনি হয় মূঢ়চেতা নয় প্রতারক। তাঁর কথা কদাপি শ্রোতব্য নয়। স্বাধীনতা লাভের চাইতে ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি কম মনোযোগী হলে বোকামির পরিচয় দেওয়া হবে। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত, কিন্তু খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করারও নিশ্চয়তা নেই।

ভাল কথা, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হাতে কংগ্রেসীদের সবার চাইতে বড় হার কি জান? ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট একদা ভারতের রাজনৈতিক জলাবর্তে "হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ" রূপ একটি টোপ ফেলেছিলেন। সেই টোপটি কংগ্রেস-কাতলা কাত্না সমেত নির্বিবাদে গলাধঃকরণ করেছেন। আর এইটে হচ্ছে ইংরেজের হাতে কংগ্রেসের সবার চাইতে বড় পরাজয়। যে আইডিয়া ভারতের জাতি-গঠনে বিষবৎ পরিত্যাজ্য সেই আইডিয়াকে কংগ্রেস আপনার মন্ত্রণাসভায় স্থান দিয়েছেন এবং পালিত পুত্রের ন্যায় সযত্নে পরিবর্ধিত করেছেন।

জাফর আলির বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব যখন পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন তখন তিনি যেমন ভাবতে পারেন নি যে এক দিন ইংরেজ সারা ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসবে, তেমনি ইংরেজ শাসকরা যে-দিন হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ রূপ আইডিয়াটা

ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন সে-দিন নিশ্চয়ই তাঁরা ভাবতে পারেন নি যে তা এতটা সাফল্যের সঙ্গে কংগ্রেসের কাঁধে ভূতের মতো এমন ভাবে চেপে বসবে এবং কংগ্রেসীদের মস্তিষ্কে এমন ভাবে কেটে বসবে যে তাঁরা ওর বাইরে কিছুই দেখতে পাবেন না, কিছুই ভাবতে পারবেন না। হিন্দু-মুসলিম-বিরোধের যে পনর আনা কাল্পনিক এবং বাকি এক আনার ন' পাই বানানো, এটা যাঁরা সম্মোহিত হন নি তাঁদের কাছেই স্পষ্ট। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যদি ভয়ঙ্করভাবে সত্য হ'ত তবে ১৯৩৫এর শাসন-সংস্কারের পর মুসলিম লীগ বিজয়গর্বে জয়-পতাকা উড়িয়ে সিন্ধু সীমান্ত ও পঞ্জাব প্রদেশে মন্ত্রিত্বের সিংহাসনে গিয়ে অধিরোহণ করতেন এবং প্রসঙ্গতঃ তাঁদের ঢক্কানিনাদে আমাদের কর্ণপটহের বিলক্ষণ ব্যায়ামের অবসর ঘটত। কিন্তু তা যে হয় নি, এইটেই প্রমাণ যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ আইডিয়া কংগ্রেসকে যেমন সম্মোহিতই করুক না কেন, সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলমানের উপর তা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এই ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রভুশক্তি দ্বারা কংগ্রেস এমনই সম্মোহিত হয়েছেন যে, এক সময়ে আরাকানের যুদ্ধের সংবাদে যেমন কেবল শোনা যেত "রথিডং বুথিডং" "বুথিডং রথিডং" তেমনি হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কথা উঠলেই কংগ্রেসের মনে কেবল প্রতিধ্বনিত হতে থাকে "মুসলিম লীগ জিন্না" "জিন্না মুসলিম লীগ"। ইংরেজ শাসকরা ঠিক যা চেয়েছিলেন কংগ্রেস ধীরে ধীরে ঠিক তাই সত্য ক'রে বুঝেছেন এবং সম্মোহিতের ন্যায় তদনুরূপ আচরণ করেছেন। বলা বাহুল্য, যে বাধা সত্য তার নিরসনের প্রচেষ্টায় মানুষ শক্তিমান হয়ে ওঠে, কিন্তু কাল্পনিক বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ হয়ে পড়ে ক্লান্ত এবং লাভ হয় তার শুধু তিক্ততা ও হয়রানি।

শোনা যায়, এক রকমের নাকি পাখী আছে যাদের চার-দিকে মাটিতে দাগ কেটে দিলে তারা আর সে দাগের বাইরে আসতে পারে না, মনে করতে থাকে যে তাদের চারদিকে একটা প্রকাণ্ড বাধা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। কংগ্রেসের অবস্থা হয়েছে কতকটা এই পাখীদের মতো। কংগ্রেসের চার-দিকে যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের দাগ কেটে দেওয়া হয়েছে, সত্য শক্ত উচ্চ পাথরের প্রাচীর মনে ক'রে কংগ্রেস আর তার বাইরে আসতে পারছেন না; সেই দাগ-দেওয়া গণ্ডির মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছেন, সম্ভবতঃ শাসকদের অতুল আনন্দানুভূতির কারণ হয়ে।

ডেমোক্রাসির একটা বিশেষ প্রকারের সাহস আছে, এ সাহস ঋজুতার সাহস। এই ঋজুতা এই সাহস কারো প্রতি অত্যাচার করে না, কাউকে অনুগ্রহ করে না। অধিকার এ চেনে, কিন্তু আবদার এর অভিধানে স্থান পায় না। এই ঋজুতা এই সাহসকে যদি সামনে রেখে কংগ্রেস অগ্রসর হতেন তবে ওরই দীপ্তির সম্মুখে যা কিছু কুট যুট, যা কিছু বক্র সব সিধা হয়ে যেত। বক্র আর অষ্টাবক্র হয়ে উঠবার সুযোগ সুবিধা বা সাহস কোনোটাই পেত না।

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের একটা অতি সহজ ফরমুলা আছে। এত সহজ যে তা সহজে সবার চোখে পড়ে না এবং এত অব্যর্থ যে তা কোনো দিন ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা নেই। এই ফরমুলাটি হচ্ছে এই যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বলে আসলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন হিন্দু-ক্রীশ্চান বা হিন্দু-পার্শি অথবা হিন্দু-শিখে সমস্যা বলে কোনো সমস্যা নেই। কিম্বা অন্য ভাবে বলা যায়, হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে যে সমস্যা আছে সে সমস্যা হিন্দু-ক্রীশ্চানের মধ্যেও আছে, হিন্দু শিখ, হিন্দু পার্শি, হিন্দু বৌদ্ধর মধ্যেও আছে। এমন কি, ইচ্ছা করলে এবং প্রচুর অবসর ও প্রযত্ন থাকলে রাম শ্যামের মধ্যেও, রহিম রহমতের মধ্যেও সমস্যা আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং হিন্দু মুসলিমের প্রশ্নটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিশিষ্ট ক'রে তোলা সত্য কথা নয় বা শুভবুদ্ধির কথা নয়, সু-নীতি বা সুবিচারের কথা নয়। তুমি বলতে পার যে, কোনো কোনো মুসলমান বলেন যে, মুসলিমরা একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায় সুতরাং তার প্রশ্নটাও বিশিষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু ভদ্র সমাজে নিজের সার্টিফিকেট নিজে দেবার রীতি নেই। আর ডেমোক্রাসি বলে যে, কোনো শক্তি বা কোনো সম্প্রদায় যদি বিশিষ্ট হন তবে তাঁর বা তাঁদের সে বিশিষ্টতা সদ্গুণের দ্বারা প্রমাণিত হওয়া চাই, প্রতিভার দ্বারা প্রকাশিত হওয়া চাই। এই প্রকাশের দ্বারা তাঁরা নিজেরা যেমন কৃতার্থ বোধ করবেন, আনন্দলাভ করবেন তেমনি স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আপন আপন বিশিষ্ট স্থানটিও অধিকার করতে পারবেন। তখন আর তাঁরা "হাত ছোট আম বড়"র মতো পদে পদে ব্যর্থতার অনুভূতি দ্বারা পীড়িত হয়ে আপনার মনের অশান্তি অন্যের অশান্তির কারণ ক'রে তুলবেন না। আমি অমুক ধর্মের সুতরাং আমার কথাটা বিশেষ ক'রে ভাব, কিম্বা আমি অমুক প্রবল প্রতাপান্বিত প্রাচীন রাজবংশের আধুনিক কালের অবতংস সুতরাং আমার জন্যে একটা সুউচ্চ আসন তৈরি করে রাখ—এমন কথা ডেমোক্রাসির স্বীকার্যের মধ্যে নেই। ডেমোক্রাসির আসল মঙ্গলের বীজটাই এর মধ্যে যে এতে কিছুই শ্রুতি বা স্মৃতি দিয়ে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় সবকিছু বর্তমানের সদ্গুণাবলী দিয়ে, প্রত্যক্ষ প্রতিভা দিয়ে। মুসলিম সম্প্রদায় যদি ডেমোক্রাসির এই সব কথা না মানেন, ডেমোক্রাসির ধর্মকে স্বীকার করা অসুবিধাজনক মনে করেন তবে তাঁরা যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করতে চান তার জন্যে তাঁদের ক্ষাত্রশক্তিকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে—যা আজ সভ্য সমাজে, অন্ততঃ কথায়, jungle law বলে নিন্দিত। কিন্তু মজার কথা হবে এই যে, ওখানেও শেষাশেষি এই প্রতিভার প্রশ্নই এসে সপ্রতিভ ভাবে হাজির হবে।

সে যা হোক ঐ সহজ ফরমুলাটি যদি কংগ্রেস আবিষ্কার করতে পারেন এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেন তবে এরই আলোকসম্পাতে তাঁরা হিন্দু-মুসলিম মিলনের যে বীজ দেশের মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে, দুয়ের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে নানাস্থানে নানারূপে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশিত হয়ে আছে সেই সৎ বস্তুকে সহজ করে সত্য ক'রে মূর্ত ক'রে তুলতে পারবেন। আর তখনই হিন্দু-মুসলমানের সত্যকার মিলন অনিবার্য হয়ে উঠবে, যে মিলন পাকিস্থানী মিলন নয়, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন। এই মিলনেই

বিরুদ্ধ পক্ষের বিমর্ষতার কারণ আছে। পাকিস্থানী মিলন বিরুদ্ধ পক্ষের হর্ষের ব্যাপার। পাকিস্থানী মিলনে যে মিল, সেটা আসলে হচ্ছে গরমিল, বড় জোর সেটাকে বলতে পারো গোঁজামিল। এবং বুদ্ধিমান মাত্রেই জানেন যে গরমিলের চাইতে গোঁজামিল বেশি বিপজ্জনক ব্যাপার।

পূর্বেই বলেছি যে, এই সহজ ফরমুলাটি অব্যর্থ। কেননা এর একটি মহাগুণ এই যে, এই ফরমুলাটি ধরে যিনিই যেখানেই যেভাবেই যেটুকুই কাজ করুন না কেন তার সবটাই সর্বকালের তরে জমার ঘরে ওয়াশীল হয়ে থাকবে।

ইতি—হসন্ত

প্রকৃত পরিচয়

শ্রীমহাদেব রায়, এম-এ

১

কিছুদিন এখানকার অডিট আপিসে চাকুরি করিয়া গিয়াছি। স্থানটার মোহ এখনও কাটে নাই। পূজার ছুটিটা এবারও এই-খানেই কাটাইয়া যাইব ভাবিয়া আসিয়াছি। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের মোহ। গেলবারও এই টানেই ছুটিয়া আসিতে হইয়া-ছিল। তবু কাটে ভাল। বড় ছুটিতে একা-একা কাটানো ঘোর দায়। তার উপর পুরনো স্মৃতির ব্যথা। এ জায়গাটা মন্দ লাগে না কিন্তু। সকাল-বিকেল সাহেব পাড়াটায় বেড়াইতে বেশ লাগে—চমৎকার ঝর্‌-ঝরে তক-তকে।—দক্ষিণে অবারিত মাঠ। দূর দিগন্তে ঘন বনশ্রেণী।

দুপুরটা পড়িয়া লিখিয়া কাটে। সন্ধ্যায় বান্ধবেরা আসিয়া আসর জমাইয়া বসেন। কোন কোন দিন নিতাইয়ের কীর্তন। বিরহের পদের মাধুর্য মনটাকে যেন কোন্ সুদূর অতীতে টানিয়া লইয়া যায়। পুরোনো দিনের স্মৃতির বেদনা ভুলিতে পারি না।

তা' যাক্। জীবনটা এই ভাবেই ত কাটিবে। আদর্শ সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিবার মত মনের বল হইল কোথায়? ছন্ন-ছাড়া জীবন একটা। এ জীবনে সদ্‌গতি নাই।

পনর-ষোল বছর সন্ন্যাস-জীবন কাটাইয়া আবার ত চাকুরিই গ্রহণ করিতে হইল। হউক অধ্যাপকের বৃত্তি—কিন্তু ইহারই কি মোহ কম? যশ—জনপ্রিয়তা—আরও কত কি! অথচ, আজ যাহাদিগকে লইয়া কাটাই, যাহারা এতখানি ভালবাসে, ভক্তি করে, তাহারা আমার প্রাণের পরিচয় কতটুকু রাখে? আমার মন যে মাঝে-মাঝে কিসের তীব্র বেদনায় ভরিয়া উঠে, কে তাহার সংবাদ রাখে?

গেলবারে সমগ্র দেশে যখন হাহাকার উঠিয়াছে, আমার মনও তখন যেন তীব্র বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। দুদিনের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিয়া মন গুমরিয়া মরিতে লাগিল আর এক দারুণ নৈরাশ্যে। সান্ত্বনা লাভের আশায় ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগি-লাম। কিন্তু বৃথা। সান্ত্বনার বিনিময়ে লাভ হইল তীব্রতর জ্বালা।

বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বুভুক্ষার তীব্র জ্বালা উঠিয়াছে। পথে-ঘাটে কঙ্কালসার মুমূর্ষু পান্থ ধীরে ধীরে মৃত্যুর কবলে কবলিত হইতেছে। কলিকাতার মত মহানগরীর রাজপথে মরণোন্মুখ নর-নারী দিনে-রাতে গড়াগড়ি যাইতেছে। শ্মশানে শবদেহের উপর শবদেহ যেন মৃতদেহের স্তূপ রচনা করিতেছে। পথি-পার্শ্বে শব-দেহের উপর কাকের দল খা-খা করিতেছে। কঙ্কালাবশেষ আবালবৃদ্ধবনিতা অন্ন-ভিক্ষার আশায় দলে-দলে দৌড়াইতেছে। নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে লঙ্গরখানা খুলিল। মৃত্যু দেখিয়া যত না ক্লেশ, ততোধিক ক্লেশ আমার মধ্যবিত্ত নর-নারীর স-সন্তানে বুভুক্ষার ক্লেশ দেখিয়া। আমার সেই পুরনো দিনের দুষ্কৃতের যন্ত্রণা যেন অস্থি-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিতে চায়। কি পামর! কি হতভাগ্য? ছিঃ! এত বড় দুষ্কৃতি যে করিতে পারে জীবনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।

নিতাই আমার বিষণ্ন ভাব দেখিয়া মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করে। কি যে ভাবেন দাদা আপনি? খুলেও বলবেন না ত আমাদের মত অপোগণ্ডকে! নিন্ পড়ুন—দুটো কবিতা পড়ুন—শোনা যাক। আপনার মত কবি-মানুষের মনোদুঃখ কিসের দাদা? বললুম আপনাকে গুড়কের নেশাটি করুন—দেখবেন কি আনন্দ। সব দুঃখু কেটে যাবে—মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে—ভর্ ভর্ করে' লেখা বেরুবে—হ্যা-হ্যা করিয়া নিতাই হাসে। মুখে তাহার হাসিটি লাগিয়াই আছে—সুন্দর, সদানন্দ ভাব। অথচ, আজও তাহার সম্যক্ পরিচয় পাই নাই। গেল-বারই যা তাহার সঙ্গে পরিচয়। তবু তাহাকে যত দেখি, ততই সে মনটাকে আকর্ষণ করে। সন্ধ্যায় কীর্তনের পদ গাহিয়া সে সকলকেই আনন্দ দেয়। তাহা ছাড়া, সর্বদাই তাহার নির্মল হাসি। গেলবার পাশের গ্রামটায় গিয়া নিতাইয়ের লঙ্গরখানায় যে অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়াছি, তাহাতে তাহার উপর শ্রদ্ধা আমার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। "কি দাদা, চেয়ে-চেয়ে দেখছেন কি? এই যে খিচুড়ি, তা-ও কি দিতে দেয় পাতায়? দেখছেন—যেন চিলে ছোঁ মেরে নিতে চায়। আর, এদেরই বা দোষ কি বলুন। দেশ দুনিয়া জুচ্চুরি করছে—এ অবস্থা ত অনিবার্য। বললে আশ্চয্যি হবেন—গরিবের পেটের জন্য চাল-ডাল দিচ্ছেন একজন, আর একজন কর্ম-কর্তা তারই থেকে চুরি করে' চালে-ডালে ঘর বোঝাই করছেন। জোচ্চোর দাদা, জোচ্চোরে ভরা দুনিয়া।"

"তাও করে নিতাই? এই সব গরিব কাঙালদের অন্ন মেরে নিজের ঘরের সংস্থান করে ভদ্র পরিবারে?" "আলবাত্ দাদা, রাম তাঁতীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন—ও ত মিথ্যে বলবে না!"

আগাগোড়া আর এক অনলস কর্মী এই রাম। তাহার মুখেও শুনিলাম—হ্যাঁ বাবু, শ্রীহরি চাটুজ্যে এই গরিবের বরাদ্দ চাল ডাল থেকে দু-দশ মণ ঘরে সঞ্চয় করে নিলে। সত্যি কথা বলব তাতে কি?

ভাবিলাম—এ দুষ্কর্ম'ও মানুষে করে! অথবা, আমি যাহা করিয়াছি, তাহার চেয়ে এ এমন আর বেশি কি? অনেকটা ভুলিয়া ছিলাম। এই দুই বৎসর দেশের হাওয়া আমার অন্তরলোকে যেন বিষের ছোঁয়া দিয়া যাইতেছে। এবার দেশে সে তীব্র আর্তনাদ কমিয়াছে সত্য; কিন্তু এক সের চালের দরে এক কষ্ট দেখিয়াছি—তিন সের দরে আর এক কষ্ট। দুর্ভিক্ষের পদলেহী মড়ক আসিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় ঔষধ নাই।—বুকে যাহাদের প্রাণ ধুক্-ধুক্ করিতেছিল, এইবার তাহাদের প্রাণান্ত। মধ্যবিত্তের অখাদ্যে প্রাণ-রক্ষার পালা সুরু হইয়াছে। গ্রামে-গ্রামে পর্যন্ত কণ্ট্রোলের দোকান। সেখানেও সারি-সারি নর-নারী। ইহাদের মধ্যে কি—? নাঃ—

মাঝে-মাঝে বন্ধু-বান্ধবকে ফাঁকি দিয়া কলিকাতায় "পাগল বাবা"র মঠে ছুটিয়া যাই। কোথাও সান্ত্বনা নাই। নিতাই আসিয়া বলে—কি যে দাদা, সন্নিসি সন্নিসি করে ছোটেন? তার চেয়ে নিজেকে খুলে বলুন দেখি সব···কি চান্।

"তুমি ত নিতাই দুনিয়াটায় জোচ্চোরই দেখছ বেশি। সাধু সন্ন্যাসীর···?"

"আর কি বলি বলুন! গেলবার ত শ্রীহরি চাটুজ্যের কাণ্ডটা দেখে গেলেন। এবার আবার কি হয়েছে জানেন? তিনিই হয়েছেন 'ফুড কমীটি'র ব্যবস্থাপক। পাঁচটি গাঁয়ের লোক তাঁরই হাত-তোলা ব্যবস্থার দিকে হা করে' চেয়ে আছে। য়্যুনিয়ন বোর্ডের সভাপতি সামন্ত সাহেবের আস্কারা রয়েছে পুরোদস্তুর। উভয়ের ঘরেই ঠাসা জিনিস-পত্তর। টিন-টিন কেরোসিন তেল, প্রচুর চিনি—অন্য জিনিসের ত কথাই নেই। আর গ্রামের ভেতর যেয়ে দেখুন—পেয়ারের দু-একটি লোক ছাড়া কারু ঘরে ডিবরি জ্বালাবার ফোঁটাটি নেই কেরোসিন তেলের। লক্ষ্মীডাঙার ছোক্‌রারা একটা নৈশ ইস্কুল খুলছিল—চলছিলও বেশ। চাষীবাসী, যুবকবৃদ্ধ সকলেই দু-অক্ষর শিখছিল। তাতে প্রথম বাদী হলেন গ্রামের সনাতনী টিকি-চটি-সম্বল বৃদ্ধ মাতব্বরেরা—আর দ্বিতীয় স্থান প্রবলতর হ'ল এই সামন্ত মশাই আর চাটুজ্যে মশাইয়ের কর্তৃত্বে। অথচ, মুখে কি শিষ্টতা! বোর্ডের আসন কায়েমি করবার জন্যে এদের অসাধ্য কর্ম নাই জানেন?"

"তা হ'লে, নিতাই গ্রামের অবস্থা বিশ-ত্রিশ বছর আগে যা ছিল, এখন তার থেকে আরও খারাপই বল।"

"সে কথা আর বলতে দাদা!"

ভাবিতে থাকি ইহাদের কথা। নিজের কথা তাহার মধ্যে আসিয়া সব গুলাইয়া দেয়।—যাক। একবার বরাহনগরের আশ্রমটা ঘুরিয়া আসি একদিন। তার পর, স্বস্থানে। সে-ই ভাল।

২

হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ফিরিবার গাড়িটা কোনমতে ধরা গেল। এক-কালের সহকর্মী বান্ধব—এই যা সম্পর্ক। তাঁহার পরিচয় আমি সম্যক্ জানিলেও এখানকার কেহই আমার সব পরিচয় রাখেন না। এ অবস্থায় বান্ধবের বাড়িতে অবকাশ যাপন। বন্ধুর ছেলে-পিলের জন্য ফল-সন্দেশ, লজেন্‌স্ বিস্কুট, আর জামা-কাপড় দু-একটা—এই যা পণ্যের মধ্যে। বেশি রাত্রি করিয়া ফিরিলে বাড়িসুদ্ধ আমার জন্য দুর্ভোগ। তাই বিকালের গাড়িটা ধরা। অবশ্য বন্ধুবর সস্ত্রীক যে আন্তরিক ভালবাসা দিয়া অকপট সমাদর করিয়া থাকেন তাহার তুলনা নাই। চমৎকার লোক এই শচীপতিবাবু—পত্নীও সেইরূপ। তবু রাত নাই, দিন নাই সময়ে-অসময়ে অতিথির অত্যাচার ত আর ভাল কথা নয়।

ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা ঘণ্টা যখন পর-পর বাজিয়া উঠে তখনও ফটকের ওপারে। ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারে এ দুঃসময়ের দুরবস্থা কিরূপ। তাহার উপর গাড়িতে উঠিতে দেয় না—আরোহীদের এমনি সহানুভূতি।

"দেখছেন না মশাই, গলদ্‌ঘর্ম লোকটা, দরজটা একটু ছাড়ুন না—উঠতে দিন।"

পরিচিত কণ্ঠস্বর নিতাইয়ের। হৃদয় যেন আমার অমৃতের ধারায় সিক্ত করিয়া দিল। "তার পর? দাদার ত পূজোর বাজার নয়—আশ্রম-টাশ্রম নিশ্চয়ই! অনর্থক সুস্থ দেহটাকে ব্যস্ত করছেন দাদা! আসুন-আসুন—বসুন দেখি—এ পাশে চলে আসুন। হতভাগার গাড়িতে কি তিল ফেলবার জায়গা আছে ছাই। তায় পূজোর বাজার! আসুন। এই ভিড়ে কিন্তু সাবধান হবেন একটু। গাঁট-কাটায় ছেয়ে ফেলেছে রাস্তা-ঘাট, বিশেষ করে ট্রেন। ···বসেছেন ত! উহু—ঠিক হয় নি। আমার এই বাঁ পাশে জানালার ধারটায় একটু ছড়িয়ে বসুন আপনি। একেবারে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছেন।"

বসিলাম। এত ভিড়ের মধ্যেও দেখিলাম—এক রুগ্নকায় একচক্ষু শিখ-বৃদ্ধের বাতাসের সৌখিন নেশা—দরজার ঠিক মাঝখানে বসিয়াছে। সামনে যে দু-ইঞ্চি জায়গা করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকেই তাড়াইবার চেষ্টায় দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিতেছে—এই হট যাও না, হাবা রোখ্‌তা কাহে?

"আরে, হঠ্‌ জায়েগা কোথায়? দেখতে পাতা নাই—তিল ফেলনেকা জায়গা কোথ্‌াও নাহি হ্যায়।"

ক্রম-বর্ধমান বাগ্‌বিনিময়ে বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণ বাঙালীর হাতাহাতির উপক্রম। নিতাই তাহার সরস-মধুর বাগ্‌ভঙ্গিতে উভয়কে থামাইয়া (বড়) দরজার কপাট দুইটিকে সজোরে দুইধারে ঠেলিয়া দিতেই দরজা ফাঁকা হইয়া গেল। মুক্তাপংক্তির মত দন্তে শুভ্র হাসি ছড়াইয়া বলিল—খাও লেও, হাবা বুড্ডা বাবা, অক্সিজেনকা জব তুম্‌হারা এতখানি প্রয়োজন, তখন সেকিণ্ড কিলাস মেঁ উপবেশন নেহি কিয়া কেঁউ বাবা। বলিয়াই তাহার আবার সেই হাসি।

এখনও কামরাময় হৈ-চৈ।

কীর্তন-রসিক দস্তিদার বাবু বলিলেন—একটা বেশ চড়াসুরে বিদ্যাপতির পদ ধর দেখি নিতাইবাবু—সব গোলমাল থেমে যাবে।

"দস্তির এক কথা! আপনার জ্বালায় মরেন ষষ্ঠী—বর দিয়ে যাও। তার চেয়ে দাদাকে দুটো তাঁর কবিতে আবৃত্তি করতে বল না—ওঁর মনটায় বেশ ইস্ফূর্তি আছে।"···হা-হা-হা করিয়া নিতাইয়ের হাসি আবার।

"এক আনায় আটখানা বিস্কুট বাবু। দেখুন—তাজা বিস্কুট।

এই দুর্মূল্যের বাজারে সস্তায় উৎকৃষ্ট খাবার হচ্ছে দিশী কারখানায়।"

"আমায় দেবেন মশাই এক আনার।" "ও মশাই, এধারে এক আনার দেবেন তো!"

নিতাইয়ের প্রতিবেশী নলিনীবাবু বলিলেন—হ্যাঁ হে, বিস্কুটটা ভাল। নিয়ে নেওয়া যাক্ কিছু, ছেলে-পিলে পছন্দ করে খুব।

নিতাইয়ের সেই অট্টহাস্য। "নলিনীদার এক কথা। এক আনায় আটখানা বিস্কুট—সেও কখনও ভাল হয়?" হো-হো করিয়া হাসিয়া নিতাই নলিনীবাবুকে অপ্রস্তুত করিয়া দিল।

"তোমার ত অই আছে—সবতাতেই ইয়ার্কি!"

"আরে, এর মধ্যে আর ইয়ারকিটা তুমি কোথা পেলে নলিনীদা? পয়সায় দুটো—পচা আটার বিস্কুট—ছোঃ। যাকে বলে—অখাদ্যিতে পেরান রক্ষে। মার ঝেঁটা—যত সব জোচ্চোরের কাণ্ড—গেল দেশটা।" দস্তিদার বাবুর পুনশ্চ অনুরোধ—ধর না নিতাইবাবু একটা! সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল কামরার এক কোণে—এঃ ও—ন্ধ হোয়ে ভাই, কোতো কোষ্টো পাই, এ জানাবো কাহারে—এ জানেন ভোগো—ও-ও—মান্।

"নাও কীর্তন শোনো।"

দস্তিদার বাবু বলিয়া উঠিলেন—আর জ্বালাতনের কামে বাঁচি না হে নিতাই বাবু।

"এও জুচ্চুরি এক রকমের দস্তি। এরও পেছনে এই পোড়া দেশে মুখপোড়া এক দল বেকার হা করে চেয়ে আছে। কি আর বলব বল।"

"ছুরি—ছুরি বাবু, কাঞ্চন-নগরের ছুরি।"

"ছুরি? হ্যাঁ, তা লাগাও—কার গলায় লাগাতে চাও।"

এবার হাসিয়া ফেলিলাম। নিতাই সেই প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া বলিল—তবে যে,—দেখুন দেখি নি একটার পর একটা কাণ্ড।

অপূর্ব শ্যামলতায় দিক ভরিয়া গিয়াছে। দূর-দিগন্ত-বিসর্পী অপূর্ব শ্যামলতা। নির্নিমেষ চক্ষু দিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির অপরূপ রূপ-সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছি। মধ্যে মধ্যে বিরাট মহীরুহের স্তব্ধচকিত মূর্তি। অস্তোন্মুখ সূর্যের আরক্ত রশ্মি-রেখা পড়িয়াছে বৃক্ষরাজির গায়ে, আর সবুজ ধান্যশীর্ষে। ধরণীর শ্যামল অঞ্চলে কনক-বর্ণ। এমন হৃদয়-রাঙা রূপের মধ্যেও মনটা হঠাৎ যেন উদাস হইয়া গেল। "নিতাই, দেখ, এ রূপের মধ্যে কিন্তু তোমার দুনিয়াময় জুচ্চুরির কোন বালাই নেই। দেখ—কেমন সুন্দর হংস-বলাকা! শরতের অপরাহ্ণ কেমন স্নিগ্ধ-শীতল সহজ সুন্দর বল ত! পদ্ম মুখ বুজে আসছে—তবু কি সুন্দর দেখতে! এ্যাঁ? ওধারে কাশবনের কেমন শুভ্র-মনোহর রূপ! মনটাকে কেড়ে নেয় না?"

"না দাদা—আপনাদের কবিত্বের জুচ্চুরিকে পেরনাম করি—কথার জুচ্চুরিতে ভুলিয়ে দিতে চান্ নিতেকে!"

"কেন, দিগন্ত-জোড়া এই শ্যামল রূপ—সুদূর-বিস্তারী এমন মনোহর শোভা! ভাল লাগে না, তোমার? মাঠের বুক চিরে পাকা-রাস্তাটা সোজা চলেছে কেমন—দু'পাশের সমান্তরাল বৃক্ষ-শ্রেণীর কালো ছায়া! সন্তানকোলে যুবতীর কি সুন্দর গতি! এ-সবও ভাল লাগে না তোমার?"

"রক্ষে করুন দাদা, পর-স্ত্রীর গতি-ভঙ্গি দেখবার সাধ কোন দিন যেন না হয়। ও-সব আপনাদের সাহিত্যিকের চোখেই পুণ্যির কাম। আমাদের মত হতভাগাদের ধাতে সইবে কি দাদা!"

"আরে পাগল, কি বলছি তলিয়ে দেখলে না? প্রকৃতির রূপের উপর আমাদের মানস চক্ষুর যে অতবড় একটা আকর্ষণ, সেটাকেও উড়িয়ে দিতে চাও! রূপের নেশা একটা বড় নেশা নিতাই।"

"কে বলছে—না। রূপের নেশা—আল্‌বাত দাদা! রূপ ত নয় যেন পূর্ণিমের চাঁদ। সে চাঁদ…যাক্ গে। দাদা, নেশার মধ্যে এখন গুড়ুক। তাতেই সমস্ত হৃদয়-মন অবশ করে' আসে অস্থায়ী-মরণ নিদ্রার নেশা। নেশা বলছেন—ঐ দেখুন শিখ-বৃদ্ধের বাতাসের নেশায় ধীরে ধীরে কেমন নাসা গর্জন সুরু হ'ল। এধারে দেখুন—ছোকরার কি রকম পড়ার নেশা! কোলে শারদীয় আনন্দবাজার খোলা—আর শিরোদেশ দক্ষিণে হেলিয়া স্কন্ধে পড়িল—ওষ্ঠ-প্রান্ত বাহিয়া অমৃত নির্ঝরিণী। পড়ার নেশা কেমন দেখছেন তো! শারদীয় আনন্দবাজার নেওয়া হয়েছে তরুণের!—ইষ্টাইল—ইষ্টাইল। পড়ার নাম ত অষ্টরম্ভা। দেখানো হবে দশ জনকে। জুচ্চুরি; জুচ্চুরি! অন্তর দিয়ে কিছু কর বাবারা—লোক ঠকান ছাড়! নাঃ। নেশা? এ দেশের নেশা, দাদা ঐ রকমের পর-প্রবঞ্চনা সব! কি—হাঃ করে চেয়ে আছেন যে বড় আমার দিকে! আচ্ছা, একদিন (দর্শনের) বক্তৃতা দিতে হবে আপনাকে। তা আপনি ত আর আমার হাড়ি-পাড়া দিকে মাড়াবেন না। গরিবটার সুখ-দুঃখের খবর ত আর কোনদিন নিলেন না। কি হালে থাকি—জীবনটায় কি—।

নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া আছি। মন কত চিন্তা করিতেছে। পূর্ণিমের চাঁদ—'সব নেশা এ দেশের পর-প্রবঞ্চনা?'—নিতাই খুব বলিল ত!

রাত্রি আটটা হইয়াছে। কত লোক উঠিতেছে, নামিতেছে। নলিনী বাবু বসিয়া বসিয়া দিব্য নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন—ভ্রূক্ষেপ নাই কোনদিকে। "আর দেরি নেই নলিনীদা, এসে গেল যে, মোট-ঘাট সব গুছোন!" বলিয়া নিতাই তাহাকে ঠেলিতে লাগিল।

চাপা গলায় "চা গেরেম—গেরেম চা। চা গেরেম—গেরেম চা!" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—"পান, বিড়ি, সিগরেট দেশালাই।"

"নামুন দাদা, নামুন।"

বলিতে বলিতে নিতাই নামিয়া পড়িয়াছে। সে বাসার দিকে অগ্রসর-প্রায়। "দাঁড়াও নিতাই, নলিনী বাবুকে নামতে দাও। তিনিও তো তোমার সঙ্গেই যাবেন!"

"দুত্তোর নলিনী বাবু, আমার তামাক যে ও ধারে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল দাদা! নটা-পাঁচ মিনিটে আমার ওষ্ঠাধর ঐ নল স্পর্শ না করলে সব নেশা মাটি।"

"এই নিতে, ফুক্কুড়ি রাখ! আমার কাপড়ের বাণ্ডিল কোথা গেল বের কর্।" নলিনী বাবু চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

নিতাই শুষ্ক-মুখে ছুটিয়া আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, কি দাদা, শেষে নলিনীদা'র উপর দিয়ে ব্রহ্মবাক্যি ফলে গেল না কি? মাইরি নলিনীদা, সত্যি বলছি এ রকম ঠাট্টা করতে পারি?

নলিনীবাবুর বুঝিবার মত মনের অবস্থা নয়। এ বাজারে দেড়-শো, দু-শো টাকার জিনিস। তায় পূজার আয়োজন। গৃহিণী, পুত্র-কন্যা! কোন্ মুখে ঘরে ফিরিবেন? কি জবাব দিবেন গিয়া? মুখখানি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া গেল। কামরার মধ্যে আর আঁতি-পাঁতি করিয়া খুঁজিলেই বা কি হইবে? ছিঃ! নলিনীবাবুর ম্লান মুখ দেখিয়া আমার মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল। নিতাইয়ের সেই হাসিমাখা মুখ হইতে হাসি কোথায় উবিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল পরেই বলিয়া উঠিল,—"ঐ-ঐ দাদা, আপনারা চলুন—দেখি বেটা এ অন্ধকারে কত দূর যায়! শয়তানির জায়গা পাও নি আর?" বলিয়াই কি আশায়, কাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া নিতাই যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল—ঠাওর করিতে পারিলাম না। এদিকে নলিনীবাবু বিশুষ্ক মুখে হাঁটিতে হাঁটিতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। দস্তিবাবু থাকিলেও কাজ হইত। কেউ না। কি করা যায়? ঘোর সমস্যায় পড়িলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটি পনর-যোল বছরের অনূঢ়া মেয়ে উপস্থিত হইয়া বলিল—এই নিন্ জল, চোখে-মুখে দিন। অবাক্ হইয়া গেলাম। সহসা তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই আমার মন যেন কোন্ দূর অতীতের চিন্তায় বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মেয়েটি নলিনীবাবুর মাথায় বাতাস করিতেছে। চোখে-মুখে তার অপূর্ব সরলতা। অর্ধ-মলিন বস্ত্র পরিধানে। তবু লাবণ্যের দীপ্তি উছলিয়া পড়িতেছে। আপনি কিছু ভাববেন না—এখুনি এ্যাম্বুলেন্স এসে যাবে। আরও অবাক্ হইয়া গেলাম। সামান্য মেয়ে—এ সুবন্দোবস্ত কোথা হইতে কি ভাবে হইল তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এ্যাম্বুলেন্স আসিয়া গেল। নলিনীবাবুকে গাড়িতে তোলাও হইল। মেয়েটির কর্মতৎপরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

৩

হাসপাতালের শয্যায় যখন নলিনীবাবুকে শোয়ান হইল, গায়ে তখন তাঁহার রীতিমত জ্বর। রাত্রি এগারোটার কাছাকাছি। বন্ধুর বাড়িতেই বা কি ভাবিবে? অথচ, এই ভাবে নলিনীবাবুকে ফেলিয়া যাই কি করিয়া? বিশেষ করিয়া মেয়েটিকে? কে এ মেয়ে তাহারও পরিচয় পাই নাই। আশ্চর্য আচরণ—অদ্ভুত সংশিক্ষা এইটুকু মেয়ের। রোগীর শুশ্রূষার এতটুকু এধার-ওধার না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—একান্ত সচেতন।

ক্লান্তিতে রোয়াকের বেঞ্চিটায় গা-হাত-পা ছড়াইয়া দিয়াছি। নিতাই আসিয়া হাসিমুখে বলিল, "দাদা, ধরতে পারলুম না বেটাকে, তবে জিনিসটা উদ্ধার হলেই হ'ল, আর আমাদের দরকার কি? বলুন—এ্যাঁ? হ্যাঁ—এখন রোগী কেমন?"

"সে কি? উদ্ধার মানে?"

'কোন চিন্তে নেই আপনার! চলুন—রোগীকে দেখা যাক্। ওঃ, ভাগ্যে ছিলেন দাদা আপনি। কোথাকার থেকে এসে কোথায় উঠে আজ নলিনীদার প্রাণ রক্ষা করলেন। নইলে বেঘোরে বেচারার প্রাণটা যেত।"

"আমি নই নিতাই, ঐ মেয়েটি—দেখবে চল।"

"কি রে শান্তি! তুই যে বড় ঠিক সময়েই এসে জুটেছিস!"

"আমি পোষ্টমাষ্টারবাবুর বাড়িতে ওঁরই মেয়ের সঙ্গে এসেছিলুম মামাবাবু। বিকেল থেকে এসে বসে আছি—ওধারে দাদা একাটি কি করছেন তার ঠিক নেই। আপনার ইয়ে ফুরিয়ে গিয়েছিল কিনা—। আমি অবশ্যি রান্না-বান্না সবাইকার সেরেই এসেছি।"

"ইয়ে মানে তামাক?" নিতাইয়ের আবার হে-হেঃ করিয়া সেই হাসি। "তাহলে এখন আর কোন ভাবনা নেই বল্। আমি তাহলে তোর খাবারটা নিয়ে আসি যেয়ে? কেমন? চলুন দাদা, আপনাকে ওধারে এগিয়ে দিয়ে চলে যাব আমি।"

"সে কি নিতাই, এইটুকু মেয়েকে একাটি ফেলে যাবে শুশ্রূষায়!"

"কিচ্ছু ভাববেন না আপনি, চলুন। কি রে শান্তি—থাকৃতে পারবি না?"

"খুব পারবো মামাবাবু।" অতি ধীরে কথা ক'টি বলিয়াই নিতাইয়ের এই ভাগিনেয়ী আমার অন্তরের কোন্ সুগভীর দেশের স্নেহ-তন্ত্রীতে যেন তীব্র ঝঙ্কার দিল।

পরদিন সকালেই হাসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নিতাইয়ের চোখ-মুখ বসিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম—পুনশ্চ ফিরিয়া সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে। নলিনীবাবু অনেকখানি সুস্থ।

* * *

সন্ধ্যায় আড্ডা জমিয়াছে। পূর্বদিনের কাহিনী কৌতূহলী হইয়া শুনিতেছেন—বৈদ্যনাথবাবু, অনাদিবাবু, তারাভূষণবাবু, রমাপ্রসন্নবাবু, যতীনদা। যতীনদা রমাপ্রসন্নবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সে কি মশাই, নিতাই যে আজ বোম্বে মেলে একরাশ কাপড় কিনে ফিরল। জিজ্ঞেস করলাম—এত কাপড় কার নিতাই?"

"কেন দাদা, আমি কি এমনি হতভাগা যে তিন কুলে কেউ নেই? বালাই ষাট্।"—

"এত ব্যাপার জানিনে মশাই। চন্দননগর থেকে ফিরছি। হঠাৎ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আপনার বৌদির জন্যে মনটা কেমন করতে লাগল।...এসে শুনছি—আপনাদের বৌদির কাছে নিতাইয়ের ভাগনি একটি গাছা হার রেখে দেড়শোটি টাকা নিয়ে গেছে।"

"তা-ও গ্রাম সম্পর্কের ভাগনি তো! তার মাকে জড়িয়ে নিতাইয়ের সম্পর্কে লোক কত কানা-ঘুষো করত।" নিতাইয়ের সম্পর্কে যাহার যতটুকু শোনা ছিল, কাড়াকাড়ি করিয়া বলিতে লাগিল। মজলিশ মশগুল করিয়া এগারোটায় যে যাহার বাড়ি ফিরিল। তারাভূষণবাবু বলিতে বলিতে গেলেন—নিতাইটার প্রাণটা খুব বড় মশাই, যে যাই বলুক। শচীপতিবাবু বলিলেন—নিতাইয়ের ছেলেটাও মশাই একটা মানুষের মত মানুষ হ'ল। বলিলাম—হাঁ শচী বাবু, ছেলেটিকে দেখে আমারও বড় ভাল লাগল। ভলান্টিয়ারের কাজ করছিল। দেখলাম—দিব্য-আকৃতি, নিরহঙ্কার। এ দিকে এম-কম পাশ করেছে। রমাপ্রসন্ন বাবু বললেন কি না।

পরম কৌতূহলী হইয়া পরদিন প্রভাতে নিতাইয়ের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। উষার অরুণ রাগে নিতাইয়ের পুষ্পোদ্যান মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। বাড়ির সুমুখে অশ্বত্থ গাছটির

পাতায়-পাতায় সোনালি রং। অর্ধ-উন্মুক্ত দ্বার দিয়া ধূম্রকুণ্ডলী বাহির হইতেছে। বাহির হইতে নিতাইয়ের গড়গড়ার শব্দ পাইয়া হাঁক দিলাম—ও নিতাই।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া আসিয়া নিতাই অভ্যর্থনা করিল—"আসুন, আসুন দাদা। সকালেই নিতের দরজায় যে বড়। বসুন—বসুন। শান্ত, এক কাপ চা নিয়ে আয় দাদার জন্যে। একটু অমনি খাবার করিস।"

"কিছু না—কিছু না" বলিয়া পাতা আরাম চেয়ারে বসিলাম। "নিতাই, তোমাকে দু-একটি প্রশ্ন করব—ঠিক ঠিক উত্তর দেবে ত!"

"আপনাকে? বলেন কি দাদা?"

"আচ্ছা, নলিনীবাবুর এই সব জিনিস-পত্তর আগেকার মতই কিনে ফেললে—আশ্চর্য চোখও তো তোমার! ওঁরা তো আর তোমার আসল কসরতের কিছু জানেন না—ভেবেছেন সেই জিনিসই উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু এটা করতে গেলে কেন?"

"ভাবলাম দাদা, নিরীহ ব্রাহ্মণের পরিবারে পুজোর বাজারটা একেবারে নিরানন্দে কাটবে। যাক্, নিতের দুঃখু তো বারমেসে।"

"শুন্‌লাম—মাইনে পেয়েই তুমি পাড়ার ছেলেদের জন্যে দশ-বিশ খরচা কর, অথচ, মাসের শেষে তোমারই উপোস পড়ে। এ-সব কেন কর?"

"খেয়াল দাদা, খেয়াল।"

"সংসারের দুশ্চিন্তাকে বিসর্জন দিয়েছ বল।"

"ভেবে করব কি বলুন। অমল—ও অমল! কোথা গেল সে? শান্ত! চা হ'ল না মুখপুড়ী এখনও। হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা—ছেঃ ছেঃ ছেঃ ছেঃ।"

অমল আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মস্তক চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলাম। চা-য়ে চুমুক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—শান্ত তোমার কি রকমের ভাগনি নিতাই? ওর বাবা কোথায় থাকেন? বেশ মেয়ে কিন্তু। সংসারের কাজও সব শিখে ফেলেছে। তা, তোমার স্ত্রী এখন—?

"তিনি বছর দুয়েক হ'ল গত হয়েছেন দাদা। শান্তটার সে কি কান্না! মানে, এক রকম তাঁরই মানুষ-করা মেয়ে তো! মেয়েটার ইতিহাস অপূর্ব। সে শুনলে দুঃখু পাবেন। শুনে কাজ নেই। ভাবনায় পড়েছি—মেয়েটার বিয়ে নিয়েই দাদা।"

"না বল নিতাই। শুনতেই হবে আমায়।"

"শুনবেন নিতান্তই। অমল, তুমি একটু দেখ বাবা, দাদার খাবারটার শান্ত কতদূর কি করছে।"

"এই সকালে খাবারের জন্যে তোমার এত ব্যস্ততা কেন?"

"হোক একটু! সাত-সকালে পায়ের ধুলো দিয়েছেন এই হতভাগার কুঁড়েতে। আপনাদের মত লোক—কি দিয়ে অভ্যর্থনা করব বলুন।"

"এসব কি বলছ নিতাই তুমি! তোমারও এই সব লৌকিকতার বাই?"

"একটু ভিড়িয়ে দিলাম, দাদা, ছেলেমেয়ে দুটোকে কাজে। সব কথা তো আর ওদের সামনে বলতে পারি না।—শুনুন তবে।—এই শান্তর গর্ভধারিণীর বার-তের বছর বয়সকাল পর্যন্ত কত মার মেরেছি—আবার কত ভালবেসেছি। ইস্কুলের বড় ছুটি হ'লেই মামার বাড়ীতে ছুটতাম। ওর পিত্রালয়েই ছিল আমার মামার বাড়ী। শেষ পর্যন্ত রটে গেল নিতে ভট্‌চাযের সঙ্গেই সম্বন্ধ করবার ইচ্ছে ওদের। তার পর কি হ'ল—কুলীন, সুপণ্ডিত পাত্রে তাঁরা মেয়ে দিলেন। পাঁচ সাত বৎসর পরে নাকি মেয়ে কুলীন শ্বশুরের ঘরে কোনমতে ঠাঁইও পেয়েছিল। কিন্তু জোচ্চর দেশ। ছেলের বাপের কৌলিন্য নষ্ট হ'ল—ধুয়া তুললে। যুক্তির ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন করে দিলে:—মেয়ের বাপ অকুলীন বলে অকুলীন মশাই ভড়্‌ভড়ে ঘর একেবারে" এই সব হ'ল প্রবীণ নেতা দু-দশ জনের সলা। ওদিকে নিতের নামে কুৎসা ছেলের কানে তুললে। সোনায় সোহাগা একেবারে। শ্বশুর যথাবিধি পুত্রবধূকে ত্যাগ করলেন। জাত তাদের টন টনে রয়ে গেল। সুপণ্ডিত পুত্রও নির্বাক্। বলব কি দাদা, সে ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন দিন যদি পরিচয় হ'ত! শুনলাম পরে—তিনি সন্নিসি হয়ে বেরিয়ে গেছেন। এখন নাকি আবার কোথায় বড় কাজ করছেন। পূর্ণিমে তো নয়—যেন পূর্ণিমের চাঁদ—পিত্রালয়েই যেয়ে উঠতে হ'ল—দু মাস যেতে না যেতেই বাপ-মার মাথা গেলেন। এই শান্ত তখন সাত মাস মা'র পেটে। ভাই-ভাজের সংসারে বেশি কাল বনি-বনাও হ'ল না। শিশু-কন্যা কোলে নিয়ে সোজা এসে চড়লেন নিতের ঘাড়ে। থাক—যেমন কপাল ক'রে এসেছিলে এই জোচ্চোরের দেশে। কিন্তু দাদা—। এ কি? শশ'দা! অমল!… অমল! আয় এ দিকে—ধর্—ধর্। শান্ত, পাখাটা নিয়ে আয় মা!

কতক্ষণ পরে জানি না—নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখি—শান্ত আমার শিরোদেশে বসিয়া মুখে চোখে জল দিয়া বাতাস করিতেছে। দক্ষিণ হস্ততল প্রসারিত করিয়া মায়ের (আমার) অধর দেশে স্নেহের স্পর্শ দান করিলাম। চোখ আমার ভরিয়া আসিয়াছে। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। গদ্ গদ কণ্ঠে অতি কষ্টে বলিলাম—"মা-হারা মেয়ে, আজ প্রাণ দিয়ে এই নির্মম মাতৃ-হন্তা পিতার সেবা করছিস মা!" মেয়ের চোখেও জল টল টল করিতেছে দেখিয়া বলিলাম—'তোর এই নিষ্ঠুর পিতার সামনে আর চোখের জল ফেলিস নে মা! দেখতে পাবি না তো—কেঁদে কেঁদে এই বুকের ভিতরটা পুড়ে খাক হয়ে গেছে রে।'

নিতাই বলিল—একটু সুস্থির হন দাদা!

"সুস্থির হয়েছি ভাই। কই, তুমি শান্তকে দিয়ে কি সব খাবার তৈরি করালে যে আনাও। মেয়ে ধন্য হোক্। মেয়ের মা তো এই হাতে পড়ে চির-ধন্য হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার আর এই মেয়ের বিয়ের ভাবনা নেই নিতাই। সেই পুণ্যবতী যেন আমার কানে-কানে বলে গেল—শান্তকে আমার অমলের হাতে সঁপে দাও; ওদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলের লক্ষণ আছে। 'পূর্ণিমা—পূর্ণিমা'—ওঃ! আজ বুঝলাম নিতাই, দুনিয়াটাকে জোচ্চোর বলে কেন এত ধিক্কার দাও। আমার চির-অশান্তির জীবনে তুমিই শ্রেষ্ঠ শান্তি দেওয়ার অধিকারী নিতাই। তুমি অকুলীন নও ভাই। শ্রেষ্ঠ কুলীন তুমিই।"

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট

শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ

গত নবেম্বর মাসে হাওড়ায় বাংলাদেশের কংগ্রেস-কর্ম্মীরা মিলিত হইয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই সময় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে একটি এইরূপ ছিল—

"(হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মত) সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি, কমিউনিষ্ট এবং যে-কোনও জাতীয়তা-বিরোধী ও কংগ্রেস-বিরোধী প্রতিষ্ঠানের সহিত কংগ্রেসভুক্ত ব্যক্তির রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক পরিহার করা উচিত।"

শুধু যে বাংলাদেশের কংগ্রেস-কর্ম্মীরা এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কংগ্রেস-কর্ম্মীরাও অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে যে প্রতিষ্ঠানগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য যেন একটা চেষ্টা হইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে কংগ্রেস যেন একটা পার্টির ছাপ লইবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টা, এই অস্পৃশ্য-নীতি সহসা কংগ্রেসের ভিতর দেখা দিল কিংবা ইহা ঘটনাচক্রের ঐতিহাসিক পরিণতিরূপে দেখা দিয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে কংগ্রেসের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার বলিয়া মনে করি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা আগ্রহান্বিত এবং চেষ্টিত —এরূপ ভারতীয়দের মিলনক্ষেত্র কংগ্রেস। প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে কংগ্রেস বলিতে এইরূপই বুঝায়। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচেষ্টা (activism) কংগ্রেসই করিয়া থাকে। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে ক্রিয়াশীলতা দ্বিবিধ হইতে পারে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের চিরাচরিত প্রথা হইল সশস্ত্র বিপ্লব। অন্যবিধ উপায় হইল অহিংসাত্মক। গান্ধী-নেতৃত্বে কংগ্রেস চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে অহিংসাত্মক উপায়ে 'স্বরাজ' লাভ করিবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম প্রথম কংগ্রেস স্পষ্ট এ কথা বলিয়াছিল যে সম্ভব হইলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত 'স্বরাজে' তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু লাহোর কংগ্রেসের সময় (১৯২৯) হইতে ইংরেজ-কবলমুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের বিঘোষিত লক্ষ্য হইয়া পড়িল।

কংগ্রেসের আর একটা লক্ষ্য হইতেছে, ভারতের ঐক্য। ভৌগোলিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের লইয়াই ভারতীয় "নেশন"* এবং কংগ্রেস সেই "অখণ্ড" ভারতীয় নেশনের স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস করিয়া আসিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় আসিয়া কংগ্রেস যখন তাহার "কনষ্টিটিউশন" বা গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করিল তখন তাহার আদর্শ হইল ভারতের একরাষ্ট্রীয়তা।

যে-কোনও প্রতিষ্ঠানে মূল আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে দ্বিমত না থাকিলেও সেই লক্ষ্য ও আদর্শ অনুসরণ করিবার পদ্ধতি কিংবা কার্য্যক্রম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ অনিবার্য্য। কার্য্যপদ্ধতির মতদ্বৈধতার উপরই সকল ডিমোক্রেসীতে বিভিন্ন পার্টি সৃষ্ট হয়। পদ্ধতি সম্বন্ধে মতানৈক্যের সম্ভাবনা কংগ্রেস কখনও অস্বীকার করে নাই এবং কংগ্রেসের মধ্যেও বিভিন্ন দল দেখা দিয়াছিল।

১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন কারাগারে, তখন দেশবন্ধু কংগ্রেসের কার্য্যক্রমের নীতির পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া এই প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বপ্রথম পার্টির সূচনা করেন। মনে রাখিতে হইবে যে স্বাধীনতা, একরাষ্ট্রীয়তা ও অহিংসা—কংগ্রেসের এই তিনটি মূলগত বিশেষত্ব তিনি সম্পূর্ণ শিরোধার্য্য করিয়া শুধু কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। মহাত্মা কারামুক্ত হইবার পর ১৯২৫ সালে স্বরাজ-পার্টির সহিত তাঁহার আপোষ হইল এবং কংগ্রেসের একটি পার্লামেণ্টারী wing বা শাখা সৃষ্ট হওয়াতে স্বরাজ পার্টি অস্তিত্ব হারাইল।

কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ পার্টির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে ডিমোক্র্যাটিক প্রতিষ্ঠানে পার্টির সৃষ্টি ভাঙনের সূচনা করে না—যদি বিভিন্ন পার্টির মধ্যে লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে বিরোধ না থাকে।

১৯৩০ সালের পর হইতে ভারতবর্ষে সোশিয়ালিজমের একটা আভাষ দেখা যায় এবং এ দেশে কংগ্রেসের মধ্যে কেহ সোশিয়ালিষ্ট কেহ বা মার্কস্‌-পন্থী বলিয়া নিজেদের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। যাঁহারা কমিউনিজম-বিশ্বাসী তাঁহারা খোলাখুলি ভাবে কমিউনিষ্ট দল গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না। কমিউনিজম ব্যক্তিগত মতবাদ হিসাবেই রহিয়া গেল। পার্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল না। কমিউনিষ্টরা পাতাল-পন্থী (underground movement) হইয়া রহিলেন।

কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস সোশিয়ালিষ্ট, বা কিষাণ—কোনও দলকেই বাদ দিবার প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস বোধ করিল না। ইঁহারা আধুনিক কংগ্রেসের চরমপন্থী হিসাবে দেশবাসীর নিকট গণ্য হইতে লাগিলেন। যথার্থ কমিউনিষ্টদের প্রতি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মনোভাবের পরিচয় পাই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময়। "কমিউনিজম প্রচার"ই ঐ মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ ছিল। পট্টভী সীতারামিয়ার কংগ্রেসের ইতিহাস পুস্তকে আছে—"The Working Committee···made a grant of Rs. 1500/- towards the defence."

১৯২০ সালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নরম ও গরম এই দুইটি রাজনৈতিক দল ছিল। সে সময় যাঁহাদিগকে নরম দলের বা মডারেট বলা হইত তাঁহারা ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা শুনিলে আতঙ্কিত হইতেন। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার ও তজ্জন্য ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার দুঃস্বপ্ন তাঁহারা ভুলিয়াও কল্পনায় আনিতেন না। স্বাধীনতাবাদিগণ কংগ্রেসের বাহিরে ছিলেন। তখন কংগ্রেস নরম দলের করায়ত্ত ছিল।

কিন্তু ১৯২০ সালের পরে কংগ্রেস বলিতে গেলে চরমপন্থী মতবাদের মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হইল। কেননা, স্বরাজ্য হইল ইহার লক্ষ্য এবং তাহা আনয়ন করিবার জন্য কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হইল ইহার উদ্দেশ্য। এবং যেহেতু অহিংস পন্থাই হইল ইহার মূল নীতি, সেইজন্য সত্যাগ্রহ, আইনভঙ্গ প্রভৃতি

---

* ইংরেজীতে 'নেশন' বলিতে যাহা বুঝায়, 'জাতি' তাহা ঠিক বুঝায় না। সেই জন্য 'নেশন' শব্দটিই ব্যবহার করিতেছি।

হইল ইহার সেই নীতির পরিপোষক কার্য্যধারা। সংগ্রাম মাত্রেই শোণিতোচ্ছ্বাস থাকিবেই কিন্তু অহিংসনীতির ভিত্তিতে যে সংগ্রাম তাহা কেবল আত্মঘাতী। ইহাতে আত্ম-বলিদানের আহ্বান আছে, বিপক্ষের প্রাণহানির আবেদন নাই।

সুতরাং অহিংস হইলেও কংগ্রেস বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াশীল একটি প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল এবং সেই কারণে ইহা ইংরেজের দুই চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল। মডারেটরা কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িলেন। কংগ্রেসের আর একটা রূপও দেখা দিল। ১৯২০ সালের পূর্ব্বে বুর্জ্জোয়া ও ক্ষুদ্র বুর্জ্জোয়া (Petite bourgeois) কর্ত্তৃক কংগ্রেস অধ্যুষিত ছিল।

কিন্তু ১৯২০ সালের পর গণতন্ত্রের গঠন-পদ্ধতিতে (democratic constitution) কংগ্রেস যে রূপ লইয়া দেখা দিল তাহা একেবারে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শুধু যে স্বাধীনতার বার্ত্তা বহন করিল তাহা নহে, বিপ্লবের বাণীও প্রচার করিতে সমর্থ হইল। ১৯২১ ও ১৯৩০।৩১ এই দুই বারই ব্যাপক ভাবে ভারতবর্ষে বিপ্লবের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ১৯৪২ সালেও এদেশে গণবিদ্রোহ গুরুতর ভাবে দেখা দিয়াছিল কিন্তু উহা কংগ্রেস পরিচালিত ছিল না। ২০ বৎসর প্রচেষ্টার ফলে কংগ্রেস যে দেশের অজ্ঞ নিরক্ষর সর্ব্বহারাদের, বিশেষতঃ কিষাণ সম্প্রদায়কে কতটা উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছে ১৯৪২ সালের স্বতঃপ্রণোদিত "ইন্‌ক্লাব" আন্দোলনের দ্বারা তাহার পরিচয় পাই।

স্বাধীনতা, স্বাধীনতার জন্য ক্রিয়াশীলতা (activism) এবং ভারতের বিরাট্ mass বা 'জনতা'কে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করাই হইল কংগ্রেসের লক্ষ্য, নীতি ও আদর্শ। অহিংস নীতির উপর এই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা সম্যক ভাবে বিপ্লবাত্মক এবং নিবিড় ভাবে প্রোলিটেরিয়ান। এরূপ যখন লক্ষ্য, সাম্রাজ্যবাদী বা মূলধনবাদী কাহারও সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষ চলিতে পারে না।

সোসিয়ালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট উভয়েই বিপ্লববাদী। ইহারা শুধু যে বিপ্লববাদী তাহা নহে, সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইহারা মারাত্মক এবং নির্ম্মম ভাবে আপোষ-বিরোধী। প্রকৃত কমিউনিষ্টের ইহাই মূল ধর্ম্মনীতি। সুতরাং কংগ্রেসে ইহাদের স্থানের অভাব নাই।

মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে স্বাধীনতাকামী চরমপন্থী মাত্রেরই কংগ্রেসে স্থান ছিল। ১৯২০ সালের পূর্ব্বে যাঁহারা স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করিয়া বহু লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে নিজেদের পন্থায় উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহারা ১৯২০ সালের পর কংগ্রেসের মধ্যে বিরাট্ গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইলেন।

ভারতের ঐক্য ও একরাষ্ট্রীয়তা এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য ভারতের বিরাট্ জন-গণ-মনকে প্রবুদ্ধ করা যাহাদের উদ্দেশ্য তাহারাই কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইল। কংগ্রেসের democratic constitution থাকার দরুন যে-কোনও রাষ্ট্রতন্ত্রবাদী দলের কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া ইহার পরি- [illegible]

কংগ্রেসের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে গণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য থাকায় ইহার এবং ভারতবর্ষকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের পাশুপাত অস্ত্র লুক্কায়িত। সেইজন্য সাম্রাজ্যবাদ যেমন এক দিকে চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতে লাগিল অন্য দিকে দেশের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করিবার জন্য নানারূপ কূটনীতিও অবলম্বন করিল। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের প্রধান কীর্ত্তি ছিল হিন্দু-মুসলমানকে এক পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন। কালক্রমে কূটভেদনীতি মুসলিম লীগ রূপে ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় একটা বিঘ্ন সৃজন করিতে সমর্থ হইল।

১৯৩৫ সালে নূতন ভারত-শাসন আইন শুধু যে হিন্দু-মুসলমান ভেদনীতিকেই ভিত্তি করিল তাহা নহে, হিন্দুর মধ্যেও একদলকে Caste Hindu বা "জাত"-হিন্দু ও অন্য দলকে Scheduled caste বা "অ-জাত" হিন্দু রূপে পৃথক করিয়া দিল। দুঃখের বিষয় ভারতের অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে যে দু-এক জন ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারা অর্থের লোভে ও ক্ষমতার মোহে সাম্রাজ্যবাদের মন্ত্রশিষ্য হইয়া পড়িল। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেস বিদ্বেষ "জাত"-হিন্দু বিদ্বেষের রূপ লইয়া দেখা দিল এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য ইহারা মুসলীম লীগের সহিত সহযোগিতা করিতেও দ্বিধা বোধ করিল না।

১৯৩৬ সালে নূতন ভারত-শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বাহ্ণে জিন্না সাহেব ভারতে পুনরাগমন করিয়া বিলুপ্ত মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া এক অভিনব মতবাদ প্রচার করিলেন। তাহা হইল Two nation মতবাদ। মিঃ জিন্না ব্যারিষ্টার, তিনি ইংরেজের রাজনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি ইংরেজী পাঠ্য পুস্তকে 'নেশন' শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। অথচ তিনিই প্রচার করিলেন—"হিন্দু" একটা "নেশন", কেননা, তাহারা তামা তুলসী লইয়া শপথ করে আর "মুসলমান" একটা "নেশন", কেননা, তাহারা কোরাণ ছুঁইয়া হলফ করে। এমন একটা অদ্ভুত, অভিনব এবং বিদঘুটে ব্যাখা পাওয়া মাত্র সাম্রাজ্যবাদী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিরাট্ মুসলমান সমাজ বেশীর ভাগই অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিষ্পেষিত। অল্প কয়েকজন শিক্ষিতকে চাকরি দিয়া, নবাবী দিয়া লীগ দলে জুটাইয়া ফেলা হইল। পাছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান প্রগতিশীল তরুণ মুসলমান সম্প্রদায় ভোটের জোরে লীগের পরিচালন যন্ত্র (executive) হস্তগত করিয়া ফেলে সেইজন্য জিন্না সাহেবকে নির্ব্বাচনবিমুখ হিটলারের মত লীগের কায়েমী সভাপতিরূপেই আমরা দেখিতে পাই। মধ্যবিত্ত মুসলমান জনতার পক্ষে লীগের মন্ত্রণাসভায় প্রবেশ একরূপ দুরূহ।

এ দিকে কংগ্রেস কিন্তু নির্ব্বাচনপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া সকলের সম্মতি অনুসারেই নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। যে-দিন গান্ধীর কার্য্যক্রমের বিরোধী দল কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, সেই দিনই গান্ধীজিকে পরিত্যাগ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের রহিয়াছে। কিন্তু জিন্না সাহেবকে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা মুসলীম লীগের নাই। গান্ধী চরিত্রবলে, মানসিক শক্তিবলে এবং [illegible]

জিন্না গবর্ণমেণ্ট-পোষিত কতকগুলা উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ত্তৃক স্বীকৃত, কেননা, তাঁহাকে স্বীকার করিলেই খেতাব ও শিরোপা পাওয়া যায়। জিন্না ও মুসলীম লীগ সমপদবাচ্য, যেমন হিটলার ও জার্ম্মানী। অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলীম লীগ ইউরোপীয় ফাসিজমের ভারতীয় সংস্করণ। ইহাতে বিরাট্ মুসলিম জনতার স্থান নাই যদিও ইহা মুসলিম জনতার মস্তকে জাঁকিয়া বসিয়া আছে। পাছে মুসলমান শিক্ষিত হইয়া উঠিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবী হইয়া উঠে, পাছে ধর্ম্মের গোঁড়ামি ভুলিয়া ইহারা জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠে, সেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার জন্য ভিন্ন একটি বিভাগ খুলিয়া বিরাট্ মুসলিম জনতাকে প্রগতিপন্থী সকল রকম আদর্শ ও লক্ষ্য হইতে শুধু যে দূরে সরাইয়া রাখা হইতেছে তাহা নহে, মুসলিম জনতার বুদ্ধিকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির কারাকক্ষে অর্গলবদ্ধ করিয়া তাহাকে যুক্তিবাদের স্পর্শ হইতে সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। এই কার্য্যে মুসলিম লীগ আপাততঃ ব্রিটিশনীতির সহায়তা করিতেছে বলিয়াই সন্দেহ হয়।

মুসলিম স্বার্থবিরোধী ফাসিষ্ট প্রতিষ্ঠান লীগ বলিতেছে ভারতবর্ষকে তিন টুকরা করিয়া ফেল। সাম্রাজ্যবাদ তাহাকে লেলাইয়া দিতেছে, কংগ্রেসের ঐক্য প্রচেষ্টাকে খান খান করিয়া দিতেছে। ভারতের স্বাধীনতার প্রয়াস, অস্ত্রহীন বিদ্রোহের জন্য যে প্রচেষ্টা ও সাধনা কংগ্রেস করিতেছিল, লীগের বর্ত্তমান নীতি তাহা ব্যাহত করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুবিধা সৃষ্টি করিতেছে।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন ইউরোপে মহাসমর বাধিয়া গেল। জার্ম্মানী ও রুশিয়া উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া পোলাণ্ড ভাগ করিয়া গ্রাস করিল। ইংলণ্ডের শাসক সম্প্রদায় পোলাণ্ডের দরদে পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও ডিমোক্রেসী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইংরেজ জাতিকে রণক্ষেত্রে আহ্বান করিল।

ভারতবর্ষে কংগ্রেস কিন্তু গোল বাধাইল। কংগ্রেস তখন ভারতবর্ষের সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব লইয়া বসিয়া আছে। কংগ্রেস বলিল, স্বাধীনতা ও ডিমোক্রেসী যদি সত্য কথা হয় তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হউক। যুদ্ধান্তে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইবে, এই সম্বন্ধে ব্রিটিশের স্পষ্ট অঙ্গীকার পাইলে কংগ্রেস কায়মনোবাক্যে এই মহাসমরে ইংরেজের সহযোগিতা করিবে। কংগ্রেসের দাবী শুনিয়া ইংলণ্ডেও অনেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে war-aims সুস্পষ্ট জানাইবার দাবী করিল। পার্লামেণ্টের বিখ্যাত মেম্বর মিঃ ডি, এন, প্রিট (Pritt) একথা স্বীকার করিয়াছেন যে যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কংগ্রেস ইংরেজ সরকারকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য (war-aims) পরিষ্কার করিতে আহ্বান করিয়া বড়ই বিপদে ফেলিয়াছিল এবং কংগ্রেসের দাবীর ফলেই ব্রিটিশ রাজনীতিকরা স্বাধীনতা ও ডিমোক্রেসীর ধুয়া ছাড়িয়া "নাৎসিজম্," "হিটলারিজম্" এই দুইটি অর্থহীন বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু ইউরোপে প্রধূমিত সমরানলের আভাষ কংগ্রেস পূর্ব্বাহ্ণেই বুঝিতে পারিয়াছিল এবং ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ওয়ার্দ্ধাতে ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে:

"যুদ্ধ বাধিলে কিরূপ নীতি গ্রহণ করা হইবে কংগ্রেস তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভারতবর্ষকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করিবার সকল চেষ্টার বিরোধিতা করিবার কৃতনিশ্চয়তা ঘোষণা করিয়াছে। এই কমিটি কংগ্রেসের নীতির দ্বারা বাধ্য এবং সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতের সম্পদের অপব্যবহার প্রচেষ্টায় বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অতীত কার্য্যধারা এবং অধুনাতন কার্য্যকলাপ প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে যে স্বাধীনতা ও ডিমোক্রেসী উহার লক্ষ্য নহে এবং কোনও সময় এই আদর্শের অপহ্নব করিতে পারে। ভারতবর্ষ এরূপ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না। * * এই কমিটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে তাঁহারা যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমরায়োজনে কোনও প্রকার সাহায্য না করেন এবং কংগ্রেসের এ সম্বন্ধে নীতি যেন ভুলিয়া না যান। উক্ত নীতির প্রতি নিষ্ঠা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যদি এই নীতি পালন করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বা পদচ্যুত হইতে হয় তবে সেরূপ পরিস্থিতির জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।"

ইহা হইল যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বের কথা। যুদ্ধ যখন সত্যই আসিয়া পড়িল তখন ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি দীর্ঘ বিবৃতি দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য পরিষ্কার রূপে ঘোষণা করিতে আহ্বান করিল এবং ঐ উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তখন ও ভবিষ্যতে কি ভাবে প্রযোজিত হইবে তাহাও পরিষ্কার করিতে বলিল। ওয়ার্কিং কমিটি ইহাও বলিল যে কনষ্টিটুয়েণ্ট য়্যাসেম্বলীর মারফত রাষ্ট্রতন্ত্র বা কনষ্টিটিউশন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভারতবাসীদের থাকা চাই। ১০ই অক্টোবর তারিখে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এই বিবৃতির সমর্থন করিলেন। ইহার কিছু পরেই ভাইসরয় বিবৃতি দিলেন। উহাকে কংগ্রেস সন্তোষজনক মনে করিল না এবং ঘোষণা করিল যে তাহারা ব্রিটিশ সরকারকে কোনও প্রকার সাহায্য করিতে পারে না এবং সেই কারণে কংগ্রেসগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মন্ত্রীমণ্ডলকে পদত্যাগ করিতে আদেশ দিল। উক্ত ঘোষণা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস আর একবার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ করিল এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল।

কংগ্রেসও আপোষের চেষ্টা করিয়াছিল কেননা, কংগ্রেসের নেতাগণ সকলেই ফাসিষ্ট-বিরোধী ছিলেন এবং ইঁহারা যুদ্ধটাকে ডিমোক্রেসী বনাম ফাসিজিম্ হিসাবে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের অসম্মানজনক কোনও আপোষ তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। সেইজন্যই তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার যে মর্য্যাদা সেইরূপ রাষ্ট্রমর্য্যাদা ভারতকে যুদ্ধের পরে দেওয়া হইবে এবং তাহা দেওয়ার একটা সঠিক সময় যদি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়, তবে ইংলণ্ডের যুদ্ধোদ্যমে কংগ্রেস পুরাদমে সাহায্য দান করিবে। যদি ইংরেজ সম্মত হইত তবে সেরূপ আপোষ অসম্মানজনক হইত না।

তবু দেখা গেল যে সহসা এ দেশে একদল লোক কংগ্রেস আপোষ করিতেছে বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। সেই সময় মনে হইতে লাগিল যে, তাহারাই সত্যকারের বিপ্লববাদী এবং

বিদ্রোহাত্মক ক্রিয়াপন্থী। তাহারা যেন এখনই লাফাইয়া পড়িয়া ইংরেজের নিকট হইতে স্বাধীনতা কাড়িয়া লইবার উপায় ও পন্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, শুধু কংগ্রেসই তাহাদের টানিয়া রাখিয়াছে। মজা এই যে, ঐ সব তথাকথিত বিপ্লবী বিপ্লব সৃষ্টি না করিয়া কংগ্রেসের সহিত ঘরোয়া লড়াই বাধাইয়া কংগ্রেসের কার্য্যক্রমকে ব্যাহত করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে "ফরোয়ার্ড" দলই প্রধান। ইঁহারা রফা করিতে চাহেন না বলিলেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইলেন না। কংগ্রেস আপোষকারী বলিয়া আরও এক পক্ষ চিৎকার করিল। সে পক্ষ হইল কমিউনিষ্টরা। ইহারা তখন খোলাখুলি কোনও দল নহে। কেননা, ইংরেজ সরকারের শ্যেন-দৃষ্টি ইহাদের উপর। ইহারা তখন গোপনে মাঝে মাঝে ইস্তাহার ছাড়িয়া জানাইয়া দেয় যে ইহারা আছে।

ইহাদের ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি ইস্তাহার হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:

"To help the imperialism in this war is to strengthen fascism in Europe."

"এই যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করিলে ইউরোপে ফাসিজমকে শক্তিমান্ করা হইবে।"

"The duty of the Indian people as a part of the International army of freedom is to unconditionally resist the war, to achieve her own freedom and weaken British Imperialism. . . ."

"স্বাধীনতার আন্তর্জাতীয় বাহিনী হিসাবে ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য হইতেছে এই যুদ্ধকে সমগ্রভাবে বাধা দেওয়া, নিজ স্বাধীনতা অর্জন করা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শিথিল করা···"

"Compromise between British Imperialism and Congress on the issue of war would be treachery to world democracy. . . ."

"যুদ্ধ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসের মধ্যে রফা হইলে ডিমোক্রেসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।"

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কংগ্রেস যখন তাহার অহিংস নীতির ভিত্তিতে দেশবাসীকে ক্রমশঃ বিপ্লবের পথে লইয়া যাইতেছে, তখনও কংগ্রেসকে হেয় করিবার চেষ্টা কমিউনিষ্টরা করিতেছিল। শুধু যে যুদ্ধারম্ভের সময়ই ইহারা এইরূপ করিতেছিল তাহা নহে, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে যখন হইতে কমিউনিষ্ট পার্টি ভারতে সৃষ্ট হইল, তখন হইতেই এরূপ চলিতেছিল।

এখনও বোধ হয় দেশের লোক ভুলিয়া যান নাই ১৯৩০-৩১ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বে কত বিরাট্ ও ব্যাপক অহিংস আন্দোলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মেদিনীপুরের কৃষক দমননীতির প্রচণ্ড রূপ সহ্য করিয়া বহুদিন অহিংস সংগ্রাম চালাইয়াছিল। ধরাসনাতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গের অভিযানে দুই সহস্রাধিক নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক ব্রিটিশ অশ্বারোহী পুলিসের আক্রমণ তুচ্ছ করিয়া যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল তাহার কথা কাহারও জানিবার ইচ্ছা থাকিলে Web Miller লিখিত পেঙ্গুইন গ্রন্থমালার "I Found No Peace" পুস্তকখানা পড়িলেই জানিতে পারিবেন। অথচ এই সকল ঘটনার দুই বৎসর পরে ১৯৩৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি

"The greatest threat to the victory of the Indian revolution is the fact that the masses of our people still harbour illusions about the Indian National Congress and have not realised that it represents a class organisation of the capitalists working against the fundamental interests of the toiling masses of our country."

মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা কথায় কথায় ভারতীয় বিপ্লবের ধুয়া তুলিয়া থাকে। বিপ্লব যে কেমন করিয়া হইবে, কাহারা করিবে, কখন করিবে তাহার ঠিকানা না থাকিলেও কংগ্রেসকে গালি দিবার জন্য এ মিথ্যা জোর গলায় প্রচার করিতে ইহাদের বাধে না। যদি ইহারা সত্যই বিপ্লববাদী তবে ১৯৩০-৩১ সালের বহু সম্ভাবনাপূর্ণ আন্দোলনের সময় ইহারা কোথায় ছিল? অথচ ঠিক দুই বৎসর পরেই ইহারা বলিতেছে যে কংগ্রেস বিপ্লববাদী নহে। হয়ত ইহারা বলিবে যে ইহারা অহিংসাত্মক পন্থায় বিশ্বাস করে না। তাহা হইলে ইহাদিগকে আরও সন্দেহের চোখে দেখিতে হয়। কেননা একথা ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন নিরক্ষর লোকেও বুঝিতে পারে যে আধুনিক কামান, গোলাগুলি, বিমান প্রভৃতি সংহারযন্ত্রাদি ইংরেজের হাতে থাকিতে হিংসাত্মক উপায়ে বিদ্রোহ করা হয় বাতুলের প্রলাপ নয় দুরভিসন্ধিপ্রসূত।

হিংসাত্মক প্রচেষ্টা মাত্রই ইংরেজ অতি সহজে প্রতিরোধ করিতে পারে, অহিংসাত্মক প্রচার ও কার্য্যপদ্ধতি দমন করিবার সুযোগ সব সময় হইয়া উঠে না। দেশের মধ্যে অর্থগৃধ্নু স্বজাতিদ্রোহীর অভাব নাই যাহারা কংগ্রেসের আন্দোলনের সময় জনতাকে হিংসার পথে লেলাইয়া দিয়া উহাকে দমনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিবে।

সুতরাং যাহারা "বিদ্রোহ" "বিদ্রোহ" বলিয়া গলাবাজি করে তাহারা প্রচ্ছন্ন শত্রু কিনা এ সম্বন্ধে সংশয় স্বতঃই জাগ্রত হয়। যদি ইহাদের মধ্যে টিমোশেঙ্কো, ভরশিলভ ও ষ্টালিনের মত দুর্দ্ধর্ষ সমরবিদ্যাবিশারদ কিলবিল করিত, যদি ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে মরি কি বাঁচি পণ করিয়া সংগ্রামার্থীর সংখ্যাধিক্য থাকিত এবং ইংরেজের সশস্ত্র দমননীতির প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম সহজপ্রাপ্য হইত, তাহা হইলে ইহাদের বিপ্লবধ্বনিকে বিশ্বাস করা সম্ভব হইত। কিন্তু ইহারা বাতুল নহে। ইহারা সকলেই শিক্ষিত, সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিতান্ত বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর লোক। আজ পর্য্যন্ত ইহারা দেশের কোনও শ্রমিক বা কৃষক সমাজে প্রবেশ করিয়া তাহাদের কোনও একটা অভাব অভিযোগকে ধরিয়া কোনওরূপ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন খণ্ডভাবেও করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

১৯৩৩ সালে ইহাদের যে manifesto হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করা হইল, তাহাতে কংগ্রেসকে দোষারোপ করিতে ইহারা কি ভাবে মিথ্যার আশ্রয় লয় তাহা দেখাইয়াছি। ঐ manifestoতে আরও আছে—

". . . And today Gandhi tells the peasants and workers of India that they have no right to and must not revolt against their exploiters. He tells them this at the very time when the British robbers are making open war on the Indian people in the N. W. Province and throughout the country."

অর্থাৎ "এবং আজ গান্ধী ভারতের কৃষক ও শ্রমিকদের বলিতেছে যে তাহাদের শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধি-

বলিতেছে সেই সময় যখন ব্রিটিশ দস্যু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (?) এবং সারা দেশে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত।"

পাঠক স্মরণ করিয়া দেখুন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ভারতবর্ষে সারা ভারতবাসীর বিরুদ্ধে "open war" করিতেছিল কি?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিরাট্‌ জনগণচিত্ত অগাধ জড়তায় আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু নন-কোঅপারেশন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আহ্বানে তাহা ক্রমশঃ সচেতন হইয়া আজ সারা দেশময় স্বাধীনতার জন্য একটা আগ্রহ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। সেই কংগ্রেসকে হেয় করিবার প্রচেষ্টায় এতখানি মিথ্যার আশ্রয় যাহারা লইতেছে, তাহারা দেশের শত্রু না মিত্র? যাহাই হউক ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে কোনও বিপ্লবাত্মক আন্দোলন কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেইজন্য এই নিদারুণ বিপ্লব-বাদীদের সত্য রূপের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু যখন কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা হইতে কংগ্রেস দলকে বাহির হইয়া আসিতে বলিল, তখন গণ-আন্দোলনের জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত হইল। যখনই অহিংসাত্মক ভাবে ব্যাপক আন্দোলন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তখনই কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া গান্ধীজীর নেতৃত্ব বরণ করিতে হইয়াছে। কেননা, ঐ "নগ্ন ফকীরটি" ছাড়া অহিংসাত্মক কর্ম্মপন্থা বাতলাইয়া দিতে আর কেহ পারে না। ১৯৪০ সালেও সেই কারণেই গান্ধী আসিয়া কংগ্রেসের প্রধান সেনাপতি হইলেন।

ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মহাত্মাজী অগ্রসর হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, "এই যুদ্ধ ভারতবাসীর যুদ্ধ নহে, এবং ভারতবাসী তাহাতে সহযোগিতা করিতে পারে না এই মতবাদ সকলে প্রচার করুক এবং প্রচার করিতে গিয়া যদি ইংরেজের নিকট শাস্তি পাইতে হয়, তাহা বরণ করিয়া লউক। কিন্তু হাল্লা করিয়া দল বাঁধিয়া হুজুগ করিতে কাহাকেও দিব না।" কংগ্রেসের সভ্য হিসাবে, কংগ্রেসের নামে যাহারা এ কথা প্রচার করিতে যাইবে তাহারা তাঁহার অনুমতি ছাড়া এই ভাবে সত্যাগ্রহ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকেই তিনি এই ভাবে শাস্তি বরণ করিতে পাঠাইলেন। ইহার দ্বারা দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের মনে চঞ্চলতা, উত্তেজনা এবং বিপ্লবাত্মক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইল। অথচ যে-সব গুপ্ত উমিচাঁদ ওঁৎ পাতিয়া বসিয়াছিলেন যে সত্যাগ্রহের সুযোগে হট্টগোলের মধ্যে জনতা ক্ষেপাইয়া খুনখারাপি ঘটাইয়া সত্যাগ্রহ দমনের সুযোগ করিয়া দিবেন—তাহারা নিরাশ হইল। এই যে সাবধানতা মহাত্মাজী অবলম্বন করিলেন, তজ্জন্য কমিউনিষ্টরা যে খানিকটা দায়ী নহে তাহা বলা চলে না। কেননা এতাবৎকাল ইহারা কংগ্রেসকে বিপ্লব বিরোধী বলিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ সুর বদলাইয়া বসিল। যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন কংগ্রেস ইংরেজকে সহযোগিতার বিনিময়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের অঙ্গীকার করিতে আহ্বান করিল, তখন পাছে ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা সম্মানজনক রফা হইয়া যায় সে আশঙ্কায় কমিউনিষ্টরা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ইহাদের ১৯৩৯ সালের বিবৃতি হইতে পূর্ব্বেই কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই বিবৃতিতেই দেখিতে পাই যে সহসা ইহারা কংগ্রেসের উপর অত্যন্ত আস্থাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা বলিল—

"It must be clearly realised that the movement against war . . . can be really effective only when it is led by the Congress."

অর্থাৎ—"ইহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুধু কংগ্রেস কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই ফলপ্রসূ হইতে পারে।"

কিন্তু এই সময় ইহারা একটা সত্য কথাও স্বীকার করিয়া ফেলিল—

"Even Satyagraha struggle, when launched by the Congress, immediately assumes mass form of national struggle and therefore acquires revolutionary possibilities."

অস্যার্থ: "এমন কি সত্যাগ্রহ আন্দোলনও যখন কংগ্রেস কর্ত্তৃক আহূত হয়, তখন দ্রুতগতি ইহা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হইয়া বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পূর্ণ হইয়া উঠে।"

যখন কংগ্রেস সংযত ও ব্যক্তিনিষ্ঠ সত্যাগ্রহের প্রস্তাব গ্রহণ করিল, কমিউনিষ্টরা বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল:—

"The ban on C.D. (Civil Disobedience) and political strikes which the W.C. (Working Committee) resolution has imposed pending the actual launching of struggle is a move to restrict the struggle to the Parliamentary plane."

অর্থাৎ—"ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট নিষেধ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তদ্দ্বারা আন্দোলনকে আইন সভার সীমানায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইতেছে—"

এই সময় কমিউনিষ্টরা ঘোষণা করিল যে ভারতের আন্দোলনকে রীতিমত ভাবে ব্যাপক করিতে হইবে, no-tax, no-rent, general strike প্রভৃতি আরম্ভ করিতে হইবে to give the mass movement revolutionary content and form," অর্থাৎ—গণ আন্দোলনকে লক্ষ্য ও পদ্ধতিতে বিপ্লবাত্মক করিতে হইবে। ইহারা এ কথাও বলিল যে, কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কংগ্রেসওয়ালাদের অনুপ্রাণিত করিয়া উস্কাইতে হইবে এবং যখন আন্দোলন তীব্ররূপ গ্রহণ করিবে তখনই খোলাখুলি ভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিনাইয়া লইয়া গান্ধী-পদ্ধতির উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে। শুনুন ইহারা তখন কি বলিল—

". . . When the movement breaks through all restrictions imposed by the Gandhian technique of non-violence and develops into mass insurrection against imperialist rule, then and then only shall the capture of power become the immediate perspective."

গান্ধীর ননভায়লেন্স বা অহিংস পদ্ধতি উড়াইয়া দিয়া দেশে রক্তগঙ্গা বহাইবার আস্ফালন ইহারা করিয়া বসিল। উদ্ধৃত অংশ Bengal Committee C. P. I. কর্ত্তৃক প্রচারিত "A Statement of Policy and Tasks in the period of War" হইতে লওয়া।

জিজ্ঞাস্য, দেশ কি তখন ইংরেজের অস্ত্রসজ্জার সহিত টক্কর দিয়া হিংসাত্মক বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিল? যদি না থাকে তবে কমিউনিষ্ট পার্টির এইরূপ মতবাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? সত্যই

কি ইহারা দেশের নাড়ী টিপিয়া বুঝিয়াছিল যে ভারতবর্ষ বিদ্রোহের জন্ত প্রস্তুত এবং একটা চেষ্টা করিলেই ইংরেজ ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইবে ? এবং এরূপ করিতে হইলে, যে নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও সরঞ্জাম প্রয়োজন তাহা ইহাদের ছিল কি ? যদি তাহা না থাকিয়া থাকে তবে কি এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে যে, ইহারা হিংসাত্মক কার্য্যপন্থার ভয় দেখাইয়া কংগ্রেসকে ব্যাপক আন্দোলন হইতে নিরস্ত করিবার জন্ত ইং-রেজের প্রচ্ছন্ন মিত্র হিসাবে এরূপ করিতেছিল ?

এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার বিচক্ষণ পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিলাম।

অন্ততঃ পক্ষে মহাত্মাজী কেন প্রথমটা অতি সাবধানে অগ্রসর হইলেন তাহা বোধ হয় এখন বোধগম্য হইয়াছে।

১৯৪০ সালে যখন রাশিয়া ও জার্মানীতে যুদ্ধ বাধিল, এবং একই উদ্দেশ্যবশতঃ ইংরেজ ও রাশিয়ায় একটা সহযোগিতার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিল এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবার একটা ভান করিল।

তৎপরে জাপান যখন ইংরেজ শক্তিকে অপদস্থ করিয়া বর্ম্মার পথে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বারদোলীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের আশ্বাস পাইলে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সঙ্কল্প প্রচার করিল। মহাত্মাজী নেতৃত্ব হইতে অপসৃত হইলেন। মাস তিনেক পরে ক্রিপস সাহেব তাঁহার প্রস্তাব লইয়া ভারতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার ধাপ্পায় পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ও মওলানা আজাদ ধরা দিলেন না।

ক্রিপস ফিরিয়া যাওয়ার পর আবার গান্ধীজীর ডাক পড়িল। কংগ্রেস বলিল যে, ইংরেজের মতলব পরিষ্কার বুঝা গেল। সুতরাং স্বাধীনতার জন্ত একটা শেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

মহাত্মাজী বলিলেন, "আমি একবার শেষ বারের জন্ত বড়লাটের নিকট শান্তি ও আপোষের দৌত্য করিব। যদি বিফল হই তবে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনের প্রয়োজন হইতে পারে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে হিংসাত্মক পথে আন্দো-লনকে যাইতে দিব না। কিন্তু যদি অহিংসায় স্বাধীনতা না আসে, আমি মরিব। আমি মরিলে দেশ যেন যে উপায়ে পারে স্বাধীনতার চেষ্টা করে।"

কিন্তু নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের শেষ দিন মহাত্মাজী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধরা পড়িলেন। নেতাদের গ্রেপ্তারে ক্ষুব্ধ হইয়া ভারতের কৃষক জনতা ক্ষেপিয়া সত্যই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিল। ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র প্রায় বিকল হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। কিন্তু নেতৃত্বহীন নিরস্ত্র আন্দোলন ক্রমশঃ সশস্ত্র শক্তির নিকট পরাভূত হইল।

দেশে যখন এরূপ একটা ব্যাপক ও তীব্র বিপ্লবাত্মক আন্দোলন চলিতেছিল তখন কমিউনিষ্টরা ১৯৩৯ সালের ফতোয়া যেন ভুলিয়া গেল। তাহারা শ্রমিক সম্প্রদায়কে বুঝাইল, "দেখ ভাই, ফাসিজমকে ধ্বংস করিতে হইলে যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিলে চলিবে না। ব্রিটিশকে সাহায্য করিয়া যাও। দেশে যে-সব বিদ্রোহাত্মক কার্য্য চলিতেছে তাহা জাপানের গুপ্তচর পঞ্চম বাহিনীর কাজ, তোমরা ইহাতে যোগ দিও না।"

লেনিন এক স্থানে বলিয়াছেন—

"Support must be given to those national movements which tend to weaken imperialism and bring about the overthrow of imperialism and not to strengthen and preserve it."

অথচ "কমিউনিষ্ট"-মুখোস পরিহিত একদল লোক ভারতবর্ষে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে বাধা দিতে লাগিল।

ইংরেজ প্রমাণ করিতে চায় আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। সারা দুনিয়ায় সে প্রচার করিয়াছে যে ইংরেজ যদি এক দিন ভারতে না থাকে তবে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মাথা কাটাইয়া একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করিয়া বসিবে।

আশ্চর্য্য, কমিউনিষ্টরাও খুব জোর গলায় সেই কথাই প্রচার করিতেছে। আমাদের ঐক্য নাই এই প্রচারের দ্বারা ইহারা জনতার হৃদয়ে অনৈক্যের বীজ বপন করিতে সহায়তা করিতেছে। Mob-psychology যাঁহারা বুঝেন তাঁহারা এই প্রচারের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিবেন।

ইহারা মুসলিম লীগের two-nation মতবাদের গোঁড়া সমর্থক হইয়া উঠিল। মুসলিম লীগ-প্রীতি ও "পাকিস্থান"-প্রীতি ইহাদিগের এত উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে তদ্দারাই ইহাদের কমিউনিষ্ট-মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে। লেনিন বা মার্কস-নীতিতে বিশ্বাসী হইলে মুসলিম লীগের "মুসলমান জাতি"র দাবী ইহারা সমর্থন করিতে পারিত না। ধর্ম্মের ছাপ যে "জাতি" বাচক একথা কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারিবেন না, অন্ততঃ কোনও মার্কসবাদী ত নহেই।

১৯৩৯ সালে যাহারা তারস্বরে "Gandhian technique of non-violence" ভাঙিয়া ফেলিবার দৃঢ় মত প্রচার করিতে-ছিল তাহারা ১৯৪২ সালে যখন গান্ধী ইংরেজের বন্দী ও দেশের বিরাট্ জনতা গান্ধীর "technique of non-violence" ভুলিয়া "mass insurrectoin"-এ ব্যাপৃত তখন এই মহাবিপ্লবী কমিউনিষ্টরা কোথায় গেল ? ইহারা তখন ইংরেজের সঙ্গে গলা মিলাইয়া দেশের বিপ্লবপন্থী জনতাকে "Fifth columnist" ও Goonda বলিয়া গালি দিল। সেই সময়কার *People's War* খুঁজিয়া জোগাড় করিতে পারিলে দেখিতে পাইবেন কিরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহারা কংগ্রেসওয়ালাদের পঞ্চম-বাহিনী বলিয়া প্রচার করিতেছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া *People's War* পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে ভারতবর্ষে ঐক্যের অভাব। স্বাধীনতা আসিতেছে না, কেননা, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের টুঁটি কামড়াইয়া রহি-য়াছে বলিয়া। এই যে প্রচার ইহারা করিতেছিল, তাহা কি ইংরেজের সুবিধার জন্ত নহে ?

কপট ও অসত্যভাষী ছাড়া এ কথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে হিন্দুর মধ্যে, মুসলমানের মধ্যে ও আম্বেদকা-রের জাতভাইদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত চাকুরীজীবী মেরু-দণ্ডহীন যে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের চাকুরির পার্সেণ্টেজ সম্বন্ধে লেলাইয়া দিয়া প্রমাণের চেষ্টা চলিতেছে যে এ দেশে ঐক্যের অভাব।

ভারতের ৩৮ কোটি হিন্দু ও মুসলমান অত্যন্ত নিবিড় ঐক্যের সহিত সম্মিলিত ভাবে, অন্নাভাব, শিক্ষাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং রাজকর্ম্মচারীদের উৎকোচ-প্রবৃত্তিজনিত দুর্গতি ভোগ করিতেছে। বাংলার বিরাট্ দুর্ভিক্ষে কাফের ও কলমানবীশ একসঙ্গে মরিয়াছে। সেই সময় জনযুদ্ধবিশারদরা কি করিল? তাহারা চাঁদা তুলিল, লঙ্গরখানা খোল বলিয়া গলা ফাটাইল।

ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, শাসন-যন্ত্র (Government) যখন ঐরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া শাসিতদের মৃত্যুর কারণ হয়, তখন সত্যকারের বিদ্রোহবাদীরা কি করে?

তাহারা বিদ্রোহের সুযোগ পায়। ফ্রান্সে Robespierre, Danton ও Marat-র দল "রুটির অভাব"টাকেই সুযোগ করিয়া প্যারিসের সর্ব্বহারা গুণ্ডাদের ক্ষেপাইয়া "বাস্তিল" ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফ্রান্সের কথা তো এখন উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সাচ্চা কমিউনিষ্টদের ইষ্টদেবতা লেনিনের এ বিষয়ে মত কি? ১৯০৯।১০ সালে যখন রাশিয়াতে দুর্ভিক্ষে বহু লোক মরিতেছিল তখন তাহাদের জন্য লঙ্গরখানা খোলার প্রস্তাবে লেনিন বলিয়াছিলেন—"বুভুক্ষিতকে অন্নদান বিপ্লব-বিরোধী কার্য্য" ("To feed the famished is a counter-revolutionary measure")। অর্থাৎ তাঁহার অভিমত এই যে জনতা অন্নের অভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেই তাহারা মরিয়া হইয়া বিপ্লব বাধাইতে পারে। অন্ন জোগাইলে সে সম্ভাবনা নষ্ট হয়।

সুতরাং জিজ্ঞাস্য—এ দেশের কমিউনিষ্টরা ঝুটা না সাচ্চা? ইহাদের সর্বশেষ পরিচয় পাই ইহাদের পাকিস্থান সম্বন্ধে মতবাদে। গান্ধী-জিন্না মোলাকাতের ফলে যখন পাকিস্থান সম্ভব হইল না, তখন মিঃ যোশী এক প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলেন। বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি উহার বাংলা তর্জ্জমা করিয়া উহাকে এস্তেহার কেতাব হিসাবে বিতরণ করিতেছে।

শ্রীযুক্ত যোশীর বিচারবুদ্ধি এবং সহৃদ্দেশ্যের নমুনা স্বরূপ ঐ পুস্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতেছি—

"লাহোর প্রস্তাবের মর্ম ও সারাংশ কি?"

"যে কেউ নিরপেক্ষ ভাবে প্রস্তাবটি পড়লে বুঝতে পারবেন এটি ১৯২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর প্রস্তাবেরই অনুরূপ একটি স্বাধীনতা প্রস্তাব।" (পৃ ৭)

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ঐ কথাগুলির অব্যবহিত পরেই পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বড় বড় কালো বৃত্ত সহযোগে রহিয়াছে—

"বর্ত্তমানে বৃটিশ শাসনে দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি অর্জ্জনের জন্য এ প্রস্তাব।"

"ভবিষ্যতের হিন্দু সংখ্যাধিক্যের শাসনের বিরুদ্ধে এ প্রস্তাব।"

পড়িলে মনে হয় যে ক্রিপস্-সহচর কুপল্যাণ্ডের আধুনিকতম পুস্তকখানি যোশী সাহেব তর্জ্জমা করিতেছেন।

অনেক ঘুরাইয়া অনেক বাঁকাইয়া যোশী সাহেব বলিতেছেন যে ভারতবর্ষে দুই জাতি, হিন্দু ও মুসলমান এবং ইহাদের ঐক্য হইলেই স্বাধীনতা আসিয়া যাইবে। গান্ধীজীর বড় অন্যায় যে "মুসলমানদের দেশে" তাদের স্বাধীনতা তিনি মানিয়া লইতে পারিলেন না।

যোশী লিখিত সুসমাচারে আছে:

"গান্ধীজী যা একেবারেই লক্ষ্য করতে পারেন নি তা হচ্ছে,

(১) পাকিস্থান দাবীর পিছনে মুসলমানদের স্বাধীনতা লাভেরই প্রেরণা বর্ত্তমান।

(২) লীগ পরিচালিত এই গণ-আন্দোলন মুসলমানদের নিজেদের বাসভূমিতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অর্জ্জনের আন্দোলন।"

পাঠক "মুসলমানদের নিজেদের বাসভূমি" লক্ষ্য করিবেন। আরব নহে, পারস্য নহে,—ভারতবর্ষের কিছু অংশ যোশীর মতে "মুসলমানদের" নিজেদের বাসভূমি এবং এই সব মহা বিপ্লবী লেনিনপন্থীরা কেমন চমৎকারভাবে ভারতের ঐক্য বিনাশের প্রচার করিতেছে তাহাও লক্ষ্য করিবেন। ক্রিপস্ প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে বহুধা-বিভক্ত (Balkanise) করিবার প্রস্তাবটি ইহারা জোর গলায় সমর্থন করিতেছে এবং এতদ্দ্বারা ইহারা ভারতীয় কংগ্রেসের একটি মূল আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে।

যদি ইহারা সাচ্চা কমিউনিষ্ট হইত তবে ইহারা লেনিনের কথা মনে রাখিত—

. . . a Socialist must concentrate the weight of his agitation on the second word of our general formula—"Voluntary amalgamation" of nations . . . *in all cases he must fight against small-nation narrow-mindedness, for the subordination of the interests of the particular to the interests of the general.*

. . . the point is that support must be given to those national movements which tend to weaken imperialism and bring about the overthrow of imperialism, and not to strengthen and preserve it.

(Discussion on Self-Determination, summed up, Lenin's collected works, vol. xix.)

লেনিনের উপরি-উদ্ধৃত দুইটি বক্তব্য হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন এদেশের কমিউনিষ্টরা সাচ্চা না ঝুটা। Imperialismকে ইহারা Strengthen ও preserve করিতেছে না weaken ও destroy করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদের কূটরাষ্ট্রনীতির জটিল ও পঙ্কিল পথ ঘাট যাঁহাদের পরিচিত নহে—এবং যাঁহাদের অধিকাংশই শুধু অনভিজ্ঞ নহে, উপরন্তু অপরিণত-বয়স্ক—তাঁহাদেরও উচিত এই প্রশ্ন বিচার করিয়া তবে এই তথা-কথিত 'কমিউনিষ্ট' দলের সহিত সম্বন্ধ রাখা।

এ সকল কথা বিচার করিলে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-কর্ম্মীরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদীর গোপন ভেদনীতির হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে তাহা সময়োপযোগী ও সমীচীন হইয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

দুর্ভিক্ষ—মহীউদ্দীন। ৮এ, রজব আলি লেন, খিদিরপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

রাত্রির আকাশে সূর্য—শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়। প্রকাশক—কুমার ভট্টাচার্য, ১২ খুরুট রোড, হাওড়া। মূল্য পাঁচ সিকা।

অসাম্য-পীড়িত রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মানুষ আজ পূর্ণ মাত্রায় সচেতন। ধনিকতাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোষিত মানবের বিক্ষোভ অর্থাৎ গণ-আন্দোলন সর্ব্বদেশের সাহিত্যে রূপ গ্রহণ করিয়েছে। আলোচ্য গল্পসংগ্রহ দুইখানিতে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। এই শোষণ-নীতির নগ্ন রূপ গত তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। এ কথা সত্য, বাহির হইতে কতকগুলি অভাব দুঃখের হিসাব লইয়া মার্কসীয় মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী মিশাইয়া গণ-সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নহে। প্রতিভাবান লেখকেরা তীক্ষ্ণ অনুভূতির দ্বারা অনেককিছু সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু সে প্রতিভা দুর্লভ। তথাপি গণ-চেতনামূলক এই সাহিত্য রচনার প্রয়াস—সর্ব্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ বা গভীর চিন্তাপ্রসূত না হইলেও—ইহার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম গ্রন্থখানিতে একটি কাহিনী ও কতকগুলি ছন্দের মধ্য দিয়া লেখক মনের বেদনা ও জ্বালাকে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাশক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই বলিয়া গল্প এবং কবিতাগুলিতে উচ্ছ্বাসের আধিক্য আছে। তাহা সত্ত্বেও লাঞ্ছিত মানবের জন্য দরদ ও বেদনাবোধ মনকে স্পর্শ করে। দ্বিতীয় গ্রন্থের গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত সাহিত্যরসপুষ্ট। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে, রচনা-কৌশলে এবং লেখকের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন কোন গল্প মনের মাঝে ছাপ রাখিয়া যায়। সাধনা থাকিলে লেখক কথা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸৹ আনা।

বাংলার প্রাণেই দেশাত্মবোধের প্রথম প্রেরণা জাগে। বঙ্গসাহিত্য সাক্ষী, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মধ্যেই ভারতীয়তা প্রথম পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত দেশপ্রেমের এই ভাবধারা ক্ষুন্ন হয় নাই। বাংলার কবিই প্রথম ভারত-সঙ্গীত গান করে। বাঙালী সাহিত্যিকই প্রথম দেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা ঘোষণা করে। বাংলার ঋষিই ভারতবর্ষকে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র প্রদান করে। শুধু পট্টভী সীতারামিয়ার 'কংগ্রেসের ইতিহাসেই নয়, ইতিহাসকে বিকৃত করিবার অপচেষ্টা বহু কংগ্রেসসেবীর কার্য্যে বাক্যে এবং ব্যবহারে পরিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীকে 'প্রাদেশিক' বলিয়া উপহাস করিবার প্রবৃত্তি দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত কোন কোন নেতা এবং তাহাদের অনুচরদের মধ্যে জাগিয়াছে। এমন বাঙালীও দেখা দিয়াছে, বাঙালী বলিয়া গর্ব্ববোধ করিতে যে ভয় পায়, পাছে লোকে তাহাকে 'প্রাদেশিক' মনে করে। বাংলাকে ছোট করিলে ভারতবর্ষকেই ছোট করা হয়। শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য দেশের লোককে বাংলার গৌরব-কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া এবং কংগ্রেস সংগঠনে বাংলার অবদানের কথা তথ্যানুগভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া শুধু বাঙালীর নয় অন্যান্য

প্রদেশবাসীরও উপকার সাধন করিয়াছেন। নানা কারণে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ ঘটে। ধর্ম্মে শিক্ষায় সমাজে রাষ্ট্রনীতিতে, বহু প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে বিবিধ আন্দোলনে, নানাবিধ সাময়িক ও সংবাদ-পত্র প্রকাশে—জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই জাগরণের প্রকাশ দেখিতে পাই। 'অগ্রগতিতে বাংলা' অধ্যায়ে গ্রন্থকার ইহার পরিচয় দিয়াছেন। 'ইতিহাসের অবিচারে' তিনি দেখাইয়াছেন, পট্টভী সীতারামিয়া মনে করেন কংগ্রেস ইতিহাসের আরম্ভ যেন ১৯২০ সালে, যেন ১৮৮৫ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরের ঘটনার গুরুত্ব বিশেষ কিছু নাই, যেন "গান্ধীজীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী কংগ্রেস-ইতিহাসে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকারূপে আলোচিত হইলেই যথেষ্ট।" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিতে কতখানি সাহায্য করিয়াছিলেন, 'কংগ্রেসের ঋণ' অধ্যায়ে গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। ১৮৫১ সালে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন', ১৮৭৫ সালে 'ইণ্ডিয়ান লীগ, ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে কলিকাতার এলবার্ট হলে এক নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স'—আহ্বান করা হয়। সুরেন্দ্রনাথকে বর্জ্জন করিয়া উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃগণ প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করেন। দ্বিতীয় বৎসর হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন এবং তৎপরবর্ত্তী কালের বাংলার আত্মত্যাগের কাহিনী ভুলিয়া গেলে ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত হইবে। সেই আত্মবিস্মৃতি যাহাতে না ঘটে তাহার চেষ্টা করিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

রসায়নের ব্যবহার—শ্রীসর্ব্বাণীসহায় গুহ সরকার; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ৩৯; মূল্য আট আনা।

মানুষের জীবনযাত্রার প্রত্যেক ক্ষেত্রে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে, বিশেষ ভাবে রোগযন্ত্রণা লাঘবে ব্যবহারিক রসায়নের দান অপরিমিত এবং অপরিহার্য্য। ইহার ইতিহাস যেমন বিরাট্ তেমনই বিস্ময়কর। আলোচ্য পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থকার ইহাতে সরল ভাবে ব্যবহারিক রসায়নের অনেক কৃতিত্বের বিষয়ই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। বইখানি সুখবোধ্য এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে।

রঞ্জন দ্রব্য—শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ ৫৮; মূল্য আট আনা।

আবহমান কাল হইতে বিভিন্ন প্রয়োজনে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রঞ্জক পদার্থের ব্যবহার চলিতেছে। প্রাচীনকালে প্রকৃতিজাত পদার্থ হইতে রঞ্জক পদার্থ সংগৃহীত হইত। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহায়তায় কৃত্রিম উপায়ে উৎকৃষ্ট ধরণের অসংখ্য রঞ্জক পদার্থ উৎপাদন করিয়া মানুষ তাহার প্রয়োজন মিটাইতেছে। এই রঞ্জন শিল্পের ইতিহাস অতি বিরাট্ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। বইখানি হইতে পাঠক-পাঠিকারা সহজেই রঞ্জক-পদার্থ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রদীপ ও শিখা—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল। ৩ নং বারাণসী ঘোষ সেকেণ্ড লেন হইতে শ্রীশিশির শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীশিশির ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২।॰ টাকা।

গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি পুস্তক জনসমাদর লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার ভাবমুগ্ধ চিত্তের একটি বিশিষ্ট রূপ অঙ্কিত হইয়াছে। নায়ক প্রদীপ এবং নায়িকা লাবণ্যর মধ্যে সনাতন প্রেমের লহরীলীলা অভিব্যক্ত—উহা উচ্চাভিমুখী এবং আদর্শধর্ম্মী। মালতীর কুটিলতা ও নির্লজ্জতাকে কৃষ্ণপটভূমির মত ধরিয়া লেখক লাবণ্যকে উজ্জ্বল ও মধুর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—ইহা ব্যতীত মালতীর চরিত্র-সৃষ্টির আর কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

প্রথম দিকের গল্পাংশ অবাস্তব ও অসংযত মনে হইলেও কিছুটা অগ্রসর হইবার পর লেখকের চিন্তাধারা এবং বাচনভঙ্গীতে পাঠক আকৃষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। চরিত্র-চিত্রনের দিক দিয়া লাবণ্যর পিতা রায় বাহাদুর তেমন স্পষ্ট নন, কিন্তু মাতা ইন্দ্রাণী সুচিত্রিতা। ধর্ম্ম ও ভক্তিবাদের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত এই উপন্যাসে নায়ক প্রদীপ এবং নায়িকা লাবণ্যর সংলাপের মধ্যে চটুলতা লক্ষিত হইলেও বইখানি সুলিখিত হইয়াছে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

ধনবিজ্ঞান—শ্রীভবতোষ দত্ত এম. এ.। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৮৩। মূল্য ।॰।

বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালার ৩১শ গ্রন্থ। ছয়টি অধ্যায়ে ধনবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি, যথা—অভাব ও চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহ, বিনিময় ও মূল্য, ধনবিভাগ প্রভৃতি সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। মূল ইংরেজী ভাষার পুস্তকেও ধনবিজ্ঞানের এই প্রাথমিক অধ্যায়গুলি সহজবোধ্য ভাবে আলোচনা করা বেশ কষ্টকর, সুতরাং বাংলা ভাষার মাধ্যমে এইরূপ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থকার ছাত্রসমাজের উপকার করিয়াছেন। তবে লেখক যে-সকল বাক্য ও শব্দ বিশেষ অর্থে, বিশেষতঃ ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ রূপে, ব্যবহার করিয়াছেন যথাস্থানে উহার বিদেশী প্রতিশব্দ বা পুস্তকের শেষে একটি পরিভাষার তালিকা দিলে গ্রন্থখানি আরও সহজপাঠ্য ও সুবোধ্য হইত। শেষ অধ্যায়ে ধনবিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তার ক্রমবিকাশের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। ভবিষ্যতে ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্যমূলক গ্রন্থাদি রচিত হইলে বাঙালী পাঠক একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যেই পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জৈনগুরু মহাবীর—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম এ, বি-এল, পিএচ-ডি, ডিলিট। প্রাচ্যবাণী মন্দির, সার্ব্বজনীন গ্রন্থমালা, দ্বিতীয় পুষ্প। ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ভারতের বিভিন্ন অংশে জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অজৈন জনসাধারণ এই ধর্ম বা ইহার প্রবর্তকগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। কোন কোন মনীষী ও প্রতিষ্ঠান জৈন সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে নানা রত্ন আহরণ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও বহু মূল্যবান্ ও কৌতুকাবহ বস্তু সাধারণের অগোচরে রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় প্রখ্যাতকীর্ত্তি ডক্টর লাহা মহাশয়ের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তিনি জৈনধর্ম প্রবর্তক মহাবীরের জীবনকাহিনী ও উপদেশাবলী বিবৃত করিয়াছেন—পরিশিষ্টে কয়েকজন প্রখ্যাতনামা জৈন মহাপুরুষের বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ হইয়াছে। আশা করি, ডক্টর লাহা ভবিষ্যতে জৈনধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃততর ও প্রামাণিক বিবরণ সংকলন করিয়া বাঙালী পাঠকের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে—শ্রীঅশোক সেন। এ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বইয়ের নাম দেখে প্রথমে একটু আশঙ্কা হয়েছিল, বুঝি অযাত্রা পথের মূঢ়-লোভন চিত্র আঁকবার প্রয়াস। পড়ে দেখলাম, না, একেবারেই তা নয়। বারিদবরণ, সুমিত্রা, রজত সেন, জীবনখাতার কয়েক পাতা, এবং উম্মাদ অধ্যাপক—পাঁচখানি নাটিকায় বলিষ্ঠ রেখায় লেখক আধুনিক

বাঙালী নরনারীর ছবি এঁকেছেন। লেখায় ন্যাকামি বা অসঙ্গত নাটুকেপনা নেই। বিশেষ ভাল লাগল সংলাপ ভাবালুতা-বর্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত, জোরাল কথাবার্তার ভঙ্গী। তার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে পাত্রপাত্রীগণের ব্যক্তিত্ব। আর একটি লক্ষ্য করবার বস্তু এই, অধিকাংশ বাংলা নাটকে ঘটনার যে অস্বাভাবিক মোচড় দেখা যায়, এ নাটিকাগুলিতে তা নেই। শেষ নাটিকার একটু অতিরঞ্জন হয়ত আছে, কিন্তু লেখকের সুরুচি শেষ পর্যন্ত গল্পটিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের আত্মবোধ ও আত্মবিস্মৃতি—শ্রীউপেন্দ্র-নারায়ণ দাশগুপ্ত, ৪০।৫৪ নং লছমনপুরা, গোধুলিয়া, বেনারস। পৃ. ৪৮। মূল্য ছয় আনা।

সুখ দুঃখের ঘূর্ণ্যাবর্তে আত্মবিস্মৃত পার্থিব জীবন কাটিয়া যায়, আত্মবোধ লাভের চেষ্টা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? গ্রন্থকার প্রাচ্য ধর্মজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান আলোচনাক্রমে এই আত্মবোধ উন্মেষের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত নিত্যস্মরণীয় একটি সচিত্র দেওয়াল-লিপিকাতেও এই আত্মবোধের সহায়ক অমূল্য কয়েকটি বাক্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজ—ভূপর্যটক শ্রীক্ষিতীশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গ্রন্থকার, পোঃ গরিয়া, ২৪-পরগণা। মূল্য ২৷০।

এই গ্রন্থে জাপানী নারী, চীনদেশের নারী, ব্রহ্মদেশের নারী, বহির্ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নারী ও ইউরোপের নারী শীর্ষক কয়েকটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের দৃষ্টিশক্তি ও মননশীলতা আছে, ভাষায় প্রবাহ ও স্বচ্ছতা আছে। পূর্ব্বে ইনি ইংরেজীতে ভূপর্য্যটনের সম্বন্ধে বই লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, বাংলা ভাষায় তাঁহার বইগুলিও বাংলা-সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। কয়েকখানি চিত্র পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

উপনিষদের গল্প—অরূপ (স্বামী প্রেমঘনানন্দ)। ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স সিণ্ডিকেট, ৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৯০ পৃঃ মূল্য ১৲।

রামকৃষ্ণের গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮৩ পৃঃ, মূল্য ১৲।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ ইতঃপূর্ব্বে 'রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প' এবং 'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প' লিখিয়া শিশু-সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছেন। উপরোক্ত বই দুখানি তাঁহার সেই যশ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। গল্প বলার সহজ সরস কৌশলটি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও নিজস্ব। উপনিষদের মধ্যে হিন্দু দর্শনের গভীর তত্ত্বসকল নিহিত আছে, হিন্দুধর্ম্মের সার উপনিষদ্ পড়িলে জানা যায়। প্রাচীন কালের ঋষিগণ মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে দর্শনের গূঢ় তত্ত্বসকল সাধারণের সহজবোধ্য করিয়া গিয়াছেন। সেই গল্পগুলি বাংলার ছেলেদের উপযোগী করিয়া গ্রন্থকার অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত উপহার দিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব গল্প বলিয়া সর্ব্বধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বসকল জলের মত সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। গ্রন্থকার তাঁহার কয়েকটি গল্পে উপদেশাংশ বাদ দিয়া শুধু গল্পগুলি বলিয়াছেন, উপদেশগুলি ইঙ্গিতে ধরিয়া লইতে বলিয়াছেন। ইহাতে গল্প পড়ার আগ্রহ মেটে, কিন্তু উপদেশগুলি কৌশলে ব্যক্ত করিয়া দিলে কি রসহানি হইত বুঝিতে পারিলাম না। কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর চিত্র বই দুইখানির আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। উভয় গ্রন্থেরই প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য ও সুকল্পিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ। দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য সাড়ে চারি টাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নামে খ্যাত বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ প্রত্যেক দেশ, জাতি ও ব্যক্তির জীবনেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই যুদ্ধ বৈচিত্র্যে, ভীষণতায় ও ব্যাপকতায় এমনই বিরাট্ যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিতে কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধারাবাহিক কাহিনী সাধারণ পাঠককে সংক্ষেপে যথাযথভাবে পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। কয়েকখানি ম্যাপ দেওয়াতে যুদ্ধের সংস্থান ও গতি বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। ঘটনাবলীর তারিখ ও দেশকালপাত্রাদির বিবরণ সঠিকভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। সুলিখিত গ্রন্থখানি পাঠকগণের কাছে আদৃত হইবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

১। ছবি ও ছড়া ২। গল্পের বই—শ্রীঅনাথনাথ বসু। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮-সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে পাঁচ আনা ও ছয় আনা।

প্রথম বইখানিতে শিশু-মনোপযোগী কয়েকটি ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। শিশুরা ছড়া মুখস্থ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখিয়াও আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর।

দ্বিতীয় বইখানি "যে শিশু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া যুক্তাক্ষর পড়িতে শিখিয়াছে তাহার নবলব্ধ অক্ষরজ্ঞানের অভ্যাসের জন্যই লেখা হইয়াছে।" লেখকের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। তিনি ইহাতে পনরটি সুপ্রচলিত কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি চিত্রিত। গল্পগুলি পাঠ করিয়া শিশুগণ আনন্দ পাইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

'সুরশ্রী' মিনতি ভট্টাচার্য্য

শ্রীমতী মিনতি ভট্টাচার্য্য গত ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'সুরশ্রী' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'সুরশ্রী' উপাধিতে ভূষিতা হন।



শ্রীমিনতি ভট্টাচার্য্য

ইনি প্রসিদ্ধ সেতারু শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ছাত্রী। ইনি ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয়া কন্যা এবং 'গীতশ্রী' দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী।

শ্রীমতী গীতা দত্ত এ বৎসর আশুতোষ কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস পরীক্ষায় সংস্কৃত বিভাগে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে



শ্রীগীতা দত্ত

প্রথম স্থান অধিকার করায় মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্ট-বৃত্তি ও নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি পাইয়াছেন:—

১। প্যাচেট সংস্কৃত পারিতোষিক, ২। সারদা প্রসাদ পারিতোষিক, ৩। জ্যোৎস্না পাঠক পারিতোষিক।

শ্রীমতী গীতা প্রবেশিকা পরীক্ষাও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে. কে. দত্ত মহাশয়ের কন্যা।

সুবিনয় রায়চৌধুরী

৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র ও ৺সুকুমার রায়চৌধুরীর ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক সুবিনয় রায়চৌধুরী দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর গত ৩০শে জানুয়ারি বাহান্ন বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিশোরদিগের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাছাড়া তাঁহার হাসির গল্প, কবিতা, ছবির ধাঁধা প্রভৃতি নানাবিধ রচনা দ্বারা বাংলার শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার 'রকমারি', 'কাড়াকাড়ি', 'খেয়াল', 'আজব বই', 'জীবজন্তুর আজব কথা' প্রভৃতি বইগুলি বৈচিত্র্য ও কৌতুকের ভাণ্ডার। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

পণ্ডিতের সম্বর্ধনা

ময়মনসিংহ—মুগা গ্রামে রমানাথ ভবনস্থ শ্রীশ্রী৺আনন্দময়ী কালী মাতার অন্যতম সেবক পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে তদীয় পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ৮৫নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীনারায়ণ আশ্রমে ২৪শে কার্ত্তিক শনিবার সম্বর্ধিত করা হয়। কলিকাতা ভাগবত চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে স্মৃতিভূষণ উপাধি-দানে সম্মানিত করেন।

লক্ষ্মীপূর্ণিমা, ১৩৫১

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

তেরশ' একান্ন সালে বিষণ্ণ আকাশ জুড়ে আবার এসেছে রাত্রি লক্ষ্মীপূর্ণিমার,
তারার সমুদ্র বেয়ে, কত ঝড় ঠেলে ঠেলে, কত কোটি বায়ুস্তর ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফের;
দূরের ঝাউয়ের বনে হীরার প্রদীপ জেলে, রাঙা ক'রে পূর্বাচল দিগন্তের পার
আবার এসেছে চাঁদ, লক্ষ্মীপূর্ণিমার চাঁদ তিমির-তীর্থের শিরে মহাশ্মশানের।

শ্মশান, শ্মশান হেথা—রুদ্রা, রিক্তা নিশীথিনী বুকে ক'রে ব'সে আছি মোরা কাপালিক
অযুত অস্থির স্তূপে, দুর্ভিক্ষের শবাসনে, কণ্ঠে প'রে কঙ্কালের মুণ্ডমালা-হার;
এখানে এসেছ কেন? আরো ত' আকাশ ছিল, আরো দেশ, আরো দ্বীপ, তীর্থ ভৌগোলিক,
সম্রাট্-সামন্ত-শ্রেষ্ঠী-কুবেরের আরাধিতা! সেখানে জমাতে যাও রূপার পাহাড়।

তিমির-রাধার স্বপ্নে মৃত্যুর কালিন্দীকূলে এখানে ধেয়ান-স্তব্ধ সন্ন্যাসীর দল—
শ্মশানে বসন্ত কেন? মেনকার নূপুরেতে জাগিবে না, জাগিবে না বিশ্বামিত্র আর;
এদের মোহের কন্যা শকুন্তলা নয় কোনো, এরা খোঁজে পূর্বাশার উদয়-অচল—
করোটির পাত্র ভ'রে তাই শুধু পান করে ঢোঁকে ঢোঁকে পৃথিবীর বিষের ভৃঙ্গার।

দেশের ফসল শ্রমব্যস্ত-হাতে লুটে নিয়ে বন্দরে বন্দরে যারা তরণী ভাসায়:
যারা আনে কালো ঝড় দুর্ভিক্ষ ও মড়কের, কোটি কোটি মানুষের ছিঁড়ে ফেলে নীড়;
ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র সেই তারা অহোরাত্র আজো দেখি পুষ্ট হয় তোমারি কৃপায়—
কেন এলে ফুলধন্বা! এ কি কুসুমের দেশ? এখানে যে মাটি-বন ক্ষুধায় অস্থির।

মাঠেতে দেখেছ ধান? হেমন্তের ফসলের তরঙ্গিত কালোচুলে পৃথিবী মসৃণ?
তুমি কি জান না চাঁদ: ও-ধানবনের পিছে কত দস্যু বণিকের পণ্যলোভী হাত
কাঁপিতেছে থর থর? চাষীর ললাট-লিপি আবারো বুঝি বা রিক্ত রুধির-রঙীন:
বাঁজা মাঠে সার দিয়ে বুঝি বা চলেছে ফের বুভুক্ষুর অধিযাত্রী সারা দিনরাত।

এখনো ও-পথে দেখো দিগন্ত-নদীর ধারে, পাহাড়ের কোলে কোলে গোরুর পাঁজর:
ভাঙা লাঙলের ফাল, চাষীর মাথার খুলি হা-হা ক'রে হাসিতেছে লক্ষ্মীজ্যোছ্‌নায়—
ফিরে যাও, ফিরে যাও—ওগো পূর্ণিমার নিশি—শ্মশানে পেতেছি মোরা তিমির-বাসর;
সে রাত্রে আবার এস যেদিন প্রভাতে মোরা জেলেছি আরেক সূর্য্য দেশের মাথায়।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

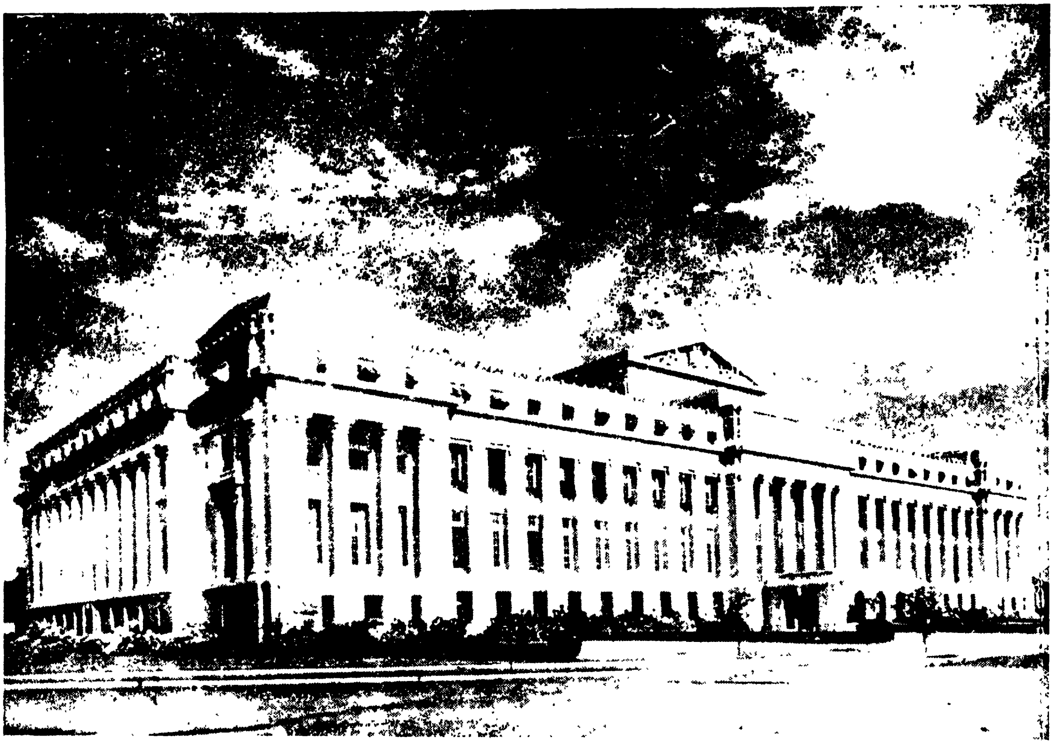


পুরীর পথে শ্রীচৈতন্য

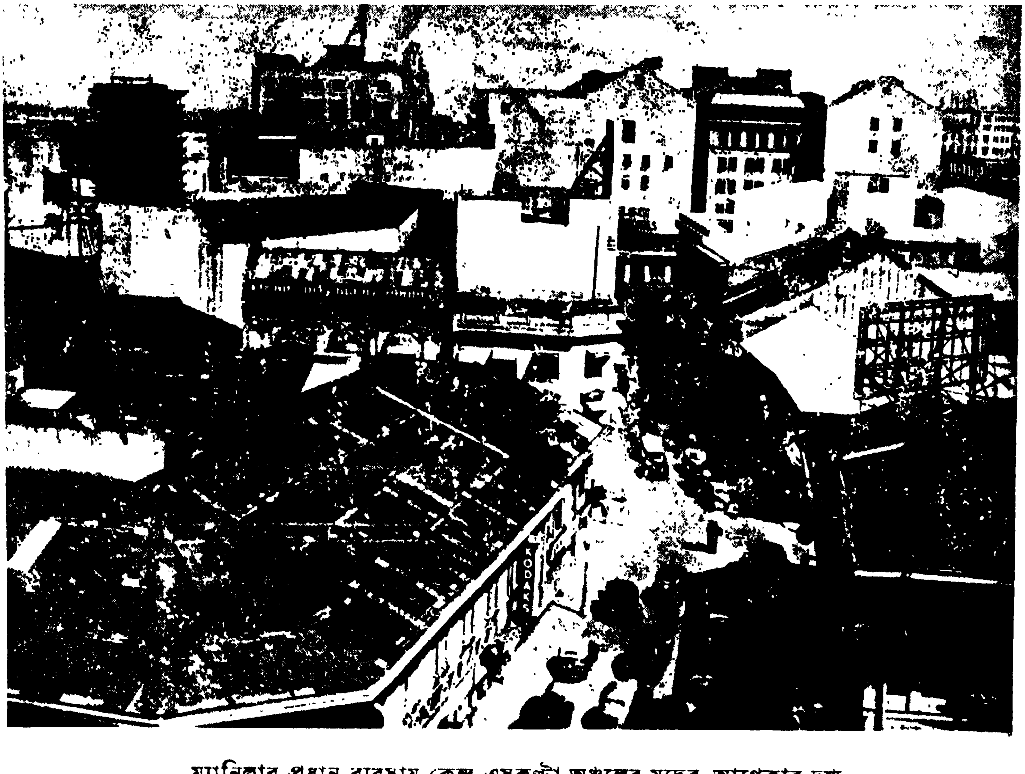
(বিদ্যাসাগর হল, মেদিনীপুর)

শ্রীখগেন রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার ব্যবস্থা-পরিষদের বিরাট্ ভবন



ম্যানিলার প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র এসকণ্টা অঞ্চলের যুদ্ধের আগেকার দৃশ্য

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৪শ ভাগ ২য় | চৈত্র, ১৩৫১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার বাজেট

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাংলার বাজেট দাখিল করা হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫-এ ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইয়াছে এবং ১৯৪৫-৪৬এ ৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বাজেটের মূল বইখানি ভাল করিয়া দেখিলে কি ভাবে করদাতাদের টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। অপচয় ও দল রাখিবার জন্য অনাবশ্যক চাকুরী সৃষ্টি করিয়া যে ঘুষ দেওয়া হইতেছে তাহার ব্যয় বাদ দিলে এই প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের মধ্যেও বাংলার আয়-ব্যয়ের সমতা নষ্ট হয় নাই, একটু অভিনিবেশ সহকারে বাজেটখানা পাঠ করিলেই তাহা ধরা পড়িবে।

১৯৪৫-৪৬-এ রাজস্ব হইতে মোট আয় হইবে ২৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং নবসৃষ্ট ফাঁপতি দপ্তরগুলি বাদ দিলে রাজস্ব খাতে ব্যয় দাঁড়ায় ২৭ কোটি। এ-আর-পি, সিভিল সাপ্লাই, ফসলবৃদ্ধি বিভাগ, নৌকা নির্মাণ প্রভৃতি বাবদ যে দশ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার একটিতেও দেশের উপকার হইতেছে একথা কোন বুদ্ধিমান লোকে স্বীকার করিবে না।

প্রথমেই ধরা যাক এ-আর-পি। বর্তমান মন্ত্রীদের রক্ষাকর্তা সাহেবদলই বলিয়াছেন যে উহার কোন প্রয়োজন আর নাই, বরং সৈন্যদের সুবিধার জন্যই অবিলম্বে উহা তুলিয়া দেওয়া উচিত। যুদ্ধের গতি যে ভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে জাপানের পক্ষে আর ভারত আক্রমণ অথবা কলিকাতায় ব্যাপক বোমা নিক্ষেপের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই বিভাগটি তুলিয়া দিলে আড়াই কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

তার পর সিভিল সাপ্লাই এবং রেশনিং। ইহাদের উভয়ের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ১ কোটি ২২ লক্ষ হিসাবে প্রায় আড়াই কোটি। সিভিল সাপ্লাইয়ের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা যেরূপ প্রতি বৎসর বাড়িতেছে উহার ব্যয়ভারও তেমনি ধাপে ধাপে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪-এ এই বিভাগের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। ১৯৪৪-৪৫-এ উহার জন্য প্রথমে বরাদ্দ হয় ৪০ লক্ষ ৩৬ হাজার, পরে উহা বাড়াইয়া সংশোধিত বাজেটে করা হয় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। এবার বরাদ্দ হইয়াছে ১ কোটি ২২ লক্ষ। অথচ এই তিন বৎসরে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ কয়লা, কাপড়, সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল প্রভৃতির কোন বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই। গত বৎসর দৈবের কল্যাণে অতি উৎকৃষ্ট ফসল হওয়ায় অন্নাভাব এবং ঔষধ আমদানীর ফলে ঔষধের অভাব কিছু কমিয়াছে, সিভিল সাপ্লাই বিভাগ ইহার জন্য বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব দাবি করিতে পারে না। এই বিভাগটি তুলিয়া দিলেও দেশের লাভ ছাড়া লোকসান হইবে না, লাঞ্ছিত দেশবাসীর ইহাই বদ্ধমূল ধারণা।

রেশনিং বিভাগটির অবশ্য খানিকটা কৃতিত্ব আছে কিন্তু উহারও ব্যয় অনাবশ্যক রূপে অধিক। উহার ১ কোটি ২২ লক্ষ বরাদ্দের মধ্যে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা ৭১ লক্ষ। বোম্বাইয়ের ন্যায় প্রতি মুদিখানার মারফৎ খাদ্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিলে, অর্থাৎ সরকারী দোকানের সংখ্যা কমাইলে এই বিপুল ব্যয়ের অধিকাংশই কমিয়া যাইত। কিন্তু বর্তমান গবর্মেণ্ট এ-আর-পি, সিভিল সাপ্লাই এবং রেশনিঙের চাকুরী-সংখ্যা হ্রাস করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে দল থাকিবে না। সুতরাং এই তিনটি বিভাগের জন্য করদাতাদের পাঁচ কোটি টাকা অপচয় হইবেই।

গত বৎসর হইতে একটি আশ্চর্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে নৌকা নির্মাণের জন্য। গত বার ইহার জন্য বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৩৮ লক্ষ। এবার হইয়াছে ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ। তন্মধ্যে এক কোটি টাকা জঙ্গলে কাঠ কিনিবার জন্য আগাম দেওয়া হইয়াছে। দৈনিক বসুমতী লিখিয়াছিলেন, সরকারী শিল্প-বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর মিঃ সতীশচন্দ্র মিত্রের উৎসাহে এবং একজন চেক ও একজন হাঙ্গেরিয়ান ইহুদীদের তত্ত্বাবধানে বাংলার বাহির হইতে আগত লোকদের দ্বারা এই নৌকা-নির্মাণ-পর্ব চলিতেছে এবং শিল্প-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সাহাবুদ্দীনের জঙ্গলে কাঠ খোঁজা হইতেছে। গত বৎসর ১০ হাজার নৌকা তৈরির কথা ছিল, তন্মধ্যে ১০খানিও তৈরি হইয়াছে কিনা সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। নৌকা অপসারণের সময় যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহার হিসাব ভারত-সরকার আজও আদায় করিতে পারেন নাই। নৌকা নির্মাণের আন্তরিক উদ্দেশ্য গবর্মেণ্টের থাকিলে তাঁহারা অন্য ভাবে উহা করিতে পারিতেন। মাঝিদের নৌকা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা

ঋণ দিলে এবং কাঠ আমদানীর সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলে নৌকা তৈরিও সহজ হইত, গ্রামবাসী ছুতার মিস্ত্রিরাও কাজ পাইত। ইহাতে বাংলার টাকা বাংলায় থাকিত, অপচয়ও কম হইত। এই ভাবে সহজ উপায়ে নৌকা তৈরির বন্দোবস্ত না করিয়া গবর্মেণ্টের পোষ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের হাতে এই পাঁচ কোটি টাকা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬৫ কোটি টাকার হিসাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ৬৫ কোটি টাকা দাবি করিয়া এক অতিরিক্ত বাজেট পেশ করা হইয়াছে। ধান চাউল গম আটা ময়দা লবণ প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে প্রধানতঃ এই টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, ইহার কতকাংশ আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে, কয়েক কোটি টাকা লোকসানও যাইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে-সব লোককে এক সঙ্গে সাধারণতঃ অযুত টাকার হিসাব রাখিতে হয় নাই তাঁহাদের হাতে করদাতাদের কোটি কোটি টাকা দিয়া যে ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছে তাহা শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। অতিরিক্ত বাজেট আলোচনার জন্য বিরোধী দল রাত্রি দশটা পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন চালাইতে চাহিয়াছিলেন, মন্ত্রীদল ইহাতে সম্মত হন নাই। স্পীকারও বিরোধীদলের এই অতিশয় ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবে মন্ত্রীদলকে রাজি করাইতে পারেন নাই। মন্ত্রীদল অপরাহ্ণ চারিটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী বসিতে সম্মত নহেন। তন্মধ্যে এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তরে এবং আরও কিছু সময় নমাজের জন্য বাদ যাইবে। সুতরাং এত অল্প সময়ে ৬৫ কোটি টাকার হিসাব আলোচনা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক বলিয়া বিরোধীদল পরিষদ-গৃহ ত্যাগ করেন। দুই মিনিটের মধ্যে অতঃপর বাজেট পাস হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীদলের, বিশেষতঃ মন্ত্রীদের, মনোভাব বিশেষ ভাবে সমালোচনার যোগ্য। মূল বাজেটে যে-সব বরাদ্দ মঞ্জুর হয় নাই সেরূপ বহু ব্যয় আজকাল মন্ত্রীরা বিনা মঞ্জুরীতে করিয়া চলিয়াছেন এবং বৎসরান্তে সেইসব ব্যয় করা টাকার হিসাব মেজরিটির জোরে পাস করাইয়া লইতেছেন। ব্যয়ের পূর্বে এবং ব্যয়ের পরে মঞ্জুরীতে যথেষ্ট তফাৎ আছে, মন্ত্রীরা ইহা জানেন না এ কথা মনে করা যায় না। মূল এবং সংশোধিত বাজেটের মধ্যেই আজকাল এত প্রচণ্ড তারতম্য দেখা যায় যে অতিরিক্ত বাজেট আরও নিন্দনীয়। ১৯৪৪-৪৫-এর মূল বাজেটে চাউল ক্রয়-বিক্রয়ে ১৭ কোটি টাকা যেখানে উদ্বৃত্ত থাকিবার কথা সেখানে ঐ বৎসরেরই সংশোধিত বাজেটে ২৬ কোটি টাকা এই বাবদে ঘাট্‌তি দেখানো হইয়াছে। গত বৎসর চাউলের বাজার মোটামুটি স্বাভাবিকই ছিল, কলিকাতায় চাউল বিক্রয়ে সরকার যথেষ্ট লাভও করিয়াছেন, তথাপি এই বিপুল ঘাট্‌তি ঘটিল কিসে?

মন্ত্রীদলের সদস্যদের বেতন ও ভাতা উভয়ই সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে। তৎসত্ত্বেও দুই তিন দিন মাত্র প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আড়াই ঘণ্টা বেশী বসিবার সময় তাঁহারা পাইলেন না কেন? এ-আর-পি, রেশনিং এবং সিভিল সাপ্লাইয়ের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের দ্বারা অনুগ্রহ বিতরণের সুযোগ হাতে থাকিতেও মন্ত্রীরা বাজেটের প্রকাশ্য আলোচনা চলিতে দিতে শঙ্কিত হইতেছেন ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। মন্ত্রীদলের ধারক ও পোষক শ্বেতাঙ্গদলের নেতাও বাজেটের সাধারণ আলোচনার সময় সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ব্যয়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কাপড়ের দুর্ভিক্ষ

সারা ভারতবর্ষে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং অবস্থা চরমে উঠিয়াছে বাংলা দেশে। এখানে বস্ত্রাভাবে নারী আত্মহত্যা করিয়াছেন এ সংবাদ ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র-দপ্তরেও পৌঁছিয়াছে এবং শ্মশান হইতে মৃতের গায়ের বস্ত্র খুলিয়া বাজারে বিক্রয় হইতেছে কর্পোরেশনে তাহারও আলোচনা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, প্রতিকার হয় নাই, প্রতিকারের কোন লক্ষণও দেখা যায় না।

কাপড়ের এই দুর্ভিক্ষ এক দিনে আসে নাই। মিলের কাপড় এবং সুতা উৎপাদন কমে নাই, তুলার ক্ষেতেও আগুন লাগে নাই, কোন কলে ধর্মঘটও হয় নাই। হঠাৎ বাজারের চাহিদাও এমন কিছু বাড়ে নাই যে সমস্ত কাপড় রাতারাতি বাজার হইতে উধাও হইয়া যাইবে। কাপড়ের এই দুর্ভিক্ষের অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, ভারত-সরকার দুই বৎসর যাবৎ মিলগুলিকে দিয়া জোর করিয়া স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরি করাইয়া উহা গুদামজাত করিতেছেন, ফলে মিহি কাপড় কম তৈরি হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের বাহিরে জোর করিয়া ভারত-সরকার কাপড় রপ্তানী করিতেছেন এবং মিলিটারীর জন্য অনেক কাপড় ভারতীয় মিল হইতে টানিয়া লইতেছেন। মিল মালিক এবং দেশবাসী উভয়েই এই রপ্তানীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন কিন্তু গবর্মেণ্ট কোন কথা শোনেন নাই। বিলাত হইতে এদেশে হুইস্কী আনিবার জন্য জাহাজে স্থান হইয়াছে কিন্তু সামরিক কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা গবর্মেণ্ট করেন নাই। তৃতীয়তঃ, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়গুলি সরকারের গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা বিতরণের সুবন্দোবস্ত করা হয় নাই এই অভিযোগ বার বার উঠিয়াছে। মিল-মালিকেরা বার-বার বলিয়াছেন যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় যদি বিলিই না হয় তবে অনর্থক উহা তৈরি করিয়া মিহি কাপড় তৈরি কমাইয়া লাভ কি? গবর্মেণ্ট উহাতেও কর্ণপাত করেন নাই। সাধারণ দোকান অথবা সমবায় সমিতির মারফৎ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিলির বন্দোবস্ত না করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকটি লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকান সাজাইয়াই তাঁহারা কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানো যাইত কিন্তু ইহার জন্য সুতা প্রয়োজন। তাঁতিদের সুতা সরবরাহের নামে সুতা কণ্ট্রোলে গবর্মেণ্ট অবতীর্ণ হইবার পর উহাও বাজার হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং তাঁতের কাপড়েরও উৎপাদন কমিয়া অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, বাংলার বাহিরে কাপড় প্রেরণের চোরাই কারবার। কয়েক মাস আগেই কথাটা উঠিয়াছিল কিন্তু উহাতেও গবর্মেণ্ট কান দেন নাই। চীন ও তিব্বতে বস্ত্র রপ্তানীর অভিযোগ বারবার উঠিয়াছে, গবর্মেণ্ট প্রতিবারই উহা অস্বীকার করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত জানা গিয়াছে তিব্বতে ভারত-সরকারের অনুমোদনক্রমেই কাপড় গিয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে সর বিঠল চন্দাবরকার বলিয়াছেন তিব্বতের

ভিতর দিয়া চীনে কাপড়ের চোরা কারবার পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। চীনে কাপড়ের গজ দশ টাকা পর্যন্ত।

ভারত-সরকার এই সব ব্যাপার জানিতেন না ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া জানিয়া লওয়া উচিত ছিল এবং তাঁহারা তাহা পারিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কাপড়ের দুর্ভিক্ষে ভারত-সরকার এবং বাংলা-সরকার উভয়েরই মনোভাব উদ্দেশ্য-শূন্য নহে বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে হায়দারী মিশন বিলাতে গিয়াছেন, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়-ওয়ালারা ভারতের বাজার ফিরিয়া পাইবার জন্য রব তুলিয়াছেন এবং ভারত-সরকারও স্বীকার করিয়াছেন বিলাত হইতে মিহি বস্ত্র আমদানীর আয়োজন হইতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা বে-বন্দোবস্ত বা bungling নয়, ইহার ভিতর দিয়া ব্রিটেন কর্তৃক ভারতের কাপড়ের বাজার পুনর্দখলের চেষ্টা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় ধরা পড়ে। বাংলায় ব্যাপারটা চরমে উঠিয়াছে, তাহার কারণ এখানে যে মন্ত্রীদল চাকুরীতে বহাল আছেন সাম্রাজ্য-বাদীর স্বার্থসাধনে ইঁহাদের সাহায্য অতিশয় সহজলভ্য এবং নির্ভরযোগ্য। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য যাঁহারা অর্ধ কোটি হিন্দু-মুসলমানের মৃত্যুতে বিচলিত হন নাই তাঁহারা বাকী সাড়ে পাঁচ কোটি বিবস্ত্র হইলেও হা-হুতাশ করিবেন না।

কাপড়ের চোরাবাজার ভাঙিবার জন্য ভারত-সরকার বা বাংলা-সরকার একবারও আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই। কিছু-দিন পূর্বে কোন কোন মিল-মালিক নিজস্ব দোকান খুলিয়া নির্দিষ্ট দরে কাপড় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ভারত-সরকার তাহার অনুমতি দেন নাই। বলাবাহুল্য, সমস্ত মিল একযোগে এই ভাবে নিজস্ব দোকানের মারফৎ কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে পাইকারী মুনাফাখোরদের অসুবিধা হইত, তাহারা সংযত হইত। ভারত-সরকার কেন এই অতি সঙ্গত প্রস্তাবে রাজি হন নাই তাহার কারণ আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য অনুসারে বুঝা কঠিন নয়।

দুর্ভিক্ষের জের

ন্যাশনাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউট রি-ইউনিয়নে সভাপতি ডাঃ অবনীমোহন গোস্বামী দুর্ভিক্ষের পর বাংলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা যেমন সত্য তেমনই মর্মন্তুদ। ডাঃ গোস্বামী বলিয়াছেন :

"এক বৎসরকাল বাংলা যে দুরবস্থার সহিত সংগ্রাম করি-তেছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাংলায় যে লোকক্ষয় হইয়াছে, তাহা মনে করিলে শঙ্কিত হইতে হয়। কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর পরে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাও ভয়াবহ। দীর্ঘকাল অনাহারের ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাবে গাছ পাতা প্রভৃতি আহার করিয়া উদরপূর্তি করায় দেশের জনগণের যে শারীরিক দুরবস্থা ঘটে তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে রোগ-প্রকোপ হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব এবং কাজেই দেশের ব্যাধির বিস্তার মহামারী হইয়া উঠে। আমরা শুনিতেছি, দুর্ভিক্ষে বাংলায় ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে আর ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ লোক শোচনীয় অবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাযাবররূপে ব্যাধি বিস্তার করি-তেছে—আপনারা দেখিতেছেন।

"দুর্ভিক্ষের পরে ম্যালেরিয়া, ক্ষত, বসন্ত ও রক্তামাশয় মহা-মারী হইয়া দেখা দিয়াছে। সরকার বাংলার ১৮টি জেলা ম্যালেরিয়া ও বসন্তের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে কোন কোন জেলায় শতকরা ৬২ জন লোক ম্যালে-রিয়ায় পীড়িত আর প্রায় শতকরা ৪৫ জন বসন্তে কাতর। ক্ষুধার ও অভাবের তাড়নায় দলে দলে স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি অব-লম্বন করিয়াছে এবং সেইজন্য যৌনব্যাধির বিস্তার ঘটিতেছে।"

সময় থাকিতে সতর্ক হইলে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী নিবারণ যে মোটেই কঠিন নয়, স্বয়ং ব্রিটেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এদেশে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের শাখা ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকার দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষের জের মহামারী কোনটিরই সম্বন্ধে যথাসময়ে সতর্ক হন নাই, পরে যথেষ্ট সময় পাইবার পরও মহামারী আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। UNRRA বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে অবতীর্ণ হইবার পরও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বা ভারত-সরকার কেহই বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নিবারণের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দুইয়েরই প্রধান কারণ যুদ্ধ।

ঔষধ প্রাপ্তির অসুবিধা

ঔষধ প্রাপ্তির অসুবিধা সম্বন্ধে ডাঃ গোস্বামী বলিয়াছেন :

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ঔষধ পাইবার পথ বিঘ্নাস্তৃত হইয়াছে। এ পর্যন্ত বাংলা-সরকার নাকি এক লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ছাড়িয়াছেন। কিন্তু কর্মীদের মতে, অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ কুইনাইন প্রয়োজন। আর প্রকৃত কুই-নাইন রোগীরা পায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।"

শুধু ডাঃ গোস্বামী নহেন, বর্ষাধিককাল পূর্বে মেজর জেনা-রেল ষ্টুয়ার্টও বলিয়াছিলেন :

(১) তিনি যে গৃহেই গিয়াছিলেন, সেই গৃহেই হয় লোক ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, নহে ত লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী অথচ (২) চিকিৎসার জন্য আবশ্যক কুইনাইন নাই। (৩) যে কুইনাইন পাওয়া গিয়াছে, তাহাও ভেজাল মিশ্রিত—সুতরাং তাহাতে কাজ হয় না। (৪) আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন প্রযুক্ত না হওয়ায় রোগীরা পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া ভোগ করে।

কুইনাইন ভিন্ন আমাশয়ের ঔষধের অভাবের কথাও মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও ঔষধের অভাবের কথা জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বাস্থ্য-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ টাইসন বিভিন্ন প্রদেশে সর্ববিধ কারণে মৃত্যুর যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ১৯৪৩-এ বাংলায় মোট ১৮,৭৩,৭৪৯ জন ও ১৯৪৪-এ ১২,৭৯,২৮৪ জন মারা গিয়াছে। ১৯৪৩ হইতে সরকারী হিসাবানুসারে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ বাদ দিলে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুসংখ্যা হয় প্রায় ১২ লক্ষ। পর বৎসর এই সংখ্যা কমা দূরে থাকুক, আরও বাড়িয়াছে। অন্য প্রত্যেকটি প্রদেশে ১৯৪৩ অপেক্ষা ১৯৪৪-এ অনেক কম

অক্ষমতা ভিন্ন এই ভয়াবহ মৃত্যুহারের অপর কোন কারণ আছে বলিয়া কোন বুদ্ধিমান লোক বিশ্বাস করিবে না।

আমেরিকায় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আমেরিকায় যে-সব বক্তৃতা করিয়াছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাহা মনঃপূত হয় নাই। কেহ কেহ ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে "আপদ" (menace) আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সত্যের উজ্জ্বল আলোকে ষড়যন্ত্রকারীর গুপ্তচক্রান্ত ধরা পড়িলে ক্রোধে শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করাই স্বাভাবিক। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর মর্য্যাদা ইহাতে কমে নাই।

"ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ কারাগার-বিশেষ"—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর এই উক্তিটিতে যেন সাম্রাজ্যবাদী মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথচ উহার প্রতিটি অক্ষর পর্যন্ত সত্য। ভারত-রক্ষা আইনের কল্যাণে বর্তমানে ভারতবাসীর স্বাধীনতা বলিয়া কোন বস্তু নাই, কারাগারের ভিতরে এবং বাহিরে দেশবাসীর জীবনযাত্রায় কোন পার্থক্য আজ আর নাই। পুলিসের গুপ্তচরের রিপোর্টে বিনাবিচারে আটকের যে দরাজ বন্দোবস্ত ভারত-রক্ষা আইনে করা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মানুষকে নিয়ত সশঙ্কিত থাকিতে হয়। কাহাকে কখন ধরিয়া জেলে পাঠানো হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতাও গিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে গ্রামশুদ্ধ লোককে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে বাস্তুভিটা ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে। শত শত বিধিনিষেধের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পক্ষেত্রে নবাগত ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পত্রালাপে গোপনীয়তা বলিয়া কোন বস্তু আর অবশিষ্ট নাই, সাধারণ নাগরিকের পত্রও আজকাল বন্দীর পত্রেরই স্থায় সেন্সর হয়। বন্দীশালা হইতে সরকারী সেন্সরের অনুমতি ভিন্ন জেলের বাহিরে সংবাদ প্রেরণ যেমন অসম্ভব, ভারতবর্ষ হইতেও তেমনি বাহিরে অতি গুরুতর সংবাদ প্রেরণও সাধ্যাতীত। গত দুর্ভিক্ষে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে, পরে পার্লামেণ্টেও ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছে। বন্দীকে যেমন সরকারী কণ্ট্রাক্টারের প্রদত্ত খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য নির্বিচারে গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি রেশনিঙের কল্যাণে জেলের বাহিরের লোককেও সরকারী দোকান হইতে প্রদত্ত অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণে বাধ্য হইতে হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে মানুষের যে-সকল অধিকার বুঝায়, সে সর্ববিধ অধিকারই আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে সর্বগ্রাসী সর্বব্যাপী ভারত-রক্ষা আইনের চাপে। ভারতবর্ষ আজ একটি বৃহৎ কারাগারে পরিণত হইয়াছে এই উক্তি অসত্য তো নহেই, অত্যুক্তিও নয়।

ভারতবর্ষে ধর্মবিরোধ

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর আর একটি কথাতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মহলে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে ধর্মবিরোধ বলিতে যাহা বুঝায় ভারতবর্ষে তাহা নাই। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অসম্ভব মনে হইলেও একটু চিন্তা করিলেই উহার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। প্রায় সাত শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ পাশাপাশি বাস করিয়াছে, একই সঙ্গে চাষবাস করিয়াছে, পরস্পরের উৎসবে যোগদান করিয়াছে। ধর্ম ভিন্ন হইলেও উভয়ের ভাষা ও সাহিত্য ছিল এক, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতিও অনেকাংশে একরূপ ছিল। ব্রিটিশ আগমনের সময় বাংলাদেশেও আমরা ইহার প্রমাণ পাই। ঔরঙ্গজেবের স্থায় দুর্ধর্ষ সম্রাটের আমলেও হিন্দু মুসলমানের মিলন নষ্ট হয় নাই। আরাকানের মুসলমান রাজসভার মুসলমান কবি আলাওল রাজপুতানার পদ্মিনীর উপাখ্যান লইয়া রচিত হিন্দী কাব্যের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। সে বাংলা বর্তমান উর্দ্দু-কণ্টকিত খিচুড়ী ভাষা নয়, খাঁটি বাংলা। বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণব গীতিকাব্যের অনুকরণে পদাবলী রচনা করিয়াছেন। হিন্দু কবির কাব্যেও বহুস্থলে কোরানের উল্লেখ রহিয়াছে। হিন্দুর পার্বণে মুসলমান এবং মুসলমানের পর্বে হিন্দুর যোগদান নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

ভারতে হিন্দু-মুসলমানে রেষারেষি সম্পূর্ণ রূপে বৃটিশ কূটনীতির ফল। প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ১৯০৪ সালে। চক্রান্তকারীদের প্রথম ধুয়া ছিল মসজিদের সামনে বাজনা এবং গো-কোরবানী। এই দুটি পুরানো হইয়া আসিলে নূতন ধুয়া উঠিল চাকুরী ও ব্যবস্থা-পরিষদ, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির আসন ভাগাভাগি লইয়া। সেগুলিও পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এখন শেষ ধুয়া উঠিয়াছে পাকিস্থান। ধর্মের পার্থক্য ভারতবর্ষের কোন যুগে কোন কালেও নাগরিক অধিকার হরণের হেতু হয় নাই। সভ্য ইংলণ্ডে প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম রাজধর্ম হইবার পর রোমান ক্যাথলিকদের সর্ববিধ নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পর্যন্ত তাহাদের ছিল না। গত শতাব্দীর শেষভাগে মাত্র আইন প্রণয়ন করিয়া খ্রীষ্টান ব্রিটেনে খ্রীষ্টধর্মেরই একটি শাখার অনুবর্তী ব্যক্তিগণকে নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। ধর্মবিরোধ বলিতে ইউরোপে যাহা বুঝায় ভারতবর্ষে কোনদিনই তাহা ছিল না।

ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলমান

আহমদাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষে যত জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন গান্ধীজী তাঁহাদের একটি তালিকা রচনার ভার ডাঃ সৈয়দ মামুদের উপর দিয়াছেন। ডাঃ মামুদ সমস্ত প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদী মুসলমান কর্মীকে এরূপ নাম পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বাদ দিয়া এবং তাঁহাদিগকে না জানাইয়া লীগের সহিত বারবার একতরফা চুক্তি করিবার চেষ্টার দ্বারা কংগ্রেস প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ। রাজাজীর ফরমুলা সমর্থন করিয়া গান্ধীজী নিজেও যে ভাবে লীগের সহিত মিলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং প্রকারান্তরে পাকিস্থান পর্যন্ত যে ভাবে মানিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃবৃন্দের প্রতি প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অনাস্থা আসা স্বাভাবিক। সাম্প্রদায়িক নীতির দিক দিয়া কংগ্রেস আজ পর্যন্ত একটি বারের জন্যও দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন নাই। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ তাঁহারা করেন নাই। মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিধ্বস্ত হইবার পর কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ বাংলায় মৌলবী ফজলুল হকের

সহিত কংগ্রেসের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি দিলে বাংলায় লীগ আর মাথা তুলিবার অবকাশ পাইত কি না সন্দেহ। আসাম ও সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস কোয়ালিশন গঠনের অনুমতি শেষ পর্যন্ত দেওয়াই হইয়াছে, বাংলার বেলায় গোড়াতেই তাহা দিলে আজ ভারতীয় রাজনীতির গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারিত। তারপর পঞ্জাবের ঘটনার পর মিঃ জিন্নার প্রভাব যখন কঠিন আঘাতে বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম, ঠিক সেই সময়ে গান্ধিজী স্বয়ং তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া লীগের লুপ্ত প্রতিপত্তি ফিরাইয়া তো দিলেনই, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরও কংগ্রেসের বিচারবুদ্ধিতে সন্দিহান করিয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহা এক মর্মন্তুদ ঘটনা। সীমান্ত, সিন্ধু ও পঞ্জাবে লীগের অবস্থা টলটলায়মান হইবার পরও দেশাই-লিয়াকৎ আলোচনা চলিতেছে, ইহাতে মনে হয়, কংগ্রেসের লীগতোষণ নীতিই আজও অব্যাহত রহিয়াছে। ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের স্থান সম্বন্ধে কংগ্রেস আগে নিজের মনের ভাব ঠিক করিয়া না লইলে এবং লীগের পশ্চাতে মরীচিকার ন্যায় ছুটাছুটি হইতে নিবৃত্ত না হইলে শুধু তাঁহাদের সংখ্যা গণনায় কোন ফল হইবে না। ইহারা নাম দিতেও হয়ত কুণ্ঠিত হইবেন।

আসামে লীগ মন্ত্রীসভা কর্তৃক মুসলমানের লাঞ্ছনা

কিছুদিন যাবৎ আসামে বাংলার মুসলমানেরা গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের আগমন বন্ধ করিবার জন্য আসামে লাইন-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সীমানার পর ইহাদিগকে যাইতে দেওয়া হইত না। বাংলায় জমির তুলনায় লোকসংখ্যা অধিক, আসামে কম। সুতরাং বাংলার বাড়্‌তি লোক পার্শ্ববর্তী প্রদেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত কিনা তাহা একটি মূলনীতিঘটিত প্রশ্ন। ভারতবাসী যেখানে আমেরিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় অবাধ বসবাসের অধিকার দাবি করিতেছে সেখানে বাংলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশে বাঙালীর প্রবেশে বাধানিষেধ আরোপণ কোন্ যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য হয় তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। নবাগতের প্রায় অধিকাংশই মুসলমান এই যুক্তিও আমাদের মতে গুরুত্বপূর্ণ নহে, তাহারাও মানুষ, তাহারাও ভারতীয়। আসামের লীগ মন্ত্রিমণ্ডল গত দুর্ভিক্ষের সময় বাংলা হইতে যাহারা সেখানে গিয়াছিল সেইসব আশ্রয়প্রার্থী বুভুক্ষু মুসলমানের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার ও লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যে নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাদিগকে আসাম হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, মুসলমান সমাজ তাহা এত শীঘ্র ভুলিতে পারিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। আসাম-প্রবাসী মুসলমানদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে মৌলবী ফজলুল হক যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় লীগ মন্ত্রীসভা প্রয়োজন হইলে মুসলমানের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে পারে এবং মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্না স্থাণুর ন্যায় উহা দর্শন করিতে পারেন। মৌলবী ফজলুল হক লিখিয়াছেন :

"বাংলা হইতে যাহারা আসামে গিয়া বসবাস করিতেছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে আসাম প্রাদেশিক মসলেম লীগের সভাপতি তারযোগে আমার নিকট এক ভয়াবহ অবস্থার সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, উহাদিগের মধ্যে যাহারা লাইন-প্রথা লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহাদিগকে কেবল মারপিট ও গুলি করা হয় নাই, তাহাদিগের ঘরবাড়ী ধ্বংস, ফসল নষ্ট, মসজিদ ভগ্ন এবং পবিত্র কোরানও পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। আসামের লীগ-সচিবসঙ্ঘ বাংলা হইতে আগতদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করার মনোভাব পোষণ করেন বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু বাংলার যাহারা আসামে গিয়া বসবাস করিতেছে, তাহাদিগের অধিকার রক্ষার নিমিত্ত বাংলার সচিবসঙ্ঘের দণ্ডায়মান হওয়া অবশ্য কর্তব্য।"

আসাম লোকালবোর্ড আইন

আসামের প্রধানমন্ত্রী সর্ মহম্মদ সাদুল্লা সেখানে লীগ প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সুরু করিয়াছেন। যুদ্ধ থামিলেই অনুগ্রহ বিতরণের প্রধান ক্ষেত্র সিভিল সাপ্লাই বন্ধ হইবে, তখন ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে আসনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া দলের লোককে দু'পয়সা পাওয়াইয়া দিবার ব্যবস্থা না করিলে দল রাখা কঠিন হইবে ইহা তিনি বুঝিয়াছেন এবং তার জন্য আগে হইতেই আটঘাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান কীর্তি আসাম স্বায়ত্তশাসন আইন পরিবর্তন। এই আইনে তিনি নিয়োক্ত নূতন বিধানগুলি প্রবর্তন করিয়াছেন :

(১) প্রত্যেক বোর্ডে মোট আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। (২) নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। (৩) মনোনীত সদস্য সম্পর্কে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আপাত দৃষ্টিতে প্রথম দুইটি ব্যবস্থা নিরীহ বলিয়া মনে হইলেও উহার মধ্যে বড় রকমের চাল আছে। প্রদেশের জনসাধারণের কল্যাণার্থে উপরোক্ত বিধানগুলি প্রবর্তিত হইয়া থাকিলে কাহারও অভিযোগের সঙ্গত কারণ থাকিত না। আসনের সংখ্যাবৃদ্ধি কি কারণে করিতে হইয়াছে, একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা দৈনিক বসুমতী তাহা ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন :

"প্রথমে আসনের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরা যাউক। মূলতঃ মুসলমানদিগকে আরও অধিক সংখ্যায় স্থান প্রদানের উদ্দেশ্যেই যে আসনের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ঘটিয়াছে, তাহা একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বোধগম্য হইবে। উত্তর শ্রীহট্ট লোকাল বোর্ডের নবসৃষ্ট ৭টি আসনের ৬টিই মুসলমানদিগের জন্য। দক্ষিণ শ্রীহট্টে ৪টি আসনের ৩টি, করিমগঞ্জে ৪টি আসনের ৪টিই, সুনামগঞ্জে ৮টি আসনের ৮টিই মুসলমানদিগকে প্রদান করা হইয়াছে।

হবিগঞ্জের ব্যবস্থা দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা প্রতিভাত হইবে।—

হবিগঞ্জ লোকাল বোর্ডে বর্তমানে আছেন—

হিন্দু	১০ জন
মুসলমান	১১ "
য়ুরোপীয়	৪ "
মনোনীত (হিন্দু একজন, মুসলমান ২ জন)	৩ জন
মোট	২৮ জন

ইহাতে ১১ জন হিন্দু য়ুরোপীয়দিগের সমর্থন পাইলে মুসলমানদিগকে পরাভূত করিতে পারেন।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় হইবে—

হিন্দু	১০ জন (৭ জন বর্ণ হিন্দু, ৩ জন তপশিলী)
মুসলমান	১৭ জন
য়ুরোপীয়	৪ জন
	মোট ৩১ জন

হিন্দুদিগকে বিভক্ত করা হইতেছে ; আর সকল হিন্দু ও য়ুরোপীয় একযোগে কাজ করিলেও মুসলমানদিগের সমকক্ষ হইবেন না।"

ইহার পর বসুমতী মন্তব্য করিতেছেন :

"সর সাহুল্লা লোকাল বোর্ডগুলিতে মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য ঘটাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; হিন্দু সদস্যদিগের সংহতি ভাঙিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে দুর্বল করিবার জন্য হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীকে বর্ণ হিন্দু, তপশিলী হিন্দু ও পার্বত্য হিন্দু—এই ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। হিন্দুদিগকে দুর্বল করাই নির্বাচকমণ্ডলের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের মধ্যে ভাঙন সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তপশিলী ও পার্বত্য হিন্দুদিগের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসনের টোপও ফেলা হইয়াছে। কিন্তু সর সাহুল্লা মুসলমানদিগকে লোকাল বোর্ডগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করিয়া এবং নির্বাচকমণ্ডলের সংখ্যাবৃদ্ধির নামে হিন্দুদিগের সংহতি নাশ করিয়াও আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই। সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় একত্রিত হইয়াও যাহাতে মুসলমানদিগকে পরাভূত না করিতে পারে, সেজন্য আসাম স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করিয়া লীগভুক্ত প্রধান-সচিব মুসলমানদিগের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে আইনের নির্দেশ, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা থাকিবে। সর সাহুল্লা আসন বণ্টনে মুসলমানদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠরূপে ধরিয়াছেন, কিন্তু সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে তাঁহাদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠের শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। মুসলমানরা আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠ, না সংখ্যালঘিষ্ঠ ? সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে সাহুল্লা সচিবসঙ্ঘ যেমন আইনের বিধান অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তেমনই আইনের বিধান পালন করিতে গেলে মুসলমানরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ হইলেও অধিকসংখ্যক আসন দাবি করিতে পারেন না। কারণ, আসন বণ্টনে কেবল লোকসংখ্যাই বিবেচ্য। আসাম স্বায়ত্ত-শাসন আইনের নির্দেশ,—'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যা নিরূপণের সময় স্থানীয় সরকারকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা, অধ্যুষিত স্থানের এবং প্রদত্ত স্থানীয় করের ও ট্যাক্সের পরিমাণও বিবেচনা করিতে হইবে।' শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন মহকুমায় অমুসলমান সম্প্রদায় স্থানীয় করের শতকরা ৬০ হইতে ৮০ ভাগ প্রদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ রাজস্বের অধিকাংশই অমুসলমানগণ যোগাইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ জেলায় লোকাল বোর্ডের আসনগুলির অধিকাংশই মুসলমানদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। অথচ চা-কর সম্প্রদায়ের প্রতি এইরূপ বৈষম্য প্রদর্শিত হয় নাই। হিন্দুদিগকে যে ভাবে ত্রিধা বিভক্ত করা হইয়াছে, সে ভাবে চা-করদিগকে ভারতীয় ও ইউরোপীয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা কিম্বা তাঁহাদিগকে দেয় স্থানীয় কর ইত্যাদির অনুপাতে তাঁহাদিগের প্রাপ্য আসনসংখ্যায় তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হয় নাই।"

আসামকে মুসলমানপ্রধান প্রদেশরূপে দাবি করিয়া তাহাকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। অথচ কোন হিসাবেই আসাম মুসলমানপ্রধান নহে। ১৯৪১-এর সেন্সসে হিন্দুর সংখ্যা হইতে ১৫ লক্ষ বাহির করিয়া লইয়া উহাকে পৃথকভাবে পার্বত্য জাতির মধ্যে ঢোকান হইয়াছে ; ফলে হিন্দুর সংখ্যা ৪২ লক্ষ, পার্বত্য জাতি ২৫ লক্ষ এবং মুসলমান ৩৪ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩১-এর সেন্সসে পার্বত্য জাতির সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। ১৯৩১-এর গণনা-পদ্ধতি অনুসৃত হইলে ১৯৪১-এ হিন্দুর সংখ্যা হইত ৫৭ লক্ষ। নিছক সেন্সসের ঘর পূরণের কারচুপির দ্বারা আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সংখ্যাধিক্য নষ্ট হইয়াছে।

১৯৪১-এর সেন্সস অনুসারেও আসামকে মুসলমানপ্রধান প্রদেশ বলা যায় না।

বিদেশী বিশেষজ্ঞদের জন্য করদাতাদের সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়

ইউনাইটেড প্রেস অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে যুদ্ধারম্ভের পর হইতে ভারতের বাহির হইতে নিমন্ত্রিত কয়েক ব্যক্তি ও ১৩টি বিশেষজ্ঞ মিশনের জন্য ভারতীয় রাজকোষ হইতে সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিভিন্ন সামরিক মিশন ও সামরিক বিশেষজ্ঞগণের ভারতে আগমনের জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে এই হিসাবে তাহা ধরা নাই। উহার মধ্যে থাই (শ্যাম) শুভেচ্ছা মিশনের জন্য ১৫ হাজার টাকা, চীনা শিক্ষা মিশন ৩৩ হাজার টাকার অধিক ; পারসিক সাংস্কৃতিক মিশন ১৫ হাজার টাকা, তুর্কী সাংবাদিক মিশন ৬৮ হাজার টাকা, ইঙ্গ-মার্কিন বন্দর ও জাহাজী মিশন ১০ হাজার টাকা, ফার্টিলাইজার টেকনিক্যাল মিশন ১৯ হাজার টাকার অধিক ও সরবরাহ বিভাগীয় মিশনের জন্য প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইক্ষুবিশেষজ্ঞের জন্য ৬০ হাজার টাকা, রেশন এডভাইসরের জন্য ৪৭ হাজার টাকা ও যন্ত্রপাতি মিশনের জন্য ৬২ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বিশেষ ব্যক্তিগণের মধ্যে অধ্যাপক এইচ, ভি, হিলের জন্য ১৭ হাজার টাকা এবং সর হেনরী ফ্রেঞ্চের জন্য ১২ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

বিদেশী মিশনগুলির মধ্যে তুর্কী সাংবাদিক মিশনের প্রতিদানের সংবাদ আমরা জানি। ফার্টিলাইজার মিশন ও সরবরাহ বিভাগীয় মিশনগুলির সুপারিশও ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল হয় নাই। এডভাইসরদের কার্য্যকলাপেও আমাদের কোন লাভ এখনও দেখা যায় নাই। বিদেশী 'বিশেষজ্ঞের' নিকট দেশের স্বার্থবিরোধী পরামর্শ ক্রয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় বোধ হয় একমাত্র পরাধীন দেশেই সম্ভব।

সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার সমর্থন

রাও কমিটি কলিকাতায় আসিয়া প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য লেডী অবলা বসু কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহাদের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর বাণীভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকারূপে নিরাশ্রয়া বিধবাদের সম্বন্ধে লেডী বসু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার ফলে তিনি সম্পত্তিতে নারীর স্বত্বাধিকার একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। লেডী বসু লিখিয়াছেন; "বর্তমানে যেভাবে হিন্দু আইন প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইতে কোনও প্রতিকার পাওয়া হতভাগ্য ও দুঃখ-দুর্দশা-গ্রস্ত বহু রমণীর পক্ষে অসম্ভব। ইহার ফলে তাঁহারা পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। এইরূপ শোচনীয় ও বেদনাদায়ক অবস্থা হইতে বিধবাদিগকে রক্ষা করার ও আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে গত ১৯১৯ সালে 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' প্রতিষ্ঠা করা আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। এই প্রতিষ্ঠানে বিধবাদিগকে বিনা খরচায় গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁহারা যাহাতে জীবিকার্জন করিতে পারেন এবং আত্মমর্যাদা পুনঃপ্রাপ্ত হন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। বিধবাগণের কোনও অর্থ-সামর্থ্য থাকে না বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ দুরবস্থায় পতিত হন। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, এই সকল বিধবা যখনই উপার্জন করিতে সমর্থ হন তখনই তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন তাঁহাদের সন্ধান করিতে থাকেন।

"বিদ্যাসাগর বাণীভবনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এযাবৎ আমরা ৫৮০০ জন স্ত্রীলোককে শিক্ষাদান করিয়াছি। তাঁহারা অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সমাজে আত্মসম্মান-শীল সদস্য মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। আইন তাঁহাদিগকে যে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল তাঁহারা সেই সমাজেই পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিধবা এবং নাবালিকা; তাঁহারা সকলেই নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা শ্বশুরগৃহ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, পিতৃগৃহে থাকিবার কোনও দাবি তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং আমার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, হিন্দু আইনে কন্যার উত্তরাধিকারিত্বের এবং সম্পত্তিতে বিধবার নির্ব্যূঢ় অধিকারের বিধান থাকা আবশ্যক। পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁহাদের অধিকার স্বীকৃত হইলে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার কতকটা প্রতিকার হওয়া সম্ভব হইবে। এতৎপক্ষে যুক্তি এই যে, দায়ভাগ অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকার উইল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এবং সম্পত্তিতে পুত্রবধূর দাবি উইলবলে বাতিল হইতে পারে। কন্যার স্বাভাবিক অধিকার স্বীকৃত হইলে সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

"বাংলাদেশে এবং অন্যান্য স্থানে এমন শত শত উদাহরণ আছে যেখানে স্বামী পুনরায় বিবাহ করায় অথবা স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী কোনরূপ প্রতিকার পাইতেছে না।

"বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশের নারীগণ সবকিছু নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কালের অগ্রগতি ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজ তাঁহারা তাঁহাদের অসূর্যম্পশ্যা অবস্থা কাটাইয়া ঘরের বাহিরে আসিতেছেন এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের স্বার্থে নিষ্ঠুর জগতে যাবতীয় সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন। যৌথ পরিবারের কথা এখন আর বলিয়া কোন লাভ নাই, কেননা সর্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছে।"

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন,

"বর্তমান হিন্দু আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত নহে। কিন্তু এই সেদিন কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ এজলী স্বামীর ক্লীবত্বের অজুহাতে পত্নীর আবেদন অনুসারে শাস্ত্রীয় বিধানে অনুষ্ঠিত বিবাহ বাতিল করিয়া দিয়াছেন। স্বামীর পক্ষ হইতে ইহাতে কোনো আপত্তি হয় নাই, নিষ্ঠাবান সমাজ হইতেও এ পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ উঠে নাই। বিচারপতি মিঃ এজলীর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অব্যাহত রহিয়াছে এবং অন্ততঃ উল্লিখিত অজুহাতে শাস্ত্রীয় বিবাহ বাতিল করিবার সমর্থনে নজির হইয়া আছে। 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ' বলিয়া যে পরাশর-বচনের উপর নির্ভর করিয়া বিচারপতি মিঃ এজলী উল্লিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্য বিদ্যা-সাগর মহাশয়ও উহারই উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। বিশেষত্ব এই যে, শাস্ত্রীয় এই প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আইন প্রণয়ন করাইতে হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রবল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আর আজ মাত্র সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই বিনা আইন প্রণয়নে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার-পতি মিঃ এজলী হিন্দু বিবাহ-ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও আপত্তি বা প্রতিবাদ হয় নাই। যাহা বিধানে থাকিলেও কালক্রমে বা পরবর্তী বিধানে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহার পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইলেও যে বিশেষ আইনের প্রয়োজন এ প্রশ্নও কেহ উত্থাপন করেন নাই।

প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের বিরুদ্ধে গোঁড়া সনাতনীদের প্রতি-বাদের অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু হিন্দু নারীর দাসীত্ব মোচনের চেষ্টায় হিন্দুনারীর বিরোধিতা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। সুখের বিষয়, রাও কমিটির সম্মুখে যে-সব মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই বিল সমর্থন করিয়াছেন।"

ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীর বিরুদ্ধে নারীধর্ষণের অভিযোগ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী নিম্ন-লিখিত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন:

"এই ঘটনাটির প্রতি সামরিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল কি না—গত ৩১শে অক্টোবর ব্রিটিশ নৌ-বহরের অন্তর্ভুক্ত ২ জন ব্রিটিশ কর্মচারী হাওড়ায় একটি বাড়িতে কোন প্রকারে প্রবেশ করে এবং ২০ বৎসর বয়স্কা এক যুবতী যে কোঠায় শয়ন করিয়াছিলেন, উহার দরজা ভাঙিয়া ভিতরে যায়। ঘটনার কিছুকাল পূর্বে তিনি একটি সন্তান প্রসব করিয়া-

ছিলেন এবং তদবধি রোগে ভুগিতেছিলেন। পূর্বোক্ত ব্রিটিশ কর্মচারী দুইটি পর পর যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং ইহার ফলে তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। তাঁহাকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় প্রায় একমাস কাল তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল।

উত্তরে সমর-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ত্রিবেদী বলেন: প্রশ্নকর্তা সদস্য ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা ঠিক ঐরূপ কিনা সে সম্পর্কে তিনি বলিতে অসমর্থ। বিষয়টি এখন বিচারাধীন। নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে সামরিক পুলিসের বিশেষ তদন্ত শাখা ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করে এবং সংশ্লিষ্ট দুই ব্যক্তিকে নৌ-কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করিয়া রাখেন। মামলাটি পরে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় বিবাদীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৮ ধারা (রাত্রিকালে অসৎ উদ্দেশ্যে গৃহে অনধিকার প্রবেশ) এবং ৩৭৬ ধারা (পাশবিক অত্যাচার) মতে চার্জ গঠন করিয়া বিচারার্থ তাহাদিগকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী ঐ সঙ্গে আরও একটি কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ১৯৪৪-এর আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত বাংলায় ও আসামে সৈন্যগণ কর্তৃক নারীর উপর অত্যাচার মোট কতগুলি হইয়াছে? উত্তরে মিঃ ত্রিবেদী জানান যে, মোট একাত্তরটি এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এই একাত্তরটি ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দুর্বৃত্তদের মধ্যে কয়জনের শাস্তি হইয়াছে মিঃ আবদুল কায়ুম তাহা জানিতে চাহিলে মিঃ ত্রিবেদী বলেন তিনি পরে উহা জানাইবেন।

ইতিমধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদেও সশস্ত্র সৈন্য কর্তৃক বলপূর্বক লোকের ঘরে প্রবেশ এবং নারীর উপর উপদ্রব সম্বন্ধে অভিযোগ উঠে এবং স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা সর নাজিমুদ্দীনের নিকট তাহার বিবরণ চাওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়া বলেন কোন ক্ষেত্রে সৈন্যেরা সম্ভ্রান্ত নারীর উপর উপদ্রব করে নাই। তাঁহার এই উক্তির তিন মাসের অধিককাল পূর্বে হাওড়ার ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ঠিক ঐ দিনই অভিযুক্ত সৈন্যদ্বয় বিচারার্থ সেসন আদালতে প্রেরিত হইয়াছিল। মামলা বিচারাধীন, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমরা করিব না। কিন্তু স্বরাষ্ট্রসচিবের জবাবের কঠোর সমালোচনা হইবেই। উক্ত ঘটনার সংবাদ না-জানা তাঁহার পক্ষে যেমন গুরুতর কর্তব্যচ্যুতির পরিচয়, জানিয়া-শুনিয়া উহা চাপিবার চেষ্টাও তেমনই অন্যায়। ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র-দপ্তর এই ঘটনা জানিতেন এবং উহা প্রকাশ করাও তাঁহারা ভারত-রক্ষাবিরোধী কার্য বলিয়া মনে করেন নাই।

চব্বিশ পরগণা জেলা শিক্ষক-সম্মেলন

চব্বিশ পরগণা জেলা শিক্ষক-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে শুধু শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগের আলোচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষার আদর্শের কথা যে ভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন বোধ হয় তাহার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষকতা আজকাল চাকুরিতে পরিণত হইয়াছে, শিক্ষকের প্রধান ব্রত বিদ্যাদান ইহা যেন অধিকাংশ শিক্ষকই ভুলিয়া গিয়াছেন। অভাব-অভিযোগ তাঁহাদের অত্যন্ত তীব্র ইহা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তাঁহারা ভুলিতে বসিয়াছেন যে কর্তব্যে অবহেলা করিলে তাঁহাদের অবস্থা ভাল হইবে না। পরন্তু শত অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও নিষ্ঠার সহিত বিদ্যাদান করিতে থাকিলে যত দ্রুত তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশে প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদল গড়িয়া উঠিবে, ততই দেশের স্বাধীনতা ও তাঁহাদের মুক্তির দিন নিকটবর্তী হইবে। ত্যাগ স্বীকার ইঁহাদের আজও করিতেই হইতেছে কিন্তু নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্য পালন করিলেই এই ত্যাগ সার্থক হইবে, দেশেরও প্রকৃত কল্যাণ হইবে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ভারতীয় শিক্ষার আদর্শের সহিত গ্রীক আদর্শের তুলনা করিয়া বলেন, "যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে সে-ই একমাত্র বিদ্যা। এ বিদ্যার্জন করিতে হইলে বহু বিধিনিষেধের অনুজ্ঞা শিরোধার্য করিতে হয়। এই বিধিনিষেধের যে জীবন তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবে ও ব্রহ্মচর্য তাহার আদিম পদ্ধতি। সংযমই এই ব্রহ্মচর্যের বাহ্য রূপ।"

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে বাংলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের মৃত্যু বাঙালীর দুঃখের বিষয়। তিনি তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরীর সহযোগিতায় বাংলায় বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল যখন বন্ধ হইবার উপক্রম হয় তখন ইঁহারা দুই জনেই উহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া মিলটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আসামের মোটর কোম্পানী, বঙ্গলক্ষ্মী সাবানের কারখানা, মেট্রপলিটন বীমা কোম্পানী প্রভৃতি ব্যবসায়ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দবাবুর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সচ্চিদানন্দবাবুর সাহিত্যানুরাগও যথেষ্ট ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা নাম দিয়া তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাংলার মূল সংস্কৃত এবং তৎসঙ্গে বঙ্গানুবাদ পুস্তকগুলির বিশেষত্ব। এই গ্রন্থমালার মধ্যে রামায়ণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সচ্চিদানন্দবাবুর মৃত্যুতে বাংলার শুধু ব্যবসায় ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাব্লিসিটি সার্ভিসের স্বত্বাধিকারী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (বকুলবাবু) সম্প্রতি কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রচার ব্যবসায়ের প্রথম যুগে তৎকর্তৃক স্থাপিত 'ক্যালকাটা পাব্লিসিটি সার্ভিস' নামক প্রতিষ্ঠানটি আজ সমগ্র ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। প্রচার-শিল্প সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

খেলাধূলায়ও অনাথনাথ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কলিকাতার জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

ক্ষতিপূরণ দানে রেলওয়ের অনিচ্ছা

বি এণ্ড এ রেলওয়ে এডমিনিষ্ট্রেশনের বিরুদ্ধে ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মৃত্যুর জন্য এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া তাঁহার পত্নী ও নাবালক সন্তানেরা যে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সেন সেই মামলায় বাদী-পক্ষে ডিক্রি দিয়া ৮৬৪০০ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়াছেন। ১৯৪০ সালের ৫ই আগষ্টের ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় শ্রীযুক্ত বসু আহত হন এবং ঐ দিনই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাদীপক্ষের আবেদনে প্রকাশ রেলওয়ের কর্তব্যপালনে অবহেলা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী এবং যথাসময়ে চিকিৎসিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত বসুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। রেলওয়ের পক্ষ হইতে চিরন্তন মামুলী সাফাই গাহিয়া বলা হয় যে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক রেল-লাইন অপসারণের জন্য দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সুতরাং রেলের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে না। বিচারপতি সেন রেলওয়ের কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিবাদীপক্ষের যুক্তির গরমিল দেখাইয়া বিচারপতি সেন মন্তব্য করেন যে ১৯৪১ সালে এই মামলা দায়ের হইয়াছে এবং প্রায় ৪ বৎসর পর গত জানুয়ারীতে উহার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রেলওয়ে বিভাগ ঘটনাটি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন, কিন্তু কয়খানা লাইন অপসারিত হইয়াছিল আজও তাঁহারা তাহা সঠিক ভাবে বলিতে পারিলেন না। এই সম্বন্ধে রেলওয়ে পক্ষ এক এক বার এক এক কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। লাইন অপসারণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ত ছিলই না, পরোক্ষ প্রমাণ যাহা ছিল তাহাও নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিচারপতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রেল কর্তৃপক্ষ এমন প্রমাণ দিতে পারেন নাই যাহাতে লাইন, গাড়ী অথবা ইঞ্জিনে কোন দোষ ছিল না অথবা ড্রাইভারের কোন ত্রুটি ছিল না এরূপ মনে করা চলে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানিবার সুযোগ একমাত্র রেলওয়ে কর্তৃপক্ষেরই আছে, তাঁহাদের উহা নির্ধারণ করা এবং বলা উচিত ছিল। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানাইয়া নিজেদের ত্রুটিতে উহা ঘটে নাই ইহা জানাইবার দায়িত্ব রেলওয়ের। কিন্তু বর্তমান মামলায় এডভোকেট-জেনারেল পরিষ্কার বলিয়াছেন যে লাইন অপসারণ ভিন্ন দুর্ঘটনার আর কোন কারণ তিনি দেখাইতে পারেন না। এই অবস্থায় লাইন অপসারণের যথাযোগ্য প্রমাণ দিতে না পারিলে রেলওয়ের কর্তব্যপালনে অবহেলার জন্য দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা মনে করা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না।

ক্ষতিপূরণের দায় এড়াইবার জন্য রেলওয়ে আজকাল পদে পদে মামলায় অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষে রেলের বিরুদ্ধে বহুল ব্যয়সাধ্য মামলায় জয়লাভ অতিশয় কঠিন। তাহা ছাড়া, রেলওয়ে বিবাদীপক্ষে থাকায় ক্ষতিপূরণের দাবিদারের উপর রেলের ত্রুটি প্রমাণ করিবার দায়িত্ব অর্শে। রেলের পক্ষে অজ্ঞাতনামা আততায়ী কর্তৃক লাইন অপসারণের কৈফিয়ৎ দিয়া বসিয়া থাকিলেই যথেষ্ট। বিচারপতি সেন এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে রেলের অবহেলায় দুর্ঘটনা ঘটে নাই ইহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব রেলের উপরেই থাকা উচিত। প্রয়োজন হইলে এ সম্বন্ধে রেলওয়ে আইনের পরিবর্তনও বাঞ্ছনীয়।

রেলে মাল হারানোও আজকাল অত্যন্ত বেশী বাড়িয়াছে এবং এ ক্ষেত্রেও রেল-কর্তৃপক্ষ পদে পদে ক্ষতিপূরণের দাবির বিরুদ্ধে মামলা লড়িতেছেন। অতি তুচ্ছ এবং খুঁটিনাটি (technical) কারণে এইসব মামলায় রেল-কর্তৃপক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া ক্ষতিপূরণের দায় এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। যে চেষ্টা ও অর্থ তাঁহারা ক্ষতিপূরণের দাবী এড়াইবার জন্য করিতেছেন তাহা যদি মাল-চোর ধরিবার জন্য এবং রেল-কর্মচারীগণের দায়িত্বজ্ঞান বাড়াইবার জন্য প্রযুক্ত হইত তবে সকল দিকেই মঙ্গল হইত।

রেলওয়ে পরিচালনায় ভারতবাসী

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রেলওয়ে বাজেট আলোচনার সময় সর এডোয়ার্ড বেন্থল রেলওয়ে পরিচালনায় শতকরা ৯৯$\frac{1}{2}$ ভাগ ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত বলিয়া ভারতবাসীকে গৌরব অনুভব করিতে বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "পয়েণ্টসম্যান লাইনসম্যান ও এই জাতীয় চাকুরীতে ভারতীয় এবং ঊর্ধ্বতম স্তরের শ্রেষ্ঠ পদগুলি ইউরোপীয়ানদের দ্বারা ভর্তি করা হইয়াছে বলিয়া কি দেশবাসী গৌরব বোধ করিবে? ইংলণ্ড হইতে সাহেব পয়েণ্টসম্যান, লাইনসম্যান প্রভৃতি আমদানী করা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই ত এই ব্যবস্থা হইয়াছে। উচ্চতম পদগুলিতে ভারতীয়দের নিযুক্ত করিয়া সমস্ত পয়েণ্টসম্যান ইউরোপীয়ান করা হউক, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না, সন্তুষ্টই হইব।" পয়েণ্টসম্যান প্রভৃতি পদের ভারতীয়দের সংখ্যার দ্বারা রেলওয়ে পরিচালনায় ভারতীয়দের অধিকার প্রতিপন্ন হয় না; যাঁহারা শীর্ষস্থানে থাকিয়া কর্তৃত্ব করেন, তাঁহাদিগকে ভারতীয় হইতে হইবে। শীর্ষস্থানে থাকিয়া যাঁহারা রেলওয়ে পরিচালনা করেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের আনুপাতিক হার কত, সর এডোয়ার্ড বেন্থল তাহার উল্লেখ করেন নাই। রেলওয়ে বোর্ডের রিপোর্টে দেখা যায় রেলের গেজেটেড অফিসারদের শতকরা প্রায় ৩৫ জন ইউরোপীয়, ১০ জন এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ডোমিসাইল্ড ইউরোপীয়ান এবং ৪৭ জন হিন্দু ও মুসলমান। মাসিক আড়াই শত টাকার উচ্চ বেতনের পদে এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ডোমিসাইল্ড ইউরোপীয়ের হার শতকরা ৩৫, হিন্দু ও মুসলমান ৪৭।

ভারতীয় রেলওয়ের সমুদয় ব্যয়ভার ভারতবাসী বহন করিলেও ভারতীয় স্বার্থে উহা পরিচালিত হয় না ইহা পদে পদে প্রমাণিত হইয়াছে। ইঞ্জিন, মালগাড়ী প্রভৃতি এ দেশে অনায়াসে তৈরি হইতে পারে ইহা জানিয়াও এখানে উহা নির্মাণ করা হয় না, বিলাত হইতে আনা হয়। জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইঞ্জিন তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর ভারত-সরকার বিদেশে প্রায় ৯৩ কোটি টাকার ইঞ্জিনের অর্ডার দিয়াছেন। এমন ভাবে এইসব অর্ডার দেওয়া হইয়াছে যেন

কয়েক পুরুষের মধ্যে আর ভারতবর্ষে ইঞ্জিন তৈরির কথা না উঠে। প্রচুর মালগাড়ীরও অর্ডার বিদেশে গিয়াছে। মালের ভাড়া নির্ধারণে বিদেশী স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আজ নূতনও নয়। সম্প্রতি বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কাফ এই বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বেস্থল সাহেব উহা এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রেলের প্রধান আয় যাহাদের টাকায় হইয়া থাকে সেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি রেল-কর্তৃপক্ষের আচরণ ভিক্ষুকের প্রতি উদ্ধত ধনিকের ব্যবহারের সহিত তুলনীয়। শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের অনুকূলে যানবাহন ক্ষেত্রে রেলওয়ের একচেটিয়া ক্ষমতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে রেল-কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রস্তাব পাস করাইয়া বাস ও লরীর প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুখের বিষয় পরিষদে উহা পাস হয় নাই।

পরলোকে ব্যারিস্টার এইচ, ডি, বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ এইচ. ডি. বসু গত ১৯শে ফাল্গুন তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন।

তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ ও অক্সফোর্ডের ওয়ার্ডহাম কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ, এস. আর. দাশ ও সর বিনোদ মিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। আইনের সূক্ষ্ম জ্ঞানের সহিত স্বাধীন মনোবৃত্তি, চারিত্রিক শুচিতা ও মার্জিত রুচির সংযোগ ঘটায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার প্রচুর পসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত যে অল্প কয়জন প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টার তাঁহাদের জুনিয়রদের নানাভাবে নিঃসঙ্কোচে উপদেশাদি দিয়া সহায়তা করিতেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ব্যবহারজীবী শ্রেণী, বিচারকবর্গ ও মামলাকারী সাধারণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বিগত ২৫ বৎসরকাল কলিকাতা হাইকোর্টে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ মামলা হইয়াছে তিনি তাহার প্রতিটি ক্ষেত্রেই পক্ষভুক্ত থাকিতেন। একাধিকবার তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু তিনি স্বীয় স্বাধীন বৃত্তি বিসর্জন দিতে রাজি হন নাই। সরল, নিরহঙ্কার, উচ্চ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ও দাতা হিসাবে তিনি একজন আদর্শ ও খাঁটি ভারতীয় ছিলেন।

রাজপথে দুর্ঘটনা

রাজপথে দুর্ঘটনার সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ইহা লইয়া প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা হইয়াছে। কলিকাতাতেই এরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। দুর্ঘটনা নিবারণে সামরিক কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ও ইচ্ছা সপ্রমাণ করিবার জন্ত কয়েক দিন আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মেজর-জেনারেল ষ্টুয়ার্ট বক্তৃতা করিয়া একটি গাড়ী কয় হাজার মাইল চলিলে একটি দুর্ঘটনা হয় তাহার হিসাব দিয়া দুর্ঘটনার গুরুত্ব কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য প্রতিদিন মানুষকে লরী চাপা পড়িয়া আহত ও নিহত হইতে দেখিলে লোকে এইসব কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। পথচারীদের দোষ নাই এমন নহে, কিন্তু ফুটপাথের উপর লরী উঠিয়া মানুষ মারিয়াছে, এরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে এবং দিনের আলোতে অনেক ট্রামগাড়িকে ধাক্কা মারিয়া ভাঙ্গা ইহাও বহু বার ঘটিয়াছে। সামরিক এবং বে-সামরিক উভয়বিধ লরীই গতি সম্বন্ধে কোন নিয়ম মানে না, উভয়েই সমান বেপরোয়া গতিতে চলিয়া থাকে। যে-সব রাস্তায় ২৫ মাইল হিসাবে গতি নির্দেশ করিয়া প্লাকার্ড দেওয়া আছে সেখানে উহার দ্বিগুণ গতিতেও লরী চলিতে প্রায়ই দেখা যায়। পথচারীদের অসতর্কতা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হইলেও লরী চালনায় অসতর্কতা ও উহাদের বেপরোয়া গতি যে প্রথম ও প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এইসব দুর্ঘটনা নিবারণ করাও আদৌ কঠিন বলিয়া আমরা মনে করি না। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় বাসগুলিকে যখন বেপরোয়া চলিতে দেওয়া হইত তখন বাস-দুর্ঘটনার সংখ্যাও ঠিক এইরূপই প্রচুর দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বাসের গতি সুনিয়ন্ত্রিত হইবার পর ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে পর্যন্ত বাস-চাপা বড় একটা কেহ পড়ে না। সামরিক এবং বেসামরিক লরী চলাচলের এইরূপ সুশৃঙ্খল নিয়ম করা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া লোকে মনে করে এবং তাহা করিলে দুর্ঘটনার সংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসিবে বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি। সম্প্রতি পথচারীদিগকে সাবধান করিবার জন্য বহু ইস্তাহার—তাহাও আবার ইংরেজীতে—ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা ঠিক, কিন্তু লরীচালকদিগের কাণ্ডজ্ঞান জন্মাইবার কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাও দেখা দরকার।

সিন্ধুতে পাকিস্থানী রাজত্ব

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা প্রদত্ত এক অভিনন্দনের উত্তরে সিন্ধু হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামদাস গিদোয়ানী সিন্ধু প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের, বিশেষতঃ হিন্দুদের, দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবির এক দফা ছিল সিন্ধুর পৃথকীকরণ, এই দাবি মানিয়া লইয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করিয়াছেন। বোম্বাই হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর সিন্ধুর হিন্দু বা মুসলমান কেহই লাভবান হয় নাই, শ্রীযুক্ত গিদোয়ানী ইহা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, "যে দিন সিন্ধুকে বোম্বাই হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেই দিনটিকে মুসলমানেরাও অভিশাপ দিতেছে; কারণ ইহা দ্বারা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই ক্ষতি হয় নাই, মুসলমানদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।"

সিন্ধুতে কি ভাবে পাকিস্থানী রাজত্ব চলিয়াছে শ্রীযুক্ত গিদোয়ানী তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। সরকারী চাকুরী ইত্যাদিতে হিন্দুদের প্রবেশপথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়াছে। মুসলমানেরা হিন্দুদের বহু জমি বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছে। প্রায় ৫৮৮৮ জন হিন্দু নিজেদের গ্রাম বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া শহরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মন্ত্রীরা তাঁহাদের ভূমি প্রত্যর্পণের ভরসা দিয়াছিলেন কিন্তু কার্যতঃ কিছুই করেন নাই। সম্প্রতি, ভূমি সংক্রান্ত যে আইন পাস হইয়াছে তাহা দ্বারা হিন্দুদিগকে জমি ক্রয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। অবশ্য গবর্ণর এখনও ঐ বিলে সম্মতি দেন নাই।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপের দুই যুদ্ধ প্রান্তে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। এতদিন পরে পশ্চিমে মিত্রপক্ষ এবং পূর্ব্বে সোভিয়েট সমানে তাল রাখিয়া অভিযান চালনা করিতেছে। জার্ম্মানী এখন সঙ্গীহীন, কেবলমাত্র হাঙ্গেরীয় সেনা ও মুষ্টিমেয় ইটালীয় সেনা বোধ হয় এখন নাৎসী সমর-সংসদের অধীনে আছে। সকল রণক্ষেত্রেই জার্ম্মান সেনার বিরুদ্ধে পাঁচগুণ হইতে অধিক সম্মিলিত জাতীয় সেনা লড়িতেছে, অস্ত্রশস্ত্রের হিসাবেও প্রায় ঐ প্রকার বিষম অনুপাত। আকাশে ব্রিটিশ ও মার্কিন—বিশেষতঃ মার্কিন—বিমানবহর প্রবল আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে; সে আক্রমণের প্রতিরোধ এখনও জার্ম্মানীর ক্ষমতার অতীত এবং সেই কারণেই প্রতিপদে জার্ম্মান রক্ষীদল ক্রমেই শক্তিবৈষম্যের ফলভোগ করিতেছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে এই মহাযুদ্ধের সকল ক্ষেত্রেই সম্মিলিত জাতীয় দল যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট এরোপ্লেন নির্ম্মাণের কার্য্যক্রমের ফলে জয়যুক্ত হইতেছে। জলে এই বিমান বহরের সপ্তসমুদ্রব্যাপী সজাগ দৃষ্টি এবং তাহার আনুষঙ্গিক বোমা ও কামানবাহী দ্রুতগামী এরোপ্লেনের আক্রমণের ফলে জার্ম্মানীর সাবমেরিন বহরের অভিযান খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে এবং জাপানের প্রবল শক্তিশালী নৌবহরের ক্ষমতাও ঐরূপে অসংখ্য বিমানবাহী মার্কিন রণতরীর অবিশ্রাম সবল আক্রমণের ফলে খর্ব্ব ও সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আকাশে মার্কিন অতিকায় "উড়াকু কেল্লা" এবং বৃহত্তর "উড়াকুকেল্লার" সহস্র যোজন পাল্লায় ভীষণ আক্রমণ এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য ছোট বড় লড়াকু এবং বোমারু বিমানের দিবারাত্র আক্রমণে বিপক্ষের যুদ্ধায়োজনের প্রতিপদে ও প্রতিপর্ব্বে অশেষ ক্ষতি ও বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে জাপানের প্রতিরোধ-চেষ্টার শতকরা ৭৫ ভাগ নষ্ট হইয়াছে মার্কিন বিমান-বহরের আক্রমণে। এই আক্রমণ একদিকে জাপানের দুর্গমালা, তোপখানা ইত্যাদি, গুরুভার বোমাক্ষেপণে নষ্ট করিয়াছে, অন্য দিকে সমুদ্রপথে রসদ, সাহায্যকারী সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করিয়া জাপানী রক্ষীদলের শক্তিবৃদ্ধি ও ক্ষতিপূরণের সকল পথ বন্ধ করিয়াছে। জাপান এই ভাবে আকাশপথে পরাজিত না হইলে মার্কিন যুদ্ধশক্তির পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরে অগ্রসর হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া যাইত। ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তের অভিযান তো এক প্রকার মিত্রপক্ষের আকাশ-শক্তির ছত্রের নীচেই চলিতেছে, সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে ও যুদ্ধরেখার পিছনে দিবারাত্র অবিশ্রাম বিমান আক্রমণ চলিতেছে, দুর্গমালা, পরিখা-প্রাকার বোমাক্ষেপণে ধূলিসাৎ হইবার পর সৈন্য চালনা সম্ভব হয়। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে অক্ষশক্তির শক্তিনাশের অঙ্কুর মার্কিন বিমানশালাতেই রোপিত হয়। স্থলপথে অক্ষশক্তির দুই প্রধান অংশীদার জার্ম্মানী ও জাপান এখনও প্রচণ্ড যুদ্ধশক্তি ধারণ করে। জলে জাপানের নৌবহরের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছে আকাশপথে আক্রমণের ফলে, সম্মুখভাবে নৌযুদ্ধে এখনও শক্তি পরীক্ষাই হয় নাই। আকাশপথে সম্মিলিত জাতীয় দলের জয়পতাকা অবাধে উড়িতেছে। ১৯৪২ সালের শেষ দিক হইতে অক্ষশক্তি আকাশপথে হটিতে আরম্ভ করে এবং এখন পর্য্যন্ত তাহারা মিত্রপক্ষের এই বিমানপথে যুদ্ধের আহ্বানের কোনও উত্তর খুঁজিয়া পায় নাই। জাপান সে দিকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, সে খবর আমরা মার্কিন নৌসেনাধ্যক্ষের মুখে শুনিয়াছি এবং সেই চেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য মার্কিন বিমানবহর এখন বিশেষভাবে ব্যস্ত তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

জার্ম্মানীর পূর্ব্ব প্রান্তের যুদ্ধের রূপ এখন আর "ঝটিকাযুদ্ধের" ন্যায় নাই। এখন সোভিয়েট বাহিনীগুলি সকল রণাঙ্গনেই সম্মুখযুদ্ধে সৈন্যবল ও অস্ত্রবলের ওজনে বিপক্ষকে হটাইতে চেষ্টিত। এইরূপ যুদ্ধে দ্রুতনিষ্পত্তির সম্ভাবনা কম, কেননা ইহাতে আক্রান্ত অপেক্ষা আক্রমণকারীর শক্তিক্ষয় অধিক ও দ্রুত হয় এবং রক্ষীদলের পিছনে এখন অতি সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহার ব্যবহারে জার্ম্মান রণাধ্যক্ষগণ অতি নিপুণ। সোভিয়েট বাহিনীগুলির পিছনে দিগন্তব্যাপী ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়া সৈন্য ও রসদের প্রবাহপথ। সে পথ সুদীর্ঘ এবং সহজও নহে, সুতরাং দ্রুত চলাচলের পক্ষে অনুকূল নহে। পূর্ব্ব-ইউরোপে তুষারদ্রবের সময় বসন্তের আগমনের সঙ্গেই আসে এবং সেদিন আর বেশী দূরে নাই। তুষারদ্রবের সময় পথঘাট সবই কাদায় ভরিয়া যায়, পথঘাটের বাহিরের ক্ষেত্র সবই মহাপঙ্কে পরিণত হয়। সে সময় দ্রুত চলাচল অসম্ভব, সুতরাং যুদ্ধের গতিবেগ হ্রাস পাইতে বাধ্য। সোভিয়েট রণনেতাগণ এই সময়ের পূর্ব্বেই আংশিক নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে তুষারদ্রবের পূর্ব্বেই পারঘাটা ও পথঘাটের মোহানা রুশসেনার হস্তগত হয়। এই শীত অভিযান অবিচ্ছিন্নভাবে বসন্ত ও পরে গ্রীষ্ম অভিযানে পরিণত হইতে পারে তবেই, যদি দুই পক্ষের সৈন্য ও রসদ ইত্যাদির চলাচলের ব্যবস্থা এক মতই থাকে অর্থাৎ ঋতুভেদে কোনও পক্ষের সুবিধার বৃদ্ধি না হয়। তুষারদ্রবের সময় যদি সোভিয়েট সেনার সরবরাহ ও চলাচলের ব্যবস্থায় অধিক বাধা পড়ে তবে আংশিক যুদ্ধবিরতি অবশ্যম্ভাবী যদি-না যুদ্ধক্ষেত্রের আশপাশের পারঘাটা ও চৌমাথাগুলি জার্ম্মান সেনার হস্তচ্যুত হয়। এখন জার্ম্মানীর পূর্ব্বাঞ্চলে যে কয়েকটি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছে সে সবই মুখ্যতঃ ঐসব চলাচল পথ অধিকারের জন্য। দ্রুত শেষ নিষ্পত্তির অভিযানের আকার তাহাতে আর পূর্ব্ববৎ নাই, তবে সেখানে শক্তিবৈষম্য এতটা আছে যে যুদ্ধের রূপ পরিবর্ত্তনও দ্রুতই হইতে পারে, যদিও সে সম্ভাবনাও তুষারদ্রবের সময় কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইতেছে।

জার্ম্মানীর পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধ, নিষ্পত্তির হিসাবে, এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মার্কিণ সেনা অবিশ্রাম আক্রমণের ফলে দুর্ভেদ্য দুর্গমালার অনেক অংশ অতিক্রম করিয়া এখন কোলোন হইতে কব্লেন্‌স্‌ পর্য্যন্ত রাইন নদের পশ্চিমকূল দখল করিয়াছে এবং এক স্থলে একটি সঙ্কীর্ণ পারঘাটা স্থাপনেও সমর্থ হইয়াছে। এই প্রান্তের ঐ সকল অংশেই যুদ্ধ এখন ক্রমে ঘোর হইতে ঘোরতর রূপ ধারণ করিতেছে। বিপক্ষের প্রতিরোধ-চেষ্টা প্রতি মুহূর্ত্তেই দৃঢ়তর হইতেছে, অন্য দিকে মার্কিণ সেনাও এখন সকল ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব ছাড়িয়া প্রবল

পরাক্রমে লড়িতেছে। বলা বাহুল্য, রাইন নদের পশ্চিম কূলের এরূপ বিশাল অংশ অধিকারে মার্কিণ সেনার পরিস্থিতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল হইল কিন্তু এখনও সম্মুখে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্নবিপত্তি আছে এবং জার্ম্মান রক্ষীদলের প্রধান অংশ এখনও সম্মুখেই আছে, সুতরাং মার্কিণ সেনার সম্মুখে এখন চরম শক্তি পরীক্ষা রহিয়াছে। যে ভাবে মার্কিণ অভিযান চালিত হইয়াছে তাহাতে জার্ম্মানীর শক্তিক্ষয়ের শেষ সীমা না আসা পর্য্যন্ত শেষ নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে যে মুখে মার্কিণ রণাধ্যক্ষ এখন সৈন্য চালনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন সেদিকে আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলে জার্ম্মানীর শক্তিকেন্দ্রে—বিশেষতঃ অস্ত্রনির্ম্মাণ কেন্দ্রগুলিতে—সাংঘাতিক আঘাত পড়িবে।

ইটালীতে জার্ম্মান বূ্যহ এখনও প্রায় পূর্ব্বেকার মতই রহিয়াছে। বিগত দুই মাসে তাহার কোনও ইতরবিশেষ হয় নাই। এই যুদ্ধপ্রান্তে জার্ম্মানরক্ষীদল এখনও অপেক্ষাকৃত রণবিরতি ভোগ করিতেছে। বসন্তঋতু অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এখানে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না। বলকান ও হাঙ্গেরীতে সেরূপ কোনও সংঘর্ষের সংবাদ কিছুদিন যাবৎ পাওয়া যায় নাই। সোভিয়েট সেনা দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টায় তাহার অধিকাংশই জার্ম্মান সীমান্তে নিযুক্ত করিয়াছিল মনে হয়। তুষারদ্রবের সময় হয়ত ঐ সকল অঞ্চলে যুদ্ধের অনল জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

জার্ম্মানীর এখন "শিয়রে সংক্রান্তি" অবস্থা ইহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাহার আকাশশক্তি এখন ব্যাহত, জলশক্তি ক্ষীণ, কেবলমাত্র স্থলক্ষেত্রে সে প্রবল বাধাদানে সমর্থ এবং তাহাও তাহার রণনেতাগণের অতি দক্ষ এবং নিপুণ যুদ্ধ চালনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেছে। স্থলযুদ্ধে শক্তিবৈষম্য এখন তাহার পক্ষে সাংঘাতিক, পূর্ব্ব প্রান্তে তাহার রক্ষাবূ্যহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ও এখনও তাহা সুদৃঢ়ভাবে সংযোজিত হইতে পারে নাই, পশ্চিম প্রান্তেও তাহার রক্ষাবূ্যহের প্রায় শেষ সীমায় যুদ্ধ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যেভাবে তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধ চলিতেছে সেই ভাবে আরও কিছুদিন চলিলে তাহার গচ্ছিত শক্তির উপর টান দুর্ব্বহ হইয়া পড়িতে বাধ্য। সোভিয়েটের আক্রমণ-প্রতিরোধ-চেষ্টায় পশ্চিম প্রান্তের রক্ষীসেনাকে অপেক্ষাকৃত অসহায় করিতে সে বাধ্য হইয়াছে যাহার ফলে মার্কিন সেনা রাইন নদের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। দুই দিকের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য শক্তি প্রয়োগের হিসাবনিকাশের সমতা অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা তাহার এখনও আছে কিনা তাহারই পরীক্ষা এখন চলিতেছে।

অন্য দিকে সম্মিলিত জাতীয় দলের সম্মুখে যে কোনই সমস্যা নাই সেকথা ভুল। বর্ত্তমানে সম্মিলিত জাতীয় দল ইউরোপের রণাঙ্গনে যে শক্তি প্রয়োগ করিতেছে ইহা তাহাদের শক্তির চরম। এখন মিত্রপক্ষ ও সোভিয়েটের যে অনুপাতে ক্ষয়-ক্ষতি চলিতেছে, যুদ্ধ আরও যত দিন চলিবে ততই সেই অনুপাতের বৃদ্ধি ঘটিবে। সুতরাং সময় এখন দুই পক্ষেরই কাছে মহামূল্য এবং মিত্রপক্ষের নিকট তাহা অত্যধিক মূল্যবান, কেননা জার্ম্মানীর পরে আরও এক প্রবল শত্রু আছে যাহার স্থলযুদ্ধের ক্ষমতা এখনও বৃদ্ধিই পাইতেছে। সোভিয়েট জাপানের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে নামিবে কিনা সেই কথা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে যাহার বিচার এখনও অবান্তর। তবে এই পর্য্যন্ত সহজেই বলা চলে যে জাপানের শক্তিনাশ মুখ্যতঃ মিত্রপক্ষকেই করিতে হইবে। ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তের যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থাতেই বুঝা যায় যে সোভিয়েটের শক্তির সীমা আসিয়া পড়িয়াছে এবং জার্ম্মানীর শক্তিকে বিনাশ করিতেই তাহার সমস্ত বলপ্রয়োগ করিতে হইবে।

জাপানের চতুর্দ্দিকে বেড়াজাল ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। এখন আকাশপথে তাহার মূল শক্তিকেন্দ্রগুলি অল্পে অল্পে আক্রান্ত হইতেছে এবং মূল অভিযান ক্রমেই তাহার পিতৃভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইয়োজিমা একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশির উপর একটি স্থূল বিন্দুমাত্র, কিন্তু ইহা জাপানের মূল দুর্গমালার এক মর্ম্মস্থল, কেননা প্রহরীর মত ইহা বিপক্ষের চলাচলের উপর দৃষ্টি রাখিত। ইয়োজিমা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপগুলি গেলে জাপানের পক্ষে মার্কিন বিমান ও নৌবহরের খবরাখবরের জন্য নির্ভর করিতে হইতে তাহার নিজস্ব বিমান ও নৌবহরের উপর এবং সেই দুই শক্তিই এখন মার্কিন আকাশ-সেনার আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ইয়োজিমার যুদ্ধ যেরূপ প্রচণ্ডভাব গ্রহণ করিয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় জাপানের নিকট এই সামান্য দ্বীপের মূল্য কি। মার্কিন আকাশবাহিনী ও নৌবহর সত্যসত্যই অসাধ্য সাধন করিয়া এই প্রশান্ত মহাসাগরের খণ্ড অভিযানগুলি চালাইতেছে। ফিলিপিন দ্বীপমালার যুদ্ধ এখনও চলিতেছে এবং আরও কিছুকাল চলিবে মনে হয়, অন্য দিকে নিউগিনি, সলোমন অঞ্চল ইত্যাদিতে যুদ্ধের আগুন এখনও জ্বলিতেছে। এই অবস্থায় অভিযানের প্রসর বিস্তারিত করিয়া আগে চলা কিরূপ অসীম যুদ্ধব্যবস্থার ব্যাপার তাহা কল্পনারও অতীত। মহাপ্লাবনের জলের মত অর্থ ও খনিজ এবং শিল্পসম্পদের ব্যয় এবং সেই সঙ্গে কোটি কোটি লোকের কার্য্যশক্তি একাগ্রভাবে নিযুক্ত হইলে পরে ইহা সম্ভব হইতে পারে। জাপান কিন্তু এখনও হার মানে নাই, সে এখনও যুদ্ধদানে সচেষ্ট এবং যুদ্ধসম্ভারের ব্যবস্থায় প্রাণপণে ব্যস্ত। জাপানের স্থলসৈন্য এখনও সেরূপ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তাহার লোকবল এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে; এতাবৎ কাল মার্কিন অভিযান তাহার কাঁচামাল সরবরাহের পথে সেরূপ প্রবল বাধা দিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি সমুদ্রপথে মার্কিন নৌবহর প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং জলপথে ওলন্দাজ দ্বীপময় ভারত, মালয়, ইন্দোচীন ও ব্রহ্মের সহিত জাপানের যোগসূত্র কর্ত্তিত হইবার—অন্ততঃপক্ষে সঙ্কুচিত—হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। জাপান সেদিকে যোগছিন্ন হইলে স্থলপথে রেল দ্বারা যোগ রাখিবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত এবং সেই কারণে দক্ষিণ-চীনে, ইন্দোচীন সীমান্তের নিকট, খণ্ডযুদ্ধ চালাইয়া সে পথ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি ইন্দোচীনে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে স্থানচ্যুত করার কারণও ঐ একই। এই নূতন যোগসূত্র স্থাপিত হইলে এসিয়ার যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এক নূতন অবয়ববৃদ্ধি ঘটিবে যাহাতে যুদ্ধের কাল বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

আকবরের আমল

শ্রীযদুনাথ সরকার

আজ ৩৪০ বৎসর হইল দিল্লীর সম্রাট্ আকবর বাদশা মারা গেছেন। তার ত্রিশ বছর আগে তিনি বাংলাদেশ জয় করেন। তাঁরই প্রতাপে সমস্ত উত্তর-ভারত এক রাজার অধীনে আসে; অর্থাৎ সেই দক্ষিণে সমুদ্রকূলে জগন্নাথপুরী হইতে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমানায় কাশ্মীরে অমরনাথ পর্য্যন্ত সব হিন্দু তীর্থগুলি এক দেশের অংশ, এক শাসনের অধীন হইয়া গেল; গৌড়ের আদিনা মসজিদ হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর নিজামুদ্দীন আউলিয়া আর আজমীরের মৈনুদ্দীন চিশতির দরগা পর্য্যন্ত সব মুসলমান পীরস্থান এক রাজ্যের মধ্যে আসিল। এই বাদশা আমাদের দেশের কি করিয়া গেলেন, তাঁহার রাজ্যে লোকদের অবস্থা কেমন ছিল, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইত যদি আমরা সেই যুগে জন্মিতাম।

আজ কল্পনা করিলাম যে, আমি তাঁহারই রাজ্যের একজন বাঙালী প্রজা ছিলাম। বাংলায় আমরা যে দিল্লীর বাদশার প্রজা, তিনি পরম ন্যায়পরায়ণ রাজা, দুষ্টের দমন, দুর্বলের রক্ষা, গুণী জ্ঞানীর আদর করেন, যেমন পূর্বে কখনও হয় নাই। এই কথা অনেকের মুখে শুনিয়া আমার বড় ইচ্ছা হইল যে একবার তাঁহাকে দর্শন করিব। তাঁহার রাজধানী ইন্দ্রের অমরাপুরীর মত সুন্দর তাহা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিব। আর সেই সঙ্গে বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ মথুরা-বৃন্দাবনের যাত্রাটাও সারিয়া আসিয়া একধারে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ করিব। এই পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভক্ত গোঁসাইরা বৃন্দাবনে মঠ ও মন্দির স্থাপন করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ লেখেন, বাঙালী বৈষ্ণব ধর্ম শিখান, এ সব খবর তীর্থযাত্রীরা ফিরিবার সময় আমাদের গ্রামে বলিয়া গিয়াছে। তাহারা আরও বলিয়াছে যে, এখন এই সুদূর তীর্থযাত্রা অতি সহজ ও নিরাপদ হইয়াছে, কারণ আকবর বাদশা এমন ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, প্রজারঞ্জক রাজা, যে তিনি যৌবনে শাসনভার নিজ হাতে পাইবামাত্র শুধু হিন্দুদের উপর যে মাথা-গুনতি জিজিয়া কর এবং প্রত্যেক তীর্থে প্রবেশের সময় যে টেক্‌স আদায় করা হইত, তাহা উঠাইয়া দিলেন, যাহাতে সব ধর্মের প্রজারা সমানভাবে ভাই ভাই হইয়া একত্র নির্বিবাদে বাস করিতে পারে। এজন্য তাঁহার বহু লক্ষ টাকার রাজ-আয় ত্যাগ করিতে হইল, তাঁহার মহা-প্রাণ সেজন্য একটুও ইতস্ততঃ করিল না। আরও শুনিলাম যে মথুরা, প্রয়াগ, কাশী অঞ্চলে রব উঠিয়াছে যে আকবর বাদশা কি হিন্দু, কি জৈন, কি জুরথাস্ত্রীয়, কি খ্রীষ্টান, কি শিয়া, কি সুন্নী, কি দাদুপন্থী,—সব ধর্মের পণ্ডিতদের ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের কাছে নিজ নিজ ধর্মের সার-শিক্ষা ও পুণ্যকাহিনী সযত্নে শুনেন এবং তাঁহাদের অর্থদক্ষিণা দেন।

আমার এই ইচ্ছা পুরাইবার সুযোগ হইল সেই বৎসর দুর্গাপূজার পর; একদল বৈষ্ণবযাত্রী বৃন্দাবন যাইতেছে শুনিয়া আমি আমার বাড়ী সাতগাঁ হইতে তাহাদের সঙ্গ লইলাম। এই যাত্রার আগে আমার দিদিমা ভয় দেখাইয়াছিলেন যে ষাট বৎসর আগে তাঁহার শ্বশুর কাশী দর্শন করিতে গিয়া পথে কষ্টে ও বিপদে মারা যান; তাঁহাকে কত ছোট ছোট স্বাধীন নবাবের রাজ্য পার হইতে হয়, প্রত্যেক রাজ্যের সীমানায় বিলম্ব, অত্যাচার ও টাকা আদায়; পথগুলি চোর-ডাকাতে ভরা, প্রায় প্রদেশেই কোন রক্ষক বা বিচারক পাওয়া যায় না; প্রত্যেক রাজ্যেই এক এক ভিন্ন মুদ্রার চলন, টাকার উপর বাটা কাটিয়া তাহার অর্ধেক মূল্য কমাইয়া দেয়। আর আমার এই বৃন্দাবন-যাত্রা আশ্চর্য নিরাপদে ও সহজে শেষ হইল। সাতগাঁ হইতে ব্রজধাম পর্য্যন্ত পাঁচ-শ ক্রোশ পথ সমস্ত এক রাজার দেশ, তাহার সব প্রদেশেই ঠিক একরকম রাজ্যশাসন-প্রণালী, এক মুদ্রা, এক সরকারী ভাষা চলিতেছে। প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে একজন সুবাদার শাসনকাজে সদা নিযুক্ত, আর প্রদেশটিকে মাপসই ছোট ছোট ভাগ করিয়া, তাহার মধ্যে এক এক জন ফৌজদারকে শান্তি রক্ষার ভার দেওয়া, এক এক জন কাজীকে বিচারের কাজে এবং বড় শহরে এক একজন কোটওয়ালকে পুলিসের কর্মে রাখা হইয়াছে। একছত্র সাম্রাজ্য, সর্বত্র এক ছাঁচে ঢালা শাসনপ্রণালী, কোন গোলমাল, কোন বিলম্ব হইতে পারে না। পথে চুরিডাকাতির সংবাদ পাইলেই ফৌজদার সদর হইতে সৈন্য লইয়া তাহার দমন ও চোরামাল উদ্ধারের জন্য ছুটিত।

আর সর্বত্রই বাদশার গোয়েন্দা পত্র-লেখক নিযুক্ত আছে, তাহারা রীতিমত মাসে মাসে গোপন পত্র লিখিয়া তাঁহাকে জানাইতেছে যে, কোন সরকারী কর্মচারী ঘুষ লইল, অবিচার করিল, অথবা কোন্ বড় ঘটনা সরকারী রিপোর্টে না দিয়া লুকাইয়া রাখিল।

সর্বত্র দেখিলাম যে পথ দিয়া বদলী রাজকর্মচারী ও সৈন্য, এক মহকুমা হইতে অন্য মহকুমায় যাইতেছে, সুবাদারের সরকারী কাগজপত্র ও বাদশাহী গোয়েন্দাদের গোপনীয় পত্র লইয়া দুজন বা জুড়ী হরকরা এবং গরুর গাড়ীতে, টাট্টু ঘোড়ার উপর বা বলদের পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দলে দলে বণিকেরা, দূর স্থানে যাইতেছে। এই একছত্র রাজত্বের ফলে এই প্রকাণ্ড মহাদেশময় শান্তি ও নিরাপদ, পথে সহজে আনাগোনা, বাণিজ্য ও সভ্যতার বিস্তার চলিতেছে; এটি আগে সম্ভব ছিল না। পথের দুদিকে নির্ভয়ে বিনা বাধায় চাষবাস, কেনা-বেচা, কারিগরদের শিল্পদ্রব্য তৈয়ারি, পড়াশুনা চলিতেছে। কত সুন্দর মন্দির মসজিদ ও সমাধি গড়িয়া উঠিতেছে, কারণ অরাজকতা দূর হওয়ায় লোকের হাতে টাকা হইয়াছে। কত ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক নির্বিবাদে ভারতের এক দিক হইতে অপর দিকে যাইতেছে, নিজ নিজ কাজ করিতেছে।

এইরূপ নিরাপদে, সহজে এবং অল্প খরচে সেই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া, পথে কাশী, প্রয়াগ সারিয়া, বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। সেখানে কি শান্তি, কি উৎসাহ, কি ধর্মচর্চা! গোকুলে বল্লভাচার্যের মঠ, খুব বর্ধিষ্ণু, রাজপুতরাজাদের ও গুজরাতী বণিকদের দানে পুষ্ট। বাদশার মা হামিদা বানু বেগম এক ফর্মান্ দিয়াছেন যাহার বলে ঐ গোকুলের বৈষ্ণবদের সব গরু বিনা বাধায় বিনা গাউচরাই টেক্সে বাদশাহী খাসমহলে চরিতে পারিতেছে। কত

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে যাত্রীরা এখানে একত্র হইয়া জন্মাষ্টমীর উৎসবে যে দৃশ্য সৃষ্টি করিল, তাহা জীবনে ভুলিব না। তখন বুঝিলাম যে আমি কোণঠাসা বাঙালী নই; এই ভারতব্যাপি জনসমুদ্রের মধ্যে আমিও ঠিক অন্যের থেকে অভিন্ন একটি জলবিন্দু।

যে বাদশা ভুভারতকে এত একত্রিত, এত বলশালী, এত ধনী, এত শান্তি, জ্ঞান ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে একবার দর্শন না করিয়া দেশে ফিরিতে মন চাহিল না। এই দর্শনলাভের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার একটি সুযোগও ঘটিল। আমাদের সাতগাঁয়ে এক কাজীর অনাথ পুত্র আমার সমবয়সী ও খেলার সাথী ছিল। ভ্রমণকারী আউলিয়া ফকিরদের কাছে আগ্রা প্রদেশের বিখ্যাত সুফী ধর্মগুরুদের বিবরণ এবং দু-চারটা বাণী শুনিয়া, তাহার বড় আকাঙ্ক্ষা হয় যে সে আগ্রা গিয়া ভাল করিয়া আরবী পারসী ভাষা শিখিবে এবং ঐসব মহাপুরুষের চরণে বসিয়া তাঁহাদের শিষ্য হইয়া জন্ম সার্থক করিবে। সাতগাঁ হইতে সেও আমাদের সঙ্গ লইল। তাহার সাহায্য পাওয়ায় সমস্ত পথে বিদেশী রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আমাদের যাত্রীদলের কথাবার্তা অতি সহজে চলিল। আমি তাহার নিকট চলনসই উর্দুভাষা শিখিয়া লইলাম। বৃন্দাবন-মথুরায় কয়েক মাস কাটাইবার পর আমি আগ্রায় আসিলাম এবং একটি মুসলমানী মঠ (খানকা)-তে এই বন্ধুকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। এই রাজধানীতে সে আমার পাণ্ডা হইল।

কিন্তু আমার মত দীনহীনজন কি করিয়া সম্রাটের দর্শন পাইবে? তাহার একটি পন্থা এই বন্ধুর সাহায্যে বাহির হইল, সেটা এইরূপে:—এই ক'বছর হইল শেখ মুবারক নামে এক পরম ধার্মিক ও মহাপণ্ডিত সুফী মারা গিয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে ভক্তি করিত; সেজন্য ঈর্ষাপরবশ গোঁড়া কাজীর দল তাঁহাকে ধর্মভ্রষ্ট রাফিজী বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহে। কিন্তু বাদশা তাহাতে বলেন, "আচ্ছা তাহাকে আমার সম্মুখে আন, আমি তাহার কথাবার্তা শুনিবার পর উচিত বিচার করিব।" শেখ মুবারককে দরবারে আনিবার পর তাঁহার সরল সাত্ত্বিক ভাব, ধর্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান এবং অকপট ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া, আকবর মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে নিজ শিক্ষক করিয়া লইলেন; কাজীদের মক্কায় নির্বাসন করা হইল। এই সাধুর দ্বিতীয় পুত্র মহাপণ্ডিত ও অতুলনীয় সুলেখক, আবুল ফজল এখন বাদশাহের সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত অমাত্য ও বন্ধু—যদিও তাঁহাকে দেওয়ান উজীর বক্সি প্রভৃতি কোন উচ্চ পদ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তাঁহার মতে বাদশা চলেন। বর্তমানে বাদশার আদেশে আবুল ফজল এই সাম্রাজ্যের একখানা বড় ইতিহাস এবং সমস্ত দেশের বর্ণনা ও শাসনযন্ত্রের বিবরণ লিখিতে ব্যস্ত আছেন। এজন্য নানা প্রদেশ হইতে স্থানীয় সংবাদ লওয়া তাঁহার আবশ্যক হইয়াছে। আমি বাঙালী এবং শিক্ষিত কায়স্থ একথা শুনিয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে বাঙলা দেশের সব খবর এবং আমাদের ধর্মসম্প্রদায়গুলির বিবরণ জানিতে চাহিলেন। আমি হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত মিশান ভাষায় বলিতাম, আর তিনি তাহা পারসিক ভাষায় সংক্ষেপে লিখিয়া লইতেন। তাঁহার বড় ভাই ফৈজী চমৎকার সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এখন আর এ জগতে নাই।

আমার বিবৃতি শেষ হইবার পরও আমি প্রত্যহ আবুল ফজলের বৈঠকে যাইতাম এবং তিনি বন্ধুবান্ধব ও আগত ভদ্রলোকের সঙ্গে যে গল্প করিতেন তাহা মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। এইরূপে বাদশা আকবরের চরিত্র ও কীর্তিকলাপের যেন একটি জীবন্ত ছবি পাইলাম। তাঁহার কাছে শুনিলাম যে বাদশা শুধু সত্য খুঁজিয়া বেড়ান, কোন ধর্মের বাহ্য আচার-ব্যবহারের দিকে না তাকাইয়া, উহার অন্তরে কি নীতিশিক্ষা আছে তাহা জানিতে চেষ্টা করেন। অনেক দিন ফতেপুর-সিকরির রাজপ্রাসাদের এক কোণে একটা ছোট ভাঙা ঘরের সামনে একখানা চ্যাপটা পাথরের উপর নিরিবিলি বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেন, গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাহার চিবুক ঝুলিয়া বুকের উপর পড়িতেছে। তার পর ঐ শহরে ইবাদৎ-খানা নামে একটি বাড়ী তৈয়ার করিলেন, তাহার এক ধারে নিজে আসন লইতেন, আর সামনের আঙিনার ডান ও বাঁ হাতের বারান্দায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রচারকগণ নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। প্রথম প্রথম এই গৃহে শুধু ইসলামের পণ্ডিতগণ আলোচনা করিতে পাইতেন, কিন্তু তাহাদের বাহাত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া এবং মোল্লাগণের ব্যক্তিগত অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার ফলে তাঁহাদের মধ্যে এত গালাগালি আরম্ভ হইল যে আকবর সত্যের চিহ্ন হারাইলেন। তখন তিনি হিন্দু জৈন জুরথাস্ত্রীয় খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্মের শিক্ষকদের ডাকিয়া তাঁহাদের ধর্মব্যাখ্যা ও নীতি-উপদেশ মনোযোগ দিয়া শুনিতেন এবং ঐ সব সাধুদের সম্মান করিতেন। একদিন আবুল ফজলের চাকরদের দলে মিশিয়া আগ্রা দুর্গে গিয়া রাজদর্শনের সৌভাগ্য আমার হইল।

এই সব আলোচনার শেষ ফল দাঁড়াইল যে আকবর বুঝিলেন যে সব ধর্মেই কিছু-না-কিছু সত্য লুকান আছে। যদি লোকে প্রত্যেক ধর্মের বাহ্য রীতিনীতি ছাড়িয়া দিয়া তাহার-ভিতরকার সাত্ত্বিক ভাব ও চির সত্যটুকু শিক্ষা করে, তবে আর ধর্মে ধর্মে লড়াই কাটাকাটি বাধে না; সব মানুষ উদারচেতা হয়, সৎভাবে নিজ জীবন যাপন করিবার পন্থা ও প্রবৃত্তি লাভ করে। এইজন্য আকবর গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা উচ্ছেদ করিতে খাড়া হইলেন। তাঁহার রাজনীতি হইল সুল্‌হ্‌-ই-কুল্‌ বা সকলের সহিত শান্তি, এখন যাহাকে বলা হয় universal toleration, অর্থাৎ সব ধর্মের পালন! কি আশ্চর্য তাঁহার ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা! নিরক্ষর আকবর নিজ নিভৃত সাধনার ফলে এই মন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার বিশাল রাজ্যের সব প্রজাকে তাহাদের ধর্মের দিকে না তাকাইয়া, আইনের বিচারে, রাজনৈতিক অধিকারে, রাজকার্যে এবং নিজ নিজ ধর্মপালনে ঠিক সমান অধিকার দিলেন। বর্তমান যুগে তুরস্কদেশকে যিনি নূতন প্রাণ দিয়াছেন সেই কমালপাশা আতাতুর্ক, যে রাজনীতি তুরস্কে চালাইয়াছেন আকবর ৩২৫ বৎসর পূর্বে ভারতে তাহাই প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন; অর্থাৎ গবর্নমেণ্টকে ধর্ম হইতে পৃথক করিতে হইবে, সমস্ত রাষ্ট্রবাসিগণ ধর্মনির্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করিবে। সতের-শ উননব্বই সনের ফরাসী রাষ্ট্র-

বিপ্লবের পর ইউরোপে যে নব্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল মন্ত্রটিও এই। সুতরাং আকবর একজন অতুলনীয় অদ্বিতীয় নেশন-স্রষ্টা ছিলেন। বর্তমানের চক্ষে তাঁহাকে এইরূপ দেখা যায়।

আবুল ফজল বলিলেন যে আকবর এই উদার ধর্মনীতি ও সমদর্শিতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া দক্ষ হিন্দুদের উচ্চ উচ্চ রাজ-পদে নিযুক্ত করিলেন, সব সম্প্রদায়ের সাধুদের দক্ষিণা ও সম্মান দিলেন; তিনি এখন একটি মাত্র ধর্মের সেনাপতি অথবা আমির্-উল্-মুমনীন রহিলেন না, জাতীয় রাজা, national king হইয়া উঠিলেন। ইস্লামের ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের উপাধির মধ্যে একটি রব্-উল্-আলমীন অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বের প্রভু, শুধু আরবীয় দেব-দূতের শিষ্যদেরই প্রভু এরূপ বলা হয় নাই।

আকবরের আজ্ঞায় আবুল ফজল কাশ্মীরের এক মন্দিরের প্রস্তর ফলকের জন্য যে লিপি রচনা করেন, তাহাতে লেখা ছিল, "এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছে হিন্দুস্থানের সমস্ত একেশ্বর-বাদীদের হৃদয় একত্র বাঁধিবার জন্ত", এবং লিপির পারসী কথা-গুলির ইংরেজী অনুবাদ এই মত :

O God ! in every temple I see people that seek Thee. and in every language
I hear spoken, people praise Thee !
Polytheism and Islam feel after Thee,
Each religion says, 'Thou art one, without equal.'
. . . Sometimes I frequent the Christian cloister, and some times the mosque,
But it is Thou whom I seek from temple to temple.

এই জন্যই আকবরের আজ্ঞায় আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড ভরিয়া হিন্দুদের শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, আচার-ব্যবহার, এবং দণ্ড-নীতির বিস্তৃত বিবরণ পারসিক ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে পরস্পরের ধর্ম ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইলে আর ধর্মে ধর্মে বিবাদ থাকিবে না,—একেশ্বরবাদী মুসলিমগণও এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিবে যে হিন্দুরাও প্রকৃতপক্ষে এক ঈশ্বরকেই ধ্যান করে। এই মহান ঐক্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে আকবর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের পারসিক অনুবাদ করান, এবং তাঁহার দরবারে তাঁহার উৎসাহে ভারতীয় ও মধ্য-এসিয়ার চিত্রকলার সম্মিলনে এক অতি সুন্দর নবীন চিত্র-পদ্ধতি গড়িয়া উঠে, যাহার জন্ত অনেক হিন্দু ও মুসলমান চিত্রকর বিখ্যাত হইয়াছে।

আল্লাহু আকবর এই বাক্যের অর্থ, আল্লা বা নিরাকার পরমব্রহ্মই সবচেয়ে বড়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য; আর যত দেব-দবী যেমন পৌত্তলিক আরবরা ইস্লাম ধর্ম গ্রহণের আগে আল্ লাট, আল্-উজ্জা, আল্-মনাৎ ইত্যাদি যে সব মূর্তি পূজা করিত, [কুরাণ, ৫৩ সুরা, ১৯-২৩ শ্লোক] তাহারা সকলেই আল্লার নীচে। ব্রহ্মের এই সর্বশ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করাকে আরবি ভাষায় বলে "তক্‌বীর্"—এটা ভক্ত মুসলমানদের একটা কর্তব্য, যেমন ভক্ত হিন্দুরা বলে "জয় দয়াময় হরি"। আকবর সমাজে আল্লাহু আকবর এই সম্ভাষণটি চালাইতে চাহিলেন। আর অমনি গোঁড়া পুরাতন দলের প্ররোচনায় আগ্রা দিল্লীর সাধারণ মুসলমানগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে আকবর নিজেকে ঈশ্বর বানাইতে চাহেন এবং এই বাক্যটির অর্থ হইতেছে "আকবর খোদ্ আল্লা হায়"—আকবর ঈশ্বরের অবতার। অথচ আকবরের ভক্ত হিন্দুরা তাঁহাকে কখনও ঈশ্বর বলে নাই, তাঁহাকে "জগদ্‌গুরু" অর্থাৎ সকলেরই ধর্ম-শিক্ষক এই উপাধি দিয়াছিল। এই মূর্খ অপবাদের জন্য আবুল ফজল বড় দুঃখ করিয়াছেন; তাঁহার আকবরনামা গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তাহা এখনও পড়া যায়।

স্বার্থপর শত্রুগণ আকবরের তক্‌বীরকে বিষফল বলিয়া বর্ণনা করিল, সুল্‌হ্-ই-কুল বা মৈত্রী মহামন্ত্রের প্রবর্তক কাফের হিন্দু হইয়াছেন এই ঘোষণা করিয়া অজ্ঞ সৈন্যদের আকবরের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে উত্তেজিত করা হইল, সেই অবসরে আফগান সীমানা ভেদ করিয়া শত্রুগণ আবার আমাদের দেশ আক্রমণ করিল। কিন্তু সেই সত্যসন্ধানী মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়াইতে পারিল না।

আকবর বাদশার শেষবয়সে রাজ্য ও ধন, সুখ ও সভ্যতা, কল্পনাতীত বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু তিনি নিজে ক্রমেই গভীর-তর বিষাদ ও হতাশায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন, কারণ তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার এই নব রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, দেশের ও দশের মিলন চেষ্টা, সব নষ্ট হইয়া যাইবে, উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও দক্ষ সৎ শিক্ষিত কর্ম-চারীমণ্ডলের অভাবে। এ দেশে জনশিক্ষা, ছাপাখানা বা সংবাদপত্র কিছুই তাঁহার মৃত্যুর দুই শত বৎসর পর পর্য্যন্তও জন্মিল না। অর্থাৎ আকবরের চেষ্টার পরও, ভারতে ক্রমোন্নতির বীজ অঙ্কুরিত হইল না। ভারত পিছাইতে থাকিল, কারণ ইউরোপ বর্ষে বর্ষে নূতন জ্ঞানে নূতন শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। ভারতের যে বিদেশীর হস্তে পরাধীনতা ইহাই তাহার কারণ।

আকবর শব্দটি একটি আরবি বিশেষণ ইহার মানে মহত্তম, সবচেয়ে বড়, যেমন আল্লাহু আকবর অর্থাৎ নিরাকার পরমেশ্বর বা আল্লা সব সাকার দেবদেবীর উপরে এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য।

আকবর বাদশা নিজে ভারতবর্ষের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে মনে হয় যে তাঁহার বাপের দেওয়া নামটি সার্থক, তিনি সত্যই আমাদের রাজাদের মধ্যে মহত্তম, সবচেয়ে-বড় সব চেয়ে ভাল ছিলেন।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা ষ্টেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা

ডাইনীর ছেলে

শ্রীকালীপদ ঘটক, বি-এ

সাঁওতাল পাড়ায় কোত্থেকে এক পাগলা এসেছে। মাথায় তার এক মাথা রুক্ষ চুল, কাঁচায় পাকায় মিশে একেবারে জট পাকিয়ে গেছে। এক মুখ দাড়ির মধ্যে গাল থেকে চিবুক পর্য্যন্ত সমস্তটা ঢেকে আছে পাগলার। ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো বসে গেছে ভিতর দিকে, লম্বা চওড়া দেহখানা নুয়ে পড়েছে বয়েসের চাপে। পরনে তার শতজীর্ণ ময়লা একখানা খাটো কাপড়, গায়ে একটা পাতলা কাঁথার তালি মারা পিরান। সাঁওতাল পাড়ার আনাচে কানাচে ক'দিন থেকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে পাগলাকে। লোকটা অদ্ভুত ধরণের। আপন মনে বিড় বিড় ক'রে হরদম সে বকতে থাকে, আর মাঝে মাঝে আঙ্গুলের চাঁটি দিয়ে গোলমত টিনের একটা কৌটা বাজায়। সাঁওতাল পাড়ার ভিতর দিয়ে পাগলা যখন আসা-যাওয়া করে, কত লোক কত কথাই জিজ্ঞাসা করে ওকে। পাগলা কিন্তু কারো কথার জবাব দেয় না। কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল পিছু পিছু ধাওয়া করে পাগলার, কেউ কেউ বা ধুলো ছোঁড়ে, পাগলার ঝোলা ধরে টান দেয় কেউ, কেউ কেউ বা ছুটে গিয়ে পাগলার পিঠে ঝোলানো টিনের বাজনাটায় কাঠি দিয়ে আওয়াজ করতে থাকে। হাজার লোক হাজার কথা বলে, নানা ভাবে উত্যক্ত করে—তামাশা করে পাগলাকে নিয়ে। পাগলা কিন্তু ভুলেও একটা কথা কয় না কারো সঙ্গে। বাজে লোকের বাজে প্রশ্নের জবাব দেওয়া সে নিষ্প্রয়োজন মনে করে।

গাঁয়ের লাগাও পড়ো খানিকটা জমির উপর সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে জড় হয়েছে বিস্তর। পাগলাকে চারদিক থেকে ওরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ঝোলা থেকে বাঁশের একটা আড়বাঁশী বের ক'রে বাজাতে সুরু করেছে পাগলা, বাঁশী রেখে টিনের কৌটাটায় এক একবার চাঁটি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বিড় বিড় ক'রে অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি যেন আওড়ে যাচ্ছে পাগলা, বলে মন্তর—ডাইনী-ছাড়ানো মন্তর। পাগলার ভাবভঙ্গি দেখে ছেলেমেয়েরা হো হো ক'রে হাসতে থাকে।

চোখ পাকিয়ে বলে উঠল পাগলা—জানে মরে যাবি, এক দম জানে মরে যাবি। জিতু হাড়ামের বাপ পিতু হাড়াম আমি—ওস্তাদের বেটা ওস্তাদ, বুঝে কাজ করিস আমার সঙ্গে। ঝাড়ব এমন এক বিষমন্তর—

পাগলা খপ্ ক'রে একটি মেয়ের হাত চেপে ধরে, বলে—লাচ্‌তে হবে তোকে, আটনে বসে ডুগ্‌ডুগি বাজাব আমি, আর ধেই ধেই ক'রে তুই লাচবি।

মেয়েটি পাগলার হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে আর এক পাশে দাঁড়ায়, ঘাড় নেড়ে বলে—নাই লাচবো।

টিনের কৌটাটা ঝুলি থেকে বের ক'রে চাঁটি মারতে থাকে পাগলা, বলে—লাচবি কি তুই, লাচবে তোর বাপ।

এই বলে পাগলা সুর ক'রে আওড়াতে থাকে :—

ডাম লাচে, ডাখিনী লাচে, লাচে রাঙাধারী,
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্—ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্—
কে লাচে—বিষাহী লাচে—পিঁচেশ লাচে—বকস লাচে—
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্—ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্—।

ঝোলা থেকে সরু মত এক টুকরো হাড় বের ক'রে সামনের দিকে বন্ বন্ করে ঘুরোতে থাকে পাগলা, নিজের মনেই নানা রকম ক্রিয়াকলাপ করতে থাকে ছেলেমেয়েদের সামনে। চোখ তেড়ে মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে পাগলা—লাচ তোরা লাচ, জিতু হাড়ামের বাপ পিতু হাড়ামের আজ্ঞা—ধেই ধেই ক'রে লাচ।

কি রকম ভাবে নাচতে হবে নিজেই পাগলা ধেই ধেই ক'রে নেচে একবার দেখিয়ে দেয়। ছেলেমেয়ের দল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, পাগলাও ওদের সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠে। ছোট্ট একটি মেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলে—লাচবো আমি।

পাগলা খুশী হয়ে বলে—তাই লাচ, আমি ডুগডুগি বাজাই।

এই ব'লে পাগলা টিনের কৌটায় চাঁটি লাগায়, আর মুখ দিয়ে শব্দ করতে থাকে—ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্—ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্—।

আর একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলে—আমি লাচবো।

পাগলা বলে—তুই—তুইও লাচবি ?

অপর মেয়েরাও একে একে এগিয়ে এসে বলতে থাকে—আমি লাচবো—আমি লাচবো।

এ বলে—আমি লাচবো, ও বলে—আমি লাচবো। চারদিক থেকে পাগলাকে ঘিরে হৈ হৈ করতে থাকে ছেলেমেয়ের দল, বলে—আমি লাচবো—আমি লাচবো।

হাতের বাজনা হঠাৎ থেমে যায় পাগলার, এর ওর মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবতে থাকে পাগলা, মুখে চোখে ওর কি যেন একটা আতঙ্কের চিহ্ন হঠাৎ ফুটে উঠতে থাকে।

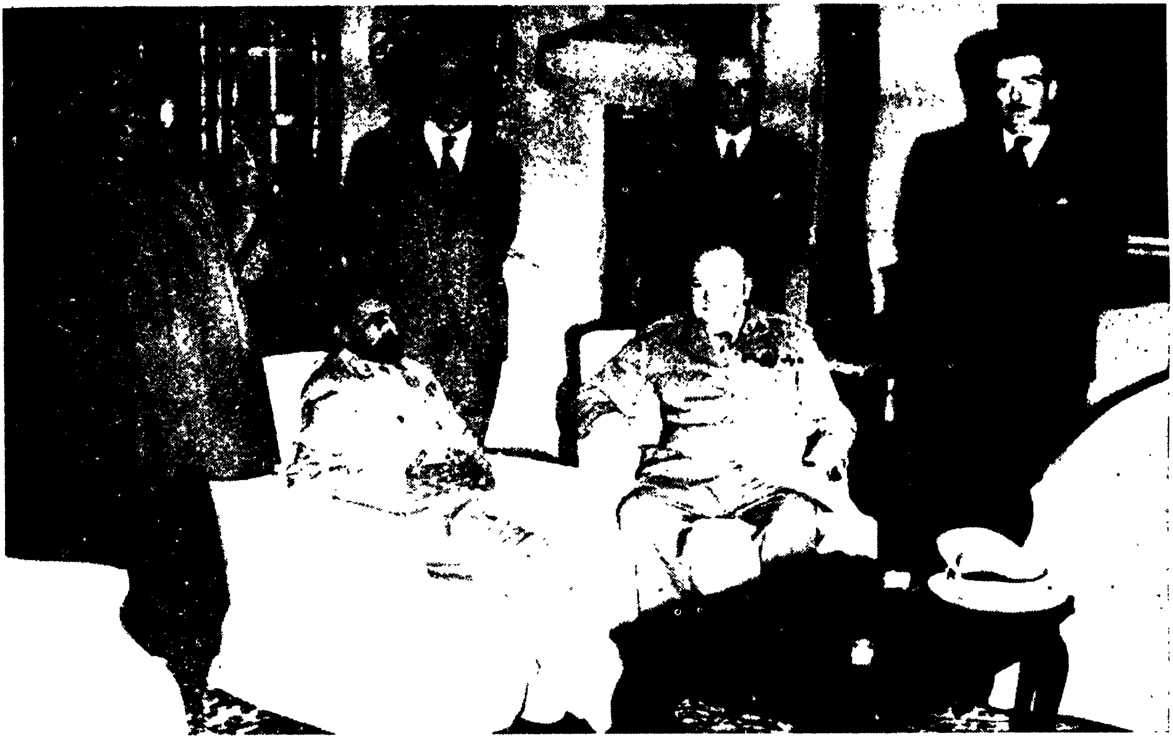
চারি দিকে রব উঠছে—আমি লাচবো, আমি লাচবো।

পাগলা তাড়াতাড়ি ওর আসবাবপত্র ঝোলায় গুটিয়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠল—ওরে না—না—লাচিস না—লাচিস না—কেউ তোরা লাচিস না, বংশের মান যাবে—চুণ কালি পড়বে তোদের মুখে, গাঁয়ের লোকে জ্যান্ত তোদের পুড়িয়ে মারবে। আমি বলছি—পিতু হাড়াম তোদের কিছু করতে পারবে না, ভুল—ভুল—বুজরুকি, খবরদার—খবরদার তোরা লাচিস না।

কি এক আকস্মিক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে পাগলা। বিস্মিত জনতা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

* * *

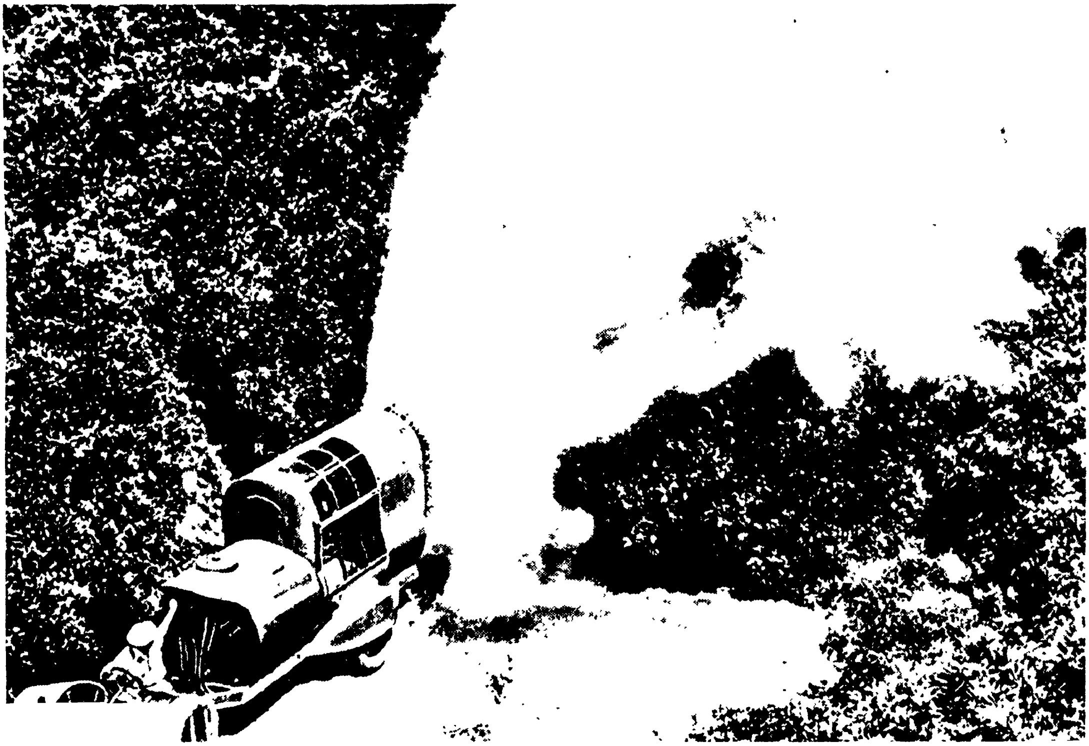
পাড়ায় ঘরে গুজব রটেছে রাগদা সাঁওতালের মা নাকি ডাইনী। বুড়ীকে দেখে কাছে আসে না কেউ, দূর থেকে পাশ কাটিয়ে যায়। কি জানি হঠাৎ মনে মনে দেয় যদি বিষ-মন্তর ঝেড়ে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। ওরা নাকি সব পারে,



ইয়াল্টা সম্মিলনী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কায়রোতে হাইলে সেলাসীর সহিত মিঃ চার্চ্চিলের মোলাকাৎ



কায়রো-পরিদর্শনকালে মিশরের রাজা ফারুকের সহিত আলাপ-আলোচনারত মিঃ চার্চ্চিল



দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত তরল বিন্দুনিক্ষেপক যন্ত্র-সাহায্যে ফলবাগানস্থ কীটপতঙ্গাদির ধ্বংসসাধন



মার্কিন রেডক্রশ কর্ত্তৃক 'শাম্পান'-যোগে চীনে ঔষধপত্র প্রেরণ

মরা মানুষকে বাঁচাতে পারে, আবার জ্যান্ত মানুষকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলতেও বড় বেশি ওদের সময় লাগে না। ডান-মন্তর ভীষণ মন্তর। ডাইনী যার নাম ধরে মন্তর পড়বে তাকে দিয়ে নাকি সে সব করাতে পারে—হাসাতে পারে, কাঁদাতে পারে, দুপুর রাতে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে শ্মশান-ঘাটে নাচাতে পারে। সেই সঙ্গে ডাইনী নাচে—উপর দিকে পা দুটো আর নীচের দিকে মাথা ক'রে, আশেপাশে তার নাচতে থাকে দাঁত বের-করা মড়ার মাথা। অন্ধকার রাতে শ্মশানে গিয়ে 'বাট বায়' এরা। এ সব নাকি ডান-ডাকিনীর খেলা।

সাঁওতাল বুড়ী লোক খুব ভালই ছিল। ননকু হাড়ামের বৌ টুসকি মেঝেন, সাত চড়ে মুখে রা ছিল না। গাঁয়ের লোকে শ্রদ্ধা করত বুড়ীকে, ভালবাসত যথেষ্ট। প্রাণ দিয়ে লোকের উপকার ক'রে এসেছে বুড়ী সারাজীবন। রাগদার মা না হলে পাড়ার লোকের চলতো না—যে কোন কাজকর্ম্মে ভোজে কাজে সলা-পরামর্শে রাগদার মায়ের ডাক পড়ত আগে। কিন্তু বরাতের ফের, কোথেকে যে ডানমন্তর শিখে এলো বুড়ী! বুড়ীকে আর বিশ্বাস করে না কেউ, রীতিমত ভয় ক'রে চলে। লোকে বলে—ডাইনী, বিষাহী। ডাইনীদের অসাধ্য কাজ নাই, ওরা নাকি কচি ছেলের রক্ত চুষে খায়, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ভ্রূণস্থ সন্তানকে মন্ত্র পড়ে নষ্ট করে দেয়, কারো মুখে রক্ত ওঠায়, কারো ঘাড়ে ভর ক'রে মাঝে মাঝে তাকে 'উদ্ভ্রান্ত' ক'রে তোলে। ডাইনী যাকে আশ্রয় করে অপঘাতে মৃত্যু তার অবধারিত।

সাঁওতালদের ছোট পল্লী। পাহাড়ী নদীর তীর ঘেঁসে মহুল বনের ফাঁকে ফাঁকে গোবর মাটি দিয়ে নিকানো পোঁছানো ঝর ঝরে কুঁড়ে ঘরগুলি যেন এক একটি ক'রে সাজানো। কাছাকাছি আরও কয়েকটি সাঁওতাল পল্লীর কেন্দ্রস্থল এই ছোট্ট গ্রামখানি। প্রাচীন যুগের বর্ব্বর জাতি বলে আজও যাদের স্মরণ করা হয় তাদেরই একটা অংশবিশেষ পুরোদস্তর আজও তাদের আদিমতার ছাপ রেখে দিয়ে গেছে তাদেরই এই বংশধর-গুলির মধ্যে—এ গাঁয়ের যারা বাসিন্দা। মাটি কুপিয়ে জমি চষে জীবিকা নির্ব্বাহ করে এই সাঁওতালের দল। অসুরের মত শক্তি এদের গায়ে, দুনিয়াকে এরা পরোয়া করে না। এদের রসদ যোগায় মাটি, আনন্দ যোগায় নাচ গান আর হাড়িয়া।* মাঝি মেঝেনদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ সাবলীল। যা বোঝে এরা ভালই বোঝে, আর যেটা এরা ভাল বোঝে সেটাকে আর মন্দ বুঝতে চায় না কোন মতেই। সংস্কারই এদের কাছে সব, যুক্তিতর্কের ধার ধারে না এরা। ঠাকুর-দেবতা এদের সবই আছে, মাটির ঢিবি আর শালগাছের পুজো ক'রেই খুশী এরা। 'বংহা' এদের দেবতা, 'মারাং বুরু' ভগ-বান। বংহা পুজোর পদ্ধতি এদের ভাল রকমই জানা আছে, দেবতাকে এরা মনে প্রাণে ভক্তি করে। কিন্তু শুধু দেবতাই নয়, অপদেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এরা অতিমাত্রায় সচেতন। ভূত প্রেতকে এরা অত্যন্ত ভয় করে, বিশেষতঃ ডাইনীর নাম শুনলে আঁতকে উঠে এরা। ডাইনীকে তাড়াবার জন্ত এরা সব করতে পারে। মন্ত্রতন্ত্র ওঝা জানগুরু থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনবোধে লাঠিসোঁটা ও তীর ধনুক পর্য্যন্ত প্রয়োগ ক'রে বসে এরা ডাইনীকে একেবারে শেষ ক'রে ফেলবার জন্ত। এদের চোখে ডান-ডাকিনীর আবির্ভাব একান্তই ভয়াবহ।

এ গ্রামে ডাইনীর উপদ্রবের কথা বহুকাল যাবৎ শোনা যায় নি। সম্প্রতি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে গাঁয়ের উপর কুদৃষ্টি পড়েছে অপদেবতার, ডাইনী ঢুকেছে এই সাঁওতাল পাড়ায়। টুংরা মাঝির ছোট ছেলেটা আকস্মিক পেটব্যথায় ধড়ফড় করছে আজ ক'দিন থেকে, গাছগাছড়া কাস্তের চিড়ি† বা শামুক পোড়ায় ওষুধ ধরে নি এতটুকু। রামা সাঁওতালের বার তের বছরের মেয়েটা—এতখানি গতর—ধুমধুমে চেহারা, রোগ নাই বালাই নাই দুপুর রাতে সেদিন মুখে রক্ত উঠে মারা গেল হঠাৎ। রাবণ মাঝির পরিবারের সাত মাসে গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে কয়েক'দিন মাত্র আগে। চা'র দিক দিয়ে শুধু অলক্ষণ আর মহামারী কাণ্ড।

অল্প দিনের মধ্যেই উপর্য্যুপরি কয়েকটা এই রকমের ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় পাড়ার লোকের মনে সন্দেহ জাগে এ সব কোন অপদেবতা বা ডান-ডাকিনীর ক্রিয়াকলাপ বলে। জানগুরুর কাছে গিয়ে ধন্না দেওয়া হয়, তিন-তিনটে জানগুরু গুনে গেঁথে একই কথাই বলেছে, এ সমস্তই নাকি ডাইনীর খেলা, ডাইনী ঢুকেছে সাঁওতাল পাড়ায়। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে একজন নাকি ডাইনীর নাম পর্য্যন্ত বাতলে দিয়েছে, এই পাড়ারই রাগদা মাঝির মা বুড়ীই নাকি ডাইনী। ভিন্ গাঁয়ের এক ডাকসাইটে ডাইনীর কাছ থেকে ডান-মন্তর শিখে এসেছে বুড়ী, মরবার সময় রাগদার মাকে সে মন্তর দিয়ে গেছে। সেই থেকে ক্রমাগত পাড়ার লোকের ক্ষতি করতে আরম্ভ করেছে বুড়ী। এ ডাইনীকে তাড়াতে না পারলে গাঁ-শুদ্ধ ছারখার হয়ে যাবে, জানগুরু এদের সতর্ক ক'রে দিয়েছে।

সাঁওতাল বুড়ীকে লোকে এড়িয়ে চলে, পথে ঘাটে দেখা হলে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে যায়, পাড়ায় ঘরে সব বুড়ীকে দেখে তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ ক'রে দেয়, উঠান থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে আগল বন্ধ করে।

সাঁওতাল বুড়ী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে এদিক ওদিক চাইতে থাকে, মনে মনে হয়ত বা কি ভাবে। কে জানে হয়ত বুড়ী মনে মনে বিষমন্তর ঝাড়ে, কুঁচের মত কোটরগত চোখ দুটো তার আশেপাশে হয়ত শিকার খুঁজে বেড়ায়। গাঁয়ের লোক জেনে ফেলেছে রাগদার মা ডাইনী।

রাগদা ভয়ানক রাগী মানুষ, অত্যন্ত একরোখা; তাই এ কথাটা রাগদার কাছে এ পর্য্যন্ত কেউ উত্থাপন করতে সাহস করে নি। তা ছাড়া রাগদা কারো সাতে-পাঁচে থাকে না, বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশাও তার কম। আপন মনে নিজের ধান্দায় মশগুল হয়ে থাকে রাগদা। বাড়িতে তার মা আছে, সংসারের দায়িত্ব সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত। বৌ আছে মা বুড়ীকে তার সাহায্য করতে, ছোট বোন আছে মুংলী, সেও তার মায়ের সঙ্গে গতর খাটিয়ে ভাইয়ের সংসারে সাহায্য করে যথেষ্ট। রাগদার আর ভাবনা কিসের। কয়েক বিঘা ধানের জমি রাগদার পৈত্রিক সম্পত্তি, তার জন্ত দুটো

* হাড়িয়া—পচুই মদ,

† চিড়ি—কোঝা

বলদ আছে, একখানা লাঙল আছে, মস্ত একটা কুরল* আছে, ধান চালাতে শক্ত পোক্ত একখানা গাড়ীও আছে। ব্যস্—আর চাই কি! চাষের কাজটুকু কোন রকমে শেষ করে দিয়েই রাগদা খালাস। ধান থেকে চাল করাবার ভার মা বুড়ীর উপর, বৌ বেটীকে বুড়ী রীতিমত তালিম ক'রে নিয়েছে। এক মুহূর্ত্ত বসে থাকে না বুড়ী, একটা না একটা কাজ নিয়ে হরদম সে ব্যস্ত থাকে। বুড়ো মানুষ যে এত খাটতে পারে—রাগদার মাকে না দেখলে তা বিশ্বাস করবার উপায় নাই। চিরটাকাল খেটে এসেছে বুড়ী, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে, চুপচাপ কিছুতেই বসে থাকতে পারে না। বিশেষতঃ রাগদাকে সুখী করবার জন্য—রাগদাকে একটু আরামে রাখবার জন্য কি না করতে পারে বুড়ী! যত কিছু সুখ-দুঃখ, যা কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই যে ওর রাগদাকে নিয়ে, রাগদার যে ও মা—রাগদা যে ওর ছেলে। রাগদার বাবা মারা যাওয়ার পর এইটুখানি বয়েস থেকে বহুকষ্টে রাগদাকে মানুষ ক'রেছে বুড়ী। সে সব কথা মনে হলে বুড়ীর চোখে জল আসে আজও। বংহার দয়া—রাগদা আজ যোয়ান হয়েছে, ঘরজোড়া ঘর আলো করা বৌ এসেছে রাগদার, দু'দিন পরে রাগদার আবার ছেলে হবে। আর বুড়ীর চাই কি! রাগদার সুখের সংসার নিজের হাতে গড়ে তুলেছে বুড়ী। এই ভিটের মাটিটুকু পর্য্যন্ত বুড়ীর কাছে স্বর্গ, রাগদা যেন বুড়ীর চোখে জীবন্ত এক স্বপ্ন। রাগদাকে ছেড়ে একটি দিনও থাকতে পারে না বুড়ী, সব সময় যেন ডানা দিয়ে ওকে ঢেকে রাখতে চায়।

ভয়ানক শিকারী লোক এই রাগদা। ধান চাষের সময়টুকু বাদ দিয়ে বৎসরের বাকি সময়টা সে বনে জঙ্গলে শিকার ক'রে বেড়ায়। ছেলেবেলা থেকেই শিকারের দিকে ঝোঁক ওর কিছু বেশি। কেউ যদি এসে খবর দিয়েছে যে ঐ দিক দিয়ে কতকগুলো শশক ছুটে গেল, কিম্বা অমুক জায়গায় একদল বরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছুটলো রাগদা তীরধনুক নিয়ে। যত দূরেই হোক শিকারকে সে ঘায়েল না করে কোন মতেই ফিরবে না। সেবার একটা ঝিঙেফুলি বাঘকেই দলদলির জঙ্গলে সাবাড় ক'রে দিয়েছিল রাগদা একটি তীরেই। এমনি রাগদার কাঁড়ের জোর। শিকার পেলে রাগদা আর কিছু চায় না, যেখানেই যাক তীরধনুক ওর সঙ্গেই থাকে। রাগদার বাবা শিকারী ছিল খুব ভাল, কিন্তু একগুঁয়ে ছিল ভীষণ। বাপের গুণগুলো ষোল আনাই রাগদার মধ্যে বর্ত্তেছে। এমনিতে দেখতে বেশ ভালমানুষটি, কিন্তু রাগলে ও তিলকে হঠাৎ তাল ক'রে বসে। রাগদার মা জীবনে কখনও শাসন করে নি ছেলেকে, হাজার দোষ করুক রাগদার উপর সে কঠোর হতে পারে না। এইখানেই বিশেষ একটু দুর্ব্বলতা ছিল বুড়ীর। অথবা এ শুধু রাগদার মায়ের দুর্ব্বলতা কেন, সকল দেশের সকল মায়ের মধ্যেই এ দুর্ব্বলতাটুকু বর্ত্তমান, কম আর বেশি। রাগদা অবশ্য জীবনে কখনও মাকে ওর অশ্রদ্ধা করে নি কোন দিনই যত বড় শিকারীই হোক রাগদা মার কাছে ওর কোন জোরই খাটে না।

রাগদার মাকে এতকাল ধ'রে মান্য ক'রে এসেছে যারা, যারা তাকে ভালবাসত শ্রদ্ধা করত বরাবর, তাদের কাছেই বুড়ী যেন আজ অবাঞ্ছিত, একান্তই অনাবশ্যক। অপবাদ রটেছে বুড়ীর নামে ডাইনী ব'লে। প্রকাশ্যে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ ও প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে নি বুড়ীর সঙ্গে, হয়ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে। ভিতরে ভিতরে কিন্তু ষড়যন্ত্র চলছে—ডাইনকে জব্দ করতে হবে, নইলে যে গোটা গাঁয়ের অমঙ্গল।

কিসকু সাঁওতালের বৌ লখী মেঝেন ক'দিন থেকে অসুখ অবস্থায় বিছানা আঁকড়ে পড়ে ছিল। নড়বার-চড়বার শক্তি ছিল না বৌটার। সেদিন হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসল লখী, তারপর সে নিজের মনেই বিড়বিড় ক'রে বকতে আরম্ভ করলে, আবোল-তাবোল যা তা বলতে লাগল। থেকে থেকে লখী হি-হি করে হেসে উঠে, হাসতে হাসতে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে। বাড়ীর লোকজন সব হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল; লখী বৌয়ের কাণ্ড দেখে সব অবাক। ক'দিন থেকে যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি, আজ হঠাৎ তার একি কাণ্ড!

কিসকু মাঝির বড়ভাই একজন বহুদর্শী লোক, এ সব ব্যাপার তার অনেক দেখা আছে, কিছুক্ষণ সে লখীবৌয়ের হাবভাব লক্ষ্য করেই ধরে ফেললে—বৌটাকে ডানে খেয়েছে, ডাইনী এসে ভর করেছে লখীবৌয়ের ঘাড়ে। ব্যাপারটি সোজা নয়, বাড়ীর লোকজন সব আঁতকে উঠল ডাইনীর কথা শুনে। কিসকুর চোখ দুটো হঠাৎ কপালে উঠে গেল, ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, বললে, বলিস কি বাইয়া, ডাইনী! তা হলে?

কিসকুর বড় ভাই বললে, আমি ওঝা ডেকে আনি, তোরা ওকে আগলে থাক, দেখি যদি হপন মাঝি কিছু করতে পারে।

হপন মাঝি এ অঞ্চলের একজন নামকরা ওঝা, জানগুরু বলেও তার সাঁওতাল মহলে খ্যাতি আছে যথেষ্ট। কিসকুর বড়ভাই পাশের গাঁ থেকে হপন মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী পৌঁছল এসে প্রায় রাত দুপুরের কাছাকাছি। লখী-বৌ তখন দাওয়ার উপর চেপে বসে বাড়ীর লোকের প্রত্যেকের নাম ধরে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেছে বেপরোয়া, কিসকু মাঝি একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছে লখী-বৌকে সামাল দিতে গিয়ে, কি যেন একটা উৎকট উত্তেজনা লখী মেঝেনকে পেয়ে বসেছে। লখীর মুখ চোখের ভাব দেখেই হপন মাঝি বলে উঠল—এ যে ভারি জবর ডাইনী, কোত্থেকে জুটল এসে হঠাৎ?

ডাইনী যে কোত্থেকে এসে জুটেছে সে খবরটুকু জানা নাই কারোই, জানগুরু হপন মাঝিকেই এ তথ্যটুকু আবিষ্কার ক'রে নিতে হ'ল লখী বৌয়ের মুখ দিয়েই। প্রথম দিকটায় ডাইনী কিন্তু আমল দিতে চায় নি মোটেই হপন মাঝিকে, মন্তর-তন্তরে তার কাজ হ'ল না বিশেষ কিছু;—নুনপড়া, হলুদ পড়া, সাত পুকুরের জলপড়া, মায় গোদা সাপের খোলসপড়া পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল হপন মাঝির, শেষে ধুনোগুঁড়োর বাণ মেরে আর সেই সঙ্গে চেলা কাঠ দিয়ে ডাইনীকে শুয়োর-ঠেঙ্গা করতে করতে বহুকষ্টে তাকে তাড়াতে হ'ল হপন মাঝিকে। ওস্তাদ

* মাটি সমতল করবার জন্য হাতল লাগানো তক্তাবিশেষ।

হপন মাঝির তাড়ায় যাবার সময় ডাইনী তার নাম প্রকাশ ক'রে গেল নিজের মুখে,—এই পাড়ারই রাগদা মাঝির মা সে, টুশকী মেঝেন।

সকলেই খাপ্পা হয়ে উঠল টুশকী মেঝেনের নাম শুনে, পাড়ায় ঘরে তাদের এত বড় ডাইনী, কি ভয়ানক কথা! কিসকূ মাঝি চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, বুড়ীকে আমি খুন করব, হারামজাদীর এত বড় সাহস।

বাঁশের একটা লাঠি হাতে নিয়ে হন্ হন্ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিসকু, রাগদার সঙ্গে সে বোঝাপড়া করতে চায়, এর একটা বিহিত না ক'রে কোন মতেই সে ক্ষান্ত হবে না। কিসকুর দাদা হঠাৎ ধরে ফেললে কিসকুকে, রাত দুপুরে একটা হৈ চৈ বা লাঠালাঠি করে লাভ নাই কোন, সকালবেলা যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কিসকুর কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ গুর গুর ক'রে কাঁপছে রাগে, অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বহুকষ্টে তাকে ক্ষান্ত করা হ'ল রাত্রের মত।

সকালবেলা পাড়ার দু-একজন মাতব্বর লোককে চুপি চুপি গিয়ে ডেকে নিয়ে এল কিসকু। যেমন ক'রে হোক এর প্রতিকার করতে হবে, ডাইনীকে গাঁ থেকে তাড়াতেই হবে। তার আগে ব্যাপারটা অবশ্য ভাল রকম যাচাই করে নেওয়া দরকার, হাতে নাতে প্রমাণ করা চাই যে রাগদার মা ডাইনী, নইলে রাগদা হয়ত বিশ্বাস করবে না এ সব কথা, রাগের মাথায় হয়ত বা একটা কাণ্ড ক'রে বসবে।

খয়েরবনির জিতু মাঝি নাকি মস্ত বড় জানগুরু, ডাকসাইটে ওঝার বেটা ওঝা। ডাইনীকে সনাক্ত এবং শায়েস্তা করতে জিতু মাঝির নাকি জোড়া নাই। মন্ত্রের জোরে ডাইনীকে সে বাড়ী থেকে টেনে আনতে পারে যে কোন প্রকাশ্য জায়গায়; উলঙ্গ অবস্থায় তাকে নাচাতে পারে, হাসাতে পারে কাঁদাতে পারে, বাণ মেরে তাকে একেবারে দেশছাড়া ক'রে দিতে পারে। পরামর্শ স্থির হয়ে গেল সেই জিতু মাঝিকেই ধরে এনে এর প্রতিকার করতে হবে, জিতু হাড়াম এসে ডুগডুগি বাজাক,—চলুক তার সঙ্গে ডাইনীর নাচ। দশ জনের সামনে এসে আগে নাচুক বুড়ী, তারপর তাকে দেখে নেওয়া যাবে। রাগদা মাঝির মা ব'লে কেউ ছেড়ে কথা কইবে না, গাঁয়ের লোক সব এক জোট হয়ে ওর ঘরবাড়ী ভেঙে চুরে রাগদার গুষ্টিকে শুদ্ধ ঠেঙিয়ে দূর ক'রে দেবে সাঁওতাল-পাড়া থেকে। জানগুরু জিতু মাঝিকে যেমন ক'রে হোক ধরে আনতে হবে।

* * *

রাগদার বোন মুংলীর বিয়ে। মহুলপাহাড়ীর হাঁসদাদের বাড়ী কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেছে, ঘর বর খুব ভাল। মুংলী ডাগর মেয়ে, দেখতে বেশ সুশ্রী, দেহখানি স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে ভরা। তাই মুংলীর বিয়ে ঠিক করতে রাগদাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, হাঁসদাদের মত উঁচু ঘর নগদ দেড় কুড়ি টাকা পণ দিয়ে মুংলীকে বৌ করতে রাজি হয়েছে। 'হরকবাঁদির' সঙ্গে সঙ্গে 'লগম বাঁধা' সমাধা হয়ে গেছে, কয়েক দিন পর বিয়ে। রাগদা মাঝি বোনের বিয়ের জন্ত তৈরি হয়ে আছে। মুংলীর বিয়েতে বাকি সে কিছুই রাখবে না, জাঁকজমকের চূড়ান্ত করবে রাগদা। কুটুম্ব ও বরিয়াতদের স্বীকার করে যেতে হবে যে মহুল পাহাড়ীর হাঁসদাদের চেয়ে রাগদা সরেন কোন অংশেই খাট নয়।

রাগদা আর রাগদার মায়ের খেতে শুতে সময় নাই, মুংলীর বিয়ের তোড়জোড় চলছে।

রাগদার বৌ আর মুংলী—বেশী দিনের ছোট বড় নয় ওরা, রাগদার বৌ বছর দুয়েক বড় হবে। ননদ ভাজে ভাব ওদের প্রচুর। মুংলীর বিয়ে হবে, রাগদার বৌ ভারী খুশী। মুংলীর বিয়ের কথা নিয়ে রাগদার বৌ মুংলীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে প্রায়ই। মুংলীর বর নাকি দেখতে খুব সুন্দর, হাঁসা ফিট্ গায়ের বন্নো ঠিক যেন 'দিকুপিড়া'। মুংলী কিন্তু চটে যায় ভীষণ, ফরসা রঙের বর মানেই গালাগালি দেওয়া, দিকুপিড়াকে বিয়ে করতে মুংলীর বয়েই গেছে। তা ছাড়া বিয়ে করতে ওর আগ্রহ খুব কম, বলে—মা বুড়ীকে ছেড়ে, দাদাকে ছেড়ে যেতে লারবো আমি, বিয়ে আমি কোন মতেই করবো না।

রাগদার বৌ হেসে বলে—মাঝি আগে আসুক ত—তারপর দেখা যাবেক মেঝেন বিয়ে করে কিনা। 'হরকবাঁদি'* হয়ে গেল, আবার চালাকি।

মুংলী বলে, হোকগে যেয়ে হরকবাঁদি, বিহাটিহা আমি করবো নাকো।

রাগদার বৌ মুচকি হেসে বলে, আমরাও তখন বলতোম যে কিসকে ওসব, কিন্তু মনে মনে কি হত জানিস? মনে হ'ত কতক্ষণে মাদল বাজে, 'দা বাপলা'র† লাচন দেখে বুকের ভেতরটা আঁকপাকু করত, ভাবতাম আমার লেগে এরা কখন লাচবেক। সত্যি বলছি ননদ, তোর কাছে মিছা বলি নাই।

রাগদার বৌয়ের কথা শুনে হো হো ক'রে মুংলী হেসে ওঠে, রাগদার বৌও হাসতে হাসতে একটা 'দং-সিরিং' গেয়ে ওঠে। দং-সিরিং সাঁওতালদের বিয়ের গান।

রাগদার বৌ সন্তানসম্ভবা, মাতৃত্বের ঢল ওর সারা অঙ্গে উপচে উঠছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে মুংলী ওর বৌদিদির মুখের দিকে, দং সিরিং শুনতে ওর ভালই লাগে। রাগদার বৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মুংলীর দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এই সে দিন সে নতুন বৌ হয়ে বাড়ী ঢুকেছে এসে, কদিনই বা হ'ল; এবার তার মা হওয়ার পালা, কচি একটি 'গিদ্‌রে'‡ এসে নতুন মায়ের সারা কোল জুড়ে বসবে। মুংলী হঠাৎ বলে ওঠে,—বঙ, তোকে একটা মজুক দেখাব, তোর ছেলের জন্তে দাদা কি একটা তৈরি করেছে দেখাই এনে থাম্।

মুংলী ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা বাঁশের ধনুক নিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। রাগদার বৌ ধনুকটা দেখে অবাক, হো হো করে হেসে উঠল ওরা দুইজনেই। ধনুকটা এত ছোট যে ব্যবহারের দিক থেকে ওটা কোন কাজেই লাগতে পারে না, বড় জোর ছেলেপিলেদের খেলনা হতে পারে। রাগদার উদ্ভট খেয়াল, ধনুকটা কখন তৈরি করে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, মুংলী সেটা আজ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

---

* হরকবাঁদি—পাকাদেখা। † দা বাপলা—জলসওয়া।
‡ গিদ্‌রে—শিশু।

ধনুকটা ছোট হলেও তৈরির দিক থেকে অঙ্গহানি করা হয় নি এতটুকু। বাঁশের ছিলায় গরুর লেজের গোগালি বেঁধে ধনুকে টান দেওয়া হয়েছে, ছোট দু'টি শরকাঠির কাঁড়—কাকের পালকে খাঁজ কেটে সুতো দিয়ে তার নীচের দিকে চমৎকার ভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভয়ানক শিকারী লোক রাগদা, কাঁড়-ধনুকের মর্ম ওর ভালরকমই জানা আছে।

মুংলী ওর বৌদিদির দিকে চেয়ে বলে ওঠে—বহু, তোর ছেলে খুব শিকারী হবেক, না ?

রাগদার বৌ জবাব দেয়,—হবেকই ত, বাপের মতন হতেই হবেক।

মুংলী হেসে বলে—আর যদি মেয়ে হয়।

রাগদার বৌ হাসতে হাসতে বলে ওঠে—তা হলে এই ধনুকটা না হয় তোর ছেলেকেই দিয়ে দিব, তোরই বা আর ক'দিন।

মুংলী রেগে উঠে বলে—না, ওকথাটি নাই বলিস।

মুংলী যত রাগে রাগদার বৌয়ের কৌতুক তত বেড়ে যায়, বলে, ওটি ভারি লাজের কথা, না ? আচ্ছা বিহাটা ত আগে চুকে যাক, তারপর দেখা যাবেক। তোর বিহাতে যা লাচবো মনদ, সে আমিই জানছি।

মুংলী হেসে বলে—ধামসা পেট নিয়ে লাচবি কেমন করে !

—ইয়েতেই লাচবো, লারি নাকি ! ধর না হয় তুই দং-সিরিং, দেখ লাচতে পারি কিনা।

এই বলে রাগদার বৌ নিজেই একটা দং-সিরিং ধরে দিলে :—

"মা-ই য কাঁদায় ঘরের ভিতর
বাবা য 'াদায় ছামড়া তলে,
দাদা য কাঁদায় লাল ছাতা ধরিয়ঁ।
উঠ বহিন গে ধীরে চল—উঠ বহিন গে ধীরে চল।"

মুংলীর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে রাগদার বৌ দং-সিরিং গাইতে গাইতে উঠানের মাঝখানে নাচতে সুরু করে দিলে। মুংলীও নাচগানে খুব পাকা, সমান তালে পা ফেলে হেলে দুলে নেচে চলল মুংলী প্রাণখোলা অপরূপ নাচ, গেয়ে চলল মন-মাতানো সুললিত গান।

কি সুন্দর এদের নাচ, কি চমৎকার এদের গান ! যারা এদের অশিক্ষিত বর্ব্বর বলে ঘৃণা করে, তারা হয়ত নাচগান এদের দেখে নি। অশিক্ষিত এরা হতে পারে, কিন্তু নাচগানের মধ্যে দিয়ে অপরূপ মাধুর্য্য ও রসসৃষ্টির দক্ষতা এদের অসীম।

মুংলী আর রাগদার বৌ নাচে গানে মশগুল হয়ে উঠেছে, এ ওদের পক্ষে নতুন নয় মোটেই। একসঙ্গে ওরা পরস্পরের হাতে হাতে জড়াজড়ি করে মনের আনন্দে গেয়ে চলেছে :—

"উপর দিকে বিটি জল হলো
নেমু দিকে বিটি জল হলো,
কুলির পথে বিটি না যাইয়ো গো—
পায়ের আলতা ধুয়ো যাবেক।"

রাগদা এতক্ষণ বাড়ী ছিল না, দূর থেকে 'দং-সিরিং'-এর আওয়াজ তার কানে গেছে। হঠাৎ এসে বাড়ী ঢুকতেই রাগদার চোখে প'ড়ল শুধু গানই নয়, নাচও এদের রীতিমত জমে উঠেছে। পা টিপি টিপি ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল রাগদা, মাদলটা গলায় ঝুলিয়ে তক্ষুণি আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। নাচুনীদের ভ্রূক্ষেপ নাই, গান ওরা গেয়েই চলেছে—

—"কুলির পথে বিটি না যাইয়ো গো—
পায়ের আলতা ধুয়ো যাবেক।"

পিছন দিক থেকে হঠাৎ রাগদার মাদল বেজে উঠল—দিং দাহাতাং—দিং দাহাতাং—।

রাগদার বৌ আর মুংলী চমকে উঠল দু'জনেই। রাগদাকে দেখে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেয়ে দু'জন দিলে দু'দিকে দিয়ে দৌড়। রাগদা বললে—সেটি হবেক নাই, তোরা লাচ—আমি বাজাব।

ওদের দু'জনকেই রাগদা আবার ধরে এনে একসঙ্গে জুড়ে দিলে। রাগদার খেয়াল—না নেচে আর উপায় আছে, নাচগান ওদের করতেই হবে। কিন্তু 'দং সিরিং'—বিয়ের গান—ভয়ানক লজ্জা করে মুংলীর, 'দং সিরিং' সে গাইতে পারবে না কোনমতেই। তাড়াতাড়ি মুংলী একটা 'লাগড়ে সিরিং' ধরে দিলে, নাচগান আবার সুরু হয়ে গেল পুরাদমে। গানের সঙ্গে রাগদার মাদল বাজছে—

দাঁড় হিঁতাড় দেঁতিড় দাং হিঁতাড় বেটপ দড়াং
দাঁড় হিঁতাড় দেঁতিড় দাং হিঁতাড় বেটপ দড়াং।
(কেড় কেড় কেড়—কেড় কেড় কেড—।)

নাচগান খুব জমে উঠেছে, এমন সময় মুংলী বাড়ীর পিছন দিকের পলাশ-জঙ্গলের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রাগদাকে বলে উঠল, বাইয়া, হুই দেখ—দেখেছিস !

রাগদা চেয়ে দেখে একটা খরগোস মাটি শুঁকে শুঁকে জঙ্গলের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রাগদা বললে—থাম্।

নাচগান বন্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মাদলটা রেখে তীর ধনুক নিয়ে এল রাগদা। ধনুকটা মুংলীর হাতে গুঁজে দিয়ে রাগদা বললে—মার কাঁড়, খুব জোরসে।

মুংলী বললে—আমি ?

রাগদা বললে—হাঁ, তোকেই মারতে হবে, কদ্দুর শিখলি তার পরীক্ষা দে।

মুংলী রাগদার হাত থেকে একটা তীর টেনে নিয়ে ধনুকে টান দিয়ে বললে—দেখবি তবে, এই দেখ—এক কাঁড়েই সাবাড়।

সোঁ করে তীরটা ছটকে গিয়ে সামনের একটা পলাশ গাছে গেঁথে গেল। মুংলী ব্যস্তভাবে বলে উঠল—ঐ যাঃ, পালাল যে !

তীরের শব্দে চমকে উঠে খরগোসটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেছে। রাগদা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—দে' দে'—আমাকে দে'।

মুংলীর হাত থেকে ধনুকটা এক লহমায় ছিনিয়ে নিয়ে রাগদা খানিকটা ছুটে গিয়ে খরগোসটাকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লে আর একটা তীর।

পলাশবনের শেষ প্রান্তে নদীতীরের সুঁড়ি পথটা এসে যেখানে মিশেছে—খরগোসটা দু'একটা লাফ দিয়ে সেইখানেই ধরাশায়ী হয়ে পড়ল।

রাগদা আর মুংলী আনন্দে চীৎকার করতে করতে ছুটে গেল শিকারের দিকে। খরগোসটা তখনও চোখ মিট মিট করছে, পাগুলো থর থর ক'রে কাঁপছে, দেখতে দেখতে ওটা একেবারেই নিস্পন্দ হয়ে গেল। তীরটা একেবারে পেটের ভিতর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে।

রাগদা উৎফুল্লভাবে তীরটা টেনে বের করতে করতে বললে—মুংলী, আজ ভোজ; লাগা আজ মাংসপোড়া আর হাড়িয়া।

মুংলী একদৃষ্টে খরগোসটার দিকে চেয়ে ছিল, বললে—বাইয়া, একে কেমন কেমন লাগছে, এটা হয়ত গভ্ভিন ছিল।

রাগদা খরগোসটার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল—এ্যাঁ—তাই নাকি!

মুংলী খরগোসটার পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—দেখছিস না, মোটাসোটা লাগছে যে!

রাগদা সায় দিয়ে বললে—হুঁ—গভ্ভিনই বটে।

খরগোসের সামনের পা দুটো টেনে ধ'রে মুংলী বললে—ধর পিছনের পা দু'টো, দু'জনে মিলে এটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

রাগদা একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল, বললে—থাকগে, এটাকে আর ঘরে ঢুকাই কাজ নাই।

মুংলী একটু বিস্মিত ভাবে বললে—কেন বল্ দেখি।

রাগদা জবাব দিলে, ঐ যে গভ্ভিন নাকি বলছিস, এমন জানলে—

এর আগে আরও কত গর্ভিনী শিকার রাগদার কাঁড়ে প্রাণ হারিয়েছে, রাগদা কখনও এতটুকু বিচলিত হয় নি। কচি নধর বাচ্ছাকে শিকারের পেট ফেড়ে টেনে বের করেছে রাগদা, আগুনে ঝলসে হাড়িয়ার চাট করেছে। কিন্তু আজ তাকে এ যেন বেশ ভাল লাগল না।

মুংলী ঈষৎ হেসে বললে,—বুঝেছি, কিন্তু এটা কি হবেক তা হলে?

রাগদা বললে,—পড়ে থাক এইখানে, সন্ধ্যেবেলা শেয়াল-কুকুরে এসে টেনে নিয়ে যাবে।

শিকার ছেড়ে ওরা সরে পড়ল। মুংলী বললে,—কিন্তু বাইয়া, যা তোর কাঁড়ের জোর,—ইঃ!

আত্মগর্বে রাগদার বুক ফুলে উঠল, সন্ধান তার ব্যর্থ হয় নি। দূর থেকে আর একবার খরগোসটার দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠল রাগদা। কত কত বাঘ ভালুক পর্য্যন্ত ঘায়েল হয়ে গেছে রাগদার এই কাঁড়ে, এ ত সামান্য একটা খরগোস।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে একটা পিয়াল গাছের নীচে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুংলী, বললে—বাইয়া, পিয়াল পেকেছে, দুটো পাড়।

মাথার উপর আরও কিছুটা উঁচুতে কতকগুলো পিয়াল ঝুলছে, ঝুপ করে গাছের নীচে বসে পড়ল রাগদা, বললে,—চাপ্ আমার কাঁধে।

মুংলী রাগদার দু কাঁধের উপর দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসতেই ওর হাত দুটো টেনে ধরে উঠে দাঁড়াল রাগদা। রাগদার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে কতকগুলো পিয়াল ছিঁড়ে আঁচলে বেঁধে নিলে মুংলী, তারপর বললে,—নামা।

রাগদা বেশ ভাল মানুষের মত সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে একটুখানি কুঁজো হয়ে দাঁড়াল। মুংলী যেই ওর পিঠের উপর দিয়ে নীচের দিকে নামতে যাবে অমনি রাগদা তাড়াতাড়ি পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে মুংলীর পা দুটো হঠাৎ জড়িয়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুংলী রাগদার গলাটাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, ছাড়্—ছাড়্—নামি।

রাগদা খিল খিল করে হেসে উঠল দুষ্টুমির হাসি, বললে, নামবি কিসকে, একেবারে ঘরে যেয়ে নামবি।

এই বলে রাগদা মুংলীকে পিঠে নিয়ে বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে হাসতে হাসতে উর্দ্ধশ্বাসে মারলে এক ছুট। মুংলী চীৎকার করতে লাগল, ছাড়্—বাইয়া ছাড়্।

মুংলীর কথা শোনে কে, হো হো করে হাসতে হাসতে মুংলীকে পিঠে নিয়ে রাগদা ছুটে চলেছে। দূর থেকে রাগদার বৌ এদের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে একেবারে লুটিয়ে পড়ল। মুংলীকে নিয়ে গিয়ে উঠানের একপাশে ধপ্ করে নামিয়ে দিলে রাগদা। মুংলী ভয়ানক লাজুক মেয়ে, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে ওর বৌদির সামনে থেকে ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

ক্রমশঃ

কোলহানের কোল 'হো' জাতি

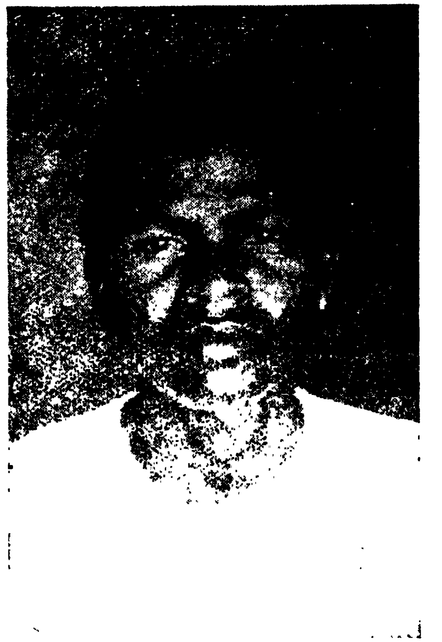
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

ছোটনাগপুর ডিভিশনের সিংভূম জেলার দক্ষিণাংশ কোলহান্, লার্কা (যুদ্ধপ্রিয়) কোল, 'হো'দিগের মূল বাসভূমি, কিন্তু এরা সারা সিংভূম জেলা এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। খন্দমাল যেমন খন্দ জাতির বাসভূমি এবং খন্দ হতেই দেশের নাম খন্দমাল সেরূপ কোল্হান্ও কোল শব্দ হতেই। কিন্তু কোল শব্দে এখানে লার্কা কোল বা হোদেরই বোঝায় যদিও কোল বলতে আমরা রাঁচি হাজারীবাগ অঞ্চলের সাঁওতাল ছাড়া অন্যান্য কৃষ্ণকায় আদিম জাতিদের ধরি; সেজন্য আমরা মুণ্ডা, হো, ওঁরাও, বীরহোর, খাড়িয়া প্রভৃতি সকলকেই সাধারণ ভাবে কোল বলি। এদের ভাষা বিভিন্ন, কোল বলে কোন একটি বিশেষ ভাষা নাই। এদিকে আবার কোলারিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে কিন্তু কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি সব অসভ্য প্রাক্‌দ্রাবিড় জাতিই পড়ে।

হোদের কোল বলে সম্বোধন করলে তারা অত্যন্ত চটে যায়। বর্তমানে আদিবাসী আন্দোলন সুরু হওয়ার ফলে সেটা আরও বেড়ে গেছে। ইংরেজ, বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া



সত্তর বৎসর পূর্ব্বের টাঙ্গি হাতে হো—রিজলে



সেরাইকেলার 'হো'

প্রভৃতিদের দিকু বা বিদেশী বলে 'হো'রা জানে। এই দিকুদের দাসত্ব করে এরা তাদের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হয়েছে। স্বাভাবিক বিবর্তনে এরা উন্নত ও হিন্দু ভাবাপন্ন,—যেমন সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালরা হয়েছে Environment বা পারিপার্শ্বিক হিন্দু সমাজের ফলে, হিন্দু মিশনের জন্য নহে। অথচ খ্রীষ্টান মিশনারীরা বহু দিন ধরে বহু কোলদের ধর্মান্তরিত করেছে। সে সংখ্যা অবশ্য এখনও তুলনায় অল্প।

সাধারণভাবে 'হো'রা বর্তমানে অনেকটা সভ্য হয়েছে। এটা ভাল লক্ষণ, কারণ অজ্ঞতার অন্ধকারে চিরদিন থেকে আদিম জাতিগুলি নৃবিদ্যাবিদ্‌দের গবেষণার খোরাক জোগাবে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়, তবে খ্রীষ্টান মিশনরী প্রভুদের কৃপায় এদের মৌলিকত্ব যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা দুঃখের বিষয়। বিবর্তনের ফলে মানুষ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে, মনুষ্যসমাজ ক্রমশ কুসংস্কার কাটিয়ে উঠছে। তথাকথিত সভ্যসমাজও সুদূর অতীতে এক দিন কোলদের মতই ছিল, অপদেবতা, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস তাদেরও যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে—হোরাও ভবিষ্যতে কুসংস্কার কাটিয়ে উঠবে।

সিংভূম জেলার সদর চাইবাসা থেকে দক্ষিণমুখো কার্ট রোড এবং তার সমান্তরালে বি, এন, রেলপথ চলে গেছে গুয়া পর্যন্ত—কোলহান গবর্ণমেণ্ট এষ্টেট—সরকারী জমিদারীর একেবারে অভ্যন্তর প্রদেশে।

১৯২৩-২৪ সালে রেল-কোম্পানী এই লাইন খোলেন এবং গুয়াতে ইণ্ডিয়ান আয়রন এবং মধ্যবর্তী ষ্টেশন নোয়ামুণ্ডীতে টাটার—লৌহখনি দুটির কাজ আরম্ভ হয়। এই লাইন খোলায় সিংভূম জেলার প্রসিদ্ধি খুব বেড়ে গেছে—খনিজ সম্পদ এবং কাঠ ও শালপাতা প্রভৃতি সংগ্রহকারী বহু কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হয়েছে।

কোলহানের অভ্যন্তরভাগ ভারি সুন্দর। তরঙ্গায়িত বনভূমি, অনুর্বর মালভূমি ও খনিজ ধাতু রত্নাবলীপূর্ণ পাহাড়ের গায়ে হোদের কৃষিক্ষেত্র—এই সকলের সমন্বয়ে কি অপূর্ব দৃশ্যই না চোখে পড়ে।

সারা সিংভূম জেলা এবং সেরাইকেলা ও খারসোয়ান হোদের বর্তমান বাসভূমি। কিন্তু হোদের দেশে উত্তর-পশ্চিম থেকে এসেছে বিহারী ও হিন্দুস্থানীরা, পূর্বদিক থেকে এসেছে বাঙালীরা—ধলভূম ও মেদিনীপুর থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী—এবং দক্ষিণাংশে, গাংপুর, বোনাই, কেওনঝর এবং ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল থেকে ঢুকেছে উড়িয়ারা। অবশ্য হোরাও চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশগুলিতে যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছে।

কোলহান ১৮৩৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে আসে। তখন হোদের বেশ ঘন বসতি ছিল। পাহাড়ে, অধিত্যকায়, পাহাড়তলীতে বহু হো পল্লী চোখে পড়ত। ৬৩০টি গ্রাম ছিল। কিন্তু খনি, কোয়্যারি বা বন কাটা আরম্ভ হয়ে কত হো-গ্রাম নষ্ট হয়ে গেছে। আজ সেখানকার অধিবাসীরা হয় কুলি-লাইনে আছে, নয় আসামের চা বাগানে চলে গেছে। ১৮৩১ সালে মুণ্ডা-বিদ্রোহে হোরা যোগ দেয়। রাঁচির ৺শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর 'মুণ্ডা' নামক বইয়ে বলেছেন হোরা একদল ব্রিটিশ সৈন্য ও কাপ্তেনকে পর্যন্ত পরাজিত ক'রে কলকাতার পথে ফিরতে বাধ্য করে।

গুয়া ও নোয়ামুণ্ডি লৌহখনিতে বেড়াতে গিয়ে লেখকের প্রথম কোলহান এবং হোদের বিষয় কৌতূহল জাগে। চাইবাসায় বহু দিন অবস্থানকালে হো মেয়ে-পুরুষদের সরল ব্যবহার

আমাকে মুগ্ধ করত। সিংভূমের জামসেদপুর ও ঘাটশিলায় হো মেয়ে-পুরুষকে তেমন স্বাধীন ভাবেও চলাফেরা করতে দেখি নাই যেমন দেখেছিলাম চাইবাসায়। জামসেদপুর, ঘাটশিলায় হোরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে অন্যান্য কোলদের সঙ্গে মিশে গেছে। ঘাটশিলাতে ত সাওতালই বেশী!

হোদের সংখ্যা ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী:—১। চাইবাসা (কোলহান)—২,৫১,৯০৬, ২। চক্রধরপুর—৫১,২১২, ৩। মনোহরপুর—২৪,৫২৮, ৪। সেরাইকেলা—২,২৫,১২৫, ৫। ধলভূম—১৪,৮২৩, ৬। খারসোয়ান—১০,৫৮০, ৭। জামসেদপুর—৩,৮৩৫, ৮। ঘাটশিলা—৩,৩৯৫।



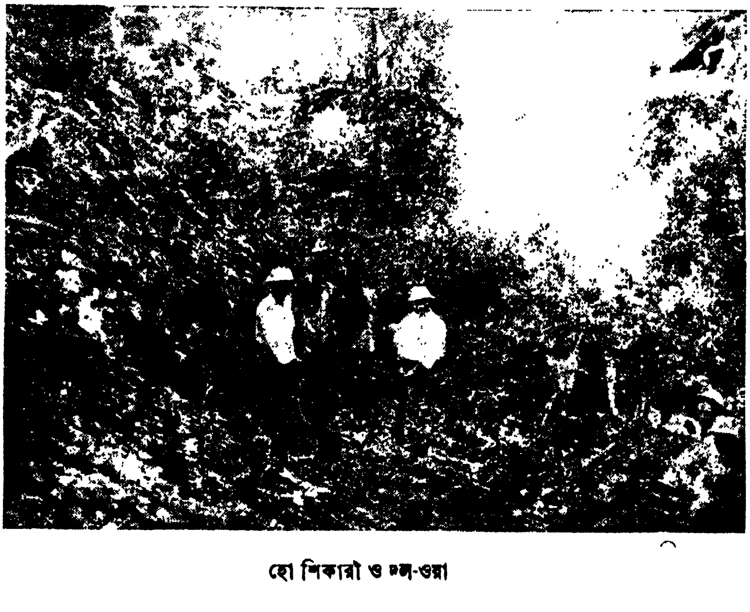
হোদের মোরগের লড়াই

মোট সিংভূমে (৩,৪৯,৩২৯) প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ হো বাস করছে। তাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।

মনে হয় বর্তমানে হো পুরুষদের দেহাবয়বে যেন অবনতি হয়েছে, তার কারণ কুলির কাজ করে আর মদ্যপান করে তারা আর পূর্বের মত সুস্থ সবল নেই। অথচ আগে ওদের স্বাস্থ্য যে কত ভাল ছিল তা টাঙ্গি হাতে কোল-পুরুষের ছবিটি দেখলে বোঝা যায়। হো মেয়েদের, বিশেষ করে যুবতীদের, দেহে এখনও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের লক্ষণ নজরে পড়ে। হাটে-বাজারে রাজপথে প্রফুল্লচিত্ত হো মেয়েদের কষ্টিপাথরের মত কাল দেহের গঠন-সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়। হো মেয়েদের সম্বন্ধে টীকেল লিখে গেছেন,

"Their happy faces, snowy white teeth and robust upright figures remind one of Swiss peasant girls."

মেয়েরা কিন্তু বয়স হলে দেখতে বিশ্রী হয়ে যায়। হো পুরুষদের দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরণের, মাঝে মাঝে দীর্ঘকায় 'হো'ও চোখে পড়ে—মেয়েদের দৈহিক উচ্চতা সাওতাল মেয়েদেরই মত, তবে দীর্ঘাঙ্গীও মাঝে মাঝে দেখা যায়। নাক চওড়া চ্যাপ্টা (platyrrhine)। মাথা লম্বাটে ধাঁজের (dolichoid), চুল কোঁকড়ানো, মুখ অল্প চওড়া গোছের, গণ্ডদেশ ঈষৎ উন্নত। হোদের মধ্যে কখনও কখনও সুশ্রী দৈহিক গঠনবিশিষ্ট নরনারী দেখতে পাওয়া যায়, এতে ডাল্টন সাহেব মনে করেছিলেন আর্যদের সঙ্গে বোধ হয় এদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ভারতবর্ষের অতি পুরাতন মূল আদিম প্রাক্‌দ্রাবিড় (Pre-Dravidian) জাতির কোলারিয়ান শাখায় হো, সাওতাল প্রভৃতিকে এক পর্যায়ভুক্ত করেছেন নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা। তাঁরা মনে করেন এই প্রাক্‌দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ানদের রক্তের সম্পর্ক আছে। দ্রাবিড় জাতির আগমনের পূর্বে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে এক দল মনুষ্য নাকি ভারতে আসে এবং তার এক ভাগ চলে যায় অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত। ৺শরৎচন্দ্র রায় লিখছেন, "এই দ্রাবিড়পূর্ব হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা ভারতের ভূতপূর্ব আদিম নিবাসী নেগ্রিটো জাতিদিগকে বিনাশ ও আংশিক গ্রাস করিয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতে



হো শিকারী ও দল-ওয়া

আধিপত্য করে…এই জাতিদিগকে অধুনা অনেকে কোল ধাঙ্গড় প্রভৃতি নিন্দাত্মক আখ্যায় অভিহিত করেন। কিন্তু এই দ্রাবিড়পূর্ব এবং তাদের পরবর্তী দ্রাবিড় জাতিগুলিই ভারতের বর্তমান অধিবাসীদের মূল স্তবক (Substratum)। এই জন্য এদের প্রোটো-অষ্ট্রালয়েডও বলা হয়।"



হো যুবতী

(২)

হো গ্রামে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়বে ওদের শ্মশান বা ডিহরি। মৃতদেহকে পুড়িয়ে তার ছাই এনে, মাটির মধ্যে রেখে তার উপর পাথর চাপা দিয়ে দেয়। মৃতদেহকে দাহ করবার প্রথাই এদের মধ্যে প্রচলিত কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু হলে এরা মৃতদেহকে কবর দেয়। অনেক সময় মৃত শিশুদেরও মৃত্তিকায় সমাহিত করে। প্রস্তরস্তম্ভ বা প্রস্তর টেবল (dolmen) দুইই অগণিত দেখতে পাওয়া যায়। খাড়া উচ্চ পাথর মেন্‌হির সংখ্যায় অল্প কিন্তু ডল্‌মেন বিস্তর—এগুলি দুটি বা চারটি পাথরের উপর একটি প্রস্তরখণ্ড-বিশেষ। হো শ্মশানে এক একটি দিক বা অংশ এক একটি 'কিলি' বা সম্প্রদায়ের; কোন গোষ্ঠীর লোক মরলে ঠিক সেই নির্দিষ্ট অংশেই তার ভস্ম সমাহিত করা হয়। স্তম্ভাকৃতি পাথর বা মেন্‌হিরকে হোরা বলে নিশান—অনেক সময় প্লেন পাথরের সঙ্গে একটি করে মেন্‌হির থাকে।

পল্লীর ভিতর প্রবেশ করলে হোদের কুঁড়েঘরের বিচিত্রিত দেয়ালগুলি বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে—বেশ সুন্দর সুন্দর নক্সা, আলপনা ইত্যাদি তাতে আঁকা। তা ছাড়া হাতী, গরু, হরিণ এবং কোন কোন পাখীর ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। দোর-গোড়ায় হয়ত একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রহরীর মূর্তি আঁকা। সাঁওতাল মাঝিদের মত হোদের গাঁয়ের মোড়ল 'মুড়া'র ঘরে একটু আভিজাত্যের আবহাওয়া আছে—এক জোড়া বলদ হয়ত চোখে পড়বে। গাঁয়ের সকলের অনুমতিক্রমে মোড়ল মরলে মুড়ার ছেলেই সাধারণতঃ মুড়া হয়, পুত্র না থাকলে হয় ভাই না হয় ভাইপো উক্ত পদ লাভ করে। এদের সমাজ আমাদের সমাজের মতই পিতৃক্ বা patrilineal, গারো খাসীয়াদের মত মাতৃক বা matrilineal নহে। রাভাদের মধ্যে মেয়েরা আবার মার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়।

প্রতি গ্রামের মুড়া খাজনা আদায় করে জমিদারকে পাঠায়, পঞ্চায়েৎ বসলে সভাপতিত্ব করে। কয়েকটি গ্রাম মিলে হয় এক একটি পীর, তার প্রতিনিধিত্ব করে 'মানকি' বলে দলের মোড়ল। এক পরিবার বা কিলির সকলে মিলে তাদের জমি চাষ করে।

'কিলি'* হ'ল "হো" সমাজে এক-একটি ক্ল্যান বা আমাদের সমগোত্র পরিবার-গোষ্ঠীর মত। এক কিলির ছেলেমেয়ে অন্য কিলির মেয়ে বা ছেলেকে বিবাহ করবে এইটেই হো সমাজের বাঁধা নিয়ম—তার ব্যতিক্রম হলে পঞ্চায়েতের শাসন ভয়ানক কড়া। সাঁওতালদের সেপ্ট বা ক্ল্যানের যেমন টোটেম নাম থাকে তেমনি কিলিরও একটা করে নাম থাকে কিন্তু তা টোটেম নয়। কারণ সাঁওতালরা টোটেমকে পূজা করে—হো বা কিলির নামে গাছ, পশু বা কোন কিছুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনাদি করে। টোটেমের প্রতি এদের বিশ্বাস নাই। আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 'কিলি'র যে মেয়ে স্বামীর কিলি গ্রহণ করে না তার পৈতৃক কিলিতেই সে পরিচিত—আমাদের মেয়েরা যেমন বিবাহ হলে স্বামীর গোত্র পায় হোদের তা নয়। বাপের কিলি থেকে গেলেও হো মেয়েরা কিন্তু বাপের বিষয়ের কোন অংশ পায় না। এদের বিয়েতে কনের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া, জোর করে হাট থেকে মনোনীত বধূকে নিয়ে পলায়ন করা, কনের বাপকে পণ দেওয়া, নাচগান, পান-ভোজন, আনন্দ-উৎসব ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আছে।

হোদের পূজা-পার্ব্বণের মধ্যে মাঘ পরব, চৈত পরব 'বাহা' (ফুলের উৎসব বা বসন্ত উৎসব), গাম পরব, বাটাওলি পরব—এগুলি প্রধান। পৌষে ধানে মরাই থাকে পূর্ণ—মাঘী পূর্ণিমাতে হোদের সর্বপ্রধান উৎসব 'মাঘ পরব' বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ইহারা গ্রাম্য দেবতা দেশাওলিকে মোরগ বা ছাগ বলি দিয়ে পূজা করে।

* "The Kili name to a Ho, now-a-days, is only the name of a special division and nothing more.—Das: *Hos of Seraikela.*"

ঋগ্বেদের নারী

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চৌধুরী

ঋগ্বেদে নারী গৃহের যোগসাধিকা ও কল্যাণসাধিকা, গৃহের পত্নী, কর্ত্রী ও গৃহের ভূষণ—ঋগ্বেদের ঋষি বিশ্বামিত্রের বাক্যে 'জায়াই গৃহ'। ঋগ্বৈদিক বিবাহের ও দাম্পত্য-জীবনের মূল উদ্দেশ্য, 'ধর্ম্ম' ও 'প্রজারক্ষ' লাভ। ঋগ্বেদে যজ্ঞ মানবের প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম ও জীবনের প্রকৃষ্ট কর্ম্ম। যজ্ঞ-ধর্ম্ম পতি ও পত্নী উভয়ের কর্ত্তব্য এবং যজমান (যজ্ঞকারী)-দম্পতি ঋগ্বেদে সবিশেষ প্রশংসিত। নারী, যজ্ঞের ঋষি ও ঋত্বিক পদেরও অধিকারিণী। ঋগ্বেদে রাজকন্যা ঘোষা, অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা ও অপালা, অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রা, অসঙ্গরাজপত্নী অঙ্গিরাগোত্রজা শশ্বতী, ভাবয়ব্যরাজপত্নী লোমশা, জুহূ, বসুক্রপত্নী মমতা, শচী, সূর্য্যা প্রভৃতি বিদুষী ঋক্-মন্ত্রপ্রণেতা নারীগণ ঋগ্বেদের ঋষি ছিলেন ও তাঁহাদের রচিত ঋক্ ঋগ্বেদে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের বিবাহমন্ত্র হইতে নারীর স্থান ও দাম্পত্যজীবনে নারীর আদর্শের কতক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবাহ মন্ত্রে আছে…"হে অশ্বিনদ্বয়! আমি তোমাদিগকে স্তব করিয়া থাকি, অতএব তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর।…আমরা যেন পতিগৃহে গমনপূর্ব্বক পতির প্রিয়পাত্র হই।…এই সকল দেবতা আমার (বরের) সহিত গৃহকার্য্য করিবার নিমিত্ত তোমাকে (বধূকে) আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।…প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন। আর্য্যমা আমাদের উভয়ের বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলিত করিয়া রাখুন।…তাবৎ দেবতাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়কে সম্মিলিত করিয়া দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।…পত্নী পতির সহিত এক হইয়া যাইতেছে। হে অগ্নি! তুমি যখন দম্পতিকে একান্তঃকরণ করিয়া দাও, তখন তাহারা তোমাকে বন্ধুর ন্যায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপ্রসবিনী এবং দেবতাদিগের ভক্ত হও। হে বধূ! পতিগৃহে গিয়া তুমি গৃহের কর্ত্রী হও। তুমি সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও।…আমরা (পতি-পত্নী) এক্ষণে মনে ও কর্মে ও ইচ্ছায় এক হইলাম। কদাপি যেন আমি তোমা হইতে পৃথক না হই, তুমিও যেন পৃথক না হও।…এই বধূ অতি সুলক্ষণান্বিতা। তোমরা এস, ইহাকে দেখ। ইহাকে সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর…" ইত্যাদি। ঋগ্বেদে দয়া, দান, অতিথিসেবা নর ও নারী উভয়ের সবিশেষ আচরণীয়। ঋগ্বেদে অতিথি দেবতাগণেরও অধিক পূজনীয়। ঋগ্বেদে অন্নদান মহৎ কর্ত্তব্য। গৃহী অন্নার্থীকে অন্নদান না করিয়া কদাপি স্বয়ং অগ্রে ভোজন করিবে না। যেরূপ ধর্ম্মলাভ বিশেষ কর্ত্তব্য, তদ্রূপ পুত্রপৌত্রাদিরূপ 'প্রজারক্ষ' লাভও ঋগ্বেদে সবিশেষ কাম্য। শেষোক্ত বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী উদ্ধৃত হইতেছে। কথিত আছে, পুরুবংশের পরাক্রমশালী অপুত্রক নৃপতি পুরুকুৎস যুদ্ধে শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইলে পর সপ্তঋষি পুরুরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু এভাবে রাজশূন্য রাজ্য চলে না। তখন সপ্তঋষি পুরুকুৎসের পত্নী দ্বারা রাজপুত্র লাভের নিমিত্ত এক যজ্ঞ করাইলেন, এবং পুরুকুৎসের রাজ্ঞী যজ্ঞে এক পুত্র লাভ করিলেন। এসদস্যু সেই পুত্র। এসদস্যু ঋগ্বেদে একজন সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি এবং দস্যু অসুরগণের ত্রাসসঞ্চারকারী ও অনার্য্য দাসদস্যু অসুরনিহন্তা মহাবীর।

ঋগ্বেদে 'জায়াই গৃহ' এবং গৃহ নারীর ক্ষেত্র। নারী সর্ব্বগৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত। নারী প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া পরিবারবর্গের নিদ্রাভঙ্গক্রমে তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছে, অবনত হইয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছে, যত্নবতী হইয়া (অনূঢ়া) কন্যার গাত্রমার্জ্জনা করিয়া দিয়া তাহাকে নির্ম্মল ও সুশোভন করিতেছে, বস্ত্রবয়নকুশলা রমণীরূপে পরিবারে বস্ত্রবিধানও করিতেছে। ঋগ্বেদরমণী বিবিধ মনোরম স্বর্ণালঙ্কারে ও উত্তম বসন-ভূষণে ও পুষ্পগন্ধমাল্য অনুলেপন ও অভ্যঞ্জন আদি উপচারে প্রসাধনে অনুরক্তা ছিল। ঋগ্বেদে পুত্রগণ পিতৃবিত্তের অধিকারী হইলেও উহাতে পুত্রগণসহ মাতারও একটি ভাগ থাকিত দৃষ্ট হয়। কন্যা পিতৃবিত্তের ভাগী হইত না, সে পিতৃগৃহে 'সম্মানিতা' হইত এবং পিতা ভ্রাতা কর্ত্তৃক সযৌতুকা ও সালঙ্কৃতা হইয়া সুপাত্রস্থা হইত। তবে পিতৃগৃহে যাবজ্জীবন অবস্থিতা কন্যা পিতৃবিত্তের একটি ভাগ লইত দৃষ্ট হয়। বিধবা নারী পরিবারে সবিশেষ ক্ষমতাশালিনী ছিল। ঋগ্বেদে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল বলিয়া দৃষ্ট হয় না এবং স্বয়ম্বরানুরূপ বিবাহানুষ্ঠান ছিল বলিয়া দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদেও যৌবনের ক্ষেত্র হইতে প্রণয় বাদ পড়ে নাই। একটি কাহিনী এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। অর্চ্চনানা নামক এক ঋষি ছিলেন। তাহার পুত্র, শ্যাবাশ্ব। কথিত আছে, রথবীতি নামক রাজা এক বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অর্চনানা ঋষি সেই যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন। শ্যাবাশ্ব পিতা অর্চনানার সহিত যজ্ঞে গমন করেন। সেই যজ্ঞ-সভায় রথবীতি রাজার কুমারীও ছিলেন। রাজকন্যাকে দেখিয়া ঋষিপুত্র শ্যাবাশ্ব মদনবাণে বিদ্ধ হন। শ্যাবাশ্ব ঋষিপুত্র হইলেও স্বয়ং বোধ হয় ঋক্‌মন্ত্র রচনার শক্তি অর্জ্জন করিয়া পরিপূর্ণ ঋষিপদবাচ্য হন নাই। তখন, রাজকন্যা-লাভের আশা ক্ষীণ দেখিয়া শ্যাবাশ্ব বোধ হয় হতাশ হৃদয়ে দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন। দেশপর্য্যটন করিতে করিতে একদা পথিমধ্যে গভীর নিশীথে ভীষণ বাত্যা-প্রভঞ্জনের হস্তে পতিত হইয়া শ্যাবাশ্ব প্রাণের মমতায় আকুল হৃদয়ে বাত্যাপ্রভঞ্জনের দেবতা মরুৎগণের স্তব করিতে আরম্ভ করেন। তখন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বতঃই সুন্দর সুন্দর ঋক্‌স্তোত্র বহির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর তদ্রচিত সেই সকল মরুৎস্তোত্র রথবীতি রাজাকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্যাবাশ্ব রাত্রি দেবীর স্তব করিলেন, "হে রাত্রি দেবি! নদীতীরে রথবীতি রাজার বাস।…হে রাত্রি দেবি! সোমযজ্ঞ সম্পন্ন হইলে তুমি আমার হইয়া রথবীতি রাজাকে নিবেদন করিও যে তাঁহার কন্যার প্রতি আমার প্রণয় কিছুমাত্র বিচলিত

হয় নাই।" বিধবাবিবাহ ঋগ্বেদে নিষিদ্ধ ছিল না। দেবরের সহিত বিধবার পুনর্বিবাহ হইত বোধ হয়। ঋগ্বেদে ঋষি ও রাজন্যকুলে পরস্পর বিবাহ হইত দৃষ্ট হয়। সচ্চরিত্রতা এবং পাতিব্রাত্য ঋগ্বেদে নারীর বিশেষ গুণ। সতীত্ব নারীর অমূল্য রত্ন। নারীর সতীত্ব 'বলশালী রাজার সুরক্ষিত রাজ্যের ন্যায়' সযত্নে রক্ষণীয়। নারী স্বভাবতঃ পুরুষের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ঋগ্বেদে গণ্য। পুংসংরক্ষণ ব্যতীত নারীর বিপথগামিনী হওয়ার উল্লেখ আছে, যেমন, ভর্তৃবিহীনা নারী। প্রয়োজনস্থলে ঋগ্বেদের রমণী স্বহস্তে অস্ত্রধারণ করতঃ যুদ্ধার্ণবে অবগাহন করিয়াছে ও প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। শত্রু আসিয়া মুদ্গল ঋষির গোধন অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। মুদ্গল-পত্নী ইন্দ্রসেনা রথে চড়িয়া সসৈন্যে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধে শত্রুপরাজয়ক্রমে পতির অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করিয়া আনিলেন। মুদ্গল পত্নীর সংগ্রাম ও রণজয় বর্ণনায় আছে,"...শত্রুহিংসার জন্য রথ যোজিত হইল। ইহার কেশধারী সারথি মুদ্গলানী শব্দ করিতে লাগিলেন।...সৈন্যগণ নির্গত হইয়া মুদ্গলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মুদ্গলের পত্নী যখন রথারূঢ়া হইয়া সহস্রজয়িনী হইলেন তখন বায়ু তাঁহার বস্ত্র সঞ্চালিত করিয়াছিল। গাভী জয়ের জন্য মুদ্গল-পত্নী রথী হইলেন।... মুদ্গলানী বিধবার ন্যায় নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পতির ধন গ্রহণ করিলেন। ঈদৃশ সারথি দ্বারা আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি।" খেল রাজার পত্নী বিশপলা যুদ্ধে গমন করিলে শত্রুশরে তাঁহার একটি পদ 'পক্ষীর পক্ষের ন্যায়' ছিন্ন হইয়া যায়। কুম্ভ-পুত্র (কথিত আছে, অগস্ত্য ঋষি কুম্ভমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) অগস্ত্যের স্তবে প্রীত হইয়া ভিষক্‌দেবতা অশ্বিনৃদ্বয় বিশপলার ছিন্নপদস্থলে একটি সুদৃঢ় জঙ্ঘা পরাইয়া দেন এবং বিশপলা সেই নূতন পাদযোগে পুনঃ যুদ্ধে গমন করেন।

ঋগ্বেদের নারীকুলে বিদুষী, আত্মনির্ভরশীলা ও তেজোবীর্য্যবতী মহিলাবৃন্দ ছিলেন।*

* এই প্রবন্ধের সমুদয় বিষয় ও উক্তি ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত

ক্ষতিপূরণ

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা

বড় বড় অক্ষরে "no vacancy" (কর্ম্মখালি নাই) লেখা থাকলেও প্রকাণ্ড আপিসের গেটের ভিতরে আনাগোনা দেখে মনে হচ্ছে একটা 'ভেকেন্সি'র গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে খবরের কাগজের মারফতে।

বেকারমহলে চাঞ্চল্যের সীমা নেই। তবু চাকরিটি তেমন শাঁসালো নয়। সামান্য মাইনে আর প্রার্থীর যোগ্যতার চাহিদাও সামান্য, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ আর বাংলাদেশের অধিবাসী হ'লেই যথেষ্ট। বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্য্যন্ত দেখা করবার সময় নির্দ্ধারিত হয়েছে। বেলা ন'টা থেকে লোক আসা আরম্ভ হ'ল। ম্যাট্রিক পাশ ছাড়াও আই-এ, বি-এ, এমন কি 'অধিকন্ত ন দোষায়' এই প্রবাদবাক্য স্মরণ করে অনেক এম-এ ডিগ্রিধারীও এসে গেটের ভিতর ঢুকল। বিদ্যার অনুরূপ তাদের বেশভূষারও বিস্তর তারতম্য ছিল, কেউ পরেছে দিশী ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবী, পাম্প-সু আর চুলকে উলটিয়ে যথাসাধ্য মসৃণ করে আঁচড়িয়েছে। মুখে যে ক্রীম মাখে নি এ কথাও হলফ করে বলা চলে না। কেউ এসেছে প্যাণ্ট-কোট পরে, প্যাণ্ট-কোটের হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ আয়তন দেখলেই সেটা যে ধার করা সে কথা বুঝতে দেরি হয় না, অপটু হাতের বন্ধনে নেকটাইটা এক পাশে ঝুলে পড়েছে।

সময় আর কাটে না। যার হাতে ঘড়ি বাঁধা আছে সকলে বারবার তার কাছে সময়ের পরিমাণ জেনে নিচ্ছে। কেউ তোলে হাই, কেউ আঙুল মটকায়, কেউ নস্য গুঁজে দেয় নাকে, কেউ ধরায় সিগারেট। মনে কিন্তু সকলের একই আশা যে কাজটা তারই হবে, ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়ে তার গলাতেই জয়মাল্য পরিয়ে দেবেন,কারণ ঠন্‌ঠনের কালীবাড়ীতে সে-ই পূজো মানত করেছে। সকলের শেষে আসে প্রবীর। তাকে দেখে অজ্ঞাতেই সকলের মন শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠে। অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন বেশভূষা। সমস্ত অঙ্গে যেন মার্জ্জিত রুচি ও আভিজাত্যের চিহ্ন বর্ত্তমান। অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছে বলে সে যেন সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে পড়ে।

বেয়ারা এসে এক-এক জন ক'রে প্রার্থীকে আহ্বান করে নিয়ে যায়। কেউ যায় বীরদর্পে, কেউ যায় অষ্টমীর ছাগবৎসের ন্যায় কম্পমান দেহে। যাদের তখনো ডাক পড়ে নি তারা ওদের গতিপথের দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। যেন ওদের প্রাপ্য সবাই লুটে নিতে যাচ্ছে।

"আপনার নাম প্রবীর রায়?" বড়বাবু জিজ্ঞাসা করেন।

বড়বাবুর বয়স যৌবনের সীমা ছাড়িয়েছে কি ছাড়ায় নি, এ কথা নিয়ে তর্ক করা চলে। পদের উপযুক্ততার জন্যই যেন তাঁর গাম্ভীর্য্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্যই যেন মেদমাংসগুলো বেশি রকম বেড়ে গেছে।

প্রবীর বলে, "হ্যাঁ স্যার।"

চশমাটা চোখে দিয়ে বড়বাবু ভাল করে তার মুখের দিকে তাকান। বোধ হয় এমন ক'রে কোন প্রার্থীর দিকে তিনি তাকান নি, অন্ততঃ প্রবীরের তাই মনে হয়, সে যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

"বি-এসসি পরীক্ষায় আপনি ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"Aplication এ (দরখাস্তে) লিখেছেন আপনার বাবা রায় কালীকান্ত বাহাদুর রিটায়ার্ড জজ, এ সব সত্যি কথা?"

"হ্যাঁ স্যার"—প্রবীরের কণ্ঠ মৃদু হয়ে আসে।

"এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে ক'জন candidate (প্রার্থী) দেখলাম, শিক্ষার দিক দিয়ে আপনার যোগ্যতা বেশী এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি ধনী পিতার পুত্র, একজন দরিদ্র প্রার্থীকে বঞ্চিত করে এ কাজ আপনাকে দেওয়া আমি অনুচিত মনে করি।"

কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি আছে, প্রবীর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত ঘরটা যেন থম্‌থমে হয়ে আসে।

অকস্মাৎ যাবার জন্ত প্রবীর ফিরে দাঁড়ায়।

"শুনুন"—

কি শুনবে কে জানে, তবু প্রবীর থামে।

"শুনুন, একজন স্থায়ীলোক আমার দরকার। আপনাদের মত qualified man-এর পক্ষে এ কাজ স্থায়ী ভাবে করা সম্ভব নয়। দু'দিন পরেই ছেড়ে দেবেন হয়ত। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই দেবেন। যে টিঁকে থাকবে না সে রকম লোক আমি চাই নে। আর আপনার ত সত্যি প্রয়োজন নেই।"

লোকটাকে যত গম্ভীর মনে হয়েছিল তা নয়, দুঃখীর জন্ত প্রাণে যেন মায়াও আছে মনে হয়। ভরসা পেয়ে প্রবীর কোন মতে বলে ফেলে—"যে-কোন একটা কাজের আমার বড় প্রয়োজন।"

নিজের বিপন্ন কণ্ঠস্বরে প্রবীর নিজেই লজ্জাবোধ করে। পকেট থেকে রুমাল নিয়ে চশমা মুছতে মুছতে বড়বাবু বল্লেন, "আপনার এই ফিফ্‌থ্‌ ইয়ার, লেখাপড়ায় আপনি ভালো, আপনার পিতার অর্থের অভাব নেই। এ চাকরি নিয়ে সমস্ত prospect (ভবিষ্যৎ) নষ্ট করবেন কেন? সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত ডিউটি জানেন ত সে কথা?"

"এম্‌-এসসি পড়া ছেড়ে দিয়েছি আমি—"

"কেন?" ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে আসে তাঁর।

"গত জানুয়ারীতে আমার বিলেত যাবার কথা ছিল।"

বড়বাবুকে যেন গল্পের নেশায় পেয়ে বসেছে।

"কোন কারণে হয়ত হয় নি। এখন যুদ্ধ না থামলে যেতে পারবেন না এ-ও ঠিক, কিন্তু এম্‌-এসসি পাশ করতে বাধা কি?"

"পড়া আর চলবে না আমার—"

"মানে?" বড়বাবু ছেলেটির অপরিণামদর্শিতায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

"বাবার টাকা আছে, আমার ত নেই—"

রূঢ়স্বরে মিষ্টার ব্যানার্জ্জি বলেন, "হেঁয়ালী ছাড়ুন প্রবীরবাবু, পিতৃধনে পুত্রের অধিকার এ কথা কি আমি জানিনে বলতে চান?"

"বাবা আমাকে ত্যাগ করেছেন"—লজ্জায় তার কণ্ঠ কাঁপতে থাকে।

"ত্যাগ করেছেন? কি অপরাধে? বলবেন কি আমাকে? যদিও অনধিকার প্রশ্ন—" মুখের কাঠিন্য তাঁর কমে আসে। প্রবীরের লজ্জারুণ মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টার ব্যানার্জ্জী বলেন, "আপনাকে দেখে আপনি কোন গুরুতর অপরাধ করতে পারেন বলে মনে হয় না। কিন্তু পিতাও ত সামান্য অপরাধে পুত্রকে ত্যাগ করতে পারেন না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমাকে বলবেন কি?"

কণ্ঠে প্রভুত্বের সে সুর নেই, যেন মিনতি ঝরে পড়ছে। এতক্ষণে প্রবীরের সঙ্কোচ কমে আসে। সে প্রার্থী, মিষ্টার ব্যানার্জ্জী দাতা, এ কথা সে ভুলে যায়।

"আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বাবার বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে আমাকে, তাই বাবা আমায় ত্যাগ করেছেন। আমি যাকে বিয়ে করতে চাই—"

সঙ্কোচে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। অসমাপ্ত কথা সমাপ্ত করলেন বড়বাবু—"বাবার বুঝি তাতে মত নেই?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় প্রবীর।

বড়বাবু সহসা যেন প্রৌঢ় বয়স থেকে যৌবনে ফিরে এলেন, তাঁর স্থূল দেহ যেন তুলার মত হালকা হয়ে গেল। প্রবীরের হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "বসুন প্রবীরবাবু, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?"

শ্লিপ হাতে পর্দ্দা ঠেলে আরদালী এসে ঘরে ঢুকল, বড়বাবু বাঘের মত গর্জ্জন করে উঠলেন, "নিকাল যাও—আবি হোগা নেই—"

প্রবীর চেয়ারে বসেই ভয়ে কেঁপে উঠল।

"বলুন প্রবীরবাবু,"—কণ্ঠ যেন মাধুর্য্যে টলমল করছে। ঢোক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে প্রবীর বলে—"বড় গরীবের মেয়ে সে, কিন্তু আমার বিলেত যাবার সমস্ত ব্যয় বহন না করলে সেখানে বাবা বিয়ে দেবেন না। তা' ছাড়া অসবর্ণ বিয়ে—"

"বলুন বলুন থামবেন না"—বড়বাবু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।

"কিন্তু তাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না, অসম্ভব!"

"দু-জনেই বুঝি দু-জনকে খুব ভালবাসেন?"—

একটি কিশোর বালকের মত তিনি হেসে ওঠেন।

"হ্যাঁ"—প্রবীরের কণ্ঠ একেবারে কুণ্ঠিত হয়ে আসে।

"পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে পারবেন তাকে গ্রহণ করতে? ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবেন না তো? পারবেন শেষরক্ষা করতে? সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে পদদলিত ক'রে চিরদিনের জন্ত দারিদ্র্য বরণ করবেন আপনার ভালবাসায় এত সবলতা আছে? ভাল করে ভেবে দেখেছেন?"

"নিশ্চয়ই পারব। সমস্ত জগতে আমার অন্ত কিছুই কাম্য নেই।"

আকস্মিকভাবে ঝড়ের মত একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে যায় বড়বাবুর নাসারন্ধ্র দিয়ে। হঠাৎ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তার পরে নিজের মনেই যেন বলতে থাকেন, "মনকে যাচাই করেছেন ভাল করে? পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, নিজের উচ্চপদ, আপনার প্রিয়ার স্থান কি সে সকলের উর্দ্ধে? সত্যি তাকে আপনি এত ভালবাসেন?" বলতে বলতে তিনি অজ্ঞাতেই প্রবীরের হাত দুখানি জড়িয়ে ধরেন। পরক্ষণেই তাঁর নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েন। তারপর একটু থেমে বলেন, "ও, হ্যাঁ, নাম কি তার?"

"মধুমালা।"

"সুইট্‌, মধুমালা এসে যেন জীবনকে আপনার মধুময় করে তোলেন, এই প্রার্থনা করি। বিয়ে কবে? ইতরজনকে যেন মিষ্টান্ন বিতরণে কার্পণ্য করবেন না।"

"একটা কাজ না পেলে,—বর্ত্তমানে আমি কপর্দ্দকশূন্ত—"

টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে বড়বাবু বলেন,

"Don't care for that. কাজ আপনি নিশ্চয়ই পাবেন—সেজন্য অযথা বিয়ের বিলম্ব ঘটাবেন না। জানেন তো শুভস্য শীঘ্রং।"

ধন্যবাদ দিয়ে প্রবীর বিদায় গ্রহণ করে।

অসময়েই বড়বাবু আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েন। বাড়ীতে না গিয়ে গাড়ী গঙ্গার কিনারায় নিতে হবে শুনে ড্রাইভারের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দীর্ঘকাল কাজ করেও মনিবের রোমান্সের পরিচয় পায় নি কোন দিন সে। কিন্তু আজ—গাড়ী গিয়ে গঙ্গার ঘাটে থামে। বড়বাবু ড্রাইভারকে বিদায় করেছেন, ট্রামে তিনি বাড়ী ফিরবেন। সেখানে একটা নির্জ্জন স্থান বেছে নিয়ে চুপ করে বসে তিনি যেন তাঁর অতীত জীবনে ফিরে গেলেন। তখন চোখে যৌবনের রঙীন কাজল লেগেছে। জগতে সবই সুন্দর, সবই সহজসাধ্য, সবই রোম্যান্টিক। ধনীর গৃহের দুলাল, কলেজের মেধাবী ছাত্র, সুন্দর সবল দেহ, খেলার মাঠে ভাল খেলোয়াড়, আশা-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্মুখে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলো অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে সাগরপারের পরীক্ষার জন্য তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছেন।...

সহসা সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার উর্দ্ধে যে স্থান পেয়েছিল সে বনশ্রী। এত সৌন্দর্য্য, এত মাধুর্য্য যে একটি নারী-দেহকে আশ্রয় করে থাকতে পারে, তা তিনি কল্পনাও করেন নি কোন দিন। এত আনন্দ, এত অধীরতা যে কোন মানব-হৃদয় বহন করতে পারে তাও তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। বনশ্রীর শান্তভীরু চাহনি যেন ঐ সন্ধ্যাতারার মতই স্নিগ্ধ ও মধুর ছিল। তার সেই সরল ও মধুর প্রাণ যেন ভবিষ্যতের কোন্ এক নিষ্ঠুর মূর্ত্তি দেখে আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে উঠত। তাই প্রিয়তমকে কাছে পেয়েও সে যেন হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলত। তিনি তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে কম্পিত হাত দুখানি মুঠোয় ভরে কত সান্ত্বনা দিয়েছেন তাকে, ভীরু বলে কত ভর্ৎসনা করেছেন। জগতে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে তাদের মিলনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে? বনশ্রীর ছেলেমানুষি দেখে তিনি হেসেছেন। খুশীতে বনশ্রীর তনুলতা লীলায়িত হয়ে উঠেছে চোখের জল তার শুকিয়ে অধরে হাসি ফুটে উঠেছে এমনি এক শ্যাম সন্ধ্যায় এই সন্ধ্যাতারাটিকে সাক্ষী রেখেই তিনি শপথ করেছিলেন তিনি বনশ্রীর, বনশ্রী তাঁর। এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।

এই সেই সন্ধ্যাতারা, এর কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। দিনের পর সন্ধ্যা সেও নিয়মিত আসছে। পরিবর্ত্তন ঘটেছে শুধু দুটি প্রাণের, দুটি নরনারীর। দ্বন্দ্ব বাধে পিতার সহিত। ব্রাহ্মণ-বংশের বধূরূপে আনবেন তিনি কায়স্থকন্যা! অমন কুলাঙ্গার পুত্রকে জন্মের পরেই কেন নুন খাইয়ে মেরে ফেলেন নি সেজন্য তিনি পরিতাপ করতে লাগলেন। আর অমন পুত্রের মুখ দর্শন করবেন না বলে একটা কঠিন শপথও উচ্চারণ করলেন।

ধনৈশ্বর্য্যে যে পালিত, সম্মুখে যার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, জীবনে যে দারিদ্র্যের স্বপ্নও দেখে নি, নিঃসম্বল অবস্থায় পথে এসে দাঁড়াতে হবে এই কল্পনায় তার জীবনের সমস্ত সঙ্কল্পেরই রূপ বদলে গেল।

প্রবীর আজ যে সাহস করেছে এতে কি তার পরাজয় ঘটবে না! অতুল ঐশ্বর্য্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, প্রতিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত কাম্যবস্তুর পরিবর্ত্তে আজীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তার কৃত কার্য্যের জন্য সে কি একবারও অনুতপ্ত হবে না?

অপরিমেয় সম্পদ, উচ্চপদ, সুরমার মত শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী, পুত্রকন্যা, জগতে লোকে যা কামনা করে, তাঁর তো সবই আছে, সমস্ত সুখের অধিকারী হয়েও প্রতিমুহূর্ত্তে তিনি যে তাঁর বুভুক্ষিত অন্তরের তৃষ্ণা অনুভব করেন, এ কি তাঁর পরাজয় নয়? প্রবীরকেই কি শুধু পরিতাপ করতে হবে, তিনি কি যথার্থই জয়লাভ করেছেন? ধনের ছলনায় যৌবনে নিজের অন্তরকে তিনি যে বঞ্চনা করেছেন তাতেই কি তাঁর জয় হয়েছে?

পরদিন প্রবীরের নিয়োগপত্র এল। সে দু-শ' টাকা বেতনে বড়বাবুর য়্যাসিষ্টেণ্টের পদে নিযুক্ত হয়েছে।

ইতিহাস

শ্রীগোপাল ভৌমিক

স্বর্গের সমৃদ্ধি নিয়ে আমাদের মন
পৃথিবীতে আনে কত সবুজ সান্ত্বনা,
বিমুগ্ধ আকাঙ্ক্ষা আর সোনার স্বপন—
জন-স্বার্থে পায় তবু অনেক বঞ্চনা।

আমরাই পৃথিবীর প্রত্যন্ত সীমায়
বীজ বুনে বারবার দিয়েছি ইঙ্গিত,
স্বপ্ন-সমারোহ শেষে পড়ন্ত বেলায়
আমরাই ভেঙে গড়ি সভ্যতার ভিত।

নিজেদের হাতে গড়া বৈষম্যের ফাঁদে—
অতর্কিতে নিজেরাই ধরা পড়ে যাই:
লাস্য-লীলা চলে যবে প্রাসাদে প্রাসাদে—
ভগ্নদেহে ফুটপাথে মেলে না ত ঠাঁই।

মানুষের সভ্যতার এই ইতিহাসে
আমরা একাগ্রচিত্তে তবু রাখি দান,
জানি রাত্রিশেষে নব সূর্য্যের আভাসে—
আমাদের স্বপ্ন হবে সত্যের সমান।

প্রাণী-জগতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রকৃতির সহিত এইভাবে রফা না করিয়া উপায় নাই। এই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ মন্থর গতিতেই হইয়া থাকে; তবে ক্ষেত্র-বিশেষে দ্রুততর পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়। বুদ্ধির সহযোগিতায় এই পরিবর্ত্তন অল্প সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হইতে দেখা



গেছো-কাঁকড়া

যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিয়া-প্যারট নামক টিয়া জাতীয় এক প্রকার পাখীর খাদ্য সম্পর্কিত স্বভাব পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিউজিল্যাণ্ডের এই পাখীগুলি রুগ্ন অথবা দুর্ব্বল মেষের কোমরের দিকের পশম ছিঁড়িয়া লইয়া পাকাশয়ের উপরিস্থিত মাংস এবং চর্ব্বি কুরিয়া কুরিয়া খায়। অনেক সময় সুস্থ সবল মেষকেও ইহারা আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণে প্রতি বৎসর অনেক মেষের জীবনান্ত ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই পাখীগুলি যে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিল সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। তাছাড়া শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপে মেষেরও আমদানী হয় নাই। অথচ পাখীগুলি সুবিধা পাইলেই কেবল মেষ-মাংসই সংগ্রহ করিয়া থাকে। নিরামিষাশী পাখীর এই নূতন স্বভাব অতি অদ্ভুত সন্দেহ নাই। প্রথমে হয়ত ভেড়ার চামড়ার সহিত সংলগ্ন দুই-এক টুকরা শুষ্ক মাংস আস্বাদন করিয়া দুই-একটি পাখী ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সাহচর্য্যের ফলে দেখাদেখি এই জাতীয় অন্যান্য পাখীরাও ক্রমশঃ মেষ-মাংস ভক্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। বংশপরম্পরায় কালক্রমে এই নূতন অর্জ্জিত স্বভাব তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ কোন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইলে মানুষ যেমন পূর্ণমাত্রায় তাহার সদ্ব্যবহারে চেষ্টিত হয় জীবজন্তুদের মধ্যেও যে এই মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব এমন কথা বলা চলে না। কোন কোন বিষয় তাহাদের অপরিণত মনের উপর এমন ভাবে রেখাপাত করে যে ক্রমে ক্রমে তাহারা সে বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে তাহা তাহাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান কিয়া-প্যারটও সেরূপ মাংসের স্বাদ গ্রহণ জনিত প্রথম আবিষ্কারের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া নিরামিষাশী হইতে কালক্রমে মাংসাশী জীবে পরিণত হইয়াছে।

একটা বিড়ালের ঘটনা দেখিয়াছি। বাজারের থলিতে মাছের সহিত একফালি কুমড়ো আনা হইয়াছিল। বোধ হয় মাছের গন্ধেই আকৃষ্ট হইয়া বিড়ালটা সেই কাঁচা কুমড়োর খানিকটা অংশ খাইয়া ফেলে। এই ঘটনার পর অনেক সময় বিড়ালটাকে কাঁচা কুমড়ো খাইতে দেখা যাইত। কিছুকাল পরে সে কাঁচা কুমড়োর প্রতি এমনই আসক্ত হইয়া পড়িল যে, অন্য বাড়ী হইতেও মাঝে মাঝে কাঁচা কুমড়োর আস্ত ফালি চুরি করিয়া বাড়ী লইয়া আসিত। প্রথম বারে বিড়ালটার তিনটি বাচ্চা হয়। বাচ্চাগুলি বড় হইবার পর দেখা গেল—তাহারাও মায়ের দেখাদেখি কুমড়ো খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে। একটা বাচ্চার তো মাছের চেয়েও কুমড়োর উপরই বেশী ঝোঁক দেখা যাইত। বন্য অবস্থায় থাকিলে হয়তো অতি সহজেই কুমড়ো-ভোক্তা এক জাতীয় বিড়ালের প্রাচুর্য্য দেখা যাইত। কিন্তু এই বিড়ালটার পরবর্ত্তী বংশধরেরা কে কিরূপ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই।



এই জাতীয় দাঁড়কাকেরা গাঙপাখীর বাচ্চা খাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায়

হেরিং-গাল এবং কৃষ্ণপৃষ্ঠ-গাল জাতীয় পাখীরা স্বভাবতঃই মৎস্যাশী। বস্তুতঃপক্ষে মৎস্য শিকার করিয়াই ইহারা জীবিকা-



সাদা লেজওয়ালা ঈগল। আয়র্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে এক সময়ে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাইত, কিন্তু এখন ইহাদের সংখ্যা অসম্ভব রূপে হ্রাস পাইয়াছে



নিউজিল্যাণ্ডের মাংসাশী টিয়া

নির্ব্বাহ করে। কিন্তু অনেকদিন হইতেই দেখা গিয়াছে, স্কটল্যাণ্ডের এই জাতীয় পাখীরা শস্য ভক্ষণেও পশ্চাৎপদ নহে। এই শস্যানুরক্তি বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বর্ত্তমানে ইহারা এখন প্রায় নিছক নিরামিষাশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ স্থানের এক-একটা শস্যক্ষেত্রে প্রায় দুই-তিন শত পাখীকে একত্রে শস্য ভক্ষণে ব্যাপৃত দেখা যায়। হেরিং-গালরা আবার গোল আলু, শালগম প্রভৃতির অভ্যন্তর ভাগ কুরিয়া খাইয়া মহা অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রকায় গালরা অবশ্য শস্যক্ষেত্রের অনিষ্টকারী পোকামাকড় ধ্বংস করিয়া কৃষকের যথেষ্ট উপকারও করে। ইহাদের আহার্য্য সম্পর্কে স্বভাব পরিবর্ত্তনের কারণ বোধ হয় অতিরিক্ত মাত্রায় বংশবৃদ্ধি। সাদা লেজওয়ালা ঈগল, একজাতীয় দাঁড়কাক, পেরিগ্রিণ ফ্যাল্‌কন্ প্রভৃতি পাখীরা গালজাতীয় পাখীদের বাচ্চাগুলি খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলিত। মানুষের শত্রুতা এবং অন্যান্য বিবিধ কারণে এই হিংস্র পাখীগুলির সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে ঐস্থানে এই গালপাখীর সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে। অধিকন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃক মৎস্য শিকারের অপেক্ষাকৃত উন্নত উপায় অবলম্বিত হইবার ফলে সংখ্যানুযায়ী ইহাদের আহার্য্য পদার্থের অনটন ঘটিবারই কথা। কাজেই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়াই ইহারা ক্রমশঃ নিরামিষ খাদ্যেই উদরপূরণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বুদ্ধির সহায়তায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই পাখীগুলির স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় আহার্য্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু আঙ্গিক পরিবর্ত্তনও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই পরিবর্ত্তনে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। গেছো-কাঁকড়া বা রবার-ক্র্যাবের কথাই ধরা যাউক। কৃষ্টমাস্‌-আইল্যাণ্ড এবং অনুরূপ অন্যান্য দ্বীপে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে এক প্রকার বৃহদাকৃতির কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণ সন্ন্যাসী-কাঁকড়ারই জ্ঞাত-ভাই। কিন্তু ইহারা এখন সম্পূর্ণরূপে স্থলচর প্রাণীতেই পরিণত হইয়া গিয়াছে। ডিম পাড়িবার সময় একবার মাত্র জলে নামিয়া থাকে। জল হইতে ডাঙ্গায় আসিতে ইহাদের বোধ হয় খুব বেশী সময়ই লাগিয়াছে। কারণ ইহা কেবল খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারই নহে—জলের জীব ডাঙায় উঠিলে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাপারটারও পরিবর্ত্তন দরকার; স্বভাব পরিবর্ত্তন অপেক্ষা শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সন্ন্যাসী-কাঁকড়া জলে মিশ্রিত বাতাস গ্রহণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাইয়া থাকে; কিন্তু রবার-ক্র্যাব বা গেছো-কাঁকড়া বায়ুমণ্ডল হইতে সোজাসুজি বাতাস গ্রহণ করে। কিন্তু এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে—গেছো-কাঁকড়ার গাছে চড়া এবং নারিকেলের শাঁস ভক্ষণের অভিনব স্বভাব লইয়া। সন্ন্যাসী-কাঁকড়ারা সাধারণতঃ পরিত্যক্ত শামুক, গুগ্‌লির খোলা অধিকার করিয়া তাহার মধ্যেই বসবাস করে এবং খোলা সমেতই একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। ইহারা ছোট ছোট পোকামাকড় এবং অন্যান্য খাদ্যের টুকরা সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করে। এই হিসাবে ইহাদিগকে প্রধানতঃ মাংসাশী প্রাণীই বলা যাইতে পারে। ইহাদেরই কেহ কেহ হয়তো কোন গতিকে একবার নারিকেল-শাঁসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। নারিকেলের লোভে ক্রমশঃ গাছে চড়িতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। শক্ত, ধারালো সাঁড়াশীর মত দাঁড়ার সাহায্যে ইহারা নারিকেলের খোলে ছিদ্র করিয়া শাঁস তুলিয়া খায় এবং শাঁসশূন্য শুষ্ক খোলাগুলিকে তাহাদের আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহার করে। ইহাদের লেজের দিকটা অপেক্ষাকৃত কোমল, কাজেই শক্ত খোলার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নারিকেলের খোলার অভাবে ইহারা পরিত্যক্ত সিগারেটের কৌটা বা অনুরূপ



আয়র্লাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড হইতে এই জাতীয় সুন্দরকায় শিকারী ঈগলও প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে

কোন পদার্থের মধ্যেও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। গেছো-কাঁকড়ার এই স্বভাব যে খুব বেশী দিনের নহে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ ঐ সকল দ্বীপে পূর্ব্বে নারিকেল গাছের চিহ্নমাত্রও ছিল না। বোধ হয় কোন দূর দেশ হইতে সমুদ্রজলে ভাসিয়া আসিয়া নারিকেল এ সকল দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং তাহাও খুব বেশী দিনের কথা নহে। গেছো-কাঁকড়ার লেজ সন্ন্যাসী-কাঁকড়াদের মত এত কোমল না হইলেও পূর্ব্বের অভ্যাস ইহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। এখনও তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মতই শক্ত খোলার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন সুদৃঢ় আবরণের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করার ব্যাপারটা সংস্কারলব্ধ হইতে পারে; কিন্তু গাছে চড়িবার অভ্যাসটা যে বুদ্ধির সাহায্যেই অর্জ্জিত হইয়াছে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা হইতেই মনে হয় ব্যাং জাতীয় প্রাণীরাও বোধ হয় এই ভাবেই ডাঙায় উঠিয়াছিল তবে এখনও তাহারা উভচর বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কই, সিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্য জাতীয় প্রাণীরা এরূপ অভ্যাস পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় কতকটা অগ্রসর হইলেও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

মোটের উপর দেখা যায়, সংস্কারই প্রধানতঃ প্রাণীদের স্বভাব নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে; কিন্তু অনুকরণপ্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাব পরিবর্ত্তনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তবে সংস্কারলব্ধ স্বভাব খুব কমই পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি বা অনুকরণ-জাত স্বভাব সহজেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তিতির, ডাহুক প্রভৃতি পক্ষিশাবকেরা তাহাদের মায়ের নিকট হইতে বিপদসূচক একটিমাত্র শব্দ শুনিবামাত্রই একেবারে কাঠের



নিউজিল্যাণ্ডের কিয়া-প্যারট। ইহারা মেষের চর্ব্বি ও মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে

মত নিশ্চল হইয়া যায়। মুরগীর বাচ্চাগুলি মায়ের আশেপাশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়; কিন্তু মায়ের নিকট হইতে একটিমাত্র বিপদসূচক শব্দ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহার ডানার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইগুলি তাহাদের সংস্কারলব্ধ অভ্যাস। এই অভ্যাস কদাচিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। কেমন করিয়া শত্রুর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে হয় উদ্‌বিড়াল বা ভোঁদরেরা তাহা তাহাদের বাচ্চাগুলিকে শিক্ষা দিয়া থাকে। বাচ্চাগুলি তাহা দেখিয়া দেখিয়া বা অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করে। কিন্তু যখন তাহারা মাছ, ব্যাঙ বা অন্য কোন প্রাণী ধরিয়া উদরস্থ করিতে অভ্যাস করে তখন তাহা তাহাদের রুচি অনুযায়ী অনেকটা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেশে চাঁপা এবং জবা গাছে ঈষৎ সবুজাভ এক প্রকার ক্যাটারপিলার বা শুঁয়াপোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দলে দলে এক একটা পাতার তলায় অবস্থান করে। প্রচুর খাদ্য পাইবার আশায় ইহারা দলবদ্ধ ভাবে নূতন স্থানে অভিযান করে। এই অভিযানের সময় একটি আর একটির লেজের দিকটা স্পর্শ করিয়া সারি বাঁধিয়া অগ্রসর হয়। যদি কোন অপ্রশস্ত গোলাকার স্থানে ইহাদিগকে তুলিয়া দেওয়া যায় তবে ইহারা মজ্জাগত সংস্কারবশে দিনের পর দিন সেই স্থানেই ঘুরিতে থাকে। অনাহার-জনিত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন নিস্তেজ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ঘূর্ণন থামে না। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, সংস্কারমূলক বলিয়াই বোধ হয়, কোন রকমেই তাহারা এই অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিমান জীবজন্তুদিগকে অতি সহজেই কোন নূতন বিষয়ে অভ্যস্ত করা যাইতে পারে এবং সহজেই তাহারা নিজেকে নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লয়।

স্বাভাবিক অবস্থা হইতে গাছপালা বা জীবজন্তুকে কোন নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রতিপালন করিয়া দেখা গিয়াছে তাহারা খাদ্য এবং অন্যান্য অভ্যাস সম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া সামঞ্জস্য বিধানে যত্নবান হয়। কিছুকাল পরে এই নূতন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইলেও অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজে দূরীভূত

হয় না। বিবর্ত্তনবাদ সম্পর্কিত ভাষায় ব্যক্তিগতভাবে এইরূপ অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যকে বলা হয়—'মডিফিকেসন'। কিন্তু জীবজগতে আর এক রকমের পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায় যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে—ইহাকে বলা হয় 'য়্যাড্‌জাষ্টমেণ্ট'। যদি কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি কিছুকালের জন্ত গরমদেশে বাস করে তবে তাহার দেহের রং বদলাইয়া যায়। চামড়ার মধ্যে 'মেলানিন' নামক কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার রঞ্জক পদার্থের আবির্ভাব হেতুই এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। গরম দেশের অধিবাসী নিগ্রোরাও এই কারণেই ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। প্রখর উত্তাপ হইতে চামড়াকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই ইহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু শ্বেতকায় ব্যক্তি কিছুকাল পরে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেই তাহার গায়ের চামড়ার স্বাভাবিক রং ফিরিয়া আসে। এইরূপ সাময়িক পরিবর্ত্তনকেই 'য়্যাডজাষ্টমেণ্ট' বলা হয়। শ্বেতকায় ব্যক্তি ত্রিশ বৎসরের অধিককাল একাদিক্রমে গরম দেশে বসবাস করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলে তাহার স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ আর ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় না। চামড়ার রঙের এই ব্যক্তিগত অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যকে 'মডিফিকেশন' বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই 'মডিফিকেশন' বা ব্যক্তিগত অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে পরিচালিত হয় কি না এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানিতে পারা যায় নাই। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, মেষকে অধিকতর ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় প্রতিপালন করিলে তাহার গায়ের লোম অধিকতর ঘন এবং দীর্ঘ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী বংশধরদের গায়ের লোম আরও উন্নত ধরণের হইতে দেখা যায়। আত্মরক্ষার জন্ত ইহা একটি প্রয়োজনীয় 'মডিফিকেশন'। পিতামাতা অপেক্ষা বাচ্চাগুলির পশম অধিকতর উন্নত ধরণের হইবার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা জন্মাবধিই ঠাণ্ডা আবহাওয়ার প্রভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু তাহাদের পিতামাতা কেবলমাত্র অবস্থা-পরিবর্ত্তনের পর হইতে এই প্রাকৃতিক রক্ষণ-ব্যবস্থার প্রভাবাধীন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের পরবর্ত্তী বংশধরদের অবস্থা কিরূপ হইয়া থাকে তাহার সঠিক বিবরণ না পাইলে বিবর্ত্তনের দিক দিয়া ইহার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার।



এই জাতীয় গাল পাখীরা শস্যভুক্ হইয়া উঠিয়াছে

উদ্ভিদ-জগতেও এইরূপ ঘটনা অহরহই ঘটিতে দেখা যায়। নিম্নভূমির গাছকে পর্ব্বতের উপরিভাগে রোপণ করিলে অভিনব আবহাওয়ার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত তাহাকে কতকগুলি পরিবর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কাহারও বল্কল পুরু হইয়া যায়, কাহারও বা পাতার গায়ে অসংখ্য শুঁয়া আত্মপ্রকাশ করে। তাহাদের পরবর্ত্তী বংশধরদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রবলভাবে বিকশিত হয়। কিন্তু তাহাদিগকে পুনরায় নিম্নভূমিতে রোপণ করিলে দুই একটি পাতা বা ডাঁটা অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিলেও নূতন পাতা বা নূতন বংশধরেরা ঠিক পূর্ব্বাবস্থায়ই ফিরিয়া আসে। উর্ব্বর-ভূমির উদ্ভিদকে মরুভূমিতে প্রতিপালন করিলেও অবস্থানুযায়ী ঠিক একই ধরণের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে 'য়্যাডজাষ্টমেণ্ট' ও 'মডিফিকেশনে'র মাঝামাঝি এক রকমের পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়।



গাল জাতীয় মৎস্যাশী পাখীরা শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে

জীব-জগতের অভিব্যক্তির দিক হইতে 'মডিফিকেশন' সম্পর্কিত কতকগুলি পরীক্ষার ফল অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। করিন্থিয়া এবং ডালম্যাটিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রোটিয়াস নামক এক জাতীয় অন্ধ নিউট বা জল-টিকটিকি বাস করে। ইহারা প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। শরীর বৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের চোখ দুইটি যথাযথরূপে বর্দ্ধিত হয় না; চামড়ার নীচে অপরিণত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রোটিয়াসকে গুহা হইতে আলোকোদ্ভাসিত পরীক্ষাগারে স্থানান্তরিত করিলে এক হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যেই চোখের স্থানে কাল দাগ আত্মপ্রকাশ করে এবং শরীরের রং সাধারণ নিউটের মতই কালো হইয়া যায়। কিন্তু বাচ্চা অবস্থায় ইহাদিগকে লাল আলোতে রাখিলে সাধারণ নিউটের মতই স্বাভাবিক চোখ আত্মপ্রকাশ করে। সাদা এবং লাল আলোতে এইরূপ পার্থক্য ঘটিবার কারণ আর কিছুই নহে—সাদা আলোতে প্রোটিয়াসের শরীরের চামড়া অতি শীঘ্রই কালো হইয়া পড়ে, কাজেই কালো রং ভেদ করিয়া চোখের স্থানে বেশী আলো পড়িতে পারে না, এইজন্যই সাদা আলোতে চোখ দুইটি পুরাপুরি ভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কিন্তু লাল আলোতে এরূপ কিছু হয় না বলিয়াই পূর্ণমাত্রায় ইহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটাকে 'প্লাস-মডিফিকেশন' বলা যাইতে পারে। ইহার বিপরীত পরীক্ষায় 'মাইনাস-মডিফিকেশনের'ও চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। তিন বছর ধরিয়া লাল-মাছকে অতি সাবধানতার সহিত সম্পূর্ণ অন্ধকারে প্রতিপালন করিয়া দেখা গিয়াছে—বরাবর অন্ধকারে থাকিবার পর তাহাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু এই অন্ধ মাছের বাচ্চাগুলিও অন্ধ হইয়া জন্মে কি না অথবা কত পুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীনতা অব্যাহত থাকে—এই বিষয়ে ধারাবাহিক পরীক্ষা হইলে জীব-জগতের ক্রমবিকাশের অনেক রহস্যই সহজে উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিত।



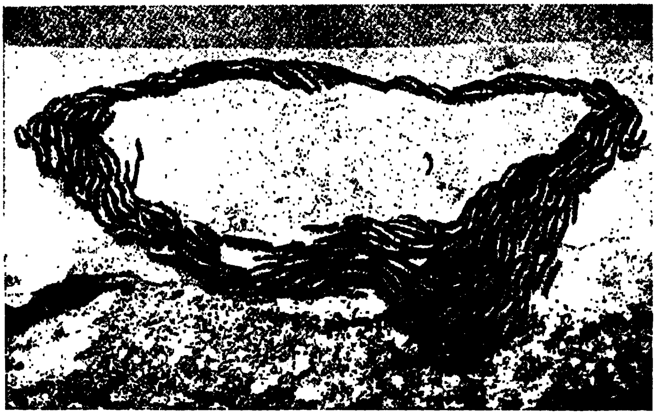
নারিকেল গাছের উপর গেছো-কাঁকড়া

অবস্থাভেদে মেক্সিকোর য়্যাক্সোলোটল নামক প্রাণীদের রূপ পরিবর্ত্তনও এরূপ এক প্রকার অদ্ভুত ঘটনা। এই প্রাণীরা বংশ-পরম্পরায় চিরকাল বেঙাচির মত জলে বাস করিয়া আসিতেছে। ইহাদের যৌবন অথবা বার্দ্ধক্যে শৈশব অবস্থার রূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু ডাঙায় উঠাইয়া কৌশলক্রমে ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে অথবা থাইরাক্সিন প্রয়োগে ইহারা অল্পদিনের মধ্যেই গিরগিটি জাতীয় স্থলচর জীবে পরিণত হয়। এ সকল ব্যাপার হইতে সহজেই মনে হয়—নিউটের অন্ধত্ব বা য়্যাক্সোলোটলের জলচারী রূপ পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরশীল একটা সাময়িক পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নহে। দীর্ঘকাল প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়াও তাহা স্থায়ী পরিবর্ত্তনে পরিণত হইতে পারে নাই। অবস্থার প্রভাবে নিউটের প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি অথবা য়্যাক্সোলোটলের প্রকৃত রূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে মাত্র। জীব-জগতের বিবর্ত্তন কতকগুলি পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা ঊর্দ্ধগামী বা অধোগামী উভয় রকমেরই হইতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তিগত-ভাবে একটা জীবের পক্ষে যে নিয়ম সত্য একটা জাতির পক্ষেও তাহা সত্য এবং ব্যাপক ভাবে দেখিলে সমগ্র জীব-জগৎ সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য। এই হিসাবে জীব-জগতের প্রকৃতি ও রূপ-বৈচিত্র্যকে এক একটা সাময়িক পরিবর্ত্তনরূপেই ধরা যাইতে পারে। বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে আদিম বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করে মাত্র। কিন্তু আমাদের প্রধান বক্তব্য হইতেছে—অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য লইয়া। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় পৌনঃ-পুনিক প্রচেষ্টা, পরিবেশ পরিবর্ত্তন অথবা ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে অর্জ্জিত কোন বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে পরিচালিত হয় কি না ইহাই হইল প্রশ্ন। পরিবেশ পরি-বর্ত্তনের ফলাফল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টার ফলে অর্জ্জিত কোন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততিতে পরিচালিত হয় কি না—এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষার ফলে আজ পর্য্যন্তও কোন সমর্থন-



গেছো-কাঁকড়া নারিকেলের শাঁস কুরিয়া খাইতেছে

সূচক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরীক্ষার বিষয় আলোচনা না করিয়াও সাধারণ পরিচিত ঘটনা হইতেই দেখা যায়, বহুকাল হইতেই চীনদেশীয় মেয়েদের পা ছোট করিবার রেওয়াজ প্রচলিত থাকিলেও এতকাল পরেও তাহাদের মেয়েরা ছোট পা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তথাপি এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্যবহার, অব্যবহার সম্বন্ধে লামার্কের মতবাদ প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও আজকাল অনেকে আবার ইহার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজিয়া পাইয়েছেন। ডারুইন জীবনসংগ্রামে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, যোগ্যতমের উদ্বর্তন দ্বারা জীবজগতের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করিলেও ব্যবহার এবং অব্যবহারের কথাটা বাদ দিতে পারেন নাই। প্রোটিয়াসের অন্ধত্ব এবং গোল্ডফিসের অন্ধত্ব সম্পর্কিত আলোচনা হইতেও ব্যবহার এবং অব্যবহারের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। মোটের উপর



শুঁয়াপোকার চক্রাকারে পরিভ্রমণের দৃশ্য

জীব-জগতের ক্রমবিকাশের অনেক ঘটনা হইতেই ব্যবহার এবং অব্যবহারের যৌক্তিকতা উপলব্ধি হয়। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুক্তির সারবত্তা যতই থাকুক তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

আমার জগৎ

আলবার্ট আইনষ্টাইন, অনুবাদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জীবন বা এই জৈব সত্তার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্মের অবতারণা অনিবার্য। সুতরাং এই প্রশ্ন উত্থাপনের কোন সার্থকতা আছে কি? আমি উত্তর দিব, যে ব্যক্তি নিজের ও প্রতিবেশীর জীবন উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া মনে করে সে শুধু হতভাগ্যই নহে অধিকন্তু জীবনধারণের অযোগ্য।

মরজীবের পক্ষে কি এক সামঞ্জস্যহীন অবস্থা! প্রত্যেকে সংসারে অল্পকাল অবস্থানের জন্য আসিয়াছে—কি উদ্দেশ্যে কেহ জানে না—যদিও কখনও কখনও অন্তরে ইহার উপলব্ধি অনুভূত হয়। জীবনের গভীরতর দিক বাদ দিয়া দৈনন্দিন জীবনের দিক হইতে দেখিলে আমরা পরস্পরের জন্য জীবনধারণ করি। প্রথমতঃ তাহাদের জন্য যাহাদের হাসিমুখ আর মঙ্গলের উপর আমাদের সকল শুভ নির্ভর করে; আর ব্যাপক ভাবে তাহাদের জন্য যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে অপরিচিত হইলেও যাহাদের অদৃষ্টের সহিত আমরা মমত্ববোধের আকর্ষণে আকৃষ্ট। প্রতিদিন আমি নিজেকে শত বার স্মরণ করাইয়া দিই—আমার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জীবন জীবিত ও মৃত বহু লোকের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে; সুতরাং আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আমি অপরের নিকট হইতে যে পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছি ও করিতেছি সেই পরিমাণ প্রতিদান দিতে পারি। অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি আমি প্রবল আকর্ষণ বোধ করি এবং প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়াও প্রতিবেশিগণের শ্রমসাধ্য কাজ আদায় করিতে হয় এই ভাবনা সর্বদাই আমার নিকট পীড়াদায়ক। সামাজিক শ্রেণীবিভাগ সাম্যের পরিপন্থী ও উহার পরিণতি জবরদস্তিতে পর্যবসিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। আমার বিবেচনায় সরল জীবনযাপন মানসিক ও দৈহিক উভয় কারণে প্রত্যেকের পক্ষেই উত্তম।

দার্শনিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতায় আমি আস্থাহীন। শুধু বাহিরের চাপে নয় অন্তরের প্রয়োজনবোধেও মানুষ কাজ করিয়া থাকে। "মানুষ সংকল্প অনুসারে কার্য করিতে পারে কিন্তু কল্পনার অনুরূপ সংকল্প করিতে পারে না"—শোপেনহাওয়ারের এই উক্তি যৌবনকাল হইতে সর্বদা আমার নিজের ও অপরের জীবনের সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রেরণা ও ধৈর্যের চির-উৎসরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। যে গুরুদায়িত্ববোধ অতি সহজে মানুষের সত্তাকে পঙ্গু করিয়া দেয়—এই দৃষ্টিভঙ্গী কোমলস্পর্শে উহার তীব্রতা প্রতিরোধ করে। ইহা আমাদের নিজেদের ও অপরের সম্বন্ধে অত্যধিক ভাবনা হইতে বিরত রাখে আর এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করে যাহাতে জীবনে 'রস-বোধ' সকল বস্তুর উপরে উহার উপযুক্ত স্থান লাভ করে।

নিজের জীবন বা সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধান বাস্তবতার দিক হইতে আমার নিকট সর্বদাই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জীবনের সকল প্রচেষ্টা ও বিচারবুদ্ধির গতি নির্দেশ করে এমন কতকগুলি আদর্শ প্রত্যেকেরই থাকে। এই অর্থে আরাম ও সুখ আমি কখনও কাম্য পরিণতি বলিয়া বিবেচনা করি না। সত্য, সৌজন্য ও সৌন্দর্য এই তিন আদর্শ আমার জীবন-পথ আলোকিত করিয়াছে ও আনন্দে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইতে পুনঃপুনঃ আমাকে নব নব উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতিবোধ এবং শিল্প ও বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে চির-অভেদ্য রহস্যাবৃত বস্তুজগতের ধ্যানমগ্ন কর্ম-ব্যস্ততা না থাকিলে জীবন আমার নিকট ফাঁকা বোধ হইত। বিত্ত, বৈষয়িক লাভ ও ভোগবিলাস—মানুষের এই সাধারণ কাম্য বস্তুগুলি চিরদিনই আমার নিকট তুচ্ছ মনে হয়।

সামাজিক সাম্য ও নাগরিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে—আমার প্রবল অনুভূতির সহিত ব্যষ্টি বা সমষ্টির সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা ব্যাপারে স্বীয় স্বাধীন অভিমতের একটা দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। আমার জীবন আমি নিজেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি এবং সর্বান্তঃকরণে কখনও আমি নিজের দেশ, স্থান, বন্ধুবান্ধব ও পরিজনের হইতে পারি নাই। এই সকল প্রীতি-বন্ধনের মধ্যেও সর্বদা আমি একটা কঠিন নিঃসঙ্গ-ভাব ও নিবিড় নিরালার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া থাকি। আর এই ভাবটি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেহ কেহ মানুষের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সমদৃষ্টির সম্ভাবনার সীমা সম্বন্ধে একান্তভাবে সজাগ, অথচ এইজন্য তাঁহাদের পরিতাপ করিবার কিছুই নাই। এইরূপ ব্যক্তি হালকা সহৃদয়তা ও লঘুহৃদয়তার ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিঃসন্দেহ; পক্ষান্তরে অপরের মতামত, আচার-ব্যবহার ও ধারণার প্রভাব হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত থাকে এবং এই সকল অস্থায়ী বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভের প্রলোভন পরিহার করিতে পারে।

আমার রাজনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্রের অনুকূল। প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা কর কাহারও প্রতি দেবত্ব আরোপ করিও না। অদৃষ্টের পরিহাসবশতঃ আমি লোকের নিকট হইতে অত্যধিক প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছি। এইজন্য আমার নিজের কোন ত্রুটি বা গুণ দায়ী নয়। আমার ক্ষীণ শক্তির সাহায্যে অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার ফলে অনেকের অনধিগম্য যে দুই-একটি ধারণা আমি আয়ত্ত করিয়াছি ঐগুলি বুঝিবার চেষ্টা ইহার কারণ হইতে পারে। আমি সঠিক ভাবেই জানি যে কোন জটিল বিষয় সম্বন্ধে সার্থকতা অর্জন করিতে হইলে ব্যক্তি-বিশেষকে সকলের চিন্তাধারা পরিচালিত করার ভাব ও মূলতঃ উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও পরিচালিত করা চলিবে না। যাহারা পরিচালিত হইবে তাহাদের নিজেদের নেতা নির্বাচনের সুযোগ দিতে হইবে। আমার মতে নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র শীঘ্রই অধোগামী হয়। কারণ আসুরিক শক্তি সর্বদাই নীচমনা লোকদিগকে আকর্ষণ করে এবং প্রবল মেধাবী স্বৈরাচারীর স্থান গুণ্ডারা দখল করিয়া থাকে—ইহা অনিবার্য নিয়ম বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই কারণে ইতালী ও রাশিয়াতে যে শাসনতন্ত্র চলিতেছে আমি আন্তরিক ভাবে উহার বিরোধী। ইউরোপে প্রচলিত গণ-তন্ত্রের যে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে গণতান্ত্রিক মতবাদ উহার জন্য দায়ী নয়। সরকারী নেতাদের কার্যে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ও নির্বাচন ব্যাপারে (দলগত চাপে) ব্যষ্টির স্বাধীন মতামত ব্যবহারের অভাব এইজন্য দায়ী। আমার বিশ্বাস আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই সম্বন্ধে সঠিক পথ গ্রহণ করিয়াছে। বেশ খানিকটা দীর্ঘ সময়ের জন্য উঁহারা রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য দায়ী একজন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিয়া থাকেন এবং প্রেসি-ডেণ্টকে দায়িত্ব সম্পাদনের যোগ্য প্রচুর ক্ষমতা দান করিয়া থাকেন। আমাদের নিজেদের শাসন-পদ্ধতিতে লোকের অসুস্থতা ও অভাবের সময় সাহায্যের যে-সকল ব্যবস্থা আছে ঐগুলি আমি খুবই মূল্যবান মনে করি। মানুষের জীবন-ব্যবস্থায় প্রকৃত মূল্যবান বস্তু ব্যষ্টির সৃষ্টিশক্তি ও ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্র নয়। কেবলমাত্র এই শক্তিই সকল মহৎ ও অনবদ্য সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে; পক্ষান্তরে সমষ্টির চিন্তাশক্তি ও অনুভূতি চিরদিনই অমার্জিত থাকিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় পশুজনোচিত দলবদ্ধ হওয়ার ভাব হইতে উদ্ভূত সর্বাপেক্ষা বড় কুফল সামরিক ব্যবস্থার কথা। ইহাতে আমার বড়ই অপ্রবৃত্তি। মানুষ যে দলবদ্ধ হইয়া বাদ্যযন্ত্রের নির্দেশমত পা ফেলিয়া চলিতে আনন্দ পায় শুধু এই কারণই উহাদের প্রতি আমার ঘৃণা উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। উহাদের বৃহৎ মস্তিষ্ক যেন ভুলে দেওয়া হইয়াছে—কেবলমাত্র মেরুদণ্ডই উহাদের প্রয়োজন। যত দ্রুত সম্ভব সভ্যতার এই গ্লানি অপনোদন করা কর্তব্য। আদেশমাফিক বীরত্ব, বর্বরোচিত হিংসা ও নিরর্থক যে-সকল অনাচার স্বদেশ-প্রেমের নামে চলিতেছে ঐগুলির প্রতি আমার কতই-না ঘৃণা। বিবাদ আমার নিকট অত্যন্ত নীচ ও ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে হয়। আমার দেহ শত ভাগে ছিন্ন হউক সেও ভাল, তবু আমি এইরূপ জঘন্য কাজে যোগদান করিতে চাই না। এইসব সত্ত্বেও মানবজাতি সম্বন্ধে আমার ধারণা এত উচ্চ যে আমি বিশ্বাস করি যদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাপাখানার মারফত ব্যবসায় ও রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে জাতির সদিচ্ছাকে নিয়মিত ভাবে নষ্ট করা না হইত তবে এই নৃশংস ব্যাপার বহু দিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইত। সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের আস্বাদ আমাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। সকল প্রকার যথার্থ শিল্প ও বিজ্ঞান অনুশীলনের মূলে এই অনুভূতি বর্তমান। যাহার এই সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, কল্পনাশক্তি আর বিস্ময়-অনুভূতি নাই, সে মৃতকল্প, নির্বাপিত প্রদীপ তুল্য। ধর্ম ও সৃষ্টির মূলেও রহস্যানুভূতি বর্তমান, যদিও ইহাতে ভয় মিশ্রিত আছে। এক অনন্ত সত্তার অবস্থান, চরম সুশৃঙ্খল এক বিধির অভিব্যক্তি ও পরম উজ্জ্বল এক সৌন্দর্যের বিকাশ—যাহাদের অতি সামান্য অংশ-মাত্র আমাদের বোধগম্য—ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুভূতিই প্রকৃত ধর্মভাবের সৃষ্টি করে। কেবল মাত্র এই একই অর্থে আমি নিবিড় ভাবে ধর্মভাবাপন্ন। যে ভগবান নিজ সৃষ্ট জীবকে পুরস্কার বা সাজা দিয়া থাকেন অথবা যাঁহার আমাদের ন্যায় সজাগ প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাঁহার কল্পনা আমি করিতে পারি না। মৃত্যুর পরেও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিবে ইহা আমার ধারণার অতীত। আমি এইরূপ কামনাও করি না। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি দুর্বল চিত্তের অদ্ভুত আত্মম্ভরিতা ও ভীতিপ্রসূত। রহস্যময় আত্মার অবিনশ্বরতা, অপরূপ সুন্দর বস্তুজগতের বিকাশ, আর উহারই সঙ্গে একাগ্রচিত্তে প্রকৃতির মধ্যে পরিস্ফুট এই সুশৃঙ্খলার অংশবিশেষকে বুঝিবার জন্য প্রয়াস আমি (জীবনে) যথেষ্ট মনে করি।*

* *Mein Weltbild* গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ

মহাসঙ্গমে রোমাঁ রোলাঁ

শ্রীতারাপদ রাহা

(জন্ম ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী.—ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্লামেসীতে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এঁর বিখ্যাত উপন্যাস জাঁ ক্রিশতফের জন্য নোবেল প্রাইজ পান। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯০৪-১৯১২। এঁর অন্যান্য উপন্যাসের নাম—*Col s, Breugnon, Clerous boult, Annette and Sy vie, Summer, Mother and Son, The Soul Enchanted* এ ছাড়া *Michel ungelo. H indel, Bethoven, Gand i, G ethe, Ramakrishna, Vivek inanda* প্রভৃতির জীবনী নিয়েও ইনি গ্রন্থ রচনা করেন। *I will not rest* এঁর আর একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ।)

ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে মনীষী রোলাঁর অমর আত্মা মহাসঙ্গম লাভ করেছে।

মানুষের জীবনকে নদীরূপে দেখেছেন তিনি বহু বার নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জাঁ ক্রিশতফের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—এই গ্রন্থ এবং তার নায়ককে আমি একটা গতিপরিবর্তনশীল নদীরূপে মনে করে নিয়েছি। এই গ্রন্থের যদি কিছু পরিকল্পনা থাকে ত মাত্র এই।

তাঁর *The Life of Ramakrishna* নামক গ্রন্থে নিজের সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি প্রতীচ্যর পাঠকবর্গকে সম্বোধন করে বলেছেন,

Now of all rivers the most sacred is that which gushes out eternally from the depths of the soul. . . . Every thing belongs to this river of the soul, flowing from the dark uplumbed reservoir of our being down the enevitable and mastered being. And just as the water condenses and rises in vapour from the sea to the clouds of the sky to fill again the reservoir of the rivers, the cycles of creation proceed in uninterrupted succession. (১)

পড়তে গিয়ে জগদীশচন্দ্রের 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'র কথা মনে পড়ে—"...আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?—নদীর কুলু কুলু ধ্বনির মাঝে শুনিতে পাইলাম—'মহাদেবের পদতলে। আমরা যথা হইতে আসি আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।'"—রোলাঁর কণ্ঠে এরই প্রতিধ্বনি—"...The cycles of creation proceed in uninterrupted succession."

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

'But I shall not remain leaning at the edge of the river. I shall continue my march with the stream right to the sea. . . . And we shall embrace within the river and its tributaries, small and great, and in the ocean itself the while moving mass of the living God.' (২)

রামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর তিরোধানের অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন তিনি—The river re-enters the sea. তাই তাঁর নিজের মৃত্যুকেও আজ মৃত্যু বলতে ইচ্ছা হয় না—একে বলতে চাই মহাসঙ্গম।

ভারতীয় সাধনার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। রামকৃষ্ণের জীবনীর প্রারম্ভে তাই তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে যদি এমন কোন দেশ থাকে যেখানে সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের যত সাধনা সব সিদ্ধি লাভ করেছে,—ত সে হচ্ছে ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এই সময় ইউরোপে আসন্ন দুর্যোগের আভাস পেয়ে রোলাঁর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'ল দেখে তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল স্বীয় জন্মভূমির কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের শান্ত আবহাওয়ায় নীড় রচনা করলেন। রোলাঁ নিজের এ নূতন আবাসকে বলেছেন—আশ্রম।

বন্ধু ম্যাক্সিম গর্কীও ব্যর্থতার বেদনা দিয়ে ঠিক এই সময়ে সাময়িকভাবে রাশিয়া ত্যাগ করেন।

পাশ্চাত্যে আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে রোলাঁ যখন অধীরচিত্তে পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলেন—তখনই কানে গেল হিন্দুস্থানের আত্মশক্তির ফেনিল কলোচ্ছ্বাস। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে রোলাঁ বলেছেন—

It was then that I saw surging up in the plains of the Indus—the citadel of the spirit which had been raised by the frail and unbreakable Mahatma. And I set myself to rebuild in Europe. (৩

রোলাঁ স্বীকার করেছেন, তাঁর চিত্ত এই সময় গান্ধীর কার্য্যনীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে বইখানা তাঁর এই সময়ের রচনা। পর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, লজপৎ রায়, জবাহরলাল নেহেরু, ডাঃ আনসারি, জগদীশচন্দ্র বসু, কালিদাস নাগ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

ডাঃ কালিদাস নাগের সহিত রোলাঁর সম্বন্ধ দীর্ঘকালের। প্রবাসী-সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণকালে একবার রোলাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি দেখেন রোলাঁর লেখার টেবিলের উপর রয়েছে—ডাঃ নাগ ও শান্তা দেবীর ছবি।

রামানন্দবাবুর ছবির দিকে দৃষ্টি পড়তে রোলাঁর বোন

---

(১) আত্মার অন্তস্তল থেকে যে প্রবাহ শাশ্বত কাল ধরে বয়ে চলেছে – পবিত্রতায় সকল নদীর সেরা সে। জগতের সব কিছুই এই ব্রহ্মনদীর বিন্দু স্বরূপ। অজ্ঞেয় তিমিরাবৃত কোন গভীর আধার থেকে নির্গত হয়ে এই নদী অপ্রতিহত গতিতে চৈতন্যের এক মহাসমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। সমুদ্রের জল বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘাকারে যেমন উৎসে ফিরে যায়, তেমনি করে চক্রাকারে সৃষ্টিপ্রবাহ চলে—অবিরাম।

(২) কিন্তু আমি এই নদীতটে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকব না। নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে তারই মাঝে বহু উপনদীর সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ হয়ে সগুণ ব্রহ্মের মহাসমুদ্রে গিয়ে মিশব আমি।

(৩) আধ্যাত্মিকতার আদিভূমি সিন্ধুতটের যে মহাবিক্ষোভ– এই সময়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কঠোরতপা ক্ষীণকায় মহাত্মা গান্ধীই ছিলেন তার মূলে। এ থেকে প্রেরণা পেয়ে আমিও ইউরোপ-পুনর্গঠন-কার্য্যে মনোনিবেশ করি।

কুমারী রোলাঁ মৃদু হেসে বললেন, "মনে করবেন না—আপনি আসছেন জেনে ছবি দুটি এখানে রাখা হয়েছে,—ছবি দুটি এখানেই থাকে।' এর কারণ আছে। ডাঃ নাগের সঙ্গে রোলাঁ-পরিবারের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। কুমারী রোলাঁ ডাঃ নাগের নিকট বাংলা শেখেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী লেখবার সময় রোলাঁ ডাঃ নাগের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। কল্লোল পত্রিকায় রোলাঁর বিখ্যাত উপন্যাস জাঁ ক্রিশ্‌তফের বাংলা অনুবাদ সুরু করেন প্রথমে শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী ও ৺গোকুলচন্দ্র নাগ। গোকুলবাবুর মৃত্যুর পর ডাঃ নাগ নিজেই এই কার্য্যে যোগদান করেন। কল্লোলের অকাল মৃত্যুতে জাঁ ক্রিশ্‌তফের অনুবাদ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রামানন্দবাবুর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে রোলাঁ বলেন, তিনি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের ইতালীয় অনুবাদ পড়েছেন। তাঁর মতে শরৎচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক। শরৎচন্দ্র আর কি কি বই লিখেছেন তিনি জানতে চান।—আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রসঙ্গও ওঠে। রোলাঁ বলেন, ভারতীয় এ বিজ্ঞানীটির অন্তর সম্পূর্ণ কবি-প্রকৃতির।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী প্রভৃতি ভারতীয় ঋষিদের জীবনীই শুধু রোলাঁ লেখেন নি, ভারতীয় ঋষিদের একমাত্র চরম কাম্য আত্মদর্শন বা ব্রহ্মানন্দের স্বাদও তিনি পেয়েছেন। ডাঃ নাগ ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'তে তাঁর *Voyage Interiore*-এর যে বাংলা অনুবাদ করেছেন তাতে পাই রোলাঁ বলেছেন, "আত্মার অন্তস্তল ভেদ করিয়া ঐ উৎক্ষিপ্ত স্রোত জীবনে তিন বার আমাকে আমার লুকান দেবতার স্পর্শ মিলাইয়া দিয়াছে।...সেই পূত অগ্নি-অভিষেক জীবনে তিন বার হইয়াছে। তিন বার বজ্রনির্ঘোষ বিদ্যুদ্দীপ্তির মত তাহা আসিয়াই মিলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার সম্মোহন আজও মিলায় নাই—এ শরীর ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা মিলাইবে না। সুইস সীমান্তে ফরাসী দেশের একটি কোণে—যেখানে ভলটেয়ার থাকিতেন সেই Ferney ভবনের ছাদে প্রথম বিদ্যুৎস্ফুরণ। দ্বিতীয় বার স্পিনোজার অগ্নিমন্ত্র এবং তৃতীয় বার রাত্রির অন্ধকারে পর্ব্বত সুড়ঙ্গ বাহিয়া যাইতে যাইতে টলষ্টয়ের বজ্রবাণী।"

স্পিনোজার প্রভাবে দ্বিতীয় বারের অবস্থা একটু বিশদ করে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই অভিন্ন সত্তা। যাহা কিছু আছে তাহা ভূমাতেই আছে, সুতরাং আমিও ভূমাতেই আছি। এমনি করিয়া শীতের রাত্রে আমার সেই বরফের মত ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে কাঁপিতে কাঁপিতে বস্তুর কারাল-গহ্বর পার হইয়া সত্তার অমিত কিরণে নবজন্ম লাভ করিলাম; এই নব সূর্য্যালোকে অভিনব দিকচক্রবাল দেখিতে দেখিতে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কত ঊর্দ্ধে উড়িয়া এই স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছি, তবুও এই অপূর্ব্ব অনুভূতি যেন স্বপ্নকেও ছাড়াইয়া যায়। শুধু আমার দেহ নয়, আত্মা নয়, আত্মার সমগ্র জগৎ যেন এক সীমাহীন সমুদ্রের মাঝে স্নান করিতেছে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমার এই সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের খাঁচায় যে সত্তার শ্বাস-রোধ হইতেছিল তাহা যেন এক বিরাট্ জগতের উত্তরাধিকার পাইয়া অসীম ধনে ধনী হইয়া উঠিল।"

পড়তে পড়তে মনে হয় রামকৃষ্ণের স্পর্শে নরেন্দ্রনাথের যেন প্রথম নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হচ্ছে।

এই গেল একটি দিকের কথা—রোলাঁর চরিত্রের অন্য দিকও বড় কম নয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে অত্যাচার, মিথ্যাচার, শোষণনীতি চলেছে তাকে উচ্ছেদ ক'রে একটা অখণ্ড শান্তিরাজ্য গড়বার স্বপ্ন তিনি চিরকাল দেখতেন। তাঁর বিবিধ রচনার মধ্যে এর প্রমাণের অভাব নেই। বর্ত্তমানের প্রগতিপন্থী তরুণের দল তাঁর চরিত্রের এই দিকটাই বড় করে দেখেছে। বস্তুতঃ জগতের সত্যকার রূপ দেখতে হলে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল।

রোলাঁর সমগ্র রচনার ভিতরই একটা সর্ব্বসংস্কারমুক্ত পবিত্র মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মানস-পুত্র জাঁ ক্রিশ্‌তফ অনেকাংশে তাঁরই নিরপেক্ষ নিষ্কলুষ সত্যদর্শী মনের প্রতিচ্ছবি। মূল গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে—*Dans la Maison*-এর ভূমিকায় জাঁ ক্রিশ্‌তফের বন্ধুগণকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

"I was isolated: like so many others in France. I was stifling in a world inimical to me. I wanted air: I wanted to react against an unhealthy civilisation, against ideas corrupted by a sham elite: I wanted to say to them 'you lie! You do not represent France! To do so I needed a hero with a pure heart and unclouded vision, whose soul would be stainless enough for him to have the right to speak; one whose voice would be loud enough for him to gain a hearing. I have patiently begotten this hero. (৪)

কল্পনা-রাজ্যে রোলাঁ যে সত্যদর্শী নিষ্কলুষ মানসপুত্রকে সৃষ্টি করেছেন—নিজের জীবনের চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলী দিয়ে তিনি তারই জনক হবার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে গেছেন। জাঁ ক্রিশ্‌তফ সত্যই তাঁর আত্মজ।

গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে 'জ্যর্নাল দা জেনেভ'তে তাঁর যে যুদ্ধবিরোধী প্রবন্ধগুলি বের হয় সেগুলিই তাঁর নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয়তার সাক্ষ্য। মানবপ্রেমিকতার উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যদর্শী ঋষি ফ্রান্সের দোষ-ত্রুটিকেও মার্জ্জনা করেন নি। ফলে তিনি ফ্রান্সের বিরাগভাজন হন। আর এইজন্যই সুইজারল্যাণ্ডের নির্জ্জন পল্লীতে তাঁর স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন। জাঁ ক্রিশ্‌তফের বন্ধু অলিভারের মুখ দিয়ে তিনি নিজের অন্তরের কথাই ব্যক্ত করেছেন। অলিভার বলেছেন,

'I love my country, . . I love France; but could I slay my soul for her? Could I betray my conscience for her? That would be to betray her. How could I hate.

(৪) ফ্রান্সের বিষাক্ত আবহাওয়ায় অন্যান্য অনেকের মত আমারও যেন দম আটকে আসছিল। এখানকার এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্যই আমি সর্ব্বসংস্কারমুক্ত নিষ্কলুষ এমন একটি বীরকে সৃষ্টি করতে চাই যে উচ্চকণ্ঠে ফরাসী জাতিকে শোনাতে পারবে, মিথ্যাচারী তোমরা, ফ্রান্সের সত্য রূপের প্রকাশ তোমাদের মধ্যে কিছুমাত্র নেই।

having no hatred, or, without being guilty of a lie, assume a hatred that I did not feel? (৫)

শুধু ফ্রান্স নয়, পৃথিবীর যেখানেই কোন অন্যায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে রোলাঁ হেনেছেন তাতে নিষ্করুণ তীব্র কশাঘাত। তাঁর 'I will not rest' নামক গ্রন্থের কয়েকটা প্রবন্ধের নাম দেখলেই তা বুঝা যাবে:

Against Italian Fascism, Bloody January in Berlin, Against Colonial Imperialism, Against Fascism in Europe,—Europe—broaden yourself or perish.

অপর দিকে সুন্দরতর, মহত্তর নূতন পৃথিবী গড়ে তুলতে—নিঃস্বার্থ হয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন—তাঁদের প্রতি দেখিয়েছেন তিনি গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিক প্রীতি। শেষোক্ত গ্রন্থে—For our brothers of Russia against the Starvation blockade, For the U.S.S.R. Greetings to Gorki প্রভৃতি প্রবন্ধই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এদের সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, 'হে তরুণের দল, কি বিপুল আনন্দে নিজেদের রক্ত দিয়ে তোমরা ধরিত্রীর তৃষ্ণা মিটাচ্ছ।…হে বিশ্বের বীরের দল, সূর্য্যকরস্নাত এ সুন্দর পৃথিবীতে ধ্বংসের কি বিপুল আয়োজনই না চলেছে। তোমাদের আদর্শই রণক্ষেত্রে তোমাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে…তোমরা আমার প্রিয়।'

দেশের জন্য যে-সব তরুণ নিজের প্রাণ অকাতরে বলি দিচ্ছে তারা তাঁর প্রিয় হলেও যুদ্ধ ব্যাপারে তাঁর তিল মাত্র আস্থা ছিল না। যুদ্ধের ফলাফলের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—যুদ্ধে কেউই বিজয় লাভ করে না, সবারই হয় পরাজয়।

(৫) আমার দেশ ফ্রান্স আমার পরম প্রিয়, কিন্তু তাই বলে তার কাছে আমার আত্মাকে বলি দিতে পারি না। দেশের জন্য বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করলে দেশেরই বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। মনে বিন্দুমাত্র ঘৃণার ভাব না থাকলেও যদি বলতে হয়—আমি ঘৃণা করি—তবে সে ত হবে ঘোরতর মিথ্যাচার।

দৃষ্টিহীনের মনোবৃত্তি

শ্রীফুলরাণী গুহ, এম্‌-এ, বি-টি

আমরা সাধারণ মানুষ মানুষকে কল্পনা করি পূর্ণাবয়বযুক্ত মানুষরূপেই। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়েই মানুষ মানুষ, এই হচ্ছে আমাদের সাধারণ ধারণা; কোনও রূপেই মানুষকে তার তুচ্ছ একটি অঙ্গ থেকে বিচ্যুত বলে কল্পনা করতে আমরা সহজে রাজী হই না। কিন্তু নির্মম বাস্তব মাঝে মাঝে দু'একটি এমনই অঙ্গহীন লোককে আমাদের চোখের সামনে এনে উপস্থিত করে, তাঁদের দেখে আমাদের সময় সময় হয় ঘৃণা, সময় সময় হয় দয়া, সময় সময় হয় ভয়, সময় সময় হয় সহানুভূতি; নানারূপ ভাবই আমাদের মনের মধ্যে খেলে যায়, পূর্ণাবয়ব মানুষ আমরা ঠিক এমনি লোকদের আমাদের সমশ্রেণীর বলে নিই না, খানিকটা নীচু স্তরের বলেই আমরা সাধারণতঃ তাদের ধরে নিই, আবার জ্ঞানে গুণে যখন এরা আমাদের সমান বা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় তখন কোনও কোনও সময় আমরা তাদের ঊর্ধ্ব স্তরের লোক বলেই ধরি। বস্তুতঃ সব সময়ই আমাদের ধারণা—অঙ্গহীন আর পূর্ণাঙ্গ মানুষ দুই শ্রেণীর। এই ধারণার পেছনে হয়ত কিছু কারণও রয়েছে। ধরা যাক্ না, দৃষ্টিহীনদের কথা। ইন্দ্রিয়হীন লোকও অঙ্গহীনের মধ্যেই পড়ে; এখন আমরা দেখছি সব সময়ই ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই জ্ঞানের প্রথম প্রবেশ হচ্ছে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জ্ঞানের প্রবেশ-দ্বার। ইংরেজীতে তাই বলে Senses are the gateways of knowledge; কাজেই একটি ইন্দ্রিয়—একটি প্রধান ইন্দ্রিয় (চক্ষুষ্মানদের মতে) যাদের নেই তাদের ত আমরা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারি না। তারপর এমনি সব লোকের উপস্থিতি আমাদের কাছে কতকটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এসব কারণেই আমরা অঙ্গহীন লোকদের ঠিক আমাদের সমমনোভাব সমমনোবৃত্তিসম্পন্ন বলে ধরে নিতে পারি না। তাদের আমরা স্বতন্ত্র এক ধরণের বলেই মনে করে থাকি।

তারপর দৃষ্টিহীনদের সম্বন্ধে চক্ষুষ্মানদের অদ্ভুত ধারণার জন্য কতকটা স্বাভাবিক কারণও দায়ী। চোখ মানুষের এত প্রয়োজনীয় আর দেহের সৌন্দর্যের পক্ষে এত বেশী সহায়ক যে মানুষ ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় চক্ষুহীন হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। কাজেই চক্ষুহীন মানুষ এক জন চক্ষুষ্মান লোকের সামনে এসে পড়লে চক্ষুষ্মান লোক তাকে ঠিক তার নিজের জগতের লোক বলে মনে করতে সহজে পারে না। পূর্ণাবয়ব মানুষ কিন্তু এখানেই মস্ত এক ভুল করে। মনোভাব মনোবৃত্তি এসব দিকে কিন্তু চক্ষুহীন লোক আর চক্ষুষ্মান লোকের প্রভেদ নিতান্ত কম। বাইরের দেহের কাঠামোকে বাদ দিয়ে ভেতরের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে সেখানে চক্ষুহীন আর চক্ষুষ্মান এ দুয়ের প্রভেদ অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।

অনেক সময় শুনতে পাওয়া যায় দৃষ্টিহীন লোকের মনোবৃত্তি এমনি সব কথা—দৃষ্টিমান আর দৃষ্টিহীন এই দুই রকম বিভাগ করে হয়ত মনোবিজ্ঞানবিদ্‌রা দৃষ্টিহীনের দিকে অনুশীলনী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পথকে দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন এই দুই বিভাগ করা মস্ত একটা ভুল। মানুষ মানুষই—মন তার সব সময়ই এক, কাজেই মনোবৃত্তির গোড়াতে যে দৃষ্টিহীনের মধ্যে অনেক কিছু নূতন রকম দেখা যাবে এ একটা মস্ত ভ্রান্ত ধারণা। যে অনুভূতি দৃষ্টিমান লোকের মধ্যে বর্তমান ঠিক তেমনই অনুভূতি দৃষ্টিহীনের মধ্যেও বর্তমান। চোখ নেই বলে চক্ষুহীন লোকেরা একটা ভিন্ন জগতের লোক নয়। বর্তমান মনোবিজ্ঞান চক্ষুহীন লোকের বৃত্তান্ত অনেক ঘেঁটে অনেক কিছু অনুসন্ধান করে দেখেছেন মনের দিক দিয়ে চক্ষুষ্মানদের সঙ্গে এদের কোন তফাৎ নেই। চিন্তা অনুভূতি ইচ্ছা প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি

সবই প্রায় এক রকম। অনেক Intelligence Test নেওয়ার পর দেখা গেছে চক্ষুহীনদের বুদ্ধিবৃত্তি চক্ষুষ্মানদের চেয়ে খানিকটা কম। তবে এর কারণ হয়ত বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত বলেও হতে পারে। আর অনেক সময় দেখা গেছে অনেক লোক এমন সব ব্যাধিতে চোখ হারিয়েছে যে সেই কালব্যাধি তার চোখ নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি তার মস্তিষ্ককেও দুর্বল করে গেছে—চক্ষুহীনের অপেক্ষাকৃত বুদ্ধির অভাব এই কারণেও অনেক সময় হয়।

জন্ম হতেই পৃথিবীর আলোর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত, তাই তাদের পৃথিবীর ধারণার সুরু হয় নিজেকে কেন্দ্র করেই—আমি আছি সুতরাং জগৎ আছে—কতকটা এই ধরণের বলা যেতে পারে। তার পরে শব্দ তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে পৃথিবীর সবকিছুর কল্পনায়, তারা সবচেয়ে বেশী সাহায্যপায় স্পর্শ দ্বারা। তাদের কাছে দেখা মানেই হচ্ছে স্পর্শ করা। ছোট জন্মান্ধ শিশুর বাইরের ধারণা অনেক সময়ই আরম্ভ হয় শব্দ দিয়ে, শব্দ তাদের মস্ত বড় সহায়ক; স্পর্শ ধারণাকে পরিষ্কার করে, কিন্তু সব জিনিষকে সব সময় স্পর্শ করা সম্ভবপর নয় আর অনেক বিরাট্ জিনিষকে স্পর্শ দিয়ে বোঝা 'সেই হিন্দুস্থানের ছয় জন অন্ধে'র মত ব্যাপারও সৃষ্টি করতে পারে। তা যাই হোক্ একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব তাদের পূরণ করতে হয় অন্য ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে; এরই জন্যে দৃষ্টিহীনদের শ্রবণশক্তি বা স্পর্শশক্তি দৃষ্টিমানদের চেয়ে একটু বেশী তীক্ষ্ণ হয়। এখানে সাধারণ লোকেরা অনেক সময় ভুল করে থাকে—তাদের ধারণা একটি ইন্দ্রিয় চলে গেলে অন্যগুলি স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে; আসলে Compensation Theory এখানে খাটে না। ইচ্ছে করলে সকলেই চালনার দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তীক্ষ্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু চক্ষুষ্মানদের প্রয়োজন হয় না বলে কোন দিনই তারা সে দিকে ঘেঁসে না, কিন্তু চক্ষুহীনদের আপনা হতেই প্রয়োজনবোধটা জন্মায় চলাফেরা প্রভৃতির জন্যই, কাজেই তাদের অন্য ইন্দ্রিয়ের চালনা বেশী করে করতে হয়; বেশী চালনার জন্যই অন্য ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

স্মৃতিশক্তি নিয়েও অনেক ভ্রান্ত ধারণা বহু কাল থেকেই চলিত আছে। দৃষ্টিহীনের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর হয় এ ধারণার প্রমাণ অনেক বিদ্বান অন্ধ ব্যক্তির জীবন থেকেই হয়ত মিলবে। কিন্তু কেন যে প্রখর হয়েছে সে কারণটা কেউই তলিয়ে দেখতে চান না। মানুষ বহুবিধ শক্তি নিয়েই পৃথিবীতে আসে—চালনা করলে শক্তিগুলো বিকশিত হয়ে ওঠে আর চালনা না করলে হয়ত বা নাশপ্রাপ্ত হয় এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। অন্ধ ব্যক্তিদের আপনাদের স্বাভাবিক অভাব পূরণের জন্য আপনা হতেই একটা চেষ্টা জন্মে সব বিষয় মনে করে রাখবার জন্য, কাজেই এ চেষ্টার ফলেই তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে।

চিন্তারাজ্যের জটিল ব্যাপারে দৃষ্টিহীনেরা দৃষ্টিমানদের কাছে আপাত খাপছাড়া বলে খানিকটা মনে হয়; দৃষ্টিহীনের পৃথিবী রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় নয়—তার পৃথিবীতে রূপের স্থান নেই—অবশ্য যারা কোনও কালে দেখতে পেত তারা এর মধ্যে পড়ছে না। অনেক সময় এর জন্য জন্মান্ধ ছেলেদের Concept গঠন করতে পরিশ্রম করতে হয়, সাধারণ মুখের কথায় সব সময় পরিষ্কার ধারণা জন্মান সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর রূপের বর্ণনা যার মধ্যে রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের স্থান নেই—জন্ম-দৃষ্টিহীনের মনে কোনও ছাপ রাখতে পারে না, কোনও ধারণাও জন্মাতে পারে না—কবির চির-আকাঙ্ক্ষিত জ্যোৎস্না রাত্রি উদাসী ভাবুকের তামসী রজনী জন্মান্ধদের মনে দিতে পারে না কোনও আনন্দ, কোনও তৃপ্তি। কিন্তু যদি সেখানে শুনতে পায় বিহগের কলসঙ্গীত, অনুভব করতে পায় রজনীর নিস্তব্ধতা, তখন সব জিনিষই তার মনে আবেগের সৃষ্টি করে,—অসীম আনন্দ অপার তৃপ্তি পায় সে সে-সব বর্ণনা থেকে। পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করে সে রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ দ্বারা। তাই সঙ্গীত তার কাছে এত প্রিয়, এত মধুর।

এখন সৌন্দর্যোপলব্ধির কথা বাদ দিয়ে অন্য দিক ধরা যাক্। দৃষ্টিহীনেরা অনেক সময় হয়ে পড়ে কেমন যেন সমাজে বেমানান—সমাজের সমস্যাস্বরূপ। কিন্তু এমন যে হয় তার কারণ কি? সাধারণত দৃষ্টিহীনদের কোনও শিক্ষালাভ হয় না, আর তার জন্য নিজেরা উপার্জনক্ষম হতে পারে না। তারা সমাজের কাছে অনাবশ্যক এবং অপরের কাছে বোঝা-স্বরূপ। ভিক্ষাবৃত্তি নয় ত আত্মীয়স্বজনের দয়ার উপর তাদের নির্ভর। এই ত বলতে গেলে দৃষ্টিহীনদের প্রকৃত রূপ। সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তাদের ভাগ্যে ঘটে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে সাধারণ স্বাভাবিক জীবনেরই দরকার পড়ে। কোনও চক্ষুষ্মান লোকদেরও যদি ঠিক এমনই অবস্থায় ফেলা যায় তবে তারাও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আপনাদের মানিয়ে নিতে পারে না। কাজেই দৃষ্টিহীনের এই অবস্থার জন্য দায়ী তার দৃষ্টির অভাব নয়, দায়ী হচ্ছে তাদের শিক্ষার অভাব, তাদের পরনির্ভরতা অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে তাদের প্রতি সমাজের ঔদাসীন্য। আজ যদি সমাজ তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলে তাহলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে দৃষ্টিহীনের বেমানানও আর কিছুই থাকবে না। বহু অন্ধ ব্যক্তি শিক্ষা পেয়ে নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়িয়েছে, তাদের পক্ষে সমাজে বেমানান হবার কোনও কথাই উঠছে না। দৃষ্টিমান লোকেদের মত সহজ স্বাভাবিক জীবনই তারা কাটাচ্ছে, দৃষ্টির অভাবের জন্য কোনও বিশেষ দুঃখ তাদের মনকে পীড়িত করছে না, দৃষ্টিহীনতা তাদের কাছে এক অসুবিধা-বিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়; অত্যন্ত স্বাভাবিক তাদের জীবন। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে তারা সংসারজীবন যাপন করছে, দৃষ্টিমানদের চেয়ে কোন দিকেই অস্বাভাবিক তাদের জীবন নয়।

কিন্তু অস্বাভাবিক জীবনযাত্রাই এ দেশের দৃষ্টিহীনদের জীবনকে অসামঞ্জস্যময় করে তুলেছে; মানুষ যখন দেখতে পায় অন্যের জীবন এক রকমের আর তার জীবন অন্য রকমের তখন তার ভিতরটা স্বভাবতঃই পীড়িত হয়ে পড়ে। চক্ষুহীন ব্যক্তি বুঝতে পারছে তার চক্ষুষ্মান ভাইবোনেরা বিয়ে করে কাজ করে জীবন কাটাচ্ছে আর তাকে থাকতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক কৌমার্য নিয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে। বস্তুত এই বাধ্যতামূলক কৌমার্য অনেক

সময়ই তাদের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় যৌনাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। এই প্রভেদই চক্ষুষ্মানদের চেয়ে চক্ষুহীনদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। এই প্রভেদকেই সময় সময় বড় করে দেখে সাধারণ লোকেরা মনে করে এই বুঝি চক্ষুহীনের নিজস্ব বিশেষ মনোবৃত্তি। আবার অনেক সময় তারা মনে করে থাকে প্রধান ইন্দ্রিয়ই যখন নেই তখন তার মধ্যে বোধ হয় যৌনবৃত্তিও নেই—ওগুলোও যেন চোখের সঙ্গে সঙ্গেই মিইয়ে গেছে। বস্তুত ঘটছে ত বিপরীত ঘটনা। চোখ না থাকায় অন্য sex-এর লোকদের দেখে যৌনবৃত্তির যে তৃপ্তি আসার সম্ভাবনা ছিল তার থেকেও তারা বঞ্চিত। কাজেই রুদ্ধ পীড়িত বৃত্তিগুলো বাধা পাওয়ায় প্রবল হয়েই উঠতে চায়।

মানুষের মনের বৃত্তিগুলি সাধারণতঃ গঠিত হয় বাইরের ছোঁয়াচে এসে—সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে ক্রমেই অন্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে ; instinct-এর থেকে ক্রমেই sentiment জন্মে থাকে। দৃষ্টিহীনের মনোবৃত্তির যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় তাও হচ্ছে ঠিক এই ব্যাপারের জন্যই। স্বাভাবিক পূর্ণাবয়ব মানুষের মত তারও ইচ্ছা হয় চলতে ফিরতে কাজ-কর্ম্ম করতে কিন্তু বহির্জগৎ সব সময় তাকে সে ইচ্ছা পূরণ করতে দেয় না, তখনই তার মনের সহজবৃত্তিগুলো আকৃতি নেয় অন্য রূপের, আর এর জন্যেই সাধারণ মানুষেরা ভুল করে বলে দৃষ্টিহীনের মনোবৃত্তি। দৃষ্টিহীনের জীবন একরূপ অলস জীবন—কোনও কাজ নেই, কেবল নিজের অন্ধত্ব নিয়ে চিন্তা করা—এই অলসতাই দৃষ্টিহীনের জীবনকে বিষময় করে তোলে। দৃষ্টিহীনের মনোবিজ্ঞানকে যদি কোনও আখ্যা দেওয়া যায় তবে তা হচ্ছে—Frustration Psychology—আর কিছু নয়।

অনেক সময় দেখা যায় দৃষ্টিহীনেরা চলতে চলতে বিশেষ কিছু একটা পদার্থ সামনে পড়লে থমকে দাঁড়ায় এখানে চক্ষুষ্মানরা অবাক হয়ে যায়। আসলে মানুষের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাইরেও একটা অনুভূতি আছে যাকে বলা চলে ষষ্ঠেন্দ্রিয়। এরই জন্যে নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তি তার পেছনে কেউ দাঁড়ালে চমকে ওঠে, ঠিক এই অনুভূতিই দৃষ্টিহীনকে সামনের পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দেয়। আর এ অনুভূতিকে ক্রমশ চালনা দ্বারা প্রবল করে তুলতে পারলে দৃষ্টিহীন লোকেরা সব সময়েই চলাফেরা ও অন্যান্য কাজ করতে পারে—দৃষ্টিহীনতার জন্য অসুবিধা অনেকাংশেই তাহলে তাদের কমে যায়।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'অন্ধের মনস্তত্ত্ব' বলে মনস্তত্ত্বের বিশেষ কোনো প্রকার-ভেদ নেই। অন্ধত্বের জন্য পারিপার্শ্বিকতা যে ভিন্ন এক আকৃতি নেয় তারই জন্যে দৃষ্টিহীনদের মনোবৃত্তিগুলো মাঝে মাঝে অন্য ধারায় চলে যায়। দৃষ্টিহীনদের মনোবৃত্তির রূপান্তরকে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ বিভাগে না ফেলে তাকে ব্যক্তিগত বিভেদের (individual difference) মধ্যে নেওয়াই সঙ্গত। কোনও দু'জন মানুষের মনই এক হতে পারে না। ব্যক্তিগত বিভেদ সকলের মধ্যেই বিদ্যমান—প্রত্যেকের মনোবৃত্তিই ব্যক্তিগত বিভেদের রঙে রঞ্জিত ; বেঁটে লোকের মনোবৃত্তি আর দীর্ঘাকৃতি লোকের মনোবৃত্তি, প্রথমজাত সন্তান আর শেষজাত সন্তান এদের মধ্যেও বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসুরা অনেক প্রভেদ দেখতে পান। এ যে প্রভেদ এমনি প্রভেদই চক্ষুহীন আর চক্ষুষ্মানের মধ্যে বর্তমান।

রাতে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দেখিয়াছ জ্যোৎস্না-রাতে নীল ঢেউ সমুদ্র-শিয়রে ?—
তাদের দু'আঁখি ভরি' কাঁপে কত চাঁদের স্বপন,
নৈশ-বিহঙ্গমগুলি নামে আসি' লঘু ডানা ভরে
উদ্বেল উদধি বুকে—ছায়াছবি নীলাভ্র গগন ?
দেখ' নাই—নৃত্যমত্ত নগ্নদেহা স্বর্গ-পরীদের ?
পৃথিবী ঘুমায়ে গেলে নামে যারা শুভ্র জ্যোৎস্না-রাতে,
মিতালি পাতালো যারা সিন্ধু সনে সহস্র ঢেউয়ের,—
তাদের দেখিতে গেলে চুপি-চুপি এস মোর সাথে।

নীরবে ছায়ার মত চ'লে এস অতিলঘু পায়ে,
দেখো যেন কথা ক'য়ে ভাঙিও না নৃত্য অপ্সরীর,
ভেঙ' না পাপ্ড়ি-ঝরা ফুলগুলি চরণের ঘায়ে,
তাহ'লে মিলায়ে যাবে পরীদের হাওয়ার শরীর,
জান তো পড়ে না ছায়া উহাদের মৃত্তিকার গায়ে,
থেমো নাকো, কে জানে হারাতে পারে মুহূর্ত্ত মদির।

মেঘলা সকাল

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দুই তীরে পাহাড়-প্রাচীর
মাঝে বহে সমুদ্রের খাল,
ব'সে আছি পা ডুবায়ে জলে,
ছায়াময় মেঘলা সকাল।

দূরে সিন্ধু সুনীল ফেনিল
আত্মহারা তরঙ্গ অধীর,
হেথা নীর মৃদু আন্দোলিত
যেন কোন্ শীর্ণা তটিনীর।

রহি এই গিরিচ্ছায়াতলে,
ঝিরিঝিরি বহুক সময়,
হোথা মন্দ্রে অশান্ত কল্লোল,
ক্ষুব্ধ সে সাগরে করি ভয়।

কাল-বিভাগের ধারা

ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

বিজ্ঞানে ও দর্শনে কালের ধারণার প্রতিষ্ঠা হইবার বহু পূর্ব্বে ব্যবহারিক জগতে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার জন্য কালের পরিমাপ একান্ত প্রয়োজনীয় হইল। প্রাচীন সকল জাতির মঠ-বিহারাদি ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে পূজাপার্ব্বণের সময় নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা কোন বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাচীন সকল জাতির মধ্যেই এই ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল। যেহেতু অধিকাংশ ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলেই ছিল সূর্য্যোপাসনা অথবা সূর্য্যের বিশেষ অবস্থানুযায়ী পূজার ব্যবস্থা, সেই কারণে সূর্য্যের গতি-সংক্রান্ত কালের নির্দ্দেশবিধি হিন্দু, গ্রীক, মিশরীয়, চীন, ব্যাবিলন, হিব্রু, পারস্যদেশীয় ও প্রাচীন রোমক প্রভৃতি সকলেরই ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়াছিল। সকল জাতির মধ্যেই কালের মূলবিভাগগুলি অর্থাৎ দিন, মাস ও বৎসর একই ছিল, প্রধানতঃ পার্থক্য দাঁড়াইল কত দিনে মাস হইবে অথবা কত দিনে বৎসর হইবে এই লইয়া। আরও মতভেদ ছিল দিনের উপবিভাগ সম্বন্ধে, দিনের আরম্ভ হইবে কখন, মধ্যরাত্র, সূর্য্যোদয় না মধ্যদিন (অর্থাৎ সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিকে আরোহণ) হইতে, বৎসরে কয়টি মাস হইবে এবং এক মাসে কয় দিন এই সমস্ত সম্বন্ধে। কখন বর্ষ আরম্ভ হইবে এবং মাস ও ঋতুর কিরূপ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হইবে এই লইয়া সকল প্রাচীন জাতিরই একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল।

স্বভাবতই চন্দ্র ও সূর্য্যের আবর্ত্তন কাল-পরিমাপের একটা মানদণ্ড-রূপে নির্দ্ধারিত হইল। প্রাচীন যুগের লোকেরা চন্দ্র ও সূর্য্যের দৈনন্দিন আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিকেই তাহারা সময়ের পরিমাপ করিবার উপযুক্ত নির্দ্ধারক বলিয়া ধরিয়া লইল। প্রাচীন জাতিগুলির প্রাথমিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় বিশিষ্ট কাল ও ঋতুবিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণ ঠিক ঠিক সময়ে সম্পন্ন করিবার জন্য একটা পঞ্জিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। অবশ্য, প্রাচীন যুগে এইরূপ পঞ্জিকা প্রথমে অসম্পূর্ণ ধরণের হইবারই কথা, কিন্তু পরে ইহার নানাবিধ সংস্কার ও সংশোধন হইয়াছিল। সকল সময়েই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে উহার উপযোগিতার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছিল।

প্রাচীন হিন্দুরা প্রধানতঃ যাগযজ্ঞ সম্পাদনের জন্যই পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেন, এবং বিভিন্ন যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের উপরই এই পঞ্জিকার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিত। যখন এই যজ্ঞগুলি ধারাবাহিকভাবে শেষ হইত, তখনই দেখা যাইত বৎসরও শেষ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বৈদিক যুগে বৎসর ও যজ্ঞ একার্থ-বোধক শব্দে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বে রচিত ঋগ্‌বেদের যজ্ঞ সম্বন্ধীয় ঋক্ হইতে অনুমান করা যায় যে যজ্ঞানুষ্ঠানের একটা ক্রমবিকাশ হইয়াছিল এবং কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি নির্ভুলভাবে বিধিবদ্ধ হইতেই পারে না, যদি মাস, ঋতু ও বৎসরের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকে। সুতরাং ইহা বলা অন্যায় হইবে না যে, বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানকে নিয়মিত করিবার জন্য কোনও একপ্রকার পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। এই পঞ্জিকা কি প্রকারের ছিল বা কতটা উন্নত ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন, তবে বৈদিক যজ্ঞ-সাহিত্যের আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেই প্রাচীন কালে চন্দ্রের বিভিন্ন কলা, ঋতুর পরিবর্ত্তন ও সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সময়ের পরিমাপ করিবার প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দুদিগের পঞ্জিকা নিয়মিত করিতে মাঝে মাঝে যে বাধা উপস্থিত হইত, তাহাতেই উহার গণনা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইত। কোন সময়ে চন্দ্রের গতিকে ভিত্তি করিয়া গণনার কার্য্য চলিত এবং চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া চান্দ্রমাস গঠিত হইত। প্রাচীন হিন্দুরা দেখিলেন যে এক রাত্রিতে চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হয় এবং আর এক রাত্রিতে সম্পূর্ণ ও গোলাকার হইয়া থাকে; তাঁহারা চন্দ্রের এই দুই অবস্থাকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা আখ্যা দিলেন, তাঁহারা আরও দেখিলেন যে এক অমাবস্যা হইতে আর এক অমাবস্যা পর্য্যন্ত অথবা এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রিশ বার সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। ইহার পরে কালক্রমে মাস-গণনার পরিবর্ত্তন হইল। সূর্য্যের গতিকে ভিত্তি করিয়া সৌরমাস গঠিত হইল। রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির এক রাশিতে অবস্থান করিতে সূর্য্যের যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাকে এক সৌরমাস বলা হইল। তারপর আবার কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিল, চন্দ্রের গতির ভিত্তিতে ও সূর্য্যের গতির ভিত্তিতে গণনার দুই ভিন্ন পদ্ধতিকে সামঞ্জস্যে আনিবার চেষ্টা হইল, ইহাতে দুই প্রকার মাসের অর্থাৎ চান্দ্র-মাস ও সৌরমাসের মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রহিল। সৌরমাস সৌর দিনে এবং চান্দ্রমাস তিথি বা চান্দ্রদিনে গণ্য হইল। এই চান্দ্র দিন সূর্য্য ও চন্দ্রের দুইটি যুতির (conjunction) মধ্যকালীন সময়ের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ বলিয়া ধরা হইল। ইহার ফলে চান্দ্র-সৌর (luni-solar) বৎসরের গঠন হইল; দিন হয় সৌর না হয় চান্দ্র, দুই প্রকারই রহিল। হিন্দুরা পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আরও লক্ষ্য করিলেন যে কোন এক দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নক্ষত্র উদিত বা অস্তমিত দেখা যায়, কিছু দিন পরে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। ইহাতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে সূর্য্যের ও চন্দ্রের ন্যায় ব্যোমপথে নক্ষত্রদিগের মধ্যে একটা গতি আছে এবং গতিপথে একবার পরিক্রমণ করিতে বার মাস অতিবাহিত হয় অর্থাৎ যে নক্ষত্র এক দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে উঠিতে দেখা যায়, তাহাকে আবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে উঠিতে বার মাস পরে দেখা যাইবে। এই গণনানুসারে এক বৎসর অর্থাৎ সূর্য্যের এক বার পরিক্রমণের সময় তাঁহারা বার মাস ধরিলেন। দিনের আরম্ভ লইয়া হিন্দুরা বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বেদ ও পুরাণের সময়ে তাঁহারা সূর্য্যোদয় হইতেই দিনের আরম্ভ ধরিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এ সম্বন্ধে নানা মতের আবির্ভাব হইয়াছিল। আর্য্যভট দিনের আরম্ভ ধরিয়াছিলেন লঙ্কায় সূর্য্যোদয় হইতে, বরাহ-মিহির ধরিয়াছিলেন মধ্যরাত্র হইতে। এই রকমে চার প্রকারের দিনের আরম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়, সূর্য্যোদয়, মধ্যরাত্র,

মধ্যদিন বা সূর্য্যাস্ত হইতে; কিন্তু সূর্য্যোদয় হইতে দিনের আরম্ভই হিন্দুদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত। সময়ের পরিমাপ করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে সূর্য্যঘড়ীর আবিষ্কার হইয়াছিল, ইহাতে বারোটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশিত ছিল, উহাতে সূর্য্যের ছায়া মাপিয়া সময়ের নির্দ্ধারণ হইত। সম্ভবতঃ সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃক্ষের ছায়ার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে সূর্য্যঘড়ীর কল্পনা জাগিয়া থাকিবে। কিন্তু সূর্য্যঘড়ী দিনের বেলায় বা সূর্য্য দেখা গেলে সময়ের পরিমাপ করিতে সমর্থ হইলেও সূর্য্যাস্তের পরে বা সূর্য্য না দেখা গেলে সূর্য্যঘড়ীর উপযোগিতা ছিল না। এই জন্যই সময়ের পরিমাপ করিতে জলঘড়ীর আবিষ্কার হইল; একটি জলপাত্রে একটি ধাতুনির্ম্মিত বাটি ভাসাইয়া দেওয়া হইত এবং উহাতে যে জল রাখা হইত তাহা তলার একটি ফুটা দিয়া এক নাড়িকা বা ২৪ মিনিটে বাহির হইয়া যাইত। ইহার ব্যবহারে হিন্দুরা এমনই পারদর্শী হইয়াছিলেন যে এই জলঘড়ী দেখিয়াই তাঁহারা বলিতে পারিতেন সূর্য্যোদয় হইতে কত সময় অতিবাহিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আর একটি যন্ত্র তাঁহারা বাহির করিয়াছিলেন, উহাকে যষ্টি আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, উহাতে সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিকে অবস্থান অর্থাৎ মধ্যদিন হইতে সময়ের পরিমাণ পাওয়া যাইত।

ক্যাল্ডীয়ানরা বৎসরের পরিমাপ খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১১ মিনিটে এক সৌর বর্ষ, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাঁহারা চান্দ্রমাস ও সৌরবৎসর দুইই ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা দিন ও রাত্রি উভয়কেই বার ভাগে ভাগ করিলেন এবং সূর্য্যঘড়ী ও জলঘড়ীর সাহায্যে সময়ের পরিমাপ করিতেন। তাঁহারা দিনের বেলায় সূর্য্যঘড়ী এবং রাত্রিকালে জলঘড়ী ব্যবহার করিতেন। জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজনে তাঁহারা এক দিনকে বার সমান ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক ঘণ্টা ধরিলেন। তাঁহারাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে এক মাসকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া সময়ের বিভাগের আর এক পর্য্যায়ে নামিলেন। প্রাচীন যুগে চান্দ্রমাস ব্যবহারের সময়ে অর্দ্ধ মাস নিশ্চয়ই জানা ছিল, কারণ এক অমাবস্যা হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণিমার ব্যবধান ছিল অর্দ্ধ মাস, এবং উহারই অর্দ্ধেক লইয়া সপ্তাহের বিভাগের সূচনা হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২০০০ বৎসরের আগেও চীনদেশীয়েরা পঞ্জিকা গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহাদের পদ্ধতি প্রত্যেক সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইত। সম্রাট্ য়ান (Yan, c.2357 B. C-c 2258 B.C)এর সময়ে সমস্ত দেশে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকা প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ইহারও পূর্ব্বে সম্রাট্ হুয়াঙ্গটির (Huang-ti, c.2700 B.C.) সময় হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকিবে। প্রমাণ আছে যে সম্রাট্ ওয়াং ওয়াংগ (Wan Wang, 1122 B.C.) এর এক নির্দ্দেশে দিনের আরম্ভ মধ্যরাত্র হইতে ধরা হইল, অথচ ইহার পূর্ব্বে সাংগ বংশের (১৭৬৬-১১২২ খ্রীঃ পূঃ) সময়ে মধ্যদিন হইতে দিনের আরম্ভ ধরা হইত। বর্ত্তমান চীনা পঞ্জিকায় এক সৌর দিনকে বার ঘণ্টায় ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রথম ঘণ্টার অর্দ্ধ ভাগ হইতে মধ্যরাত্রির আরম্ভ ধরা হয়। চীনা ভাষায় চীনা ঘণ্টাকে সি (Shi) বলা হইয়া থাকে, এক সি ইংরেজী ১২০ মিনিটের সমান। এক সি আট ভাগে বিভক্ত, উহাকে খে (khe) বলা হয়, এক খে ইংরেজী এক ঘণ্টার এক-চতুর্থ অংশ অর্থাৎ ১৫ মিনিটের সমান। এক খে আবার ১৫ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় ফেন্ (fen), তাহা হইলে এক ফেন্ ইংরেজী এক মিনিটের সমান; এক ফেন্‌কে আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় মিয়াও (Miao), এক মিয়াও এক সেকেণ্ডের সমান। বর্ত্তমান সময়ে চীন দেশে আমেরিকার ঘটিকাযন্ত্রের বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে। চীন দেশেও সাত দিনের একটা কাল বিভাগ ধরা হইয়াছিল এবং মাস চান্দ্র তিথিতে বিভক্ত হইয়া অমাবস্যা হইতে পরিগণিত হইত।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিশরবাসীরা একটা স্থির বর্ষের উপযোগিতা বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের জনসাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে একটা পরিবর্ত্তনশীল বৎসর এমন ভাবে জড়িত ছিল, যে, তাঁহারা ইহাও একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। ঋতু বিভাগের সময়ে স্থির বর্ষই ধরা হইত এবং নদীর অবস্থানুসারে এক বর্ষে তিনটি ঋতু ধরা হইত, যেমন বারি ঋতু, উত্থান ঋতু ও ফল ঋতু, প্রথমটি ২১শে জুন হইতে ২০শে অক্টোবর, দ্বিতীয়টি ২১শে অক্টোবর হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী এবং তৃতীয়টি ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২০শে জুন পর্য্যন্ত। এইগুলি মন্দিরের যাজকসম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইত। তাঁহারা অভ্যাসের দ্বারা সহজেই ইহার নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন এবং তাঁহারাই দেশের প্রধান পঞ্জিকাকার ছিলেন। মন্দির হইতে নীল নদের জলের বৃদ্ধি ও হ্রাসের ঘোষণা হইত, মন্দিরে যাজকসম্প্রদায়ের পর্য্যবেক্ষণে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস মাপিবার যন্ত্র থাকিত। প্রাচীন মিশর দেশে ব্যবহারিক প্রয়োজনে রাত্রি দিনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পৃথক্ দিন ও রাত্রি প্রত্যেকটি বার ঘণ্টায় বিভক্ত হইত; কিন্তু এই ঘণ্টার মাপ ঋতুর তারতম্যের সহিত পরিবর্ত্তিত হইত। প্রাচীন মিশরে দিবসের আরম্ভ হইত সূর্য্যাস্ত হইতে। কিন্তু ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) বলেন যাজকসম্প্রদায় মধ্যরাত্র হইতে দিবসের আরম্ভ ধরিতেন। পরবর্ত্তী কালে দিনের আরম্ভ হইত মধ্যদিন হইতে এবং দিনকে চব্বিশ সমান ঘণ্টায় ভাগ করা হইত। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টলেমিও (Ptolemy) ইহাই করিয়াছিলেন। মিশর দেশের জাতীয় পঞ্জিকায় শেষের মাস ছাড়া প্রত্যেক মাসে ত্রিশ দিন, শেষের মাসে (Mesori) পাঁচ দিন বেশী ধরা হইত এবং ইহাতে এক বৎসরে সর্ব্বসমেত ৩৬৫ দিন হইত। এই গণনায় এক-চতুর্থ দিবসের ভুল থাকিয়া যাইত। সুতরাং বর্ষ স্থির না হইয়া পরিবর্ত্তনশীল হইতে বাধ্য হইত এবং জ্যোতিষ্কদিগের অবস্থানের তুলনায় বর্ষারম্ভ প্রথম অবস্থায় আসিতে ৪×৩৬৫ বা ১৪৬০ (১৪৬১ মিশর দেশীয়) বৎসর লইত। মিশরে বর্ষারম্ভ হইত থথ্ (Thoth) মাসের প্রথম দিন হইতে, এই থথ্ ছিলেন মিশরের এক প্রসিদ্ধ দেবতা। তিনিই পঞ্জিকা ও সংখ্যা মিশরে আনিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। ইহার পরে মিশর যখন রোম সাম্রাজ্যের অধীন হইল খ্রীষ্ট পূর্ব্ব প্রথম অর্দ্ধশতাব্দীতে, তখন আলেকজান্ড্রিয়ার পঞ্জিকার সহিত উহার স্থির বর্ষও মিশরে

আসিল, কিন্তু জনসাধারণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহাদের পরিবর্ত্তনশীল বর্ষই ব্যবহার করিত। আলেকজান্দ্রিয়ার পঞ্জিকা মিশরে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময়ে মিশর আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। সুতরাং পঞ্জিকারও পরিবর্ত্তন দেখা দিল, কেবল উত্তর-মিশরে প্রাচীন পঞ্জিকা চলিতে লাগিল। পরে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফরাসীরা অল্প সময়ের জন্য মিশর জয় করিয়াছিল, তখন মিশরে য়ুরোপীয় পঞ্জিকা মুসলমান পঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হইল।

প্রাচীন এথেন্সবাসীরা মিশরীয়দিগের অনুসরণে সূর্য্যাস্ত হইতে নূতন দিনের আরম্ভ ধরিতেন এবং দিন ও রাত্রি উভয়কেই বার ঘণ্টায় বিভক্ত করিলেন। তখনও তাঁহারা সাত দিনে সপ্তাহ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা চান্দ্রমাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রথম ভাগ দশ দিনে বিভক্ত হইল এবং এই দিনগুলিকে তাঁহারা ক্রমিক সংখ্যা দিলেন, যেমন প্রথম ভাগের পঞ্চম দিনকে তাঁহারা পঞ্চমী আখ্যা দিলেন। তাঁহারা দ্বিতীয় ভাগকেও দশ দিনে বিভক্ত করিলেন এবং পূর্ব্বের মতই ক্রমিক সংখ্যা দিলেন, পার্থক্যের মধ্যে তাঁহারা এই দিনগুলিকে একোত্তর দশ বা একাদশ, দ্বাদশ প্রভৃতি বিংশতি পর্য্যন্ত নাম দিলেন। মাসের শেষের ভাগও দশ দিনে বিভক্ত হইল এবং উহাদের নাম হইল একবিংশতি, দ্বাবিংশতি হইতে ত্রিংশৎ পর্য্যন্ত। কখনও কখনও এই গণনা প্রথম হইতে না হইয়া মাসের শেষ হইতে ধরা হইত। এক অমাবস্যা হইতে পরের অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক চান্দ্রমাস ধরা হইত, এবং এইরূপ বার মাসে এক বৎসর। সুতরাং এক বৎসরে হইল ৩৫৪ সৌর দিন। ইহাতে সৌর বর্ষের হিসাবে প্রায় ১১ দিন কম পড়িল এবং তিন বৎসর অন্তর এক মাস বেশী করিয়া এক বৎসরে ধরিতে হইত। ইহাকে এথেন্সবাসীরা বলিতেন পসিডনের দ্বিতীয় মাস (second month of Poseidon)। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৪৩২ সালে মেটন (Meton) উনবিংশতি বৎসরের একটা কালচক্র স্থির করিলেন এবং ইহাতে তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ, ষোড়শ ও উনবিংশতি বৎসরে একটি অধিক মাস যোগ করিয়া দিলেন। তাহা হইলে ১৯ বৎসরে হইল (১৯×১২+৭) ২৩৫ মাস এবং ৬৯৩৯$\frac{৩}{৪}$ দিন। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে এমন ভাবে দিনের সংখ্যা লওয়া হইত যাহাতে ১৯ বৎসরে ৬৯৪০$\frac{১}{৩}$ দিন পাওয়া যাইত। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩২৫ সালে ক্যালিপাস (Callipus) চার গুণ উনিশ লইয়া ৭৬ বৎসর বা ৯৪০ মাস লইয়া একটা কালচক্র স্থির করিলেন; তিনি ২৯ ও ৩০ দিনে মাস ধরিয়া ৯৪০ মাসে ২৭৭৫৯ দিন নির্দ্ধারিত করিলেন। ইহার পরে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৫০ সালে হিপার্কাস (Hipparchus) ১৬ গুণ উনিশ লইয়া ৩০৪ বৎসর লইয়া একটা কালচক্র স্থির করেন। কিন্তু শেষোক্ত দুইটি কাল বিভাগ কখনও জনসাধারণের ব্যবহারে আসে নাই।

রোমবাসীরা সাত দিনে এক সপ্তাহ ধরিলেন এবং গ্রহগুলিকে নিম্ন পর্য্যায় ক্রমে প্রতি দিনের এক একটি ঘণ্টার অধিপতি স্থির করিলেন—শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ ও সোম। তখন রবি ও সোম গ্রহ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই পর্য্যায় তাঁহারা আরম্ভ করিলেন শনিবারের প্রথম ঘণ্টা হইতে, তাহা হইলে শনিবারের দ্বিতীয় ঘণ্টার অধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় ঘণ্টার অধিপতি মঙ্গল, চতুর্থ ঘণ্টার অধিপতি রবি; এইরূপে চতুর্বিংশতিতম ঘণ্টার অধিপতি মঙ্গল। দ্বিতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে রবি, তৃতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে সোম, চতুর্থ দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে মঙ্গল, পঞ্চম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে বুধ, ষষ্ঠ দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে বৃহস্পতি এবং সপ্তম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি হইবে শুক্র। এই প্রকারে রোমবাসীদের সপ্তাহের সাত দিনের নাম, সাত দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি গ্রহের নাম হইতে উৎপন্ন হইল। তাহা হইলে প্রথম দিন হইল শনিবার (Saturn's Day), দ্বিতীয় দিন রবিবার (Sun's Day), তৃতীয় দিন সোমবার (Moon's Day), চতুর্থ দিন মঙ্গলবার (Mar's Day, ফরাসী Merdi—মার্ডি), পঞ্চম দিন বুধবার (Mercury's Day, ফরাসী Mercedi—মার্কেডি), ষষ্ঠ দিন বৃহস্পতিবার (Jupiter's Day, উত্তর ভূভাগে Thor's Day), এবং সপ্তম দিন শুক্রবার (Venus' Day, Frigg's Day, Frigg ছিল বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী)। কথিত আছে যে রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস (Romulus) রোমের প্রাচীনতম পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক। ইহাতে এক বৎসরে দশ মাস ধরা হইত। প্রত্যেক মাসের দিনের সংখ্যা সমান ছিল না, এবং এক বৎসরে দিনের সংখ্যা ছিল ৩০৪। তখন মার্চ্চ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইত। পরে নুমা পম্পিলিয়াস (Numa Pompilius, ৭১৫—৬৭২ খ্রীষ্টপূর্ব্ব) আরও দুই মাস যোগ করিয়া দিলেন, উহাদের নাম দিলেন জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এবং বৎসরকে চান্দ্র বৎসর ধরিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ডিসেমভিরের (Decemvirs) নির্দ্দেশ ক্রমে সৌর বৎসর স্থির হইল, অবশ্য ইহার ব্যবস্থার ভার পড়িল যাজক-সম্প্রদায়ের উপর। কিন্তু এই পঞ্জিকার ব্যবস্থায় এমন বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল যে জুলিয়াস সিজারের (Julius Caesor) সময়ে বৎসরের প্রত্যেক দিন জ্যোতিষিক অবস্থানের তুলনায় আশী দিন পিছাইয়া পড়িল। সুতরাং পঞ্জিকা-সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। তখন জুলিয়াস সিজার নির্দ্দেশ দিলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৬ সালে এক বৎসরে ৪৪৫ দিন ধরিতে হইবে এবং পরে প্রত্যেক বৎসরে ৩৬৫ দিন, আর প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে ৩৬৬ দিন। কিন্তু ইহাতেও কতকটা গোল রহিয়া গেল, কারণ ব্যবহারিক বৎসরে ঠিক ৩৬৫ দিন ধরা হইল, অথচ সৌর বৎসর অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তে সূর্য্যের এক বার পরিক্রমণের সময় প্রায় ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন, অর্থাৎ বিষুববিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই বিষুববিন্দুতে আসিতে সূর্য্যের ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫.৫ সেকেণ্ড লাগে। ইহাই হইল আসল সৌর বৎসর। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে বৎসরকে ৩৬৫ দিনের ধরিলে জ্যোতিষিক সৌর বৎসর হইতে ৫ ঘণ্টা ৪৮মিনিট ৪৫.৫ সেকেণ্ড কম ধরা হইল, এই ভুল চারি বৎসরে ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেণ্ড বা প্রায় এক দিনে পরিণত হইবে। এই ভুলের সংশোধন না হইলে প্রত্যেক চারি বৎসরে ক্রান্তিপাতের সময় এক দিন পিছাইয়া যাইবে। এই দুই প্রকার বৎসরের সংশোধন

করিবার চেষ্টা জুলিয়াস সিজারই প্রথম করিলেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরে এক দিন বেশী অর্থাৎ ৩৬৬ দিন ধরা হইল। সিজার নিম্নলিখিত প্রণালীতে বৎসরে মাসের ক্রম ও দিনের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিলেন :

	মাসের নাম	দিনের সংখ্যা
১।	মার্সিয়াস (Martius)	৩১
২।	এপ্রিলিস্ (Aprilis)	৩০
৩।	মেয়াস্ (Maius)	৩১
৪।	জুনিয়াস্ (Junius)	৩০
৫।	কুইন্‌টিলিস (Quintilis)	৩১
৬।	সেক্সটিলিস্ (Sextilis)	৩১
৭।	সেপ্টেম্ব্রিস (Septembris)	৩০
৮।	অক্টোব্রিস্ (Octobris)	৩১
৯।	নভেম্ব্রিস্ (Novembris)	৩০
১০।	ডিসেম্ব্রিস্ (Decembris)	৩১
১১।	জানুয়ারিয়াস্ (Januarius)	৩১
১২।	ফেব্রুয়ারিয়াস্ (Februarius)	২৮

ইহাতেই দেখা যায় যে পঞ্জিকার প্রথম বিধানে মার্চ্চ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইত। কারণ, মূল শব্দ হইতেও দেখা যায় যে, কুইন্‌টিলিস্ অর্থে পঞ্চম মাস, সেক্সটিলিস অর্থে ষষ্ঠ মাস, সেপ্টেম্বার অর্থে সপ্তম মাস, অক্টোবর অষ্টম মাস, নভেম্বর নবম মাস এবং ডিসেম্বর দশম মাস। জুলিয়াস সিজার তাঁহার প্রথম নির্দ্দেশে স্থির করিয়াছিলেন যে মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাসগুলির দিনসংখ্যা পর্য্যায়ক্রমে ৩১ ও ৩০ হইবে, কেবল ফেব্রুয়ারী মাসে ২৯ দিন থাকিবে এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাস ৩০ দিনের হইবে। পরে জুলিয়াস সিজার নির্দ্দেশ দিলেন যে বৎসর জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ হইবে। পরিশেষে তাঁহারই জীবদ্দশায় তিনি পঞ্চম মাস কুইন-টিলিস্‌কে নিজের নাম জুলিয়াস নামে পরিবর্ত্তিত করিলেন, তিনি নিজে ঐ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও কয়েকটি মাসের দিনসংখ্যার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলে বর্ত্তমান জুলিয়ান পঞ্জিকা। জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পঞ্জিকার দ্বিতীয় বর্ষেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিধানে চতুর্থ বর্ষের অর্থাৎ যে বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে এক দিন যোগ করিতে হইবে তাহার নির্দ্ধারণে গোল বাধিল। অগাষ্টাস সিজার তখন সম্রাট্, তিনি ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারই সম্মান প্রদর্শনার্থে সেক্সটিলিস (ষষ্ঠ মাস) অগাষ্টাস নামে পরিবর্ত্তিত হইল। সেই হইতে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অগাষ্টাস সিজার সংশোধিত জুলিয়ান পঞ্জিকাই য়ুরোপে চলিয়া আসিতেছিল। এই সময়ে পোপ ত্রয়োদশ গ্রীগরী পঞ্জিকার আর একটু সংস্কার করিলেন। জুলিয়াস সিজারের বিধানানুসারে প্রতি চতুর্থ বৎসরে এক দিন বেশী ধরা হইত। কিন্তু ব্যবহারিক এক দিন ২৪ ঘণ্টা আর সৌর দিন ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেণ্ড, অর্থাৎ ব্যবহারিক দিন সৌর এক দিন হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট বেশী। সুতরাং চতুর্থ বর্ষে ব্যবহারিক এক দিন যোগ করায় চার বৎসরে প্রায় ৪৫ মিনিটের ভুল হইল এবং এক বৎসরে প্রায় ১১ মিনিট বেশী হইল। ইহাতে চার শত বৎসরে ভুল প্রায় তিন দিনে দাঁড়াইবে। এই জন্যই পোপ গ্রীগরী নির্দ্দেশ দিলেন যে, প্রতি চারি শত বৎসরে তিনটি কম লীপ্ ইয়ার (Leap year) ধরিতে হইবে, অর্থাৎ ১০০, ২০০, ৩০০ বৎসরে এক দিন করিয়া যোগ দিতে হইবে না ; জুলিয়ান পঞ্জিকায় পোপ গ্রীগরীর সংশোধনানুসারে এক শতের দুই গুণ, তিন গুণ, পাঁচ গুণ, সাত গুণ প্রভৃতি বৎসর যাহা জুলিয়ান পঞ্জিকানুযায়ী লীপ ইয়ার হইত, সাধারণ বৎসর বলিয়াই পরিগণিত হইবে, কেবল যে সকল শতক চার দিয়া ভাগ দিলে ভাগ শেষ থাকিবে না অর্থাৎ ১৬০০, ২০০০, ২৪০০ প্রভৃতি লীপ ইয়ার হইবে। এই সংশোধনে চারি শত বৎসরে তিন দিন বাদ দেওয়া হইল। পোপ গ্রীগরীর সংশোধন সত্ত্বেও খুব সামান্য একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে, ইহা এত সামান্য যে ৩২০০ বৎসরে প্রায় এক দিন হইবে। ইংলণ্ডে ১৭৫২ সাল পর্য্যন্ত গ্রীগরীর সংশোধন গ্রহণ করা হয় নাই, ফলে সংশোধিত পঞ্জিকানুসারে ইংলণ্ডের পঞ্জিকায় মোট ১১ দিনের ভুল জমা হইয়া রহিল। সুতরাং ১৭৫২ সালে ১১ দিন ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং ২রা সেপ্টেম্বরকে ১৩ই সেপ্টেম্বর ধরা হইল। য়ুরোপের সর্ব্বত্র এই সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইয়া আসি-তেছে। কেবল গ্রীস দেশে ক্যাথলিক সম্প্রদায় এবং রাশিয়ার পুরোহিত সম্প্রদায় ১৯১৪-১৮ সাল পর্য্যন্ত জুলিয়ান পঞ্জিকা ব্যবহার করিতেছিল। তখন পশ্চিম য়ুরোপের সর্ব্বত্র সংশোধিত পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছিল এবং উহার তুলনায় রাশিয়ার পঞ্জিকায় তের দিনের পার্থক্য দেখা দিয়াছিল। এখন সর্ব্বত্র এই গ্রীগরী-সংশোধিত পঞ্জিকার প্রচলন হইয়াছে।

প্রাচীন পারসিকেরা সর্ব্বপ্রথমে সৌর বৎসর ব্যবহার করি-তেন, কিন্তু পরে চান্দ্র বৎসর ও হিজিরা পঞ্জিকা (Hejira) গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রই মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঋতুকালীন ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য সৌর বৎসরের হিসাব রাখা একান্ত প্রয়োজন। অথচ মুসলমান সম্রাটেরা চান্দ্র বৎসর ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, যেহেতু মোহম্মদ ইহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে একটা সামঞ্জস্য বিহিত হইল, ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রাচীন পারসিকদিগের সৌর বৎসর স্বীকৃত হইল এবং রাজ্যের অন্য সমস্ত কার্য্যের জন্য চান্দ্র বৎসরই প্রচলিত রহিল। প্রাচীন পারসিক পঞ্জিকাও ঋতুগুলি আর নির্ভুল ভাবে সূচিত করিতে পারিতেছিল না ; কারণ প্রতি চতুর্থ বর্ষে (Leap year) পারসিক বৎসরে যে এক দিন যোগ করা হইত তাহা প্রাচীন পারসিকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়াছিলেন, এখন মুসলমান সম্রাটেরা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত পারসিকদিগকে তাহাদের পুরাতন ধর্ম্ম ভুলাইবার জন্য সেই বেশী দিন যোগ করা আইনের নির্দ্দেশে বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে ঋতু নির্ণয়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। পারস্য দেশের বিখ্যাত সম্রাট্ মালিক শাহ একাদশ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষিক ওমর খৈয়া-মের (শ্রেষ্ঠ কবিও) উপর ইহার সামঞ্জস্য বিধানের ভার দিলেন। ইস্পাহান মানমন্দিরে পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা করিয়া ওমর তাঁহার সৌর বৎসর সংযুক্ত পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিলেন। ওমরের গণনায় যে সৌর বৎসর হইল উহাতে তিনি ৩৬৫ দিন ১৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট

ধরিলেন, ইহা বর্ত্তমান সময়ে স্বীকৃত সৌর বৎসর হইতে মাত্র ১১ সেকেণ্ড অধিক। ওমরের পূর্ব্বে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইত সেই দিন হইতে যেদিন সূর্য্য মীন রাশিতে প্রবেশ করিত, ওমর পূর্ব্বের ভুল গণনা সংশোধন করিয়া যেদিন সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে সেই দিনের মধ্যাহ্ন হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরিলেন। সেদিন বিষুব সংক্রান্তি, শুক্রবার ১৫ই মার্চ্চ ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দ, ইহাই হইল ওমরের পঞ্জিকার প্রথম দিন। বৎসরকে তিনি বার মাসে বিভক্ত করিয়া প্রথম এগারো মাসে ৩০ দিন আর দ্বাদশ মাসে ৩৫ দিন ধরিলেন, ইহাতে সাধারণ বৎসরে দিনের সংখ্যা হইল ৩৬৫; এবং প্রতি চতুর্থ বৎসরে তিনি দ্বাদশ মাসে ৩৬ দিন ধরিয়া সেই বৎসরে দিনের সংখ্যা ৩৬৬ পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পঞ্জিকায় বত্রিশ সংখ্যক বৎসর সাধারণ নিয়মে ৩৬৬ দিনের হইলেও উহাকে ৩৬৫ দিনেরই ধরা হইল এবং তেত্রিশ সংখ্যক বৎসরকে ৩৬৬ দিনেই গণ্য করা হইল। এই রূপে ওমর তেত্রিশ বৎসরের একটা কালচক্র ধরিলেন, উহাতে ২৫টি সাধারণ বৎসর ও ৮টি ৩৬৬ দিনের বৎসর। পারস্য জাতির পঞ্জিকাগুলির মধ্যে ওমরের সংশোধিত পঞ্জিকা সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ; ইহাতে ১০,০০০ বৎসরে ৩৬৫২৪২৪ সৌর দিন, অথচ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত গ্রীগরীর পত্রিকায় ১০,০০০ বৎসর ৩৬৫২৪২৫ সৌর দিবস, জ্যোতিষিক গণনায় ১০,০০০ সৌর বৎসরে বাস্তবিক হওয়া উচিত ৩৬৫·২৪২২ × ১০,০০০ অর্থাৎ ৩৬৫২৪২২ সৌর দিবস। সুতরাং বৈজ্ঞানিক হিসাবে বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে প্রচলিত পঞ্জিকা হইতে ওমরের পঞ্জিকা বিশুদ্ধতর, ইহাতে ১০,০০০ বৎসরে মাত্র দুই দিনের ভুল আর য়ুরোপীয় পঞ্জিকানুসারে তিন দিনের ভুল। এই পঞ্জিকা সেলজুক ও খৌয়ারিজ্‌মি (Seljuks and Khowarizmis) সম্রাট্‌গণের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরে তাতার সম্রাটেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়া হিজিরা পঞ্জিকারই পুনঃপ্রচলন করিলেন। ওমরের পঞ্জিকা এখনও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষে পারসিকদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকায় সাধারণতঃ পূর্ব্ব-য়ুরোপে এপ্রিল মাস হইতে এবং পশ্চিম-য়ুরোপে মার্চ্চ মাস হইতে বর্ষারম্ভ ধরা হইত। কখনও কখনও পোপদিগের খেয়াল অনুসারে খ্রীষ্টমাস দিবস বা ঈষ্টার দিবস অথবা অন্য কোন পার্ব্বণের দিন হইতে বৎসরের আরম্ভ প্রচলিত হইত। স্পেনদেশে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ১লা মার্চ্চ হইতে এবং জার্মান দেশে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ২৫শে মার্চ্চ হইতে বর্ষারম্ভের প্রথা ছিল, কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য খ্রীষ্টীয় পুরোহিতশ্রেণী সাধারণতঃ অ্যাডভেণ্ট (Advent) রবিবার অর্থাৎ খ্রীষ্টমাসের পূর্ব্বের চতুর্থ রবিবার হইতে বর্ষারম্ভ ধরিতেন। মধ্যযুগে ফরাসী দেশে ১লা মার্চ্চ বর্ষারম্ভ ধরা হইত; পূর্ব্ব খ্রীষ্টান ভূমি ও ভিনিসে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, কিন্তু পিসা ও ফ্লোরেণ্টাইন দেশের লোকেরা ২৫শে মার্চ্চ হইতে বৎসরের গণনা আরম্ভ করিত। ইতালি দেশে পোপ দ্বাদশ ইনোসেণ্ট (Innocent XII) নির্দ্দেশ দিলেন যে ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১লা জানুয়ারী হইতে বর্ষারম্ভ ধরিতে হইবে, দ্বিতীয় ফিলিপ্স ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ডে এইরূপ বর্ষারম্ভ প্রচলন করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে জুলিয়াস সিজারও এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইতালীয় দেশগুলির প্রায় সর্ব্বত্র ১লা জানুয়ারী বৎসরের আরম্ভের দিন বলিয়া গণ্য হইল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলণ্ড ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই বর্ষারম্ভ প্রথম গ্রহণ করিল।

হিন্দুদিগের পঞ্জিকায় বর্ষারম্ভ যে বহু বার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রাচীন বৈদিক যুগে সূর্য্য যখন বিষুববিন্দুতে অধিষ্ঠিত হইত তখন হইতে বর্ষারম্ভ হইত, তাহার পর অস্ত ক্রান্তিপাত হইতে বর্ষারম্ভ ধরা হইত। পঞ্জিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঋতুনির্ণয়, এইজন্য অয়নাংশের জন্য মেষ ক্রান্তির অপসরণে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) সময়ে তৃতীয় বার বর্ষারম্ভের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তখন ঋতুগুলি ১৪ দিন সরিয়া গিয়াছে; সুতরাং বর্ষারম্ভ পূর্ণিমা হইতে না ধরিয়া অমাবস্যা হইতে ধরা হইল। আর এক বার ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহ মিহিরের সময়ে বর্ষারম্ভের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

ইহুদীদিগের পঞ্জিকায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে দিনের আরম্ভ এবং শনিবারের রাত্রি হইতে সপ্তাহের আরম্ভ ধরা হইত। বর্ষারম্ভ গণনা করা হইত মীন-ক্রান্তিপাতের (২২শে সেপ্টেম্বরের) পরের অমাবস্যা হইতে। উহাদের পঞ্জিকা চান্দ্র দিন ও চান্দ্র মাস লইয়া গঠিত। প্রাচীন ময় সভ্যতার সময়ে বৎসর আরম্ভ হইত মকরক্রান্তি হইতে, বৎসরে ১৮ মাস ধরা হইত, এবং ইহাদের সহিত জ্যোতিষের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের ধারণা যে উহাদের পঞ্জিকা খ্রীষ্টপূর্ব চতুস্ত্রিংশৎ শতাব্দী হইতে প্রচলিত ছিল। মুসলমানদিগের হিজিরা পঞ্জিকায় সূর্য্যাস্ত হইতে দিনের আরম্ভ করা হইয়াছে, দিন ও রাত্রি উভয়কেই ১২ ঘণ্টায় বিভক্ত করা হইয়াছে, ঘণ্টার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঋতু পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করিত, সপ্তাহ আরম্ভ হইত রবিবার হইতে, মাস চান্দ্র ছিল এবং উহার আরম্ভ হইত অমাবস্যায়, বৎসর সম্পূর্ণ চান্দ্র ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে। সুতরাং চতুর্থ বৎসরে এক মাস যোগ করিতে হইত।

এইরূপে যখন বর্ষারম্ভ, মাস ও দিন সংখ্যার নির্ণয় হইল, তখন বৎসরের সংখ্যা ঠিক করিবার জন্য একটা অব্দ স্থির করা প্রয়োজন দেখা দিল। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শকাব্দই ব্যবহৃত হইল, এক বিখ্যাত শকসম্রাটের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে এই অব্দ ধরা হইল, উহা খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর কম। বাংলা দেশে বঙ্গাব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার আরম্ভ ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। য়ুরোপে রোমক ব্যবস্থা মানিয়া প্রথম যুগে সম্রাটের রাজত্ব আরম্ভের সময় হইতে বৎসরের সংখ্যা গণিত হইত, পরে ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাইয়োনিসিয়াসের (Dionysius Exignus) ব্যবস্থায় খ্রীষ্টের কাল্পনিক জন্মতারিখ হইতে অব্দের আরম্ভ স্থির হইল। এই অব্দ রোমে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৃহীত হইল এবং পরে সমগ্র য়ুরোপে প্রচলিত হইল। মুসলমানদিগের অব্দ মোহম্মদের সময় হইতে ধরা হইয়াছে। হিজিরা অব্দ হইতে খ্রীষ্টাব্দ বাহির করিতে হইলে উহার বর্ষসংখ্যাকে ৯৭ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফল ১০০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ৬২২ যোগ দিতে হইবে, অর্থাৎ ১৩০০ হিজিরাব্দ $= \frac{৯৭ \times ১৩০০}{১০০} + ৬২২$ বা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। ফরাসী বিপ্লবের য়ুরোপে আর একটি অব্দ প্রচলিত

করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, উহা ১৭৯২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করা হইবে স্থির হইয়াছিল।

কালের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যে দিনই সহজপ্রাপ্য; সুতরাং দিনই কালপরিমাপের একক (unit) বলিয়া গণ্য হইল। এবং বহুকাল ধরিয়া ইহাকে অপরিবর্ত্তনীয় মনে করা হইত। যেমন মনুষ্যজাতির জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল, নানা-প্রকারের দিনের পার্থক্য দেখা দিল। প্রথমে অপরিবর্ত্তনশীলতার দিক্ হইতে নাক্ষত্রিক দিনই ব্যবহারের যোগ্য বলিয়া মনে হইল, একটি স্থির নক্ষত্র উহার ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে যে সময়ে এক বার পরিক্রমণ শেষ করে সেই সময়কেই নাক্ষত্রিক দিবস বলা হইল, ইহা আধুনিক সময়ের অনুপাতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪০·৯ সেকেণ্ড। সাধারণ পর্য্যবেক্ষকের নিকট সৌর দিনই সহজ মনে হইল, সূর্য্য এক বার মাধ্যাহ্নিকে দেখা দিয়া পুনরায় মাধ্যাহ্নিকে দেখা দিতে যে সময় লইবে, সেই সময়ের ব্যবধানকে সৌর দিন (true solar) বলা হইল। কিন্তু এই যে দিন উহা ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন ও সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দিনের মধ্যে ব্যবধান ৫১ সেকেণ্ড, অথচ সাধারণ ব্যবহারের জন্য সৌর দিন বহু শতাব্দী চলিয়া আসিল এবং সূর্য্যঘড়ী দিয়া সময়ের পরিমাপের ব্যবস্থা হইল। তারপর যখন আধুনিক ঘটিকা যন্ত্রের প্রচলন হইল, তখন আর এক প্রকার দিনের ব্যবহার আরম্ভ হইল, উহা হইল এক বৎসরের সৌর দিনগুলির একটা গড় (mean) এবং এই দিনকে গড় সৌর দিন নাম দিয়া একটা অপরিবর্ত্তনীয় দিনেব মাপ পাওয়া গেল। ইহার পরিমাপ হইল ২৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৫৬·৫৬ সেকেণ্ড নাক্ষত্রিক দিনের অনুপাতে। এই দুই তিন প্রকার ভিন্ন নানা দেশের নানা পঞ্জিকায় আরও বহুবিধ দিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাবলিনবাসীদের দিন আরম্ভ হইত সূর্য্যোদয় হইতে; প্রাচীন হিন্দুরা সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্ন, মধ্যরাত্র, অথবা সূর্য্যাস্ত হইতে দিনের আরম্ভ ধরিতেন, কিন্তু প্রধানতঃ সূর্য্যোদয় হইতে ধরিতেন। এথেন্সবাসীরা,' ইহুদীরা অন্যান্য প্রাচীন অনেক জাতি, এমন কি কোন কোন খ্রীষ্টীয়-সম্প্রদায় সূর্য্যাস্ত হইতে দিনের গণনা করিতেন। রোম ও মিশর দেশের পুরোহিত-সম্প্রদায় মধ্যরাত্র হইতে দিনের আরম্ভ ধরিতেন।

দিনের পরই যে কালবিভাগের কথা প্রথমেই মনে আসে, তাহা মাসের ব্যবস্থা। প্রথমে এক অমাবস্যা বা এক পূর্ণিমা হইতে পরের অমাবস্যা বা পূর্ণিমার ব্যবধান সময়কে মাস বলা হইত। ইহা সকল প্রাচীন জাতিই ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহা কাল বিভাগের একটা বিশিষ্ট পরিমাপক বলিয়া গণ্য হইত। পরে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দিন যেমন বহু প্রকারের, মাসও তেমন বহু প্রকারের; প্রথম, নাক্ষত্রিক মাস, অর্থাৎ যে সময়ে স্থির নক্ষত্রের অবস্থিতির তুলনায় চন্দ্র একবার পৃথিবীর চারি ধারে ঘুরিয়া আসে, ইহার পরিমাপ ছিল ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট ১১·৫ সেকেণ্ড; দ্বিতীয় চান্দ্র মাস, অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যের দুইটি যুতি-(conjunction) কালের মধ্যে ব্যবধান, ইহার গড় পরিমাপ ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেণ্ড অর্থাৎ নাক্ষত্রিক মাস হইতে ২ দিন ৫ ঘণ্টা ৫১·৫ সেকেণ্ড বেশী। যাঁহারা চান্দ্র পঞ্জিকা মানিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রথমে বার মাসে বৎসর ধরা হইত।

দিন ও মাসের ব্যবস্থা স্থির হইলে বৎসরের পরিমাপের চেষ্টা হইল। নাক্ষত্রিক বৎসর ও সৌর বৎসর, দুই প্রকারের বৎসরের প্রচলন হইল। একটি স্থির নক্ষত্রের অবস্থানানুসারে সূর্য্যকে এক বার যে স্থানে দেখা যাইত, পুনরায় সেই স্থানে সূর্য্যকে দেখা যাইবার যে সময়ের ব্যবধান, উহাকে এক নাক্ষত্রিক বৎসর বলা হইত, আর যে সময়ে সূর্য্য বিষুববিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার বিষুববিন্দুতে ফিরিয়া আসিত, উহাকে ধরা হইত এক সৌর বৎসর। কিন্তু যে বৎসর জনসাধারণে ব্যবহার করে, তাহার সংখ্যা ৩৬৫ দিন; আর সূর্য্যের রাশিচক্রে পরিভ্রমণের সময় ৩৬৫$\frac{1}{4}$ দিন। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ কাল-বিভাগ হইল সপ্তাহ। সম্ভবতঃ দিনের অপেক্ষা দীর্ঘ এবং মাসের অপেক্ষা অনেক কম এক কালবিভাগের প্রয়োজন হইয়াছিল। ক্যাল্ডীয়ান যাজক-সম্প্রদায়ই ইহার ব্যবস্থা করেন এবং এই কাল-বিভাগ এখন সকল জাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সাতটি গ্রহের নামানুসারেই উহাদের নামকরণ হইয়াছে।

সকল প্রাচীন পঞ্জিকায় বার ঘণ্টায় দিন ও বার ঘণ্টায় রাত্রি ধরা হইত। কেন যে বার সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে বৎসরের মাস সংখ্যা বার বলিয়া দিনের ঘণ্টার সংখ্যাও বার, কিন্তু এই ধারণা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ব্যাবিলনবাসীরা এই সংখ্যা সর্বপ্রথমে স্থির করেন। কেহ কেহ বলেন দ্বাদশ সংখ্যা হইতে ভগ্নাংশ বাহির করিতে সুবিধা হইত বলিয়াই এই সংখ্যার প্রচলন হইল। প্রাচীন জাতির সকলেই দেখিলেন যে গ্রীষ্মকালে দিনের ঘণ্টা রাত্রির ঘণ্টার অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং শীতকালে ইহার বিপরীত।

ইহার পর সময় নির্দ্ধারণ করিতে ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষে সূর্য্যঘড়ীর ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সূর্য্যের অবস্থানের সহিত যোগাযোগ থাকায়, সূর্য্য না উঠিলে বা রাত্রিকালে সময়ের পরিমাপ করিতে জলঘড়ীর ব্যবহার আরম্ভ হইল। এই সকলের উদ্ভাবন হইতেই বর্ত্তমান ঘটিকাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বোথিয়াসই (Boethius—480 to 525 A. D.) প্রথমে রোমদেশে ইহার প্রবর্ত্তন করেন এবং ৬১২খ্রীষ্টাব্দ হইতে ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইহা ব্যবহৃত হইল। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত ঘড়ীর আবিষ্কার হইল ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ হিউজেনসের (Huygens) চেষ্টায়।

এইরূপ ভাবেই কালের বিভিন্ন বিভাগের উৎপত্তি ও প্রচলন আরম্ভ হয় এবং প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগ হইতেই বহু প্রাচীন জাতির মধ্যে এই কাল-বিভাগের সূচনা ও প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।

ব্যর্থ

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

এত বড় প্রকাণ্ড বাড়ীটা জনশূন্য নিরালা পুরী। এই বিরাট্ নিঃসঙ্গ শূন্যতা প্রতিমার জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে সবকিছু স্বপ্ন-দেখার শেষ করে আনে। স্বপ্ন দেখেছিল প্রতিমা। জীবনের অভিধানে প্রথম যে'দিন ভালবাসা কথাটার অর্থ খুঁজে পেয়েছিল সে'দিন সে দেখেছিল স্বপ্ন, মুকুল যেদিন স্পর্শের শিহরণে এনেছিল বুকের স্পন্দনে অজানা পুলক সেদিন চোখে ছিল স্বপ্ন, বাসরের নববধূর কানে মধু-গুঞ্জরণে যেদিন এসেছিল নীড় বাঁধার ডাক, সে দিনও সে দেখেছিল স্বপ্ন।

জানলার লোহার গরাদে মাথা রেখে প্রতিমা নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পথের দিকে। চলমান মানুষের কলরব। ট্রামগুলো মাঝে মাঝে ছুটে চলে যায়, ভেসে আসে লাল বাসগুলোর বেসুরো গর্জ্জন। ঘণ্টা বাজে রিকসাগুলোর ঠুং ঠুাং। সবাই চলে। শেষ নেই এই পথের; তাই এই পথ-চলারও শেষ নেই। স্বপ্ন! ভাবে প্রতিমা, মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে? স্বপ্ন, শুধুই স্বপ্ন। ও কি সত্যি হয়! তবু মানুষ জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখে। জীবন ত স্বপ্ন নয়। জীবন এই বাস্তবের উলঙ্গ সত্য। মানুষ পাবে না যা কোন দিন, শুধু তারই স্বপ্ন দেখে। তাই কি?

বিকাশও স্বপ্ন দেখত। আজও দেখে। মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার এই যে একঘেয়ে জীবন, এর বাইরে বিজ্ঞান-সাধনার মাঝে যে বিরাট্ পৃথিবী আজও রয়েছে অজ্ঞাত, তারই স্বপ্ন। তাই ল্যাবরেটরির ঐ ছোট্ট ঘরে সে রয়েছে বন্দী হয়ে। এই ঘরের বাইরে আলো-বাতাসপরিপূর্ণ পৃথিবীর কাছে ওর কোন দাবি নেই। বিকাশ নাড়াচাড়া করে নানা শিশি-বোতল, বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। মাঝে মাঝে টেনে আনে আলমারির মোটা বইগুলো। পেনসিলের রেখায় ভরে যায় স্তূপীকৃত সাদা কাগজ।

প্রথম যেদিন এ বাড়ীতে এল, সেদিনই বুঝল প্রতিমা এ এক নতুন পৃথিবী। কোন জীবন্ত মানুষের কলহাস্যের সাড়া নেই। এই ভয়াবহ নির্জ্জনতাকে, এর অখণ্ডতাকে কেউ ভাষার তরঙ্গে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করছে না। প্রতিমার বুকের কোণে ভাষার কলোচ্ছ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে গুমরে মরছে! কিন্তু কাকে সে জানাবে অন্তরের কথা! এই পৃথিবীর মানুষ নেই কেউ এখানে! এই মাটির দেয়াল যদি কথা বলতে পারত!

বিকাশ ওর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, কি যেন তোমার নামটা বললে—

—প্রতিমা।

—ও, প্রতিমা। ঠিক।

সারাদিনের মধ্যে এই দুটো কথাই বলল বিকাশ। তার পর এসে ঢুকল ল্যাবরেটরিতে। হারিয়ে গেল বাইরের পৃথিবী; হারিয়ে গেল প্রতিমা। এক বার সে ভেবে দেখল না, এ বাড়ীতে এসেছে নতুন একজন। ওর প্রেরণা আছে, হৃদয় আছে, প্রেম আছে। হাসি-কান্নায় ভরা এই মাটির পৃথিবীর সেও এক জন।

নামল রাত্রি। চাঁদের আলো অজস্রধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রতিমা—ছাদে। যেখানে আকাশ উদার হয়ে দিয়েছে ধরা, চামেলির গন্ধে মাতাল হয়েছে বাতাস। এমনি রাতে সে কত স্বপ্ন দেখেছে। আজ মনে হ'ল, মিথ্যে ও চাঁদ, মিথ্যে ওর স্বপ্নময় আলো। কোন একটা বইয়ে প্রতিমা পড়েছিল, চাঁদ নাকি যৌবনের আলেয়া। মিথ্যে ত নয়।

ছাদ থেকে নেমে ধীরে ধীরে ল্যাবরেটরির কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরে জ্বলছে আলো। একটা মোটা বইয়ের মধ্যে ডুবে ছিল বিকাশ। নীরবে এসে দাঁড়াল প্রতিমা চেয়ারের পাশে। ওর সাড়া পায় না বিকাশ। ইচ্ছে হ'ল প্রতিমার ওর কপালে রাখে হাত। এলোমেলো চুলগুলোকে হাতের কোমল পরশে গুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হ'ল।

চেয়ার ঠেলে আলমারির কাছে এগিয়ে এল বিকাশ আর একটা বই আনবার জন্যে। তাই চোখ পড়ল প্রতিমার দিকে।

—তুমি! ও, প্রতিমা!

একটু হেসে প্রতিমা বলল, আমার নামটা বারবার তুমি ভুলে যাও।

—ভুলতে আমি চাই না, তবু ভুলে যাই।

আলমারি থেকে বইটা টেনে আবার সে চেয়ারে এসে বসে। হাতে পেনসিল নিয়ে সাদা কাগজে কি সব লিখতে থাকে। এই একটু আগে প্রতিমা কাছে ছিল, তার সে উপস্থিতি সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কাগজের বুকে রেখা টেনে কি যেন খুঁজতে থাকে।

প্রতিমা দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ নীরবে তারপর করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে ঘর ছাড়ল।

বিকাশ অধ্যাপক। মাঝে মাঝে দু-এক জন ছেলে তার কাছে আসে। সেদিন মনে হয় প্রতিমার, তার এত দিনের পরিচিত পৃথিবী থেকে এই ছেলের দল ছুটে এসেছে সজীব প্রাণের আনন্দ-নির্ঝর নিয়ে। ওদের দেখে প্রতিমা দোতলার রেলিঙে দাঁড়িয়ে। বড় ভাল লাগে ওদের। ইচ্ছে হয়, কথা বলে ওদের সঙ্গে। শুধু কথা। সত্যিই প্রতিমা এখন কথা বলতে ভুলে গেছে, হাসতে ভুলে গেছে। মনে হয় মাঝে মাঝে, সে যেন জনশূন্য প্রেতপুরীতে বন্দিনী হয়ে রয়েছে। সে ভুল ভেঙে দেয়, ভোলা চাকর আর ড্রাইভার।

বিকাশকে রোজ মনে করিয়ে দিতে হয় কলেজ যাবার কথা। প্রতিমা বলে, এত দিন তোমার কলেজ যাবার কথা কে মনে করিয়ে দিত?

—ভোলা।

—ও ত বুড়ো মানুষ। ও যেদিন ভুলত?

—সেদিন থাকত ড্রাইভার আর মোটরের হর্ন। ভাবি মাঝে মাঝে, ছেড়ে দিই কলেজ। কিন্তু ওরা ছাড়তে দেয় না।

কথা শেষ করে একটু হাসে বিকাশ। প্রতিমার সঙ্গে এই হ'ল বিকাশের সবচেয়ে বেশী কথা।

এমনি ক'রে এগিয়ে চলে প্রতিমার নিঃসঙ্গ জীবন নির্জ্জন এই পাষাণ-পুরীতে। মনে হয় প্রতিমার, দিন এগোচ্ছে মন্থর গতিতে। এই যে হাঁপিয়ে-ওঠা জীবন—পাষাণ-প্রাচীরের রুদ্ধ কোণে এ শুধু গুমরে মরে।

এক দিন এল মুকুল। ট্রাঙ্ক আর বিছানা নিয়ে মোটর থেকে নামল গেটের সামনে। মুকুলকে অবাক হয়ে দেখল প্রতিমা! এ বাড়ীতে এমনভাবে মুকুলকে দেখবে স্বপ্নেও সে আশা করে নি কোন দিন। তবু জীবনে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

মুকুল বলল, খুবই অবাক হয়েছ বোধ হয় এ বাড়ীতে আমায় দেখে। আগে জানলে, এতটা অবাক হতে না। বিকাশ আমার অনেক দিনের বন্ধু।···তারপর, আছ কেমন?

—ভালই, জবাব দিল প্রতিমা।

—তোমার বিয়ের খবর ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম। ডাক এসেছিল দু'দিক থেকেই! তখন সাড়া দিতে পারি নি। সময় হ'ল আজ এতদিন বাদে। বললে ত ভালই আছ। কিন্তু চেহারা দেখে তা মনে হচ্ছে না!

—"ভাল থাকা না-থাকাটা একান্ত মনেরই অধিকারে।"—সামান্য একটু হাসল প্রতিমা, "শরীরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।"

মুকুল হেসে বলল, বেশ। এখন খেতে দাও ত কিছু, খুব খিদে পেয়েছে। বিকাশ কই?

—ল্যাবরেটরিতে।

—ঐ এক আশ্চর্য্য মানুষ! এখানে আসব বলে যে তার করেছিলাম, তাও তোমাদের জানায় নি নিশ্চয়ই। টেলিগ্রামটা পড়েছে কি না সন্দেহ।

তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে এগোল মুকুল।

অনেক দিন পরে আজ আবার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের চেহারা দেখে প্রত্যাসন্ন পূর্ণিমার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ওরা দু'জনে বসেছিল ছাদের কোল ঘেঁসে।

মুকুল বলল, শোন প্রতিমা, কেন এখানে এলাম। তোমায় দেখতে পাব রোজ, থাকব তোমার কাছে তাই।

একটু চুপ ক'রে প্রতিমা বলল, ভুল কর না মুকুল। আজ আমি সেদিনের সে প্রতিমা নই।

—সেদিন তুমি এর চেয়ে অনেক ভাল ছিলে। সেদিন তুমি ছিলে সত্যিই প্রতিমা। সেদিনের চেয়ে আজ তুমি অনেক বদলে গেছ।

"হয়ত তাই।" টবের ওপরকার ফুলগাছের ছোট্ট একটা পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রতিমা বলল, "কিন্তু আজ আমি বিবাহিতা।"

—জানি। আর এও জানি, ওকে পেয়ে তুমি সুখী হতে পার নি। বিকাশকে পেয়ে কেউ কোন দিন সুখী হতে পারে না।

সত্যিই প্রতিমা সুখী হয় নি। শূন্যপুরীতে ওর সারা অন্তর আকুল হয়ে গুমরে মরছে। এখানে ওর ভাষা হয়ে গেছে মূক, ও হাসতে ভুলে গেছে। একটা দিনের জন্যেও পায় নি সে বুকের কোণে প্রীতির স্পর্শ। না, সুখী হয় নি প্রতিমা। মুকুল বলেছে ঠিক।

কিন্তু তবু জবাব দিল প্রতিমা, আমি কিন্তু সত্যিই সুখী হয়েছি; ওকে আমি ভালবাসি।

"ভালবাস! বাজে কথা বলো না প্রতিমা।" হেসে উঠল মুকুল। "কি আছে ওর, যে ভালবাসবে? ঐ ল্যাবরেটরি ঘরের বাইরে সে ফিরে তাকায় নি কোন দিন। ল্যাবরেটরির পাথরের দেয়ালে আটক থেকে বিকাশও পাষাণ হয়ে গেছে।"

একটু শ্লেষের সুরে বলে উঠল প্রতিমা, তাই বন্ধুর এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে—

—ভুল বুঝ না প্রতিমা। আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার ওপর দাবি আছে আমার।

—আমার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ভালবাসার মৃত্যু হয়েছে। জবাব দিল মুকুল, ভালবাসার ত মৃত্যু নেই প্রতিমা।

প্রতিমা কোন জবাব দিল না। তার কাছে সবই দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। মুকুল এই দুর্ব্বার আহ্বান নিয়ে এত দেরিতে কেন এল? তাই সে ভাবতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে ডাকল প্রতিমা, মুকুল—

—বল

—কি?

—এখান থেকে চলে যাও তুমি। এ জীবনটা আমায় এমনি করেই এখানে কাটাতে দাও।

—কিন্তু এমনি করে জীবনের জের টেনে লাভ কি প্রতিমা? এই পাষাণ-প্রাচীরে বন্দিনী থেকে কি তুমি পেয়েছ? কি তুমি পাবে?

বিছানায় শুয়ে মুকুলের কথাগুলোই ভাবতে থাকে প্রতিমা। সত্যি সে কিছুই পায় নি। সত্যিই বিকাশ পাষাণ। স্পন্দনহীন বক্ষে ওর সাড়া জাগে না। তবে কি মুকুলের সঙ্গে সে পালিয়ে যাবে? সে গেলে হয় ত খেয়ালও করবে না বিকাশ। কিন্তু এমনি ভাবে ঘর-ভাঙা কি সঙ্গত হবে? কিন্তু এর নাম কি ঘর? মায়া নেই, প্রেম নেই, নেই স্নেহের বন্ধন। শুধু পাথরের দেয়াল দিয়েই কি ঘর বাঁধা যায়? মুকুল তাকে দেবে সবই—নারীজীবনের যা কিছু কাম্য। ওর হৃদয় আছে, প্রেম আছে, তবে কেন প্রতিমা এমন করে এখানে পড়ে থাকবে? কিন্তু সত্যিই কি বিকাশ পাষাণ? বৈজ্ঞানিক সাধনার মাঝে জ্ঞানের জীবনই বিকাশ চিনেছে। চিনল না তার প্রতিদিনের হাসি-কান্নায় মেশান এই জীবন, এর সঙ্গেই ঘটল না তার পরিচয়। তাই কি?

মুকুলকে বলেছে, বিকাশকে সে ভালবাসে। মিথ্যে নয়। সে আজও চায় ভালবাসতে। বিয়ের প্রথম দিন থেকেই চেয়েছিল। মুকুল কেন এল এই অসময়ে? এই নতুন জীবনে এমন ক'রে মুকুলের আবির্ভাব চায় নি সে।

উঠে বসল সে বিছানা ছেড়ে, ছুটে এল ল্যাবরেটরি ঘরে। বিকাশ রোজকার মত ডুবে রয়েছে। আশ্চর্য্য! হৃদয় থেকেও হৃদয় যার অন্ধ, তাকে নিয়ে কি করবে প্রতিমা? মানুষ না হয়ে

সত্যিই ও কেন পাষাণ হ'ল না! তা হলে এমন করে কাঁদত না প্রতিমা।

প্রতিমা ওর গায়ে রাখল হাত। বিকাশ ওর দ্রুত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল।

—কে? প্রতিমা?

—"হ্যাঁ, আমি!" ওর হাতদুটো ধরে বলল, "এস"।

—যাব।

"হ্যাঁ। এস আমার সঙ্গে। তোমার বইখাতা ওখানেই থাক।" বিমূঢ় বিকাশকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে, নিয়ে এল নিজের ঘরে। পাশে বসিয়ে বলল, বল।

—বল! কি বলব প্রতিমা?

—যা ইচ্ছে বল। তোমার কথা শুনব। আমায় তুমি কিছু বল নি কোন দিন। আজ বল।

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে রইল বিকাশ।

—বলবার কিছুই কি নেই তোমার? মুকুল অত কথা বলে, তোমার কি বলবার কিছুই নেই! ঐ ঘরের মাঝে কি তুমি পেয়েছ আমায় বলতে পার? তুমি পাষাণ, সত্যিই তুমি পাষাণ!

বিকাশের কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে ওঠে প্রতিমা। বিকাশ বুঝতে পারে না। এ কান্নার সঙ্গে প্রথম তার পরিচয়। মুখে আসে না কোন সমবেদনার বাণী। প্রতিমার অজস্র কালচুলের মাঝে আঙুল চালিয়ে নীরব ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দেয়।

মুকুলের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর আবহাওয়া বদলে যায়। তার কলহাস্যে এ নির্জন পুরী মুখরিত হয়ে ওঠে। এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে প্রতিমারও আসে পরিবর্ত্তন। কিন্তু এ ত সে চায়নি। এক ঝড়ের ঝাপটায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে যয়ে। এর চেয়ে সেই নীরব নিঃসঙ্গ জীবনই হয়ত ছিল ভাল।" প্রাণ ভরে সে কাঁদতে পারত।

সেদিন আকাশে মেঘ করেছে—প্রতিমা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ ঘরে আসে বিকাশ। এ ভাবে তার আসাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

—জান প্রতিমা, এতদিন ধরে যে স্বপ্ন দেখেছি, আজ তার হবে শেষ। আজকের সারাটা রাত আমায় জাগতে হবে। কাল সকালে সারা পৃথিবী অবাক হয়ে দেখবে এই নতুন আবিষ্কার। কেউ জানে না এখনও, কেউ দেখে নি এখনও—

আবার সেই আবিষ্কার। সেই নীরস বিজ্ঞান। এ ছাড়া কি কথা নেই ওর? এ ছাড়া কি কথা ও জানে না? সারাটা মন বিষিয়ে উঠে প্রতিমার।

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করে বিকাশ ছুটে এগিয়ে এল মুকুলের ঘরে। দুপুরের এই একটু সময়ও সে নষ্ট করতে পারে না। এখন থেকে সারা রাত, তার পর রাতের পৃথিবী যখন ভাঙবে তার ঘুম—

দাঁড়াতে পারে না বিকাশ।

সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। বিছানায় বসে কত কি ভাবছিল প্রতিমা। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা জানলা দিয়ে নিয়ে আসে জলের ছাট, সে দিকে তার খেয়াল নেই।

মুকুল কখন এসেছিল কে জানে। ডাকল, প্রতিমা—ঘাড় ফেরাল প্রতিমা শান্তভাবে। যেন সে ওর আগমনই প্রতীক্ষা করছিল।

—প্রতিমা, কাল আমি যাচ্ছি। তুমিও যাবে।

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে।

একটু থেমে প্রতিমা বলল, এই ঘর ভেঙে—

—ঘর বাঁধাই যখন হ'ল না, ভাঙার প্রশ্ন আসে না।

জানালার মাঝ দিয়ে অবিশ্রান্ত জলধারার দিকে চেয়ে জবাব দিল প্রতিমা, ডাক যখন দিলে, কিছু দিন আগে দিলে পারতে।

—দেরি হয় নি কিছুই।

শান্ত কণ্ঠে জানাল প্রতিমা, আমি যাব না মুকুল।

—কেন?

—সেদিনও বলেছি, আজও বলছি ওকে আমি ভালবাসি।

হেসে উঠল মুকুল। হাসির সুরে পরিহাস।

—ও কি জানে ভালবাসা! যে এখনও জীবনকে চিনতে পারে নি, সে কেমন ক'রে জানবে কাকে বলে ভালবাসা! শোন প্রতিমা, আমি জানি তুমি সেদিন আমায় ভালবাসতে। আজও ভালবাস আমাকে।

প্রতিমা সজোরে প্রতিবাদ করে ওঠে, না না।

মিছে ব'ল না প্রতিমা। মুকুলের কণ্ঠস্বর দৃঢ়। আমি জানি তুমি আমায় চাও। তোমার সারা অন্তর চায় আমায়। অথচ লজ্জায় তুমি জানাতে পারছ না।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠে প্রতিমা, সমস্ত শরীরটা তার কাঁপছে, কপালের কোণে জমে উঠেছে ঘাম।

—না না, এ সত্যি নয়। এ মিথ্যে, এ মিথ্যে।

—কথার আবরণে তোমার অন্তরটা ঢাকতে চেষ্টা ক'রো না। সেটা যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! আমার কাছ থেকে তুমি চাও প্রেম—পাওনি যা তুমি। তোমার সকল সঞ্চয় আমায় দান করে তুমি চাও প্রতিদান।

—না না, এ ভুল। সত্যি নয়, সত্যি নয়।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় প্রতিমা পাগলের মত। কাঁপছে সে—উত্তেজনায়, অজানা ভয়ে।

ছুটে চলে আসে প্রতিমা বিকাশের কাছে। ওই তাকে বাঁচাতে পারবে। বিকাশ ছাড়া আর যে কেউ নেই তার!

দুটো স্পিরিট্-ল্যাম্প জ্বলছে টেবিলের ওপর। ফ্লাস্কের ভেতর রক্তবর্ণ তরল পদার্থ। আগুনের আভায় ফেনিল উচ্ছ্বাসে কাঁচের আবরণ ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে সেই রক্তবর্ণ পদার্থটা। বিকাশ টেষ্ট-টিউব হাতে নিয়ে ঢালছে এসিড।

ছুটে এল প্রতিমা। শরীর তার টলমল করছে। কোথায় যেন সে বিভীষিকা দেখেছে, হৃৎ-স্পন্দন হচ্ছে দ্রুততর।

দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল প্রতিমা।

—শোন, শোন। আজ তোমায় শুনতে হবে।

কানে যায় না কথাটা বিকাশের। সে তন্ময়, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

"শোন।" প্রতিমা ওর গায়ে রাখল হাত।

—কে, প্রতিমা। একবার শুধু মুখটা ফিরিয়ে আবার নিজের কাজে মন দেয় বিকাশ।

—ওগুলো ফেলে দাও। ভেঙে ফেল বাড়ীটা, চুরমার করে দাও এই ল্যাবরেটরি ঘরটা।

—কথা নয় প্রতিমা। লক্ষ্মীটি যাও। আজকের এই রাতে হয়ত আসবে আমার জীবনের চরম শুভক্ষণ। আমায় কাজ করতে দাও।

বিকাশ টেনে আনে আর একটা এসিডের শিশি। ওর কানে আসে না প্রতিমার বুকের উন্মত্ত আর্ত্তনাদ। ভয়ার্ত্ত প্রতিমা কাছে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় কাঁপছে, দেখতে পায় না বিকাশ।

—না না, তোমায় কাজ করতে দোব না। আর কোন দিন না। ওর এসিডের বোতলশুদ্ধ হাতটা ধরল সে।

—হাত ছাড়, আজকের রাতটা আমার বিফল করে দিও না।

—না, না। এমনি করে সারা-জীবন তুমি আমায় কাঁদাবে? কেন, কি অপরাধ আমার? কি আমি করেছি?

ওর কথা শোনবার স্পৃহা নেই বিকাশের, অবকাশও নেই। তার ওই বিরাট্ আবিষ্কার এখুনি হারিয়ে যাবে। ফুটছে এসিড, বেরোচ্ছে গ্যাস। আর একটা মুহূর্ত্ত—

চেঁচিয়ে ওঠে বিকাশ, প্রতিমা—

এ কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক। রূঢ়। তবু প্রতিমা দৃঢ়।

সজোরে প্রতিমাকে ঠেলে উন্মাদের মত এগোতে যায় বিকাশ। ওকে ছাড়বে না প্রতিমা; সেও যেন পাগল হয়ে গেছে। হাতের বোতল ছিটকে ভিতরকার তরল পদার্থ প্রতিমার গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

চীৎকার ক'রে ওঠে প্রতিমা। ওর সারা দেহ ফুলে ওঠে—অসহ্য যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়ে প্রতিমা। সারা দেহে তার তীব্র জ্বালা। শেষে যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে আর শব্দ বেরোয় না।

স্তম্ভিত বিকাশ। নির্ব্বাক। চোখের সামনে দেখছে সে আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়া। এ ভয়াবহ, এ নির্ম্মম। তবু সে নীরব, তবু সে স্তব্ধ।

প্রতিমা ইসারায় ওকে ডাকল। বিকাশ এগিয়ে এল যন্ত্র-চালিতের মত। প্রতিমা মুখটা সামনে এনে বহু কষ্টে কথা বলল, যাবার আগে একটা কথা বল। বল, তুমি আমায় ভালবাস। বল—।

বলেছিল বিকাশ। বলেছিল, ভালবাসি। যাবার ক্ষণে ঐ সামান্য কথাটার দাম ওর কাছে কতখানি, সেদিন বিকাশ জানে নি।···মৃত্যুর ভয়াবহতাকে তার এই কথা কয়টি সেদিন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত করে তুলেছিল।

দিনকতক পরে মুকুল চলে গেল। এবার বিকাশের মনে হ'ল সে একা—নিতান্তই একা।

নিস্তব্ধ বাড়ীটা ঠিক তেমনই আছে। এর মাঝে কোন পরিবর্ত্তন দেখা দিল না। প্রতিমা যেদিন নববধূর সাজে এ বাড়ীতে এসেছিল সেদিন কোন সমারোহ জাগে নি। সেদিন এ পাথরের বাড়ী যেমন স্তব্ধ ছিল, আজও ঠিক তেমনি।

প্রতিমার স্মৃতিবিজড়িত শূন্যপুরীতে বিকাশের নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়, তার জীবনের সাধনা রইল অসমাপ্ত, সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে সমস্ত জীবনটাই তার ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে বস্ত্রসমস্যা

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

কাপড়ের বাজারের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার কারণ বুঝিতে হইলে ১৯৪৩ সালের ৩১শে জানুয়ারি বোম্বাইয়ে ভারত-সরকারের আহ্বানে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক হয় তাহার বিবরণ একটু জানা দরকার। তৎকালীন বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এবং ভারত-সরকারের বাণিজ্য-বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ টি. এস. পিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। বোম্বাইয়ের মিল-মালিক সর্ নেস ওয়াদিয়া মোটামুটি অবস্থা ব্যক্ত করিয়া বলেন,—ভারতবর্ষের মোট উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ প্রায় ৪৫০ কোটি গজ, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ইহার শতকরা ৬০ ভাগ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরি হউক। এই পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরি হইলে সাধারণ কাপড় পাওয়া যাইবে মাত্র ২৭০ কোটি গজ। ইহার মধ্যে ৭০।৮০ কোটি গজ সাপ্লাই বিভাগ টানিয়া লইবেন, গত বৎসর ইঁহারা ১২০ কোটি গজ লইয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট থাকিবে মাত্র ১৮০ কোটি গজ। এই ১৮০ কোটি গজের উপরেও গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ইহা হইতে ৬০ কোটি গজ বিদেশে রপ্তানী করা। কাজেই দেশের যে সব লোকের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরি হয় নাই এবং যাহারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় লইতে চাহিবে না তাহাদের জন্য কিঞ্চিদধিক ১০০ কোটি গজ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ফলে দেশের যে এক-চতুর্থাংশ লোক সবচেয়ে বেশী কাপড় ক্রয় করে তাহাদের ভাগে বৎসরে মাত্র ১০ গজ অর্থাৎ এক জোড়া ধুতি পড়িবে, জামার কাপড়ের কোন বন্দোবস্ত থাকিবে না। ওদিকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সরকারের হিসাব অনুযায়ী ২০০ কোটি গজ তৈরি হইলে দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোকের ভাগে বার্ষিক মাত্র ৬ গজ পর্য্যন্ত পড়িবে।

প্রয়োজনের তুলনায় কাপড় কত কম পাওয়া যাইতেছে তাহার এই হিসাব দেখাইয়া সর্ নেস ওয়াদিয়া কস্তুরভাই লালভাই, সর্ পদ্মপৎ সিংহনিয়া, সর্ শ্রীরাম, সর্ বিঠল চন্দাবরকার, প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পপতিগণ ভারতের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে এই ৬০ কোটি গজ রপ্তানী না হইয়া দেশে থাকিলে বস্ত্রসমস্যা অন্ততঃ খানিকটা কমিবে। বোম্বাই মিল-মালিক সমিতিও গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন যে, সাধারণ অবস্থায় যেখানে মাত্র সাড়ে বার কোটি গজ কাপড়

বিদেশে রপ্তানী হইত সেখানে এই বস্ত্রাভাবের দিনে উহার পরিমাণ চারি-পাঁচ গুণ বাড়াইয়া ৬০ কোটি গজ বাহিরে পাঠাইবার প্রস্তাব একান্ত বিসদৃশ। সর্ নেস ওয়াদিয়া বলেন,—বর্ত্তমানে মিশর, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশই আমাদের কাপড় অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে মিশর ভারতবর্ষ হইতে বড় জোর ৭০ লক্ষ গজ কাপড় ক্রয় করিত, গত বৎসর উহা বাড়িয়া ৫ কোটি ৮০ লক্ষ গজে দাঁড়াইয়াছে। এই সব দেশে ভারতীয় বস্ত্রের বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে ইহারা পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় জার্ম্মেনী ও ইতালি হইতে বস্ত্র ক্রয় করিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং সরকারী প্রতিনিধি মিঃ পিলে উভয়েই রপ্তানী বন্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহারা আশ্বাস দেন যে উহার পরিমাণ কমাইবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, আগেই কথা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কাপড় না পাঠাইয়া উপায় নাই। সর্ নেস ওয়াদিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলেন—কেন এই ভাবে আগেই কথা দিয়া রাখা হয়? নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কারণে গবর্ণমেণ্ট এরূপ করিতেছেন। রপ্তানীর পরিমাণ শেষ পর্য্যন্ত ৬০ কোটির বেশী হইয়া দাঁড়াইবে কিনা এই প্রশ্ন উঠিলে পিলে সাহেব শুধু বলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় 'না'।" সভায় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা বলেন যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈয়ারি বাধ্যতামূলক নয় বটে, কিন্তু কোন মিল উহা তৈয়ারি না করিলে তাঁহাদের উপর ভারতরক্ষা আইন প্রযুক্ত হইতে পারে।

১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ এই দুই বৎসর ধরিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈয়ারি হইয়াছে, প্রদেশে প্রদেশে প্রেরিতও হইয়াছে, কিন্তু বাজারে উহা দেখা যায় না। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আনিয়া গুদামে মজুত করিয়াছেন। সরকারী মনোনীত দোকান ভিন্ন আর কাহাকেও উহা বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় নাই। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে কাপড় বিক্রয়ের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ফলে অতি সামান্যই বিক্রয় হইয়াছে, অধিকাংশ কাপড় গুদামে পচিতেছে। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে যাহারা অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল গবর্ণমেণ্টের এই সুবন্দোবস্তে বস্ত্রাভাবে তাহাদের অনেকেই শীতে ও রোগে মরিয়াছে। কাপড়গুলি সাধারণভাবে দোকানদারদের মারফৎ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে এই বিভ্রাট ঘটিত না। ১৯৪৪-এর ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মিলগুলি গবর্ণমেণ্টকে মোট ৩৪ কোটি ১৯ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈয়ারি করিয়া দিয়াছে এবং ইহার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই সরকারী গুদামে মজুত হইয়া অবিক্রীত পড়িয়া রহিয়াছে প্রকাশ্যে এ অভিযোগ উঠিয়াছে।

১৯৪৪-এর শেষভাগে, নবেম্বর মাসে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রীয় সরকারকে কাপড় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতে উৎপন্ন মোট কাপড়ের কত ভাগ কোন্ প্রদেশ পাইবে তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা? দেওয়া হইয়া থাকিলে জনপ্রতি প্রাপ্যের কি হিসাব ধরা হইয়াছে এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে লোকে যে পরিমাণ কাপড় ব্যবহার করিত তাহার সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কি না; বাংলা ও আসামে সামরিক ও সমর-বিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যে-সব তৈরি পোষাক কিনিয়া থাকে তাহা বিবেচনা করিয়া ভারত-সরকার বাংলা ও আসামের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধির কথা ভাবিয়াছেন কিনা; রেড-ক্রশ এবং হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ও বে-সামরিক অধিবাসীদের প্রাপ্য ভাগ হইতে গ্রহণ করা হয় কি না। বাণিজ্য-সচিব সর্ মহম্মদ আজিজুল হক এইসব প্রশ্নের কোন জবাব দেন নাই, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে জানাইবেন বলিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন। বাংলা ও আসাম হইতে বহু কাপড় চোরাই পথে বাহির হইয়া যাইতেছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যসচিব বলেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহার আর একটি প্রশ্নের উত্তরে সর্ মহম্মদ বলেন, বাংলা ও আসামে তাঁতের কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে গবর্ণমেণ্ট ইহা অবগত নহেন। সরকার কর্ত্তৃক সুতা নিয়ন্ত্রণের ফলে তাঁত বন্ধ হইয়াছে এই ধারণা যে সম্পূর্ণ সত্য বাংলা ও মাদ্রাজে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিকপত্র 'কমার্স'-র সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি মাদ্রাজের ১৫০০০এর মধ্যে ১০০০০ তাঁত সুতার অভাবে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বাংলাদেশেরও বহু স্থানে সুতার অভাবে সহস্র সহস্র তাঁতি বেকার হইয়াছে সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁতিদের সুলভে সুতা প্রাপ্তির সহজ উপায় গবর্ণমেণ্ট কোন দিনই করিয়া দিতে পারেন নাই, সুতা কণ্ট্রোলের পর অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়াছে, সুতা এখন দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু।

১৯৪৩ সাল হইতেই ভারতীয় মিলমালিক ও জনসাধারণ উভয়েই ভারতের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী এবং সাধারণ কাপড় তৈরির পরিমাণ কমাইবার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। কাপড়ের দুর্ভিক্ষ এক দিনে আসে নাই। ভারত-সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংখ্যাতত্ত্ব পত্রিকায় দেখা যায় ভারতবর্ষের মোট উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ কমে নাই। গত পাঁচ বৎসরের মিলের বস্ত্র উৎপাদনের সরকারী হিসাব :—

১৯৩৯-৪০—৪০১·২ কোটি গজ
১৯৪০-৪১—৪২৬·৯ „ „
১৯৪১-৪২—৪৪৯·৩ „ „
১৯৪২-৪৩—৪১০·৯ „ „
১৯৪৩-৪৪—৪৮৫·৯ „ „

যে পরিমাণ উৎপন্ন বস্ত্রে ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪ সাল এক প্রকার কুলাইয়া গিয়াছে, তাহা বজায় থাকিলে অকস্মাৎ গত কয়েক মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় কেন? বাহিরে যথেষ্ট বস্ত্র রপ্তানী হইয়া যাইতেছে ইহা সুনিশ্চিত। সেদিনও বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রীরা তিব্বতে বস্ত্র রপ্তানীর কথা অস্বীকার করিবার পরেই ভারত-সরকার উহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তিব্বতে প্রেরণের জন্য কালিম্পং-এ বস্ত্র মজুদ আছে। বস্ত্র-রপ্তানীর ব্যাপারটা বরাবরই চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাংলায় বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের জন্য একমাত্র

বাংলা-সরকার দায়ী, ভারত-সরকার এবং বোম্বাইয়ের বস্ত্র-বিতরণের কর্তারা উভয়েই এ ইঙ্গিত করিয়াছেন। উভয়েই দেখাইয়াছেন যে বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মোটামুটি কম কাপড় পায় নাই, স্বাভাবিক অবস্থায় যে কাপড় এখানে বিক্রয় হইত তদপেক্ষা বাংলার বরাদ্দ বিশেষ কমও নয়। সুতরাং এখানকার এই দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ বেপরোয়া চোরাবাজার ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তবে এই চোরা কারবার বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া কত দূর বাহিরে গিয়াছে তাহা এখনও ধরা পড়ে নাই। এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে কি না বাঙালীর পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত নিয়োগী তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কোন স্পষ্ট উত্তর পান নাই।

বর্ত্তমান কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার পূর্ব্বে চারিটি স্পষ্ট ধাপ দেখা যায়। প্রথম, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরি করিতে মিলগুলিকে বাধ্য করা এবং সরকারী বে বন্দোবস্তে উহার অধিকাংশ অবিক্রীত পড়িয়া থাকা। দ্বিতীয়, জোর করিয়া ভারতের বাহিরে বহু বস্ত্র রপ্তানী করা। তৃতীয়, বস্ত্র বিতরণের সুবন্দোবস্তের নামে নিত্য নূতন স্কীম তৈরি; ফলে ক্রমাগত বণ্টন ব্যবস্থার অবনতি এবং গুদামে অযথা মাল আটক রাখা। চতুর্থ, সুতা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা হাতের তাঁতের সর্বনাশসাধন।

ভারতবর্ষে এই ভাবে তীব্র বস্ত্রাভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিবার পিছনে বৃহত্তর কোন অভিসন্ধি নাই ইহা মনে করা কঠিন। ভারতবর্ষের এই একটি মাত্র শিল্প বিলাতী মিল-মালিকদের তীব্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সরকারের সাহায্য ছাড়াই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। ভারতবাসী জনসাধারণও এই শিল্পটি দাঁড় করাইবার জন্য কম স্বার্থত্যাগ ও লাঞ্ছনা সহ্য করে নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের পর ধীরে ধীরে সমগ্র বস্ত্রশিল্পের উপর সরকারী বজ্রমুষ্টি সুদৃঢ় করিয়া কৃত্রিম উপায়ে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হইয়াছে। মিল-মালিকদের অর্থগৃধ্নুতার ষোল আনা প্রশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে অসঙ্গত ভাবে দাম বাড়াইতে দেওয়া হইয়াছে। মিল-মালিকদের উপর বিরক্ত হইয়া দেশবাসী স্বদেশীবস্ত্রের প্রতি মমতা হারাইলেই ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের আসল ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সস্তা বিলাতী কাপড় তখন ভারতের বাজার পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ছাইয়া ফেলিতে পারে। বর্ত্তমান মিল-মালিকেরা কল্পনার অতীত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, সমস্ত মিল উঠিয়া গেলেও ইহাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি কিছুই হইবে না, কিন্তু যে দেশবাসীর অর্থে ত্যাগে ও লাঞ্ছনায় এই সব মিলের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টি, পরম ক্ষতি হইবে তাহাদেরই। হায়দরী মিশনের বিলাতযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বস্ত্রের এই তীব্র দুর্ভিক্ষ কার্য্যকারণ সম্পর্ক-বিহীন ইহা মনে করিতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মিলগুলির কলকব্জা অকস্মাৎ গত কয়েক মাসে এমন ভাবে ক্ষয় পাইবার কথা নহে যাহাতে উৎপাদন কমিতে পারে। তুলার উৎপাদনও কমে নাই, তাঁতও লোপ পায় নাই।

এই যুদ্ধের মধ্যে বিলাতের তুলনায় আমেরিকার বস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বাড়িয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে প্ল্যাট সাহেবের নেতৃত্বে একটি মিশন আমেরিকায় বস্ত্র উৎপাদনের নূতন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। প্ল্যাট মিশন ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন যে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া আমেরিকার কাপড়ের কলের একজন শ্রমিক যত বস্ত্র উৎপন্ন করে, ল্যাঙ্কাশায়ার বা মাঞ্চেষ্টারের শ্রমিকের পক্ষে বর্ত্তমান যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহা করা অসম্ভব। সুতরাং ইঁহারা আমেরিকা হইতে নূতন যন্ত্র আনাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐসব যন্ত্র আনিবার কথাও কেহ বলেন নাই। বোম্বাইয়ের মিল-মালিকেরা এই সংবাদে খুশী হইয়াছেন, কারণ ইঁহারা তখন ল্যাঙ্কাশায়ারের বাতিল করা যন্ত্র সস্তা দরে কিনিয়া আপ-টু-ডেট হইতে পারিবেন। কিন্তু এই ভাবে আপ-টু-ডেট হইবার পূর্ব্বেই যদি বর্ত্তমান বস্ত্রাভাবের সুযোগে ল্যাঙ্কাশায়ার ভারতবর্ষে তাহার কাপড়ের লুপ্ত বাজার পুনরায় দখল করিয়া লইতে সমর্থ হয় তখন তাহাকে আবার হটাইয়া দেওয়া বিষম কষ্টকর ব্যাপার হইবে। "স্বদেশের পণ্য কিনে হও ধন্য" এই প্ল্যাকার্ড গলায় ঝুলাইয়া আসর জমাইবার চেষ্টা তখন সফল নাও হইতে পারে।

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের সম্মুখে যে ভয়ানক বিপদ আসিতেছে সে সম্বন্ধে মিল-মালিকদের যতখানি সাবধান হওয়া উচিত ছিল, বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়াও তাঁহারা তাহা হন নাই ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

অতীত দিন

শ্রীদীপ্তিলেখা মিত্র

হে মোর অতীত দিনগুলি,
তোমা লাগি চিত্ত মোর হয়েছে চঞ্চল।
শৈশবের খেলা ঘরে ঘরে
তোমারে চিনিয়াছিনু, অবোধের তরে
হাতে লয়ে ছন্দভরা বাঁশী সুমধুর,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে গুঞ্জরিত কি আনন্দ সুর।
কৈশোরের পথপানে পা বাড়ানু যেই,
কত নব নব সাথী, তুমি শুধু নেই।
চেয়ে দেখি ওড়ে দূরে তোমার অঞ্চল।

ওগো মোর শৈশবের দিন,
এত অসময়ে কেন নিদারুণ খেলা?
প্রথম প্রভাতে যত অসম্পূর্ণ কাজ,
সহসা কেমনে বল পূর্ণ করি আজ?
যে কোমল পুষ্পমালাখানি,
অর্দ্ধস্ফুট মালতীর কুঁড়িগুলি আনি
গেঁথেছিনু দিনে দিনে যতনের ভরে,
গেল ঝরে; তবু কেন ডাক বারে বারে?
জান নাকি বন্ধু মোর শেষ হ'ল বেলা!

সাহিত্যে মুসলমানের দান

শ্রীসুলতা কর

আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষে বাংলার সমাজ ও সাহিত্য জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ বিষাক্ত আবহাওয়া চিরকাল ছিল না। অতীতের গৌরবময় ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য দুই-ই গড়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দানে।

কোন্ সুদূর অতীত কাল থেকে মুসলমান সম্রাটেরা বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিয়ে আসছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়। যে রামায়ণ, মহাভারত প্রতি বাঙালী হিন্দুর একান্ত শ্রদ্ধার গ্রন্থ, মুসলমান সম্রাট্‌দের উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে আজ তাদের অস্তিত্ব বাংলাদেশ থেকে লোপ পেয়ে যেত।

বাংলা বিজয়ের পর যখন মুসলমান সম্রাটেরা এদেশে এসে বাস করতে লাগলেন তখন তাঁদের হিন্দুদের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ইত্যাদি জানবার জন্য কৌতূহল হ'ল। হিন্দু প্রজাদের উপর রামায়ণ, মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব লক্ষ্য করে তাঁরাই সর্ব্বপ্রথম হিন্দু পণ্ডিতদের রাজসভায় আহ্বান করে রাজকোষ থেকে বৃত্তি দিয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করাতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা কিন্তু বাংলা ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের বিরোধী হয়ে উঠলেন। তাঁরা কাশীদাস ও কৃত্তিবাসকে 'সর্ব্বনেশে' উপাধি দিলেন। যাঁরা বাংলা ভাষায় পুরাণের অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের রৌরব নরকে স্থান হবে বলে নির্দ্দেশ দিলেন। এসব সত্বেও মুসলমান সম্রাটেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে লাগলেন। সম্রাট্ নসীর খাঁ সর্ব্বপ্রথম হিন্দু পণ্ডিত আহ্বান করে বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করালেন। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি সম্রাট্ নসীর খাঁর প্রশংসা করে একটি পদে লিখেছেন—

"সে যে নসিরা শাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥"

সম্রাট্ হুসেন শাহ বহুকাল ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। বেহুলাকাব্য-রচয়িতা প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্ত এঁর প্রশংসা করে লিখেছেন—

"সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।"

হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ হিন্দুকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়ে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাভারতের অনুবাদ করালেন। তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ হিন্দুকবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করালেন।

বাংলার আর এক সম্রাট্ সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ হিন্দু পণ্ডিত মালাধর বসুকে দিয়ে ভাগবতের অনুবাদ করালেন। অনুবাদ শেষ হলে মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দিলেন।

কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে শুধু এইটুকুই মুসলমান সমাজের দান নয়। আমরা দেখতে পাই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু মুসলমান লেখক ও কবির রচনায় সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ও উঠছে।

প্রাচীন কালে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীকবিরা কতকগুলি সুন্দর পল্লীগাথা রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে অনেকগুলিই মুসলমান কবিদের রচনা। শিক্ষিত কবির অলঙ্কার-নিপুণতা, বাক্যাড়ম্বর, শব্দ-ঝঙ্কার নাই বটে, কিন্তু এই কাব্যগুলিতে সরল ভাষায় ভাবের গভীরতা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা হয় না।

এ কবিতাগুলির মধ্যে আমরা আরও দেখতে পাই যে সে-যুগে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ দূরে থাক, প্রীতির সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ ছিল। মুসলমান কবি তাঁর কাব্যে কালিদাস, গজদানী ও মামিনা খাতুনের প্রেম বর্ণনা করেছেন। একটি গাথায় ব্রাহ্মণ জয়চন্দ্র মুসলমানীর, আর একটিতে মুসলমান সুরৎজামাল ব্রাহ্মণ রাজকুমারী অধুয়ার প্রেমাকর্ষণ করেছেন।

মনসুর বাইতি রচিত 'দেওয়ান মদিনা' কাব্যটিতে কবির অসাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও করুণরস-সৃষ্টির নিপুণতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

মদিনা শৈশব থেকে দুলালের অনুরাগিণী। দুজনে একত্রে খেলাধুলা করে বড় হয়েছে। মদিনার বুলবুলির বাচ্চা উড়ে গেলে দুলাল তাকে ধরে আনত। আমের চারা পুঁতে দু'জনে তাতে জল ঢালত। তার পরে যৌবন কালে পরিণীত হয়ে দু'জনে কত দীর্ঘকাল গভীর ভালবাসায় কাটিয়ে দিল। হঠাৎ এক দিন বিনামেঘে বজ্রপাতের মত দুলাল কি এক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তালাকনামা দিয়ে মদিনাকে ত্যাগ করে চলে গেল। মদিনা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করছে না যে দুলাল তাকে সত্যসত্যই ছেড়ে গেছে। তালাকনামা পড়ে মদিনা বলছে—

"আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে॥
দুলালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে।
মদিনারে ভালবাসে যেবা জান পরাণে॥
তারে ছাড়িয়া দুলাল রইতে না পারিব।
কতদিন পরে খসম নির্চয় আসিব॥"

তারপর নিদারুণ উদ্বেগ বহন করে বিরহিণী মদিনা দীর্ঘদিন ধরে প্রেমাস্পদের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করছে। এমনি করে ছয় মাস কেটে গেল, মদিনা ধৈর্য্য রাখতে না পেরে পুত্র সুরুযকে দুলালের খোঁজে পাঠাল। সুরুয ফিরে এসে বলল যে দুলাল সত্যই তাদের ত্যাগ করেছে। মদিনা আর সহ্য করতে পারল না—

"মদিনা কান্দয়ে—আল্লা কি লেখ্‌ছ কপালে।
বনের পংখী অইয়া যেমন উইড়া গেলে চইলে॥
পরাণের পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া দিল্ রহিলা একেলা॥"

শোকে অধীর হয়ে মদিনা প্রাণত্যাগ করল। তারপর

এক দিন দুলালের মোহ কেটে গেল। ঘরে ফিরে এসে ব্যাকুল হয়ে সে মদিনাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু তখন মদিনা কোথায়! শেষের দুঃখের করুণ বর্ণনা কবির লেখনীতে সুন্দর হয়ে ফুটেছে।

দুলাল জিগায় "সুরুয মদিনা কোথায়।"
চউখে হাত দিয়া সুরুষ কয়বর দেখায়॥"

শুধু এই একটি কাব্য নয় "সুরৎজামাল ও অধুয়া", "দেওয়ান ইশা খাঁ" "মাণিকতারা" ইত্যাদি বহু প্রাচীন পল্লীগাথাতে মুসলমান কবিদের কাব্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

চৈতন্যযুগে যখন সারা বাংলাদেশ কীর্ত্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে তখন হিন্দু পদকর্ত্তাদের পাশাপাশি বসে পদ রচনা করেছেন আকবর শাহ আলী, সেখ জালাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা, করম আলি, নসির মামুদ প্রভৃতি এগার জন মুসলমান বৈষ্ণব কবি। তাঁদের অনেকের রচিত পদ মাধুর্য্য ও কোমলতায় অতুলনীয়। করম আলির বিরহের পদ সকল রসজ্ঞ বৈষ্ণবের মন মুগ্ধ করবে।

কীর্ত্তন গান যেমন বাঙালীর একান্ত আপনার, বাউল গানও তেমনই। বাংলার মুসলমান বাউলরা প্রাণের দরদ দিয়ে যে-সব বাউল গান বেঁধেছেন হিন্দু-মুসলমান সবারই তাহা অতি প্রিয়। বাংলার মাঠে, ঘাটে কান পাতলে আজও শোনা যাবে মুসলমান বাউলদের বাঁধা এইসব গান।

"ক্ষেপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়?
আপন ঘর না বুঝে বাহির খুঁজে
পড়্‌বি ধাঁধায়।
* * *
আপনারে আপনি না চিনিলে ঘুরবি কত ভুবনে?
লালন বলে অন্তিম কালে নাই রে উপায়॥"

কিংবা

"খাঁচার মাঝে অচিন্ পাখী কম্‌নে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখীর পায়॥"

পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান কবি আলোয়ালের 'পদ্মাবতী' প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য। দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর-রাজ্ঞী পদ্মিনীর রূপতৃষ্ণায় অধীর হয়ে যে ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়েছিলেন তাই অবলম্বন করে এই কাব্য রচিত হয়েছে। পদ্মিনীর বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় কবি লিখেছেন:—

"আড় আঁখি বক্র দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥
চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়।
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়॥"

পদ্মিনীর রূপ বর্ণনা করে লিখেছেন:—

"কুটিল কবরী কুসুম মাঝে।
তারকা মণ্ডল জলদ সাজে॥
শশিকলা প্রায় সিন্দুর ভালে।
বেড়ি বিধুমুখ অলক জালে॥"

এই পদগুলি পড়লে রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবিদের শ্রেষ্ঠ পদগুলির কথা মনে পড়ে যায়।

কোথাও বা শব্দসম্পদে অতুলনীয় পদ পড়তে পড়তে জয়দেবের কথা মনে পড়ে।

যেমন—

"বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।
বরবালা দুই ইন্দু, স্রবে যেন সুধাবিন্দু॥
মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে।"

কখনও বা বিদ্যাপতিকে মনে পড়ে:—

"চলিল কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জন
গমনশোভিতা।"

কবি আলোয়াল 'ছয়ফুল মুল্লুক' 'বদিউজ্জমাল' ইত্যাদি আরও কতকগুলি কাব্য রচনা করেছেন। 'পদ্মাবতী' যদিও তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য তথাপি এ কাব্যগুলিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। এ ছাড়া তাঁর রচিত কতকগুলি, রসমধুর বৈষ্ণব পদও আছে। যেমন:—

"ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি।
ঘরের ঘরণী, জগত মোহিনী, প্রত্যূষে যমুনায় গেলি॥
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি॥"

আলোয়ালের পর বঙ্গসাহিত্যের আসর কবিওয়ালাদের মুখে মুখে বাঁধা গানে মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই আসরে হিন্দু কবিদের পাশে বসে মুসলমান কবিরাও গান গেয়েছেন। সৈয়দ জাফর খাঁ ও মূর্জা হুসেন আলির নাম কবির আসরে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। কালীভক্ত মূর্জা হুসেন আলীর ভক্তির আবেগপূত গান—

"যারে শমন এবার ফিরি, এস না মোর আঙ্গিনাতে।
দোহাই লাগে ত্রিপুরারি, যদি কর জোর জবরি
সামনে আছে জজ কাছারি।
আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাস
তালুকে বসত করি।
বলে মূর্জা হুসেন আলি যা করে মা জয়কালী।
পুণ্যের ঘর শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নীলাম করি॥"

—এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়ে পল্লীবাসীদের অন্তরে ভক্তির উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তোলে।

বর্ত্তমান যুগেও ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে মুসলমান কবিদের দান সামান্য নয়। কবি নজরুল ইসলামের অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি বাংলার তরুণ চিত্তে যে তেজোদৃপ্ত ভাব জাগিয়ে তুলেছে, তাতে নজরুলের বিদ্রোহী কবি নাম সার্থক হয়েছে। এ যুগের পরাধীন আত্মবিশ্বাসহীন বাংলার তরুণকে ডেকে তিনি শুনিয়েছেন তেজের মন্ত্র:—

"বল বীর—
চির উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রির।

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে, রাজ রাজটীকা
দীপ্ত জয়শ্রীর।"

বাংলা-সাহিত্যে করুণ কোমল সুর চিরকাল প্রাধান্য পেয়েছে। কান্ত কোমল পদ-রচনায় বাঙালীর তুলনা নাই। কিন্তু অন্য জাতির সাহিত্যে যে বীরগাথা, যে যুদ্ধের গানের দৃপ্ত তেজোময় সুর শোনা যায় বাংলার কাব্যক্ষেত্রে তার অভাব চিরকাল ছিল। কাজী নজরুল সর্ব্বপ্রথম বাংলার কাব্যক্ষেত্রে রুদ্রের বিষাণ বাজিয়েছেন। আমাদের কাব্যক্ষেত্রে কোমল-কঠোরের সমাবেশ হয়েছে।

সৈন্যদল তালে তালে কুচ করে চলেছে, নজরুল গান বেঁধেছেন—

"চল্ চল্ চল্।
উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্।"

অসহায় নির্যাতিত শ্রমিকদের মুখে গান দিয়েছেন—

"ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।"

নজরুলের পর এ যুগে কবি জসীমউদ্দিন, বন্দে আলী মিঞা, প্রভৃতি কয়েকজন কবির পল্লীগীতিও সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে। এঁদের রচিত পল্লীগাথায় নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতাশূন্য বাংলা মায়ের খাঁটি প্রাণের সুর শুনতে পাওয়া যায়।

'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' কবি জসীমউদ্দিনের সুন্দর কাব্য-রচনা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দুটি ডাগর চোখ, পল্লী-রাখালের চোখজুড়ান কালো রূপ, দুটি গাঁয়ের মন-ভোলানো রূপ, কত ছবিই না তিনি এঁকেছেন।

বর্ষা নামছে না, গ্রামের কিশোরী মেয়েরা বার মাসের বার মেঘের আদরের নাম ধরে আবাহন গান গাইছে। চাষীদের দেওয়া মেঘগুলির নাম কত সুন্দর।

" 'কালো মেঘা' নামো, নামো, 'ফুল তোলা মেঘ'
নামো,
'ধুলট মেঘা' 'তুলট মেঘা' তোমরা সবে নামো।
'কানা মেঘা' টলমল বারো মেঘার ভাই
আরও ফুটিক ঢলক দিলে চীনার ভাত খাই।"

বাংলার দুটি গাঁয়ের নয়ন-ভুলানো রূপের কেমন কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন।—

"এ গাঁও চেয়ে ও গাঁর দিকে, ও গাঁও এ গাঁর পানে,
কতদিন যে কাটিবে এমন, কেই-বা তাহা জানে।
মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল কুমুদী মেলছে শতদল।"

এই দুটি গ্রামের তরুণ-তরুণীর প্রেমলীলা বর্ণনা করে লিখেছেন:—

"এ গাঁর চাষী নিঝুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে
ওই না গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে।
এ গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে রয় সে পেতে কান।"

বন্দে আলী মিঞার 'ময়নামতীর চর' কাব্য গ্রন্থখানি কাব্য-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। কবির অন্তরের দরদী স্পর্শে ময়নামতীর চরের প্রতিটি দৃশ্য অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে।

পদ্মাতীরের পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র পল্লীবাসীদের সুখদুঃখ-ভরা জীবনযাত্রা, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্যের নিখুঁত বর্ণনা কবি করেছেন। জ্যোৎস্না-মাখা ময়নামতীর চরের রূপ দেখে মনে হয়।—

"এপার হইতে চাহিয়া ওপারে মাঝরাতে মনে হয়
জোসনা সায়রে ময়নামতী সে হেসে খেলে মেতে রয়;
খোঁপায় জ্বলিচে আগুনের ফুল—আঁচলে জোনাকী মেলা
নিশুতি রাতের কূলে বসি আজ খেলিচে বালুর খেলা।"

কোনদিন দুপুরে হয়ত ময়নামতীর চর মেঘের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, তখন—

"দুপুরে যেদিন নেমেচে সন্ধ্যা—মেঘেতে ঢেকেচে বেলা,
গাঁয়ের মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসিতে না করে হেলা।"

এমনি দিনে—

"কঞ্চির বেড়া ধরিয়া বধূরা প্রিয়-পথ চেয়ে রয়।
দোকানীর বৌ নদী পানে চায় কোথা গেছে নেয়ে তার,
এমন বাদলে কোন্ হাটে তার বিকাইবে সম্ভার—
জাল বোনা ভুলি জেলের যুবতী বিরহ দিবস গণে
কোথা ধরে মাছ জেলে যে তাহার এমন উতলা ক্ষণে।"

এই ভাবে বাংলা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে অতি প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানের মিলিত দানে সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাংলা-সাহিত্যের ভিতর থেকে আমরা একথাও জানতে পারি যে বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই।

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অন্তরের প্রীতির উপর রচিত হয়েছে এদেশের সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

আলোচনা

"প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন"

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সবিনয় নিবেদন,

গত মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আপনারা দিল্লী অধিবেশনের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন যে তাহা "গবর্ণমেণ্টের প্রভাবাধীনে প্রবাসী সরকারী কর্ম্মচারী সম্মেলনে পরিণত" হইয়াছিল। এই অযথা ভ্রমাত্মক বর্ণনার প্রতিবাদ করিয়া আমরা জানাইতেছি যে ১৩৫০ সনের দিল্লী অধিবেশনে গবর্ণমেণ্টের কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল না এবং থাকা সম্ভব ছিল না। আপনাদের নিকট প্রেরিত কার্য্যবিবরণী হইতে দেখিতে পাইবেন যে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য ও চাঁদাদাতাগণ দিল্লীরই সাধারণ অধিবাসী এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন আর্থিক বা অন্যান্য সাহায্য দিল্লী অধিবেশন লয় নাই। দিল্লীর বাঙালীগণ বহুলত সরকারী কর্ম্মচারী; এখানকার সাহিত্যিকগণও, যাহাদের প্রবন্ধাদি সময় সময় প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, প্রায় সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী। স্বাভাবতঃ তাঁহারাই স্থানীয় বে-সরকারী বাঙালী অধিবাসীদিগের সহিত সমান উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। আমি নিজে ছাত্র এবং সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। আমার ন্যায় বহু ব্যক্তি ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যপ্রেমিক বা সাহিত্যিক তাঁহারাই সম্মেলনের কর্ম্মী ছিলেন। সাহিত্যে জাতিভেদ বা দলাদলি নাই ইহা আপনারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে দিল্লীতে আমরা এই অধিবেশনের আয়োজন না করিলে সম্মেলন বন্ধ থাকিত এবং সম্মেলনের মূল সভা ১৯৪৩এর দুর্ব্বৎসরে দেশের বহু স্থানে সভা আমন্ত্রণ করাইতে ব্যর্থকাম হইয়া মাত্র ৮ বৎসর আগে দিল্লীতে অধিবেশন হওয়া সত্ত্বেও আমাদিগকে অধিবেশনের আয়োজন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমাদের সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ ব্যয়ের উদ্বৃত্ত প্রায় সমস্ত অর্থই সম্মেলনের মূল সভাকে অযাচিত ভাবে পাঠাইয়া দিয়াছি। অর্থাভাবক্লিষ্ট মূল সভা ইতিপূর্ব্বে কোন স্থানে এইরূপ সাহায্য বা উৎসাহ পায় নাই।

সরকারী কর্ম্মচারিগণ সাহিত্যপ্রীতি লইয়া সম্মেলনে যোগ দিলে যদি ইহা রাহুগ্রস্ত হয় তাহা হইলে এই দুর্দ্দশা সম্মেলনের চিরকালই আছে। ১৯৩৭এর দিল্লী-অধিবেশনে গত অধিবেশনের ন্যায়ই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও প্রধান কর্ম্মসচিব ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী এবং স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ১৯৪০-এর জামসেদপুর অধিবেশনে প্রধান সভাপতি ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি ছিলেন আই-সি-এস কর্ম্মচারী এবং সেখানেও রামানন্দবাবু একটি শাখা-সভাপতি ছিলেন। তখন কিন্তু আপনারা এ কথা তুলেন নাই। বর্ত্তমান কানপুরের অধিবেশনেও প্রধান কর্ম্মসচিব, অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি, দুইজন শাখা-সভাপতি ও বহু কর্ম্মী সরকারী কর্ম্মচারী থাকা সত্ত্বেও ইহা কি করিয়া "রাহুমুক্ত" হইল তাহা বুঝিলাম না। সম্মেলনের মূল সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী স্বর্গত সর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় ইহা সকলেই জানেন। ইহার বর্ত্তমান স্থায়ী কর্ম্মিগণের মধ্যে অনেকেই বহু প্রবাসী বাঙালীর ন্যায় সরকারী কর্ম্মচারী।

বাংলা-সাহিত্য মুসলমান যুগ হইতে রাজসরকারের উৎসাহে পুষ্ট হইয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বর্ত্তমান যুগেও বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত ও নবীন সেন হইতে অধুনা অন্নদাশঙ্কর প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমিক বাংলা ভাষার সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সাহিত্যসৃষ্টিই আমাদের নিকট প্রধান দান বলিয়া গ্রহণীয়, তাঁহাদের রাজকার্য্য সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে গৌণ। কিন্তু সেজন্য বাঙালী কখনও বাংলা-সাহিত্যকে রাহুগ্রস্ত বলিয়া বর্ণনা করে নাই।

আমাদের এই চিঠি প্রকাশ করিয়া গত দিল্লী-অধিবেশন সম্বন্ধে ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে সুখী হইব। অধিবেশনের সাহিত্যিক সাফল্যের বিচার সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি যথাসময়ে করিয়াছিল। তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ইতি

প্রিয়রঞ্জন সেন,
যুগ্ম-সম্পাদক।



শ্রীমৃন্ময়ী রায়

মহিলা-সংবাদ

শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হইয়াছেন। তিনি কলিকাতায় জিতেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল শিশু-শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার অধ্যক্ষতা কার্য্যেও তিনি প্রতিষ্ঠা অবধি নিয়োজিত রহিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া কয়েক বৎসর শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন এবং সেখানকার ও ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষায়তনের শিক্ষাদান কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। সেনেটের সদস্য নিয়োগে এক জন সত্যকার শিক্ষাব্রতী সম্মানিত হইলেন।

সনাতনী

"যুদ্ধ তো হয়ে এলো" বলিতে বলিতে মুখুজ্যেমশায় চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় আসিয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে আসর খুব জমিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের ২৫ হইতে ৬০ বৎসরের সকলেই এই আসরের সভ্য। মুখুজ্যে মশায়ের মুখ হইতে কথা কয়টি বাহির হইতে না হইতেই চারিদিক হইতে এক সঙ্গে প্রশ্ন হইল—"আজকের কি খবর মুখুজ্যেমশায় ?" প্রৌঢ় তারিণীচরণ কোন দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, যেন কোন প্রশ্নই শুনেন নাই, নিজের নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে জাঁকিয়া বসিলেন এবং পার্শ্বস্থিত গড়গড়ায় জোরে বার কয়েক টান দিয়া আপনার কথারই অনুবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—"তা তো জানাই আছে। আখেরিতে একেবারে শূন্য। তা' হবেই তো।" সনৎকুমার বলিয়া উঠিল—"কথাটি ঠিক হ'ল না মুখুজ্যেমশায়। রাজনীতির দিক থেকে জার্ম্মানী একটার পর একটা মারাত্মক ভুল করে গেছে এবং তারই ফলভোগ. অনিবার্য্য। দেখুন না কেন —পর পর জয়ের উল্লাসে অনাক্রমণ-চুক্তি অগ্রাহ্য করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাশিয়ার উপরে এবং এই বোধ হয় তার সব সেরা ভুল। তারপর···।" মুখুজ্যেমহাশয় একটু উষ্ণ হইয়াই বলিলেন—"তোমাদের অত সব কলা-কৌশল, রাজনীতির চালাকি আমরা বুঝিনে বাপু! অদৃষ্ট বলে একটা জিনিষ আছে তো হে—না তাও মান না। আজকাল শুনতে পাওয়া যায়—ভগবানকে নাকি তোমরা অপাংক্তেয় করেছ! আচ্ছা বল ত হে, যে-নৌকাটা সারা পথ বেয়ে এসে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ডাঙার কাছে এসে ডুবে গেল! কেন ? একে কি বলতে চাও। সেবারও ত দেখলুম হে খোদ কর্ত্তারা পর্য্যন্ত ভয়ে থর থর কম্পমান। আমি বাবা ঠিক আছি।" তারিণীচরণের অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিস্ফারিত হইল। সনৎ কি যেন বলিতে যাইতেছিল এমন সময় এক সুদর্শন যুবা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই সনৎ যুবাকে জড়াইয়া ধরিল এবং প্রশ্নে প্রশ্নে তাহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। "বিমান, তুই কবে এলি ?..." বিমান একে একে সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া বলিল—"আচ্ছা সে ত হ'ল, কিন্তু এখনও আসর জমিয়ে বসে আছিস যে ? আজকের বিশেষ দিনটির কথা ত মনে নিশ্চয় থাকা উচিত!" সনৎ বলিল, আছে বৈকি—এখানে একটু জমে গেছলুম মুখুজ্যেমশায়ের সঙ্গে। তা চল্। কি মুখুজ্যেমশায় চিনতে পারছেন না—ও-গাঁয়ের 'চৌধুরীদের ছেলে, আমাদের বিমান। আপনারা চলুন সবাই সনাতনীর প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসবে। সকলেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নদীতীরের পথ ধরিল।

পাশাপাশি দুই গ্রামের মধ্যপথে নদীর দিকে মুখ করিয়া যে বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীটি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ফটকের গায়ে লেখা রহিয়াছে "সনাতনী"। সনাতনী প্রতিষ্ঠার মূলে এক মর্ম্মান্তিক করুণ ইতিহাস নিহিত আছে। সে কথা হয়ত আজ আর কেহ স্মরণও করে না। বৃদ্ধ রমাপতি হালদার জীবনের সায়াহ্নে প্রচুর অর্থ ও তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী সনাতনকে লইয়া এইখানেই ঘর বাঁধিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাসা বাঁধিতে না বাঁধিতেই দুরন্ত ঝড়ে উড়িয়া গেল। অতিশয় স্বল্পভাষী সদাহাস্যমুখ বৃদ্ধ একদা যেমন সকলের অজ্ঞাতে এই গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন তেমনই ইহজীবনের সকল মমতা এখানেই উজাড় করিয়া দিয়া এক রাত্রির অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই জানিল না!

সনৎরা যখন আসিয়া পৌছিল তখন সভা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে এক বিরাট্ জনতা যেন গ্রাম দুইটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যাওয়া-আসার বিরাম নাই। এমনটি সনৎ আশা করে নাই। ইতিমধ্যে কয়েক জনের বক্তৃতা হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"বিমান, এবার তোমায় কিছু বলতে হবে।"

"আমাকে ?"

"হাঁ।"

বিমান ধীরে ধীরে সভাপতির পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।—

"আমি ভাবছি আজকের দিনে আপনাদের কাছে আমার কি বলবার আছে। যে সর্ব্বহারা মানুষটি আকণ্ঠ গরল পান করে সুধার ভাণ্ড আমাদের অধরে তুলে দিয়ে গেলেন তাঁকেই সর্ব্বাগ্রে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা দুঃস্বপ্নের যে প্রহর যাপন করেছি, যার চরমতম লাঞ্ছনা তিনি ভোগ করে গেছেন তার জন্য অদৃষ্ট বা বিধাতাকে দায়ী করলে চলবে না—মূলে রয়েছে অতিশয় বাস্তব সত্য। অস্বীকারের উপায় নেই। পুষ্টিবিদ্‌রা বলছেন, ভারতবাসী বিশেষ করে আমরা বাঙ্গালী যে খাদ্য নিত্য গ্রহণ করি তাতে ভিটামিন বি বা খাদ্যপ্রাণ 'খ' যথেষ্ট নেই বলেই আমরা শতকরা ৯৯ জন ভুগি স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে, ক্ষুধামান্দ্য ও পুষ্টিহীনতায় এবং তারই ফলে দেখা দেয় বেরিবেরি যার নিষ্ঠুর কবল থেকে সেদিন আমরা মুক্ত করতে পারিনি আমাদের বহু প্রিয়জনকে, সনাতনকে। তাই আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ 'খ'-এর প্রয়োজন এবং তার একমাত্র সহজ উপায় **'বাই-ভিটা-বি'** সেবন, যার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়—কারণ আমি ডাক্তার।"

বিজ্ঞাপন

পুস্তক-পরিচয়

রামমোহন-গ্রন্থাবলী—(৩য় খণ্ড—সহমরণ)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৵০।

ঝাড়গ্রামরাজ-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত এই গ্রন্থাবলী সাহিত্য-পরিষৎ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলীর একখানি সুষ্ঠু, নির্ভুল এবং প্রামাণিক সংস্করণের প্রয়োজন ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া জ্ঞানান্বেষী পাঠকবর্গের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থাবলীর এই খণ্ডখানি সহমরণ-বিষয়ক। তৎসাময়িক মূল গ্রন্থগুলির সহিত মিলাইয়া ইহা সম্পাদিত হইয়াছে। সহমরণ বিষয়ে সেকালে যে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল তৎসম্পর্কিত সকল কথা জানিতে পাঠকের কৌতূহল হয়। ১৮.৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন "সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ" প্রকাশ করেন। ইহার উত্তর স্বরূপ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে কাশীনাথ তর্কবাগীশ রচিত "বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ" প্রচারিত হয়। প্রত্যুত্তরে ঐ বৎসরের শেষ ভাগে রামমোহনের "প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ" প্রকাশিত হয়। পরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বিপ্র' ও 'মুগ্ধবোধ-ছাত্র' নামে দুই ব্যক্তির পত্রের উত্তরে লিখিত "সহমরণ বিষয়" নামক আর একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উত্তর-প্রত্যুত্তর-সমন্বিত এই সমস্ত পুস্তিকাই এই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলীর সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

বাংলার মানস-আকাশ রবীন্দ্র-প্রভায় সমুজ্জ্বল; আজও আছে, শত বর্ষ পরেও থাকিবে। শুধু কাব্যই নয় কবিও আমাদের কৌতূহলের বস্তু। তিনি যাহা বলিয়াছেন, যাহা করিয়াছেন, যাহা গড়িয়াছেন, তাঁহার বাক্য, তাঁহার কার্য্য, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার সৃষ্টি—এ সকলই জানিবার জন্য আমাদের মন উৎসুক হইয়া থাকে। তাঁহার বিষয় শুনিতে এবং তাঁহার কথা বলিতে আমরা আনন্দ পাই। শুধু কাব্যে এবং কলায়, শুধু সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে তাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই, জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাহা বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। শান্তিনিকেতন তাঁহার বাস্তব সৃষ্টি। বিশ্বভারতীর দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারি রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি এবং কর্ম্মী। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "এ বই শান্তিনিকেতনের ইতিহাস নয়। ইহা আমার মনের উপর শান্তিনিকেতনের ছাপ।...যদি ইহার প্রকৃত নায়ক কেহ থাকেন তবে তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ; আর তাহার সঙ্গে আছে—বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ শান্তিনিকেতনের মাঠে অবারিত।" শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সম্পূর্ণ ছাত্রজীবন—'জীবনের সতরো বছর কাল'—বোলপুরেই কাটিয়াছে। তাঁহার বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের সমস্ত স্মৃতিই রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। "আমরা রবীন্দ্রনাথের যে সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম পরবর্ত্তী কালের ছেলেরা তাহা পায় নাই।" তিনি রবীন্দ্রনাথকে দুই কালেই দেখিয়াছেন, নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যখন শুধু বাংলার কবি, আর তার পর যখন তিনি জগতের কবি। "সেবার পূজার ছুটির পরে সন্ধ্যাবেলার ট্রেনে আশ্রমে পৌঁছিয়াছি। ছুটিতে করণীয় হোম-টাস্কের কিছুই হয় নাই। মনে হইল এক রাত্রির মধ্যে একটা কিছু ঘটিয়া পরের দিন যুগান্তর ঘটিতে পারে না!...এমন সময় অজিত চক্রবর্ত্তী রান্নাঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—গুরুদেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন!" কর্ত্তব্যবোধে নয়,

বলিতে আনন্দ পাইয়াছেন বলিয়া লেখক নিজের শিক্ষানিকেতনের কথা বলিয়াছেন। আনন্দ ও অনুভূতির মধ্য দিয়া কথাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া পুস্তকখানি এত আকর্ষণের বস্তু এবং স্মৃতিরঞ্জিত বলিয়া ইহা এমন বর্ণাঢ্য হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন, অজিত চক্রবর্ত্তী ও সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতির তিনি যে ছবি আঁকিয়াছেন আহা আমাদের মনকে কৌতূহলী করে। মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ হাস্য ও মিষ্ট পরিহাস লেখাটিকে লীলায়িত করিয়াছে। সুন্দর গদ্যে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রমথনাথ বিশী যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পাঠকের নিকট একান্ত উপভোগ্য হইবে। শান্তিনিকেতনের শাল-বীথিকা প্রভৃতি অনেকগুলি ছবি বইখানির শ্রী বর্দ্ধন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে—শ্রীরেণু মিত্র। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এখানি সমালোচনা-গ্রন্থ। গ্রন্থে ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তীর একটি সুলিখিত ভূমিকা আছে। আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য বহুবিস্তৃত নয়। গল্প উপন্যাস ও কাব্য রচনায় নিজের শক্তি নিয়োগ না করিয়া লেখিকা এইরূপ কার্য্যে হাত দিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার ভাবিবার ক্ষমতা আছে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্ব আছে। নারী-মানসের আলোকপাতে উপন্যাসের চরিত্রগুলির বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসখানিতে রবীন্দ্রনাথ এক বৃহৎ সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন। এ সমস্যা চিরকালীন, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার জটিলতা বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যাহার সহিত আমাদের নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধ তাহাকে সাধারণতঃ আমরা ঘরে এক রূপে পাই, সে পাওয়া আংশিক; বাহিরের সংসারের মধ্য দিয়া তাহাকে আর এক রূপে লাভ করি। এই দুই-রূপে পাওয়ার মধ্য দিয়া আমাদের পাওয়া সম্পূর্ণ হয়। ঘরের পাওয়ার মধ্যে বাধা-বিঘ্ন অল্প, সুতরাং দয়িত সেখানে কতকটা অনায়াসলভ্য। কিন্তু বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে সে কখনও বহু দূরে সরিয়া যায়, কখনও কাছে আসে, এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়া বাঞ্ছিত দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। আদর্শবাদী নিখিলেশ বিমলাকে দুই রূপেই পাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া তাহাকে নানা বেদনার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। আর একটি দেশ-গত সমস্যাও উপন্যাসের সঙ্গে জড়াইয়া আছে। ন্যায়-অন্যায়-বিচারহীন দুর্দ্দমনীয়তা এবং উদ্দাম উচ্ছ্বাস, না—কঠোর নিষ্ঠা এবং শান্ত তপস্যার মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে? লেখিকার মতে স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্যে জীবন সুসম্পূর্ণ। কথাটা ঠিক, কিন্তু স্থিতি ও গতির অর্থ তিনি একটু ব্যাপক করিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, 'নিখিলেশ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্থিতি-প্রধান', —কেননা 'সে আদর্শবাদী'। আদর্শের দিকে গতিই কি জীবনকে পরিণতি দান করে না? তাহাই কি জীবনের অভিব্যক্তি নয়? বিমলা নদীর মত উচ্ছল এবং আবেগপ্রধান, সন্দীপ ঝড়ের মত উচ্ছ্বাসময় এবং দুর্ব্বার, নিখিলেশ সাগরের মত গভীর এবং গম্ভীর। গম্ভীরতা কখনও কখনও প্রকাশহীন হইতে পারে কিন্তু সকল সময়ে তাহা গতির অভাব সূচিত করে না। শুধু দার্শনিক মন লইয়া তত্ত্বের দিক দিয়া লেখিকা রস-সৃষ্টির আলোচনা করেন নাই; এই অপূর্ব্ব উপন্যাসখানিকে তিনি নানা ভাবে দেখিয়াছেন এবং ইহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশভঙ্গী পাঠকের চিত্তে আনন্দের সঞ্চার করিবে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যসাধক-চরিতমালা-৪৮)। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

রাজকৃষ্ণ-মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪৫ সালে, মৃত্যু হয় ১৮৮৬ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রাজকৃষ্ণকে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত বলিলে যথেষ্ট হয় না, বাংলা গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব অল্প নহে। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র

লেখক এবং বঙ্কিমের বন্ধু ছিলেন। "যৌবনোদ্যান," "মিত্র বিলাপ." "কাব্য-কলাপ", "মেঘদূত (পদ্যানুবাদ)" ও "কবিতা মালা" তাঁহার পদ্য রচনা। "রাজবালা" ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা, ইহা তাঁহার প্রথম গদ্য রচনা। "প্রথম শিক্ষা বীজগণিত"ও তাঁহারই রচিত। তাঁহার "নানা প্রবন্ধ" এবং নানাবিধ ইংরেজী রচনাও আছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস" সমালোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন, "যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস আর নাই।"

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথির বিবরণ প্রথম ভাগ। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সংকলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় পরিষদের সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পূর্বগ্রন্থে অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে, পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বাংলা পুথির মধ্যে ১৫৫৩ খানির বা প্রায় অর্ধাংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুথিগুলি বিষয় ও রচয়িতার নামানুসারে সজ্জিত। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত—এই তিন প্রধান বিভাগের পুথি এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। বিবরণে পুথির নাম, বিষয়সংখ্যা, ক্রমিকসংখ্যা, রচয়িতার নাম, পত্রসংখ্যা, লিপিকাল ও লিপিস্থান পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। কোনও পুথি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু থাকিলে তাহা পাদটীকায় নির্দেশ করা হইয়াছে। কোনও পুথিসম্বন্ধে অন্যত্র কোথাও কিছু আলোচনা হইয়া থাকিলে তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। ভূমিকার মধ্যেও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। মোটের উপর, যাঁহারা প্রাচীন পুথি লইয়া কাজ করেন এই গ্রন্থ তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

ব.

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ— রেজাউল করিম। আনন্দময়ী বুক ডিপো, ৯১ বি, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তা, তিনি মুসলমান-বিদ্বেষী ;—এই ধরণের অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল অহিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীলদের মধ্যেও কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, প্রবন্ধ রচনায় অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ফুটিয়া উঠিলেও রসসৃষ্টিতে অর্থাৎ অনুভূতির ক্ষেত্রে তিনি ততটা উদার হইতে পারেন নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে চিন্তাশীল লেখক এই সকল ভ্রান্ত মতবাদ শুধু খণ্ডনই করেন নাই, নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া প্রভূত যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সত্য পরিচয় আবিষ্কারেরও চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই সাধু চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে।" বাংলার কৃষকগণের মধ্যে শতকরা সত্তর জন মুসলমান। বঙ্কিমচন্দ্র দরদী বন্ধুর মত কৃষককুলের দুঃখদুর্দশার কথা বলিয়া গিয়াছেন। সঙ্কীর্ণমনা ও মুসলমানবিদ্বেষী হইলে তিনি তাহা কিছুতেই পারিতেন না। হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য ব্যতীত বাংলার প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব এই কথা যিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে ভ্রাতৃদ্রোহিতার প্রশ্রয় দেওয়া কি সম্ভব ছিল? এই বিমূঢ় প্রশ্নের সার্থক উত্তর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ'। গ্রন্থখানির 'পরিশিষ্ট' অংশে কাজী আবদুল ওদুদ ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের দুইটি প্রবন্ধ [যথাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র ও সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র] সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার মূল্য সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। একসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিন জন মুসলমান-চিন্তানায়কের বক্তব্য জানিতে পারিয়া পাঠকসমাজ আনন্দিত, আলোকিত ও উপকৃত হইবেন। গ্রন্থখানির একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন স্যর যদুনাথ সরকার। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হউক, ইংরেজী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ভারতময় পঠিত হউক। তবেই সত্যের জয় হইবে।" সত্য সত্যই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

পিশাচ—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। মিত্রালয়, ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর পরিচয় চিত্রানুরাগীর কাছে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লেখনী প্রয়োগে তাঁহার দক্ষতার কথা এই উপন্যাসের মারফতে জানা গেল। তুলির টানে এবং কলমের আঁচড়ে যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন—তাহাতে পিশাচের পৌরুষব্যঞ্জনাময় মূর্ত্তিটি চিনিতে ভুল হয় না। একথাও সত্য, এই চরিত্রকে ফুটাইতে নীতি-সঙ্কোচে কোথাও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। অকুতোভয়ে শেষ পর্য্যন্ত ছবিটিতে রং ফলাইয়াছেন। ভূগর্ভস্থ রহস্যময় রাজপ্রাসাদ, হিংস্র সর্প-ব্যাঘ্র-বরাহ-নিষেবিত ভয়াল বনভূমি এবং তাহার সঙ্গে সমতা রাখিয়া মর্য্যাদা-গর্ব্ব-লাম্পট্য-ক্ষমতা-অধিকারী এক অদ্ভুত মানুষ। প্রেতলোকোচিত বিভীষিকাময় এই প্রতিবেশ এবং এই রকম হৃদয়হীন নিষ্ঠুর নায়ক বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ। রাসমণি, নলিন, ছোটবাবু, দারোগা প্রভৃতি চরিত্রগুলি পিশাচের চারিপাশের অন্ধকারকে খানিকটা বাড়াইয়াছে এবং সেই অন্ধকারেই তাহারা ফুটিয়াছে ভাল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বহু বিচিত্র—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৬০, মূল্য ২৷৹।

বিচিত্র ধরণের বারটি গল্প আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলির বিষয়বস্তুই শুধু বিচিত্র নয়, রচনা-শৈলী সংলাপ, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতিতে বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম গল্প 'তৃতীয় পক্ষে' অরক্ষণীয়া একটি মেয়ে দ্বিতীয় বার বিপত্নীক পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের এক পুরুষের নিকট গিয়া স্বয়ম্বরা হইয়া বলিতেছে—"আমাকে যদি খুব অপছন্দ না হয় ত আমি রাজি আছি।" মাঝে মাঝে ভাষাও বিচিত্র। ৫৫ পৃষ্ঠায় 'ব্যবসায়' নামক গল্পে লেখক লিখিয়াছেন—'আর তুলসীর সেবাও চলিতে লাগিল নিটোল ভাবে।' তাই বলিয়া প্রত্যেক গল্পই এরূপ নহে,—ভাংচি, চাঁদের আলো, শিল্পী প্রভৃতি কয়েকটি গল্প উচ্চাঙ্গের শিল্পোৎকর্ষের দাবি করিতে পারে। 'কক্ষচ্যুত' নামক গল্পটি নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া শেষের কয়েকটি লাইনে হঠাৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীতারাপদ রাহা

এলোমেলো—শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাদার্ণ পাবলিশার্স, ৭ বসন্ত বসু রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কবিতার বই। প্রথম কবিতা 'সিম্‌প্লি সে শুধু খুকী'। নামে চটুলতার আভাস থাকলেও মন্দ লাগে নি। পরবর্ত্তী কয়েকটি কবিতাও ভাল লেগেছে। কিন্তু শেষের দিকে কবিতা আর 'সিম্‌প্লি কবিতা' রইলো না দেখে দুঃখ বোধ করলাম। 'শ্যামবাজার' ব্ল্যাকমার্কেট খুঁজতে বেরিয়ে কবি যখন তালঠুকে সুরু করলেন: "স্বাধীনতা চাই? ব্ল্যাকমার্কেট তারও জমেছে খুব, গান্ধীজিন্না সে হাট নিয়েছে জমা" তখন মনে হ'ল 'ব্ল্যাক-আউটে'র রাত্রে কবিতার রাজ্যেও 'ব্ল্যাকমার্কেট' সুরু হয়েছে। ভয়ে ভয়ে ফিরে এলাম।

মিছিল—শ্রীসত্যকুমার নাগ ও শতদল গোস্বামী সংকলিত। চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৪২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২৲।

আধুনিক কবিতার সঞ্চয়ন। রবীন্দ্রনাথ থেকে নীলিমা দেবী পর্যন্ত অনেকের কবিতাই স্থান পেয়েছে, প্রত্যেকের একটি ক'রে। বাছাইয়ের ব্যাপারে রুচিভেদ ও মতভেদ থাকবেই। তবু কয়েকটি ভালো কবিতা একসঙ্গে করে' পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন এজন্য সংকলয়িতারা

ধন্যবাদার্হ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদে অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ভাল লাগল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার দুর্ভিক্ষ (১৩৫০)—শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী। শিল্প-সম্পদ প্রকাশনী, ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৪০, মূল্য ৪৲।

ভারতের ইতিহাসে বাংলার ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে মানুষের বে-বন্দোবস্তে এবং সরকারী গাফিলিতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাইতে পারে এ ধারণা দেশের লোকের ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা দেখিয়া দেশবাসী নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছে। কাগজে-কলমে এমন কি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভোট দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে ১৩৫০ সালে বাংলায় কোন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। খাদ্যসঙ্কট হইয়াছিল মাত্র। দোষ কেন্দ্রীয় না বঙ্গীয় সরকারের তাহাও আজ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত। অজন্মার জন্য বা ব্রহ্মদেশের আমদানীর অভাবে, না অতিরিক্ত রপ্তানীর জন্য, না চলাচলের অসুবিধার জন্য এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহারও আজ পর্য্যন্ত চরম মীমাংসা হয় নাই। হয়ত ইহার সবগুলিই দুর্ভিক্ষের কারণ। সর্ব্বোপরি বাঙালীর দুরদৃষ্টই যে ইহার কারণ সন্দেহ নাই। ভারতবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধ তাহাদের পরাধীনতা। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস, এদেশের আপাত ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির পশ্চাতে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নহে।

লেখক কয়েকটি অধ্যায়ে নানা দিক দিয়া এই ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের আলোচনা করিয়াছেন। আমদানী, রপ্তানী, উৎপাদন, অব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি, লোকক্ষয়, সরকারের বণ্টন-নীতি প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়ই লেখক বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলাভাষায় এই বিষয়ে যে কয়খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান পুস্তকখানিই সর্ব্বাপেক্ষা তথ্যবহুল ও সুলিখিত। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সর্বানন্দ-উপদেশামৃত ও পত্রাবলী— স্বামী সর্বানন্দ পুরী, পোঃ বক্স নং ৯৪, নয়াদিল্লী। ৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য—এক টাকা।

গ্রন্থের প্রথমাংশে মানবজীবনের কল্যাণকর ১১৩টি উপদেশ এবং বাকী অংশে শিষ্য ভক্ত ও বন্ধুদের নিকট লিখিত স্বামীজির ১২খানি চিঠি স্থান পাইয়াছে। চিঠিগুলিতে বহু সুচিন্তিত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে যুক্তিবাদী ধর্মপিপাসুগণ উপকৃত হইবেন।

গীতামৃত—শ্রীবিধুভূষণ পাল। ৩৯।৫এ, গোপালনগর রোড, আলীপুর হইতে শ্রীনবেন্দুভূষণ পাল কর্তৃক প্রকাশিত। ১৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য—দুই টাকা।

মাহাত্ম্যসমেত পূর্ণ অষ্টাদশাধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদিনী শ্রীশ্রীগীতার এই পদ্যানুবাদ গ্রন্থ চারি বৎসরের ভিতর তৃতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিল। ইহা হইতেই প্রবীণ গ্রন্থকারের সরল ও সুললিত পদ্যানুবাদ যে কতটা লোকপ্রীতি অর্জন করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। গীতানুরাগী মাত্রেই গীতামৃত পাঠে তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দূরে চক্রবাল—শ্রীক্ষীরোদ ভট্টাচার্য। শৈলশ্রী, ১।১।১এ, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲ টাকা।

এক তরুণের বাল্যপ্রেমের করুণ কাহিনী লইয়া লিখিত এই উপন্যাসে লেখক একটি উপাদেয় রস পরিবেশন করিয়াছেন। ভাষার সরলতা

এবং মিষ্টতার জন্য তাঁহার বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িতেই হইবে যদিও গল্পে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। কিন্তু চির পুরাতন এই প্রেমের আখ্যানে তিনি যে নায়কটিকে পাঠকের নিকট ধরিয়াছেন, তাহার মনস্তত্ত্ব, অর্থাৎ তাহার মান অভিমান অনুরাগ বিরাগ ঠিক ঐ বয়সের ঐরূপ ছন্নছাড়া যুবকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এইজন্যই লেখকের সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

ভারতের পুণ্যতীর্থ—ডক্টর বিমলাচরণ লাহা। প্রাচ্য-বাণী-মন্দির, ৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬৭ পৃষ্ঠা। মূল্য—এক টাকা।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্য অসংখ্য তীর্থস্থানের পরিচয় ও মাহাত্ম্য-বর্ণনে মুখরিত। তবে অনেকগুলি তীর্থ বর্তমানকাল পর্যন্ত বিশেষ সমাদৃত হইলেও তাহাদের প্রামাণিক ও পুরাতন বিবরণ সাধারণের নিকট একরূপ অজ্ঞাত। বর্তমান গ্রন্থের সুযোগ্য রচয়িতা প্রাচীন ভারতের নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্ব সমাহরণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি এইরূপ বিবরণ সংকলনে হস্তক্ষেপ করিলে বিশেষ মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্যগ্রন্থে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের কতকগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থের নাম ও অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ তীর্থের মধ্যে গয়ার নাম বাদ পড়িয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

যোগ পরিচয়—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তিকা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্তর্গত। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য গ্রন্থকার মহাশয় সর্বজনপরিচিত। পাতঞ্জল দর্শন, তথা ব্যাস-ভাষ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল, এই পুস্তিকাতে যথাসম্ভব বিবৃত হইয়াছে; অধিকন্তু পুরুষবহুত্বের নিয়ামক কি, পরিণামবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, অস্মিতার ধ্যান কিরূপ—তাহা শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয় বিশদভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষাগত ত্রুটি এবং মুদ্রাকরকৃত প্রমাদ না থাকিলে পুস্তিকাখানির উপযোগিতা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইত। ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদই প্রচার করে এ অপবাদ খণ্ডন করিয়া গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য আট আনা।

দর্শনশাস্ত্রের স্বরূপ, তার প্রতিপাদ্য বিষয় ও ক্রমবিকাশের বিবরণ এই পুস্তিকাতে দেওয়া হইয়াছে; ইহার ভাষা সুসংযত অথচ প্রাঞ্জল; যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, এই পুস্তিকা তাঁহাদের প্রারম্ভিক পাঠ্য হইবার যোগ্য।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

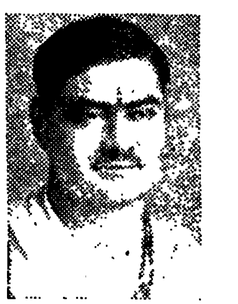
ছোটদের পথের পাঁচালী—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৯২ পৃ.। মূল্য ১৷৹।

বিভূতিবাবুর 'পথের পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব অবদান। সাবলীল অনাড়ম্বর ভাষায় পল্লীজীবনের অপূর্ব্ব খুঁটিনাটি বর্ণনা, বিকাশোন্মুখ শিশুচিত্তের সুনিপুণ বিশ্লেষণ সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর পাঠকের মনেই এক বিচিত্র বিস্ময়জনক অনুভূতির সৃষ্টি করে। বিভূতিবাবু স্বয়ং ছেলেদের উপযোগী করিয়া ইহার এক সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

মহামান্য ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন **রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন, এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)**; প্রেসিডেণ্ট—বিশ্ববিখ্যাত 'অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী'।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া ও ভারতের বাহিরের, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্ত লিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্বিদ—যাঁহার গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়া মহামান্য সম্রাট স্বয়ং প্রশংসা জানাইয়াছেন এবং আঠারজন স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভায় একমাত্র ইঁহাকেই **"জ্যোতিষশিরোমণি"** উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সবজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।" হার্ হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রেতেই সম্ভব।" সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—"ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন—"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।" বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব শ্রীসূর্যমণি দাস বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।" ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহাপাধ্যায় ভারতাচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষে ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।" উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।" বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি. মাধবম্ নায়ার কে-টি, বলেন—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যইতিনি একজন বড় জ্যোতিষী।" চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।" জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ৭৫৲ পাঠাইলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—স্বল্পায়াসে ধনলাভ করিতে হইলে এই কবচ ধারণ একান্ত আবশ্যক; চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া পুত্র, আয়ুঃ, ধন ও কীর্ত্তি দান করেন। "ধনং বহুবিধং সৌখ্যং রাজত্বঞ্চ দিনে দিনে", ইহা ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হয়। মূল্য ৭৷৶৹। তন্ত্রোক্ত কল্পবৃক্ষের ন্যায় ফলদাতা, অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ বৃহৎ কবচ। মূল্য ২৯৷৶৹।

বগলামুখী কবচ—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্ম্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৶৹, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৶৹ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)।

বশীকরণ কবচ—ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও স্বকার্য সাধন যোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১৷৹, বৃহৎ ৩৪৶৹। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (প্র) গ্রে ষ্ট্রীট, **"বসন্ত নিবাস"** (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ **সাক্ষাতের সময় :**—প্রাতে ৮৷৹টা হইতে ১১৷৹টা

ব্রাঞ্চ—৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (ওয়েলেসলীর মোড়), ফোন : কলিঃ ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫-৩০টা—৭৷টা।

লণ্ডন অফিস :—মিঃ এম-এ-কার্টিস. ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইনিস পার্ক, লণ্ডন, এস ডব্লিউ, ২০

১। রায়তের কথা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।
২। জমির মালিক—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।
৩। বাংলার চাষী—শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু।
৪। বাংলার রায়ত ও জমিদার—শ্রীশচীন সেন।
৫। জমি ও চাষ—শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী

বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালা। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য প্রত্যেকখানি ।• আনা।

একদা বাংলার প্রজা-হিতৈষীদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে আইনের সাহায্যে জমির উপর মালিকানা স্বত্ব লাভ করিয়া রায়তেরা যদি জোত হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহা হইলেই তাহাদের সকল দুঃখদুর্গতির অবসান হইবে। কিন্তু বাস্তবিকই রায়তের পক্ষে তাহা কল্যাণের পথ কিনা রবীন্দ্রনাথের মনে সে-সম্বন্ধে সংশয় জাগিয়াছিল। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর টীকা সম্বলিত তাঁহার যে প্রবন্ধটি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় সেটি শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। উক্ত দুটি প্রবন্ধই 'রায়তের কথা'য় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি বাংলা মনন-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বাংলার চাষ ও চাষী সম্বন্ধে আন্দোলন সুরু হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এবং বাস্তবতঃ তাহা সাফল্য লাভ করে উনিশ বৎসর পরে। ১৯৩৮ সালে সংশোধিত টেনেন্সি আইনের ফলে জমির মালিকী স্বত্ব লাভ করা সত্ত্বেও চাষীদের দুর্গতির অবসান কেন হইল না, আসল গলদ কোথায়, শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত 'জমির মালিকে' তাঁহার নিজস্ব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

'বাংলার চাষী', 'বাংলার রায়ত ও জমিদার', 'জমি ও চাষ' এই তিনখানা পুস্তকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কৃষি ও কৃষকের সমস্যা আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বঙ্গীয় নাট্যশালা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য আট আনা।

বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত এই পুস্তকখানির পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। পুস্তকখানি জনাদর লাভ করিয়াছে। স্বল্প-পরিসরে বঙ্গীয় নাট্যশালার তথ্যপূর্ণ ইতিহাস ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে নাট্যশালা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার সূত্রও ইহার মধ্যে মিলিবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ-বিদেশের কথা

শশধর ভট্টাচার্য্য

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দাগ্রাম নিবাসী শশধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২৯০ সালে মালদহ শহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই অতি কষ্টে শিক্ষা লাভ করেন। এনট্রান্স পাশ করিয়া পিতার দরিদ্রতা হেতু মাসিক ৭৲ টাকা বেতনে জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী গ্রহণপূর্ব্বক তিনি সংসারে অবতীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী ভ্রাতাদের লেখাপড়া শেখান। তাঁহার পিতা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। শশধর বাবু যশের সহিত কার্য্য করিয়া সামান্য ৭৲ টাকা বেতনের মোহরার হইতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া ম্যানেজার পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক জন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন।

বলাইচন্দ্র সেন

পরলোকগত বলাইচন্দ্র সেন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার বিখ্যাত সেন বংশে ১৩০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গত ১১ই ফাল্গুন, ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান হয়। তিনি ১৯ বৎসর বয়সে সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ-র ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হন। দীর্ঘকাল যাবৎ অনলস ভাবে পরিশ্রম করিয়া তিনি ব্যবসাক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন। 'ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ' এবং 'পিওর ড্রাগস্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের' প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি ছিলেন। তাঁহার দানে কালনার মিউনিসিপাল হাসপাতাল, অম্বিকা হাই স্কুল ও কালনা কলেজ পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইদানীং কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য সুদূর পল্লীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ প্রচারেও তিনি বিশেষ সগরতা করেন।

নিরঞ্জনকুমারী বৈরাগী



নিরঞ্জনকুমারী বৈরাগী

নিরঞ্জনকুমারী বৈরাগী গত ৮ই ফেব্রুয়ারি দীর্ঘকাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহ জেলায় এসিষ্ট্যাণ্ট স্কুল-ইন্স্পেক্ট্রেস্ ছিলেন। স্বাস্থ্য উপযুক্ত না থাকায় ১৯৩৮ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেথুন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠান। যুদ্ধ হেতু বেথুন স্কুল বন্ধ থাকায় তাঁহাকে কুমিল্লা ফৈজুন্নেসা গার্লস স্কুলে বদলি করা হয়। তিনি সহজ স্বাভাবিক ও সত্যপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কঠিন রোগ যন্ত্রণার মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখেও তাঁহার সহজ প্রসন্নতা নষ্ট হয় নাই। হাসপাতালের ডাক্তারগণ পর্য্যন্ত নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে তাঁহার মৃত্যুভয়পরিশূন্য স্বাভাবিক প্রসন্নতা দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে তিনি গবর্ণমেণ্ট এবং বন্ধুবর্গের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিরঞ্জনকুমারীর গোপন দান বিস্তর ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে পোষ্যগণকে কাহাকেও ছয় মাস, কাহাকেও এক বৎসরের মত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। নিজের অর্থের অনটন হইতে পারে জানিয়াও তিনি এই কার্য্য হইতে বিরত হন নাই।

[illegible] প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত